Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

Documentation of Bengali documents in collaboration with Rabindra Bharati University and the Ford Foundation: microfilmed and digitised in December 2006

Record No: 2006/ 169	Language of work: Bengali
Author (s) / Editor (s): SRI NISI KANTA GHOSH	
Title: কৃষি সম্পদ KRISI SAMPAD	
Volume(s): VOLUME 7 PART 1 BAISHAKH 1323 [APRIL 1916] - CAITRA 1323 [MARCH 1917]	
Place (s) of Publication: DHAKA	Publisher: SRI NISI KANTA GHOSH AT THE KRISI SAMPAD OFFICE 66 NARINDA DHAKA
Year / edition:	
Size: 23cm	Condition of the original: BRITTLE
Remarks:	
Holding institute: Rabindra Bharati University, Calcutta	Microfilmed and digitised by: Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta, 2006 - 2007.

Microfilm Roll No:	From gate:	To gate:

Approved by the Dir[illegible] Instruction Bengal, [illegible] in Schools & Colleges (Vide, Calcutta Gazette, [illegible])

Krishi-Sampad.

Vol. VII. No. 1. [illegible]মাত্র কৃষিবিষয়ক মাসিক পত্র। বৈশাখ, ১৩২৩.
৭ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা।

আমাদের অন্নসমস্যা-সমাধানের প্রধান উপায় কৃষি।

আমাদের শ্রম-শিল্পের প্রধান উপকরণও কৃষি।

কৃষি-সম্পদ

কৃষি, কৃষি-শিল্প এবং যৌথ ঋণ-দান-সমিতি-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নূতন ধরণের সচিত্র মাসিক পত্র।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩৲ মাত্র।

প্রবন্ধ-সম্পদে অতুলনীয়, চিত্র-সৌন্দর্য্যে
অপূর্ব্ব ও সর্ব্বত্র উচ্চ-প্রশংসিত
বাঙ্গালার কৃষি-বিষয়ক
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও বৃহত্তম পত্র।

লেখক—"কৃষি-সম্পদে" রহিয়াছেন—

আমেরিকা-প্রত্যাগত শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী বি, এ, এম, এস, এ।
" " শ্রীযুক্ত দ্বিজদাস দত্ত এম্, আর, এ, সি,
" " " অনাথবন্ধু সরকার এম্, এ, সি, এস,
জাপান-প্রত্যাগত শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম্, এ, এস।
" " " রসিকরঞ্জন ঘোষ এম্, এস, এ।
" " " মন্মথনাথ দে " " "
" " " যোগেশচন্দ্র চৌধুরী " " "
" " মিঃ এ, সি, ঘোষ এম্, এ, এস্।
" " " এন্, এল, দত্ত " " "
" " ডাঃ পি, কে, বিশ্বাস পি, এইচ ডি।
ফ্রান্স-প্রত্যাগত শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস এস, ই
" ঈশ্বরচন্দ্র গুহ এফ, আর, এইচ, এস
" প্রবোধচন্দ্র দে " " " "
" রাজেশ্বর দাসগুপ্ত এম, আর, এ, এস
" প্রকাশচন্দ্র সরকার " " " "
" রঘুনাথ দাস জি, বি, ভি, সি
" কামিনীকুমার লাহিড়ী B. A. G.
" হেমচন্দ্র দেব (মেডিকো বোটানিষ্ট)

রংপুর গবর্ণমেণ্ট কৃষি-পরীক্ষাক্ষেত্রের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত যামিনীকুমার বিশ্বাস বি, এ, কটক গবর্ণমেণ্ট কৃষি-পরীক্ষাক্ষেত্রের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত রাজনাথ রায় বি, এ, ঢাকা-বিভাগের স্কুল-ইন্স্পেক্টার রায় সাহেব শ্রীযুক্ত প্রমোদ কুমার বসু এম, এ, আমেরিকার বার্কলী কৃষি-কলেজের শ্রীযুক্ত স্বর্ণকুমার মিত্র, শ্রীযুক্ত নিরুপমচন্দ্র গুহ প্রভৃতি।

"কৃষি-সম্পদের" নিয়মাবলী।

১। "কৃষি-সম্পদের" প্রত্যেক সংখ্যা সাধারণতঃ চারি ফর্ম্মা অর্থাৎ ৩২ পৃষ্ঠা পরিমিত হইবে।

২। ইহার বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত সর্ব্বত্র ৩৲ তিন টাকা মাত্র। মূল্য অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যা ।/০ আনা। নমুনার মূল্য বাবদ /০ দিতে হয়।

৩। "কৃষি-সম্পদ" প্রত্যেক পূর্ণিমায় বাহির হয়। সুতরাং ইহা প্রকাশিত হইবার কোনও নির্দ্দিষ্ট সময় নাই। তবে যে মাসের যে তারিখে যে সংখ্যা প্রকাশিত হইবে, ১ম সংখ্যায় স্বতন্ত্রভাবে তাহার লিষ্ট প্রদত্ত হইয়াছে। নির্দ্দিষ্ট সময়ের পরও একসপ্তাহমধ্যে পত্রিকা হস্তগত না হইলে, প্রথমতঃ স্থানীয় পোষ্ট আফিসে সংবাদ লইবেন, এবং তৎপর "কৃষি-সম্পদ" আফিসে সংবাদ পাঠাইবেন। নচেৎ অপ্রাপ্ত সংখ্যার জন্য, পরে মূল্য ও ডাকমাশুল দিতে হইবে।

৪। বৎসরের যে কোন সময়ে, "কৃষি-সম্পদের" গ্রাহক হইতে পারা যায়; কিন্তু প্রত্যেক গ্রাহকই ১ম সংখ্যা হইতে "কৃষি-সম্পদ" প্রাপ্ত হইবেন।

৫। **"কৃষি-সম্পদ" সম্বন্ধীয় সমস্ত চিঠি-পত্র, প্রবন্ধ, বিনিময়ের সংবাদ-পত্র, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি** "কৃষি-সম্পদ" পত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত ঘোষের নিকট কৃষি-সম্পদ আফিস, ৬৬নং নারিন্দা, ঢাকা—এই ঠিকানায় এবং টাকাকড়ি আমার নামে পাঠাইতে হইবে।

শ্রীনগেন্দ্রকুমার রায়।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত কার্য্যালয়, ফরিদাবাদ—ঢাকা।

বিজ্ঞাপনের হার।

১। বিজ্ঞাপনের হার সুলভ। মাসিক প্রতি পৃষ্ঠা ৬৲ টাকা; প্রতি কলম ৪৲ টাকা। সিকি কলম ২॥০ টাকা; ⅛ কলম ১॥০ টাকা।

২। কাভারিং এর দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ পৃষ্ঠায়ও বিজ্ঞাপন গৃহীত হইবে। দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় মাসিক ১০৲, ৩য় পৃষ্ঠায় ৮৲ টাকা এবং চতুর্থ পৃষ্ঠায় ১২৲ টাকা দেয়।

বাৎসরিক চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

আমাদের বিজ্ঞাপনের দর-দস্তুর নাই—ইহাই নির্দ্দিষ্ট নিয়ম।

বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

RABINDRA BHARATI UNIVERSITY LIBRARY

To Kshitindra Nath Tagore Esqr B.A. Tattwanidhi
Editor, Tattwabodhini
With the Editor's best compliments

আভোকাডো-বৃক্ষের ফুল ও ফল।

AVOCADO: ITS FLOWERS & FRUITS.

আভোকাডো-বৃক্ষের ফুল।

আভোকাডো-ফলের থোপা।

কর্ত্তিত আভোকাডো-ফল।

অন্নং বহু কুর্ব্বীত ॥ তদ্‌ব্রতম্ ॥

তৈত্তিরীয়োপনিষদি ভৃগুবল্লী।

RABINDRA BHARATI UNIVERSITY LIBRARY

সূচী

[লেখকদিগের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।]

বিষয়	পত্রাঙ্ক
নিবেদন	১
মিঃ ব্যাকউড্ ও বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগ	৩
আভোকাডো (ফল) ... ... —শ্রীযুক্ত স্বর্ণকুমার মিত্র এম, এস (সাবৌর)	৪
কদলী সম্বন্ধে দুই-চারিটি কথা —শ্রীযুক্ত নিরুপমচন্দ্র গুহ (সাবৌর-কৃষি কলেজ)	৯
কৃষি আর কৃষিজাত দ্রব্য (পূর্ব্বানুবৃত্তি)	১২
উদরাময় —শ্রীযুক্ত রঘুনাথ দাস জি, বি, ভি, সি ...	১৩
বাঁশের ব্যাঙ্ক ও বাঁশের চাষ —শ্রীযুক্ত পরেশনাথ বসু এম, এস সি, বি, এল	১৫
আঁশপ্রদ উদ্ভিদ—পাট —শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সোম (পাট-ব্যবসায়ী)	২৭
ধানের পোকা ও তাহার প্রতিকার —শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার মজুমদার বিদ্যাভূষণ	৩০
বিক্রমপুর-সমবায়-কেন্দ্রসমিতি —শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ বি, এ	৩২

নিবেদন।

বিশ্বনিয়ন্তার ব্যবস্থায় বঙ্গের একমাত্র কৃষি-বিষয়ক মাসিক-পত্র "কৃষি-সম্পদ" আজ ৭ম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। তাঁহার অপার অনুগ্রহে এই ক্ষুদ্র পত্রিকাখানি নানা প্রকার বাধা-বিঘ্নসত্ত্বেও গত ছয়বৎসরকাল আত্মরক্ষা বা দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারিয়াছে, আবারও সেই জগজ্জননীই কল্যাণনিলয়রূপে নিত্য বিদ্যমান রহিয়া, তাঁহার আশীর্ব্বাদ-পত্রখানিকে রক্ষা করিবেন; আজি এ নববর্ষের প্রারম্ভে, দৃঢ়তার সহিত সে বিশ্বাসই আমরা হৃদয়ে পোষণ করিতেছি। সুতরাং, জীবনের এই পট পরিবর্ত্তনের সময়ে, আমরা সর্ব্বাগ্রে জগজ্জননীর কৃপা ও শুভাশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া, পুনর্ব্বার কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইলাম। সর্ব্বমঙ্গলা আমাদের শুভসঙ্কল্পে সহায় হউন।

"কৃষি-সম্পদের" আজন্ম ব্রত—"অন্নং বহু কুর্ব্বীত তদ্ ব্রতম্" ॥ "কৃষি-সম্পদ" গত ছয়বৎসরকাল, এই

ব্রতই উদ্‌যাপন করিয়া আসিতেছে ; এবং দেশবাসীর সেবা করিয়া ধন্য হইয়াছে। আজ "কৃষি সম্পদ" সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করিল। কৃষি-প্রাণদেশে একমাত্র কৃষি-পত্রখানি ষষ্ঠবর্ষকাল জীবিত রহিয়াছে, ইহাতেও কেন আমরা কৃতকৃতার্থ হইতেছি, তাহা কাহাকেও বোধ হয় বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। কৃষি-বৃত্তিতে সত্যসত্যই আমরা এমনই শ্রদ্ধাবান্!

জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়ের যুগ্মসংখ্যা যন্ত্রস্থ ; আশা করা যায়, আষাঢ়মাসের শেষ সপ্তাহেই ইহা বাহির হইবে। সেই সংখ্যাতে রঙ্গপুর-কৃষি-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথমবার্ষিক অধিবেশনে পঠিত তাবৎ প্রবন্ধই স্থানলাভ করিবে। নিম্নে প্রবন্ধের নাম ও প্রবন্ধ-লেখকের নাম—এককথায় সূচীপত্র—প্রদত্ত হইল :—

জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়-সংখ্যার সূচী।

প্রবন্ধের নাম— প্রবন্ধ-লেখকের নাম

১। কৃষি ও কৃষক—শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র গুহ এম্, আর, এইচ, এস্।
২। গোপালনসম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী বি, এ, এম্, এ, এস্।
৩। কৃষির আবশ্যকতা ও আমাদের কর্ত্তব্য—শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম্, এ, এস্।
৪। মেঘ ও বৃষ্টি বিচার—কবিরাজ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দেব।
৫। তামাক ও তামাকচাষে ঐতিহাসিক তত্ত্ব—শ্রীযুক্ত যামিনীকুমার বিশ্বাস বি, এ।
৬। কৃষি-শিক্ষা ও গো-রক্ষা—শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র সরকার বি, এল্।
৭। কৃষি-রসায়নের ক্রমঃবিকাশ— ডাঃ প্রমোদাচরণ বিশ্বাস পি, এইচ্, ডি।
৮। কৃষকের শোচনীয় অবস্থা— শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ সান্যাল বি, এল্।
৯। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে কৃষিতত্ত্ব— পণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।
১০। আমার কৃষি-জীবনের কথা—শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দে এফ্, আর, এইচ, এস্।

এবার স্থানাভাবে "কৃষি-সম্পদে"র বর্ষ-কথা প্রকাশিত হইল না ; সম্ভবতঃ শ্রাবণের সংখ্যায় ইহা প্রকাশিত হইবে।

এ দেশে ব্যবহারিক-সাহিত্য এখনও গড়িয়া উঠে নাই সত্য, কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায়, সামাজিক জীবনে ইহার আবশ্যকতা ষোলকলায় রহিয়াছে। সাহিত্যের প্রভাবে জাতীয় জীবন গড়িতে হইলে, ব্যবহারিক সাহিত্যই এক্ষণ চাই। কৃষি-সাহিত্যই সর্ব্বপ্রধান ব্যবহারিক সাহিত্য ; একথা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছি বলিয়াই, আমরা বহুপ্রকার আর্থিক কষ্ট ও অসুবিধা ভোগ করিয়াও, কৃষি-সাহিত্যের চর্চ্চায় আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি নিয়োজিত করিয়াছি। আমরা প্রার্থনা করি, সহৃদয় দেশবাসী আমাদের সঙ্কল্পসিদ্ধির পথে সহায় হইবেন।

"কৃষি-সম্পদে"র বর্ত্তমান লেখক-সংখ্যা অত্যধিক না হইলেও, তাঁহারা সকলেই "কৃষি-সম্পদে"র পরিচালন-কার্য্যে, আমাদের সহকর্ম্মী ও চিরসুহৃৎ। তাঁহাদের সকলের নিকটই আমরা কৃতজ্ঞতার অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ।

এস্থলে, আমাদের সহৃদয় পৃষ্ঠপোষক, লেখক, গ্রাহক ও অনুগ্রাহক মহোদয়দিগকে যথাযোগ্য প্রণাম, নমস্কার এবং আন্তরিক প্রীতি-সম্ভাষণ জানাইতেছি ; এবং এই সকল কৃষি-সাহিত্যানুরাগী বন্ধুবর্গের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। বস্তুতঃ, যে কোন ব্যক্তিই কৃষি বা কৃষি-সাহিত্যের উন্নতি-প্রয়াসী, সাহিত্যের হিসাবে এবং লৌকিক কল্যাণের হিসাবে, তাঁহারা সকলেই আমাদের কৃতজ্ঞতা-ভাজন। তাঁহাদের অনুগ্রহই "কৃষি-সম্পদের" জীবন। ভরসা করি, তাঁহারা কৃষি-সম্পদের প্রচার-বৃদ্ধির আনুকূল্য করিয়া, এ কৃষি-প্রাণ বা কৃষি-প্রধান দেশে কৃষি-কথা প্রচারেরই সাহায্য করিবেন। ফলে, "কৃষি-সম্পদে"র জীবনরক্ষার ব্যবস্থা বিহিত হইবে।

দেশের সাধারণ কৃষক-সমাজ নিরক্ষর ও নির্ধন ; এরূপক্ষেত্রে, এদেশে উন্নত-প্রণালীর কৃষি-প্রথা প্রবর্ত্তন, অথবা কৃষক-সমাজে কৃষি-প্রথা প্রচার করিতে হইলে, বর্ত্তমান সময়ে, শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের আনুকূল্য সর্ব্বতো-ভাবেই আবশ্যক। বস্তুতঃ, শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের আদর্শে বা সংস্রবেই, এদেশের সাধারণ কৃষকের উন্নতি ঘটিবে। কার্য্যক্ষেত্রেও, ইহার যাথার্থ্য প্রমাণিত হইয়াছে। সদাশয় গভর্ণমেণ্ট, ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড ও ল্যোকাল বোর্ডের অনুগ্রহে ও অর্থানুকূল্যে, বাঙ্গালা বহুবিদ্যালয়েই "কৃষি-

Kshitindranath Tagore Collection

সম্পদ" প্রেরিত হইয়াছে। অনেক শিক্ষকই গ্রাম্য-কৃষক-সমাজে "কৃষি-সম্পদ" পাঠ করিয়া, কৃষি-তত্ত্ব প্রচারে, আমাদিগকে সাহায্য করিয়াছেন। এইজন্য, তাঁহারা আমাদের ধন্যবাদার্হ। ইহাতে কৃষি-কথা-শ্রবণে কৃষকের বিশেষ আগ্রহও বাড়িয়াছে—চাষ-বাস-সম্পর্কে অনেকে অনেক প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য প্রশ্নের উত্তর (১) পত্র-ব্যবহারে এবং (২) স্বতন্ত্র প্রবন্ধে—উভয় প্রকারেই প্রদত্ত হইয়াছে। সুতরাং সদাশয় গভর্ণমেণ্ট, ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড ও লোক্যাল বোর্ডের অনুগ্রহে, "কৃষি-সম্পদের" কর্ম্মক্ষেত্রও ক্রমশঃ প্রসারিত হইতেছে এবং দেশের নিঃস্ব ও নিরক্ষর কৃষক-সমাজেও কৃষি-কথা সম্যক্ প্রচারিত ও আলোচিত হইয়াছে।

পুনরপি, সর্ব্বমঙ্গলনিলয়—সর্ব্বসিদ্ধিদাতা ভগবচ্চরণে প্রণতিপূর্ব্বক, আমরা নববর্ষে পুনরায় অবনত মস্তকে সম্পাদকীয় কর্ত্তব্যভার গ্রহণ করিতেছি।

মিঃ ব্ল্যাকউড্ ও কৃষি-বিভাগ।

মিঃ, জে, আর, ব্ল্যাকউড্ (Mr. J. R. Blackwood L. L. B., I. C. S.) আই, সি, এস মহোদয় বাঙ্গালার কৃষি-বিভাগের অধ্যক্ষ (Director of Agriculture)। প্রায় পাঁচবৎসরকাল কৃষি-বিভাগের অধ্যক্ষতা করিয়া, তিনি সম্প্রতি দীর্ঘকালের অবকাশ লইয়া স্বদেশে গমন করিতেছেন। এস্থলে, তাঁহার কোন কার্য্যের সমালোচনা করা আমাদের অভিপ্রেত নহে। তথাপি, তাঁহার সম্পর্কে এক্ষণ আমরা সংক্ষেপে দু'একটী কথা বলিতে চাই। তাঁহার সময়ে কৃষি-বিভাগের কার্য্যে আমরা বেশ একটু সজীবতা লক্ষ্য করিতে পারিয়াছি। মিঃ ব্ল্যাকউড্ সম্পূর্ণ-ভাবে গতানুগতিকের পন্থা অবলম্বন করেন নাই ; ইহাই তাঁহার বিশেষত্ব। ফলে, কৃষক-সমাজও কৃষি-বিভাগের অস্তিত্ব অনেকাংশেই এক্ষণ অনুভব করিতে পারিয়াছে।

সরকারী কৃষি-বিভাগের রিপোর্ট পড়িয়া শিক্ষালাভ করা, এদেশের নিরক্ষর কৃষকের পক্ষে সর্ব্বাংশে সম্ভবপর নহে। উন্নত কৃষি-প্রণালীর কথা মুখে বলিয়া দিলেও, তাহারা সে কথা সহজে বিশ্বাস করিবে না ; এবং বিশ্বাস করিলেও, 'আস্ত' (আর্থ ; নাই বলিয়া', নূতন কিছু করিতে সহজে রাজি হইবে না। এইজন্যই এদেশের অশিক্ষিত কৃষকদিগকে নূতন কিছু শিক্ষা দিতে হইলে, কৃষকের ক্ষেতে গিয়া হাতে-হেতেড়ে শিক্ষাদান (Field demonstration) অত্যাবশ্যক। সুফল অর্থাৎ আয়ের পরিমাণ কিঞ্চিৎ অধিক দেখাইতে পারিলেও, কৃষকেরা তাহা সহজে গ্রহণ করিবে। এই উদ্দেশ্যে কৃষকের ক্ষেত্রে হাতে-হাতেড়ে কৃষি-পরীক্ষা প্রদর্শন (demonstration) করা হয়। পূর্ব্বে একমাত্র পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামেই কএকজন কৃষি-প্রদর্শক ছিল ; কিন্তু ব্ল্যাকউড্ সাহেবের সময় সমগ্র বঙ্গেই বহুসংখ্যক কৃষি-প্রদর্শক (Demonstrators) নিযুক্ত হইয়াছে। (১) মাঠে যাইয়া হাতে-হেতেড়ে কৃষকগণকে কৃষি-পদ্ধতি প্রদর্শন করা, (২) কৃষকদিগকে উৎকৃষ্ট বীজ সংগ্রহ করিয়া দেওয়া, এবং (৩) সরকারী কৃষি-পরীক্ষা-ক্ষেত্রের পরীক্ষালব্ধ ফলের কথা কৃষকদিগকে বুঝাইয়া বলা—প্রধানতঃ, এই তিনটীই কৃষি-প্রদর্শকদিগের কর্ত্তব্য কার্য্য। বলা বাহুল্য, কৃষকের ক্ষেত্রে কৃষি-পরীক্ষা-প্রদর্শনের ব্যবস্থা দেশকালপাত্রোপযোগীই হইয়াছে। কৃষি-প্রদর্শকদিগের অনুষ্ঠিত কৃষকের ক্ষেত্রে কৃষি-পরীক্ষা-প্রদর্শন, নূতন নূতন শস্যের চাষ-পরীক্ষা, অর্দ্ধমূল্যে বা বিনামূল্যে সরকারী কৃষি-পরীক্ষা-ক্ষেত্রসমূহের বাছাইকরা বীজ বিতরণ, লাভজনক শস্যের চাষ-প্রবর্ত্তন প্রভৃতি কার্য্যের ফলও বেশ সন্তোষজনক হইয়াছে।

আমরা যতদূর জানি, মিঃ ব্ল্যাকউডের অভিপ্রায় ছিল, বঙ্গের প্রত্যেক বিভাগেই এক একজন কৃষি-তত্ত্বাবধায়ক (Superintendent of Agriculture), প্রত্যেক জিলায় এক একজন জিলা-কৃষি- কর্ম্মচারী (District Agricultural officer) এবং থানায় থানায় এক একজন কৃষি-প্রদর্শক (Demonstrator) নিযুক্ত করিবেন। কার্য্য-ক্ষেত্রেও তিনি অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন ; কিন্তু অনেক স্থলেই, জিলা-কৃষি-কর্ম্মচারী এবং কৃষি-প্রদর্শক

নিযুক্ত হয় নাই। আমরা আশা করি, যিনি মিঃ ব্লাকউডের স্থলবর্ত্তী হইবেন, তিনি তাঁহার আরব্ধকার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া দেশবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন।

মিঃ ব্লাকউডের সময়ে রঙ্গপুরে একটী আদর্শ 'ডায়েরী ফার্ম্ম' (Dairy Farm) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বাঙ্গালায় ইহাই একমাত্র সরকারী ডায়েরী ফার্ম্ম। তদ্ভিন্ন, তিনি বাঙ্গালার গবাদি পশু-গণনায় (Cattle Census) এবং পাটের চাষী-জমির পরিমাণাদির শেষগণনায় (Final Jute Forecast) বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন।

মিঃ ব্লাকউডের সময় বঙ্গের প্রত্যেকবিভাগেই এক একটী বীজাগার (Seed store) সংস্থাপিত এবং কৃষি-বিভাগের বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী পুনঃ বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হইতেছে। এইসব নানা কারণেই, তিনি এদেশে স্মরণীয় হইয়া রহিবেন।

আভোকাডো—Avocado Fruit.

[শ্রীযুক্ত স্বর্ণকুমার মিত্র, এম্, এস্ মহাশয়ের লিখিত।]

আভোকাডো সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ—আভোকাডো একপ্রকার বৃহজ্জাতীয় ফলবান বৃক্ষ। এই বৃক্ষের আকার অনেকাংশে আম্রবৃক্ষের অনুরূপ। ইহার পাতা, ফুল ও ফল দূর হইতে দেখিলে, আমগাছের পাতা, ফুল ও ফল বলিয়াই ভ্রান্তি জন্মে। আভোকাডো-গাছ ৬০|৭০ ফুট উচ্চ ও তদনুযায়ী বহু শাখা-প্রশাখাবিশিষ্ট হইয়া থাকে। ইহার পত্রে—বিশেষতঃ ফলে, একপ্রকার বিশেষ গন্ধ অনুভূত হয়। তেজপাতা, দারুচিনী, কর্পূর প্রভৃতি বৃক্ষের পত্রেও বিভিন্নপ্রকার বিশেষ গন্ধ বর্ত্তমান রহে। পত্রের গন্ধের বিশেষত্ব ধরিয়াই, উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদগণ আভোকাডো-বৃক্ষকে তেজপাতা, দারুচিনী, কর্পূর ও লরেল প্রভৃতি বৃক্ষের পরিবারভুক্ত (Laurel family) করিয়াছেন। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম 'Persea gratissina'।

আভোকাডো মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্বর্ত্তী গ্রীষ্মপ্রধান-দেশসমূহের একপ্রকার অত্যুৎকৃষ্ট উপাদেয় ফল। ইহা মধ্য আমেরিকা (Central America), ব্রাজিল (Brazil), হাওয়াই (Hawii), মেক্সিকো, (Maxico) প্রভৃতি স্থানে প্রচুর পরিমাণে জন্মে। অধুনা, কালিফোর্ণিয়া (California). এবং ফ্লোরিডার (Florida) কৃষকেরাও, বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বনে, আভোকাডোর চাষ আরম্ভ করিয়াছে। আমেরিকার সর্ব্বত্রই আভোকাডো-ফলের যথেষ্ট আদর বলিয়া, তথায় ইহার চাষ ক্রমশঃই বিস্তৃতি লাভ করিতেছে।

আভোকাডো-ফলের আকার গোল; কিন্তু তদুপরিভাগ নাশপাতি-ফলের ন্যায় ঈষৎ লম্বা হইয়া থাকে। ইহা অনেকাংশেই গোল আমের অনুরূপ এবং তদনুযায়ীই বড় হইয়া থাকে। এই ফলের মাংস বা ফল-শস্য মাখনের ন্যায় অতি কোমল, শাঁসহীন, সুস্বাদু, সুগন্ধযুক্ত ও পুষ্টিকর। কিন্তু ইহাতে চিনির অংশ নাই। পক্ষান্তরে, আভোকাডো-ফলে যথেষ্ট তৈল আছে। সেই জন্যই ইহা খাইতে মাখনের মত লাগে; এবং মুখে রাখিলে মাখনের ন্যায় গলিয়া যায়। মেক্সিকো, গোয়াটেমালা এবং মধ্য আমেরিকার অধিবাসিগণ এই ফল হইতে তৈল বাহির করিয়া, তাহা খাদ্যরূপে ও নানাবিধ প্রয়োজনীয় কার্য্যে ব্যবহার করিয়া থাকে। কোনও কোনও রকম (variety) আভোকাডো-ফলের ত্বক পুরু এবং কোন কোন রকমের ফলের ত্বক পাতলা হইয়া থাকে। সাধারণতঃ গ্রীষ্মপ্রধান স্থানের ফলের বাকলই স্থূল হয়। এই ফলের বর্ণ সবুজ; এবং পাকিলেও উহার বর্ণের বিশেষ কোনরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে না। কিন্তু কোনও কোনও রকম ফল পাকিলে বেগুনী-বর্ণ ধারণ করে।

আভোকাডো-বৃক্ষ গ্রীষ্মপ্রধান-দেশসমূহে জন্মে; সুতরাং ভারতের নানাস্থানেই এই বৃক্ষের চাষ হইতে পারে। আভোকাডো-বৃক্ষের অথবা ফলের নাম এ দেশবাসী জনসাধারণের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত বলিয়াই, এ দেশের কেহ কখনও ইহার চাষ-পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চেষ্টা করেন নাই। যাহাতে ভারতবর্ষেও আভোকাডো-বৃক্ষের চাষ-প্রথা প্রচলিত হইতে পারে এবং এই অভিনব উপাদেয়

ফলের চাষ করিয়া, যাহাতে ভারতবাসীরা তাঁহাদের দেশোৎপন্ন ফলের তালিকায় একটী নূতন নাম যোগ করিতে পারেন, তদুদ্দেশ্যেই ইহার চাষ-প্রণালী সম্বন্ধে নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে কএকটী কথা বিবৃত হইল।

আভোকাডো-চাষোপযোগী আবহাওয়া—আভোকাডো গ্রীষ্মপ্রধান-দেশজাত ফল সত্য, কিন্তু তথাপি, ইহা মেক্সিকো-দেশের পার্ব্বত্য-প্রদেশসমূহেও প্রচুর পরিমাণে জন্মে। এই সব উচ্চ পর্ব্বত শীতকালে তুষারাবৃত রহে। সামান্য তুষারপাতে আভোকাডো-গাছের বিশেষ কোনরূপ ক্ষতি হয় না। এই জন্য হিমালয়ের পার্ব্বত্য-প্রদেশসমূহে—এমন কি, নেপাল, ভূটান, প্রভৃতি স্থানেও, অনায়াসে ইহার চাষ করা যাইতে পারে। তদ্ভিন্ন, বঙ্গদেশের যে সকল স্থান বর্ষাকালে জলমগ্ন হয় না, তদ্রূপ উচ্চ ভূমিতেও ইহা উত্তমরূপে জন্মিতে পারে। কিন্তু এ স্থানে, চৈত্র বৈশাখ মাসের প্রখর রৌদ্রে, চারা-গাছের বিশেষ অনিষ্ট ঘটিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা রহে। এই জন্যই বাঙ্গালার মৃত্তিকায় আভোকাডো-বৃক্ষের চাষ করিতে হইলে, চারাগাছগুলিকে বিশেষ যত্নের সহিত রক্ষা করিতে হইবে। প্রখর রৌদ্রের সময় চারাগাছগুলি কোনরূপ ঢাকনী দিয়া ঢাকিয়া রাখিতে পারিলে, গাছগুলি রৌদ্রদগ্ধ হইতে পারে না। কএক বৎসর অতীত হইল, সরকারী কৃষি-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ, আমেরিকা হইতে আভোকাডোর বীজ আনয়ন করিয়া, এলাহাবাদে কএকটী গাছ উৎপন্ন করিয়াছেন। কিন্তু যথোচিত যত্নের অভাবে—বিশেষতঃ, ১১৫°—১২০° ডিগ্রি (ফার্ণহিটের তাপমান-যন্ত্রের) উত্তাপ সহ্য করিতে না পারায়, সেই সকল চারা-গাছ সতেজে বর্দ্ধিত হইতেছে না। জলবায়ুসহনশীল (acclamatised) না হওয়াতেই যে, উক্ত চারাগাছগুলির যথোচিত বৃদ্ধি স্থগিত রহিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমার মনে হয়, গোয়াটেমালা (Guatamala) অথবা মধ্য আমেরিকার স্থলত্বকযুক্ত আভোকাডোর বীজোৎপন্ন গাছই আমাদের দেশের জলবায়ুর পক্ষে বিশেষ অনুকূল হইবে। কারণ, ঐরূপ বীজোৎপন্ন গাছ আমেরিকার অত্যধিক উত্তাপবিশিষ্ট স্থানেও স্বতঃই জন্মিয়া থাকে।

চারা-প্রস্তুত-প্রণালী—বীজের চারা ও কলম—এই দ্বিবিধ উপায়েই আভোকাডোর বংশবৃদ্ধি করা যায়। এই ফলের মধ্যে আমের আঁঠির ন্যায় একটী বড় বীচি রহে। ঐ বীচি হইতেই অতি সহজে গাছ জন্মে। কিন্তু আঁঠির গাছে অনেক সময়েই মাতৃবৃক্ষের অনুরূপ ফল জন্মে না বলিয়া, কলমের চারাই উৎকৃষ্ট। যাঁহারা এ দেশে আভোকাডোর চাষ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহারা প্রথমতঃ কলমের চারাই রোপণ করিবেন। কলমের গাছগুলি এ দেশের জলবায়ুসহনশীল হইলে পর, উহাদের বীজের চারাও রোপণ করা যাইতে পারে। কারণ, তদবস্থায় বীজোৎপন্ন চারাগাছের ফল অনেকাংশেই নিকৃষ্ট হইয়া পড়িবার বড় সম্ভাবনা রহিবে না।

আমেরিকায় সাধারণতঃ চোক-কলম (Budding) করিবার প্রথাই প্রচলিত রহিয়াছে। আভোকাডো-গাছের চারাই কলমের গুঁড়ির (stock) নিমিত্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উৎকৃষ্ট ফলপ্রদ-বৃক্ষের সুপুষ্ট শাখা হইতে মুকুল-শাখা (Bud) তুলিয়া লইয়াই, তাহা চারাগাছের কাণ্ডে বসান হয়।

আভোকাডো-ফলের বীচি বা আঁঠির চারা উৎপন্ন করিতে হইলে, বীচিগুলি ছোট ছোট টবের মৃত্তিকায় রোপণ করাই সঙ্গত। বীজের সূক্ষ্মাগ্রভাগ (pointed-end apex) ঊর্দ্ধে রাখিয়াই রোপণ করিতে হয়। টবের মৃত্তিকা বেলে-দো-আঁশ হইলেই ভাল। রোপিত বীজের একচতুর্থাংশ টবের মৃত্তিকার উপর থাকা চাই। এইরূপ প্রণালীতে বীজ রোপিত হইলে, গ্রীষ্ম-প্রধান ভারতবর্ষে তাহা অঙ্কুরিত হইতে বোধ হয় মাসাধিক সময়ের আবশ্যক হইবে না। যাহাতে টবের মৃত্তিকা শুষ্ক হইয়া না যায়, তন্নিমিত্ত আবশ্যকমত সময় সময় জলসিঞ্চন করিয়া, উহা সরস রাখা আবশ্যক। যদি রোপিত বীজসহ টবগুলি আওতায় না থাকে, তবে ঐগুলি কোনরূপ ঢাকনী দ্বারা দিনের বেলায় ঢাকিয়া রাখিতে হইবে। নতুবা, রৌদ্রে শুষ্ক হইয়া, বীজের উৎপাদিকা-শক্তি আংশিক বা সর্ব্বাংশেই নষ্ট হইয়া যাইতে পারে।

টবের চারাগাছগুলি ছয় হইতে আট ইঞ্চি লম্বা হইয়া উঠিলে পর, উহাদিগকে টব খুলিয়া, শ্রেণীবদ্ধভাবে, চারা-

চৌকায় বসাইতে হয়। প্রত্যেক সারির ব্যবধান ১৫—২০ ইঞ্চির অধিক রাখা অনাবশ্যক। চারা-চৌকার (Nursery) চারাগাছগুলি একবৎসরের মধ্যেই কলম বাঁধিবার উপযোগী হইয়া উঠে। বলা বাহুল্য, চারা-চৌকার যে সকল চারাগাছ বসান হয়, সেই সকল যাহাতে প্রচণ্ড রৌদ্রে দগ্ধ হইয়া যাইতে না পারে, তজ্জন্য চারা-চৌকার উপর বাঁশের শলার বা বাখারীর 'ছাউনী' (Lath house) করা আবশ্যক। পাণের বরোজের ন্যায় ছাউনী হইলেই ভাল হয়। টবের মৃত্তিকার ন্যায়, চারা-চৌকার মৃত্তিকাও সরস রাখিতে হইবে। এই জন্য বৃষ্টি না হইলে, আবশ্যকমত সময় সময়, চারা-চৌকাতেও জলসেচন করা আবশ্যক।

মুকুল-কলম বাঁধিবার প্রণালী—আতোকাতো-গাছের চোক-কলম বা মুকুলকলম করাই সুবিধাজনক। এইরূপ কলম প্রস্তুত করা, কষ্টসাধ্য না হইলেও, যত্নসাপেক্ষ। বিশেষতঃ, চোক-কলম করিতে যৎকিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতাও থাকা চাই। চোক-কলম করিবার প্রথা বঙ্গদেশের কুত্রাপিও প্রচলিত নাই। শুধু বঙ্গদেশ কেন, সমগ্র ভারতের কোনও স্থানেই চোক-কলমে বৃক্ষের বংশবৃদ্ধি করা হয় না। চোক-কলম বাঁধিবার প্রণালী বা উপকারিতা এ দেশবাসীর সম্পূর্ণ অজ্ঞাত বলিলেও, বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। এই জন্যই আমেরিকাতে যে প্রণালীতে আতোকাতো-বৃক্ষের চোক-কলম বাঁধা হয়, নিম্নে তাহারই সংক্ষিপ্তবিবরণ প্রদত্ত হইল।

প্রথমতঃ, মৃত্তিকা হইতে প্রায় ছয় ইঞ্চি উপরে, চারা-গাছের বাকলে, ধারাল কলম-বাঁধা ছুরি দ্বারা একটী রেখা কাটিতে হইবে। এমনভাবে রেখা কাটিতে হইবে, যেন কাষ্ঠের উপর দাগ না পড়ে। তৎপর, উক্ত রেখার সমকোণ করিয়া (at right angles) বাকলের উপর আরও একটী রেখা কাটিতে হইবে। ইহাতে চিহ্নিত স্থানটী ইংরেজী "T" অক্ষরের মত দেখা যাইবে। ছুরির চেপ্টা বাট দ্বারা বিশেষ সাবধানতার সহিত গাছের কাষ্ঠ হইতে বাকল ঈষৎ উঠাইতে এবং তন্মধ্যে তৎপশ্চাৎ একটী চোক বা মুকুল-শাখা ধীরতার সহিত বসাইতে হইবে। বলা বাহুল্য, নির্ব্বাচিত চারাগাছের গুঁড়িতে দাগ কাটিবার পূর্ব্বেই, শাখা (আতোকাতো-বৃক্ষের) হইতে এক বা দেড় ইঞ্চি পরিমিত বাকলসহ মুকুল-শাখা বা চোক (Bud wood) উঠাইয়া রাখা আবশ্যক। নিম্নলিখিত কএকটী বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াই, সাবধানতার সহিত চোক তুলিতে হয়।

(১) চোকগুলি ঈষৎ হেলাইয়া (যেভাবে কলম কাটা হয়) কাটিতে হইবে। নতুবা, উহা মূলগাছের গায়ে ভালরূপে বসিবে না।

(২) চোকের গায়ের ছালে যেন কোনরূপ আঘাত না লাগে।

(৩) চোকের নিম্নভাগে যেন একটু কাষ্ঠ রহে।

(৪) চোকটী এমনভাবে তুলিতে হইবে, যেন উহার চারিপার্শ্বেই সমপরিমাণ স্থান রহে; অর্থাৎ কর্ত্তিত অংশের মধ্যস্থলে চোকটী রাখিতে হইবে।

চোকটী উঠাইয়া আনিয়া, উহা কোনও ঠাণ্ডা জায়গায় ভিজা কাপড়ে ঢাকিয়া, ঈষৎ আর্দ্র রাখিতে হইবে; এবং যত সত্বর সম্ভব, চোকটী আতোকাতোর চারাগাছে বসাইতে হইবে। কারণ, কর্ত্তিত চোক শুষ্ক হইয়া গেলে পর, উহা বসাইলেও কোন ফল হইবে না। মোটকথা কলম বাঁধিবার সকল বন্দোবস্ত ঠিক না করিয়া, চোক উঠান অনুচিত।

চোক বসাইবার পরমুহূর্ত্তেই পাটের আঁশ বা তজ্জপ অন্য কিছু দিয়া, মুকুলের উভয়পার্শ্ব জড়াইয়া বাঁধিতে হইবে। তদুপরি মোম-কাপড়ের বাঁধ দ্বারা কর্ত্তিত সকল অংশই ঢাকিয়া দিতে হয়। বাঁধিবার সময় যাহাতে মুকুলের বা চোকের উপর বাঁধ না পড়ে এবং উহার কোনরূপ অনিষ্ট না হয়, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। যাহাতে রৌদ্রে মুকুল-শাখা শুকাইয়া যাইতে না পারে, তদুদ্দেশ্যে বাঁধের উপর একটুকরা কাপড় আল্‌গাভাবে ঝুলাইয়া দিলে বেশ ভাল হয়।

কলম বাঁধিবার পর, ২।৩ সপ্তাহমধ্যেই, উহা জোড়া লাগিয়া যায়; এবং মুকুলের বর্ণ সবুজ হইয়া উঠে। মুকুলের বর্ণ দেখিয়াই জোড়া লাগিয়াছে কিনা, তাহা সহজে

বুঝিতে পারা যায়। কলমে জোড়া লাগিলে অর্থাৎ কলম বাঁধিবার দুই সপ্তাহ পরই, কাপড়ের বাঁধ শিথিল করিয়া দিতে হইবে। প্রায় এক বা দেড় মাস পরে কাপড়ের বাঁধ খুলিয়া ফেলিতে হয়; এবং মুকুল-শাখা প্রস্ফুটিত হইয়া পত্রাকারে নির্গত হইলে পর, চারাগাছের কাণ্ডটী, উহার প্রায় চারি ইঞ্চি উপরেই, কর্ত্তন করা আবশ্যক। ইহাতে কলম খুব শীঘ্র বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। শাখা-কলমটী প্রায় এক ফুট উচ্চ হইলে পরই, চারাগাছের কাণ্ডটী 'তেড়ছা' (slenting) ভাবে কর্ত্তন করিতে হয়। যাহাতে বাতাসে কলম ভাঙ্গিয়া বা বক্র হইয়া না যায়, তদুদ্দেশ্যে উহা বাঁশের বাখারীর (lath stick) সহিত বাঁধিয়া দিতে হইবে। এইরূপে কলমের গাছ প্রায় এক বৎসর বর্দ্ধিত হইলে, উহা স্থায়ীভাবে বাগানের সারিতে রোপণ করা যাইতে পারে। যাঁহারা কলম-প্রস্তুতসম্বন্ধে, আরও বিস্তৃতভাবে, অবশ্যজ্ঞাতব্য তথ্যসকল জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা বিগত ১৩২২ সালের "কৃষি-সম্পদের" অগ্রহায়ণের সংখ্যায় "আমের মুকুল-কলম" নামক প্রবন্ধটী পাঠ করিবেন।

রোপণ-প্রণালী—চৈত্রের শেষে বা বৈশাখের প্রথমভাগে, প্রথম বৃষ্টিপাত হইয়া মৃত্তিকা সরস হইয়া উঠিলেই, জমি চাষ করিতে হইবে। ইহার কিছুদিন পরে পুনর্ব্বার বৃষ্টি হইয়া গেলে পর, দ্বিতীয়বার ভূমিকর্ষণ করিতে হয়। এইরূপে ক্রমাগত ৩।৪ বার উপর্য্যুপরি ভূমিকর্ষণ করিতে হইবে। বলা বাহুল্য, প্রত্যেকবার কর্ষণের পরই, মই দিয়া কর্ষিত মৃত্তিকা চূর্ণ করিতে ও আগাছাদি বাছিয়া ফেলিতে হয়। এইরূপে বারম্বার চাষ করিলে, কেবল যে জমি প্রস্তুত হইবে, তাহা নহে; ইহাতে বৃষ্টির জল সহজেই জমিতে প্রবেশ করিতে পারিবে এবং জমির উপর ঝুরা-মাটীর একটী পাতলা স্তর পড়িবে। এই স্তর পড়িলে মৃত্তিকার জলীয়াংশ সহজে বাষ্প হইয়া উড়িয়া যাইতে পারে না; ফলে, জমি বেশ সরস রহে।

জমি প্রস্তুত হইলে পর, তাহাতে শ্রেণীবদ্ধভাবে আতোকাতো-কলমের চারা রোপণ করিতে হইবে। এই গাছগুলি খুব বড় ও 'ঝাকড়া' হইয়া উঠে বলিয়া, অন্ততঃ কুড়ি হাত অন্তর অন্তর গাছ লাগান কর্ত্তব্য। সমান দূরে দূরে গাছ বসাইবার পদ্ধতিকে 'Square system' কহে। তদ্ভিন্ন, 'alternate system, অনুযায়ীও গাছ রোপণ করা যাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত, প্রথমোক্ত প্রণালী (Square system) অবলম্বন করাই সহজসাধ্য। গাছ বসাইবার পূর্ব্বেই, বাগানের যে যে স্থানে গাছ রোপণ করিতে হইবে, সেই সকল চিহ্নিত স্থানে (জমির উপর বৈর্য্যে ও প্রস্থে কুড়িহাত ব্যবধানে দড়ি ফেলিলে, যতগুলি চতুর্ভুজ হইবে, তাহার প্রত্যেক কোণেই এক একটী গাছ বসিবে।) এক একটী গর্ত্ত করিয়া রাখিতে হইবে। বর্ষার প্রারম্ভেই প্রত্যেক গর্ত্তে এক একটী গাছ রোপণ করিতে হয়।

হাপোর হইতে নির্দ্দিষ্টস্থানে চারাগাছ স্থানান্তরিত করিবার সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক। চারাগাছের গোড়ার চতুর্দ্দিকের মৃত্তিকা বর্ত্তুলাকারে খনন করিয়া, শিকড়সহ গাছটী উঠাইতে হইবে। যাহাতে শিকড় হইতে মাটী খসিয়া পড়িয়া না যায়, তজ্জন্য গাছটী উঠাইবার পরই, উহার গোড়ার চতুর্দ্দিকে চট মোড়াইয়া বাঁধিতে পারিলে ভাল হয়। এইরূপে বাঁধা চারাগাছ (balled nursery stock) বহু দূরে প্রেরণ করা যায়; এবং ইহা কএক দিন পরে বাগানে রোপণ করিলেও কোনরূপ ক্ষতি হয় না। গাছ রোপণ করিবার সময়, গর্ত্তের মৃত্তিকার সহিত পুরাতন গোময়সার মিশ্রিত করিয়া, তদ্দ্বারা গর্ত্তটী পূর্ণ করিতে পারিলে ভাল হয়।

রোপণের পরবর্ত্তী ব্যবস্থা—গাছ রোপণ করিবার পর যদি বৃষ্টিপাত না হয় অথবা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা না রহে, তাহা হইলে, রোপিত গাছের গোড়ার আবশ্যকানুযায়ী জলসেচন করা আবশ্যক। আতোকাতো-গাছের গোড়ার মৃত্তিকা যাহাতে সকলসময়ই সরস রহে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই আবশ্যকমত জলসেচনের বন্দোবস্ত করিতে হইবে। রোপিত চারাগাছ মৃত্তিকায় বসিয়া গেলে পর, সময় সময় গাছের গোড়ার চারিপার্শ্বের মৃত্তিকা কোদাল দ্বারা কোপাইয়া আল্‌গা করিয়া দিতে এবং আগাছাদি পরিষ্কার করিয়া দিতে হইবে। তদ্ভিন্ন, ইহার অন্য কোনরূপ পাইটের বড় আবশ্যক হয় না।

আভোকাডো গাছ স্বতাই বেশ 'ঝাড়াল' হইয়া উঠে বলিয়া, উহা ছাঁটিয়া দেওয়ার বড় আবশ্যক হয় না। তবে প্রখর রৌদ্রে রোপিত চারাগাছগুলি যাহাতে নিস্তেজ হইয়া পড়িতে না পারে, তদুদ্দেশ্যে গ্রীষ্মকালের দিনের বেলায়, প্রখর রৌদ্রের সময়, চারাগাছগুলির উপর কোনরূপ ঢাকনীর বন্দোবস্ত করা কর্ত্তব্য। আভোকাডো-চাষে অন্য কোনরূপ পাইটের বড় আবশ্যক হয় না।

সাধারণকথা—বাগানে রোপিত আভোকাডো-চারাগাছে ৪।৫ বৎসরের মধ্যেই ফল ধরিতে আরম্ভ করে। বেলে-দো-আঁশ (Sandy loam) অথবা ভারি আঠাল (Heavy loam) জমিতেই আভোকাডো-গাছ ভালরূপে জন্মে। জলবায়ু এবং মৃত্তিকার উপরই, ইহার ফলোৎপাদন-শক্তি অনেকটা নির্ভর করে। সাধারণতঃ, এই গাছ বহু ফলপ্রদ (prolific) হইয়া থাকে। আভোকাডো-গাছ সতেজে বর্দ্ধিত হয়; এবং কএক বৎসরমধ্যেই বেশ বড় হইয়া উঠে। গাছ যত বড় হয়, উহাতে ফলের সংখ্যাও তত অধিক হইয়া থাকে। প্রত্যেকটী পূর্ণবয়স্ক বৃক্ষে পাঁচ হাজার পর্য্যন্ত ফল ধরে। আমেরিকার কালিফোর্ণিয়া ও ফ্লোরিডা—এই উভয় স্থানেই যে বর্ত্তমানসময়ে আভোকাডো-বৃক্ষের চাষ হইতেছে, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ইহার ফল উক্ত উভয়স্থানে লবণ, ভিনিগার ও অন্যান্য মোসলা-সংযোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এইরূপ ফল-মিশ্রিত খাদ্যদ্রব্যকে (salad fruit) একরূপ চাটনী বলা যায়। এক একটী আভোকাডো ফল ২৫ সেণ্ট হইতে ৫০ সেণ্ট অর্থাৎ ৸০ আনা হইতে ১৷৹ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে। বিগত ১৯১৫ খৃঃ অব্দে, কালিফোর্ণিয়ার জনৈক কৃষক একটী আভোকাডো-বৃক্ষের ফল ১৪০০ ডলার মূল্যে (এক ডলার=৩৲ আনা) এবং সেই বৃক্ষেরই কলম ১৩০০ ডলার মূল্য বিক্রয় করিয়াছিল। একটী গাছের ফলের মূল্যে যে প্রায় ৮,৫০০৲ টাকা হইতে পারে, ইহা ভারতবাসীর পক্ষে কল্পনারও অতীত বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

আভোকাডো-ফলে অন্যান্য ফলের অপেক্ষা অম্লসারের অংশ বেশী; বিশেষতঃ, উহাতে কৃতকটা 'তৈলজ (medicinal) গুণও আছে। কালিফোর্ণিয়ার বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক এম, ই, জ্যাফা (Prof. M. E. Jaffa) এই ফলের রাসায়নিক বিশ্লেষণ (analysis) করিয়া, উহাতে যে সকল উপাদান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, নিম্নে তাহার মোটা-মোটি হিসাব (average composition) প্রদত্ত হইল :—

ফলের ও উহার বিভিন্ন অংশের ওজন 'গ্রাম' হিসাবেই ধরা হইয়াছে।

ফলের ওজন		১৯৭·৪
অখাদ্য অংশ—		
বীচি	...	৪০·০
বাকল	...	২২·৫
		৬২·৫

অর্থাৎ ফলের শতকরা ৩৪·৩ ভাগই অখাদ্য বলিয়া পরিত্যাক্ত হইয়া থাকে।

খাদ্য-অংশে রহিয়াছে—		
জল (শতকরা)		৬৯·১৬
অম্লসার	...	২·০৪
তৈল ...	...	২০·১
শ্বেতসার ইত্যাদি (carbohydrate)	...	৭·৩৯
ছাই ...	...	১·২৬

অর্থাৎ মোট ওজন ১৩৫·৮ বা শতকরা ৬৫·৭ ভাগ।

আমাদের দেশে যে সকল বড় নাশপাতী আছে, তাহাতে বোধ হয় আভোকাডো-গাছ কিনিতে পাওয়া যায়। না পাওয়া গেলে, আমেরিকার কোনও নার্শারী হইতে বীজ নিয়াও চারা উৎপন্ন করা যাইতে পারে। এই বৈদেশিক ফলের চাষে, এদেশে যে কেবল একটী ফলের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইবে, তাহা নহে। পরন্তু, ইহা হইতে প্রচুর অর্থাগমেরও বিলক্ষণ সম্ভাবনা রহিয়াছে। সুতরাং, আভোকাডোর চাষ উপেক্ষার বিষয় নহে।

শ্রীস্বর্ণকুমার মিত্র।
কালিফর্ণিয়া—বার্কলী-কৃষি-কলেজ।

কদলী সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ।

[ক্যালিফর্ণিয়া ইউনিভার্সিটীর বার্কলী-কৃষি-কলেজের শ্রীযুক্ত নিরুপমচন্দ্র গুহ মহাশয়ের লিখিত।]

আজকাল অনেক স্থানেই কলার চাষ-প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। কতকগুলি দ্বীপের অধিবাসীরা একমাত্র কলার চাষ করিয়াই জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছে। কএক বৎসর পূর্ব্বেও, ব্রিটিস্ ও ফ্রেঞ্চ গায়না, সাউথ ও সেণ্ট্রাল আমেরিকা, কেনেরীদ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি স্থানবাসীরা কলার চাষপ্রণালীবিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল। কিন্তু এক্ষণ ঐ সকল স্থান হইতে প্রতিবৎসর লক্ষ লক্ষ টাকার কলা ইউরোপ ও আমেরিকায় রপ্তানি হইতেছে। পক্ষান্তরে, ভারতবর্ষ কদলীর আদি জন্মস্থান হইলেও, এ স্থান হইতে একছড়া কলাও বিদেশে রপ্তানি করা হয় না। বিদেশে রপ্তানি হওয়া দূরে থাকুক, নিজেদের ব্যবহারের জন্যও যথেষ্ট পরিমাণ উৎপন্ন করা হইতেছে না। ভারতবর্ষে আবহমানকাল হইতেই কদলী জন্মিতেছে; এদেশের প্রায় সর্ব্বত্রই উত্তমরূপে কদলী জন্মে এবং কদলীর চাষও বিশেষ লাভজনক। কিন্তু তথাপি, কদলীচাষের প্রতি যে ভারতবাসীর বিশেষ দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতেছে না, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। রিপোর্ট বা সরকারী কৃষি-বিবরণী পাঠে অবগত হওয়া যায়, ভারতবর্ষেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রকারের বা বহু প্রকারের উৎকৃষ্ট জাতীয় কলা জন্মে এবং উহা অন্যান্য দেশীয় কলা অপেক্ষা অধিকতর সুমিষ্ট, সুবাদু ও সুগন্ধযুক্ত। এককথায় বলিতে গেলে, ভারতের নানাবিধ উৎকৃষ্ট জাতীয় ফলাই জগতে অদ্বিতীয়। এইজন্য ভারতের নানাপ্রকার কলা ইউরোপে রপ্তানি করিতে পারিলে যে অধিক মূল্যে বিক্রয় হইবে, তাহা নিঃসন্দেহেই বলা যায়। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ করিয়াও অতিরিক্ত হইলে, তাহা বিদেশে পাঠান যাইতে পারে। ভারতের যে সকল প্রদেশ কলাচাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী, সেই সকল স্থানে বহুল পরিমাণে কলার চাষ করিয়া, প্রথমতঃ দেশের জন্যই যথেষ্ট পরিমাণ কলা উৎপন্ন করিবার চেষ্টা করা আবশ্যক। কারণ, আমাদের দেশের ধনী ও নির্ধন সকলেই অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে ব্যবহার করিতে পারে, এমত পরিমাণে কলা জন্মে না।

সর্ব্বপ্রকার ফলের মধ্যে কলাই শ্রেষ্ঠ ফল বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। কলার ন্যায় উপকারী ও পুষ্টিকর ফল আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহাতে যথেষ্ট পরিমাণে শরীরপোষক পদার্থ বর্ত্তমান রহিয়াছে। অন্য কোনও ফলেই কলার ন্যায় অধিক পরিমাণে শরীরের পুষ্টিকর অথচ সহজপাচ্য পদার্থ পাওয়া যায় না। খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে শরীরপোষক পদার্থ বর্ত্তমান রহিলেই, তদ্দ্বারা যে শরীরের উপকার সাধিত হয়, তাহা নহে। কারণ, উহা দ্রবণীয় অবস্থায় না রহিলে, সহজে পরিপাক হয় না; সুতরাং, তদবস্থায় বহু হজম্ হইয়া, উপকারের পরিবর্ত্তে শরীরের অপকারই সাধন করিয়া থাকে। অনেক ফল ও অন্যান্য নানা প্রকার আহার্য্য দ্রব্যে যথেষ্ট পরিমাণে শরীর-পোষক পদার্থ বর্ত্তমান; কিন্তু উহা সহজে হজম হয় না বলিয়া, তদ্দ্বারা শরীরের উপকার হওয়া দূরে থাকুক, অনেকটা অপকারই সাধিত হয়। কলার মধ্যে যে বলকারক পদার্থ টুকু বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা সহজেই জীর্ণ হইয়া শরীরের পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে। বিশ্লেষণ দ্বারা দেখা গিয়াছে, গমের ময়দার কলার ময়দা অপেক্ষা অধিক পরিমাণ পুষ্টিকরপদার্থ বর্ত্তমান রহিলেও, উহা কলার ময়দার ন্যায় সহজপাচ্য অথবা শরীর-পোষক নহে। গমের ও কলার ময়দা বিশ্লেষণ করিলে নিম্নলিখিত পদার্থগুলি পাওয়া যায়। গমের ময়দায় রহিয়াছে :—

জল (moisture)	১৩·৮ ভাগ।
প্রোটীন (Protien)	৯·৯ ,,
তৈলাক্ত পদার্থ (Fat)	১·৪ ,,
চিনি ও শ্বেতসার (Carbohydrate)	৭৬·৪ ,,
খনিজপদার্থ (mineral matter)	·৫ ,,
কলার ময়দায় রহিয়াছে :—	
জল (moisture)	১৩·০ ভাগ
প্রোটীন (Protien)	৪·০ ,,
তৈলাক্ত পদার্থ (Fat)	০·৫ ,,
চিনি ও শ্বেতসার (Carbohydrate)	৮০·০ ,,
খনিজপদার্থ (mineral matter)	২·৫ ,,

এই উভয় পদার্থের বিশ্লেষণের ফলে দেখা যাইতেছে যে, গমের ময়দায় মোটের উপর অধিক পরিমাণ পুষ্টিকরপদার্থ বর্ত্তমান রহিয়াছে। গমের ময়দায় প্রোটিন ও তৈলাক্ত-পদার্থের ভাগ অনেক বেশী; আবার কলার ময়দায় খনিজ-পদার্থ, চিনি ও শ্বেতসারের (Starch) ভাগ অধিক। অবশ্য প্রোটিন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুষ্টিকর পদার্থ; কিন্তু তথাপি, (১) কলার ময়দায় গমের ময়দার অপেক্ষা শ্বেতসারের ভাগ অধিক, (২) কলার ময়দার শ্বেতসার সহজেই পরিপাক হয় এবং (৩) কলার ময়দায় খনিজপদার্থ 'Phosphate' অবস্থায় বর্ত্তমান—প্রধানতঃ, এই তিনটী কারণেই কলার ময়দা গমের ময়দা অপেক্ষা অধিকতর শরীরপোষক। তাছাড়াও কলার ময়দার প্রায় সমপরিমাণ পুষ্টিকরপদার্থ আছে।

কলা সুখাদ্য ও উপকারী বলিয়াই, ইহা সভ্য-সমাজেও বিশেষ আদৃত হইতেছে। শীতপ্রধান-দেশে কলা জন্মে না; তথাচ, সে সকল দেশে বারমাসই কলা পাওয়া যায়। এই সমস্ত কলা আমদানীর জন্য হাজার হাজার ষ্টিমার এবং ইহার চাষে লক্ষ লক্ষ একার জমি খাটিতেছে। পূর্ব্বে যে সকল জমি অনাবাদী পতিত ছিল—যাহা কখনও চাষ-বাসের উপযোগী হইবে বলিয়া কাহারও ধারণা ছিল না, এক্ষণ সেই সকল পতিত জমি কলার বাগানে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। একমাত্র কলার চাষ করিয়া কতকগুলি দ্বীপের অধিবাসীরা বিশেষ লাভবান হইতেছে—প্রতি বৎসরই তাহাদের লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ দাঁড়াইতেছে। রপ্তানির সুবিধার নিমিত্ত, এক জ্যামেইকা-দ্বীপ হইতেই প্রায় এক হাজার কলা বোঝাই ষ্টিমার প্রতিবৎসর ইউরোপ ও আমেরিকায় যাতায়াত করিয়া থাকে। একমাত্র কলা রপ্তানি করিবার জন্যই ঐ সকল ষ্টিমার প্রস্তুত করা হইয়াছে। যাহাতে সহজে কলা পাকিয়া না যায়, তদুদ্দেশ্যে প্রত্যেক ষ্টিমারেই কলা ঠাণ্ডা রাখিবার কল আছে। জ্যামেইকা-দ্বীপ হইতে অনেক কোম্পানীর ষ্টিমারেই কলা রপ্তানি হইয়া থাকে। তন্মধ্যে, একটী কোম্পানীরই কলা-রপ্তানি করিবার উপযোগী পাঁচশত আনি ষ্টিমার আছে।

ভারতের কলা বিদেশে পাঠাইবার কোনরূপ সুবিধা নাই—এই কথা মনে করিয়া নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া রহিলে চলিবে না। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বিস্তৃতভাবে কলার চাষ আরম্ভ করিতে পারিলে, পাঠাইবার সুবিধাও আপনিই আসিবে। উক্ত জ্যামেইকা-দ্বীপবাসীরা প্রথমতঃ কলা রপ্তানি করিবার সুবিধা বা সুবন্দোবস্ত করিয়া, তৎপর কলার চাষে প্রবৃত্ত হয় নাই। তাহারা বিস্তৃতভাবে কলার চাষে প্রবৃত্ত হইলে পরই, তাহাদের কৃষিজাত কলা রপ্তানির সুবিধা করিয়া দেওয়ার জন্য, অনেক কোম্পানী রপ্তানির উপযোগী ষ্টিমার প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষেও বিদেশে রপ্তানি করিবার উপযোগী প্রচুর পরিমাণে কলা উৎপন্ন করিতে পারিলে, তাহার রপ্তানির জন্য কখনও ভাবিতে হইবে না। কোন কোম্পানীই ভারতবাসীর সুবিধার জন্য কিম্বা তাহাদের প্রতি দয়ার্দ্র হইয়া একখানি ষ্টিমারও প্রস্তুত করিয়া দিবে না—দিতেও পারে না। পক্ষান্তরে, উহাদের লাভ দাঁড়াইবার সম্ভাবনা রহিলে, উহারা শত সহস্র ষ্টিমার (কলা রপ্তানি করিবার উপযোগী অর্থাৎ ঠাণ্ডা কোঠা-বিশিষ্ট) প্রস্তুত করিতে কখনও পশ্চাৎপদ হইবে না। যে সমস্ত কোম্পানী জ্যামেইকা-দ্বীপ ও অন্যান্য কতিপয় দ্বীপে ষ্টিমার চালাইয়া বহু অর্থলাভ করিতেছে, লাভের প্রত্যাশা রহিলে, সেই সকল কোম্পানীই ভারতবর্ষের জন্য জাহাজ পাঠাইবে। ভারতবাসীরা কেবল রপ্তানির সুবিধা ও অসুবিধার কথাই বৃথা ভাবে, কিন্তু রপ্তানি করিবে কি, তাহার কথা আদৌ চিন্তা করে না!

বিদেশে রপ্তানি করিবার উদ্দেশ্যে কলার চাষ করিতে হইলে, কলা পাকিবার ও উহা সংগ্রহ করা সম্বন্ধে বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। কারণ, এই দুইটী বিষয়ের উপরই লাভ-লোকসান সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকে। বিশেষ যত্নের সহিত এমনভাবে কলার ছড়া কাটিতে হইবে যে, একটী কলাতেও যেন সামান্য 'চোট' (আঘাত) না লাগে। কলাতে সামান্য চোট লাগিলেও, উহা বিদেশে রপ্তানি করিবার পক্ষে অকর্ম্মণ্য বলিয়াই বিবেচিত হয়। কারণ, আঘাত-প্রাপ্ত কলা কোন প্রকারেই ২।৩ সপ্তাহ ভাল রহে না। শুধু কলা কেন, সর্ব্বপ্রকার ফলসম্বন্ধেই এ কথা খাটে।

দূরদেশে ফল পাঠাইয়া লাভবান হইতে হইলে, উহা সংগ্রহ ও প্যাক করা এবং পাকাইবার প্রণালী সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা থাকা চাই। এইগুলিই ফলের ব্যবসায়ের গুহ্য রহস্য। যাহারা এ রহস্য পরিজ্ঞাত হইতে পারিয়াছেন, তাহারাই ফলের ব্যবসায়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন।

কলাগাছের রোপণসম্বন্ধেও লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। ইহা এমন সময়ে রোপণ করিতে হইবে যে, সমস্ত ফলই এক সময়েতে সংগ্রহ করিতে পারা যায়। নচেৎ, ইহা দূরদেশে পাঠাইবার পক্ষে বিশেষ অসুবিধা ঘটে। জ্যামাইকা-দ্বীপে মার্চ্চ মাসে কলাগাছ রোপণ করা হয়। পনর ফুট বা দশহাত ব্যবধানে আড়াই ফুট গর্ত্ত করিয়া, তাহাতে আট মাস বয়সের চারাগোপণ-প্রথাই জ্যামাইকার সর্ব্বত্র প্রচলিত। তথায়, কেহ কেহ চারা তুলিয়াই, উহা রোপণ করিয়া থাকে; আবার, কেহ কেহ উহা ৩।৪ দিন পর্য্যন্ত শুকাইয়া লইয়াও রোপণ করে। ভারতবর্ষেও এই উভয় প্রথাতেই কলাগাছ রোপিত হয়।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বিস্তৃতভাবে কলার চাষ-প্রথা প্রবর্ত্তিত হইলেও, প্রথমতঃ বিদেশে টাট্‌কা কলা পাঠাইবার চেষ্টা করা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। কারণ, তাহা করিতে হইলে, প্রথম হইতেই খুব বড় বড় ঠাণ্ডা গুদাম ঘর (Ranch) করা আবশ্যক। নচেৎ বিদেশে রপ্তানি করিবার সুবিধা হইবে না। এমনভাবে গুদাম করিতে হইবে যে, তন্মধ্যস্থ ফল দ্বারা অন্ততঃ ৩।৪ খানা জাহাজ সকলসময়েই বোঝাই হইয়া যাইতে পারে। এইরূপ করিতে হইলে, কার্য্যারম্ভ করিবার পূর্ব্বেই বহু মূলধনের আবশ্যক হইয়া থাকে।

টাট্‌কা কলা বিদেশে না পাঠাইয়া, ইহা শুষ্কাবস্থায়ও পাঠান যাইতে পারে। শুষ্ক কলা রপ্তানি করিতে পারিলে খরচও অনেক কম হয়; অথচ, উহা যখন-তখন পাঠানও যাইতে পারে। টাট্‌কা কলা পাঠাইবার বহু নিয়ম আছে। এই সকল নিয়ম জানা না থাকিলে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। এস্থলে একটী মাত্র নিয়মের কথাই উল্লেখ করিতেছি। ছোট ছোট কলা অথবা যে সকল ছড়ায় কম ফানা থাকে, তাহা বিদেশের বাজারে বিক্রয় হয় না। এই সমস্ত কলা প্রথমতঃ জ্যামাইকাতে নষ্ট হইয়া যাইত; কিন্তু এক্ষণ উহা আর নষ্ট হয় না। কলা বাছাই করিয়া, উৎকৃষ্ট কলাগুলি টাট্‌কা অবস্থায়ই বিদেশে রপ্তানি করা এবং নিকৃষ্ট কলা-গুলি শুষ্ক করা হয়। এক্ষণ বিলাতের বাজারে শুষ্ককলা বিশেষ আদৃত হইতেছে। এক রকম শুষ্ককলা ইউরোপ-বাসিদিগের টেবলের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা 'Banana Fig' নামে পরিচিত। আর একপ্রকার শুষ্ককলা প্রাতরাশের (Break-fast) পক্ষে বিশেষ আদৃত হইতেছে। ইহা 'Banana chief' নামে অভিহিত হয়। এই উভয়প্রকার শুষ্ককলাই জ্যামেইকা-দ্বীপ হইতে ইউরোপের সর্ব্বত্র প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হইয়া থাকে। প্রথমাবস্থায় ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে টাট্‌কা কলা রপ্তানি না করিয়া, উল্লিখিতরূপ শুষ্ককলা পাঠানই কর্ত্তব্য। ইহাতে অত্যধিক মূলধনেরও আবশ্যক হয় না, অথচ বেশ লাভবান হওয়া যায়।

কলা শুষ্ক করিবার নানাবিধ উপায় আছে। সাধারণতঃ, আমসত্বের ন্যায়, রৌদ্রের তাপেই কলা শুষ্ক করা হয়। এই প্রকারে ডাঙ্কা, পিচ্, এপ্রিকট্ প্রভৃতি নানাবিধ ফলও শুষ্ক করিবার প্রথা আছে। পাকা কলার খোসা ও আঁশ প্রভৃতি ফেলিয়া দিয়া, উহা প্রথমতঃ লম্বালম্বিভাবে দুইভাগে বিভক্ত করা হয়; এবং, তৎপর, কদলীখণ্ডগুলি রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লওয়া হয়। আমাদের দেশে কাঁচা বা পাকা আমের 'কালী' রূপে শুষ্ক করিয়া আমলী প্রস্তুত করা হয়, কলা শুষ্ক করিবার প্রণালীও তদনুরূপ। ২।৩ দিনের প্রখর রৌদ্রেই কদলীখণ্ডগুলি ভালরূপে শুকাইয়া যায়। এই প্রকারে রৌদ্রে শুকাইবার সময় বৃষ্টি হইলে, অনেক লোকসান হইবার সম্ভাবনা থাকে। কারণ, দুই চারি ছড়া কলা ত আর একসঙ্গে শুকান হয় না—লক্ষ লক্ষ ছড়া কলা একবারে শুষ্ক করা হয়। এতগুলি কলা একত্রে তুলিয়া কোনও প্রকারের ঘরের নীচে রাখিতে হইলেও অনেক সময়ের দরকার হয়। যাহাতে বৃষ্টির জল লাগিয়া কলা পচিয়া না যায়, তদুপায়-বিধান করিতেই হইবে। নচেৎ, একবারে এতগুলি কলা পচিয়া গেলে যে, কিরূপ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা, তাহা সহজেই

অনুসন্ধের। এই জন্যই যাহারা রৌদ্রে কলা শুকাইতে চাহেন, তাহাদের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বেই, বৃষ্টির সময় কলা রাখিবার নিমিত্ত একখানি ঘর প্রস্তুত করিয়া লওয়া আবশ্যক। কলাচারা রোপণ করিবার সময়ই, উহা রৌদ্রে শুকাইবার কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। সুতরাং এমন সময়ে চারাগাছ বসাইতে হইবে, যে সময়ের রোপিত গাছে বর্ষাকালে ফল পরিপক্ক হইয়া না উঠে। রৌদ্র ব্যতীত নানা প্রকার কলের সাহায্যেও কলা শুষ্ক করা হয়। কিন্তু কলে শুষ্ক করা ব্যয়সাধ্য ব্যাপার।

কোনও কুঠরীর মধ্যে গরম বাতাস বা তাপ চালাইবার বন্দোবস্ত করিতে পারিলে, তন্মধ্যস্থ খণ্ডীকৃত কলার জলীয়াংশ তাপসংস্পর্শে বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়। ইহাতে সহজেই কলা শুষ্ক হইয়া যায়। বদ্ধ কুঠরী হইতে জলীয়-বাষ্প বহির্গত হইবার জন্য নর্দ্দমা রাখিতে হয়। এক নর্দ্দমা দিয়া কুঠরীতে গরম ও শুষ্ক হাওয়া প্রবেশ করিবে, এবং অন্য নর্দ্দমা দিয়া জলীয়বাষ্প বাহির হইয়া যাইবে। কুঠরীতে যে হাওয়া পরিচালিত করা হইবে, উহা যত বেশী তাপযুক্ত হইবে, ততই শীঘ্র শীঘ্র তন্মধ্যস্থ কলা শুষ্ক হইয়া পড়িবে। কিন্তু অতিরিক্ত গরমে কলা পাক হইয়া যাইতে পারে। পাক বা অসিদ্ধ হইলে কলার সুগন্ধ ও পুষ্টিকর পদার্থসমূহ নষ্ট হইয়া যাইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা রহে। এই সব নানা কারণে, তাপপ্রয়োগে কলা শুষ্ককরা সহজসাধ্য নহে। কলা শুষ্ক করিবার সর্ব্ববিধ উপায়ের মধ্যে রৌদ্রে শুষ্ককরাই সহজসাধ্য ও অল্পব্যয়সাপেক্ষ। এই উপায়ে শুষ্ক কলাই, গুণে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট হয়। মার্কিণ সরকার ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের কলা শুষ্ক করিবার জন্য একপ্রকার কল (Vacuam drier)প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। সরকারী কার্য্যবিবরণী বা রিপোর্ট পাঠে মনে হয়, ঐ সকল কল ব্যবহারে বিশেষ সুফলই পাওয়া যাইতেছে।

শুষ্ককলার ময়দা প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে, বিলাতে একটী কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই কোম্পানীর নাম "Banana Bread Flour Food Ltd" এবং কোম্পানীর ঠিকানা "16, Burnsweek street, Leverpool—London!" যাহারা শুষ্ককলার ব্যবসায় করিতে ইচ্ছা করেন, তাহারা উপরোক্ত কোম্পানীর নিকটই সমস্ত মাল উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় করিতে পারিবেন। ঐ কোম্পানীর লোকেরা পৃথিবীর নানাস্থান হইতেই শুষ্ক কলা খরিদ করিয়া থাকেন, এবং শুষ্ককলা হইতে, 'Bananine' নামক একপ্রকার রোগীর পথ্য প্রস্তুত করিয়াছেন। এই পদার্থটীর মত রোগীর সুপথ্য আর প্রস্তুত হয় নাই। উহা রোগী ও শিশুকে নির্ভয়ে খাওয়ান যাইতে পারে। বার্লি ও সাগুদানা প্রভৃতি খাদ্যে অধিক পরিমাণ শক্ত শ্বেতসার (Starch) রহিয়াছে বলিয়া, উহা রোগীর ও শিশুর পক্ষে অপকারী। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, কলার জন্মভূমি ভারতবর্ষে উক্ত দুইটী পদার্থ ব্যতীত অন্য কোনরূপ সুলভ মূল্যের শিশুখাদ্যও নাই! যাহা কিছুতেই শিশুদিগকে খাওয়ান উচিত নহে, তাহাই ভারতবাসীরা উৎকৃষ্ট শিশুখাদ্য বলিয়া মনে করেন।

শ্রীনিরুপমচন্দ্র গুহ।

কৃষি আর কৃষিজাত দ্রব্য।

(৫)

হলণ্ড ও বেলজিয়াম।

[বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে, হলণ্ড ও বেলজিয়ামের কৃষির অবস্থা যেরূপ ছিল, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহারই বিষয় লিখিত হইয়াছে।]

হলণ্ড—ইউরোপের পশ্চিমভাগে, উত্তর সাগরের তীরে, এই ক্ষুদ্র দেশ অবস্থিত। ইহার অপর নাম নেদার-ল্যাণ্ড্স্। হলণ্ডের আয়তন মাত্র ১৩,০০০ বর্গ মাইল; এবং লোকসংখ্যা প্রায় ৬০ লক্ষ অর্থাৎ বঙ্গের ঢাকা জিলার লোকসংখ্যার (ঢাকা জিলার জনসংখ্যা প্রায় ত্রিশ লক্ষ) দ্বিগুণ। অধিবাসীর প্রায় নয়ভাগই টিউটনিক জাতি এবং একভাগ ইংরেজ, জার্ম্মেণ এবং বেলজিয়ান প্রভৃতি বৈদেশিক জাতি।

ইউরোপের মধ্যে হলণ্ড দেশই সর্ব্বাপেক্ষা নিম্ন এবং সমতল ভূমি। ইহার সাতভাগের তিনভাগ পরিমিত স্থানই বাঁধ বাঁধিয়া সমুদ্রজলের প্লাবন হইতে রক্ষা করিতে হয়। স্থানীয় অধিবাসীগণের অদম্য উৎসাহ ও পরিশ্রমের ফলে, হলণ্ডের অধিকাংশ প্রদেশই অতি উর্ব্বর এবং মূল্যবান ভূমিতে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব্বদিকের ঠাণ্ডা বাতাসে শীতের প্রকোপ অত্যধিক হইলেও, এই স্থানের আবহাওয়া মোটের উপর প্রীতিপ্রদ।

হলণ্ডের কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে বীট (sugar beets), রাই (rye) এবং নানাবিধ সব্জী বিশেষ খ্যাত। গম, বার্লি, মটরজাতীয় কলাই, শণ, হেম্প এবং তামাক বিস্তর জন্মে। ক্ষুদ্র দেশের তুলনায় ফুল এবং ফল অত্যন্ত অধিক। এখানে অরণ্য অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু পশু-চারণোপযোগী ক্ষেত্র অনেক আছে। স্থানে স্থানে উর্ব্বর প্রান্তর গোচারণের জন্য বিশেষভাবে রক্ষিত রহিয়াছে। এই দেশের গরু, ঘোড়া ও ভেড়া সভ্যজগতে সমাদৃত এবং মাখন সুপরিচিত। অরণ্যের অভাব বলিয়া গৃহপ্রস্তুতোপযোগী কড়ি, বরগা প্রভৃতির বিশেষ অভাব। সেই জন্য ঐ সকল নরওয়ে ও সুইডেন দেশ হইতে আমদানী করা হয়।

দেশটী কৃষিজাত দ্রব্যে যেরূপ সম্পদশালী, খনিজ-পদার্থে আবার তদনুরূপই নিঃস্ব। হলণ্ডে কোনরূপ খনিজপদার্থ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু তথায় বাসন প্রস্তুতোপযোগী মৃত্তিকা অত্যুৎকৃষ্ট। এ স্থানের চীনামাটীর বাসন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এখানে বন না থাকায়, বস্ত্রজন্তুর ভাগও অতি অল্প। সামুদ্রিক উৎপন্নের মধ্যে মৎস্যের ব্যবসায় অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। অয়ষ্টার (oyester), হেরিং (herring) এবং কড (cod—ইহার যকৃতের তৈলকে 'কড্‌লিবর অয়েল' কহে) প্রভৃতি মৎস্য বিস্তর পাওয়া যায়।

শিল্প-বাণিজ্যে ডেইরি ফারমিং (গোপালন ও গব্য-জিনিষের ব্যবসায়) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। প্রাচীনকালে অধিকাংশ ভারতবাসীরই যেমন চাষ-বাসের জমি ও গোধন জীবিকা-র্জ্জনের একমাত্র সহায় ছিল, বর্ত্তমানকালে হলণ্ডবাসীর অবস্থাও প্রায় তদ্রূপ। তবে বৈজ্ঞানিক-প্রথা প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে, এই দেশবাসীরা অতি সামান্য জায়গায়ও যথেষ্ট পরিমাণ আয়ের পন্থা নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। হলণ্ড হইতে প্রতিবৎসর প্রচুর পরিমাণে মাংস, পনির (cheese) এবং মাখন বিদেশে প্রেরিত হইতেছে। অন্যান্য শিল্পের মধ্যে এঞ্জেনের সূতি, আলমেলোর রেসমী ও তিলবার্গের লিনেন্ বস্ত্র এবং দেল্‌ফতের মাটীর বাসন উল্লেখযোগ্য। পূর্ব্বে আমষ্টার্ডম্ হীরকের কাজের জন্য বিখ্যাত ছিল; কিন্তু অধুনা, পারিস ও লণ্ডনের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে অসমর্থ হওয়ায়, উহা লোপ পাইতে বসিয়াছে।

ইংলণ্ড এবং অপরাপর ঐশ্বর্য্যশালী দেশের সন্নিকটে, উত্তর সাগরের ধারে এবং রাইন নদীর মোহনায় অবস্থিত বলিয়া, সমগ্র পৃথিবীর সহিত ব্যবসায়-বাণিজ্য চালাইবার পক্ষে হলণ্ড একটী বিশেষ উপযোগী ক্ষেত্র। এই স্থানের অধিকাংশ কৃষিজাত দ্রব্যই ইংলণ্ড, জার্ম্মেনী এবং বেল-জিয়মে প্রেরিত হইয়া থাকে। প্রতিবৎসর অন্যূন পঞ্চাশ কোটী ডলারের (এক ডলার = প্রায় ৩৲ টাকা) কৃষিজাত দ্রব্যাদি বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, অন্যূন ৬০ কোটী টাকার কয়লা, কাষ্ঠ, লৌহ-সরঞ্জাম, চাউল, গম, কফি, ঔষধ এবং নানাবিধ শিল্পজাত দ্রব্য বিদেশ হইতে আনীত হয়। জার্ম্মেনী, গ্রেটব্রিটেন, আমেরিকার যুক্তরাজ্য, বেলজিয়ম এবং পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতেই অধিকাংশ দ্রব্য আমদানী হইয়া থাকে। আমষ্টার্ডম্ এবং রটার্ডম নামক বন্দর দুইটীই হলণ্ডের প্রধান বাণিজ্যস্থান। এই দুই স্থানের লোকসংখ্যা যথাক্রমে প্রায় পাঁচ লক্ষ ও চারি লক্ষ।

হলণ্ডে বহুল পরিমাণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী-নালা রহিয়াছে বলিয়া, তথায় কৃষির, ব্যবসায়-বাণিজ্যের এবং সর্ব্বসাধা-রণের যাতায়াতের পক্ষে বিশেষ সুবিধা ঘটিয়াছে। অনাবশ্যক বলিয়াই, দেশে রেলপথ অতি সামান্য—মাত্র দুই হাজার মাইল।

বেলজিয়াম—বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের সহিত বেল-জিয়মের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ থাকায়, অনেকেই ইহার অবস্থিতি, ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতি সবিশেষ অবগত আছেন। কৃষি-জগতে ইহাদের কৃতিত্ব কতদূর, তাহাই নির্দ্দেশ করা আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। বেলজিয়ামও পৃথিবীর মধ্যে

একটি অতি ক্ষুদ্র দেশ। ইহার আয়তন মাত্র ১১,৩৭৩ বর্গ-মাইল; এবং লোকসংখ্যা ন্যূনাধিক ৭০ লক্ষ। অধি-বাসীদের অর্দ্ধাংশ ফ্লেমিং এবং বাকী অর্দ্ধ ওয়ালুন জাতীয়। এই উভয় জাতির ভাষাই ফরাসী।

বেলজিয়ামের দক্ষিণ-পূর্ব্ব প্রদেশের কতিপয় ক্ষুদ্র পাহাড় ব্যতীত আর সর্ব্বত্রই সমতল। এ দেশের ভূমি স্বভাবতঃ উর্ব্বরা নহে—মৃত্তিকায় বালির ভাগ বেশী। কিন্তু তথাপি, বিজ্ঞানসম্মত উন্নত-প্রণালীতে চাষ করা হয় বলিয়া প্রচুর পরিমাণে শস্য জন্মিয়া থাকে। সমগ্র ইউরোপের মধ্যে বেলজিয়ামের ন্যায় অনুর্ব্বর ভূমি আর কোনও দেশে আছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু তথাপি, তথায় যে উত্তম ফসল জন্মে, তাহা জমির গুণে নহে—চাষীদের গুণে। বেলজিয়াম কৃষি-কার্য্যের জন্য ইউরোপে প্রসিদ্ধ। ইউরোপের কোন দেশেও বেলজিয়ামের ন্যায় উন্নত কৃষি-প্রণালী পরিলক্ষিত হয় না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কেবল মাটীর দোষ-গুণের উপর যে চাষের দোষ-গুণ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে না, এবং কৃষকের যত্নে ও উন্নত-প্রণালীর চাষে কিরূপ উন্নতি হইতে পারে, বেলজিয়ামই তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

এই স্থানের মৃত্তিকায় বালির ভাগ বড় বেশী; সেইজন্য গ্রীষ্মকালে, রৌদ্রের তেজে, উহা একেবারেই শুষ্ক হইয়া যায়। জমির নীচের মাটীতে হীরাকস প্রভৃতি লৌহময় পদার্থ থাকায়, তাহাতে এরূপ কঠিন 'চটা' বাঁধিয়া যায় যে, তাহা ভেদ করিয়া সহজে জল নীচে প্রবেশ করিতে পারে না। এই প্রকার নীরস জমিতে চাষীরা যেরূপ কৌশলে ও পরিশ্রমের সহিত চাষ করিয়া থাকে এবং যেরূপ উত্তম ফসল উৎপাদন করে, তাহা দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। সমস্ত বৎসরের মধ্যে জমিতে কোন-না-কোন ফসল নাই, এমন সময় খুব কম দেখিতে পাওয়া যায়। প্রায় সকল সময়েই শস্য-ক্ষেত্রসমূহ ঘোর সবুজবর্ণের শস্যে পরিপূর্ণ রহে। বেলজি-য়ামের কৃষকেরও যেমন বিরাম নাই, জমিরও সেইপ্রকার বিরাম নাই। চাষী যেমন দিবারাত্র জমির উপর পড়িয়া আছে, জমিও সেইরূপ ফসলের পর ফসল দিতেছে। নানা প্রকার ফসলের চাষ সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। তদ্ভিন্ন, দুইটী ফসলের মাঝে কৃষকেরা প্রায়ই একটী উপরি ফসলের চাষ করিয়া থাকে। এখানকার আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ। দেশের পশ্চিমভাগে, সমুদ্রের উপকূলেই, বৃষ্টির পরিমাণ বেশী।

বেলজিয়ামের কৃষিজাত দ্রব্যমধ্যে গম, যব, শণ, হেম্প, আলু, হপ্ (hop—ইহাতে বিয়ার নামক মদ প্রস্তুত হয়), তামাক, বীট (চিনি প্রস্তুতের জন্য) এবং কল্‌জা জাতীয় কপির (ইহার বীজে ল্যাম্পে ব্যবহারোপযোগী একপ্রকার তৈল প্রস্তুত হইয়া থাকে) নামই উল্লেখযোগ্য। গৃহপালিত পশুর খাদ্যাভাব দূর করিবার জন্য কপি, বীট, গাজর; শালগম, মটর প্রভৃতি নানাপ্রকার সব্জীর চাষ-প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে। বেলজিয়ামে বকৃহুইট নামক এক প্রকার শস্যের চাষ করা হয়। ইহার ফল চুকাপালঙ্গ শাকের ত্রিকোণাকার ফলের অনুরূপ। সেই ফল গুঁড়া করিলে একপ্রকার ময়দা প্রস্তুত হয়। ইউরোপের গরীব লোক গমের ময়দার পরিবর্ত্তে বকৃহুইটের ময়দার রুটী প্রস্তুত করিয়া খায়। বলা বাহুল্য, গমের ময়দা অপেক্ষা ইহার দাম কম।

বেলজিয়ামের কৃষকেরা অনুর্ব্বর মৃত্তিকা চাষ করিয়াও যে সুফল লাভ করিতে পারে, তাহার প্রধান কারণ তাহারা বিনা সারে কোনও শস্যেরই চাষ করে না। তথায় ক্ষেত্রে যে পরিমাণ সার দেওয়া হয়, ইউরোপের অন্য কোনও দেশেও তত অধিক পরিমাণে সার ব্যবহার করা হয় না। এ দেশের চাষীরা আলুর জমির একহাত পর্য্যন্ত কোদাল দিয়া খুঁড়িয়া বিঘাপ্রতি ২৮০/০ মণ গোবরসার ও ৩০০/০ মণ গো-মূত্র প্রভৃতি সাররূপে ব্যবহার করিয়া থাকে।

বেলজিয়ামে তিসির চাষও যথেষ্ট হয়। অতি প্রাচীন-কাল হইতেই ভারতবর্ষে তিসির চাষ-প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বে যেরূপ তিসিগাছের ছাল হইতে আঁশ বাহির করিয়া, তদ্দ্বারা উৎকৃষ্ট কাপড় প্রস্তুত করা হইত, এক্ষণে তাহার চাষ-প্রথা একেবারেই লোপ পাইয়াছে—ভারতবর্ষের কুত্রাপিও তিসির ছাল হইতে আঁশ বাহির করিবার প্রথা প্রচলিত নাই। কেবল বীজের

জন্যই ভারতবর্ষে তিসির চাষ হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে তিসির চাষে বিশেষ অবনতি ঘটিয়াছে। পক্ষান্তরে, বেলজিয়ামে উন্নত-প্রণালীর চাষে তিসির যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। আঁশ বাহির করিবার জন্য তথায় বহু-কাল হইতেই তিসির গাছ জলে ভিজাইবার বা পচাইবার প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে। তিসির আঁশ বাহির করিবার প্রণালী অনেকাংশেই আমাদের দেশের পাটের আঁশ বাহির করিবার প্রণালীর অনুরূপ।

বেলজিয়ামে গৃহপালিত পশুর সংখ্যাও অপ্রচুর নহে। তথায় গরু, ঘোড়া, মুরগী এবং ভেড়া বিস্তর পাওয়া যায়। আকরিক পদার্থে বেলজিয়াম অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী। খনিজ-পদার্থের মধ্যে কয়লা, লৌহ এবং জিঙ্কের (zinc) নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। খনিজপদার্থের জোরেই বেলজিয়াম একটী শিল্পপ্রধান দেশ। নামুর এবং লিজের চতুষ্পার্শ্বস্থ লৌহখনি এবং তৎসন্নিহিত মন্স ও চারলেরই প্রান্তভাগস্থ সুবিস্তৃত কয়লার খনি সুপ্রসিদ্ধ। এই কয়লার খনি ফরাসী দেশ হইতে সমগ্র বেলজিয়াম ভেদ করিয়া জার্ম্মেনী পর্য্যন্ত পৌছিয়াছে। কয়লা ও লৌহের উৎপন্নের হিসাবে, বেলজিয়াম পৃথিবীতে পঞ্চমস্থানাধিকার করিয়াছে। এখানকার লৌহ-শিল্প এরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে যে, দেশজ লৌহ ছাড়াও বিদেশ হইতে প্রচুর পরিমাণ লৌহ আনয়ন করিতে হয়। বিদেশে যে পরিমাণ লৌহদ্রব্য রপ্তানি হইয়া থাকে, তাহার প্রায় অর্দ্ধেক লৌহই ভিন্ন দেশ হইতে বেলজিয়ামে আমদানী করা হয়। দেশের পূর্ব্বপ্রান্তে জিঙ্ক এবং লিজ ও ভারভায়ারসের ধারে বিস্তর তামা ও সীসার খনি আছে। তদ্ভিন্ন, অট্টালিকা নির্ম্মাণোপযোগী সুন্দর সুন্দর পাথর, মার্ব্বল, চূণা এবং ছাদের শ্লেট বা পাথরের টালি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দেশের তুলনায় লোকসংখ্যা অত্যন্ত অধিক; সুতরাং, অর্দ্ধেকভাগেরও অধিক জমিতে বিজ্ঞান-সম্মত উন্নত-প্রণালীর চাষ-বাস প্রবর্ত্তিত হওয়া সত্ত্বেও, জীবিকার্জ্জনের জন্য দেশবাসীকে শিল্পবাণিজ্যের উপর অনেকটা নির্ভর করিতে হয়। বেলজিয়ামে বীট হইতে এত চিনি প্রস্তুত হয় যে, দেশবাসীর প্রয়োজনাতিরিক্ত চিনি বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, প্রতিবৎসর প্রচুর পরিমাণ গম আমেরিকার যুক্তরাজ্য হইতে আমদানী করা হয়। লিসের উপত্যকায় অত্যুৎকৃষ্ট শণ এবং ফ্লাণ্ডারসে উৎকৃষ্ট হেম্প ও কল্‌জা কপি বিস্তর জন্মে। আর্দ্দেনেসের পার্ব্বত্য-প্রদেশে প্রচুর ওট্স (oats) এবং সমুদ্রোপকূলে গম ও ঘাস যথেষ্ট উৎপন্ন হয়। উপকূল ভূমিতে এবং ক্যাম্পাইন নদীর তীরে বিস্তৃত গোচারণ ভূমি রহিয়াছে। ফলে, ঐ সকল স্থানে গো-মেষাদি গৃহপালিত পশু প্রচুর পরিমাণে প্রতি-পালিত হয়। ক্যাম্পাইনের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের মাখম জগদ্বিখ্যাত।

বেলজিয়মে ছাগল ও ভেড়ার সংখ্যা খুব বেশী। এখানকার উলের পরিমাণও নিতান্ত কম নহে। তদ্ভিন্ন, মোরগ-মুরগী এত বেশী যে, বিদেশে বিস্তর রপ্তানী হইয়া থাকে। বহুল পরিমাণে ডিমও অন্যান্য দেশে রপ্তানি করা হয়।

কৃষির বিষয় ছাড়িয়া, যদি ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং শিল্পের দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, তাহা হইলে বেলজিয়ামকে ইউরোপের অতি প্রাচীন এবং বিখ্যাত শিল্প-প্রধান দেশ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। এ শিল্পের মূলে অপর্য্যাপ্ত খনিজপদার্থের, মূলধনের অপ্রতুলতার, লোক-সংখ্যার আধিক্যের এবং দেশবাসীর কার্য্যকুশলতার অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। চারলেরই, নামুর, ভারভায়ারস্ এবং লিজ শিল্প-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল। লিজের কামান, বন্দুক এবং গোলাগুলি জগদ্বিখ্যাত। ইহা পৃথিবীর সর্ব্বত্রই রপ্তানি হইয়া থাকে। বেলজিয়ামে প্রচুর পরিমাণে কল-কব্জা, রাসায়নিক দ্রব্য এবং কাচ, ইস্পাত, চীনামাটী টিন ও তামার জিনিষ প্রস্তুত হইয়া থাকে। এ স্থানের উল্, সূতি এবং লিনেন বস্ত্রও বিখ্যাত। বেলজিয়ামের ফিতা (lace) সুপরিচিত। বিয়ার (beer is the national beverage of this Country) সর্ব্বসাধারণের উপাদেয় পানীয়।

ইউরোপের পশ্চিমভাগে, সমুদ্রের ধারে এবং শিল্পপ্রধান দেশের মধ্যে বেলজিয়াম অবস্থিত বলিয়া, তথাকার অধিবাসীদের ব্যবসায়-বাণিজ্যের বিস্তর সুবিধা রহিয়াছে।

এস্থান হইতে বিদেশে শিল্পজাত দ্রব্যের রপ্তানি এবং বিদেশ হইতে এখানে কৃষিজাত দ্রব্যের আমদানী হইয়া থাকে। যে সকল দ্রব্য রপ্তানি হয়, তন্মধ্যে সুতা, নানারূপ থান-কাপড়, কম্বল; কলকব্জা, লৌহ, ইস্পাত, চিনি, গুড়, কাচ, দস্তা এবং ফিতা প্রভৃতি বিখ্যাত। অধিকাংশই ফ্রান্স, গ্রেটব্রিটেন, জার্ম্মেনী, হলাণ্ড প্রভৃতি দেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর অন্যূন ৪০ কোটী ডলারের দ্রব্য বিদেশে প্রেরিত হয়। পক্ষান্তরে, অন্যূন ৪৫ কোটি ডলারের দ্রব্য প্রতিবৎসর বিদেশ হইতে আমদানী হইয়া থাকে। বিদেশ হইতে যে সকল দ্রব্য আনয়ন করা হয়, তন্মধ্যে গম, বার্লি, আঁশ, কাঠ, জীবজন্তু, রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতিই উল্লেখযোগ্য। এই সকল দ্রব্যের অধিকাংশই ফ্রান্স, গ্রেটব্রিটেন, হলণ্ড এবং আমেরিকার যুক্তরাজ্য হইতে আমদানী করা হয়।

য়্যাণ্টওয়ার্প, ব্রাসেলস, ঘেণ্ট, এবং ব্রিউজেন—এই কএকটীই বেলজিয়ামের প্রসিদ্ধ বন্দর। দেশের জলপথ এবং স্থলপথ উভয়ই সুগম। খাল ও রেলের রাস্তা জালের মত দেশের সর্ব্বত্রই বিস্তৃত রহিয়াছে। রাজধানী য়্যাণ্টওয়ার্পের লোকসংখ্যা প্রায় তিন লক্ষ। বেলজিয়াম নয়টী বিভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে, পূর্ব্ব ফ্লাণ্ডার্স কৃষি-কার্য্যের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ।

উদরাময়—Diarrhœa.

[শ্রীযুক্ত রঘুনাথ দাস জি, বি, ভি, সি লিখিত।]

গবাদি গৃহপালিত পশুর উদরাময়-রোগ সাধারণতঃ সংক্রামক ও মারাত্মক ব্যাধি নহে। তবে কখনও কখনও পূর্ণবয়স্ক গাভী—বিশেষতঃ, গোবৎসদিগের মধ্যে এই পীড়া সংক্রামক হইতে দেখা যায়। গোবৎসগণ সংক্রামক পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হইলে অধিকাংশ স্থলেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কিন্তু উদরাময়-রোগে পূর্ণবয়স্ক গাভীকে কদাচিৎ মরিতে দেখা যায়। এই রোগে মৃত্যুর সম্ভাবনা বড় কম রহিলেও, রোগাক্রান্ত গাভী অত্যন্ত শীর্ণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। দুগ্ধবতী গাভীর রোগ জন্মিলে, উহার দুগ্ধের পরিমাণ ক্রমশঃই হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।

স্থানভেদে নাম—স্থানভেদে উদরাময় বিভিন্ন নামে পরিচিত। ইহা ওজরাটে পেটছুটুভু; মহারাষ্ট্রে হাগওয়ান; পঞ্জাবে ভুকনী ও ওয়া; সিন্ধুতে টিক, দাস্ত ও টিয়ার; বোম্বে-কানাড়াতে ভেইদ্দি ও উছিগলু; ব্রহ্মদেশে ওয়ান-কিয়া (Wan-kya); উড়িষ্যায় পুথেরী ও ঝাড়া; আসামে হাগনী এবং বঙ্গদেশে পেটের অসুখ, পেট নাবান বা পেট নাবান, হাগার ব্যামো, অপাক, দেরান প্রভৃতি নামে কথিত হয়। ইহা তামিল-ভাষায় কালিচাগ এবং তেলেগুভাষায় ভেদী নামে পরিচিত। আমরা ইহাকে উদরাময় নামে অভিহিত করিলাম।

রোগের প্রকৃতি—এই রোগে বারম্বার পাতলা দাস্ত হয়; কিন্তু জ্বর কিম্বা শারীরিক অন্য কোন প্রকার গোলমাল প্রায়ই থাকে না। তবে সময়ে সময়ে তলপেটের উত্তেজনার লক্ষণ সকল বিদ্যমান রহে। পাকস্থালী অন্ত্রের বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে বলিয়া, সর্ব্বদা অধিক পরিমাণে জলবৎ তরল মল নির্গত হয়।

রোগের কারণ—নানা কারণেই উদরাময়-রোগ জন্মিতে পারে। নিম্নে কতিপয় প্রধান কারণের বিষয় বিবৃত হইল :—

(১) অস্বাস্থ্যকর খাদ্য অর্থাৎ কটু, তিক্ত, তীব্র ও বিষাক্ত তৃণলতাদি ভক্ষণ কিম্বা অপরিষ্কার ও দূষিত জল পান করিয়াই গবাদি পশুরা সাধারণতঃ রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে।

(২) জলাভূমি এবং ডোবা, পুকুর প্রভৃতির অত্যন্ত পরিমাণ দূষিত জলে যে সকল জলজ উদ্ভিদ্ জন্মে, তাহা অত্যধিক পরিমাণে ভক্ষণ করিলেও গাভীর উদরাময়-রোগ হয়।

(৩) বর্ষার পচা জলযুক্ত স্থানের ঘাস খাইয়াও অনেক গাভী উদরাময়-রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে।

(৪) অত্যধিক পরিমাণে শুষ্ক ও গুরুপাচ্য দ্রব্য ভক্ষণ এবং অত্যধিক পরিমাণে জোলাপের ঔষধ সেবন করিলেও পেটের পীড়া জন্মে।

(৫) অধিক সময় প্রখর রৌদ্রে রহিলে, এবং অধিক উত্তাপ লাগিলে গাভীর পেটের অসুখ হয়।

(৬) অত্যধিক শীতে এবং ভয়ানক গ্রীষ্মের পর হঠাৎ ঠাণ্ডা বাতাস অথবা শীতের রাত্রিতে অত্যধিক হিম লাগিলেও উদরাময়-রোগ জন্মিতে পারে।

(৭) শ্বাস-প্রশ্বাস-যন্ত্র বা ফুসফুস্ ও তাহার আবরক ঝিল্লীর প্রদাহ, রক্তদোষজনিত রোগ এবং অন্যান্য বলক্ষয়-কারক রোগের চরমাবস্থায় পেটের পীড়া উপস্থিত হইয়া থাকে।

(৮) বর্ষাকালে প্রথম বৃষ্টির পর মাঠে যে সবুজ ঘাস জন্মে, তাহা অত্যধিক পরিমাণে ভক্ষণ করিয়াও গাভীগণ পেটের পীড়াগ্রস্ত হইয়া পড়ে।

(৯) খাদ্যের বিশেষ পরিবর্ত্তন অথবা পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তনেও উদরাময়-রোগ জন্মে।

(১০) অন্ত্রমধ্যে কৃমির আধিক্য হইলেও, অনেক সময়, পেটের পীড়া দেখা দেয়।

রোগের লক্ষণ—বায়ুনিঃসরণের সহিত বারম্বার জলবৎ তরল মল নির্গত হইতে থাকে। প্রথমতঃ মলত্যাগের সময় বেগ দিতে বা বেদনা অনুভব করিতে দেখা যায় না। ক্ষুধা উত্তমরূপে থাকিতে পারে সত্য, কিন্তু জাবরকাটার কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম ঘটে। উদরাময়-রোগের প্রথমাবস্থায় রুগ্ন গাভীর স্বাস্থ্যের বিশেষ কোনরূপ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় না। রোগ পুরাতন হইলে মলত্যাগ-কালে বেগ দিতে হয়; এবং রুগ্ন গাভীর মেরুদণ্ড বক্র হইয়া যায়। তদ্ভিন্ন, উহার পার্শ্বদেশ শীর্ণ ও শিথিল হইয়া পড়ে এবং চর্ম্মের লোম খাড়া হইয়া উঠে। তৎকালে অল্পাধিক পরিমাণে বেদনা অনুভব করে এবং কখনও কখনও মলের সহিত রক্ত নির্গত হইতেও দেখা যায়। গোবৎসদিগের উদরাময় হইলে তাহাদের নাভিস্থল উত্তপ্ত, বেদনাযুক্ত ও স্ফীত হইয়া থাকে। উক্ত লক্ষণসমূহ গবাদি পশুর শরীরে সুস্পষ্ট ও ক্রমবর্দ্ধিতাকারে আবির্ভূত হয়। সাধারণতঃ রুগ্ন গাভীর মল শুভ্রবর্ণের হইতে দেখা যায়।

চিকিৎসা—এই রোগোৎপত্তির কারণ নির্ণয় করিয়াই ঔষধের ব্যবস্থা করিতে হয়। সাধারণ স্থলে, গরুটী যে জমিতে চরিত এবং যেরূপ খাদ্য ভক্ষণ ও জলপান করিত, তাহার পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক। পক্ষান্তরে, যাহাতে সহজপাচ্য কোমল ও টাটকা ঘাস এবং পরিষ্কৃত জল খাইতে পারে, তাহারও ব্যবস্থা করিতে হয়। ইহাতে রোগের উপশম না হইলে, প্রথমাবস্থায় নিম্নলিখিত মৃদু বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করা যুক্তিসঙ্গত।

রেড়ির তৈল	৫ ছটাক।
তিসির তৈল	৩ „

একত্র মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইতে হইবে। মৃদু জোলাপের কার্য্য সম্পন্ন হইলে পর, নিম্নলিখিত ধারক ঔষধ খাওয়াইতে হয়।

খড়িমাটী গুঁড়া	½ ছটাক।
খয়ের	½ „
শুঁঠ	½ „
আফিম	।৵০ আনী।
দেশী মদ	১ ছটাক।

উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া ১০ ছটাক পরিমিত তিসির কিম্বা ভাতের মাড়ের সহিত খাওয়াইতে হইবে। যতদিন পর্য্যন্ত পেটের অসুখ না সারে, ততদিনই প্রাতে ও সন্ধ্যায় দৈনিক দুইবার উল্লিখিত ঔষধটী খাওয়ান আবশ্যক। রোগ কঠিন হইলে, রুগ্ন গাভীর পুষ্টিসাধনোদ্দেশ্যে, কেবল ভাতের মণ্ড বা ভুষি লবণমিশ্রিত করিয়া খাইতে দেওয়া কর্ত্তব্য। তলপেটে অধিক বেদনা থাকিলে, তদুপরি গরম সেক দিতে হয়। পীড়িত গরুকে উত্তম, সুমিষ্ট ও পুষ্টিকর খাদ্য খাইতে দেওয়া আবশ্যক। পাতলা মলনির্গমন বন্ধ হইবার পরও, কিছুদিন পর্য্যন্ত জলের পরিবর্ত্তে ভাতের, মসিনার ও ময়দার মাড় উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া খাইতে দিবে।

রুগ্ন গাভীটী দুর্ব্বল বা অতিশয় শীর্ণ হইলে, দিবসে দুই একবার করিয়া নিম্নলিখিত বলকারক ঔষধ দুইটীর একটী খাওয়াইতে হয়।

হীরাকসচূর্ণ	এক তোলা।
লবণ	আধ ছটাক।

উত্তমরূপে গুঁড়া করিয়া প্রতিদিন ভাতের মাড়ের সহিত খাওয়াইতে পারিলে, রুগ্ন গাভী সবল হইয়া উঠিবে। অথবা—

মৌরীচূর্ণ	১ তোলা
এলাচিচূর্ণ	১ „
জোয়ানচূর্ণ	১ „
চিরতাচূর্ণ	আধ ছটাক।

একত্র মিশ্রিত করিয়া, উহা প্রতিদিন ভাতের মাড়ের সহিত খাওয়াইলে গরু বেশ সবল হইয়া থাকে।

রোগ পুরাতন হইয়া পড়িলে, সোয়া সের জলের সহিত তুঁতিয়াচূর্ণ একতোলা ও আফিম সিকি ভরি একত্র মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইতে হয়। এই ঔষধের সহিত উপরোক্ত একটী বলকারক ঔষধও প্রয়োগ করা আবশ্যক।

অন্ত্রমধ্যে অত্যধিক পরিমাণ ক্রিমি বিদ্যমান রহিলে (এই অবস্থায় মলের সহিত ক্ষুদ্র ও বৃহদাকার ক্রিমি নির্গত হইয়া থাকে।) যে পেটের পীড়া হয়, তন্নিবারণের জন্য নিম্নলিখিত ক্রিমিনাশক ঔষধের কোনও একটী খাওয়াইলে নিশ্চয়ই উপকার হইবে।

তার্পিণ তৈল	এক ছটাক।
তিসি বা নারিকেল তৈল	দশ „

বার ঘণ্টা অনাহারে রাখিয়া, রোগাক্রান্ত পশুটীকে এই ঔষধ খাওয়াইতে হয়। অথবা :—

লবণ	এক ছটাক।
হীরাকসচূর্ণ	সিকি „
গন্ধকচূর্ণ	অৰ্দ্ধ „

সোয়া সের পরিমিত জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইতে হইবে। ক্রমাগত একসপ্তাহকাল পর্য্যন্ত দিনে দুইবার করিয়া ঔষধ খাওয়াইতে পারিলে ভাল হয়। এই ঔষধ খাওয়াইবার পর নিম্নলিখিত বিরেচক ঔষধ খাওয়ান আবশ্যক।

লবণ	৬ ছটাক।
মুসব্বর	১/৪ „
শুঁঠ	১/৪ „
চিটাগুর	৪ „

সোয়াসের পরিমিত খুব উত্তপ্ত জলের সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া গরম থাকিতে থাকিতেই পান করাইতে হইবে। অথবা :—

হিঙ্গ	১/৪ ছটাক।
গন্ধকচূর্ণ	১/২ „

পূর্ব্বোক্ত ঔষধের ব্যবস্থানুযায়ী খাওয়াতে হইবে।

গোবৎসগণকে প্রাপ্তবয়স্ক গাভীদিগের নির্দ্ধারিত প্রণালী অনুসারেই চিকিৎসা করিতে হইবে। তবে ঐ সকল ঔষধের সিকি মাত্রা প্রয়োজ্য। অধিকন্তু, নাভিস্থল পরিষ্কার করিয়া, তাহাতে নিম্নলিখিত ক্ষতরোগের ঔষধ লাগাইতে ও উহা বাঁধিয়া রাখিতে হইবে।

তুঁতিয়ার গুঁড়া	ছয় আনী।
গরম জল	দশ ছটাক।

দ্রব করিয়া ঠাণ্ডা হইলে লাগাইতে হয়।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা—সাধারণ উদরাময়-রোগে পরিষ্কার জলের সহিত আর্সেনিক এলব IX ৮ ফোঁটা দুই ঘণ্টা পর পর দিলে উপকার হয়। পেটে বেদনা থাকিলে এবং মলের সহিত রক্ত নির্গত হইলে, মার্কুরিয়াস্ কর IX ৪।৫ ফোঁটা দুই ঘণ্টা পর পর সেবন করাইতে হইবে। ক্রিমির আধিক্য হইলে, সিনা IX ১০ ফোঁটা দিনে দুইবার ব্যবস্থেয়।

সতর্কতা অবলম্বন—যাহাতে এই রোগ বিস্তৃত হইতে না পারে, তদুপায় বিধান করা অবশ্যকর্ত্তব্য। সদ্য প্রসূত গোবৎসদিগকে পীড়িত গাভীর সন্নিকটে আসিতে দেওয়া অনুচিত। তদ্ভিন্ন, উহাদের নাভিস্থল যাহাতে কোনরূপে অপরিষ্কৃত হইতে না পারে, তৎপ্রতিও বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। পালের একটী গাভীর উদরাময়-রোগ দেখা দিলে, অন্যান্য গাভীর খাদ্যের পরিবর্ত্তন করিতে এবং পানীয় জলের বিশুদ্ধিতার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

উদরাময়-রোগ সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত রুগ্ন গাভীকে ভাতের মাড়ের সহিত কিছু লবণ এবং কচি ঘাস খাইতে দেওয়া ভাল। উহাকে শক্ত খড় অথবা অন্য কোনরূপ গুরুপাচ্য খাদ্য দেওয়া অনুচিত। কারণ, রুগ্ন গাভী ঐ সকল দ্রব্য জীর্ণ করিতে পারে না। ফলে, রোগ ক্রমশঃই বৰ্দ্ধিতাকার ধারণ করে।

শ্রীরঘুনাথ দাস।

বাঁশের কাজ ও বাঁশের চাষ।

ভারতের জলবায়ু ও মৃত্তিকা বাঁশের পক্ষে বিশেষ অনুকূল; সুতরাং দেশের সর্ব্বত্রই অল্পাধিক পরিমাণে নানা জাতীয় বাঁশ জন্মিতেছে। এই হেতু সহজ-সুলভ বাঁশের সাধারণ ব্যবহার-জ্ঞান আমাদের থাকিলেও, উহার শিল্পোচিত ব্যবহারে আমরা নিতান্তই অজ্ঞ। ইউরোপ বা আমেরিকার ন্যায় বাঁশের "বেতি" (slits) করিতে ও বাঁশের বেতি বুনিতে আমাদের যন্ত্র-ব্যবহার শিক্ষাও নাই, জাপানী-শিল্পীর ভূয়োদর্শনও নাই। এক কথায়, শিল্পের হিসাবে, আমরা স্বচ্ছন্দজাত, সুলভ বংশবৃক্ষকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া থাকি! জাপানে বাঁশে গেছ-বৎ সূক্ষ্মসূত্র, কূপ-জলোত্তলনকারী বৃহৎ রজ্জু, রন্ধনশালার ভাণ্ড, সুসজ্জিত চেয়ার-টেবিল—আর কত কি—হইতেছে। আমাদের দেশে প্রধানতঃ যুক্ত-প্রদেশের বেরেলী এবং আসামের শ্রীহট্ট বাঁশের শিল্পকার্য্যে একটুকু প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। বর্ত্তমানে ব্যবসায় ও শিল্পের হিসাবে, কোনস্থলেই বাঁশের চাষ অথবা কাজ হইতেছে না। এ দেশীয় বংশশিল্পে (১) শিল্পকলার প্রশংসনীয় বিকাশ নাই, (২) মূল্যের একান্ত সুলভতার প্রবল আকাঙ্ক্ষায় জিনিষের গঠন-পারিপাট্যের প্রতি লক্ষ্য নাই এবং (৩) শিল্পে ব্যবহার্য্য বংশরক্ষার কোনও প্রকৃষ্ট পদ্ধতি নাই।

এ দেশের লোক এরূপ স্বচ্ছন্দ বনজাত বৃক্ষের অবাধ ব্যবহারে পরাঙ্মুখ হইবার প্রধানতঃ দুইটী কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে :—(১) বাঁশে ঘুণ ধরে, (বাঁশ একরূপ ক্ষণভঙ্গুর ও অচিরস্থায়ী) এবং (২) বাঁশে জোড়া লাগাইবার কোনও বিশিষ্ট প্রণালী নাই। প্রধানতঃ, এই দুইটি কারণেই, কাষ্ঠের ন্যায়, বহুস্থলে বাঁশের ব্যবহার হইতে পারে না।

অতি প্রাচীনকালে যে সকল কার্য্যে বংশের ব্যবহার-প্রথা এ দেশে প্রচলিত ছিল, এক্ষণও প্রায় সেই সকল কার্য্যেই বাঁশের ব্যবহার প্রচলিত রহিয়াছে। বংশের শিল্পোচিত অবাধ ব্যবহার এদেশে কখনও ছিল না—এখনও নাই। বরং পূর্ব্বে যাহাও ছিল, অধুনা ক্রমশঃই তাহা বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। ভারতের অধিকাংশ লোকই কুটীরবাসী। তাহাদের কুটীর প্রস্তুতকার্য্যে আবহমান কাল হইতেই অত্যধিক পরিমাণে সর্ব্বপ্রকার বাঁশ ব্যবহৃত হইতেছে। তদ্ভিন্ন, গৃহস্থের নিত্যপ্রয়োজনীয় ডালা, কুলা প্রভৃতি, মৎস্য ধরিবার নানাপ্রকার যন্ত্র, ঘরের, বাগানের, ক্ষেত্রের ও বাড়ীর চতুষ্পার্শ্বস্থ বেড়া, বেড়া বাঁধিবার মোলা, চাটাই প্রভৃতি, বসিবার মোড়া এবং 'ছৈ' (নৌকা প্রভৃতির উপরিভাগের আবরণ) ও সাঁকো প্রস্তুত করিতেও প্রচুর পরিমাণ বাঁশ ব্যবহৃত হয়। এ দেশে বাঁশের লাঠির এক-দিন যথেষ্ট আদর ছিল; কিন্তু অধুনা বাঁশের লাঠি বাঙ্গালা ছাড়িয়া, তীরধনুর ন্যায়, কোল, ভীল, গারো প্রভৃতি অসভ্য জাতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। যে বাঁশের বাঁশীর রব শুনিয়া একদিন যমুনা উজান বহিত, সেই সরল বাঁশের বাঁশীরও এ দেশে আর বড় আদর নাই। গৃহিণীরাও সুলভ মূল্যের লিপটনের চা'র খালি টীনের কৌটা পাইয়া, বহুকাল যাবতই রন্ধনশালা হইতে মসলা রাখিবার বাঁশের চোঙ্গা বিদায় করিয়া দিয়াছেন। শিক্ষিত বাবুদের বৈঠকখানাতেও আজকাল বাঁশের মোড়ার প্রবেশলাভের অধিকার নাই। বর্ত্তমান সভ্যতার যুগে, কবিরাজি ঔষধের বড়িগুলিও, বাঁশের চোঙ্গা ছাড়িয়া, কর্ক-বদ্ধ শিশিরির মধ্যে স্থানলাভ করিয়াছে। এখন আর এ দেশের কুত্রাপিও বাঁশের হুকা, তামাক ও পান রাখিবার বাঁশের ডিবা, বাঁশের কঞ্চির কলম প্রভৃতি দৃষ্ট হয় না। বাঁশের আরও কত কি ব্যবহার এ দেশে প্রচলিত ছিল; কিন্তু বেশী দিনের কথা নহে—২৫।৩০ বৎসরের মধ্যেই এ দেশে বাঁশের জিনিষ অনাদৃত হইয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমান রুচি অনুযায়ী বংশশিল্পের উন্নতিসাধন করিতে পারিলে, বাঁশের আদর ক্রমেই যে বৰ্দ্ধিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বাঁশের বংশ ও স্থানীয় ব্যবহার।

পুথিপত্রে দেখিতেছি—বাঁশ ২৫০ প্রকার। তন্মধ্যে, ১৫০ প্রকার জাপানেই জন্মে, এবং আমেরিকায় ৮২ প্রকার বাঁশের রপ্তানি হয়। ভারতে কত প্রকার বাঁশ আছে, ভারতবাসী তাহার সংবাদ রাখে না। পূর্ব্ববঙ্গে সাধারণতঃ (১) তল্লা, (২) বয়রা, (৩) শীলবয়রা, (৪) ওরা, (৫) প্যাচাজালী, (৬) বুনো (solid বা male), (৭)

RABINDRA BHARATI UNIVERSITY 1934

লোড়া, (৮) মূলী, (৯) ঢুলি, (১০) মহাকাল, (১১) জাওয়া (ইহা ঘুণে ধরে না), (১২) কণ্টকযুক্ত বাঁশ—এই কএক প্রকার বাঁশ অত্যধিক পরিমাণে জন্মে। এতৎ-দেশে মোলা ও চাটাই নির্ম্মাণে তল্লাবাঁশ যথেষ্ঠ ব্যবহৃত হয়। ইউরোপ, জাপান ও আমেরিকা এবং আমাদের দেশে বেরেলীতে বুনো (solid বা male) বাঁশেরই ব্যবহার অত্যধিক।

জাপানী বাঁশের পরীক্ষা।

মাদ্রাজের কৃষি-সমিতির ক্যাভানা সাহেব কতকগুলি বিভিন্ন জাতীয় জাপানী বাঁশ আনাইয়া তাঁহার বাগানে রোপণ করিয়াছিলেন। উহাদের মধ্যে একজাতীয় বাঁশের মুল শিকড় প্রায় ২।৩ ফুট দীর্ঘ হয়। এই বাঁশে সুন্দর ছড়ি প্রস্তুত হইতে পারে। আমাদের দেশে চট্টগ্রামেও এরূপ বাঁশ দেখা যায়। আর একজাতীয় বাঁশ আছে, তাহাদিগকে ইচ্ছানুক্রমে বাঁকান যাইতে পারে; সাজ-সজ্জানির্ম্মাণকল্পে, ইহারা প্রশস্ত। কাল বর্ণেরও কএক প্রকার শোভনদর্শন বাঁশ আছে। ইয়োকোহামার নার্শারি-ওয়ালা বোনার কোম্পানী ঐ বাঁশগুলি পাঠাইয়াছিলেন। আমরা তাহাদের ইংরাজি নাম ইংরাজিতেই দিলাম; কোনও পাঠকের দুরাশা থাকিলে, তিনি তাহার বঙ্গানুবাদ করিয়া লইবেন।

Phyllostachys Sulphuria—Ma-dake
do Mites—Mosochiku
do Nigra—Kurochiku
Bambusa Marmarea—Kanchiku
do (Phyllostachys) Castillonsis Kemmic-chiku
do Henonis Ha-chiku
do Bambosoids-ya-dake
do Alphonse sow-chiku

এ দেশের সর্ব্বত্র উক্ত কএক প্রকার জাপানী বাঁশের চাষ হইতে পারে কিনা, সরকারী কৃষি-ক্ষেত্রে তাহার পরীক্ষা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বাঁশে পেপার-পালপ্।

ব্রহ্মদেশীয় বাঁশে কাগজনির্ম্মাণোপযোগী পালপ্ (pulp) প্রস্তুত হয়; আমাদের দেশেও এই পালপ্ প্রস্তুত হইতে পারে। ব্যবসায়বুদ্ধিতে, এই পালপ্-ব্যবসায় বিশেষ লাভজনক। এ স্থলে, আমরা প্রসঙ্গতঃ, একটা শিল্প-বাণিজ্য-সংবাদও দিতেছি। "ব্রহ্ম দেশে কাগজ ও কাগজ-নির্ম্মাণোপযোগী পালপ্ প্রস্তুত করণ" (Manufacture of paper & paper-pulp in Burmah) নামক পুস্তকে, গ্রন্থকার মিঃ ডবলিউ সিণ্ডাল (Mr W. Sindall, F. C. S) লিখিয়াছেন—(১) এক টন (এক টন=২৭¼ মণ) বাঁশের পালপ্ প্রস্তুত করিতে ২¼ টন বাঁশ প্রয়োজন। এই পালপ্ প্রস্তুত করিতে যে পরিমাণ বাঁশের প্রয়োজন, তাহার মূল্য ১০॥০ টাকা বা ১পাঃ ১শিঃ এবং পালপ্ প্রস্তুতের মোট ব্যয় ৪পাঃ ৯শিঃ। সুতরাং এক টন অশুভ্রীকৃত (unbleached) পালপ্ নির্ম্মাণে ৫পাঃ ১০শিঃ এবং মাশুল ২পাঃ ধরিলেও, বিলাতের বাজারে ইহার মূল্য দাঁড়াইবে অন্ততঃপক্ষে ৮ কি ৯ পাউণ্ড। এই সুবিধার কথা উল্লেখ করিয়া, তিনি বিলাতে এরূপ পালপ্ রপ্তানির পরামর্শ দিয়াছেন। মোট কথা, অসভ্যের মত বাঁশে একমাত্র তীর-ধনু নির্ম্মাণের আমরণ প্রয়াসে আমাদের শিল্প-সম্পদ বাড়িবে না; রুদ্ধচক্ষুতে দেশের ব্যবসায়িক মঙ্গল দুরাশা মাত্র।

বর্ত্তমানসময়ে কাগজ কিরূপ দুর্ম্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নহে। বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের ফলে, অষ্ট্রীয়া ও জার্ম্মেনীর কাগজ আমদানী আজ প্রায় দুই বৎসর একেবারে বন্ধ। নরওয়ে ও সুইডেনের কাগজ যুদ্ধের প্রথমাবস্থায় কিছু কিছু আমদানী হইতে ছিল; কিন্তু নানা কারণে তাহাও প্রায় বন্ধ হইয়াছে। সুইডেন হইতে প্রেরিত গাছবিশেষের ছালে সংবাদপত্রের সুলভ মূল্যের কাগজ ইংলণ্ডে প্রস্তুত হইত; কিন্তু কএক মাস হইতে সুইডেন গবর্ণমেণ্ট কাগজ প্রস্তুতোপযোগী মণ্ডের রপ্তানি বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। তাহার ফলে, বিলাত হইতেও ঐ শ্রেণীর কাগজ আসার সম্ভাবনা

Kshitindranath Tagore Collection
RABINDRA BHARATI UNIVERSITY 1934 LIBRARY

বড় কম। এই সব নানা কারণে, এদেশে কাগজ ক্রমেই দুর্ম্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে। যদি আরও কিছু দিন যুদ্ধ চলে, তাহা হইলে এদেশে সুবর্ণের দামে কাগজ বিক্রীত হইবে। সমগ্র ভারতে তিনটী মাত্র কাগজের কল রহিয়াছে; এই তিনটী কলই কলিকাতার সন্নিকটে অবস্থিত। তন্মধ্যে, দুইটী টিটাগর কোম্পানীর এবং অন্যটী বেঙ্গল পেপার মিল কোম্পানীর। এই তিনটী কলের একটীতে প্রতি সপ্তাহে ২০০ টন এবং অন্যটীতে ১৫০ টন কাগজ প্রস্তুত হয়। অন্য আর একটী কলে কি পরিমাণ কাগজ প্রস্তুত হয়, তাহার হিসাব জানিতে পারা যায় নাই। উক্ত টিটাগর কোম্পানীর দুইটী কলে বার্ষিক মাত্র ১৯ হাজার টন এবং বেঙ্গল পেপার মিলে ছয় হাজার টন—এই মোট ২৫ হাজার টন কাগজ প্রস্তুত হইতেছে। মোট ২৫ হাজার টন কাগজের ৯ হাজার টন (টিটাগর কোম্পানীর ৬ হাজার টন এবং বেঙ্গল পেপার মিলের ৩ হাজার টন) কাগজ গভর্ণমেণ্ট ক্রয় করিয়া থাকেন। সুতরাং, অবশিষ্ট ১৬ হাজার টনে বঙ্গের কাগজের অভাব দূর হইতে পারে না। এইজন্যই আজকাল এদেশে কাগজের কল-প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা অনেকেই উপলব্ধি করিতেছেন। মিঃ সিণ্ডালের মতে, এদেশে—বিশেষতঃ ব্রহ্মদেশে, কাগজের কল প্রতিষ্ঠিত হইলে এবং বাঁশের পাল্পে কাগজ প্রস্তুত করিতে পারিলে, যথেষ্ট লাভেরই সম্ভাবনা রহিয়াছে। কথাটা সত্য কিনা, তাহা পরীক্ষা করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।

বাঁশ ও কাঠ।

বাঁশও একরূপ কাঠ (লাকড়ি); যত প্রকার শক্ত কাঠ আছে, বাঁশ তাহাদের অন্যতর। দোদুল্যমান পুলে (Suspension bridge—ঝুলানো পুল) বাঁশের ব্যবহারই ইহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

বাঁশে যদি ঘুণ না ধরিত, অথবা ঘুণপ্রতিষেধক বিশেষ কোন উপায় আমাদের পরিজ্ঞাত থাকিত, তাহা হইলে, এই অনায়াসলব্ধ বাঁশেরও এদেশে ব্যবহার-প্রাচুর্য্য আরও বহুলপরিমাণে বাড়িয়া যাইত। এরূপ বিবেচনা করিবার আরও একটা হেতু আছে—এদেশ অরণ্যপ্রধান হইলেও, ইহা সুলভমূল্য কাষ্ঠের জন্মভূমি নহে। [illegible] মাইল দূরে অবস্থিত নরওয়ে দেশ (পাঠাইতে মাশুল খরচ করিয়াও), মূল্যের সুলভতার হিসাবে, বহুপরিমাণে কলে-কাটা তক্তা ভারতকে জোগাইতেছে; এরূপ ব্যাপার রহস্যজনক হইলেও সত্য! বাঁশের কাজে (Industry) বাঁশের অত্যধিক প্রচলনই বর্ত্তমানক্ষেত্রে বাঞ্ছনীয় ও কর্ত্তব্য।

বাঁশ কাটিবার সময়।

জাপানে ডিসেম্বর কি জানুয়ারী মাসে বাঁশ কাটা হয়। এই সময়ে বংশমধ্যস্থ রস (বলা বাহুল্য, এই রসে চিনি আছে) বিশেষ পরিপক্কতা লাভ করে—তখন আর নূতন রস সঞ্চিত হয় না। বাঁশ কাটিবার ইহাই প্রশস্ত কাল; অন্য সময়ে কাটিলে, বাঁশে ঘুণের আবির্ভাব ও দৌরাত্ম্য সহজেই সংঘটিত হয়। এরূপে কর্ত্তিত বংশদণ্ড ঘুণ-প্রতিষেধক উপায়ে শিল্পকার্য্যোপযোগী ও স্থায়ী হয়। পূর্ব্ববঙ্গে সাধারণতঃ বাঁশ কাটিবার কোনও দিন বা তিথি নাই; স্থানে স্থানে কেবল মাত্র বৃহস্পতি বা রবিবারে বংশ-কর্ত্তন-নিষেধ-বিধি আছে; কারণ, সাধারণের বিশ্বাস, ঐ দুইদিন বাঁশের জন্মদিন। বাঁশের শিল্পোচিত ব্যবহারে প্রয়াসী হইলে, শিল্পীকে এইভাবে দেশকালসম্মত প্রশস্ত-কালে বংশ কর্ত্তন করিতে হইবে; এবং এরূপ বাঁশ অন্ততঃ ১৮ ইঞ্চি অন্তরে রোপিত হইয়াছে কিনা (বলা বাহুল্য, বৈজ্ঞানিক বংশচাষের ইহাই প্রকৃষ্ট প্রণালী), তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। নচেৎ তাহার শ্রম সার্থক হইবে না।

বংশ-রঞ্জন।

গত ১৯০৪—০৫ খৃঃ অব্দে, বোম্বাই সহরে যে কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী বসিয়াছিল, তাহাতে তৎপ্রদেশের বস্ত্ররঞ্জনবিৎ মিঃ দেশাই কতকগুলি কৃষ্ণ, পীত, সবুজ, কমলা ও নীলবর্ণে রঞ্জিত বংশদণ্ড প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার এই উদ্ভাবন-কৌশলে একটুকু বিশেষত্ব ছিল—(১) ইহাতে বাঁশের চাকচিক্য নষ্ট হয় নাই, (২) বাঁশের বহিরাবরণও অবিকৃত ছিল, অথচ (৩) রংও বংশমর্ম্মভেদী ছিল। শুনিয়াছি, এরূপ সুন্দর রঞ্জন-প্রণালী শিক্ষা

করিতেও কেহই ব্যাকুল নহে। এখন ব্যাকুলতা না থাকিলেও, ভবিষ্যতে যে এ জন্য ব্যাকুলতা জন্মিবে, এ কথা অনুমান করিতে পারা যায়। ইউরোপ বা আমেরিকার কেহ এ কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলে, শিল্পসমিতির চাঁদায় বিদেশ যাত্রা করিয়া, এই বিদ্যার্জ্জনের আবশ্যকতা-জ্ঞান অনেকেরই জন্মিবে; সুতরাং বর্ত্তমানে কাহারও উৎকণ্ঠার প্রয়োজন নাই।

আর একটি উন্নতি।

কুমিল্লার জেলে কলার আঁশে বাঁশের ঝোড়া দেওয়া হইতেছে। সরকারী সংবাদে প্রকাশ, এই উপায়ে শিল্পসম্পদও বাড়িয়াছে। দেশে এরূপ পর্য্যবেক্ষণ না থাকিলে, দেশেই দেশের কাঁচামালের বাণিজ্যিক ব্যবহার বা প্রচলন না করিতে পারিলে, দেশের আর মঙ্গল কোথায়?

পূর্ব্ববঙ্গে বাঁশের কাজ।

গত আদম সুমারীতে (Census) দেখা গিয়াছে, এ প্রদেশে ৭৪, ৮৬২ জন লোক বাঁশের কাজে জীবনধারণ করিতেছে। এতন্মধ্যে, ২০,০৪৮ জন পুরুষ এবং ১৬,৪৮৩ জন স্ত্রীলোক প্রকৃত কারিকর (কর্ম্মী)। ১১৯৮ জন কৃষি ও বাঁশের কার্য্যে নিযুক্ত; এবং অবশিষ্ট ৩৭,১৩৩ জন তাহাদের পোষ্য। শ্রীহট্টে সাধারণতঃ মৌলা ও চাটাই অত্যধিক পরিমাণে এবং অল্প পরিমাণে কারুকার্য্যহীন চেয়ার, টেবিল, মোড়া প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। শ্রীহট্টের অনুকরণে, পূর্ব্ববঙ্গেরও নানাস্থানে অত্যল্প পরিমাণ মৌলা, চাটাই, মোড়া প্রভৃতি প্রস্তুত হইতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাঁশের চেয়ার, টেবিল প্রস্তুত করিবার চেষ্টা আজিও হয় নাই। ময়মনসিংহের অন্তর্গত ঈশ্বরদীয়া-চড়ে ৬৫টী পরিবারে একপ্রকার বাঁশের বাক্স প্রস্তুত হয়; ময়মনসিংহ সহরে তাহার আদর ও কাটতি অত্যধিক। ছনের মূল্য অত্যধিকরূপে বাড়িয়া গিয়াছে বলিয়া, ঢাকা জিলার নানা স্থানেই মুনীবাঁশের 'কেচা' দ্বারা ঘর ছাওয়ার কার্য্য চলিতেছে।

আর দুইটী নূতন ব্যবসায়ের সম্ভাবনা।

বাঁশের সন্ধিস্থলে একরূপ আঠা থাকে; বংশের জীবন নাশ না করিয়া, এরূপ আঠা (gum) সংগ্রহ করিতে পারিলে, একটী নূতন ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে। কুমিল্লা ও চট্টগ্রামের একপ্রকার বাঁশে ছাতির "ডাট" হইতেছে; উহারও বিস্তৃতরূপ ব্যবসায় চলিতে পারে।

যন্ত্র-ব্যবহার।

আমেরিকায় সাধারণতঃ ইহাকে প্রস্তুত (১) গোল করাত এবং (২) বংশকর্ত্তন ও বুনন-যন্ত্র (Spliting weaving machinery) ব্যবহৃত হয়। অন্য দেশে বাঁশের কাজে যন্ত্র-ব্যবহার হয় না; সুতরাং, যন্ত্র-ব্যবহারের কথায় নিরাশ হইবার কোনও কারণ বা আবশ্যকতা নাই। বাঁশের কাজ (Bamdo industtry) অনায়াসে হস্ত দ্বারাই সম্পন্ন হইতে পারে।

মূল্যের সুলভতা।

জিনিষ গুণে নিকৃষ্ট করিয়া, মূল্যের সুলভতা দেখাইতে যাওয়াতেই আমাদের দেশে বংশশিল্পের অধোগতি ঘটিয়াছে। শ্রীহট্টে প্রস্তুত বাঁশের চেয়ার এখনও ৷৵০ আনা মূল্যেই প্রাপ্তব্য। বৈদেশিক বাঁশের চেয়ারের মূল্য ইহার অনেক গুণ বেশী; অথচ, সেই মহার্ঘ দ্রব্যই দেশ-বিদেশে প্রচুর পরিমাণে সাদরে গৃহীত হইতেছে। বৈদেশিক চেয়ারের অনুকরণে, শ্রীহট্টের কারিকর দ্বারা এ দেশেও ভাল চেয়ার প্রস্তুত করাইতে পারিলে একটী বিশেষ লাভজনক ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে। এ দেশের শিক্ষিত-সমাজের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইবে কি?

বিশেষজ্ঞের আশ্বাসবাণী।

বিগত ১৮৯০ খৃঃ অব্দে, মিঃ কলিনস্ বলিয়াছেন—এদেশের কারুকার্য্যপূর্ণ বাঁশের জিনিষ বিদেশে রপ্তানি না হইবার কোনও বিশিষ্ট কারণ নাই। "টাইমস্ অব্ ইণ্ডিয়া"

নামক প্রসিদ্ধ পত্রে লিখিত হইয়াছে যে, ভারতবর্ষে বাঁশ ও বেত নিত্য-ব্যবহার্য্য দ্রব্যের উপাদান; সুতরাং যথেষ্ট উৎসাহ দিলে, ইহা (বাঁশ) বস্ত্র-শিল্পের (তাঁতের) পরবর্ত্তী স্থানই অধিকার করিবে; এবং এ নিমিত্ত উচ্চহারে পারিশ্রমিক প্রদত্তও হইতে পারিবে।

শিল্পোন্নতির উপায়।

আমরা ইতিপূর্ব্বে বাঁশের প্রচুর ব্যবহারের আবশ্যকতা ও অন্তরায় দেখাইয়াছি। আমাদের মতে, শিল্পকার্য্যে বাঁশ প্রচুররূপে ব্যবহৃত হইলে, স্বচ্ছন্দবনজাত একটী বৃক্ষে আমাদের (১) ধনাগমও হইবে, (২) ধ্বংসোন্মুখ একটী শিল্পের উন্নতিতে (বলা বাহুল্য, এরূপ উন্নতি কল্পনার বিষয় নহে।) অনেকের জীবিকার পথও প্রশস্ত হইবে। আমাদের কারিকর অশিক্ষিত বলিয়া, বৈদেশিক আদর্শের সমাক অনুকরণও তাহাদের ক্ষমতাতীত—ধারণাতীত। সুতরাং, তাহাদের প্রকৃত শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বংশক্ষেত্রে প্রস্তুত এবং প্রশস্তকালে বংশ-কর্ত্তন —এই ত্রিবিধ উপায়ে, আমরা বাঁশের কাজে এদেশটাকে জাপান না গড়িতে পারিলেও, অন্ততঃ আমাদের বাবুমহলে চেয়ার, টেবিল এবং বিদেশে "পেপার পাল্প্" যোগাইতে পারিব, সন্দেহ নাই। আমাদের কারিকরেরা জাপানী কারিকরের তত্ত্বাবধানে ও শিক্ষাধীনে প্রথমতঃ "হাতেখড়ি" বা বাল্যশিক্ষা না পাইলে, অন্য উপায়ে তাহাদিগকে শিক্ষিত করিবার প্রয়াস সর্ব্বথাই বৃথা। এ দেশের ধ্বংসোন্মুখ বংশশিল্পের উৎকর্ষসাধনোদ্দেশ্যে, কোনও শিক্ষিত যুবক যদি জাপান হইতে বংশশিল্প শিক্ষা করিয়া আসিতে এবং দেশের অশিক্ষিত কারিকরদিগকে জাপানী প্রণালী শিক্ষা দিতে পারেন, তাহা হইলেই বংশশিল্পের যথোচিত উন্নতি সাধিত হইতে পারিবে।

কাগজের মণ্ড (paper pulp)

কাগজের ব্যবসায় সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ সুপ্রসিদ্ধ মিঃ সিণ্ডাল (Mr W. Sindall F. C. S) ব্রহ্মদেশের বাঁশে কাগজ প্রস্তুত করিয়া, সেই কাগজে একখানা পুথি লিখিয়াছেন। ব্রহ্ম-গভর্ণমেণ্ট প্রায় ৯ টন বাছা বাছা বাঁশ তাঁহার নিকট বিলাতে পাঠাইয়া ছিলেন; সেই বাঁশের মণ্ডেই কাগজ ও সেই কাগজেই তাঁহার পুস্তিকা মুদ্রিত হইয়াছে।

বায়ুশুষ্ক বৃহৎ বংশ হইতে গড়ে ১০০ ভাগের ৪৫ ভাগ শুষ্ক শাঁস পাওয়া যায়। একটী কলে সাপ্তাহিক ৩০০ টন শুষ্ক শাঁস প্রস্তুত করিতে বাৎসরিক ৩৫।৩৬ হাজার টন বাঁশের প্রয়োজন। এক টন বায়ুশুষ্ক বাঁশের মূল্য সাধারণতঃ ১২ শিলিং ৩ পেন্স। কর্ত্তিত বাঁশের মূলভাগ যে পরিমাণে রক্ষিত হইবে, দরের সুলভতাও সেই পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। এরূপভাবে এক টন শাঁস প্রস্তুত করিতে যে বাঁশের প্রয়োজন হইবে, তাহার মূল্য ১ পাঃ ১০ শিলিং ধরিলেও লাভ যথেষ্টই হইবে। উৎকৃষ্ট ও মসৃণ কাগজের সহিত তুলনাতেও, বাঁশের মণ্ডে প্রস্তুত কাগজ নিকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, বাঁশের মণ্ডে প্রস্তুত কাগজ গ্রন্থমুদ্রণের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী। ইহা অত্যন্ত স্থায়ী—নাড়াচাড়াতেও সহজে নষ্ট হয় না। ইহা অতি সহজে পরিষ্কৃত ও নির্ম্মল করাও যাইতে পারে; ইহাই সিণ্ডাল সাহেবের অভিমত।

পাল্প্ প্রস্তুতোপযোগী বাঁশ।

কোন কোন জাতীয় বাঁশের পাল্প্ বা মণ্ড কাগজ প্রস্তুতের পক্ষে উপযোগী, তাহা আজিও পরীক্ষিত হয় নাই। সুতরাং, তদ্বিষয়ে জোর করিয়া কোনও কথা বলা যায় না। আমাদের মতে, নরম বাঁশমাত্রেরই পাল্প্ প্রস্তুত হইতে পারে। আমাদের সদাশয় গভর্ণমেণ্ট যদি বিশেষজ্ঞের দ্বারা নানা জাতীয় বাঁশের পাল্প্ প্রস্তুত করাইয়া, তাহার ফলাফল পরীক্ষা করিতে এবং পরীক্ষার ফল সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে পারেন, তাহা হইলে এদেশে একটী লাভজনক ব্যবসায়ের সূত্রপাত হইতে পারে।

পূর্ব্ববঙ্গে বাঁশের চাষ।

বেশী দিনের কথা নহে—১৪।২০ বৎসর পূর্ব্বেও, পূর্ব্ব-বঙ্গে যে পরিমাণ জমিতে বাঁশ জন্মিত, আজকাল তাহার অর্দ্ধাংশ জমিতেও বাঁশের ঝোপ দৃষ্ট হয় না। ফলে, বাঁশ ক্রমশঃই দুর্ম্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। এক্ষণ ভাল

বাঁশ টাকায় দুইটীর অধিক পাওয়া যায় না। যতপ্রকার আয়কর বৃক্ষ আছে, তন্মধ্যে বাঁশের নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাঁশের চাষ বিশেষ লাভজনক। কিন্তু তথাপি, এ প্রদেশের কৃষকদিগের বাঁশের চাষের প্রতি আদৌ দৃষ্টি নাই।

বাঁশের চাষে ব্যয়ের পরিমাণ অতি অল্প বা নামমাত্র সত্য, কিন্তু উহা বিক্রয় করিয়া অর্থলাভ করিতে হইলে ২।৩ বৎসর অপেক্ষা করিতে হয়। এ দেশের নিঃস্ব কৃষক ফলের আশায় এতকাল অপেক্ষা করিয়া 'সবুরে মেওয়া ফলাইতে' পারে না। এই জন্যই তাহারা বাঁশের ঝোপ ভাঙ্গিয়া পাটক্ষেতে পরিণত করিতেছে। বাঁশের চাষে জমির পরিমাণের হ্রাস ঘটিবার ইহাই মুখ্যকারণ।

বৈশাখ হইতে আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত বাঁশের পত্র-মুকুল জন্মে। এই সময়েই বাঁশ রোপণ করা হয়। সাধারণতঃ বৈশাখমাসই বাঁশের 'মোথা' (মূল) রোপণের পক্ষে প্রশস্ত-কাল বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। বৈশাখমাসে বৃষ্টিপাত হইয়া মৃত্তিকা সরস হইলে পরই, বাঁশের মোথা তদুপরিস্থ প্রাণ্ডটী 'পাপ্' (গ্রন্থি) সহ উঠাইয়া নির্দ্দিষ্টস্থানে রোপণ করা হয়। সাধারণতঃ জমির উত্তরদিকেই বাঁশ লাগাইবার প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে। মোথার সম্পূর্ণ অংশ মাটীর নীচে রোপণ করা আবশ্যক বলিয়া, নির্দ্দিষ্ট স্থানের ৩।৪ হাত ব্যবধানে তিন পোয়া বা একহাত গভীর এক একটী গর্ত্ত করা হয়। বাঁশের চাষে ভূমিকর্ষণের বড় আবশ্যক হয় না। তবে নির্দ্দিষ্ট স্থানে গর্ত্ত করিবার পূর্ব্বেই, সমুদয় স্থানের তৃণ-জঙ্গলাদি উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। কেহ কেহ জঙ্গলাদি পরিষ্কার করিয়া ফেলিয়া, কোদাল দ্বারা নির্দ্দিষ্ট স্থান কোবাইয়া থাকে। ৩।৪ হাত ব্যবধানে মোথার সহিত বাঁশের ৩।৪ হাত অংশ রোপণ করিলে, ২।৩ বৎসরমধ্যেই সমুদয় স্থান বাঁশের ঝাড়ে পূর্ণ হইয়া যায়। মূলীবাঁশ, অন্যান্য সকলপ্রকার বাঁশ অপেক্ষা শীঘ্র শীঘ্র ঝাড় বাঁধিয়া উঠে। ২।৩ বৎসরের পুরাতন বাঁশেরই নিম্নাংশ মোথার সহিত রোপণ করা হয়। নূতন বা কচি বাঁশের মোথা লাগাইলে প্রায়ই গাছ বাঁচে না।

বাঁশগাছ রোপণ করিবার পর, উহার আর কোনরূপ যত্ন অথবা পাইট করা হয় না। তবে সময় সময় জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া দেওয়া হয়। বাঁশগাছের গোড়ায় 'পুখী' (ফেক্‌ড়ী) মেলিয়া ঝাড় বাঁধিয়া উঠিলে, প্রত্যেক গাছের গোড়ায় খড়, কুটা ইত্যাদি আবর্জ্জনা-সাররূপে দেওয়ার প্রথা আছে। বর্ষার জলে আবর্জ্জনাগুলি পচিয়া গিয়া সারের কার্য্য করে। এই সার গোড়ায় পড়িলে, বাঁশগাছ খুব শীঘ্র শীঘ্র বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

বাঁশ খুব ঘন হইলে, ঝোপের মধ্যে অন্যূন অর্দ্ধহস্ত ব্যবধানে এক একটী বাঁশ রাখিয়া, অবশিষ্ট বাঁশগাছগুলি কাটিয়া ফেলা হয়। কারণ, অত্যন্ত ঘন হইয়া জন্মিলে বাঁশগাছ যথোচিত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না। অধিকন্তু, গাছে নানারূপ কীটেরও উপদ্রব ঘটিতে দেখা যায়। ছোট থাকিতেই যেসকল বাঁশগাছের মাথা ভাঙ্গিয়া যায়, সেই সকল মাথাভাঙ্গা বাঁশগাছ (১) যথোচিত বর্দ্ধিত ও পরিপক্ক হয় না; এবং (২) মাথাভাঙ্গা বাঁশগাছ ঊর্দ্ধদিকে বর্দ্ধিত হয় না বলিয়া, উহার কঞ্চীর সংখ্যা অত্যধিক হয়—প্রধানতঃ এই দুইটী কারণে, উহা ঝোপে রাখা হয় না। কোনও গাছে কঞ্চীর সংখ্যা অত্যধিক হইলে, তাহাতে তৎপার্শ্বস্থিত অন্যান্য গাছের বৃদ্ধির পক্ষে ব্যাঘাত ঘটে।

পুরাতন বাঁশঝোপে সার দেওয়ার প্রথা সর্ব্বত্রই প্রচলিত রহিয়াছে। চৈত্রমাসে বংশতলনিপতিত শুষ্ক বংশপত্রে অগ্নিপ্রদান করা হয়; ইহাতে যে ভস্ম জন্মে, তাহা বাঁশের পক্ষে সারের কাজ করে। তৎপর, বাঁশের গোড়ায় নূতন মাটীও (পুষ্করিণী, খাল, ডোবা প্রভৃতি জলাশয়ের নিম্নে সঞ্চিত পলিপড়া মাটী) তুলিয়া দেওয়া হয়। বর্ষাকালে বাঁশের ঝাড় বিক্রয় করিবার প্রথা প্রায় সর্ব্বত্রই প্রচলিত রহিয়াছে।

বাঁশের চাষ বিশেষ লাভজনক। এক বিঘা জমিতে বাঁশের চাষ করিলে, ৩।৪ বৎসরের মধ্যে অন্যূন ৩।৪ শত টাকা প্রাপ্ত হওয়া যায়; অর্থাৎ বাঁশের চাষে ব্যয় বাদে (ব্যয় নামমাত্র) বার্ষিক প্রতিবিঘায় অন্ততঃ একশত টাকা লাভ দাঁড়াইয়া থাকে। পূর্ব্ববঙ্গের কুত্রাপিও ইহা অপেক্ষা কম লাভ হয় না। তবে লাভের টাকা গণনা

করিতে হইলে, অন্ততঃ তিনটী বৎসর প্রতিক্ষা করিতে হইবে। এক বিঘা বলিলে ৮০ হাত দীর্ঘ এবং ৮০ হাত প্রস্থ স্থান না বুঝিয়া, ১০।১৫ হাত প্রস্থ স্থান যতটা দীর্ঘ হইলে একবিঘা হয়, তাহাই বুঝিতে হইবে। কারণ, ক্ষেত্রের সকল স্থানেই বাঁশের ঝাড় থাকে না; লম্বালম্বিভাবেই বাঁশের চাষ করা হয়।

বাঁশের চাষে খনা।

বাঁশের চাষে কিরূপ সার ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, কৃষি-তত্ত্বে পারদর্শিনী বিদুষী খনা কেবল তৎসম্বন্ধেই মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। নিম্নে কতিপয় খনার বচন প্রদত্ত হইল।

"ফাল্গুনে আগুণ চৈতে মাটি।
বাঁশ ছেড়ে বাঁশের পিতামহ কাটি॥"

ফাল্গুনমাসে বাঁশের শুষ্কপত্রসমূহ পোড়াইয়া দিতে ও চৈত্রমাসে বাঁশের গোড়ায় মাটী (নূতন মাটী) দিতে হইবে। খনার এই বচনানুযায়ী পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বত্রই যে কার্য্য করা হয়, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। বাঁশের পিতামহ অর্থাৎ তিন বৎসরের পুরাতন বংশ কর্ত্তন করাই খনার মতে কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। বস্তুতঃ, তৎপূর্ব্বে কোন জাতীয় বাঁশই পরিপক্ক হয় না। অপরিপক্ক বাঁশ কাটিলে, তাহাতে সহজেই ঘুণ ধরে। অধিকন্তু, অত্যধিক পরিমাণে ঝাড় হইতে অপরিপক্ক বাঁশ কাটিলে বাঁশের বংশ নির্ব্বংশ হইয়া পড়িবারও সম্ভাবনা রহে। কারণ, অপরিপক্কাবস্থায়ই ঝাড়ের বাঁশ কাটিয়া নিলে, তাহাতে বংশবৃদ্ধিরই ব্যাঘাত ঘটে।

"শুন ওহে চাষার বেটা।
বাঁশে দিও ধানের চিটা॥
চিটা দিলে বাঁশের গোড়ে।
বিঘে ভুঁই বেড়বে ঝাড়ে॥"

বাঁশের পক্ষে ধানের চিটা অত্যুৎকৃষ্ট সার। বাঁশের গোড়ায় ধানের চিটা দিলে, বাঁশের ঝাড় অত্যধিকরূপে বিস্তৃতি লাভ করে। পূর্ব্ববঙ্গের কোনও কোনও স্থলে বাঁশের গোড়ায় ধানের চিটা দেওয়ার প্রথা রহিয়াছে সত্য; কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই সাররূপে খড়, কুটা ইত্যাদি আবর্জ্জনাই প্রদত্ত হয়।

"গোয়ে গোবর বাঁশে মাটি।
অফলা নারিকেলের শিকড় কাটি॥"

সুপারিগাছের গোড়ায় গোবর ও বাঁশের গোড়ায় মাটী দিতে হইবে। অফলন্ত নারিকেলগাছের শিকড় কাটিয়া দিলে, তাহাতে ফল ধরিবে। যে সকল ফলবানবৃক্ষ সতেজে বর্দ্ধিত হয়, সেই সকল গাছে ফলের সংখ্যা অধিক হয় না। ঐরূপ গাছের শিকড় কাটিয়া দিলে, গাছ অনেকটা নিস্তেজ হইয়া পড়ে; ফলে, উহাতে ফলের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক হয়। শুধু নারিকেল-বৃক্ষ কেন, যে সকল ফলবান বৃক্ষ যথাসময়ে ফলপ্রসূ হয় না, তাহাদেরই শিকড় কাটিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। বলা বাহুল্য, শিকড় কাটিয়া দিলেও, যাহাতে গাছটী মরিয়া না যায়, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াই গাছের শিকড় কাটিতে হইবে।

"দাতার নারিকেল বখিলের বাঁশ।
কমে না, বাড়ে বার মাস॥"

নারিকেল মধ্যে মধ্যে পাড়িলে ও বাঁশ না কাটিলে (অপরিপক্কাবস্থায়) অধিক হয়।

বংশরক্ষার উপায়।

বাঁশে সহজেই ঘুণ ধরে বলিয়া, ভারতের প্রায় সকল স্থলেই বংশরক্ষার অর্থাৎ বাঁশকে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী বা বহুকালস্থায়ী করিবার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়া থাকে। পূর্ব্ববঙ্গে দ্বিবিধ উপায়ে বংশের স্থায়ীত্ব বৃদ্ধি করিবার প্রথা আবহমানকাল হইতেই প্রচলিত রহিয়াছে। প্রথা দুইটী এই:—

(১) **পাইনট করা**—পরিপক্ক বংশ কর্ত্তন করিবার পর, উহা ক্রমাগত ২।৩ দিন পর্য্যন্ত ছায়ায় রাখিয়া দেওয়া হয়। উহাতে কর্ত্তিত বাঁশের রস কিয়ৎপরিমাণে শুষ্ক হইয়া যায়। তদবস্থায় বাঁশগুলি কোনও জলাশয়ের জলে ভিজাইয়া রাখিলেই পাইনট্ করা

হয়। বাঁশগুলি জলে ভিজাইবার পূর্ব্বে, উহাতে গোবর মাখিয়া ও ভালরূপে শুষ্ক করিয়া লইতে পারিলে, সুদীর্ঘ-কালেও যে বাঁশে ঘুণ ধরে না, ইহা আমাদের বিশেষ পরীক্ষিত। ৩।৪ সপ্তাহ পাইনট করিলেই বাঁশগুলি ব্যবহার-উপযোগী হইয়া থাকে। তবে যত অধিক সময় পাইনট করা যায়, ততই উহার স্থায়ীত্বের পরিমাণ অধিক হয়। পক্ষান্তরে, ২।৩ মাসের অধিক কাল জলে ভিজিলে বাঁশের আঁশ এতই নরম হইয়া যায় যে, তাহাতে ঘুণে না ধরিলেও, বাঁশ একরূপ অকর্ম্মণ্যই হইয়া পড়ে। 'নূতন জলে' (বর্ষা-কালের বৃষ্টির জল) অধিক দিন বাঁশ পাইনট করা অনুচিত। পাইনট করিবার সময় বাঁশগুলি জলে ভাসিয়া রহে বলিয়া, তদুপরি ভারী কাষ্ঠের অথবা মৃত্তিকার চাপ দেওয়া আবশ্যক। নতুবা, বাঁশের যে অংশ জলের উপর রহে, উহা রৌদ্রের তাপে শুষ্ক ও ভঙ্গপ্রবণ হইয়া পড়ে। সুপক্ক বাঁশ উত্তমরূপে পাইনট করিয়া লইলে, তাহাতে কখনও ঘুণে ধরে না।

(২) সেক দেওয়া—পরিপক্ক বাঁশ কাটিয়া আনিয়া, তাহা সেক দিয়া শুষ্ক করিয়া লইতে পারিলেও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। বাঁশের কঞ্চী ফেলিয়া দিয়া, তন্নিম্নে খড়-কুটা ও গাছের শুষ্কপাতা প্রভৃতি আলিয়া দিতে হয়। এইরূপ মৃদু অগ্নির তাপে বাঁশের উপরিভাগ ঝলসিয়া যায় না; অথচ, উহাতে বাঁশের রস বা জলীয়াংশ শুষ্ক হইয়া যায়। তাপপ্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে, যাহাতে বাঁশে অত্যধিকরূপে ধূম লাগিতে পারে, তৎপ্রতিও বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। পাইনট করা বাঁশের ন্যায়, সেক দেওয়া বাঁশ সুদীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না সত্য, কিন্তু উহাতেও সহজে ঘুণ ধরিতে পারে না।

ঘুণ-প্রতিষেধক আর একটী উপায়।

কীটতত্ত্ববিদ ষ্টেবিং (Mr. E. P. Stebbing) সাহেব (কৃষি-বিভাগের) বলেন—"বাঁশ কাটিয়া পাঁচ দিন পর্য্যন্ত জলে ভিজাইতে এবং বাঁশগুলি জল হইতে উঠাইয়া ঘরে কিম্বা কোনও আবৃত স্থানে রাখিয়া শুকাইতে হইবে। শুষ্ক বাঁশগুলিকে পুনরায় ৪৮ ঘণ্টা ক্রুড্ কেরোসিন তৈলে (অসংস্কৃত খনিজ পাথুরে কয়লার তৈল। এই তৈল হইতেই প্রণালীবিশেষের সাহায্যে কেরোসিন তৈল প্রস্তুত হয়। কেরোসিন তৈল অপেক্ষাও এই তৈল সস্তা।) ভিজাইয়া রাখিলেই বংশপ্রস্তুতের কার্য্য শেষ হয়। এই প্রণালীতে বাঁশ প্রস্তুত করিয়া লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, তাহাতে দুইবৎসরেও ঘুণে ধরে নাই।" উক্ত ষ্টেবিং সাহেবের হিসাবে, ১২ ফুট বা ৮ হাত দৈর্ঘ্য একখণ্ড বাঁশ প্রস্তুত করিতে, এক আনা খরচই যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। তির্ব্বত-অভিযানের সময়, মাঠের মধ্যে এইরূপ বাঁশের খুটী পুতিয়া টেলিগ্রাফের তার বসান হইয়াছিল। ঐ সকল খুটীতে দুইবৎসরেও ঘুণে ধরে নাই।

বাঁশের ঘুণ।

বাঁশে ঘুণ না ধরিলে, গৃহকার্য্যে ও গৃহসজ্জায়, প্রধানতঃ বাঁশের উপর নির্ভর করিলেই চলিত। কিন্তু বাঁশে ঘুণ ধরে বলিয়াই, তাহা হয় না। ঘুণ স্থূলদৃষ্টির অগোচর নিতান্ত ক্ষুদ্রাকৃতিবিশিষ্ট বিটেল-জাতীয় অর্থাৎ কঠিন পক্ষ-বিশিষ্ট পতঙ্গ। ইহার ইংরেজি নাম 'shot borer'। ঘুণের আকৃতি অত্যন্ত ক্ষুদ্র হইলেও, বংশবৃদ্ধির প্রাচুর্য্যহেতু, ইহাদের কার্য্যশক্তি বড় কম নহে। এই জন্যই বাঁশ অথবা কাঠে একবার ঘুণ ধরিলে, অত্যল্পসময়ের মধ্যেই উহা অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়ে। স্ত্রী-পতঙ্গ ছোট একটী গর্ত্ত করিয়া, বাঁশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে ও সেখানে ডিম পাড়ে। কএকদিনের মধ্যেই ডিমগুলি হইতে অতি ক্ষুদ্র ঈষৎ গোলাকার পলু (কীড়া) বাহির হয়। কীট জন্মিয়াই বাঁশের অভ্যন্তরে সুরঙ্গ করিয়া খাইতে থাকে ও উহার শাঁস গুড়া করিয়া ফেলে। উক্ত পলুসমূহ চারিসপ্তাহের মধ্যেই পুত্তলী আকারে পরিণত হয়। এই পুত্তলী হইতেই, কএকদিনের মধ্যে, পূর্ণাবয়বপ্রাপ্ত ঘুণ-পতঙ্গের সৃষ্টি হইয়া থাকে। পতঙ্গাবস্থা প্রাপ্ত হইলেই, উহারা বাহির হইয়া পড়ে ও চারিদিকে উড়িয়া উড়িয়া আশ্রয়ের সন্ধান লয়। এইরূপেই ইহারা একস্থান হইতে অন্যস্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়ে।

ঘুণ-পতঙ্গের বংশবৃদ্ধির কথা শুনিলে অবাক্ হইতে হয়। ভারততবর্ষের উষ্ণপ্রধান সমতল-দেশে চৈত্র হইতে আশ্বিন—এই সাতমাসের মধ্যে, এই পোকার অন্ততঃ পাঁচবার বংশবৃদ্ধি হইয়া থাকে। একটী মাত্র স্ত্রী-পতঙ্গ প্রথমবারে যদি ২০টী ডিম পাড়ে এবং তাহার অর্দ্ধাংশও যদি স্ত্রী-পতঙ্গ হয়, তাহা হইলেও, উক্ত দশটী স্ত্রী-পতঙ্গ হইতে, দ্বিতীয়-পুরুষে ১০×২০=২০০ শত ডিম হইবে। এই হিসাবে, পঞ্চম-পুরুষে এক লক্ষ পুং-পতঙ্গ ও এক লক্ষ স্ত্রী-পতঙ্গ জন্মিতে পারে। আর যদি শীতকালের পূর্ব্বে ৬ষ্ঠ-পুরুষ পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে, তাহা হইলে, একটী পতঙ্গ হইতেই ৬ষ্ঠ-পুরুষে, উহার সন্ততির সংখ্যা ২০ লক্ষ হইয়া পড়িবে। ইহা দ্বারাই ঘুণের বংশবৃদ্ধির সত্বরতা ও প্রাচুর্য্যতার বিষয় সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবে।

নানা কথা।

ইক্ষুগাছ সুপক্ক হইলে, তাহাতে যেমন ফুল ধরে, পুরাতন বাঁশেও তদ্রূপ কখনও কখনও ফুল ধরিতে দেখা যায়। ইক্ষু-ফুলের ন্যায়, বাঁশের ফুল হইতেও ফল এবং ফলে বীজ জন্মে। বাঁশের বীজ দ্বারা গাছ উৎপন্ন করিবার চেষ্টা পৃথিবীর কোনও স্থানে করা হইয়াছে কিনা, তাহা জানা যায় না। পক্ষান্তরে, ইক্ষুর বীজ হইতে কোনও কোনও স্থলে চারা প্রস্তুত করা হইতেছে। বাঁশগাছে ফুল জন্মিলেই দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়—ইহাই এদেশবাসীর দৃঢ় বিশ্বাস।

বাঁশের পর্ব্বের অভ্যন্তরে শ্বেতবর্ণের এক প্রকার গুড়া পাওয়া যায়; ইহাই সর্ব্বজনবিদিত বংশলোচন বা বংশ-শর্করা। বংশলোচন মূল্যবান ঔষধরূপে কবিরাজি দ্বতা-দিতে ব্যবহৃত হয়।

বংশপত্র পশুখাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা অতিশয় গুরুপাক বলিয়া, খাদ্যের অভাব না হইলে, গবাদি গৃহপালিত পশুকে বাঁশপাতা খাইতে দেওয়া হয় না। বাঁশপাতা জলে সিদ্ধ করিয়া, সেই জল খাওয়াইলে গাভীর দুগ্ধের পরিমাণ কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত হয়। শুধু বাঁশ-পাতা সিদ্ধ জল না দিয়া, তাহার সহিত জোয়ান আধ ছটাক ও অন্যূনপরিমাণ ইক্ষুগুড় মিশাইয়া দিতে পারিলে সুফল লাভ সুনিশ্চিত।

শ্রীপরেশনাথ বসু এম্, এস্ সি।

আঁশপ্রদ-উদ্ভিদ্।

পাট—Jute.

[বিগত ১৯১৪—১৫ খৃঃ অব্দে, সমগ্র বাঙ্গালায় প্রায় ২৮৭২৯০০ একার (এক একার=কিঞ্চিদধিক তিন বিঘা) জমিতে পাট উৎপন্ন হইয়াছে। চাষী-জমির পরিমাণ ধরিয়া হিসাব করিলে, ধানের পরই পাটের নাম উল্লেখ করিতে হয়। ইহার শতকরা প্রায় ৮৪ ভাগ পাটই পূর্ব্ববঙ্গে জন্মে। সুতরাং কড়াক্রান্তির হিসাবে, মূল্য ও চাষী-জমির পরিমাণ ধরিয়া হিসাব করিলে, অর্থনীতির দোহাই দিয়া বলিতে পারা যায়—পাটই পূর্ব্ববাঙ্গালার সর্ব্বপ্রধান শস্য-সম্পদ্। প্রবোধবাবুর "বাঙ্গালার সম্পদ—পাট" ও "পাট ও লাল মাকড়সা" প্রভৃতি প্রবন্ধে এবং নানা কৃষি-প্রসঙ্গে, বহু-বারই পাটের কথা "কৃষি-সম্পদে" আলোচিত হইয়াছে। তথাপি, কৃষি-সম্পদের বহুসংখ্যক গ্রাহক—বিশেষতঃ কএকজন সুপ্রসিদ্ধ পাট-ব্যবসায়ী, পাটসম্পর্কে এরূপ সাময়িক কৃষি-কথায় তৃপ্ত হইতে পারেন নাই। তাঁহাদের মতে, "কৃষকসমাজের মুখপত্র "কৃষি-সম্পদ"-পত্রে পাটের চাষসম্পর্কে প্রতিসংখ্যাতেই কিছু-না-কিছু প্রকাশিত হওয়া কর্ত্তব্য।" আমরা তাঁহাদের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলাম না। অতঃপর, পাটের চাষ ও পাটের ব্যবসায় সম্পর্কে, কৃষি-সম্পদে ধারাবাহিকরূপে, ক্রমে ক্রমে সকল কথাই যথাসম্ভব লিখিত হইবে। ইহা কৃষক ও পাট-ব্যবসায়ীদিগের কাজে লাগিলেই, আমরা কৃতার্থ হইব।

পাটের চাষে শেষগণনা (Final jute Forecast), বিশেষজ্ঞের গবেষণার ফল প্রভৃতি উচ্চাঙ্গের পাট-কৃষির কথার সারমর্ম্ম বা মর্ম্মানুবাদ প্রদত্ত হইবে। কোন কোন সময়, আলোচ্যবিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনায়, মূল-ইংরেজীও উদ্ধৃত করা হইবে। কৃঃ সঃ সঃ]

চাষী-জমি।

(সরকারী সংবাদ)

বিগত:১৯১৪—১৫ খৃঃ অব্দে, বাঙ্গালার কোন কোন জিলায় কি পরিমাণ ভূমিতে পাটের চাষ করা হইয়াছে, সরকারী কৃষিগণনা-পুস্তিকায় (Agricultural Statistics of Bengal) তাহা প্রদত্ত হইয়াছে। এস্থলে, সাধারণের অবগতির নিমিত্ত, আমরা তাহাই উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। প্রথমতঃ জিলার নাম, এবং তৎপার্শ্বেই চাষী-জমির পরিমাণ প্রদত্ত হইল। চাষী-জমির পরিমাণ সর্ব্বত্রই একার (এক একার=৩⅓ বা কিঞ্চিদধিক তিন বিঘা) হিসাবে দেওয়া হইয়াছে।

ঢাকা-বিভাগ—

ঢাকা—২৯৩১০০ ; ময়মনসিংহ—৫৮৭৬০০ ; বাখরগঞ্জ—৬২০০০ এবং ফরিদপুর—২৪১১০০ একার।

রাজসাহী-বিভাগ—

দিনাজপুর—৯২০০০ ; রঙ্গপুর—২৯৬০০০ ; জলপাইগুড়ী—৬১৫০০ ; মালদহ—৪০০০০ ; বগুড়া—৮৫০০০ ; পাবনা—১৫৬০০০ ; রাজসাহী—১২১৫০০ এবং দার্জ্জিলিং—৩৫০০ একার।

চট্টগ্রাম-বিভাগ—

চট্টগ্রাম—২০০ ; ত্রিপুরা—২৯৬৩০০ এবং নোয়াখালী—৬৯৫০০ একার।

প্রেসিডেন্সি-বিভাগ—

চব্বিশ-পরগণা—৮৭৮০০ ; নদীয়া—৯৩৫০০ ; মুর্শিদাবাদ—৩৭৮০০ ; যশোহর—১২৫৩০০ এবং খুলনা—৩২০০০ একার।

বর্দ্ধমান-বিভাগ—

বর্দ্ধমান—১২০০০ ; বীরভূম—০ ; বাঁকুড়া—০ ; মেদিনীপুর—১৫০০০ ; হুগলী—৪৩৯০০ এবং হাওড়া—২০৮০০ একার।

পাটের চাষে মোট জমির পরিমাণ ২৮৭২৬০০ একার বা ৮৮৯৬১৫ বিঘা।"

বিগত ১৯১২—১৩ খৃঃ অব্দে, পাটের চাষে মোট জমির পরিমাণ ছিল—প্রায় ৯০ লক্ষ বিঘা। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, আলোচ্যবৎসরে পাটের চাষে জমির পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস, ইউরোপীয় বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের ফলেই এরূপ ঘটিয়াছে।

আলোচ্য বৎসরে (১৯১৪—১৫ খৃঃ অব্দে) প্রেসিডেন্সী-বিভাগ ও বর্দ্ধমান-বিভাগে মোট ৪৬৮১০০ একারে পাটের চাষ করা হইয়াছে। পশ্চাত্তরে, এই বৎসর ঢাকা-বিভাগের একমাত্র ময়মনসিংহ জিলাতেই ৫৮৭৬০০ একার জমিতে পাট জন্মিয়াছে। সুতরাং, পশ্চিমবঙ্গে অর্থাৎ প্রেসিডেন্সী-বিভাগ এবং বর্দ্ধমান-বিভাগে মোট যে পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ করা হইয়াছিল, একমাত্র ময়মনসিংহ জিলাতেও তদপেক্ষা ১১৯৫০০ একার অধিক জমিতে পাট জন্মিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গে পাটের চাষ কিরূপভাবে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে, ইহা তাহারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

বাঙ্গালায় ধান ও পাট।

চাষীজমির পরিমাণ তুলনা—১৯১৪-১৫ খৃঃ অব্দ।

বাঙ্গালায় ২৯, ৬৩৯, ৬০০ একার জমিতে নানাবিধ শস্য জন্মে। তন্মধ্যে, ধানের জমির পরিমাণ ২০, ৪৪৯, ৯০০ একার ; এবং পাটের চাষে রহিয়াছে, ২, ৮৭২, ৬০০ একার। সুতরাং শতকরা হিসাবে, বাঙ্গালার সমগ্র চাষী-জমির প্রায় ৭০ ভাগ ভূমিতে ধান এবং প্রায় দশভাগ ভূমিতে পাটের চাষ করা হইয়া থাকে।

পাটের কড়ি।

কৃষি-বিভাগের ডিপুটী ডিরেক্টার মিঃ স্মিথের নির্দ্দেশমতে, পাটে বাঙ্গালী কৃষকের বাৎসরিক আয় প্রায় ৩৬ কোটী টাকা। তিনি প্রতিবিঘায় উৎপন্ন পাটের পরিমাণ ধরিয়াছেন—৫/০ মণ এবং মণ হিসাবে পাটের মূল্য ধরিয়াছেন—৮৲ টাকা। ১৯১৩—১৪ খৃঃ অব্দে, সমগ্র বঙ্গে ৯০ লক্ষ বিঘায় পাট হইয়াছিল ; কিন্তু আলোচ্যবর্ষে পাটের চাষে ভূমির পরিমাণ ও তদনুযায়ী উৎপন্নের পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। ফলে, পাটের চাষে আয়ের পরিমাণও কমিয়া গিয়াছে। সুতরাং মিঃ স্মিথের নির্দ্দেশানুযায়ী বিঘাপ্রতি

৫/ মণ পাট এবং উহার মূল্য গড়ে ৮৲ টাকা ধরিয়া হিসাব করিলেও, এক্ষণ পাটের চাষে আয় দাঁড়ায়—৩৪৭৮৪০০৲ টাকা। খরচ বাদে প্রতিবিঘার কত নিট লাভ দাঁড়ায়, মিঃ স্মিথ তাহা নির্দ্দেশ করেন নাই। ধান ও পাটের চাষে আয়-ব্যয়ের তুলনা করিয়া দেখিলে, অর্থনীতির হিসাবে, কোন শস্যের চাষ কৃষকের পক্ষে অধিকতর লাভজনক, তাহা বুঝা যাইত।

উন্নতির উপায়।

বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগের ডিপুটী ডিরেক্টার মিঃ স্মিথ Mr. F. Smith) বলিয়াছেন,—"বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পাটচাষ করিলে, ইহার উৎপন্নের পরিমাণ শতকরা ৭০ গুণ বৃদ্ধি পাইতে পারে।" বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কি প্রকারে পাটের চাষ করিলে উৎপন্ন বৃদ্ধি পায়, মিঃ স্মিথ তাহার বিশেষ কোনও উপায় নির্দ্দেশ করেন নাই। বৈজ্ঞানিক প্রণালী বহু ব্যয়সাধ্য হইলে, এ দেশের নিঃস্ব কৃষকের পক্ষে তাহা গ্রহণীয় নাও হইতে পারে। সুতরাং সাধারণ কৃষকের গ্রহণোপযোগী কি কি বৈজ্ঞানিক প্রণালী পাটের চাষে প্রবর্ত্তিত হইতে পারে, দেশের সকলেরই তাহা ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য। কারণ, অল্পাধিক পরিমাণে দেশের সকলেরই পাটের চাষে স্বার্থ রহিয়াছে।

কৃষি-বিভাগের তন্তুবিদ বিশেষজ্ঞ কর্ম্মচারী মিঃ ফিন্‌লো (Mr. R. S. Finlow) পাটের চাষে কতিপয় বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করিতেছেন। তাঁহার গবেষণা বা পরীক্ষার ফল এখনও কৃষক-সমাজের কাজে লাগে নাই। পাটের চাষে, এ দেশের কৃষকেরা এখনও "যথাপূর্ব্বম্, তথাপরম্।" তথাপি, পাটের চাষে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা প্রকৃতই সুফলপ্রসূ হইলে, সাধারণ কৃষকও তাহা ক্রমে ক্রমে অবলম্বন করিবে, আমাদের এ ভরসা আছে।

বীজের দোষেই প্রধানতঃ পাটের চাষে ক্রমাবনতি ঘটিতেছে ; ইহা কৃষকদিগেরও অজ্ঞাত নহে। কিন্তু তথাপি, সুবীজ সংগ্রহের প্রতি তাহাদের বিশেষ দৃষ্টি আজিও আকৃষ্ট হয় নাই। কি প্রণালী অবলম্বনে সুবীজ সংগ্রহ করিতে হয়, তাহা অনেক কৃষকই জানে না। ক্ষেত্রের যে স্থানে ভাল পাট জন্মে নাই, যে স্থানের কীটদষ্ট পাট যথোচিত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় নাই, নিঃস্ব কৃষক সাধারণতঃ সেই স্থানের পাটের বীজই সংগ্রহ ও বপন করে। ইহার ফল কিরূপ হইতেছে, তাহা আর কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। কৃষি-বিভাগের দৃষ্টি এদিকে ইতঃপূর্ব্বে আকৃষ্ট হইয়াছে। কলিকাতার কোন কোন 'জুট ফার্ম্ম' (Jute Firms) মফঃস্বলের কতিপয় স্থানের রায়তদিগের মধ্যে কৃষি বিভাগের পাটের বীজ পরীক্ষার্থ প্রদান করিয়াছিলেন। সেই বীজে কৃষকেরা উৎকৃষ্ট পাট জন্মাইয়াছে। মিঃ ফিন্‌লো তাঁহার রিপোর্টে ইহা উল্লেখ করিয়াছেন। নিম্নে তাঁহার উক্তি উদ্ধৃত করা হইল। মিঃ ফিন্‌লো লিখিয়াছেন—

"In last year's report the suggestion was made that the mufassal agencies of the Calcutta jute firms might be able to render great assistance to the Agricultural Department in testing and introducing improvements in the cultivation of jute in their respective districts. Messrs. Sinclair Murray & Co. have, through Mr. Luke, made a commencement in this direction at Naraingunge in the present season by growing a fine crop of jute from departmental seed as a demonstration."

ইহার মর্ম্মানুবাদ এইরূপ—

"গত বার্ষিক কার্য্য-বিবরণীতে প্রস্তাব করা হইয়াছিল যে, কলিকাতাস্থ ভিন্ন ভিন্ন 'জুট ফার্ম্মের' মফঃস্বল এজেন্সী সকল আপন আপন এলাকার মধ্যে পাটের চাষে উন্নত কৃষি-পদ্ধতি পরীক্ষা ও প্রবর্ত্তন করিয়া, কৃষি-বিভাগের কার্য্যে যথেষ্ট আনুকূল্য করিতে পারে। মেসার্স সিনক্লেয়ার কোম্পানী মিঃ লিউকের মধ্যবর্ত্তিতায় নারায়ণগঞ্জে, বর্ত্তমান পাটের বীজ (১৯১৪—১৫ খৃঃ অব্দে), এই কার্য্যের সূত্রপাত করিয়াছেন। পরীক্ষার্থ উক্ত কোম্পানী এবার কৃষিবিভাগের বীজে ভাল পাট উৎপাদন করাইয়াছেন।"

মেসার্স সাটী এণ্ড ব্লাণ্ট (Messrs. Suttie and Blount) নারায়ণগঞ্জের বাহিরে মফঃস্বলের অন্যত্রও

রায়তদিগকে সুবীজ পাইবার সুযোগ-সুবিধা করিয়া দিয়াছেন।

একমাত্র সুবীজ-নির্ব্বাচনেই পাটের চাষে সুফল লাভ হইয়াছে। অন্যান্য বিষয়ে—যথা, সারব্যবহার, ফস্ফেট-ব্যবহারে পাটের ওজন বৃদ্ধি প্রভৃতি বিষয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, এতদপেক্ষা অধিকতর সুফল লাভের আশাই করা যায়।

এস্থলে আরও একটী কথাও উল্লেখযোগ্য। পাট না জন্মিলে, আজকাল কৃষকেরা জমিদারের খাজনা দিতে পারে না। সুতরাং, পাটের চাষে জমিদারেরও একটা গৌণ স্বার্থ রহিয়াছে। ব্যবসায়ি-সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া, এদেশের জমিদার-সম্প্রদায় কি কৃষক-প্রজাকে সুবীজ, সার প্রভৃতি প্রদান করিতে পারেন না? এবিষয়ে আমাদের দেশের সকল জমিদার সভারই (Land-holders' Associations) বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

ইতঃপূর্ব্বে মিঃ ফিন্‌লোর রিপোর্টের কথা উল্লিখিত হইয়াছে *। মিঃ ফিন্‌লো ইহাতে সাতটী বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। কিপ্রকারে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বনে পাট-কৃষির উন্নতিবিধান করা যাইতে পারে, ইহাতে তাহার আলোচনা রহিয়াছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক তাহা পড়িয়া দেখিবেন।

মিঃ ফিন্‌লোর আলোচ্য বিষয়গুলি এই—

(১) বাঙ্গালার অম্লাক্ত লাল মাটীতে সার-ব্যবহার (Manures for jute on the acid red soils in Bengal).

(২) ক্ষার প্রয়োগ (Application of Potash);

(৩) পাটে ফস্ফেট ব্যবহারের ফল-পরীক্ষা (Investigation of the effect of Phosphates on jute);

(৪) কৃষির উন্নতিতে সমবায়-সমিতির প্রভাব (Influence of Co-operative Credit in the development of agriculture);

(৫) বিভিন্ন জাতীয় পাট-নির্ব্বাচন (selection work on jute varieties);

(৬) মফঃস্বল জুট ফার্ম্মের সাহায্যলাভ (Assistance from Mufassal agencies of jute firms);

(৭) বেল বাঁধা পাটে দাগ লাগা (Heart damage); এবং

(৮) কচুরী (Water weeds.)

'কচুরী' সম্বন্ধে বিগত ১৩২২ সালের ফাল্গুনের সংখ্যা "কৃষি-সম্পদে" যৎকিঞ্চিৎ আলোচিত হইয়াছে। জুট ফার্ম্ম ও কৃষি-বিভাগের সহকর্ম্মিতার কথাও এস্থলে উল্লিখিত হইল। স্থানাভাবে অন্যান্য বিষয়সম্পর্কে কোন কথাই বলা হইল না। আমরা পরবর্ত্তীসংখ্যায় মিঃ ফিন্‌লোর অন্যান্য বিষয়ে গবেষণার ফল প্রকাশ করিব। পাটের চাষে কিপ্রকারে উন্নতিসাধন সম্ভবপর, তাহা দেশের কৃষি-সমিতি, শিক্ষিত-সম্প্রদায়, জমিদার-সভা এবং শিক্ষিত কৃষক-সম্প্রদায় ভাবিয়া দেখিতে পারেন। দর্শনিক হইতে একই বিষয়ের আলোচনা হইলে, মনে হয়, অদূর ভবিষ্যতেই আমরা এ বিষয়ে একটা স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিব।

শ্রীসতীশচন্দ্র সোম।

* "কৃষি-বিভাগের বিশেষজ্ঞ কর্ম্মচারী সকলের ১৯১৪—১৫ খৃঃ-অব্দের বার্ষিক কার্য্যবিবরণী" (Annual Reports of the Expert officers of the Department of Agriculture, Bengal).

ধানের পোকা ও তাহার প্রতীকার।

[শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার মজুমদার বিদ্যাভূষণ লিখিত।]

ধান্যে অনেকপ্রকার পোকারই উপদ্রব ঘটিয়া থাকে। সেই সকল পোকার অনিষ্টের প্রকৃতি, খাদ্য, জীবনী-কথা এবং প্রতিকারোপায় সম্বন্ধে, গত ১৩২২ সালের বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠের সংখ্যা "কৃষি-সম্পদে", বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগের সহকারী কীটতত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয় বহু অবশ্যজ্ঞাতব্য তথ্যই বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। সুতরাং, তৎসম্বন্ধে আমার নূতন কিছুই লিখিবার নাই। তবে, একপ্রকার বিশেষ অনিষ্টকর ধান্যকীটের উপদ্রব

হইতে আমরা যে প্রণালী অবলম্বনে ধান্যরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম, আজ "কৃষি-সম্পদে"র পাঠকদিগকে তাহাই বলিব।

হৈমন্তিক ধান্য পাকিবার প্রাক্কালে বা ধান্য পাকিয়া উঠিলেই, একপ্রকার পোকা ধান্যের ছড়া কাটিয়া দেয়। ধানের ছড়া বাহির হইলেও, কখন কখন, এই পোকার উপদ্রব ঘটিতে দেখা যায়। ইহারা ধানের অত্যন্ত ক্ষতি করিয়া থাকে। সাধারণতঃ, একক্ষেত্রে পোকার উপদ্রব ঘটিলে, ক্রমে ক্রমে সে মাঠে বা সে প্রদেশেই ইহারা বিস্তৃত হইয়া পড়ে। পোকার সংখ্যা অত্যধিক হইলে, উহারা একদিনেই বহু ক্ষেত্র নষ্ট করিয়া ফেলে। এই পোকার আকৃতি ক্ষুদ্র এবং এবং উহারা প্রায়ই কালরঙ্গের হইয়া থাকে। ইহাদের পক্ষ রহে না; ও মুখটা একটু লাল হয়। 'মেঘলা' (মেঘাচ্ছন্ন) দিনেই পোকার উপদ্রব বেশী হয়। যদি ক্রমাগত ৩।৪ দিন পর্য্যন্ত আকাশ মেঘাচ্ছন্ন রহে, অথচ বৃষ্টি না হয়, তাহা হইলেই পোকার সংখ্যা অত্যধিকরূপে বাড়িতে দেখা যায়। এই পোকাগুলি যখন ধানের ছড়া কাটিতে আরম্ভ করে, তখন ক্ষেত্রপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলে একপ্রকার 'কট্ কট্' শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়; আর সঙ্গে সঙ্গে ধানের ছড়া মাটীতে পড়িতে দেখা যায়। অত্যল্পসময়ের মধ্যেই, পোকার উপদ্রবে ক্ষেত্রের একাংশ ছড়া শূন্য হইয়া পড়ে। এককক্ষেত্রের অনিষ্ট করিয়াই, উহারা অন্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করে; এবং সেই ক্ষেত্রেরও বিশেষ অনিষ্টসাধন করিয়া থাকে। এইরূপে ইহারা ক্রমে ক্রমে সমস্ত মাঠে ছড়াইয়া পড়ে। সাধারণতঃ কার্ত্তিকমাসেই ধানের ক্ষেতে উক্ত পোকার উপদ্রব ঘটিয়া থাকে। যে ক্ষেতের জল শুকাইয়া যায়, তাহাতেই পোকা প্রবিষ্ট হয়।

কএক বৎসর হইল, একবার ধানের ক্ষেতে পোকা লাগে; এবং সমগ্র মাঠের ক্ষেত্রগুলি নষ্ট করিতে থাকে। ফলে, চারিদিকেই হাহাকার পড়িয়া গেল। আমার ধান্যক্ষেত্রগুলিতে পোকা পড়িয়াছে সংবাদ পাইয়া, আমি অনেকগুলি তামাক-পাতা জলে ভিজাইয়া রাখিলাম এবং সেই জল ক্ষেত্রে ছিটাইয়া দিলাম। তামাক-পাতার জল ছিটাইয়া দেওয়ার পরদিনই সমস্ত পোকা ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল। বলা বাহুল্য, তামাক পাতার বিষাক্ত জলে কীটের জীবননাশ ঘটিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা রহিয়াছে মনে করিয়াই, আমি উহা ছিটাইয়া দিতে সাহসী হইয়াছিলাম। এই বিষয়ে আমার একটুকু অভিজ্ঞতাও জন্মিয়াছিল। কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে, হিমালয় ভ্রমণকালে, আমি 'ঋষিকেশ' নামক পার্ব্বত্য-প্রদেশ হইতে বাঁশমতি ধান্যের বীজ আনিয়াছিলাম। উহা আমার ধান্যক্ষেত্রে রীতিমত রোপণ করি। সেই ধানের গাছগুলি বড় হইলে, যখন তাহাতে ছড়া বাহির হইল, তখন দেখা গেল ক্ষেত্রে পোকা ধরিয়াছে। আমি নিজের বুদ্ধিতেই ক্ষেত্রে হুকার জল ছিটাইয়া দিয়াছিলাম। ফলে, পোকার উপদ্রব অনেকটা কমিয়া গিয়াছিল সত্য, কিন্তু একেবারে নিবারিত হয় নাই। তৎপর, তামাকপাতার কষ-জল (তামাক-পাতা কিংবা কাল জলে ভিজাইয়া রাখিলেই, উহাতে পাতার কষ বাহির হয়।) ক্ষেত্রে ছিটাইয়া দেওয়ার পরই পোকাগুলি নিঃশেষ হইয়া গেল।

রুড়কি-ইঞ্জিনিয়ারিং-কলেজের রেক্টার প্রদ্ধেয় বন্ধু বাবু বিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় আমার রুড়কি অবস্থানকালে, আমাকে কএকপ্রকার পার্ব্বত্য ধান্য দিয়াছিলেন। এই ধান্যবীজ বপন করিবার পরই, বিনোদবাবুকে ধান্যের পোকার বিষয় জানাইয়া (পার্ব্বত্য-প্রদেশের ধান্যবীজ বাঙ্গালার নিম্ন-প্রদেশে জন্মিলে, তাহাতে পোকার উপদ্রব ঘটিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা রহে।), তাহার প্রতিকারোপায় জানিতে চাহিয়াছিলাম। আমার পত্রের উত্তরে, তিনি লিখিয়াছিলেন,—বাঙ্গালাদেশে পার্ব্বত্য-প্রদেশের ন্যায় প্রচুর বৃষ্টি হয় না। কার্ত্তিকমাসে প্রচুর বৃষ্টি না হইলেই পোকা হয়। এই সময়ে পার্ব্বত্য-প্রদেশে বৃষ্টি হয়; সুতরাং ধান্যে কখনও পোকা লাগে না। কোনও প্রকারে ক্ষেত্রে জল দিতে পারিলে, বাঙ্গালাদেশেও পোকার উপদ্রব ঘটিবার সম্ভাবনা রহিবে না।" আমি যে উপায়ে পোকা তাড়াইয়া ছিলাম, তাহাও বিনোদবাবুকে লিখিয়াছিলাম। কিন্তু এই উপায় অবলম্বন করা সকল সময় নিরাপদ নহে। কারণ, তীব্র ও বিষাক্ত তামাক-পাতার জল লাগিলে ধানগাছেরও অনিষ্ট ঘটিতে পারে। কোনও উপায়ে ক্ষেত্রে

প্রচুর পরিমাণে জল দিতে পারিলে (এমন [illegible] যে জল দিতে হইবে, যাহাতে ক্ষেত্রে জল দাঁড়াইয়া [illegible] আপনিই মরিয়া যায়। তদ্ভিন্ন, গাছগুলিও জল পাইয়া সতেজ হইয়া উঠে এবং প্রচুর ধান্য উৎপাদন করিয়া থাকে।

একবার আমাদের চাষী-জমির পার্শ্ববর্ত্তী বৃহৎ মাঠে পোকা ধরিয়াছে শুনিতে পাইয়া, আমার যে কএকখানি ক্ষেত্র ছিল, তাহাতে আমি নিকটবর্ত্তী বিল ও ঝিল হইতে প্রচুর জল উঠাইয়া দিলাম। ইহাতে আমার চাষী-জমিতে পোকা আসিল না। সেবার আমার শস্য রক্ষা হইল; অধিকন্তু প্রচুর ধান্য জন্মিল। জল দেওয়ার কিছুদিন পরেই, গাছগুলি সতেজ ও পুষ্ট হইয়াছিল। আসল কথা কোনও প্রকারে ক্ষেত্রে জল আটক রাখিলেই, তাহাতে আর উক্ত অনিষ্টকারী পোকা জন্মিতে পারে না।

শ্রীরাজেন্দ্রকুমার মজুমদার।

সমবায়-সমাচার—

বিক্রমপুর-সমবায়-কেন্দ্র-সমিতি।

পাবনা-কেন্দ্র-সমিতির আদর্শে, ১৯১৩ খৃঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে বিক্রমপুর-সমবায়-কেন্দ্র-সমিতি (The Bikrampur Central Co-operative Bank Ltd.) প্রতিষ্ঠিত হয়।

সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান-পত্র।

কর্ম্ম-গৃহ (Office)—সমিতির কর্ম্ম-গৃহ এক্ষণ মুন্সীগঞ্জ লোক্যালবোর্ডে অবস্থিত।

মুলধন (Capital)—ইহার ব্যক্ত মূলধন দুই লক্ষ টাকা; ইহা ৪০০০ অংশে বিভক্ত। প্রত্যেক অংশের মূল্য ৫০৲ টাকা; তন্মধ্যে এক্ষণ ২০৲ টাকা মাত্র দেয়।

সমিতির উদ্দেশ্য (Objects)—(১) ইহার এলাকার মধ্যে সমবায়-সমিতি-সংস্থাপন (organisation); (২) অন্তর্ভুক্ত সমিতিতে অর্থপ্রদান (fin[illegible]ng) ও (৩) অন্তর্ভুক্ত সমিতির তত্ত্বাবধান (supervision)।

সভ্য-পদবী (Membership)—অষ্টাদশ বৎসরের উর্দ্ধবয়স্ক যে কোন ব্যক্তি, (১) বিক্রমপুরবাসী বা (২) বিক্রমপুরে অবস্থিত কোন অস্থাবর বিষয়-সম্পত্তির অধিকারী হইলেই সমিতির সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইতে পারিবেন।

পরিচালক-সভা (Board of Directors)—ইহার পরিচালক-সভায় সভ্যসংখ্যা রহিয়াছেন—১৫ জন; মুন্সীগঞ্জের মহকুমা-হাকিম ইহার (Ex-officio) সভাপতি ও অক্লান্তকর্ম্মা প্রবীণ উকিল শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকিশোর ঘোষ বি, এল মহাশয় ইহার সেক্রেটারী।

কার্য্যকরী মুলধন (Working Capital)—আলোচ্য বর্ষে ইহার কার্য্যকরী মূলধন দাঁড়াইয়াছে—অংশ-মূল্য—ব্যক্তি-সভ্য (ক) ১৩৫৲, (খ) সাধারণ ৪০৫৲ আমানতি-(ক) ৯০০৲ (খ) সভ্যেতর ৯৬০০৲ মোট ১১০৪০৲

বর্ত্তমানে সভ্যেতর ব্যক্তির আমানতি টাকাই সমিতির সর্ব্বপ্রধান আয়ের পথ। ইহাতে সমিতির কার্য্যে সাধারণের প্রভূত বিশ্বাসও সূচনা করিতেছে।

সুদের হার—অন্তর্ভুক্ত সমিতিতে ইহার লগ্নী টাকার সুদ শতকরা বার্ষিক ৯৵০ আনা। এক বৎসরের স্থায়ী আমানতি টাকায় সমিতির সুদের হার শতকরা বার্ষিক ৬।০ টাকা এবং দুই বৎসরের স্থায়ী আমানতি টাকায় সুদের হার শতকরা বার্ষিক ৭৷৷০ টাকা।

লভ্যাংশবণ্টন (Dividend)—সমিতি আলোচ্য বর্ষে শতকরা ৬।০ টাকা হারে লভ্যাংশ দিয়াছেন।

অন্তর্ভুক্ত সমিতি (Affiliated Societies)—আলোচ্যবর্ষে ইহার অন্তর্ভুক্ত সমিতির সংখ্যা নয়টী; কনকসার-সমিতি ইহার অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। থইরা গ্রামে একটী তন্তবায়-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

উপসংহার—গত বৎসর ইহার কার্য্যকরী মূলধন ছিল ৩৭৫০৲ টাকা; আলোচ্য বর্ষে, ইহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১১০৪০৲ টাকা। আশা করি, বর্ষে বর্ষে ইহার এরূপ উন্নতির ধারা অক্ষুন্ন রহিবে। তাহা হইলে, ইহাতে দেশে একটী মাঙ্গলাশক্তির সঞ্চার হইবে—বিক্রমপুর-কেন্দ্র-সমিতির-প্রতিষ্ঠার প্রকৃত উদ্দেশ্যও সম্যক্ সিদ্ধ হইবে। শিক্ষিত বিক্রমপুরবাসী কি সমবায়-সমিতির কার্য্যে যোগদান করিয়া ইহার কর্ম্মক্ষেত্রের প্রসারবৃদ্ধি করিতে পারেন না?

শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ।

Printed by Jatindra Mohan Das at the Wari Printing Works, Dacca and published by Nishikanta Ghosh at the "Krishi-Sampada" office, 66 Narinda, Dacca.

কৃষি-তত্ত্বের বহুল প্রচার-কামনায়, বিগত ১৩১৭, ১৩১৮, ও ১৩১৯—

এই তিন সালের "কৃষি-সম্পদ" অর্দ্ধমূল্যে প্রদত্ত হইবে

স্মরণ রাখিবেন—

এ আশাতীত সুযোগ অধিক দিন স্থায়ী হইবে না।

প্রথম বর্ষের অর্থাৎ ১৩১৭ সালের "কৃষি-সমাচারে" ("কৃষি-সম্পদের" প্রথমবর্ষে নাম ছিল "কৃষি-সমাচার") ন্যূনপক্ষে ৫০টীরও অধিক তথ্যবহুল কৃষি-প্রবন্ধে এবং ৫০টী কৃষি-প্রসঙ্গে নানা কৃষি-কথা আলোচিত হইয়াছে। ইহাতে ১৫ খানি হাফ্‌টোন ছবি ও ৬ খানি লাইন ব্লক আছে।

দ্বিতীয় বর্ষের অর্থাৎ ১৩১৮ সালের "কৃষি-সম্পদে" ৪৫টী প্রবন্ধ ও ধারাবাহিক প্রবন্ধের আকারে প্রকাশিত ৪ খানি গ্রন্থের কতকাংশ প্রকাশিত হইয়াছে। কৃষি-প্রসঙ্গের সংখ্যাও অন্যূন ৭৫টী হইবে। প্রত্যেক প্রবন্ধ গড়ে কৃষি-সম্পদের ৮ পৃষ্ঠাব্যাপী হইয়াছে। সুতরাং কোন প্রবন্ধের কলেবরই ক্ষুদ্র হয় নাই। ১২শ সংখ্যায় মোট ২১ খানি হাফ্‌টোন ছবি প্রকাশিত হইয়াছে।

তৃতীয় বর্ষের অর্থাৎ ১৩১৯ সালের "কৃষি-সম্পদে" ৬৫টী কৃষি-প্রবন্ধ ও ৪৩টী কৃষি-প্রসঙ্গ প্রকাশিত হইয়াছে। এই বৎসরে ৪৮ খানি চিত্র রহিয়াছে। তন্মধ্যে ৪৭ খানাই কৃষি-চিত্র, এবং ৩০ খানাই এক পৃষ্ঠাব্যাপী।

পুস্তকের হিসাবে, এই তিন বৎসরের প্রত্যেক বর্ষের "কৃষি-সম্পদকে" প্রায় এক হাজার পৃষ্ঠার একখানি কৃষি-গ্রন্থ বলা যায়। এইরূপ একখানি সচিত্র পুস্তকের মূল্য ১০৲ টাকার কম হয় না। সুতরাং তিন বৎসরের "কৃষি-সম্পদকে" ৩০৲ টাকা মূল্যের একখানি বিরাট কৃষি-গ্রন্থ বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। কিন্তু আপনি ডাকমাশুলসহ ৫৲ টাকা পাঠাইয়া দিলেই, ৩০৲ টাকার সমান বিগত ১৩১৭, ১৩১৮, ১৩১৯ সালের—এই তিন বৎসরের তিন সেট কৃষি-সম্পদ প্রাপ্ত হইবেন।

অদ্যকার ডাকেই টাকা পাঠাইয়া দিউন—

উক্ত তিন বৎসরের পত্রিকার অর্দ্ধমূল্য ও রেজেষ্টরী করিয়া পাঠাইবার ব্যয় বাবদ মাত্র ৫৲ টাকা মানি অর্ডার করিয়া পাঠাইয়া দিলেই, ঘরে বসিয়া আপনি তিন বৎসরের পত্রিকা প্রাপ্ত হইবেন। মূল্য অগ্রিম পাঠাইতে হইবে। পুরাতন "কৃষি-সম্পদ" ভিঃ পিঃ ডাকে পাঠাইতে পারিব না।

নামমাত্র ৫৲ টাকা পাঠাইয়া দিয়া—

এ অমূল্য রত্ন সংগ্রহ করিয়া রাখুন; ইহাই আমাদের বিনীত অনুরোধ। অল্পসংখ্যক পত্রিকা আছে।

টাকা পাঠাইবার ঠিকানা—শ্রীনিশিকান্ত ঘোষ। কৃষি-সম্পদ আফিস, ঢাকা।

"It is my wish that there may be spread over the land a net-work of schools and colleges, from which will go forth loyal and manly and useful citizens able to hold their own in industries and "AGRICULTURE" and all the vocations in life"

His Majesty the King-Emperor George V.
6th January, 1912.

Selected by the Director of Public Instruction, Bengal, for use in Schoo[...]ges and Attached Hostels (Cal. Gazette, 2nd Oct. 12).

Krishi-Sampad,
Vol. VII. Nos. II & III.

জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়, ১৩২৩,
৭ম বর্ষ, ২য় ও ৩য় সংখ্যা।

কৃষি-সাহিত্য-সম্মিলন-সংখ্যা—
(রঙ্গপুর-কৃষি-সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত প্রবন্ধ-সপ্তক)

কৃষি-সম্পদ

একমাত্র কৃষিবিষয়ক মাসিক পত্র।

শ্রীনিশিকান্ত ঘোষ কর্ত্তৃক
সম্পাদিত।

"I am glad to know that in other directions the agricultural practice of India has improved. The cultivator has always been patient, laborious and skilful, though his methods have been based upon tradition. Latterly the resources of science have been brought to bear upon agriculture and have demonstrated in a very short time the great results that can be secured by its application."

H. M. The KING EMPEROR.

কৃতজ্ঞতা স্বীকার।

রংপুর-কৃষি-সাহিত্য-সম্মিলনকর্ত্তৃপক্ষ মহোদয়েরা অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক সম্মিলনে পঠিত প্রবন্ধগুলি "কৃষি-সম্পদে" প্রকাশ করিতে দিয়াছেন। তজ্জন্য, এ স্থলে, তাঁহাদের নিকট আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। সকল প্রবন্ধ একবারে প্রকাশ করাই আমাদের অভিপ্রেত ছিল; কিন্তু দৈব-দুর্ঘটনায় বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়াতে আমাদের অভিপ্রায়ানুযায়ী কার্য্য সম্পন্ন হইল না। এ জন্য আমরা বিশেষ দুঃখিত। আশা করি সম্মিলনকর্ত্তৃপক্ষও আমাদের অনিচ্ছাকৃত ত্রুটী ক্ষমা করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

বিনয়াবনত—

ম্যানেজার, কৃষি-সম্পদ।

অন্নং বহু কুর্বীত ॥ তদ্ব্রতম্ ॥

তৈত্তীরীয়োপনিষদি ভৃগুবল্লী।

প্রবন্ধ-সূচী।

[লেখকদিগের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।]

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
গোপালনসম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ ... ... —শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী বি, এ, এম, এস, এ (রংপুর গভর্ণমেণ্ট ডাইরী ফার্ম্মের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট)	৩৩
কৃষি-রসায়নের ক্রমবিকাশ ... ... —ডাঃ প্রমোদাকুমার বিশ্বাস পি এইচ, ডি	৩৬
বাঙ্গালার রেসমের ভবিষ্যৎ ... ... —শ্রীযুক্ত রসিকরঞ্জন ঘোষ এম, এস, এ	৪১
মেঘ ও বৃষ্টি বিচার ... ... —শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দেব (মেডিকো-বোটানিষ্ট)	৫৪
আর্য্যশাস্ত্রে কৃষিতত্ত্ব ... —শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ	৭০
তামাক ও তামাকের ঐতিহাসিক তত্ত্ব ... —শ্রীযুক্ত যামিনীকুমার বিশ্বাস বি, এ (রংপুর—বুড়িরহাট গভর্ণমেণ্ট কৃষি-পরীক্ষাক্ষেত্রের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট)	৭৭
কৃষির আবশ্যকতা ও আমাদের কর্ত্তব্য ... —শ্রীযুক্ত মধুনাথ সরকার এম, এ, এস (বর্দ্ধমান-বিভাগের কৃষি-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট)	৮৩

গোপালনসম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ।

[রংপুর গভর্ণমেণ্ট ডাইরী ফার্ম্মের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী বি, এ, এম, এস, এসোসিয়েশনের লিখিত।]

দেশের পক্ষে শুভ লক্ষণ—আজকাল দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের অনেকেই দেশের উন্নতির কথায় কৃষি ও কৃষকের কথা ভাবিতে শিখিয়াছেন। দশবৎসর পূর্ব্বেও দেশের শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের চিন্তার গতি স্বতন্ত্র ছিল;—তখন স্বদেশের উন্নতিসাধনের সর্ব্বপ্রধান উপায় ছিল রাজনৈতিক আন্দোলন বা কতকটা সামাজিক আন্দোলনের প্রচেষ্টা। এক্ষণ দেশের চিন্তার গতি স্বতন্ত্রমুখী;—শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের অনেকেই, অর্থনীতির হিসাবে, কৃষিকে এক্ষণ কল্যাণ-পন্থা নির্দ্দেশ করিতেছেন। তাই মনে হয়, আমাদের জীবদ্দশাতেই, ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত, দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট বঙ্গমাতার আবার 'ধনধান্যপুষ্পভরা'—শস্যশ্যামলা-মূর্ত্তি দেখিতে পাইব। ইহা একদিনে সম্ভবপর হইবে না। তজ্জন্য আমাদের ত্যাগ চাই, সহিষ্ণুতা চাই, সর্ব্বোপরি সাধনা চাই।

আমরা কৃষিবিষয়ে চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়াছি বটে, কিন্তু কৃষির সে মূলশক্তি, সেই গোমাতার প্রতি আমাদের দৃষ্টি এখনও যথোচিতভাবে আকৃষ্ট হয় নাই। গত দুই তিন বৎসরে, বঙ্গভাষায় গোজাতিসম্পর্কে কএকখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে; ইহা নিশ্চিতই আশার বিষয়, সন্দেহ নাই। আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনধারণের জন্য গোজাতির নিকট কতটা ঋণী, তাহা আপাততঃ সর্ব্বদা উপলব্ধি করি কিনা সন্দেহের বিষয়। এমন কি, কৃষির উন্নতিও যে কতকটা গোজাতির উন্নতি-সাপেক্ষ, তাহাও আমরা অনেকসময় বিস্মৃত হই। কৃষি বলিতে আমরা সাধারণতঃ চাষই বুঝিয়া থাকি; এবং কৃষির উন্নতি বলিতে, ভূমিকর্ষণ ও শস্যাদির উন্নতির কথাই আমাদের মনে পড়ে। কিন্তু চাষের সহিত গোজাতির যে কিরূপ নিকটসম্বন্ধ, তাহা আমরা অনেক-সময়ই উপলব্ধি করিতে পারি না।

কৃষির উন্নতিসাধন ও গোজাতির উন্নতিবিধান পরস্পর সাপেক্ষ; অর্থাৎ একের উন্নতি ব্যতিরেকে অন্যটির উন্নতি সম্ভবপর নহে। পাশ্চাত্য-দেশের কৃষির ইতিহাস আলোচনা করিলে, ইহা সহজেই প্রতীয়মান হইবে। ভারতবর্ষে হলকর্ষণের প্রধান সহায় বলদ। কৃষির আর একটী প্রধান অবলম্বন—সার। গোময়-সারের ন্যায় উৎকৃষ্ট ও সহজলভ্য সার আর দ্বিতীয় নাই। সার ও হলকর্ষী জন্তুর উন্নতি ব্যতিরেকে চাষের কোনরূপ স্থায়ী উন্নতিও অসম্ভব। আমাদের দেশের অধিকাংশ কৃষকই উপযুক্ত বলদের অভাবে, অতি ক্ষুদ্র লাঙ্গল ব্যতীত অন্য কোনরূপ উন্নত কৃষি-যন্ত্র ব্যবহার করিতে পারে না। ফলে, যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করিয়াও, তাহারা যথোপযুক্ত ফললাভে বঞ্চিত।

দুগ্ধের জন্য গাভীর আবশ্যকতা কি, তাহা আমরা সকলেই জানি; এবং বিশুদ্ধ দুগ্ধের অভাবে আমাদের শিশুসন্তানবর্গের যে কিরূপ দুরবস্থা ঘটিতেছে, তাহাও আমাদের অজ্ঞাত নহে। বোম্বে-মিউনিসিপালিটীর রসায়ন-তত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত এন্, এন্, জোশী মহোদয় সম্প্রতি এ বিষয়ে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। মিঃ যোশীর গ্রন্থে বহু তথ্য ও প্রভূত মৌলিক গবেষণা রহিয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন—অধিকাংশ সহরের দুগ্ধই যে কেবল জলমিশ্রিত ও অপ্রচুর, তাহা নহে। পরন্তু গোয়ালা ও কৃষকদিগের অজ্ঞতা ও আলস্যের ফলে, অধিকাংশ সহরের দুগ্ধই নানারূপ সংক্রামকরোগ-বীজাণুর আশ্রয়স্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিশুদ্ধ দুগ্ধের আবশ্যকতা যে কিরূপ অপরিহার্য্য, ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আমরা গোদুগ্ধে পরিপুষ্ট হই—গো-মাতা আমাদিগকে দুগ্ধ দ্বারা প্রতিপালন করেন; এবং শস্যোৎপাদনার্থ ভূকর্ষণে বলদ আমাদের প্রধান সহায়। তদ্ভিন্ন, গোময় ও গোহাড় প্রভৃতি সাররূপে ব্যবহার করিয়াও আমরা বিশেষ উপকৃত হই। গো-চর্ম্মের ব্যবহার সকলেই অবগত আছেন। গো-শৃঙ্গ ও অস্থি দ্বারা ছাতি ও লাঠির হ্যাণ্ডেল প্রস্তুত করা হয়। গত কএক-বৎসর যাবৎ বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগ নানাস্থানে পরীক্ষা দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, ধান্য ও অন্যান্য কতিপয় শস্যের পক্ষে চূর্ণীকৃত গোহাড় উৎকৃষ্ট সার। এই সারব্যবহারে অতি অল্পব্যয়ে এবং অল্পশ্রমে ধান্যের ফলন বিঘা প্রতি ৩।৪ মণ বর্দ্ধিত করা যাইতে পারে। কিন্তু আমাদের অবহেলায়, এই বহুমূল্য সারের অধিকাংশই বিদেশে চলিয়া যাইতেছে। বিগত ১৯১৩—১৪ খৃঃ অব্দে, একমাত্র বঙ্গদেশ হইতে ২৮১৩৮১৲ টাকা মূল্যের হাড় বিদেশে রপ্তানি হইয়া গিয়াছে। আমরা এদিকে "হা অন্ন" "হা অন্ন" করিয়া কাঁদি, আর অদৃষ্টের ধিক্কার দেই। অথচ, বিধাতা আমাদের চতুর্দ্দিকে যে রত্নরাজি বিক্ষিপ্ত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা কুড়াইবার শক্তি—এমন কি, প্রবৃত্তিও আমাদের নাই!

আমাদের সময় অতি সংক্ষেপ। গোজাতির উন্নতি-সম্পর্কে, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে, সবিস্তৃত আলোচনা সম্ভবপর নহে। বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগের বর্ত্তমান সুযোগ্য অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জে, আর, ব্ল্যাকউড্ এল্, এল্, বি, আই, সি, এস্ মহোদয় বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক গোজাতির উন্নতিসম্পর্কে নানাবিধ তথ্যানুসন্ধানে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। নানা কারণে তাঁহার রিপোর্ট প্রকাশে বিলম্ব হইয়া পড়ে। সম্প্রতি কতিপয় মাস হইল, তিনি এক সুবৃহৎ ও সুচিন্তিত রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার একটী বিষয়ে

কৃষিতত্ত্বানুসন্ধিৎসু মহোদয়গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াই, আমি আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

আপনারা সকলেই জানেন, গত কএকবৎসর যাবৎ গাভী ও বলদের মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। উক্ত রিপোর্ট পাঠে দেখা যায় যে, বঙ্গের প্রত্যেক জিলাতেই গত ১০ বৎসরে গরু ও বলদের মূল্য দ্বিগুণেরও অধিক বাড়িয়াছে। কৃষি-কার্য্যোপযোগী দেশীয় বলদের সংখ্যা হ্রাস পাইতেছে; এবং ইহাদের অভাব ক্রমশঃই বেহার ও অন্যান্য দেশ হইতে আনীত বলদের দ্বারা পূরণ করা হইতেছে। যে সমস্ত জেলাতে পাটের চাষ বাড়িতেছে, সেই সকল জেলাতেই আমদানী বলদের সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। রংপুরে ও দিনাজপুরে আমদানীকৃত এবং দেশী বলদের সংখ্যা প্রায় সমান। বগুড়াতে আমদানী বলদ তিনভাগের একভাগ এবং মালদহ জিলায়, ইহা এক-চতুর্থাংশ। সত্বরই ইহার কোনও প্রতীকার না হইলে, আমাদিগকে সম্পূর্ণভাবেই পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইবে।

বর্ত্তমানে গোপালনের প্রধান অন্তরায়—গোচারণ-ভূমির অভাব। কিন্তু আজকাল যে কি ভীষণ অবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা অনেকেই জানেন কিনা সন্দেহ। পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞগণ প্রত্যেকটী গাভীর জন্য তিন বিঘা জমির আবশ্যক বলিয়া মনে করেন। আমাদের দেশীয় বলদ ও গাভী ক্ষুদ্রকায় বলিয়া, ইহাপেক্ষা কিঞ্চিৎ অল্প-পরিমাণ জমি হইলেও চলিতে পারে। আপনারা হয়ত শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে, আমাদের এই রংপুর জেলায় প্রত্যেকটী গাভীর জন্য তিনবিঘা ভূমি দূরে থাকুক—প্রতি বিঘায় বাওটী গরুকে চরিয়া খাইতে হয়। বগুড়া জেলায় তেরটী গরুর জন্য একবিঘার অধিক গোচারণ-স্থান নাই। এ বিষয়ে রাজসাহী-বিভাগই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অপরাধী। ঢাকার অবস্থা এতদূর শোচনীয় নহে! প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, রঙ্গপুর সরকারী গোশালাতে এ পর্য্যন্ত যত জেলার গাভী পরীক্ষা করা হইয়াছে, তাহাতে ঢাকা ও মালদহ জেলার গাভীই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। গোচারণ-ভূমির এইরূপ শোচনীয় অবস্থা, অথচ গোবাছুর নিমিত্ত কোনরূপ শস্যোৎপাদন-বিষয়েও আমরা সম্পূর্ণ উদাসীন! সরকারী বিভিন্ন কৃষি-ক্ষেত্রের পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, গোগ্রাসের নিমিত্ত বর্ষাকালে যোয়ার ও শীতকালে বট ও মটরের চাষ বিশেষ উপযোগী। চাষীদিগের মধ্যে এই সকলের চাষ-প্রথা প্রচলনের চেষ্টা করা হইতেছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত বিশেষ কোনরূপ ফল পাওয়া যায় নাই।

কৃষি-বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ব্ল্যাকউড্ মহোদয় বঙ্গীয় গোজাতির অবনতির তিনটী প্রধান কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রথম কারণ—ঘাসের অভাব; দ্বিতীয় কারণ—জন্ম হইতেই গো-বৎসের প্রতি যত্নাভাব ও উদাসীন্য এবং তৃতীয় কারণ—বণ্ডনির্ব্বাচনে অমনোযোগিতা। সাধারণতঃ গাভীর দুগ্ধের অর্দ্ধেকাংশই বৎসকে পান করিতে দেওয়া উচিত। কিন্তু আজকাল কৃষক ও গোয়ালাগণ গরুর সবটুকু দুধই দোহন করিয়া লয়; অথচ, তাহার পরিবর্ত্তে বাছুরকে কিছুই খাইতে দেওয়া হয় না। শৈশবাবস্থার এই অযত্নের ফলে বৎস রুগ্ন ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে, পরবর্ত্তীকালে কিছুতেই উহাকে আর সবল করিতে পারা যায় না। শৈশবে অযত্নের ফলেই, সমস্ত বঙ্গদেশ ক্ষুদ্রকায় ও কঙ্কালসার বলদ ও গাভীতে পরিপূর্ণ হইতেছে। তৃতীয় বা প্রধান কারণ—উপযুক্ত ষণ্ডের অভাব। তিন বৎসর বয়সের পূর্ব্বে কোনও ষণ্ডই জননকার্য্যের নিমিত্ত ব্যবহার করা উচিত নহে। খুব কম লোকই এই নিয়ম প্রতিপালন করিয়া থাকেন। তদ্ভিন্ন, আজকাল পল্লীগ্রামে বলিষ্ঠ উপযুক্ত ষণ্ড নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আপনারা হয়ত শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন, গত দুইবৎসর বহু অনুসন্ধান করিয়াও, আমাদের গোশালার জন্য একটী উপযুক্ত দেশী ষণ্ড সংগ্রহ করিতে পারি নাই। আমরা এখনও একটী গাভী নির্ব্বাচন করিতে কখনই আয়াস ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া থাকি। কিন্তু ষণ্ডনির্ব্বাচনসম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ উদাসীন! ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্য ও পরিতাপের বিষয়। সাধারণতঃ একটী গাভী হইতে সমস্ত জীবনে ৩।৭টীর অধিক বৎসলাভের আশা করিতে পারি না; পক্ষান্তরে, একটী ষণ্ড প্রতিবৎসরে অন্ততঃপক্ষে

৫০টী বৎস উৎপাদন করিয়া থাকে। এক একটী ষণ্ডের উপর প্রায় ৪০০ বৎসের শুভাশুভ নির্ভর করে। উপযুক্ত ষণ্ডনির্ব্বাচন যে কিরূপ গুরুতর কার্য্য, তাহা ইহা হইতেই সম্যক উপলব্ধি হইতে পারে। ব্ল্যাকউড্ মহোদয় তাঁহার রিপোর্টে গোজাতির উন্নতিসাধনের প্রধানতঃ দুইটী উপায়নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা:—(১) স্থানে স্থানে গভর্ণমেণ্ট অথবা কোম্পানীর কর্তৃত্বাধীনে আদর্শ গোশালা ও কৃষিক্ষেত্র স্থাপন; এবং (২) বিভিন্ন গ্রামে জননকার্য্যের জন্য উপযুক্তসংখ্যক বলিষ্ঠ উন্নতজাতীয় ষাড়রক্ষার ব্যবস্থা করা। প্রথম উপায়সম্বন্ধে, আমি এ স্থলে বিশেষ কিছু বলিব না। কারণ, ইহা বিশেষ ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। যাঁহারা ইচ্ছা করেন, তাঁহারা একটু কষ্টস্বীকার করিলেই, সভাভঙ্গের পরে আমাদের রংপুর-গোশালা চাক্ষুষ সন্দর্শন করিয়া, এ সম্বন্ধে একটা ধারণা করিতে পারিবেন। কিন্তু দ্বিতীয় উপায়টী তত ব্যয়সাধ্য নহে। জমিদার-সম্প্রদায় সামান্য চেষ্টা করিলেই, ইহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন। তাঁহারা উদ্যোগী হইলে, ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড এবং গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতেও সাহায্য প্রত্যাশা করিতে পারেন। সম্মিলিত সুধিবর্গের এবং জমিদার-সম্প্রদায়ের নিকট আমার বিনীত নিবেদন যে, তাঁহারা অন্ততঃ দু'একটী গ্রামেও উৎকৃষ্ট ষণ্ডরক্ষার সুফল পরীক্ষা করিয়া দেখুন। ক্রমাগত ৪।৫ বৎসর রীতিমত পরীক্ষা করিলেই, ইহার ফল বুঝা যাইবে।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

কৃষিরসায়নের ক্রমবিকাশ।

[ডাঃ প্রমোদাকুমার বিশ্বাস পি এইচ্, ডি লিখিত।]

আমাদের দেশে একটী সাধারণ বিশ্বাস আছে যে, ভূমিকর্ষণ ও সার ইত্যাদির সাহায্যে জমির ফসলবৃদ্ধি করাই কৃষি। বিগত শতাব্দীর মধ্যে, পাশ্চাত্য-সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে, কৃষি-বিজ্ঞানের যে ভূয়সী উন্নতি সাধিত হইয়াছে ও যে সমস্ত রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে উদ্ভিজ্জ-জগতের, প্রাণীদেহের ও কৃষিশিল্পের উত্তরোত্তর উন্নতি সাধিত হইতেছে, সে সম্বন্ধে এ দেশবাসীর অভিজ্ঞতা অতি অল্প। এই প্রবন্ধে কৃষি-রসায়নের ক্রমিক উন্নতির স্থূল সংক্ষিপ্তবিবরণী মাত্র প্রদান করিতে চেষ্টা করিব। উহাতে আমরা দেখিব যে, কিরূপে একটী তত্ত্বের পর অপর তত্ত্বের আবিষ্কারের ফলে, কৃষি-রসায়ন বর্ত্তমান বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে।

বৈজ্ঞানিক-জগতে কৃষিশব্দ ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রথমতঃ, উহা উদ্ভিদ-জনন-বিজ্ঞান (Science of plant culture); এবং দ্বিতীয়তঃ, উহা প্রাণী-জনন-বিজ্ঞান (Science of animal culture)—এই উভয়বিভাগে উদ্ভিজ্জ-বীজ বা প্রাণীবীজের কেবল নির্ব্বাচন দ্বারা যে উন্নতি সাধিত হইতে পারে, তাহা সাধারণ কৃষি (Agriculture proper) ও রাসায়নিক ক্রিয়াসংযোগে ফসলের উন্নতিবিধানকে কৃষি-রসায়ন বলা হইয়া থাকে। পদার্থের যে সমুদয় আণবিক রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে, ফসলের উৎকর্ষ, প্রাণীদেহের পরিপুষ্টি বা রাসায়নিক শিল্পের উন্নতি হইতেছে, তাহাও এই কৃষি-রসায়নের অন্তর্গত। কৃষি-রসায়নে মৃত্তিকা, সার, উদ্ভিজ্জ ও জৈবিক রসায়ন, খাদ্য-রসায়ন, রসায়নশিল্প ইত্যাদি সবিশেষ আলোচিত হইয়া থাকে। মৃত্তিকার মধ্যে সর্ব্বসময়েই নানারূপ রাসায়নিক পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইতেছে। পর্ব্বত হইতে শীতাতপ ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ার প্রভাবে কিরূপে মৃত্তিকা গঠিত হয়, তাহার উপায়-নির্দ্ধারণ ও সারপ্রয়োগে মৃত্তিকার উন্নতিসাধনের উপায়-নির্দ্দেশ করাই মৃত্তিকা-রসায়নের বিষয়। মৃত্তিকার জৈবিক ও অজৈবিক উপাদান নির্দ্দেশ ও তন্নিহিত জৈবিক পদার্থের পচনক্রিয়ার ফলে মৃত্তিকার প্রাকৃতিক (physical) ও রাসায়নিক পরিবর্ত্তন দ্বারা উর্ব্বরতা-শক্তি বৃদ্ধি করাই ইহার উদ্দেশ্য। এতদ্ভিন্ন, উদ্ভিদাণুর সাহায্যে মৃত্তিকার মধ্যে যে সমুদয় রাসায়নিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে, তাহাও রাসায়নিক-সংশ্লেষ (Chemico-synthesis) আখ্যায় কৃষি-রাসায়নের আলোচ্যবিষয়।

বিগত ১৮৭৬ খৃঃ অব্দে, ডেটনার (Detner) ও উলনি (woolny), ১৮৭৯ সালে ফেস্কা (Fexa), ১৮৯৯ সালে মিলচ্ (Milch), ১৯০৩ সালে মায়ার (Meyar), ১৯০৫ খৃঃ অব্দে নোয়াকি (Nowacki) এবং কিং (King) ও ষ্টক্‌ব্রিজ (Stockbridge) সাহেব নানারূপ অনুসন্ধান করিয়া, মৃত্তিকার বিশ্লেষণ ও বিবিধরূপ নূতন তথ্যের উদ্ভাবন করিয়াছেন। প্রতিবৎসর ফসল উৎপাদনের দরুণ মৃত্তিকার উর্ব্বরতা-শক্তি ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। মৃত্তিকার উৎপাদিকা-শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সারের বিশেষ প্রয়োজন। সুতরাং সারের বিশ্লেষণ ও উপযুক্ত-রূপে সংরক্ষণ কৃষিকার্য্যের পক্ষে বিশেষরূপে প্রয়োজনীয়। মৃত্তিকার প্রাকৃতিক শক্তির উন্নতিসাধন করিয়া, প্রক্রিয়াদির সাহায্যে ফসলের যথাযোগ্য খাদ্যযোগানই সারপ্রয়োগের উদ্দেশ্য। এই বিভাগে ষ্টেরার (Steror), আইক্‌ম্যান্ (Aikman), ষ্টুট্‌জার (Stutzer), মুলার (Muller), সিমারম্যান্ (Semmerman) প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ অনেক গবেষণা করিয়া, সারের প্রয়োজনীয়তা ও তাহা সংরক্ষণের প্রকৃষ্ট উপায়নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। উদ্ভিদের জীবনী-শক্তির প্রভাবে উদ্ভিদ-দেহে মৃত্তিকার উপাদান ও বায়ু-মণ্ডলের অম্ল-অঙ্গারকপদার্থের সাহায্যে যে রাসায়নিক প্রক্রিয়া সাধিত হইয়া থাকে, তাহাই উদ্ভিদ-দেহ-রসায়ন নামে অভিহিত হয়। উদ্ভিদেরা বায়ুমণ্ডল হইতে অম্ল-অঙ্গারক ও মৃত্তিকা হইতে অজৈবিকপদার্থ গ্রহণ পূর্ব্বক স্বীয় জীবনীশক্তির প্রভাবে স্বকীয় দেহ-পদার্থ প্রস্তুত করিয়া থাকে। মৃত্তিকা হইতে উদ্ভিদের অজৈবিকপদার্থ পরিগ্রহণসম্বন্ধে প্রভূত জ্ঞানলাভ করা গিয়াছে; এবং ঐ আবিষ্কারের ফলেই আজ কৃষিবিজ্ঞান এত উন্নতি লাভ করিয়াছে। এক্ষেত্রে ১৭৮০ খৃঃ অব্দে, সেনেবিয়ার (Senebier) ও ১৮০৪ খৃঃ অব্দে, সস্যুরে (Sausowre) প্রকাশ করেন যে, অজৈবিকপদার্থ উদ্ভিদের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

১৮১৪ খৃষ্টাব্দে, হামফ্রেডেভি (Humphrey Davy) লিপিবদ্ধ করেন যে, ধাতবপদার্থ উদ্ভিদের তন্তু ও প্রাণীর অস্থি প্রস্তুতকার্য্যে বিশেষ উপযোগী। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে, স্প্রেণগেল (Sprengel) সাহেব লৌহ, চূণ প্রভৃতি দ্বারা যে ভূমির উর্ব্বরতা-শক্তি বৃদ্ধি পায়, ইহা সপ্রমাণিত করেন। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে, লেভি (Liebig) প্রকাশ করেন যে, মৃত্তিকার অঙ্গারজাতপদার্থ উদ্ভিদের পক্ষে অনাবশ্যক; কিন্তু অন্যান্য উপাদান বিশেষ দরকারী। তবে ইতঃপূর্ব্বে এ বিষয়ে কোন কোন বৈজ্ঞানিকেরা মতপ্রকাশ করেন যে, উদ্ভিদেরা স্বকীয় দেহে নিজ শক্তিতেই মৌলিক-উপাদান প্রস্তুত করিতে সমর্থ হয়। এ সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রথমে বার্লিন-বিশ্ববিদ্যালয় এক পুরস্কার ঘোষণা করেন এবং শ্রাডেট্ (Schradet) সাহেব উদ্ভিদ-দেহে মৌলিক-উপাদান প্রস্তুত হয়, ইহা প্রকাশ করেন। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে, গেটিনগেন-বিশ্ববিদ্যালয় উদ্ভিদের অজৈবিকপদার্থপরিগ্রহণসম্বন্ধে অপর এক পুরস্কার ঘোষণা করেন: Gottengen Preis frage—"Ob die sogenante anorganisches Elemente, welche in die Asche der Pflanzen gefunden werden anch daun im den pflanzen sich finden, wenn sie derselfen nicht dargeboten werden und ob jene Elemente so wesentlich Bestandteile des vegetabilischen Organismms Sein, das diesier sie zu seiner volligen Ausbildung bedunfe". ইহার সারমর্ম্ম এই—উদ্ভিদ-দেহে যে সমুদয় অজৈবিকপদার্থ পাওয়া যায়, উদ্ভিদ নিজশক্তিতে ঐ সমস্ত উপাদান প্রস্তুত করিতে সমর্থ হয় কিনা এবং উদ্ভিদ-দেহের পরিপুষ্টির জন্য ঐ সমস্ত উপাদানের মধ্যে কি কি দ্রব্য একান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা যিনি প্রমাণ করিতে পারেন, তিনি ঐ পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন।"

১৮৪২ খৃষ্টাব্দে উইগ্‌ম্যান (Wigman) ও পোরস্টরফ (Porstorf) অনুসন্ধান করতঃ প্রতিপন্ন করেন যে, মৌলিক-উপাদান গঠন করিবার উদ্ভিদের কোনও শক্তি নাই। ইঁহারা মৃত্তিকা হইতে পরিগৃহীত ধাতবপদার্থ উদ্ভিদ-দেহের অবশ্যপ্রয়োজনীয় সপ্রমাণ করতঃ এই পুরস্কার প্রাপ্ত হ'ন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে, হলষ্টমার (Holstmer), উইগম্যান ও পলষ্টর্ফ (Polstorf) এ বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করতঃ দ্বিদলজাতীয় উদ্ভিদের সম্পূর্ণ বৃদ্ধির জন্য সিলিকা, ফোস্‌ফরাস্, গন্ধক, পোটোসিয়াম, ম্যাগনিসিয়াম্, চূণ, ম্যাঙ্‌গেনিস্ ও লৌহ একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। অতঃপর, সাকস্ (Sachs) নপ্ (Knop), ষ্টোম্যান (Stohmann), নবে (Nobbe), ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে, হেলরিগেল (Hellriegel), ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে, উডমার (Woodmar), ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে, ক্রোণ (Crone) প্রভৃতি বালি বা জলের সাহায্যে উদ্ভিদের পরিপোষণ করতঃ অজৈবিকপদার্থের উপকারিতা সপ্রমাণ করেন। বারণার (Burner), লিউকোমাস্ (Leucomus) প্রভৃতি দেহতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ গন্ধক, পোটাসিয়াম, চূণ, ম্যাগনিসিয়াম্, ফস্‌ফরাস্ ও লৌহ উদ্ভিদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। এতদ্ভিন্ন, পুষ্পবান উদ্ভিদের (Phanerogams) পক্ষে অঙ্গারক, যবক্ষারজান, অম্লজান ও নেত্রজান একান্ত প্রয়োজনীয়।

পোটেসিয়াম্ উচ্চ-শ্রেণীর উদ্ভিদের পক্ষে অবশ্য-প্রয়োজনীয় ধাতবপদার্থ। ইহা বৃক্ষের বিভাজ্য অংশে (meristem), বীজগত বৃক্ষের (embsyo) গড়নে (structure) ও বীজকোষে (protoplasma) পাওয়া যায়। নেগেলি (Nagelli), ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে, বেনেকে (Benecke) প্রভৃতি অনুসন্ধান করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদের পক্ষেও এই উপাদান একান্ত প্রয়োজনীয়। তবে সময়ভেদে তৎস্থানে অন্যান্য উপাদানও কার্য্যকরী হইয়া থাকে।

ম্যাগনিসিয়াম—এই উপাদানের পরিবর্ত্তে অন্য কোনও পদার্থ কার্য্যকরী হয় না। বৃক্ষের বিভাজ্য অংশে (meristem), বীজ, "রাইজোম্" (Rhizome), কন্দ (tuber) প্রভৃতিতে এই উপাদানের দরকার। ইহা বীজের অঙ্কুরকালে প্রোটিড-ম্যাগনিসিয়ামের সহিত "ছিদ্ড" (sieve) প্রণালীর মধ্য দিয়া বৃহত্তত্ত্ব গঠনক্রিয়ার সাহায্য করে। উইলস্টেটরের (willslater) এর মতে, ম্যাগনিসিয়াম সবুজ-বর্ণপদার্থগঠনেরও সহায়তা করে।

ক্যালসিয়াম—ইহা উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদের পক্ষে অবশ্যপ্রয়োজনীয়। কিন্তু নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদের পক্ষে তেমন-আবশ্যকীয় নহে। ১৮৯৫ হইতে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে, বেনেকে (Benecke) ও মোলিস্ (Molisch) পরীক্ষা করিয়া সপ্রমাণ করেন যে, "ক্যালসিয়াম্"-হীন জলে নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদ হইয়া থাকে। উদ্ভিদের বিভাজ্য বৃহত্তন্তুতে (Meristematic tissue) ক্যালসিয়াম পাওয়া যায় না; পুরাতন অংশেই উহা বিদ্যমান রহে। পত্র-কোষেও (cells) ক্যালসিয়াম-অক্‌জেলেট (Calcium Oxalate) বিদ্যমান থাকে।

লৌহ—লৌহের প্রয়োজনীয়তাসম্বন্ধে, ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে গ্রীস্ (Gris), ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে মলিস্ (Molisch), ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে বেনেকে (Benecke), ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে উইলস্টেটার (Willslater) অনুসন্ধান করতঃ প্রতিপন্ন করেন যে, জীবনাঙ্কুর (protoplasm) গঠনে উহা একান্ত প্রয়োজনীয়। উদ্ভিদের বৃহত্তন্তুগঠনেও প্রোটিড্ এবং লৌহ দরকার। উদ্ভিদ-দেহে সবুজবর্ণপদার্থগঠনেও লৌহের আবশ্যকতা আছে বলিয়া অনেক কৃষিতত্ত্ববিদ মত প্রকাশ করেন। কিন্তু কেহই এখন ঐ মতের পোষকতা করেন না।

ফস্‌ফরাস্—এই উপাদান ফস্‌ফেটরূপে গৃহীত হয়। প্রোটিড্ জাতীয় দ্রব্যের সহিত সংমিশ্রিত হইয়া, উদ্ভিদ-দেহে উহার চালন-প্রক্রিয়ার সহায়তা করে। নিউক্লিন ও লেসিথিন গঠনেরও ইহা এক বিশিষ্ট উপাদান।

সালফেট—প্রোটিড্ জাতীয় বস্তুগঠনে ইহার বিশেষ প্রয়োজন। মূলা (Radish), সালগম (turnip), সরিষা, পিয়াজ প্রভৃতিতে অধিক পরিমাণ গন্ধক পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন, পরভুক্‌বৃক্ষসমূহও জনকবৃক্ষ হইতে গন্ধক-যুক্ত খাদ্যসমূহ গ্রহণ করিয়া থাকে;

উল্লিখিত উপাদানগুলি উদ্ভিজ্জীবনে একান্ত প্রয়োজনীয় (indispensable)। এতদ্ব্যতীত, ক্লোরিণ, সিলিকা ও সোডিয়াম সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। মোটের উপর, উদ্ভিদের ভস্ম (Ash) পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, তন্মধ্যে পঞ্চত্রিংশ রকম উপাদান বিভিন্নরূপে বর্ত্তমান রহে।

উদ্ভিদেরা বায়ুমণ্ডল হইতে বা নানারূপ জটিল জৈব-পদার্থ হইতে অঙ্গারকপরিগ্রহণে স্বীয় বর্দ্ধনক্রিয়ার আনুকূল্য করে। এই কার্য্যের তারতম্যানুসারে উদ্ভিদকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা—অটোট্রফ (Autotroph) ও হিটারোট্রফ (Heterotroph) উদ্ভিদ। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা অনুসন্ধানের ফলে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, উদ্ভিদের সবুজবর্ণপদার্থ (Chlorophyll) আলোর সাহায্যে বায়ুর অম্লজারকপদার্থ ও স্বাস্তরস্থ জলের রাসায়নিক সংমিশ্রণে অঙ্গারময়পদার্থ গঠন করিয়া থাকে। ১৮৮৭ খৃঃ অব্দে, বনিয়ার (Bonnier) ও ম্যাগনিন (Magnin) সর্ব্বপ্রথমে উহা সপ্রমাণ করেন। মোল (Moll) প্রমাণ করেন যে, মৃত্তিকার অঙ্গারময়পদার্থ হইতে অঙ্গারক পরিগৃহীত হয় না। ১৮৭৩ খৃঃ অব্দে, পেফার (Pfeffer) ও গড্‌লেস্‌কি (Godlewsky) ও অতঃপর এঙ্গেলম্যান (Engelmann) ও মিরিয়াজেপ্ (Tmiriazeff) সপ্রমাণ করেন যে, উদ্ভিদেরা সূর্য্যরশ্মি হইতে এই ক্রিয়াশক্তি লাভ করে। ১৮৮১ খৃঃ অব্দে, পেফার (Pfeffer), ১৮৮৬ খৃঃ অব্দে বায়ারিঙ্ক (Beiyerinck), ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে কোণি (Kony), ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে এওয়ার্ট (Ewart), ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে মলিস্ (Molisch) "ক্লোরোফিল" নামক সবুজপদার্থের দ্বারা যে উদ্ভিদের আঙ্গারকপরিগ্রহণ-কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে, ইহা সপ্রমাণ করেন। পূর্ব্বোক্ত তথ্য হইতে ইহা পরিলক্ষিত হয় যে, উদ্ভিদেরা সবুজবর্ণপদার্থ বা "ক্লোরোফিল" সাহায্যে বায়ু হইতে অম্ল-অঙ্গারক গ্রহণ করতঃ স্বাস্তরস্থ জলের সহিত আলোযোগীকরণে স্বীয়দেহে নানাপ্রকার অঙ্গারময়পদার্থ উৎপন্ন করিয়া থাকে। তবে সর্ব্বপ্রথমে শর্করা কি শ্বেতসার উৎপন্ন হয়, তৎসম্বন্ধে কৃষি-রসায়নাভিজ্ঞ পণ্ডিতেরা বিভিন্নরূপ মতপোষণ করেন। এক্ষেত্রে বায়ার (Bayer), গডলেস্‌কি (Godlewsky), ক্রাউস্ (Kraus), মায়ার (Mayer), বুইলহাক (Bouilhac), ট্রিবো (Trebo), ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে স্পিপার (Schimper), ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ব্রাউন (Brown) ও মরিস্ (Morris), ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে রাইণকে (Reinke) ও কার্টিয়াস (Curtius), ১৯০৬ সালে আশর্ (Usher) ও প্রিস্টলি (Prisstly), এতদ্ভিন্ন ক্রেটো (Crato) বাক্ (Bach) ও ভাইন্স (Vines) শর্করা বা শ্বেতসার গঠনসম্বন্ধে নানারূপ প্রমাণ দিয়াছেন। উহার সম্যক আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, উদ্ভিদ-দেহে প্রথমতঃ ফরমেলডিহাইড্ উৎপন্ন হয়। উহা ক্রমে ট্রাক্ষাচিনি (Dextrose) ও লেভুলোস্ (Laevulose) বা ফল-চিনিতে পরিণত হয় এবং ইহাই শ্বেতসার ও ইক্ষু-শর্করায় পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। ক্রমে এই উভয়বিধ পদার্থ মল্টোস্ (Maltose), বা ট্রাক্ষাচিনি ও ফল-শর্করা (fructose) রূপে উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশে পরিচালিত হইয়া থাকে। কিন্তু এ বিষয়ে কোন স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্ব্বে, আরও তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন।

পরিমিতরূপে প্রাণীসমূহের খাদ্যনির্দ্দেশ করা প্রাণীখাদ্য-বিজ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রাণীর খাদ্য ও উহার পরিপুষ্টি-কারিতা (nutritive value) নিরূপিত করাই এই বিভাগের বিষয়। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে, লেবি (Liebig) এই বিষয়ে অবতারণা মাত্র করেন। লেবি (Liebig) নির্দ্দেশ করেন যে, প্রাণীদেহে খাদ্যের অন্যান্য উপাদান হইতে চর্ব্বি উৎপন্ন হইয়া থাকে। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে, হোহেনহাইম (Hohenheim), ১৮৪৮ হইতে ৫০ খৃঃ অব্দের মধ্যে লয়েস্ (Lowes) ও গিলবার্ট এ বিষয়ে অনুসন্ধান করেন। ১৮৬০ খৃঃ অব্দে, বেছফ (Bischoff) ও ফয়েট (Voit) প্রতিপন্ন করেন যে, মলমূত্রের মধ্যে খাদ্যের উপাদানসমূহ বর্ত্তমান থাকে। হেনেবার্গ (Henneberg) ও ষ্টোম্যান (Stohmann) গরুর খাদ্যসম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া, তদ্বিষয়ে স্বীয়মত লিপিবদ্ধ করেন। অতঃপর, ফইট (Voit) উদ্ভিজ্জ ও জান্তব খাদ্যগ্রাহী প্রাণীসমূহের মাংসগঠনসম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে, প্রাণীখাদ্য-বিজ্ঞানের (Cattle feeding) এক নবযুগের আবির্ভাব হয়। ঐ

বৎসর পারিশ (Paris) ও গ্যাটিনগেন (Gottingen) নগরে প্রাণীর খাদ্যবিষয়ে বিশেষ চর্চ্চা হইয়া থাকে। অতঃপর, কেলনার (Kellner) ও ষ্টুট্যার (Stutzer) এ বিষয়ে অনুসন্ধান করেন ও জীবদেহের সামর্থ্যরক্ষণবিষয়ে খাদ্যবস্তুজাত উত্তাপের ক্রিয়া লক্ষ্য করেন। তৎপর রুবণার (Rubner), কেলনার (Kellner), য্যাটওয়াটার (Atwater) আরমস্‌বি (Armsby), লেহম্যান (Lehmann), পট (Pott), বোমার (Bohmer), হেনরী (Henry) প্রভৃতি জীবদেহের পরিপোষণসম্বন্ধে অনেক পরীক্ষা ও অনুসন্ধান করেন। ফইট (Voit), পেটেনকফের (Pottenkofer), বাউয়ার (Bauer), হফম্যান (Hoffman) প্রভৃতি দেখান যে, শ্বেতসার ও শর্করাবহুলপদার্থ এবং প্রোটিড বা আমিষ-জাতীয় পদার্থ হইতে মানবদেহে যথাক্রমে চর্ব্বি ও মাংস গঠিত হইয়া থাকে। বিছফ (Bischoff), ফইট (Voit) ও পোটেনকফের (Pottenkofer) মাংসগঠনসম্বন্ধে অনুসন্ধান করতঃ প্রোটীড-জাতীয় খাদ্যের সীমানির্দ্দিষ্ট করেন ও খাদ্য-উপাদানের মিতব্যবহারসম্বন্ধে এবং প্রাণীদেহে বিশেষ উপাদানের আধিক্য করিতে হইলে, তৎপাদক যে পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা পরিগণনা পূর্ব্বক নির্দ্ধারণ করেন। যাবতীয় খাদ্যসমূহের তাপজননশক্তি-সম্বন্ধে কেলণার (Kellner) ও আরমস্‌বি (Armsby) অনেক পরীক্ষা করিয়াছেন ও প্রাণীদেহে মোটশক্তি (Available Energy) এবং কার্য্যকরীশক্তি (Nett Energy) নির্দ্ধারণের নানা প্রণালী উদ্ভাবন করিয়াছেন। এইরূপে খাদ্যবিজ্ঞান মানব ও কৃষিকার্য্যোপযোগী জন্তুসমূহের খাদ্যনিরূপণের ব্যবস্থা করিয়া, জ্ঞানের সম্প্রসারণ ও মিতব্যয়িতার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন।

বিগত শতাব্দীতে, মানবীয় সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে, কৃষিশিল্পের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে। শ্বেতসার, শর্করা, নীল, সিগারেট, অরেঞ্জ, সাইডার (cider), বিয়ার (Beer) প্রভৃতি শিল্পদ্রব্য কৃষিরসায়নের সাহায্যে উৎপন্ন হইতেছে। এইরূপে উদ্ভিদের চাষ ও উদ্ভিজ্জশিল্পের ন্যায় জান্তব খাদ্যপ্রস্তুতপ্রণালীতেও কৃষি-রসায়নের বিশেষ আবশ্যকতা আছে। মাখন, পনির, গাঢ়দুগ্ধ (Condensed milk), কফির (Kaflir) ইত্যাদি তৈয়ার ও মাংস-সংরক্ষণ, উল, কেশ, পালক, চামড়া ইত্যাদির শিল্পেও রাসায়নিক প্রক্রিয়ার প্রয়োজন; এবং উল্লিখিত শিল্পাদিও বিস্তৃত অর্থে কৃষি-রসায়নের অন্তর্ভূত। ফ্লাইসম্যান (Fleishman), ক্রিকনার (Krichner), ষ্টুয়ার্ট (Stewart), ষ্টোম্যান (Stohman) রুবণার (Rubner) উইলোবাই (Willoughby), উইল (Will), সাইডার (Suyder) প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত শিল্প এবং হ্যাম, ব্যাকন (bacon) প্রভৃতি প্রাণীজাত শিল্প-সম্বন্ধে অনেক তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন।

এই প্রবন্ধে কৃষিরসায়নের লক্ষ্যসম্বন্ধে সামান্য অবতারণা মাত্র করিলাম। বিগত শতাব্দীতে কৃষি ও শিল্প-বিজ্ঞানের যে উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তাহার সাহায্যে আজ মানব জ্ঞান-চক্ষুর দ্বারা প্রকৃতির অপূর্ব্ব আভ্যন্তরীণ শোভা নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইতেছে। পৃথিবীতে স্থলভাগের অনুপাতে জনসংখ্যা প্রতিবৎসরই বর্দ্ধিত হইতেছে। এই বর্দ্ধিত জনসংখ্যার খাদ্য যোগান ক্রমশঃই দুরূহ হইয়া দাঁড়াইতেছে। কৃষিরসায়নের সাহায্যে লোকসংখ্যার অনুযায়ী খাদ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি বা উপযুক্তরূপে নিয়মিত করতঃ মানব স্বীয় রক্ষণোপযোগী নানা উপায় অবলম্বন করিতে পারিতেছেন। একদেশের অতিরিক্ত কৃষিজাত খাদ্যসমূহ সংরক্ষিত হইয়া সুদূর জনপূর্ণ বিদেশে লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণরক্ষা করিতেছে। বিলাসপরায়ণ জাতিসমূহ কৃষিরসায়নের সাহায্যে পানীয় ও নানা অভিনব সামগ্রীসমূহ প্রস্তুত করতঃ মানবজন্ম সার্থক করিতেছেন। ভবিষ্যতে কৃষি-রসায়ন-বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে কি অপূর্ব্ব আবিষ্কার সম্ভবিত হয়, তাহা অনুমান করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। কিন্তু বর্ত্তমান উন্নতি লক্ষ্য করিলেই বিস্মিত হইয়া ভাবিতে হয়—"What man has done for man".

শ্রীপ্রমোদাকুমার বিশ্বাস।

বাঙ্গালার রেশমের ভবিষ্যৎ।

প্রবন্ধের সারমর্ম্ম।

স্মরণাতীত কাল হইতে বাঙ্গালায় রেশমের চাষ প্রচলিত রহিয়াছে। ইউরোপ ও এসিয়ার রেশমগোলা বলিয়া এককালে বাঙ্গালার খ্যাতি ছিল। সম্প্রতি শিল্পটীর এতদূর শোচনীয় অধঃপতন ঘটিয়াছে যে, যথাসম্ভব সত্বর তাহার প্রতিকার না করিলে, বাঙ্গালার এই প্রাচীন ও সমৃদ্ধ শিল্পটীর ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। ঝোপ-তুঁত-চাষের ব্যয়বাহুল্য, রেশম-কীটপালনপ্রথার ত্রুটী, রেশম-কীটের বংশগত অপকৃষ্টতা, 'কটা'-রোগের ব্যাপ্তি, রেশম-কাটাই-প্রথার দোষ ও নিকৃষ্ট রেশম উৎপাদন এবং রেশম-শিল্পের বিভিন্ন শাখার কার্য্যে নিয়োজিত শিল্পীগণের সম্মিলিত বিধিব্যবস্থার অভাবই বাঙ্গালার এই শিল্পটীর অধঃপতনের সর্ব্বপ্রধান কারণ। অধঃপতন ও ধ্বংসের হস্ত হইতে শিল্পটীকে রক্ষা করিতে হইলে, অনতিবিলম্বে অল্পব্যয়ে উৎকৃষ্ট তুঁতের চাষ ও কীট-পালনপ্রথার উন্নতিবিধান করিতে হইবে; ইউরোপের উৎকৃষ্ট জাতীয় একচক্রী রেশম-কীটের সহিত বাঙ্গালার নিকৃষ্ট বহুচক্রী কীটের মিলন দ্বারা উৎকৃষ্ট গুটীপ্রদ স্থায়ী বহুচক্রী কীট উৎপাদিত করিয়া, তাহা পালন করিতে হইবে; অনুবীক্ষণ সাহায্যে কীট-পরীক্ষা পূর্ব্বক সম্পূর্ণ নীরোগ কীটের বীজ হইতে পলু পুষিতে হইবে, বীজগুটী বিক্রয়ের পরিবর্ত্তে গবর্ণমেণ্টের নার্শারীসমূহে নীরোগ কীটের বীজ বা অণ্ড বিক্রয় করিতে হইবে এবং অপরীক্ষিত বীজ বিক্রয় বা তজ্জাত কীটপালন আইনবলে বন্ধ করিতে হইবে। উৎকৃষ্ট গুটী হইতে উন্নত উপায়ে রেশম-কাটাই করিয়া, রপ্তানি করিবার পূর্ব্বে, তাহার ফিরাণ করিতে হইবে। তদ্ভিন্ন, দেশীয় শিল্পীদিগকে সর্ব্বদা বিভিন্ন দেশের রেশম-বাজারের অবস্থা পরিজ্ঞাত হইতে এবং দেশ-বিদেশে বিজ্ঞাপন প্রচার করিতে হইবে। দেশে রেশম-সমবায়-সমিতি, যৌথ-ঋণদান-ব্যাঙ্ক ও বাণিজ্যিক দর্শনাগার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

শ্রীরসিকরঞ্জন ঘোষ।

বাঙ্গালার রেশমের ভবিষ্যৎ।

আজকাল বৎসর বৎসর কাশ্মীরদেশে অপর্য্যাপ্ত রেশম উৎপন্ন হইতেছে; কিন্তু বাঙ্গালার রেশমের সমৃদ্ধির সময় কাশ্মীরী রেশমের নামও শুনা যায় নাই। ফলতঃ, উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত ভারতীয় রেশম বাঙ্গালাজাত রেশমেরই নামান্তর মাত্র ছিল। কোন স্মরণাতীত কাল হইতে যে বাঙ্গালায় রেশমের চাষ চলিয়া আসিতেছে, অদ্যাপি তাহা নির্ণীত হয় নাই। আমাদের ঋগ্বেদ, রামায়ণ, মহাভারত এবং মনুসংহিতা প্রভৃতি প্রাচীনতম ধর্ম্মগ্রন্থের স্থানে স্থানে রেশমের উল্লেখ আছে। ইহা হইতেই বাঙ্গালার এই কৃষি-শিল্পটী যে কত প্রাচীন তাহা সম্যক উপলব্ধ হইতে পারে। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে প্রাচীন রোমে বাঙ্গালার রেশমের আদর এতদূর বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে, বাঙ্গালাজাত সূক্ষ্ম-রেশম ব্যতীত অপর কোনও রেশমেই রোমকসম্রাট্‌গণ পরিতৃপ্তিলাভ করিতেন না। রেশমই তৎকালে ভারতের সর্ব্বপ্রধান পণ্য বলিয়া পরিগণিত হইত। বাগ্দাদের খলিফাগণও বাঙ্গালার রেশমের যথেষ্ট আদর করিতেন। মোগলসম্রাটগণের শাসনকালেও শিল্পটীর পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিল। 'আইন্-ই-আকবরী' পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, দীল্লীশ্বর আকবর রেশমশিল্পের উন্নতির জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তৎকালে এই ব্যবসায় অবলম্বনপূর্ব্বক বহুলোক গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করিত। সাম্রাজ্ঞী নূরজাহানও বীরভূমের রেশমী চাদরের অত্যন্ত আদর করিতেন। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে, ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানী বাঙ্গালা হইতে প্রচুর পরিমাণে কাঁচা-রেশম (Raw Silk) ও রেশমজাত দ্রব্যাদি রপ্তানি করিত। বার্ণিয়ে সাহেব বাঙ্গালাকে ইউরোপ ও এসিয়ার রেশমের গোলাঘর বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংরেজ ও ওলন্দাজদিগের রেশমের কুঠীতে প্রত্যহ হাজার হাজার মজুর কাজ করিত। ট্র্যাভারনিয়ে তদীয় বাঙ্গালা-ভ্রমণ-বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন যে, একমাত্র কাশীমবাজার হইতেই প্রতিবৎসর প্রায় এক কোটী পাউণ্ড রেশম জাপান ও ইউরোপে রপ্তানি হইত। তৎকালে কাশীমবাজারই বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রেশমকেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত হইত। অর্ম্মিসাহেব তদানীন্তন রেশমশিল্পীগণের শিল্পকৌশলের ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিয়াছেন। হাণ্টার ও সারজর্জ্জ বার্ডউড প্রমুখ সুবিখ্যাত ইংরেজগণের মতে, একমাত্র মালদহ হইতেই প্রতিবৎসর পঞ্চাশোর্দ্ধ রেশম-বোঝাই জাহাজ রুশিয়া ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে রপ্তানি হইত। এই সমুদয় বিবরণ

পাঠে বাঙ্গালার রেশমশিল্পটী কত প্রাচীন এবং কিরূপ সমৃদ্ধ ছিল, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

বিগত শতাব্দীর শেষাংশে শিল্পটীর এতই অধঃপতন হইতেছিল যে, বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট তাহার কারণ নির্ণয় ও প্রতিকার বিধানার্থ ৺নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়কে নিযুক্ত করিতে বাধ্য হন। মুখোপাধ্যায় মহাশয় শিল্পটীর উন্নতি-কল্পে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ, এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু উন্নতি সাধিত হইয়াছে, সে সমস্ত তাঁহারই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল। কিন্তু ইহাও অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, শিল্পটীর অবনতি নিবারণ করিতে তিনিও সম্পূর্ণরূপে সফলকাম হইতে পারেন নাই। এককালে রেশমশিল্প যে সকল স্থানে উন্নতির উচ্চতম সোপানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এক্ষণ বহু জেলায় আজকাল আর ইহার চিহ্নমাত্রও পরিলক্ষিত হয় না। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যশোহর জেলা অন্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রেশমকেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত হইত; কিন্তু অধুনা, এই জেলা রেশম-সম্পর্ক-বিরহিত হইয়া পড়িয়াছে। মুর্শিদাবাদ ও মেদিনীপুর সহস্র সহস্র অনাবাদী তুঁতক্ষেত্র এবং শত শত ঘাইএর ভগ্নস্তূপ বক্ষে ধারণ করিয়া, তাহাদের অতীতগৌরবকাহিনী নীরবে ঘোষণা করিতেছে। এইরূপে বৎসরের পর বৎসর প্রত্যেক জেলা হইতে রেশমশিল্প ধীরে ধীরে লোকচক্ষুর অন্তরালে আত্মগোপন করিতেছে। ফলে, রেশমচাষীগণ অজস্রবিধ কৃষির সাহায্যে জীবিকানির্ব্বাহের জন্য কঠোরতর জীবনসংগ্রামে লিপ্ত হইতেছে। পক্ষান্তরে, পাশ্চাত্য ব্যবসায়ী ও কুঠিয়ালগণ তাহাদের ব্যবসায় এবং কারখানা ক্রমশঃ পরিত্যাগ করিতেছেন। লুই পেয়েন কোম্পানির সমস্ত রেশমের কুঠি এইভাবে বন্ধ হইয়া গিয়াছে; এবং কলিকাতার বিখ্যাত ব্যবসায়ী লায়েল মার্খেল কোম্পানি রেশমের ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়াছে।

কতিপয় বৎসর পূর্ব্বেও, বাঙ্গালার রেশমই ইংলণ্ডের সর্ব্বপ্রধান অবলম্বন ছিল;—বাঙ্গালা হইতে ইংলণ্ডে প্রতি-বৎসর প্রভূত পরিমাণে রেশম রপ্তানি হইত। অধুনা ইংলণ্ডে এই রেশমের রপ্তানি যে শুধু কমিয়া গিয়াছে, তাহা নহে; পক্ষান্তরে, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জাপান এবং চীন হইতে বৎসর বৎসর অপর্য্যাপ্ত পরিমাণ রেশম এ দেশে আমদানী হইতেছে। নিম্নলিখিত তালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই, আমদানী-রপ্তানির হিসাবে, বাঙ্গালার রেশমের কতদূর দুর্গতি ঘটিয়াছে, তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে :—

বর্ষ—	রপ্তানি—	আমদানী—
১৮৯০—'৯১	৬৩, ৫০, ৫৩৬ টাকা	১১, ৭৯, ৯৬৩ টাকা
১৯০০—'০১	৫৭, ৬৮, ৪২৭ „	৮, ৬৭, ৫৪৬ „
১৯০৫—'০৬	৪৮, ৩৪, ৪৮৩ „	১১, ৪০, ৬০৬ „
১৯১০—'১১	৩২, ৩২, ৩২৯ „	১৯, ৩৩, ৮৯৭ „

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ১৮৯০-৯১ সনে রপ্তানি আমদানীর প্রায় ছয়গুণ ছিল; কিন্তু ১৯১০-'১১ সনে অর্থাৎ বিশবৎসরমধ্যে আমদানীর পরিমাণ রপ্তানির অর্দ্ধেকেরও অধিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সম্প্রতি বিদেশীয়, বিশেষতঃ জাপানী, রেশমের আদর এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, ১৩১৪-'১৫ সনে, রপ্তানি হইতে আমদানীর পরিমাণ অধিক হওয়াই সম্ভব। বাঙ্গালার একটী প্রাচীনতম ও সমৃদ্ধ শিল্পের ঈদৃশ শোচনীয় অবস্থা এবং ভাবী অধঃপতনের বিষয় চিন্তা করিলে, স্বদেশপ্রেমিক এবং কৃষি-শিল্পোৎসাহী ব্যক্তি-মাত্রেরই হৃদয় একান্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে।

কি কারণে বাঙ্গালায় রেশমশিল্পের অবনতি ঘটিয়াছে, এবং কি উপায় অবলম্বন করিলে শিল্পটীকে পুনরায় সুপ্রতিষ্ঠিত করা যাইতে পারে, তাহা নির্দ্ধারণোদ্দেশ্যে আমি বিগত পাঁচবৎসরকালমধ্যে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মপরিচালনা, রেশমকেন্দ্র পরিদর্শন ও অনুসন্ধান এবং মদীয়ক্ষুদ্রশক্তি-সম্ভূত অভিজ্ঞতা ও গবেষণা দ্বারা যে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহাই লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিব। মুখ্য ও গৌণভেদে শিল্পটীর অবনতির দুইপ্রকার কারণ আছে। এ পর্য্যন্ত শুধু মুখ্যকারণ নিরাকরণেরই প্রচেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু গৌণকারণসমূহের প্রতিবিধান-কল্পে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে উল্লেখযোগ্য কোন চেষ্টা করা হইয়াছে, এরূপ বলা যাইতে পারে না। এই গৌণকারণগুলি ব্যষ্টিভাবে নিতান্ত ক্ষুদ্র, কাজেই অবহেলার যোগ্য, এরূপ মনে করা নিতান্তই ভ্রম। কারণ, ইহাদেরই সমষ্টির ফলে,

মুখ্যকারণগুলির প্রতিকারসত্ত্বেও এ পর্য্যন্ত শিল্পটীর দুর্গতির কোনও প্রতিকার হয় নাই।

তুঁতপত্র রেশমকীটের খাদ্য; সুতরাং, প্রথমতঃ তুঁতের চাষসম্বন্ধেই আলোচনা করিব। যে জমিতে তুঁতের চাষ করা হয়, অপর শস্যের তুলনায়, তাহার কর ভূমাধিকারীগণ প্রায় দ্বিগুণ আদায় করিয়া থাকেন। ভূমির উৎকর্ষাপকর্ষ অনুসারে, বিঘাপ্রতি তুঁতের জমির কর প্রায় আট আনা হইতে দুই টাকা হারে আদায় করা হয়। কিন্তু ঐ একই ভূমিতে অপর শস্য উৎপাদন করিলে, তজ্জন্য চারি আনা হইতে এক টাকার অধিক হারে খাজানা দিতে হয় না। তুঁতভূমির জন্য এইরূপ বর্দ্ধিতহারে খাজানা আদায়ের পোষকতায়, ভূমাধিকারীগণের পক্ষ হইতেও ন্যায্য বক্তব্য রহিয়াছে। তুঁতক্ষেত্রে প্রতিবৎসর পচা মাটীর (Silt) সার প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। এইরূপে কএক বৎসর সারপ্রয়োগের ফলে, তুঁতক্ষেত্রগুলি পার্শ্বস্থ ক্ষেত্র হইতে এত অধিক উচ্চ হইয়া পড়ে যে, তাহা অপরাপর ফসলচাষের অযোগ্য হইয়া উঠে। কাজেই ভূমির মূল্য অত্যন্ত কমিয়া যায়। এই নিমিত্ত তুঁতের জমি কোনও এক চাষী ছাড়িয়া দিলেও, যাহাতে খাজানার প্রচলিত হারে, উহা সহজেই পুনরায় অপর কোনও চাষীর নিকট পত্তন করা যায়, তদুদ্দেশ্যেই ভূস্বামীগণ তুঁতচাষের জন্য অধিক কর নির্দ্ধারিত করেন। এইরূপে সারপ্রয়োগ, অধিক হারে খাজানা প্রদান এবং ঝোপ-তুঁতের রক্ষণ-অবেক্ষণের জন্য তুঁতচাষীদিগকে বহু অর্থব্যয় করিতে হয়। ফলে, তাহারা সস্তায় রেশম গুটী বিক্রয় করিতে পারে না। সুতরাং কুঠিয়ালগণও উচ্চমূল্যে কোয়া (cocoon) ক্রয় করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু এই কোয়া 'কাটাই' করিয়া যে রেশম পাওয়া যায়, তদ্দ্বারা উপযুক্তরূপে লাভবান না হওয়াতে তাহারা আর গুটী ক্রয় করে না; কাজেই কাটাইর কাজও (Reeling of Raw silk) বন্ধ হইয়া যায়। এইভাবেই মেদিনীপুরে রেশমশিল্পের অধঃপতন ঘটিয়াছে।

আমরা ঝাড় বাঁধিয়া তুঁতের চাষ করিয়া থাকি। ঝাড়-তুঁতের পুষ্টিকারিতা বড়ই কম। আর বহুচক্রী (Multi-voltine) ব্যতীত অপর কোনও রেশমকীটই ইহা তত পসন্দ করে না। বাঙ্গালার কোন্ জাতীয় রেশমকীট পালন করা উচিত, তৎসম্বন্ধে পরে আলোচনা করিব। তুঁত-চাষের সংশ্রবে ইহাই বলিতেছি যে, সেই জাতীয় কীটপালনের পক্ষে ঝোপতুঁত বিশেষ উপযোগী নহে। আমাদিগকে নূতনভাবে তুঁতের চাষ করিতে হইবে। আট ফুট অন্তর তুঁতের চারা বা কলম ক্ষেত্রে রোপণ করিয়া, সেগুলি পাঁচ হইতে সাড়ে পাঁচ ফুট উচ্চ হইলে, তাহাদের ডগাগুলি কাটিয়া দিতে হইবে। তৎপর কর্ত্তিতস্থান হইতে শাখা বাহির হইয়া, ক্রমে তাহা সুন্দর তুঁতবৃক্ষে পরিণত হইবে। কিন্তু এই সকল শাখা দশ কি বার ফুটের অধিক বড় হইতে দেওয়া উচিত নহে। দুইবৎসর পর, এই সকল 'বামনবৃক্ষ' (Dwarf tree) হইতে পত্রসংগ্রহ করিয়া পলু (Silk worm) পোষা যাইতে পারে। এইভাবে তুঁতের চাষ করিলে, একদিকে যেমন খরচও কম হইবে, অপরদিকে ঝোপগাছ (Bush) হইতে পাতাও অধিক পাওয়া যাইবে। আবার গাছে অনায়াসে রৌদ্র ও বাতাস লাগাতে ঝোপ-তুঁতের শত্রু 'টুকরা'-রোগ দ্বারা ইহার কোনও অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা রহিবে না। 'বামনবৃক্ষে' সারপ্রয়োগেরও বিশেষ সুবিধা রহিয়াছে। ঝোপচাষের ন্যায়, সমুদয় ক্ষেত্রে সার প্রয়োগ না করিয়া, প্রত্যেক বৃক্ষের চতুর্দ্দিকের একটু পরিমিত ভূমিতে সারপ্রয়োগ করিলেই চলিতে পারে। এইরূপে সারপ্রয়োগ করিলে (কৃত্রিমসার সর্ব্বোৎকৃষ্ট) জমির কোনও অনিষ্ট হইবে না বা আদরও কমিবে না। সুতরাং কররৃদ্ধিরও সম্ভাবনা রহিবে না।

সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, বাঙ্গালার রেশমকীটের বংশগত অধঃপতন (Degeneration) ঘটিয়াছে। ফলতঃ, প্রাণীতত্ত্বানুসারে বহুচক্রী-স্বভাবও (Multivoltine character) বাঙ্গালার রেশমকীটের অধোগতিরই পরিচায়ক। আমাদের পলু অত্যন্ত ক্ষুদ্র—বিলাতী, জাপানী কিম্বা চীনা পলু (Silk-worm) 'লোদের কলপে'র (Last moult) পূর্ব্বেই, বাঙ্গালার পূর্ণবয়প্রাপ্ত পলু অপেক্ষা আকারে বড় হয়। অনেকে অনুমান করেন যে, বাঙ্গালার ঝোপতুঁতের অপুষ্টিকর পাতা খাইয়াই পলু-গুলিও আকারে বড় হইতে পারে না। আবার ইহাও

শুনিতে পাওয়া যায় যে, অস্বাস্থ্যকর স্থানে এবং যথোপযুক্ত প্রণালীতে পালিত না হওয়াতেই, ইহারা ক্ষুদ্রকায় হইয়া পড়িয়াছে। পক্ষান্তরে, কেহ কেহ এরূপও বলিয়া থাকেন যে, উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্যের অভাবে ইহারা বড় হইতে পারে না। ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, বসনীগণ (Rearers) পলুকে যথোপযুক্ত আহার প্রদানে প্রকৃতই কার্পণ্য প্রদর্শন করিয়া থাকে; এবং একশ্রেণীর লোক শুধু তুঁতপত্রবিক্রয়ের ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকাতে, এই কৃপণতার মাত্রা সমধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। কারণ, এই পত্র-বিক্রেতার দল থাকাতে, যাহাদের তুঁতক্ষেত্র মাত্রই নাই তাহারাও পলু পুষিতে পারিতেছে। এরূপ বসনীরা যে পলুকে উপযুক্ত আহার প্রদানে কৃপণতা করিবে, তাহাতে আর বিস্ময়ের বিষয় কি আছে? কিন্তু অন্যবিধ পরীক্ষা দ্বারা ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্যের অভাবেই পলুগুলি ক্ষুদ্রকায় হয় নাই। আমি স্বহস্তে কতকগুলি বাঙ্গালার পলু ও বিলাতী পলু পুষিয়াছিলাম। দেশী পলুগুলিকে প্রত্যহ বহুবার ও যথোপযুক্ত পরিমাণে তুঁতপত্র দেওয়া হইত এবং বিলাতী পলুগুলিকে বারে এবং পরিমাণে তদপেক্ষা কম খাদ্য দিয়াছিলাম। তথাপি গুটী করিবার সময়, উভয়ের আকারের পার্থক্য রহিয়াই গেল। ইহা হইতেই এই সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায় যে, এই উভয় জাতীয় পলুর আকারের পার্থক্য খাদ্যের প্রাচুর্য্য বা অপ্রচুর্য্যজাত নহে;—ইহা বংশগত একটী বিশেষত্ব। এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, এই বিশেষত্বটী পুরুষানুক্রমিক অপ্রচুর আহারের ফল কিনা, তাহা স্থিরীকৃত হয় নাই। যাহা হউক, এই সকল ক্ষুদ্র পলুর কোয়াও ছোট ছোট। ইহারা এত ছোট যে, ইহাদের বৃহত্তম কোয়া বৈদেশিক তৃতীয় শ্রেণীর কোয়া হইতেও ক্ষুদ্র। ইহাদের রেশম-তন্তুও ছোট এবং পরিমাণে কম। একই অবস্থায় উভয়বিধ পলু পাশাপাশি পুষিয়া দেখা গিয়াছে যে, গড়ে প্রত্যেক বৈদেশিক কোয়ার ওজন ১৮০০ মিলিগ্রাম এবং তাহাতে ২০০ মিলিগ্রাম রেশমতন্তু আছে; কিন্তু বাঙ্গালার কোয়ার ওজন ৬০০ মিলিগ্রাম ও তন্মধ্যে মাত্র ৪০ মিলিগ্রাম রেশম পাওয়া যাইতে পারে। অর্থাৎ বাঙ্গালার পাঁচটী কোয়া হইতে যে রেশম পাওয়া যায়, বিদেশীয় কোয়ার একটীতেই সেই পরিমাণ রেশম আছে। অধিকন্তু, দেশী-কোয়ার রেশমতন্তু গুণেও বৈদেশিক কোয়ার তন্তু হইতে নিকৃষ্ট। রেশমকীটের বংশগত অধঃপতনই বাঙ্গালার রেশমশিল্পের অবনতির সর্ব্বপ্রধান কারণ।

বাঙ্গালার পলুর কোয়া ও রেশম নিকৃষ্ট হইলেও, ইহারা বৎসরে অনেকবার গুটী প্রস্তুত করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে, বিদেশীয় পলুর রেসম উৎকৃষ্ট হইলেও, উহারা বৎসরে প্রধানতঃ একবারমাত্র কোয়া প্রস্তুত করে। প্রত্যেকবার সামান্য পরিমাণ লাভ হইলেও, বহুচক্রী-কীট পুষিয়া কৃষকগণ বৎসরান্তে অনায়াসে যে পরিমাণ লাভ করে, একবার মাত্র একচক্রী-কীট পুষিয়া তাহারা সেই পরিমাণ উপার্জ্জন করিতে পারে না বলিয়াই, আমাদের দেশের নিরন্ন কৃষকগণ নিকৃষ্ট হইলেও বহুচক্রী-কীটেরই আদর করিয়া থাকে। এ অবস্থায় উভয়দিক রক্ষা করিতে হইলে, বৈদেশিক উৎকৃষ্ট একচক্রী (univoltine) ও দেশীয় নিকৃষ্ট বহুচক্রী, এই উভয়জাতীয় কীটের মিলন দ্বারা একজাতীয় উৎকৃষ্ট অথচ স্থায়ী বহুচক্রী সঙ্করকীট উৎপাদনপূর্ব্বক, বসনী-দিগকে তাহাই পালন করিতে দিতে হইবে। এইরূপ সঙ্করকীট পালন করিয়া এই লাভ হইবে যে, আমরা উৎকৃষ্ট কোয়াপ্রস্তুতকারী অথচ বহুচক্রী একজাতীয় কীট প্রাপ্ত হইব। এই সঙ্করকীটের এক আউন্স বীজ হইতে কোয়ার যে ফলন হইবে, দেশীয় কীটের অন্যূন তিন আউন্স বীজ হইতে সেই পরিমাণ কোয়া ও রেশম পাওয়া যাইতে পারে। কাজেই বসনীগণ যখন দেখিতে পাইবে যে, ছয় 'বন্দে' দেশী পলু পুষিয়া যে লাভ হইত, শুধু দুই বন্দ (Season) সঙ্করকীট পালন করিয়াও তাহারা অনায়াসে সেই পরিমাণ লাভ করিতে পারে, তখন দেশী কীটপালনের সপক্ষে তাহাদের চিরার্জ্জিত ভ্রান্তধারণা বিদূরীত হইবে এবং তাহারা এই নূতন পলু আগ্রহের সহিত পালন করিতে তৎপর হইবে। কিন্তু এরূপ কীটবংশস্থাপনের বহু স্বাভাবিক অন্তরায়ও রহিয়াছে; এবং সকলের দ্বারা ইহা সুসম্পন্ন হইবার সম্ভাবনাও নাই। এ সম্বন্ধে বিস্তৃতবিবরণ মৎপ্রণীত ইংরেজী ভাষায় লিখিত "বাঙ্গালার রেশমশিল্পের

অধঃপতন ও তাহার প্রতিকারোপায়" (Decline of the Silk Industry of Bengal and How to Arrest it) নামক পুস্তিকায় ও ১৩১৮ বঙ্গাব্দের 'কৃষি-সম্পদ' পত্রিকায় লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

পলুপোষা সম্বন্ধেও দুই একটী কথা বলা আবশ্যক। বসনীরা দিবসে তিন কি চারি বারের অধিক পলুকে পাতা খাইতে দেয় না। ইহাতে পলুর শরীর ও স্বাস্থ্য—উভয়ই নষ্ট হয়। ডিম ফুটিয়া বাহির হইবার পর, কএক দিন পর্য্যন্ত পলুকে ঘন ঘন পাতা দেওয়া আবশ্যক। তারপর পলু যতই বড় হইতে থাকিবে, পাতা দেওয়ার বারের সংখ্যাও ততই কমাইতে হইবে। কিন্তু শেষের কলপের (Last moult) পরে দিবসে অন্ততঃ পাঁচবার পাতা দেওয়া উচিত। প্রাণীমাত্রই শৈশবাবস্থায় ঘন ঘন আহার করিয়া থাকে। পলুর প্রথমাবস্থায় ঘন ঘন খাইতে না দেওয়াও, কাজেই একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার হইয়া পড়ে। এইরূপ প্রকৃতিবিরুদ্ধভাবে পাতা দেওয়ার ফলে, পলুগুলি দুর্ব্বল ও রুগ্ন হইয়া পড়ে। বাঙ্গালার গ্রীষ্মপ্রধান জলবায়ুতে পদার্থমাত্রই অতি শীঘ্র শুষ্ক হইয়া যায় বলিয়া, তুঁতপত্রের পুষ্টিকর জলীয়পদার্থও শীঘ্রই নিঃশেষিত হইয়া যায়। কাজেই, এই পাতা খাইয়া শিশু পলুর তেমন পুষ্টিসাধন হয় না। তদ্ভিন্ন, ইহাদের কোমল দাঁত ও চোয়াল শুষ্কপত্র ছিঁড়িতে যাইয়া সহজেই অবসন্ন হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে, বায়ুতে প্রচুর জলীয়বাষ্প রহিলে পত্র সহজে শুষ্ক হইতে পারে না বটে, কিন্তু দীর্ঘকালের উপযোগী অতিরিক্ত পত্র একসঙ্গে দেওয়াতে পলুর 'কাশার' ভিজা ও স্যাৎস্যাতে হইয়া যায়। এই উভয় কারণেই রোগের উৎপত্তি হওয়াতে বহু পলু মৃত্যুমুখে পতিত হয়। নিম্নলিখিত নিয়মে পলুকে পাতা খাইতে দেওয়া উচিত:—

প্রথম অবস্থায় (First stage)	দিবসে	৭	বার
দ্বিতীয় "	"	৬	"
তৃতীয় "	"	৬	"
চতুর্থ "	"	৬	"
পঞ্চম বা শেষ অবস্থায়	"	৫	"

প্রাতে ৬টা হইতে রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত এগার ঘণ্টা সময়, সমভাবে উল্লিখিত কএকভাগে বিভক্ত করিয়া, ঐ নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর পাতা দিতে হইবে। পাতা হাতে যত কম নাড়াচাড়া যায় ততই ভাল। পলু পুষিয়া সুফল লাভ করিতে হইলে, পলুর ঘরে যাহাতে প্রচুর পরিমাণ বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চালিত হয়, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বিশুদ্ধবায়ুসঞ্চালনের উপকারিতা বর্ণন করিয়া শেষ করা যায় না। ইটালী দেশের অন্তর্গত ক্রিমোনার কৃষি-সমিতি বিশুদ্ধবায়ুসঞ্চালনের উপকারিতা প্রদর্শন করিবার জন্য, ১৯১৪ সনে, মুক্তাকাশতলে পলু পুষিয়া সুফল লাভ করিয়াছিল। বিশুদ্ধ বায়ুসঞ্চালনের জন্য আমাদের বসনীরা কি করিয়া থাকে? তাহাদের পলুপোষার মাটীর ঘরে একটী দরজা ব্যতীত বায়ু চলাচলের অন্য পথ মাত্র নাই। দেওয়ালের শীর্ষভাগে এক একটী ক্ষুদ্র ছিদ্র রাখিয়া দিয়া, তাহারা অনায়াসে পলুগুলিকে বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করাইতে পারে।

পরভুক্ মাছি (Parasitic Fly) দ্বারাও রেশমশিল্পের সামান্য ক্ষতি হয় নাই। এরূপ অনুমান করা হয় যে, সমুদয় ফসলের শতকরা প্রায় দশভাগ মাছির উপদ্রবে নষ্ট হইয়া যায়। এই মাছি মারিবার জন্য ৺ নিত্যগোপাল বাবু নানাপ্রকার উপায় উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন। সম্প্রতি কলিকাতার বড় বড় ঔষধালয়ে মাছিমারা কাগজ (Fly paper) নামে একপ্রকার কাগজ কিনিতে পাওয়া যায়। এই কাগজের গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া মাছি তাহার উপরে বসিলেই, মাছির পা ও পাখা কাগজস্থ আঠায় এরূপ দৃঢ়ভাবে আটকাইয়া যায় যে, সে কিছুতেই আর পলাইতে পারে না। পলু পুষিবার ঘরে কএক তা এই কাগজ রাখিয়া দিলে, তদ্দ্বারা বিশেষ সুফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে।

বাঙ্গালায় রেশমকীটের বীজ কিনিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু 'সঞ্চ' অর্থাৎ বীজগুটী বাজারে, গবর্ণমেন্টের বা প্রাইভেট নার্শারীতে কিনিতে পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর গুটী হইতে যে বীজ পাওয়া যায়, তাহা অপরীক্ষিত অবস্থায়ই পলুপোষার জন্য রাখা হয়। অপরীক্ষিত বীজব্যবহারের দোষে 'কটা'-রোগ দেশে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ফলে, কোয়ার ফলন ভাল হয় না; কখন কখন আদৌ কোয়া

পাওয়া যায় না। কটা-রোগের বিস্তার বাঙ্গালার রেশম-শিল্পধ্বংসের একটী সর্ব্বপ্রধান কারণ। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে, কটা-রোগের প্রাদুর্ভাবে সমগ্র ইউরোপের রেশমশিল্প ধ্বংসোন্মুখ হইয়াছিল। এমতাবস্থায় ফ্রান্সের স্বনামখ্যাত কীটাণুতত্ত্ববিদ্ পাস্তর সাহেবের উদ্ভাবিত সেলুলার (Cellular) প্রণালীতে অণুবীক্ষণযন্ত্রপরীক্ষিত একমাত্র সুস্থ চোকরীর (Female moth) বীজ হইতে পলু পুষিয়া, ইউরোপ পুনরায় স্বপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালায় অদ্যাপি উক্ত উৎকৃষ্টতম প্রণালী প্রবর্ত্তিত হয় নাই। আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে, বহুসংখ্যক বসনী অণুবীক্ষণযন্ত্রের নামও শুনে নাই।

এই রোগের নিবারণকল্পে, বসনীরা শুধু তুতিয়া ও গন্ধকের সাহায্যে পলুপোষা ঘর ও অপরাপর সাজসরঞ্জাম শোধন করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকে। দুঃখের বিষয়, গবর্ণমেণ্টও ইহার অতিরিক্ত কিছুই করিতেছেন না। এই প্রকার শোধনের আশু উপকারিতা থাকিলেও, ইহা দ্বারা বিশেষ কোনও স্থায়ী সুফল ফলিবে না। ভিজা গামছা গায়ে মুছিয়া জ্বর-রোগীর শরীরের উত্তাপ কমাইবার চেষ্টা বৃথা। রোগের বীজ সমূলে উৎপাটন করিতে হইবে। বাঙ্গালায় অণুবীক্ষণযন্ত্রের সাহায্যে চোকরী পরীক্ষা না করিয়া এবং বাহ্যিক আকার-প্রকার ও লক্ষণ দ্বারা চোকরী বাছিয়া, তাহা হইতেই বীজসংগ্রহ করা হয়। এরূপ বহু চোকরী দেখা গিয়াছে, যাহাতে দৃষ্টতঃ কোনও রোগের লক্ষণ না থাকা সত্ত্বেও, তাহাতে কটারোগের অসংখ্য বীজ রহিয়াছে। কাজেই, অনেকসময় কটারোগের আক্রমণ শুধু বাহ্যলক্ষণ দেখিয়া স্থির করা যায় না। ফ্রান্স, ইটালী ও জাপান প্রভৃতি দেশে শুধু দৃষ্টি দ্বারা চোকরী-নির্ব্বাচনের প্রথা একটা উপহাসের বিষয়। কটা পুরুষানুক্রমিক ব্যাধি; সুতরাং বীজনির্ব্বাচনবিষয়ে অণুবীক্ষণের সাহায্যও অপরিহার্য্য। এই প্রণালীতে প্রত্যেক জোড় চোকরা ও চোকরীর পৃথক পৃথক মিলন করাইতে হয়; আর তাহাদের বীজও স্বতন্ত্র রাখিতে হয়। একটী চোকরা যাহাতে একাধিক চোকরীর সহিত মিলিত হইতে না পারে, তৎপ্রতিও লক্ষ্য রাখিতে হয়। এক এক জোড় সুস্থ চোকরা ও চোকরী এক একটা শোধিত টীনের খুরীর (Tin Funnel) নীচে আবদ্ধ করিয়া, উহাদিগকে ছয়ঘণ্টাকাল মিলন করাইতে হইবে। ছয়ঘণ্টা মিলনের পর, চোকরাটী ফেলিয়া দিয়া এবং শুধু চোকরীটিকে আর একখানা কাগজের উপর রাখিয়া, পুনরায় খুরী দ্বারা ঢাকিয়া দিয়া ডিম পাড়িতে দেওয়া হয়। তারপর প্রত্যেকটী চোকরীর রস অণুবীক্ষণসাহায্যে পরীক্ষা করিতে হইবে। পরীক্ষায় কোনও চোকরীর রসে কটারোগের বীজাণু দেখা গেলে, সেই চোকরীর সমস্ত বীজই পুড়িয়া ফেলিতে হইবে। রোগবীজযুক্ত ডিম রাখা ঘোরতর আপত্তিজনক ও বিপদসঙ্কুল। যে সকল চোকরীর রসে কটারোগের চিহ্নমাত্রও নাই, এইরূপ চোকরীর বীজই পলু পুষিবার উপযোগী। যদি কোনও কাগজে শতকরা পাঁচটীর অধিক চোকরী কটারোগাক্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে সেই কাগজ হইতে একটী বীজও রাখা সঙ্গত নহে। কারণ, কটারোগের কীটাণু সমস্ত বীজেই সংক্রামিত হইবার সম্ভাবনা আছে।

যাহাতে কটারোগের বীজাণুসংখ্যা দেশ হইতে লুপ্ত হইয়া যায়, সেই উদ্দেশ্যে কঠোর আইন প্রণয়ন করা গবর্ণমেণ্টের একান্ত কর্ত্তব্য। অপরীক্ষিত বীজের ব্যবহার আইন বিরুদ্ধ কাজ বলিয়া নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত; এবং কোনও বসনী অপরীক্ষিত বীজ ব্যবহার করিলে তজ্জন্য তাহার অর্থদণ্ড হওয়া উচিত। প্রত্যেক রেশমোৎপাদক দেশেই বহুকালাবধি এইরূপ আইন প্রচলিত রহিয়াছে। তাহাতেই তত্তদ্দেশীয় রেশমশিল্প বর্ত্তমান সমুন্নত অবস্থায় পৌঁছিয়াছে। সুতরাং, বাঙ্গালার ন্যায় দেশে, এই মহা-প্রাচীন ধ্বংসোন্মুখ শিল্পটীর রক্ষার জন্য, ঐরূপ আইন প্রণয়ন যে কিরূপ আবশ্যক, তাহা সহজেই অনুমেয়। এই আইন বিধিবদ্ধ হইলে অপকৃষ্ট বীজোৎপাদন একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে। ফলে, বীজোৎপাদকের অনটন ঘটিবার সম্ভাবনা। সেই অভাব পূরণ করিবার নিমিত্ত রেশম-কেন্দ্রের বহুস্থানে গবর্ণমেণ্টকে বহু বীজের কারখানা খুলিতে হইবে। এই সকল কারখানায় সঞ্চ বা বীজগুটী বিক্রয় না করিয়া, চোকরীর বীজ বা অণ্ড বিক্রয় করিবার

বন্দোবস্ত করিতে হইবে। কোনও বসনী বীজ পাড়াইয়া স্বয়ং চোকরী-পরীক্ষায় অসমর্থ হইলে, গবর্ণমেণ্টকে আদৌ বিনামূল্যে তাহার চোকরীগুলি পরীক্ষা করিয়া দিতে হইবে। বিনামূল্যে সম্ভবপর না হইলে, যথাসম্ভব সুলভে চোকরীগুলি পরীক্ষা করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বসনীদিগের সাহায্য করিতে হইবে। এই উপায় অবলম্বন করিলে, অধিক পরিমাণে উৎকৃষ্ট ফসল পাইয়া, বসনীরাও দ্বিগুণ উৎসাহ ও আগ্রহ সহকারে পুনরায় পলু পুষিতে আরম্ভ করিবে।

রপ্তানিকৃত রেশমের মূল্য যে বৎসরের পর বৎসর ক্রমেই হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু রপ্তানির মূল্য যে হারে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে, পরিমাণে তাহা সেই অনুপাতে কমে নাই। এতদ্দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বাঙ্গালা হইতে নিকৃষ্ট শ্রেণীর রেশমই রপ্তানি হইতেছে। অপর দেশীয় রেশমের তুলনায়, বাঙ্গালার রেশম যে কত নিকৃষ্ট, নিম্নলিখিত মূল্যতালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

ফরাসী	রেশমের	প্রতি	পাউণ্ডের	দর	১৫৲ টাকা
ইটালীয়	„	„	„	„	১৫৲ „
জাপানী	„	„	„	„	১৩।০ „
বাঙ্গালার	„	„	„	„	৯।০ „

ভারতের বাহিরে শুধু ইউরোপেই বাঙ্গালার রেশম বিক্রীত হয়। ইউরোপে উত্তম সূক্ষ্ম রেশমের জন্য উচ্চমূল্য পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু নিকৃষ্ট রেশমের গ্রাহক অধিক না থাকাতে সেখানে উহার মূল্য বড়ই কম। কাজেই, ইউরোপে বাঙ্গালার রেশম বিক্রয় করিতে যথেষ্ট বেগ পাইতে হয়। পক্ষান্তরে, উচ্চমূল্যে বিক্রীত না হওয়াতে শিল্পী বা বিক্রেতা কাহারই যথোপযুক্ত লাভ হয় না। ফলে, পাশ্চাত্য-বাজারে বাঙ্গলার রেশমের ভবিষ্যৎ ক্রমশঃই সঙ্কীর্ণ হইতে সঙ্কীর্ণতর হইয়া উঠিতেছে।

কি কি দোষে আমাদের রেশম নিকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হইতেছে, এবং কি কি উপায়ে সেই সকল দোষ নিরাকৃত হইতে পারে, প্রথমতঃ তাহারই বিচার করিব।

(ক) সূত্রের সমবেধত্ব:—

পাশ্চাত্য-বাজারে প্রত্যেক রেশমের সূত্র, একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত, সমবেধবিশিষ্ট (unisonal) কিনা, তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করা হয়। যদিও বাঙ্গালার রেশমের কোনও নির্দ্দিষ্ট নম্বর (Size বা Denier) মোটের উপর ঠিকই রাখা হয়, তথাপি সতর্কতার সহিত পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, স্থানে স্থানে উহা অত্যন্ত মোটা, আবার বহুস্থানে যারপর নাই মিহি। কিন্তু জাপানী বা ইউরোপীয় রেশমে এই দোষ প্রায় নাই বলিলেও চলে। সূত্রের এই দোষ প্রধানতঃ দুইটী কারণেই ঘটিয়া থাকে; (১) কাটনীর অসতর্কতা বা প্রতারণা এবং (২) অতি দ্রুতবেগে তবিলের (Reel) ঘূর্ণন। সতর্কতা বা কঠোরতার সহিত কাটাইর কাজ পর্য্যবেক্ষণ ও পরিদর্শন করিলেই, প্রথম দোষটী সংশোধিত হইতে পারে। কি হিসাবে, অর্থাৎ মিনিটে কতবার তবিলটী ঘোরা উচিত, দ্বিতীয় দোষের সংশোধন করিতে হইলে, তাহাও নির্দ্ধারিত হওয়া আবশ্যক। সাধারণতঃ তবিল এত দ্রুত ঘোরান হয় যে, কাটাইকালে কোয়া হইতে সূত্র যত শীঘ্র নিঃশেষিত হইয়া তবিলে জড়াইয়া যায়, কাটনী তত সত্বর নূতন কোয়ার 'গুচ্ছি' যথাযথরূপে ফেলিতে পারে না। অথচ সূত্রের নম্বর ঠিক রাখিবার জন্য কখনও কখনও অধিক গুচ্ছিও ফেলিতে হয়। ইহাতেই সূত্রের বেধ সর্ব্বত্র সমান রহে না। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, প্রতি মিনিটে ১২৫ হইতে ১৫০ বার তবিল ঘুরাইলে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায়।

(খ) ভারসহনীয়তা:—

এই গুণের তারতম্যানুসারে রেশমসূত্রের মূল্যেরও যথেষ্ট হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে। উচ্চশ্রেণীর রেশমের প্রত্যেকটী লক (Bave) প্রায় ৮ গ্রাম্ ভার সহিতে পারে, কিন্তু বাঙ্গালার রেশমের লক ৫ গ্রামের অধিক সহিতে পারে না; অর্থাৎ বাঙ্গালার রেশমের তুলনায় অপরাপর, উচ্চ-শ্রেণীর রেশম প্রায় দেড়গুণ অধিক মজবুত। কাটাই করিবার সময় সূত্রে যথোপযুক্ত 'ফের' (twist) না লাগিলে এবং ঊষে (Chrysalis) মারা ও কোয়া শুকাইবার দোষেই সাধারণতঃ সূত্রের ভারসহনীয়তা হ্রাস হয়। গ্রন্থিবিশিষ্ট

সূত্র এই গুণে বড়ই হীন। সূত্রে পাক দেওয়া ও ঈষে মারিবার নিয়ম পরে বর্ণিত হইল।

(গ) ফিরাণ:—

ফিরাণের ত্রুটীই ইউরোপের বাজারে বাঙ্গালার রেশমের অনাদরের সর্ব্বপ্রধান কারণ। উৎকৃষ্ট রেশমের ৯০ হইতে ১০০ বন্দী (skeins) পর্য্যন্ত একজন লোকেই ফিরাণ করিতে পারে। আমাদের রেশমে ছুট্ (Ends) এত বেশী থাকে যে, একজন লোকে কিছুতেই ২৫ বন্দীর অধিক ফিরাণ (unwind) করিতে পারে না। দৈনিক হিসাবে পাশ্চাত্য-দেশে মজুরী অত্যন্ত বেশী। কাজেই বাঙ্গালার রেশমের ফিরাণ করাইতে সেখানে কারখানাওয়ালাগণের আয়ের অনুপাতে ব্যয় অধিক হয় বলিয়া, ফিরাণ করা না হইলে তাঁহারা বাঙ্গালার রেশম কিনিতে চায় না। অথচ, রেশম ফিরাণ করিয়া বিক্রয় করিবার প্রথা আমাদের দেশে আদৌ নাই বলিলেও চলে। বাঙ্গালার রেশম ব্যবসায়ীগণ ফিরাণ করিয়া ইউরোপে রেশম পাঠাইলে, প্রতি পাউণ্ডে দুই হইতে তিন টাকা পর্য্যন্ত অতিরিক্ত মূল্য পাইতে পারেন। প্রতি পাউণ্ড রেশম ফিরাণ করিতে আট আনার অধিক খরচ পড়ে না। ফিরাণ করা রেশম ইউরোপে রপ্তানি করিয়া, ব্যক্তিগতভাবে তাঁহারাও লাভবান হইবেন; আর সঙ্গে সঙ্গে শিল্পটীর এবং দেশেরও এক মহদুপকার সাধিত হইবে।

(ঘ) ছুট:—

অত্যধিক ছুটের জন্যই যে প্রধানতঃ ফিরাণের দোষ ঘটে, রেশমের কাট্‌তি হ্রাস পায় এবং রেশম অল্পমূল্যে বিক্রীত হয়, তাহা ইতঃপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং রেশমে যাহাতে অত্যধিক ছুট না থাকে, তদ্বিষয়ে কতদূর সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক, তাহা সহজেই অনুমেয়। বিশেষতঃ, বর্ষাকালে যে রেশম কাটাইকরা হয়, তাহাতে এত অধিক ছুট থাকে যে, তদ্দ্বারা কোনও ভাল কাজই হইতে পারে না। রেশম অত্যন্ত বাষ্পশোষক (Hygroscopic) পদার্থ। ইহা দৃষ্টতঃ অত্যন্ত শুষ্ক বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও, স্বভাবতঃই স্ব ওজনের দশমাংশ জলীয়বাষ্প ধারণ করিতে সমর্থ। বর্ষাকালে বাঙ্গালার বায়ু জলীয়বাষ্পে পরিপূর্ণ রহে; সুতরাং, তৎকালীন রেশমও অত্যন্ত আর্দ্র থাকে এবং সহজে শুষ্ক হয় না। ফলে, বন্দীর সর্ব্বনিম্নস্থ সূত্রের (চিকের) যে অংশ তবিলের গায়ে লাগিয়া থাকে, সেই অংশের সূত্রগুলি জমিয়া এত শক্ত হইয়া যায় ও পরস্পর এত দৃঢ়সংবদ্ধ থাকে যে, ফিরাণ করিবার সময় অথবা বন্দী খুলিতে হইলে, সেই স্থানের সূত্র ছিন্ন হইয়া যায়। ফিরাণ করাই সর্ব্বপ্রকার ছুটের মহৌষধ। যাহাদের ফিরাণ করিবার সুবিধা নাই, অথচ বাদ্‌লা দিনে যাহাদিগের রেশম কাটাই করিতে হয়, তাহারা ইটালীদেশের 'উষ্ণাধার' (Hot case) ব্যবহার করিয়া যথেষ্ট সুফল পাইতে পারে। তবিলটীর চতুর্দ্দিকে একটী কাঠের বাক্স তৈয়ার করিয়া, তাহার মধ্যে, তবিলটীর নিম্নভাগে, একটী বাষ্পনালী পরিচালিত করিয়া উষ্ণ-বাক্স প্রস্তুত করা হয়। এই আধারের অভ্যন্তরভাগ বেশ গরম থাকে; কাজেই, রেশমসূত্র তবিলে জড়াইবার সঙ্গে সঙ্গেই শুষ্ক হইতে পারে বলিয়া, ছুটের সংখ্যা অনেক কমিয়া যায়।

(ঙ) ফুলকি:—

বাঙ্গালার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পলুর কোয়াও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র। এই সকল ছোট কোয়ার 'ঈষে'ও ছোট আর হাল্‌কা হয়। রেশম কাটাই করিবার সময়, তবিলের অতিদ্রুত আবর্ত্তনের ফলে, ক্ষুদ্র ও হাল্‌কা কোয়াগুলি ঘাই হইতে উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠাতে, ডেলার আকারে বড় বড় ফুলকি সূত্রের সঙ্গে তবিলে চলিয়া যায় এবং রেশম খারাপ করিয়া ফেলে। ফুলকি খাঁটী রেশমের সমবেধত্বধ্বংসকারী একপ্রকার ঝুট-রেশম (Waste silk) মাত্র। প্রচুর পরিমাণে আর্দ্রতা ধারণ করিবার শক্তি থাকাতে, ইহা অকৃত্রিম রেশমসূত্রকে নরম করিয়া দেয়; এবং ছুটের সংখ্যা বর্দ্ধিত করে। কাজেই ফুলকি থাকিলে রেশমের মূল্য হ্রাস পায়। বাঙ্গালার রেশমে অসংখ্য ফুলকি থাকে। কাটাইকালে রেশমে ফুলকি চলিয়া যাইবামাত্রই, উহা তুলিয়া ফেলা উচিত।

(চ) গাঁদ:—

পাকা রং করিতে হইলে, রেশমসূত্রের বহিরাবরণ—"সেরিসিন" নামক আঠাবৎ রাসায়নিক উপাদানটী গালিয়া ফেলিয়া, তারপর রং লাগাইতে হয়। এই উদ্দেশ্যে, রং

করিবার পূর্ব্বে, গরম জলে রেশম সিদ্ধ করিতে হয়। বাঙ্গালার রেশম, এই প্রক্রিয়াতে, ওজনে শতকরা ২৮ ভাগ ও অপরাপর উচ্চশ্রেণীর রেশম শতকরা মাত্র ২৫ ভাগ হাল্‌কা হয়। যাহারা সহস্র পাউণ্ড রেশমে রং করিয়া থাকে, এজন্য তাহাদের সামান্য ক্ষতি হয় না। উৎকৃষ্ট কোয়া প্রস্তুতকারী পলু পোষা ব্যতীত ফুলকি ও গাঁদের দোষ নিবারণের আর কোনও শ্রেষ্ঠ উপায় নাই।

বর্ণ, ঔজ্জ্বল্য, স্থিতিস্থাপকতা ও ভারসহনীয়তা—রেশমের এই চারিটী গুণের সহিতই ঈষে মারিবার প্রণালীর বিশেষ গুরুতর সম্বন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে। ঈষে মারিবার সর্ব্বপ্রধান তিনটী উপায় আছে; যথা:—

(১) রৌদ্রোত্তাপে মারা—বাঙ্গালার অধিকাংশস্থলেই এই প্রণালীর অনুসরণ করা হয়। ইহা অতি নিকৃষ্ট প্রথা। ইহা দ্বারা রেশমের প্রথমোক্ত চারিটী গুণই নষ্ট হয়।

(২) উষ্ণবায়ুর সাহায্যে মারা—ইহা প্রথমোক্ত প্রণালী হইতে শ্রেষ্ঠ।

(৩) বাষ্পসাহায্যে মারা—ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট পন্থা; এবং সকলেরই এই প্রণালীতে ঈষে মারা কর্ত্তব্য। বাঙ্গালার তুন্দুলসাহায্যে ঈষে মারার প্রথা, এই প্রণালীরই রূপান্তর মাত্র। বাষ্পসাহায্যে ঈষে মারিবার সুবিধা হইলে, 'তুন্দুল' ব্যবহার না করাই কর্ত্তব্য। বড় বড় কারখানাতে বয়লারের সাহায্যে বাষ্প উৎপাদন করা হয়; কিন্তু অল্প পরিমাণ কোয়ার ঈষে মারিতে হইলে কোনও সহজ উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে। কোনও অর্দ্ধপূর্ণ জলপাত্রের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহুছিদ্রযুক্ত একটী টুকরী এরূপভাবে বসাও যেন টুকরীটী জলস্পর্শ না করে। কোয়া ঢালিয়া টুকরীটী পরিপূর্ণ কর। চুপড়ী ও জলপাত্রটী একটুকরা চট দ্বারা ঢাকিয়া, উহা একটী উনানের উপরে রাখিয়া জল-সিদ্ধ করিতে থাক। জলপাত্রের বাষ্পে ঈষে মরিয়া যাইবে। এই উপায়ে, একটী মাত্র উনানের সাহায্যে, ঘণ্টায় অর্দ্ধমণ কোয়ার ঈষে মারিতে পারা যায়।

কাটাই করিবার পূর্ব্বে, গুণানুসারে কোয়া বাছাই করা নিতান্ত আবশ্যক। পলু পুষিয়া যে সকল কোয়া পাওয়া যায়, তাহার সমস্ত কোয়াই কোনও এক নির্দ্দিষ্ট নম্বরের সূতা কাটিবার উপযোগী হয় না। উৎকৃষ্ট রেশম কাটাই করিতে হইলে কোয়াও চাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট; আর নিকৃষ্ট কোয়া হইতে নিকৃষ্ট সূত্রই পাওয়া যায়। সুতরাং কোয়া বাছাই করিবার প্রয়োজনীয়তা এত অধিক যে, বিশেষজ্ঞ কাটানীও অবাছাই কোয়া হইতে দ্বিতীয়শ্রেণীর রেশমও কাটাই করিতে পারে না। কাটাই করিবার পূর্ব্বে, গুণভেদে কোয়া, বাছাই করিয়া; তাহা হইতে বিভিন্ন শ্রেণীর রেশম কাটাই করা উচিত।

কাটাইকালে লকে ফের দিলে, সূত্রের জল সহজে ঝড়িয়া পড়াতে, রেশম সহজে শুষ্ক হয়। তাহাতে ছুটের সংখ্যাও কমিয়া যায়। তদ্ভিন্ন, শুষ্ক রেশমের রং চমৎকার থাকে এবং ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি হয়। যথোপযুক্তসংখ্যক ফের থাকিলে রেশমে অধিক ফুলকি যাইতে পারে না। তাহাতে ছুটের সংখ্যা আরও কমিয়া যায়। ফেরের সংখ্যা ৩০০ হইতে ৩৫০ হওয়া উচিত। এই পরিমাণ ফের পড়িলে কাটাই-কালে ফের-যুক্ত স্থানটী ৮ কি ৯ ইঞ্চি দীর্ঘ হয় এবং ফেরের উপরিভাগের কোণটী নীচের কোণের প্রায় ডবল হয়। বাঙ্গালার কাটাই-যন্ত্রের বর্ত্তমান অবস্থায় ৩০০।৩৫০ ফের দেওয়াই যাইতে পারে না। কিন্তু কএকটী অতিরিক্ত পুলি (Pulley) ও হুক (Hook) ব্যবহার করিয়া, ইহাতেও ঐ পরিমাণ ফের দেওয়ার বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে।

কোয়া সিদ্ধ এবং কাটাই—এই উভয় উদ্দেশ্যে বাঙ্গালায় একটীমাত্র পাত্র ব্যবহৃত হয় বলিয়া, পাত্রের জল সর্ব্বদাই খুব গরম থাকে। এইরূপ অত্যুষ্ণ জলে সর্ব্বদা কাজ করিতে কাটনীদের বিশেষ কষ্ট হয়। বিশেষতঃ, কোয়া বহুক্ষণ অত্যুষ্ণ জলে থাকিয়া অতিরিক্তমাত্রায় সিদ্ধ হইয়া যাওয়াতে, কোয়ার 'সেরিসিন' গলিয়া যায়। ফলে, রেশম বহু ফুলকি-যুক্ত ও নরম হইয়া পড়ে। কাজেই একটীমাত্র পাত্রে কোয়া সিদ্ধ করা এবং রেশম কাটাই করিবার যে প্রথা আছে, তাহা যেমন অসুবিধাজনক তেমন ক্ষতি-কারকও বলিতে হইবে। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর রেশম কাটাই করিতে হইলে, কোয়া সিদ্ধ করিবার জন্য একটী এবং রেশম কাটাই করিবার জন্য আর একটী—এই দুইটী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পাত্র থাকা আবশ্যক। এই উভয় কার্য্যের জন্য, কোয়ার

ওণাহুসারে, জলের উত্তাপ যথাক্রমে ১৪০°—১৬০° ও ২০৫°—২১০° পর্য্যন্ত হওয়া উচিত। দুইটী পাত্র থাকিলে উত্তাপের এই বিভিন্নতা অতি সহজেই রক্ষা করা যাইতে পারে।

১৯১২ সনে, বাঙ্গালায় ২৯টী রেশমের কারখানায় (Filatures) ৩৫৩৩ জন মজুর কাজ করিয়াছে। ঐ সনে দেশী যাইএ প্রায় দশ সহস্র লোক খাটিয়াছে বলিয়া অনুমান করা হয়। ইহারা কারখানায় প্রায় ২৭০০০ পাউণ্ড এবং যাইএ প্রায় ৯৩০০০ পাউণ্ড রেশম উৎপাদন করিয়াছে। সুতরাং, দেখা যাইতেছে যে, কারখানার তুলনায় যাই যেমন সংখ্যায়ও অধিক, তদ্রূপ উৎপন্ন রেশমও পরিমাণে যাই হইতেই অধিক, পাওয়া গিয়াছে। ভারতে যে সমস্ত রেশমী বস্ত্রাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহার অধিকাংশেই ৩৫।৪০ হইতে ৫৫।৬০ 'ডেনিয়ারের' রেশম-সূত্র ব্যবহৃত হয়। আর ইউরোপে ৯।১১ হইতে ২৫।৩০ ডেনিয়ারের সূত্রই অধিক ব্যবহৃত হয়। বাঙ্গালার রেশম ইউরোপ ব্যতীত আর কোথাও রপ্তানি হয় না, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। যাইএ ৪০।৪৫ হইতে ৫৫।৬০ 'ডেনিয়ারে'র রেশম প্রস্তুত হয়; পক্ষান্তরে, কারখানার রেশমের ডেনিয়ার ১৬।১৮ হইতে ২৫।৩০। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে যে, যাইএর রেশম বিশেষ বিক্রীত হয়; বিদেশে ইহার উল্লেখযোগ্য কোনও রপ্তানি নাই। পক্ষান্তরে, দেশে কারখানার রেশমের তেমন কাটতি নাই; বিদেশে এই রেশমই রপ্তানি হইয়া থাকে। দেশে এই রেশমের যা' কিছু কাটতি হইতেছিল, জাপানী সস্তা মালের প্রতিযোগিতায় তাহাও প্রায় নাই বলিলেও চলে। আবার নিকৃষ্টতার জন্য বিদেশের বাজারেও এই রেশমের আদর কমিয়া গিয়াছে। কাজেই কারখানাওয়ালারাই অধিক মাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। ইউরোপের বাজারে উৎকৃষ্ট মিহি রেশমের (৯।১১ হইতে ১৩।১৫ ডেনিয়ারের) যথেষ্ট গ্রাহক আছে। কিন্তু বাঙ্গালার কোয়ায় তদ্রূপ উৎকৃষ্ট মিহি রেশম তৈয়ার করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কাজেই এখানেও আমরা উৎকৃষ্ট কোয়ার আবশ্যকতা অনুভব করিতেছি। উৎকৃষ্ট কোয়া পাইলে, এবং প্রস্তাবিতরূপে কাটাইর উন্নতিসাধন করিতে পারিলে, কি যাই কি কারখানা উভয় হইতেই ইউরোপীয় বাজারের সম্পূর্ণ উপযোগী উত্তম মিহি রেশম প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

রেশমোৎপাদনস্থানসমূহের কেন্দ্রস্থলে গবর্ণমেণ্ট যদি রেশম কাটাইর একটী আদর্শ প্রদর্শনী (Model Demonstration Reeling Farm) স্থাপন করেন, তাহা হইলে তদ্দ্বারা দেশের যথেষ্ট উপকার হয়। এই প্রদর্শনীগৃহে উন্নত বহুচক্রী কাটের উৎকৃষ্ট কোয়া ও সাধারণ কোয়া, উন্নত উপায়ে ও দেশী প্রথানুযায়ী কাটাই করা হইবে। এতদ্দ্বারা সাধারণ কাটনীগণ পরিদর্শনকালে পুরাতন প্রথার তুলনায় নূতন প্রথার গুণাবলী অতি সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবে। আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে, এরূপ একটী প্রদর্শনী স্থাপিত হইলে, কাটনীগণ বহুবিষয়ে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া, পুরাতন প্রথার দোষসমূহ পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক, উন্নততর নূতন প্রথার গুণগ্রহণ ও অনুসরণ করিতে প্রলুব্ধ হইবে। গবর্ণমেণ্ট এ পর্য্যন্ত তাঁহাদের কার্য্যকলাপ একমাত্র বয়নদিগের প্রতিই সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন; কিন্তু এখন এরূপ সময় আসিয়াছে যে, কাটনীর কার্য্যে উপেক্ষা প্রদর্শন করিলে আর চলিবে না।

এমন একদিন ছিল, যখন বাঙ্গালার কাটনী ও বয়নবিরগণের নৈপুণ্য দেখিয়া পাশ্চাত্য-জগৎ মুগ্ধ হইয়া যাইত। আজ আমরা সেই আত্মপ্রসাদে বঞ্চিত হইয়াছি। আজ সেই অতীত গৌরবের পুণ্যস্মৃতিটুকু অবধি আমাদের নাই! দেশের ধনকুবেরগণ অকৃত্রিম, বহুমূল্য ও সূক্ষ্ম দেশী রেশমীবস্ত্রের আর আদৌ আদর করেন না। আপাতসুন্দর কৃত্রিম বৈদেশিক বস্ত্রের বাহ্য চাকচিক্যেই তাঁহারা মুগ্ধ ও পরিতৃপ্ত হইতেছেন। ফলে, উৎসাহপ্রাপ্তির অভাবে, দেশে আর তেমন সুনিপুণ কারিকর জন্মিতেছে না। যা'ও দুই একজন জন্মিতেছে, তাহারাও 'আঘ্রাত কুসুমের ন্যায় মরুভূমিই সুবাস ছড়াইয়া' আপনি আত্মগোপন করিতেছে। তাই আমরা দ্বিতীয় দুবরাজের নামও শুনিতেছি না! আবার স্বাভাবিক স্থিতিশীলতাবশতঃ, বিদেশের উন্নত বা নূতন প্রণালী অবলম্বন পূর্ব্বক আমরা

লাভবান হইতে পারিতেছি না। এদিকে জাপানীদিগের ন্যায় উদীয়মান জাতিসমূহ, তাঁহাদের গ্রহণশীল স্বভাব ও জ্ঞানতৃষ্ণা বলে, উন্নততর নূতন প্রণালীর গুণাগুণ সম্যক বিচার পূর্ব্বক আয়ত্তাধীন ও গ্রহণ করিতে সমর্থ হওয়াতে, সুলভে উৎকৃষ্ট রেশম উৎপাদন করিয়া, বাঙ্গালার রেশমকে বাজার হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতেছে। বৎসরের পর বৎসর, বাঙ্গালার উৎপন্ন রেশম পরিমাণে ক্রমশঃই কমিয়া আসিতেছে। রেশম কম উৎপন্ন হইলেও, ইহার আদর ও ব্যবহার দেশে ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হওয়াতে, বিদেশের সুলভ রেশমের পক্ষে সেই স্থান অধিকার করিয়া বসিবার এক সুবর্ণসুযোগ সমুপস্থিত হইয়াছে। ফলতঃ, বৈদেশিক প্রতিযোগিতারূপী দুর্দ্দমনীয় দানব বাঙ্গালার রেশমশিল্পের সাংঘাতিক শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের 'অবাধ বাণিজ্য' নীতির আশ্রয়ে, এই দানব শিল্পটীর দ্রুতপতনের সহায়তা করিতেছে।

সমুচিত বিধিব্যবস্থার অভাবেও আমাদের রেশম-শিল্পের সামান্য ক্ষতি হয় নাই। আমার মনে হয়, পলুর ও কোয়ার বহু দোষ এবং কীটপালন ও রেশমকাটাই-প্রথার যথেষ্ট ত্রুটী থাকা সত্ত্বেও, যথোচিত বিধিব্যবস্থাবলে (Organization) শিল্পটীর শোচনীয় অবস্থার প্রভূত উন্নতিসাধন করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, কাটনী তন্তুবায় ও বিক্রেতার কথাই আলোচনা করা যা'ক। ইহাদের প্রত্যেকেই শুধু স্ব স্ব স্বার্থান্বেষণ করিতে গিয়া কেবল যে শিল্পটীর অবনতি ঘটাইয়াছেন, তাহা নহে; পরন্তু কেহই স্থায়ীভাবে লাভবান হইতে পারেন নাই। কাটনী ও তন্তুবায়গণ নিকৃষ্ট মালের জন্য উচ্চমূল্য দাবী করাতে, বিক্রেতা বা বণিকগণ সেরূপ উচ্চমূল্যে মাল খরিদ করিতে স্বীকার করেন নাই। পক্ষান্তরে, বণিকগণও অল্পমূল্যে উৎকৃষ্ট মাল ক্রয় করিতে যাইয়া সফলকাম হইতে পারেন নাই। এইভাবে উভয়ের মনোমালিন্যের ফলে, পরিশেষে কেহই লাভবান হইতে পারেন নাই; অথচ শিল্প ও ব্যবসায়টীর অধঃপতন ঘটিয়া গিয়াছে। যদি ইঁহারা পরস্পর পরস্পরের লাভালাভ ও স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের নিজেদেরও উপকার হইতে অধিকন্তু শিল্পটীও উন্নত অবস্থা হইতে বিচ্যুত হইত না।

কোথায় কাহার নিকট কাঁচা-রেশম বিক্রয় করা যাইতে পারে, বাঙ্গালার শতকরা নব্বই জন কাটনীই তাহা অবগত নহেন। আবার ক্রেতাগণেরও অনেকেই কোথায় কাঁচা-রেশম পাওয়া যায়, সেই খবর রাখেন না। কাজেই, এই উভয় শ্রেণীর কার্য্য পরিচালনার্থ একদল মধ্যবর্ত্তীর সৃষ্টি হইয়াছে। ফলে, এই ব্যবসায়ে ক্রেতা বা বিক্রেতা কেহই লাভবান হইতেছেন না বটে, কিন্তু মধ্যবর্ত্তীগণ অনায়াসে লাভের 'সিংহগ্রাস' গ্রহণ পূর্ব্বক বেশ পরিপুষ্ট হইতেছে। এতদ্দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, ক্রেতা ও বিক্রেতাগণের সম্মিলিত চেষ্টার অভাবেও ব্যবসায়টীর যথেষ্ট ক্ষতি হইতেছে। আশা করা যায়, লর্ড কারমাইকেলের প্রস্তাবিত 'বাণিজ্যিক দর্শনাগারে'র, (Commercial Maseum) প্রতিষ্ঠা হইলে দেশের একটী মহা অভাব এবং রেশমশিল্পের এই অভিযোগের স্থায়ী প্রতিকার হইবে।

আমাদের বসনী, কারখানাওয়ালা ও যাইওয়ালাগণ ইউরোপ, চীন বা জাপানের প্রধান প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্রের অস্তিত্বের কোনও খোঁজই রাখেন না। এজন্য তাঁহাদিগকে অনেক উচ্চমূল্যে মাল ক্রয় ও অল্পমূল্যে বিক্রয় করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। উদাহরণস্থলে বলা যাইতে পারে যে, যখন ঐ সকল বাজারে কোয়ার মূল্য অল্প, সেই সময় এ দেশের যাই ও কলওয়ালাগণ অধিক মূল্যে কোয়া ক্রয় করিয়া, তজ্জাত রেশম রপ্তানিওয়ালা বণিকদিগের নিকট এরূপ সময় অল্পমূল্যে বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন, যখন ঐ সকল দেশে রেশমের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। বাজার দরের এইরূপ অজ্ঞতানিবন্ধন, অনেকসময় কি বসনী, কি কলওয়ালা, সকলকেই বিলক্ষণ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে। যদি তাঁহারা সকলে সম্মিলিত হইয়া, কোনও বিশ্বস্ত এজেণ্টের সহায়তায়, ফ্রান্সের লিও, ইটালীর মিলান এবং ইংলণ্ডের রেশম-বাজারের অবস্থা দৈনন্দিন তারযোগে অবগত হইতে পারেন, অথবা যাই ও কলওয়ালাগণ যদি তাঁহাদের মাল ঐ সকল দেশে এজেণ্টের নিকট মজুত রাখিতে এবং সুযোগ বুঝিয়া সুবিধা দরে বিক্রয়ের বন্দোবস্ত

করিতে পারেন, তাহা হইলে এরূপভাবে অযথা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কোনও আশঙ্কাই থাকে না। আর এতদ্দেশীয় সংবাদপত্রসমূহ কলিকাতার বাজারদরের তালিকায় পাট, তামাক, লাক্ষা ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে রেশম এবং কোয়ার মূল্য বিজ্ঞাপিত করিলেও, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর যথেষ্ট সুবিধা হইতে পারে। ইহাতে সংবাদপত্রসমূহেরও গ্রাহকবৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

এই কঠোরতম প্রতিযোগিতার দিনে, যাহাতে উৎপন্ন মালের বিক্রয় বৃদ্ধি হয়, তদ্বিষয়ে কোনও প্রকার চেষ্টা করা হয় না। হাজার হাজার মাইল দূর হইতে আসিয়া ইউরোপ, চীন ও জাপানের রেশম আমাদেরই দেশের হাট-বাজার হইতে আমাদেরই রেশমকে বিতাড়িত করিতেছে! আর আমরা স্বদেশীয় বাজারে আমাদের ঘরের পণ্য বিক্রয় করিতে পারিতেছি না; তথাপি অলস ও নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া আছি। ইহা অপেক্ষা অধিকতর পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? রেলকোম্পানিসমূহ মালের ভাড়ার হার না কমাইলে, এ বিষয়ের প্রতিকারের সম্ভাবনা অল্প সত্য, কিন্তু তথাপি, আমাদেরও যথেষ্ট কর্ত্তব্য রহিয়াছে। ভারত-বর্ষের প্রত্যেক প্রসিদ্ধ কেন্দ্রে যে সকল বড় বড় দেশীয় 'আড়ৎ' আছে, তাহাদের প্রত্যেকটীতে যাহাতে বাঙ্গালার রেশম যথোপযুক্ত স্থানলাভ করিতে পারে, তাহার সুব্যবস্থা করিতে হইবে। আমেরিকার দাতাকর্ণ ও সুবিখ্যাত ধনকুবের এণ্ড্রু কার্ণেজি বিজ্ঞাপনের সফলতার উপর ব্যবসায়ের সফলতা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অধুনা পাশ্চাত্য-জগতে বিজ্ঞাপনপ্রকাশকে শিল্পবিশেষ বলিয়া গণ্য করা হয়। কিন্তু আমরা ইহাকে অযথা অর্থব্যয় বলিয়া মনে করি। ইহার কোনই স্বার্থকতা না থাকিলে 'নেস্‌লির জমাট দুগ্ধ,' 'লিপটনের চা' অথবা 'পিয়ার্সের সাবান' প্রভৃতি বহুকালপ্রতিষ্ঠিত ও সমুন্নত কোম্পানীসমূহ, এরূপ সতেজে বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া, এত অর্থের অপব্যবহার করিত না। ফলতঃ, বিজ্ঞাপন প্রচারের প্রয়োজনীয়তা এত অধিক এবং ইহা এতই সুফলপ্রদ যে, বড় বড় ব্যবসায়ীগণ একমাত্র এই উদ্দেশ্যেই বার্ষিক খরচের কতকাংশ স্বতন্ত্র করিয়া রাখেন। সুতরাং বাঙ্গালার রেশমের উৎপাদক ও বিক্রেতাগণেরও এ বিষয়ে অবহেলা করিলে চলিবে না। কলিকাতা, দিল্লী, লাহোর, বোম্বাই, করাচী ও মান্দ্রাজ প্রভৃতি প্রধান প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্রে বাঙ্গালার রেশমের স্থায়ী-প্রদর্শনী থাকা উচিত। এই সকল স্থানের যাদুঘরগুলিই প্রদর্শনীর উদ্দেশ্যসিদ্ধির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান।

কাটনী ও তন্তুবায়দিগের পক্ষ হইতে, ভারতের যে যে স্থানে বাঙ্গালার রেশম বিক্রীত বা ব্যবহৃত হয়, কেহ সেই সকল স্থানে যাইয়া লোকের প্রকৃতি ও রুচি পর্য্যবেক্ষণ-পূর্ব্বক, তদনুযায়ী মাল প্রস্তুত করিবার উপদেশ দিয়াও, তাঁহাদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারে। এই উপায় অবলম্বন করিয়াই,* অত্যল্পকালমধ্যে, জার্ম্মেনী ভারতের বাজারে স্বীয় বাণিজ্যপ্রাধান্যস্থাপনে সমর্থ হইয়াছিল।

কুটীরশিল্পীগণের অনেকেই অচ্ছেদ্য ঋণজালে জড়িত রহিয়াছে। কর্মাই-সদৃশ উত্তমর্ণগণের ঋণজালে আবদ্ধ হইয়া, এক্ষণ তাহারা কায়মনে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। কারণ, তাহারা স্পষ্টই দেখিতে পায় যে, ব্যবসায়ের লাভের সারাংশই উত্তমর্ণের হাতে চলিয়া যায়; আর তাহাদিগকে শুধু মজুরীতেই সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। এই সকল উত্তমর্ণরূপী শোণিত-শোষকের (Vampire) করাল কবল হইতে হতভাগ্য শিল্পীদিগকে উদ্ধার করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে। সমবায়-সমিতি ও যৌথ ঋণদান-ব্যাঙ্ক স্থাপন ব্যতীত হতভাগ্যদের মুক্তিবিধানের আর উপায়ান্তর নাই।

শিল্পটীর দুর্গতি দেখিয়া, শিক্ষিত, স্বদেশপ্রেমিক বা রেশমতত্ত্ববিদগণের নৈরাশ্যসহকারে পশ্চাৎপদ হইবার আর অবসর নাই। সময়ের গতি বুঝিয়া, পতনভয়-বিরহিতচিত্তে অগ্রসর হইবার এখনও যথেষ্ট সুযোগ রহিয়াছে। এই উন্নতিশীল জগতে অলসের ন্যায় অসার অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে, তাঁহাদিগকে সঙ্কুচিত হওয়া উচিত। চিন্তা বা বুদ্ধি, অর্থ বা সামর্থ্য যাহার যা' সম্বল আছে, লুপ্তপ্রায় শিল্পটীর পুনরুদ্ধারকল্পে, তাহাই নিয়োজিত করিয়া, তাঁহারা স্ব স্ব কর্ত্তব্য প্রতিপালন করুন। পুনরায়

সতেজে দেশে অকপট স্বদেশীর (Honest swadeshi) প্রচার পূর্ব্বক মৃতকল্প শিল্পটীকে পুনরুজ্জীবিত করা তাঁহাদেরই কর্ত্তব্য। অকপট স্বদেশীর অকৃত্রিম অনুরাগে জনসাধারণের মনঃপ্রাণ অনুপ্রাণিত হইলেই, সিদ্ধির পথ বহুলরূপে সহজ ও সুগম হইয়া আসিবে; এবং বৈদেশিক প্রতিযোগিতার ভয় বাত্যাবিতাড়িত তৃণের ন্যায় দূরে পলায়ন করিবে।

বাঙ্গালায় একটী স্থায়ী রেশম-সভা-(Silk Association) অবশ্য স্থাপন করিতে হইবে। রেশমশিল্পের উন্নতিবিধানার্থ যাহা কিছু করা আবশ্যক, সেই সমুদয় বিষয় কার্য্যে পরিণত করাই এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য হইবে। এই সভায় বীজোৎপাদন, কীটপালন, রেশমকাটাই ও রঞ্জন এবং বয়ন প্রভৃতি রেশমশিল্পের প্রত্যেক শাখার কার্য্য আন্দোলিত ও আলোচিত হইবে। প্রত্যেক শাখার কার্য্যের জন্য এক একজন বিশেষজ্ঞ নিয়োজিত থাকিবেন। তাঁহারা নিজ নিজ বিষয়ে 'হাতে-হেতেড়ে' (Practical) পরীক্ষা করিয়া, তাহার ফলাফল সভার মুখপত্র সাপ্তাহিক পত্রিকায় লিপিবদ্ধ করিবেন। বিদেশীয় বাজারের কোয়া ও রেশমের অবস্থা এবং মূল্যের হার প্রভৃতি এই পত্রিকার সাহায্যেই বিজ্ঞাপিত হইবে। এই পত্রিকায় ভারতের বিভিন্ন রেশমগ্রাহী স্থানের লোকের প্রকৃতি ও রুচি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা রহিবে। পত্রিকাখানি বাঙ্গালা ও ইংরেজী উভয় ভাষায় ("ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলনে"র ন্যায়) লিখিত হইবে। পত্রিকার ভাষা এরূপ যথাসম্ভব সরল ও প্রাঞ্জল করিতে হইবে, যেন ইংরেজী ভাষায় অভিজ্ঞ বা অনভিজ্ঞ সকলেই ইহা পাঠ করিয়া লাভবান হইতে পারে। উচ্চ-নীচ অভিজ্ঞ-অনভিজ্ঞ ভেদে যাহাতে প্রত্যেকেরই নিকট এই সভা সহজপ্রবেশ্য হয়, তদ্বিষয়ে তীব্রদৃষ্টি রাখিতে হইবে; এবং যাহাতে ইহা একমাত্র শিক্ষিত ও অভিজাতবর্গের একচেটিয়া সম্পত্তি হইয়া না দাঁড়ায়, তাহারও উপায়বিধান করিতে হইবে। নতুবা, এই সভার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া যাইবে। বাঙ্গালার 'রেশম-সমিতি' (Silk Committee) হইতে আমরা এই শিক্ষাই লাভ করিয়াছি। রেশম-সমিতির পরিণাম বিস্তৃত হইলে চলিবে না; উহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়াই, আমাদিগকে লাভবান হইতে হইবে।

এই সকল প্রস্তাবের কোনটীই কার্য্যে পরিণত করা অসাধ্য বা অসম্ভব নহে। পরন্তু, রেশমশিল্পের হিতৈষীগণ সম্মিলিত হইয়া বিধিবদ্ধ প্রণালীতে চেষ্টা করিলে, সহজেই যে, বর্ত্তমান প্রতিবন্ধকসমূহ নিরাকৃত করিয়া, শিল্পটীর উন্নতিবিধান করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহাদের সম্মিলনের পক্ষেই যাহা কিছু বাধাবিঘ্ন রহিয়াছে; তাঁহাদের বিধিবদ্ধ প্রণালীতে চেষ্টা করাতেই যাহা কিছু সন্দেহ থাকিতে পারে। একবার সম্মিলিত হইয়া চেষ্টা করিতে পারিলে, তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, কত সহজে এই সমুদয় প্রতিকূল অবস্থার গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে; আর শিল্পটীও কেমন দ্রুতগতিতে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির পথে ধাবিত হইবে। ইউরোপের বিধ্বংসী মহাকুরুক্ষেত্রের উদ্গীর্ণ হলাহলের সঙ্গে যে অমৃতবিন্দুর উদ্ভব হইয়াছে, তিল তিল করিয়া আমাদিগকে তাহা সঞ্চয় করিতে হইবে। দেশী ও বিদেশীয় বাজারে বাঙ্গালার রেশমপ্রচারের এই যে এক শুভ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, আমাদিগকে তাহার প্রতিমুহূর্ত্তের সদ্ব্যবহার করিতে হইবে। শুভক্ষণে বাঙ্গালায় শিল্পোন্নতির প্রচেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে; শুভমুহূর্ত্তে আমাদের লোকপ্রিয় লাট লর্ড কারমাইকেলের মুর্শিদাবাদ-রেশমপ্রীতির পরিচয় আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে। তাই, এই অন্তঃসলিলা হৃদয়ক্ষতে আশা হয়, আবার বাঙ্গালার সুদিন আসিবে; আবার বাঙ্গালার রেশমশিল্পাকাশ সুবিমল পূর্ণচন্দ্রের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় প্লাবিত হইবে।

শ্রীরসিকরঞ্জন ঘোষ এম্, এস্, এ।

মেঘ ও বৃষ্টি বিচার।

[শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দেব (মেডিকো-বোটানিষ্ট) লিখিত।]

অন্ন জীব-জগতের প্রাণস্বরূপ; বৃষ্টির উপর অন্ন নির্ভর করে। কোন সময়ে কিরূপ বৃষ্টি হইবে, কোন সময় বৃষ্টি হইলে

অশুভ ঘটিবার সম্ভাবনা, ইহা তৎপূর্ব্বে জানিতে পারিলে যে জগতের কতদূর উপকার হয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। সুতরাং, ইহজগতে মানবের মঙ্গলজনক, অন্নের প্রতিপাদন-কর্ত্তা, এবং ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্য-বিজ্ঞাপক বর্ষা-শাস্ত্র অপেক্ষা আর কোন শাস্ত্রের প্রাধান্য স্বীকার করিতে ইচ্ছা হয় না। আজকাল আমাদের দেশ দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ যেরূপ নিত্য নিত্য দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি, মহামারী, ঋতুব্যাপত্তি প্রভৃতি দ্বারা উপতাপিত হইতেছে, বর্ষাশাস্ত্র অবগত থাকিলে লোকে পূর্ব্বাহ্ণে ইহার অনেকটা প্রতীকারপরায়ণ হইতে পারেন। এই সকল দৈববিপত্তি নিবারণার্থ প্রত্যেক যোত্রসম্পন্ন গৃহস্থের ও প্রত্যেক বিজ্ঞানানুসন্ধিৎসু ব্যক্তির বর্ষা-শাস্ত্র শিক্ষা করা উচিত। এই শাস্ত্র শিখিতে বিশেষ কষ্টস্বীকারের আবশ্যক হয় না; এবং গণনায় ভবিষ্যফলের যথার্থতা উপলব্ধি করিয়া, শিক্ষার্থীর হৃদয় নির্দ্দোষ আনন্দরসে পরিপ্লুত হইয়া উঠে। অনেকে হিন্দুর জলবিচারশাস্ত্র সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক—বিশেষতঃ, 'মেঘের গর্ভ'—এই কথাটী সম্পূর্ণ অযৌক্তিক মনে করিয়া, ইহার প্রতি বীতশ্রদ্ধ। বস্তুতঃ, ইহা অবৈজ্ঞানিক কি অযৌক্তিক, তদ্বিষয়ে তর্ক করিবার আবশ্যক নাই; কিন্তু ইহার ফলাফল লইয়া বিচার করিলে, তাঁহাদের উক্ত সিদ্ধান্ত নিতান্ত বিরুদ্ধ বলিয়াই প্রমাণিত হইবে। মায়াবাদী পাশ্চাত্য বিজ্ঞানমানীগণ প্রত্যক্ষ ব্যতীত অন্য কোন প্রমাণ গ্রাহ্য করেন না। সুতরাং অনুমান ও যুক্তিমূলক শাস্ত্রগুলির ফল যথার্থ দেখিয়াও, তাঁহারা তাহার সারবত্তা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইয়া থাকেন।

দেশে দিন দিন অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি ঈতিভয়বাহুল্য ঘটিতেছে; ভূমিভাগ দিন দিন উপতপ্ত, জলহীন ও অগ্নিকণাবর্ষী হইতেছে; এবং আনূপদেশ সকল জলাভাবে জাঙ্গল বা সাধারণ দেশে পরিণত হইতেছে। কারণ, অরণ্যের পরিমাণ পূর্ব্বাপেক্ষা হ্রাস ও সেই অনুপাতে চাষের জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবার ফলে, পূর্ব্বকালীন কাননজাত শৈত্যের অভাবনিবন্ধন বৃষ্টির পরিমাণ উত্তরোত্তর হ্রাস হইতেছে। ইহা গর্ভোপঘাতের একটী প্রধানতম হেতু। আজ প্রায় ৩০।৪০ বৎসর ধরিয়া উপর্য্যুপরি অনাবৃষ্টি ও সেই সঙ্গে সঙ্গে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে; এবং দেখা যায় যে, এই অনাবৃষ্টির মধ্যেও মাঝে মাঝে প্রচুর বর্ষা হইয়া থাকে। উপর্য্যুপরি ২।৩ বৎসর ধরিয়া অনাবৃষ্টি হইলে, আকাশে প্রচুরপরিমাণ বাষ্পরাশি সঞ্চিত হইতে থাকে। এইরূপ ক্রমাগত সঞ্চিত হইতে হইতে, প্রতি ৪র্থ বা ৫ম বৎসরে, পরিমাণের অত্যধিক নিবন্ধন, বাষ্পরাশি আর আকাশে বিলম্বিত (suspension) অবস্থায় রহিতে পারে না—শৈত্যাধিক্য ও ভার বশতঃ তখন প্রবলধারায় পৃথিবীতে নিপতিত হয়; এবং সেই বৎসর প্রচুর বন্যাও হইয়া থাকে। পুনরায় পরবর্ত্তী ৪।৫ বৎসর পর্য্যন্ত বৃষ্টির পরিমাণ উত্তরোত্তর হ্রাস পাইতে থাকে। আজ প্রায় ৩০।৪০ বৎসর যাবৎ এইরূপ ঘটিতেছে। বৃষ্টিবিচার-শাস্ত্রে অধিকার থাকিলে, অতি অল্প আয়াসে পূর্ব্ব হইতেই অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টির বিষয় লোকে অবগত হইতে পারে। যদি সাধারণ লোকেও, এই বৃষ্টিবৈচিত্র্য অবগত হইয়া, পূর্ব্ব হইতেই অনাবৃষ্টির বা দুর্ভিক্ষের বৎসরের জন্য যথাসাধ্য খাদ্যসামগ্রী সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারে, তাহা হইলে অন্নকষ্টের সময়ে আর অনাহারে মরিতে হয় না।

বর্ষাবিচার-শাস্ত্র দ্বারা যেরূপ পূর্ব্বাহ্ণে নিঃসংশয়রূপে অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টির বিষয় জানিতে পারা যায়, অপর কিছুতেই তদ্রূপ জানিবার উপায় নাই। বিচক্ষণ জলগণক কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ দ্বারা বর্ষাকালের কোন কোন মাসে কিরূপ বৃষ্টি হইবে, তাহাও বলিতে পারেন। পূর্ব্বাহ্ণে জানা থাকিলে, অনাবৃষ্টির বৎসর কৃষকেরা অল্পজলে প্রবর্দ্ধনশীল নানাপ্রকার শস্যের চাষ করিতে পারে। কারণ, অল্পজলে ধান্য না হইলেও অন্যপ্রকার শস্য জন্মে। আবার অতিবৃষ্টির বৎসরেও, অল্পজলীয় শস্যের চাষ না করিয়া, ধান্যাদি প্রভৃত জলে প্রবর্দ্ধনশীল শস্যের চাষে কৃষকেরা লাভবান হইতে পারে। তদ্ভিন্ন, তাহারা প্রচুর বর্ষা-সম্ভাব্য বৎসরে, নিম্নভূমির চাষ অগ্রে সমাধা করিয়া, পশ্চাৎ উচ্চভূমির চাষ করিতে পারে। এইরূপে অসময়ে বীজবপন, শস্যাদির জুলিয়া বা হাজিয়া যাওন, অনাবশ্যক বীজনাশ প্রভৃতি নানাপ্রকার ক্ষতি ও অসুবিধা নিবারিত হইতে পারে। প্রায় অনেকসময় দেখা যায় যে, কোন নির্দ্দিষ্ট মাসে কতকগুলি বিশেষ

লক্ষণ প্রকটিত না হইলে, বর্ষায় প্রায় বৃষ্টি হয় না; এবং কোন নির্দ্দিষ্ট মাস, তিথি, নক্ষত্র বা বারে যদি মেঘসঞ্চার না হয়, বা গর্ভ না হয়, বা বৃষ্টি না হয়, বা সামান্য বর্ষণ হয়, বা সূর্য্য মেঘাবৃত না হয়, তাহা হইলে সে বৎসর প্রচুর শস্য জন্মে না বা নানাবিধ উপদ্রবে নষ্ট হইয়া যায়। কখন বা দেখা যায় যে, কোনও প্রকার বিশেষ শস্যের প্রচুর উৎপত্তি বা অনুৎপত্তি পরবর্ত্তী কোন বিশেষ শস্যের নাশ বা প্রাচুর্য্যের পূর্ব্বরূপ বা পরবর্ত্তী কালের বর্ষার অল্পত্ব বা প্রচুরত্বজ্ঞাপক; এবং ঋতুবিশেষে কোন বিশেষ উদ্ভিদের উৎপত্তি বা পুষ্পমুকুলের উদ্গম, কোন বিশেষ রোগ বা সাধারণ ব্যাধি-উৎপত্তির পূর্ব্বরূপ। সকল নক্ষত্রের বৃষ্টিপাতে কৃষিকার্য্যের উপকার হইলেও, এবং মৃত্তিকার রসশোষণ ও বিকিরণ শক্তি স্বভাবিকভাবে থাকিলেও, কোন নক্ষত্রবিশেষে সূর্য্যের অবস্থানকালে বর্ষণ হইলে, ভবিষ্যতের প্রচুর উত্তাপ ও অবর্ষণ সত্ত্বেও মৃত্তিকার রসাকর্ষণ ও শস্যপোষণ শক্তি অব্যাহত থাকে। কখনও বা দেখা যায় যে, কোন বৎসর আকাশ বেশ পরিষ্কার, সূর্য্যের উত্তাপ তীক্ষ্ণ ও অসহ্য; কোন বৎসর প্রভূত মেঘের জন্য সূর্য্যোত্তাপ শীতল ও স্পর্শসহ; আবার কোনও বৎসর সূর্য্যের উত্তাপের এতদূর আধিক্য হয় যে, বঙ্গের মত আনূপদেশেও ".লু" চলে। কোন বৎসর আকাশ ঘোলা মেঘে আবৃত রহে; ফলে, গুমটে জীবজগৎ উপতাপিত হইয়া থাকে। কোনও বৎসর বর্ষা "নাবী" অর্থাৎ বিলম্বে, আবার কোনও বৎসর স্বকালের ২।৩ মাস পূর্ব্ব হইতেই বর্ষা আরম্ভ হইতে দেখা যায়। কোন বৎসর সমগ্র বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টি, আবার কোন বৎসর অতি সামান্য বৃষ্টি; কোন বৎসর প্রচুর মেঘে সামান্য বর্ষণ, আবার কোন বৎসর ঠিক তাহার বিপরীত হইয়া থাকে। কখন বা মেঘ জন্মিবামাত্রই, তাহা প্রবল বায়ুতে উড়িয়া যায়; কখনও বা নীলাঞ্জনসদৃশ গাঢ়কৃষ্ণ বিস্তৃত মেঘে বিন্দুমাত্র বারিপাত নাই। আবার কোন বৎসর মেঘ জন্মিতেছে, আর বৃষ্টি হইতেছে। কোন বৎসর ৫।৭।১০।১৫।২০ দিবস ধরিয়া একাদিক্রমে বাদল; আবার কোন বৎসর প্লাবনের ন্যায় আকস্মিক মহাবর্ষণে গ্রাম-নগরাদি উৎসন্ন যাইতেছে। কোন বৎসর দারুণ শীত, আবার কোন বৎসর শীতের অযোগ; কোন বৎসর সমগ্র শীতকালের উভয় সন্ধ্যা ঘোরতর রাগরঞ্জিত ও প্রবল রুক্ষ বায়ু প্রবাহিত হইতেছে; আবার কোন বৎসর ঠিক তাহার বিপরীত। ষড়ঋতু-বিভাগেই, এই সমস্ত সংঘটিত হইতেছে; এবং আমরা প্রতিনিয়ত এইরূপ সত্য ঘটনা প্রত্যক্ষ করিতেছি। এই সমস্ত প্রাকৃতিক ঘটনাই জড় ও জীব জগতের শস্যনাশ বা শস্যোৎপত্তি ও রোগাধিক্য বা রোগাল্পতার পরিচায়ক। আবহমানকালাবধি এই সমস্ত অমূল্য সত্য হস্তলিখিত পুঁথির শ্লোকে পদ্যবসিত হইয়াছে, বা কতকগুলি বৃদ্ধ কৃষকের সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ রহিয়াছে; উন্নতি বা অনুশীলনের চর্চ্চা মাত্র হয় নাই। পঞ্জিকা-গণকেরা স্থূলভাবে সম্বৎসরের ফলাফল জ্ঞাপন করিলেও, জলগণনা-শাস্ত্রে তাঁহাদের অধিকাংশেরই বিশেষরূপ জ্ঞান না থাকায়, লোকের স্বাস্থ্য, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, রোগোৎপত্তি প্রভৃতি বিষয় নিঃসংশয়রূপে প্রমাণ করিতে সমর্থ হয়েন না। কৃষক অশিক্ষিত, দেশের লোক শাস্ত্রে বীতশ্রদ্ধ, গণকেরা প্রত্যক্ষ-অনভিজ্ঞ, এবং শিক্ষিত-সমাজ বৈদেশিক বিজ্ঞানচর্চ্চায় প্রমত্ত। ফলে, অমূল্য জলগণনা-শাস্ত্র লোপ পাইতে বসিয়াছে।

আধুনিক যতপ্রকার জলবিজ্ঞানশাস্ত্র প্রচলিত আছে, হিন্দুর জলবিজ্ঞান তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। হিন্দুগণক গণনা-বলে যাহা ভবিষ্যদ্বাণী করিবেন, পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক নানা-বিধ যন্ত্রসাহায্যে গণনা করিলেও সেরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিবেন না। বাৎসরিক শস্য ও জলের অবস্থা অবগতির জন্য গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে জলবিজ্ঞানসম্বন্ধীয় নানাবিধ যন্ত্রাদিসমন্বিত বিস্তর পরীক্ষা-গৃহ স্থাপিত হইয়াছে; এবং বৎসর বৎসর ইহার সংখ্যাও বর্দ্ধিত হইতেছে। এই সমস্ত পরীক্ষা-গৃহের মস্তব্য প্রত্যহ অবগত হইয়া, সরকারী প্রধান জলগণক তাঁহার দৈনিক বিবরণী প্রকাশ করিয়া থাকেন। নানাবিধ যন্ত্রসাহায্যে গণিত, এই বিবরণীতে স্থূলভাবে সমগ্র দেশে কখন বৃষ্টি আরম্ভ হইবে, কখন বৃষ্টি ধরিয়া যাইবে, কোথায় ঝটিকা হইবে বা কোথায় ঝটিকার মধ্যকেন্দ্র গঠিত হইতেছে

ইত্যাদি লিখিত থাকে। কিন্তু সময়ে সময়ে কার্য্যকালে দেখা যায় যে, হয়ত বৃষ্টির সম্বন্ধ নাই, এমন সময়ে বা সময় অতিক্রম করিয়া বর্ষা আসিল; হয়ত প্রচুর বৃষ্টিপাতের পরিবর্ত্তে সামান্য বর্ষণ হইল; এবং হয়ত ঝটিকা কেন্দ্র পরিবর্ত্তন করিয়া অন্যদিকে প্রবাহিত হইল। এইরূপে সরকারী গণকের গণনাও সময়ে সময়ে অন্যথা হইয়া যায়। যন্ত্রযোগে কখন কখন এমনও দেখা গিয়াছে যে, কোন একটী বিস্তৃত সীমামধ্যে বর্ষণ হইবে, এইরূপ চিহ্ন প্রকাশিত হইল; কিন্তু যথাকালে দেখা গেল যে, সেই বৃষ্টি সর্ব্বত্র না হইয়া, সীমার একদেশে বদ্ধ আছে। কিন্তু গর্ভগণনায় এরূপ বিপর্য্যয় প্রায় দেখা যায় না। এই গর্ভগণনাফল এতদূর বিস্ময়জনক যে, কোথায়, কোনদিন, কোনসময়ে ও কি পরিমাণ বারিপাত হইবে, গণক তাহা ঘটনার বহুপূর্ব্বে নিঃসংশয়ে বলিতে পারেন। যদি এই গর্ভগণনা নানাবিধ যন্ত্রসাহায্যে ও বহুদর্শী, সদা-সতর্ক গণক কর্ত্তৃক গণিত হয়, তবে না জানি তাহার ফল আরও কত বিস্ময়জনক হইবে। বস্তুতঃ, রাজা যতদিন এই মঙ্গলময় শাস্ত্রের উন্নতি ও আলোচনা সম্বন্ধে বিশেষ যত্ন ও সাহায্য না করিবেন, ততদিন যন্ত্র-বিজ্ঞান অধুনাতনকালাপেক্ষা সহস্রগুণ উন্নতি লাভ করিলেও, দেশ ঈতিভয় হইতে মুক্ত হইতে পারিবে না। যন্ত্র ও বিজ্ঞান বলে উপস্থিত বিপত্তি অবগত হওয়া যায়; কিন্তু ভবিষ্যতের তমোময়-গর্ভ ভেদ করিতে হইলে, গর্ভগণনা-শাস্ত্রের সাহায্য আবশ্যক।

অতঃপর, গর্ভগণনা সম্বন্ধে "বৃহৎ সংহিতা" হইতে মূল শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিয়া, এবং বিগত ২৫ বৎসর ধরিয়া, উক্ত শ্লোকগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করিয়া, যাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ জ্ঞানলাভ করিয়াছি, তাহাই সুধীবর্গসমীপে নিবেদন করিব।

অন্নং জগতঃ প্রাণাঃ প্রাবৃটকালস্যচান্নমায়ত্তম।
যস্মাদতঃ পরীক্ষ্যঃ প্রাবৃটকালঃ প্রযত্নেন ॥ ১
তল্লক্ষণানিমুনিভির্যানি নিবদ্ধানিতানিদৃষ্ট্বেদম।
ক্রিয়তেগর্গপরাশরকাশ্যপবাৎস্যাদিরচিতানি ॥ ২
দৈববিদবহিতচিত্তো দ্যুনিশং যোগর্ভলক্ষণে ভবতি।
তস্যমুনেরিব বাণী নভবতি মিথ্যাম্বুনির্দ্দেশে ॥ ৩
কিং বাতঃপরমন্যচ্ছাস্ত্রং জ্যায়োঽস্তি যদ্বিদিত্বৈব।
প্রধ্বংসিন্যপিকালে ত্রিকালদর্শী কলৌ ভবতি ॥ ৪
কেচিদ্বদন্তি কার্ত্তিকশুক্লান্তমতীত্য গর্ভদিবসাঃস্যুঃ।
নতু তন্মতং বহুনাং গর্গাদীনামতং বক্ষ্যে ॥ ৫
মার্গশিরশুক্লপক্ষপ্রতিপৎ প্রভৃতি ক্ষপাকরেঽষাঢ়াম।
পূর্ব্বাং বা সমুপগতে গর্ভানাং লক্ষণং জ্ঞেয়ম ॥ ৬
যন্নক্ষত্রমুপগতে গর্ভশ্চন্দ্রেভবেৎ সচন্দ্রবশাৎ।
পঞ্চনবতে দিনশতে তত্রৈব প্রসবমায়াতি ॥ ৭
সিতপক্ষভবাঃকৃষ্ণেশুক্লে কৃষ্ণাদ্যসম্ভবারাত্রৌ।
নক্তং প্রভবাশ্চাহনি সন্ধ্যাজাতাশ্চ সন্ধ্যায়াম ॥ ৮
মৃগশীর্ষাদ্যাগর্ভা মন্দফলাঃ পৌষশুক্লজাতাশ্চ।
পৌষস্যকৃষ্ণপক্ষেণ নির্দ্দিশেচ্ছ্রাবণস্যসিতম ॥ ৯
মাঘসিতোত্থাগর্ভাঃ শ্রাবণকৃষ্ণে প্রসূতিমায়ান্তি।
মাঘস্যকৃষ্ণপক্ষেণ নির্দ্দিশেদ্ভাদ্রপদশুক্লম ॥ ১০
ফাল্গুনশুক্লসমুত্থা ভাদ্রপদস্যাসিতে বিনির্দ্দেশ্যাঃ।
তস্যৈব কৃষ্ণপক্ষোদ্ভবাস্তু যে তে অশ্বযুকশুক্লে ॥ ১১
চৈত্রসিতপক্ষজাতাঃ কৃষ্ণে অশ্বযুজস্য বারিদা গর্ভাঃ।
চৈত্রাসিতসম্ভূতাঃ কার্ত্তিকশুক্লেঽভিবর্ষন্তি ॥ ১২
পূর্ব্বোদ্ভূতাঃ পশ্চাদপরোত্থাঃ প্রাগভবন্তি জীমূতাঃ।
শেষাস্বাপদিক্ষ্বেবং বিপর্য্যয়ো ভবতি বায়োশ্চ ॥ ১৩
হ্লাদিমৃদ্বদকছিবশক্রদিগভবোগারুতোবিয়দ্বিমলম্।
স্নিগ্ধসিতবহুলপরিবেষপরিবৃতোহিমময়ুখার্কৌ ॥ ১৪
পৃথুবহুলস্নিগ্ধঘনং ঘনসূচীক্ষুরকলোহিতাভ্রযুতম্।
কাকাণ্ড মেচকাভং বিয়দ্বিশুদ্ধেন্দু নক্ষত্রম্ ॥ ১৫
সুরচাপমন্দ্র গর্জ্জিতবিদ্যুৎ প্রতিসূর্য্যকাঃশুভাসন্ধ্যা।
শশিশিবশক্রাশাস্থাঃ শান্তরবাঃ পক্ষি মৃগসঙ্ঘাঃ ॥ ১৬
বিপুলাঃ প্রদক্ষিণচরাঃস্নিগ্ধময়ুখাগ্রহানিরুপসর্গাঃ।
তরবশ্চ নিরুপসৃষ্টাঙ্কুরা নরচতুষ্পদাহৃষ্টাঃ ॥ ১৭
গর্ভাণাং পুষ্টিকরাঃ সর্ব্বেষামেব যোঽত্রতুবিশেষঃ।
স্বর্ত্তুস্বভাবজনিতো গর্ভবিবৃদ্ধ্যৈতমভিধাস্যে ॥ ১৮
পৌষেসমার্গশীর্ষে সন্ধ্যারাগোঽম্বুদাঃ সপরিবেষাঃ।
নাত্যর্থং মৃগশীর্ষেশীতং পৌষেঽতিহিমপাতঃ ॥ ১৯
মাঘেপ্রবলো বায়ুস্তুষার কলুষদ্যুতী রবিশশাঙ্কৌ।
অতিশীতং সঘনস্যচ ভানোরস্তোদয়ৌ ধন্যৌ ॥ ২০

ফাল্গুনমাসে রুক্ষশ্চণ্ডঃ পবনোঽভ্রসংপ্লবাঃস্নিগ্ধাঃ।
পরিবেধাশ্চাসকলাঃ কপিলস্তাম্রোরবিশ্চশুভঃ ॥ ২১
পবনঘনবৃষ্টিযুক্তাশ্চৈত্রে গর্ভাঃ শুভাঃ সপরিবেষাঃ।
ঘনপবনসলিল বিদ্যুৎস্তনিতৈশ্চ হিতায় বৈশাখে ॥ ২২
মুক্তারজতনিকাশাস্তমাল নীলোৎপলাঞ্জনাভাসঃ।
জলচরসত্ত্বাকারা গর্ভেষু ঘনাঃ প্রভূতজলাঃ ॥ ২৩
তীব্রদিবাকরকিরণাভিতাপিতা মন্দমারুতাজ্জলদাঃ।
রুষিতাইব ধারাভিবিসৃজন্ত্যাম্ভঃ প্রসবকালে ॥ ২৪
গর্ভোপঘাতলিঙ্গান্যুল্কাশনিপাংশুপাতদিগ্দাহাঃ।
ক্ষিতিকম্পখপুরকীলক কেতুগ্রহযুদ্ধনির্ঘাতাঃ ॥ ২৫
রুধিরাদিবৃষ্টিবৈকৃতপরিবেন্দ্রধনূংষি দর্শনং রাহোঃ।
ইত্যুৎপাতৈরেভিস্ত্রিবিধৈশ্চান্যৈর্হতোগর্ভঃ ॥ ২৬
স্বর্ত্তুস্বভাবজনিতৈঃ সামান্যৈর্যৈশ্চ লক্ষণৈর্বৃদ্ধিঃ।
গর্ভাণাং বিপরীতৈস্তৈরেব বিপর্য্যয়োভবতি ॥ ২৭
ভাদ্রপদাদ্বয়বিশ্বাম্বুদেবপৈতামহেষ্বথর্ক্ষেষু।
সর্ব্বেষৃত্তুষুবিবৃদ্ধোগর্ভো বহুতোয়দোভবতি ॥ ২৮
শতভিষগাশ্লেষাদ্রাস্বাতিমঘাসংযুতঃ শুভোগর্ভঃ।
পুষ্ণাতিবহূনদিবসানহন্ত্যুৎপাতৈর্হতস্ত্রিবিধৈঃ ॥ ২৯
মৃগমাষাদিষ্বষ্টৌ ষট্ ষোড়শ বিংশতিশ্চতুর্যুক্তা।
বিংশতিরথদিবসত্রয়মেক তমর্ক্ষেণ পঞ্চভ্যঃ ॥ ৩০
ক্রুরগ্রহসংযুক্তেকরকাশনিমৎস্যবর্ষদাগর্ভাঃ।
শশিনিরবৌবাশুভসংযুতেক্ষিতেভূরিবৃষ্টিকরাঃ ॥ ৩১
গর্ভসময়েঽতিবৃষ্টি গর্ভাভাবায়নির্নিমিত্তকৃতা।
দ্রোণাষ্টাংশেঽভ্যধিকে বৃষ্টেগর্ভঃ স্রুতোভবতি ॥ ৩২
গর্ভঃ পুষ্টঃ প্রসবেগ্রহোপঘাতাদিভির্যদিনবৃষ্টঃ।
আত্মীয়গর্ভসময়ে করকামিশ্রং দদাত্যম্ভঃ ॥ ৩৩
কাঠিন্যং যাতিযথাচিরকালধৃতংপয়ঃপয়স্বিন্যাঃ।
কালাতীতং তদ্বৎ সলিলং কাঠিন্যমুপয়াতি ॥ ৩৪
পঞ্চনিমিত্তৈঃশতযোজনং তদর্দ্ধার্দ্ধমেকহান্যাতঃ।
বর্ষতি পঞ্চনিমিত্তাদ্রূপেণৈকেন যোগর্ভঃ ॥ ৩৫
দ্রোণঃ পঞ্চনিমিত্তেগর্ভে ত্রীণ্যাঢ়কানি পবনেন।
ষড় বিদ্যুতা নবাভ্রৈঃ স্তনিতেন দ্বাদশপ্রসবে ॥ ৩৬
পবনসলিলবিদ্যুদ্গর্জ্জিতাভ্রান্বিতো যঃ
স ভবতি বহুতোয়ঃ পঞ্চরূপাভ্যুপেতঃ।
বিসৃজতি যদি তোয়ং গর্ভকালেঽতিভূরি
প্রসবসময়মিত্বা শীকরাম্ভঃ করোতি ॥ ৩৭

ইতি গর্ভলক্ষণং বৃঃ সংহিতাঃ।

জ্যৈষ্ঠসিতেঽষ্টম্যাদ্যাশ্চত্বারো বায়ুধারণাদিবসাঃ।
মৃদুশুভপবনাঃশস্তাঃস্নিগ্ধঘনস্থগিতগগনাশ্চ ॥ ১
তত্রৈবস্বাত্যাদ্যে বৃষ্টেভচতুষ্টয়ে ক্রমান্মাসাঃ।
শ্রাবণপূর্ব্বাজ্ঞেয়াঃ পরিস্রুতা ধারণাস্তাঃস্যুঃ ॥ ২
যদিতাঃস্যুরেকরূপাঃ শুভাস্ততঃ সান্তরাস্ত্বনশিবায়।
তস্করভয়দাঃ প্রোক্তাঃ শ্লোকাশ্চাপ্যত্র বাশিষ্ঠাঃ ॥ ৩
সবিদ্যুতঃসপৃষতঃসপাংশুৎকরমারুতাঃ।
সার্কচন্দ্রপরিচ্ছন্নাধারণাঃশুভধারণাঃ ॥ ৪
যদাতু বিদ্যুতঃ শ্রেষ্ঠাঃ শুভাশাপ্রত্যুপস্থিতাঃ।
তদাপিসর্ব্বশস্যানাং বৃদ্ধিং ব্রুয়াদ্বিচক্ষণঃ ॥ ৫
সপাংশুবর্ষাঃ সাপশ্চশুভাবালক্রিয়াঅপি।
পক্ষিণাংসুস্বরাবাচঃ ক্রীড়াপাংশু জলাদিষু ॥ ৬
রবিচন্দ্রপরিবেষাঃ স্নিগ্ধা নাত্যন্তদূষিতাঃ।
বৃষ্টিস্তদাপিবিজ্ঞেয়া সর্ব্বশস্যাভিবৃদ্ধয়ে ॥ ৭
মেঘাঃস্নিগ্ধাঃ সংহতাশ্চ প্রদক্ষিণগতিক্রিয়াঃ।
তদাস্যান্মহতীবৃষ্টি সর্ব্বশস্যার্থসাধিকা ॥ ৮

ইতি গর্ভধারণা বৃঃ সংহিতাঃ।

জ্যৈষ্ঠ্যাং সমতীতায়াং পূর্ব্বাষাঢ়াদিসম্প্রবৃষ্টেন।
শুভমশুভং বা বাচ্যং পরিমাণঞ্চাম্ভসস্তজ্ঞৈঃ ॥ ১
হস্তবিশালং কুণ্ডকমধিকৃত্যাম্বুপ্রমাণনির্দ্দেশঃ।
পঞ্চাশৎপলমাঢ়কমনেননিম্নুয়াজ্জলং পতিতং ॥ ২
যেনধরিত্রীমুদ্রাজনিতা বা বিন্দবস্তৃণাগ্রেষু।
বৃষ্টেন তেনবাচ্যং পরিমাণং বারিণঃ প্রথমম্ ॥ ৩
কেচিদ যথাভিবৃষ্টং দশযোজনমণ্ডলং বদন্ত্যন্যে।
গর্গবসিষ্টপরাশরমতমেতদ্দ্বাদশান্ন পরম ॥ ৪
যেষুচ ভেষভিবৃষ্টং ভূয়স্তেষ্বেব বর্ষতি প্রায়ঃ।
যদিণাগ্যাদিষু বৃষ্টং সর্ব্বেষু তদাষ্টনাবৃষ্টিঃ ॥ ৫
হস্তাপ্যসৌম্যচিত্রাপৌষ্ণ ধনিষ্ঠাসু ষোড়শদ্রোণাঃ।
শতভিষগৈন্দ্রস্বাতিষু চত্বারঃ কৃত্তিকাসুদশ ॥ ৬

শ্রবণেমঘান্বরাধাভরণীমূলেষু দশচতুর্যুক্তাঃ।
ফল্গুণ্যাং পঞ্চকৃতিঃ পুনর্ব্বসৌ বিংশতিদ্রোণাঃ ॥ ৭
ঐন্দ্রাখ্যাখ্যে বৈশ্বেচ বিংশতি সার্পভে দশত্র্যাবিকাঃ।
আহিব্রধ্নার্য্যম্ন প্রাজাপত্যেষু পঞ্চকৃতিঃ ॥ ৮
পঞ্চদশাজৈ পুষ্যেচ কীর্ত্তিতা বাজিভেদশদ্বৌচ।
রৌদ্রেহষ্টাদশ কথিতাদ্রোণানিরুপদ্রবেষ্বেষু ॥ ৯
রবিরবিসুতকেতুপীড়িতেভেঙ্গিতিতনয়ত্রিবিধাদ্ভুতাহতেচ।
ভবতিহিনশিবং নচাপিবৃষ্টিঃ শুভসহিতে নিরুপদ্রবে
জিবক্ষে ॥ ১০

ইতি প্রবর্ষণং বৃঃ সংহিতাঃ।

"জীবলোকের প্রাণস্বরূপ অন্ন বর্ষাকালায়ত্ত; সুতরাং বর্ষার বিষয় অতিযত্নের সহিত অবগত হওয়া কর্ত্তব্য। পূর্ব্বতন গর্গ, পরাশর, কাশ্যপ, বাৎস্যাদি ঋষিগণ যে সমস্ত বর্ষালক্ষণ উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, তাহাই সঙ্কলন করিয়া, উপরোক্ত শ্লোকগুলি লিখিত হইয়াছে। যে দৈবজ্ঞ দিবারাত্র অবহিতচিত্তে গর্ভলক্ষণ সকল আলোচনা করিয়া বর্ষানিরূপণ করেন, তাঁহার বাক্য অম্বুনির্দ্দেশে কখনও নিষ্ফল হয় না; অপিচ, ক্ষণবিধ্বংসী পাপপ্রবণ কলিকালেও, তিনি পূর্ব্বতন মুনিগণের ন্যায় ত্রিকালদর্শী।

অতএব এই বর্ষাগণনা-শাস্ত্র অপেক্ষা আর কোন শাস্ত্র অধিকতর শ্রেষ্ঠ? কোন কোন পণ্ডিতের মতে, চান্দ্রকার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষ অতীত হইলে গর্ভ আরব্ধ হয়; কিন্তু গর্গাদি বহুতর ঋষিগণের মতে, চান্দ্র-অগ্রহায়ণমাসের শুক্লপক্ষ-প্রতিপদ হইতে যখন চন্দ্র পূর্ব্বাষাঢ়াদি নক্ষত্রে গমন করে, তৎকালীন গর্ভ প্রশস্ত ও গণনীয়। চন্দ্রের যে নক্ষত্র-ভোগকালে গর্ভ হয়, ত্রয়োদশ পক্ষান্তে বা ১৯৫ দিবস পরে পুনরায় যখন চন্দ্র সেই নক্ষত্রে আগমন করে, তৎকালে চন্দ্রবশে বর্ষণ হয়। শুক্লপক্ষভবগর্ভ কৃষ্ণপক্ষে, কৃষ্ণপক্ষ-ভব গর্ভ শুক্লপক্ষে, দিবাভবগর্ভ রাত্রে, রাত্রিভবগর্ভ দিবায়, এবং প্রাতর্ভবগর্ভ সন্ধ্যায়, ও সন্ধ্যাভবগর্ভ প্রাতে বর্ষণ হইয়া থাকে। যেদিকে গর্ভ হয়, এবং তৎকালে বায়ু যে দিক হইতে প্রবাহিত হয়, কালপূর্ণ হইলে অর্থাৎ প্রসবকালে তাহার বিপরীতদিকে বর্ষণ হয়। তদ্ভিন্ন, বায়ুও তৎকালে বিপরীতদিক হইতে প্রবাহিত হয়; অর্থাৎ পূর্ব্বদিকে গর্ভ হইলে, পশ্চিমদিকে বর্ষণ হয়; এবং গর্ভকালে বায়ু পূর্ব্বদিকে প্রবহমান থাকিলে, বর্ষণকালে পশ্চিমদিক হইতে প্রবাহিত হয়। অন্যান্য দিকসম্বন্ধেও এইরূপ বিপরীতক্রমে বর্ষণ হইয়া থাকে। অগ্রহায়ণমাসের শুক্লপক্ষজাতগর্ভ জ্যৈষ্ঠের কৃষ্ণপক্ষে, এবং কৃষ্ণপক্ষজাত গর্ভ আষাঢ়ের শুক্লপক্ষে; পৌষের শুক্লপক্ষজাত গর্ভ আষাঢ়ের কৃষ্ণপক্ষে এবং কৃষ্ণপক্ষ জাত গর্ভ শ্রাবণ-শুক্লপক্ষে বর্ষিত হইয়া থাকে। এইরূপ উত্তরোত্তর মাসগত পাক্ষিক গর্ভসমূহ যথাকালে বিপরীত পক্ষক্রমে অভিবর্ষণ করে। কিন্তু অগ্রহায়ণমাস ও পৌষের শুক্লপক্ষজাত গর্ভে উত্তমরূপ বর্ষণ হয় না। যদি গর্ভকালে আকাশ বিমল রহে এবং উত্তর, ঈশান ও পূর্ব্বদিক হইতে মৃদুমন্দভাবে মনোহর সজলবায়ু প্রবাহিত হইতে থাকে, বা চন্দ্রসূর্য্যের মণ্ডল সকল স্নিগ্ধশ্বেত ও বিশাল হয়, বা মেঘ সকল যদি অতি স্থূল, বিস্তৃত, স্নিগ্ধ, ঘনসূচী, ক্ষুরের আকারবিশিষ্ট বা লোহিত বর্ণ হয়, বা আকাশ, চন্দ্র, নক্ষত্রাদি বিমল হইলেও কাকাণ্ড ও বিচিত্র বর্ণযুক্ত হয়; যদি ইন্দ্রধনু, মৃদুবজ্রগর্জ্জন, তড়িৎ ও প্রতিসূর্য্য প্রভৃতি লক্ষিত হয়; যদি উভয় সন্ধ্যা পরম মনোরম এবং শান্তমৃগপক্ষিকুল শান্তাদিক হইতে মনোহর রব করিতে থাকে; যদি প্রদক্ষিণ-গামী গ্রহগণ বিপুলাকার, নিরুপসর্গ ও স্নিগ্ধকিরণবিশিষ্ট হয়; এবং চরাচর জীবজগৎ সর্ব্বদা প্রমুদিত থাকে ও বৃক্ষ-লতাদি সুপুষ্ট ও পল্লবসমূহ অভক্ষিত ও অমলিন বা অঙ্কুরসমূহ জলসেচন ব্যতীতও বর্দ্ধিত হইতে থাকে, তাহা হইলে তদ্দ্বারা তৎকালজাত গর্ভের প্রভূত পুষ্টিসাধন হইয়া থাকে; এবং যথাসময়ে প্রচুর বারিও বর্ষিত হয়।" গর্ভপুষ্টিকর উপরোক্ত সাধারণ লক্ষণগুলি ব্যতীত প্রত্যেক ঋতুজাত আরও কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ আছে; যথা:— যদি অগ্রহায়ণ ও পৌষমাসের সন্ধ্যাদ্বয় লোহিতরাগরঞ্জিত ও মধ্যে মধ্যে আকাশ বিশাল মেঘমণ্ডলে ব্যাপ্ত হয়, এবং অগ্রহায়ণমাসে অত্যন্ত শীত ও পৌষমাসে অতিশয় তুষারপাত হয়; যদি মাঘমাসে ঘোরতর শীত ও প্রবলবায়ু প্রবাহিত হয়, চন্দ্রসূর্য্যের দীপ্তি তুষারপাতে অত্যন্ত মলিন ও অস্পষ্ট বোধ হয় এবং সূর্য্যের উদয় ও

অস্তকালে আকাশ মেঘাবৃত থাকে; যদি ফাল্গুনমাসে সূর্য্য কপিল বা তাম্রবর্ণ, মেঘ সকল স্নিগ্ধ ও অসম্পূর্ণ মণ্ডলযুক্ত ও প্রচণ্ড রূক্ষ পবন প্রবাহিত হয়; যদি চৈত্রমাসে চন্দ্র-সূর্য্য পরিবেশযুক্ত এবং মেঘ, বৃষ্টি ও বাতজ ত্রিনিমিত্তক গর্ভ পরিলক্ষিত হয়; এবং বৈশাখমাসে মেঘ, বায়ু, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ ও বজ্রাঘাত জনিত পঞ্চনিমিত্তক গর্ভ হয়, তাহা হইলে ঋতুস্বভাবজনিত তত্তৎকালীন গর্ভ অতীব প্রশস্ত। যদি গর্ভকালে মেঘসকল মুক্তা, রৌপ্য, তমাল, নীলোৎপল বা নীলাঞ্জন সদৃশ আভাবিশিষ্ট বা জলচরপ্রাণীর আকার-বিশিষ্ট হয়, বা নির্বাত আকাশে মেঘ সকল যদি তীব্রতর সূর্য্যকিরণে প্রতপ্ত হইতে থাকে, তাহা হইলে প্রসবকালে সে সমস্ত গর্ভ প্রভূত বারিবর্ষণ করিয়া থাকে। কিন্তু উপরোক্ত যেসমস্ত লক্ষণ দ্বারা গর্ভের বিবৃদ্ধি হইয়া থাকে, কখন কখন উল্কা, অশনিপাত, দিগ্দাহ, ভূমিকম্প, গন্ধর্ব্ব-নগর, কীলক, কেতু, গ্রহযুদ্ধ, নির্ঘাত, ধূলি ও রুধিরাদি বৃষ্টি, মৃগপক্ষিবৈকৃত, পরিঘ, ইন্দ্রধনু, গ্রহণ প্রভৃতি ত্রিবিধ উৎপাত দ্বারা পীড়িত হইলে গর্ভ সকলের উপঘাত হইয়া থাকে; অর্থাৎ প্রসবকালে বর্ষণ হয় না, বা সময়াতিক্রান্তে সামান্য বারিবর্ষণ হয়। অধিকন্তু, ঋতুস্বভাবজনিত লক্ষণের বৈপরীত্য ঘটিলেও গর্ভের হানি হইয়া থাকে। সাধারণতঃ সকল ঋতুতেই ভাদ্রপদদ্বয়, আষাঢ়া-দ্বয় ও রোহিণী নক্ষত্রজাত গর্ভসকল প্রভূত পরিমাণ বারিবর্ষণ করিয়া থাকে। শতভিষা, অশ্লেষা, আর্দ্রা, স্বাতী ও মঘা নক্ষত্রজাত শুভলক্ষণযুক্ত গর্ভসকল বহুদিবস ধরিয়া বারিবর্ষণ করে; কিন্তু অশুভ নিমিত্ত দ্বারা পীড়িত হইলে বিপরীত ফল প্রদান করিয়া থাকে। অনুকূল গ্রহ-তারা ও চন্দ্রের যোগে যদি উক্ত পঞ্চনক্ষত্রে অগ্রহায়ণোত্তর ছয়মাসে গর্ভ হয়, তাহা হইলে প্রসবকালে যথাক্রমে ৮।৬। ১৬।২৪।২৩ দিবস ধরিয়া অবিশ্রান্ত বারিবর্ষণ হইয়া থাকে। গর্ভকালে চন্দ্র ও সূর্য্য শুভগ্রহ কর্ত্তৃক সংযুক্ত বা বীক্ষিত হইলে প্রভূত বারিবর্ষণ হইয়া থাকে; অন্যথা করকা, অশনি, মৎস্য, ভেক, সরীসৃপাদি বর্ষণ হয়। গর্ভকালে যদি অতিরিক্ত বারিপাত হয় বা এক দ্রোণের অষ্টমাংশের অধিক বর্ষণ হয়, তবে সে গর্ভ স্রাব হইয়া যায় অর্থাৎ প্রসবকালে বর্ষণ করে না। পরিপুষ্টগর্ভ প্রসবকালে যদি গ্রহোপঘাতাদি উৎপাত জন্য বর্ষিত না হয়, তবে পুনরায় ত্রয়োদশ পক্ষান্তে চন্দ্রবশে সেই নক্ষত্রে করকামিশ্র জলদান করে। (এই শ্লোক দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, অনিমিত্তবশতঃ যে সকল গর্ভে বর্ষাকালে বৃষ্টি হয় না, সে সকল পরবর্ত্তী শীতের মধ্য বা শেষভাগে করকাযুক্ত বর্ষণ করে)। পয়স্বিনী গাভীর দুগ্ধ বহুদিবস দোহন না করিলে যেরূপ কঠিনত্ব প্রাপ্ত হয়, কালাতীত গর্ভও তদ্রূপ দ্বিতীয় বর্ষণকালে কাঠিন্য প্রাপ্ত হয়। পঞ্চনিমিত্তক গর্ভে শতযোজন, চতুর্নিমিত্তকগর্ভে পঞ্চাশত যোজন, ত্রিনিমিত্তক গর্ভে পঞ্চবিংশ যোজন, দ্বিনিমিত্তক গর্ভে ১২॥০ যোজন এবং একনিমিত্তকগর্ভে ৬।০ যোজন পরিমিত ভূভাগে বর্ষণ হইয়া থাকে। পঞ্চনিমিত্তকগর্ভে ১ দ্রোণ, পবন-নিমিত্তকগর্ভে তিন আঢ়ক, বিদ্যান্নিমিত্তক গর্ভে ছয় আঢ়ক, মেঘজগর্ভে নয় আঢ়ক, এবং মেঘগর্জ্জননিমিত্তকগর্ভে দ্বাদশ আঢ়ক পরিমিত জল প্রসবকালে বর্ষিত হইয়া থাকে। গর্ভকালে যদি পঞ্চনিমিত্তকগর্ভে প্রচুর বর্ষণ হয়, তাহা হইলে প্রসবকালে কণামাত্রও বারি বর্ষে না।"

ধারণা—"চান্দ্র জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লপক্ষের অষ্টম্যাদি চারিদিবসকাল যদি শুভদিক (অর্থাৎ ঈশানাদি) হইতে মৃদুমন্দ বায়ু প্রবাহিত হয় ও স্নিগ্ধ ঘন মৃদুগতি মেঘ সকল আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন করে, তবে তাহা ধারণা বলিয়া কথিত হয়। যদি উল্লিখিত অষ্টমী তিথি হইতে স্বাত্যাদি-ক্রমে চারি নক্ষত্রে বৃষ্টি হয়, তাহা হইলে শ্রাবণাদিক্রমে চারি মাসে উত্তম বর্ষা হইবে। যদি ঐ কয়দিবস আকাশে জলকণাবর্ষী সবিদ্যুৎ মেঘ দেখা যায়, এবং ধূলিকণাযুক্ত বায়ু প্রবাহিত, বজ্রঘাত ও চন্দ্রসূর্য্যের দীপ্তি পরিচ্ছন্ন হয়; যদি শুভদিক হইতে রক্তদণ্ডতুল্য তড়িৎ দৃষ্ট হয়, বালক সকল পরস্পর ধূলি ও জল ক্রীড়া করে, শুভ মৃগপক্ষিকুল সুস্বরে রব এবং ধূলি ও জলে স্নানক্রীড়া করিতে থাকে; যদি বিপুল স্নিগ্ধ মেঘরাশি প্রদক্ষিণগতিতে ভ্রমণ ও বর্ষণ করে এবং চন্দ্রসূর্য্যের মণ্ডল স্নিগ্ধ ও বিমল হয়, তাহা হইলে তৎকালীন 'ধারণা' অতীব প্রশস্তা, প্রচুর বৃষ্টি ও সর্ব্বশস্যার্থ-সাধিকা।"

প্রবর্ষণ—"জ্যৈষ্ঠমাসের পূর্ণিমা অতীত হইলে, যদি পূর্ব্বাষাঢ়াদি নক্ষত্রে বৃষ্টি হয়, তাহা হইলে তৎকালে পৃথিবীতে নিপতিত (অতএব পরিমাণ-পাত্রে সঞ্চিত) বা তৃণাগ্রে সঞ্চিত বৃষ্টির পরিমাণ দেখিয়া, দৈবজ্ঞ ভবিষ্যৎ বর্ষার শুভাশুভ ও বৃষ্টির পরিমাণ নির্দ্দেশ করিবেন। ঐকালে যে যে নক্ষত্রে বৃষ্টি হইবে, বর্ষাকালে সেই সেই নক্ষত্রেই বৃষ্টি হইবে; এবং যদি পূর্ব্বাষাঢ়াদি নক্ষত্রে বৃষ্টি না হয়, তাহা হইলে বর্ষায় অনাবৃষ্টি বা অল্পবৃষ্টি হইবে। যদি গর্ভ ও জ্যৈষ্ঠমাসের বর্ষণকালে এবং বর্ষাকালে চন্দ্র শুভ ও নিরুপদ্রব এবং নক্ষত্র সকল শুভগ্রহ কর্ত্তৃক বীক্ষিত হয়, তাহা হইলে বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টি হয়। কিন্তু যদি শনি, কেতু ও মঙ্গল কর্ত্তৃক বীক্ষিত এবং দৈব, আন্তরীক্ষ্য ও ভৌমাদি ত্রিবিধ উৎপাত-পীড়িত হয়, তাহা হইলে উত্তম বর্ষণ হয় না।"

টীকা—পূর্ব্বতন দৈবজ্ঞগণের মতে, অগ্রহায়ণমাসই গর্ভগণনাপক্ষে প্রশস্তকাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু কার্ত্তিক মাস হইতে গণনা করায় কোন ক্ষতি নাই। কারণ, কার্ত্তিক মাসের গর্ভেও বর্ষণ হইয়া থাকে; তবে সেরূপ বৃষ্টি অল্প। বৃষ্টিমাত্রই গর্ভপরিপুষ্টির একটী প্রধান কারণ। কার্ত্তিক-মাসে চন্দ্রের নক্ষত্রভোগকালে বৃষ্টিনিমিত্তক যে সকল গর্ভ হয়, বৈশাখমাসে সেই সেই নক্ষত্রে নিশ্চয়ই প্রচুর বা মধ্যম বর্ষণ হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত ভূয়োদর্শনবলে অধুনাতন জলবিদগণ কার্ত্তিকমাস হইতেই গর্ভগণনা করিবার উপদেশ দিয়া থাকেন।

"গর্ভদিবস হইতে ১৯৫ দিবস বা ত্রয়োদশ পক্ষান্তে, সেই নক্ষত্রে বর্ষণ হইবে"; সিদ্ধান্ত-গ্রন্থে এরূপ উল্লেখ থাকিলেও, সাধারণতঃ ১৯২ বা ১৯৩ দিবসে অভীষ্ট নক্ষত্র পাওয়া যায়; এবং কখন কখন সিত-কৃষ্ণাদি পক্ষসম্বন্ধে ২।৪ দিবসের বিভিন্নতাও দেখা যায়। সুতরাং, এ অবস্থায় ১৯২ বা ১৯৩ দিবসে যে নক্ষত্র পাওয়া যায়, তাহাকেই অভীষ্ট নক্ষত্র স্থির করা উচিত। কিন্তু কদাচ ১৯৫ দিবসের পরের অভীষ্ট নক্ষত্র গ্রহণ করা উচিত নহে; কারণ, তাহাতে গণনার বিশেষ ভ্রান্তি ও বিপর্য্যয় ঘটে।

কার্ত্তিক অবধি চৈত্র পর্য্যন্ত—এই কএক মাসে প্রভূত বাষ্প ও মেঘরাশি সঞ্চিত হইয়া গর্ভ হইয়া থাকে; তন্মধ্যে, সাধারণতঃ কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসের গর্ভে মন্দ মন্দ বৃষ্টি হয়; এবং কার্ত্তিকমাসে বৃষ্টিগর্ভ ব্যতীত অন্য কোন গর্ভে প্রায় বর্ষণ হয় না। কিন্তু এ মাসেও গর্ভকালে প্রচুর বর্ষণ হইলে, গর্ভ বিফল হইয়া থাকে। সুতরাং মন্দ মন্দ বা মধ্যমরূপ বর্ষণ হইলে, গর্ভের পুষ্টিসাধন হইয়া, যথাকালে প্রচুর বর্ষণ হয়। অবশিষ্ট কএক মাসের মধ্যে পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন মাসের বহুসংখ্যক গর্ভে বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টি হইয়া থাকে। চৈত্রমাসে গর্ভসংখ্যা মধ্যমরূপ। অধুনাতন-কালে, কেহ কেহ বৈশাখমাসেও গর্ভগণনার উপদেশ দিয়া থাকেন; কিন্তু তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে। অগ্রহায়ণ-মাস ও মাঘমাসের মধ্যভাগে বিস্তর সূক্ষ্ম (Cirrus) গর্ভ হয়; কিন্তু শীতসহযোগে এগুলি পুষ্ট না হইলে মন্দফলা হয়। পৌষাদি চৈত্র পর্য্যন্ত কএক মাসের মধ্যে মেঘজনিত গর্ভই অধিকতর প্রশস্ত। পৌষমাসের সংক্রান্তি বরাবর কখন কখন বৃষ্টি দেখা যায়; কিন্তু তাহাও ৫।৭ বৎসর অন্তর। ঝটিকাবর্ত্তযুক্ত গর্ভ সকল ফাল্গুনের শেষ ও চৈত্রমাসেই অধিক দেখা যায়। কখন কখন পৌষ ও মাঘ মাসে, উপর্য্যুপরি ৩।৪ দিন বা ৬।৭ দিন ধরিয়া নির্ম্মল আকাশে প্রবলগতি প্রখর শীতবায়ু প্রবাহিত হইয়া, বাতগর্ভ সকল নিষ্পন্ন হয়; এবং এইরূপ গর্ভের পর প্রায়ই দেখা যায় যে, আকাশ প্রভূত পরিমাণ সূক্ষ্মায় ঢাকিয়া গিয়াছে। সমগ্র শীতকাল ব্যাপিয়া বাষ্পগর্ভও হইয়া থাকে। এগুলি পূর্ব্বাহ্ণ ১০টা হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত শিথিল তুলারাশির মত গগনমণ্ডলের ইতস্ততঃ প্রবাহিত হয়। সাধারণতঃ অষ্টমী হইতে অমাবাস্যা বা পূর্ণিমা পর্য্যন্ত গর্ভ-সংখ্যা অধিক; এবং যে পক্ষে গর্ভসংখ্যা অধিক হইবে, তৎপরপক্ষে সেই পরিমাণে অল্পসংখ্যক গর্ভ হইবে বা একে-বারে হইতেও না পারে। প্রতিপদের গর্ভ বড়ই প্রশস্ত। সকল নক্ষত্রে গর্ভ হইলেও, রোহিণী অবধি আর্দ্রা, পূর্ব্ব-ফাল্গুনী অবধি স্বাতী, মূলা অবধি উত্তরাষাঢ়া ও শতভিষা এবং ভাদ্রপদদ্বয়, বিশেষ এই চারিটী কাল্পনিক নাক্ষত্রিক-গণে প্রচুর ও নিরবচ্ছিন্ন গর্ভ দৃষ্টিগোচর হয়। শীতকালে

এক নক্ষত্রে গর্ভ হইলে, প্রায় মাসে মাসে সেই নক্ষত্রেই গর্ভ হইয়া থাকে; কখন বা একমাস না হইয়া পরমাসে গর্ভ হয়। কিন্তু এ নিয়মটী আর্দ্রা, স্বাতী, পূর্ব্বফল্গুনী, মূলা ও শতভিষা প্রভৃতি নক্ষত্রসম্বন্ধে অধিক খাটে; এবং কখন কখন অষ্টমী, চতুর্দ্দশী ও প্রতিপদ তিথিতেও এই নিয়ম লক্ষিত হয়।

পূর্ব্বতন সংগ্রহকারগণের মতে, গর্ভের বিপরীত সময়ে বর্ষণ হয়; কিন্তু অনেক সময় ইহার বিপর্য্যয়ও লক্ষিত হয়। কারণ, দেখা যায় যে, সন্ধ্যাদ্বয়ে গর্ভ হইলেই বিপরীত সময়ে বর্ষণ হয়; অন্যথা, অন্যান্য গর্ভে গর্ভকালের বিপরীত সময়ে বর্ষণ না হইয়া, ৩।৪ ঘণ্টা হইতে ৭।৮ ঘণ্টার মধ্যে বর্ষণ হইয়া থাকে। আবার কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ জাত গর্ভ সকল যে সময়েই উৎপন্ন হউক না কেন, প্রায় সন্ধ্যাকালেই বর্ষিত হইয়া থাকে; এবং কখন কখন দারুণ গ্রীষ্মাতিশয্য-বশতঃ, ঐ সকল গর্ভে বর্ষণ না হইয়া, আকাশে রং উঠিয়া কাটিয়া যায় বা শৈত্যবশতঃ 'কসে' আকাশ ঢাকিয়া যায়। এই নিমিত্তই বোধ হয় পূর্ব্বতন ঋষিরা কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ জাত গর্ভ সকল মন্দফলা বলিয়া গিয়াছেন।

(১) উপর্য্যুপরি স্নিগ্ধ ও বিশালকায় মেঘ সকল ৪।৫ ঘণ্টাকাল প্রবাহিত হইলে গর্ভ হয়; এবং তাহার বর্ষণফলও প্রচুর। সাধারণতঃ এইরূপ মেঘ পূর্ব্বাহ্ণ ৮টা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত প্রবাহিত হয়; এবং ইহার বর্ষণ-কাল মধ্যাহ্ন হইতে অপরাহ্ণ ৪টার মধ্যে। কখন কখন উক্তরূপ মেঘ ক্রমাগত ২।৩ দিবস ধরিয়া প্রবাহিত হয়; তদবস্থায় প্রত্যহই সময় সময় বর্ষণ হইয়া থাকে। কখন বা ৩।৪ দিন ধরিয়া এক নির্দ্দিষ্টসময়ে গর্ভ হয়; এরূপ অবস্থায় বর্ষণকালে যে বৎসর অধিক বৃষ্টির আশা করা যায়, সে বৎসর কয়দিবসই বৃষ্টি হইতে পারে। আবার কখন বা পর্য্যায়ক্রমে একদিবস অন্তর স্বকীয়নক্ষত্রগুলিতে বর্ষণ হইয়া থাকে; কখন বা প্রথমভাগে একদিবস বৃষ্টি হয় ও অবশিষ্ট কয়দিবস শুষ্ক যায়। পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন—এই তিনমাসে এইপ্রকার গর্ভ প্রায়ই দেখা যায়। কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসে এইরূপ গর্ভসংখ্যা অল্প এবং বর্ষণফলও মন্দ।

(২) যাবতীয় মেঘজনিত গর্ভমধ্যে "রঙ্গের" গর্ভ সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত; এবং ইহার বর্ষণফলও স্থিরনিশ্চয়। মেঘ সকল যাইতে যাইতে কোনস্থলে প্রভূতপরিমাণে সঞ্চিত হইয়া "রং" (Nimbus) আকার ধারণ করে; কখনও বা তাহাতে সামান্য বৃষ্টি, বিদ্যুৎ ও বজ্রা-ঘাত হইয়া, গর্ভের প্রভূত পুষ্টিসাধন করে। এরূপ গর্ভ প্রায়ই ফাল্গুনের শেষভাগে ও চৈত্রমাসে দেখা যায়। ইহাই চতুঃ বা পঞ্চ নিমিত্তক গর্ভ। পৌষ ও মাঘ মাসে বৃষ্টি আদি ব্যতিরেকেও "রং" এর গর্ভ দেখা যায়; এবং তাহাতে উত্তম বর্ষণও হইয়া থাকে। যদি কোনও দিবস ৩।৪ বার বা ক্রমাগত ২।৩ তিন দিন ধরিয়া, ঐরূপ গর্ভ হয়, তাহা হইলে বর্ষায় সেই দিবস বা উপর্য্যুপরি কয়দিবস মাঝে মাঝে বা থাকিয়া থাকিয়া বৃষ্টি হইবে; ইহা স্থির। কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসে "রং" এর গর্ভ প্রায় দেখা যায় না; এবং কার্ত্তিকমাসে "রং" উঠিলে, তৎক্ষণাৎ বৃষ্টি হয়।

(৩) কখন কখন টুক্‌রা টুক্‌রা 'আড়ং' ও 'দোর' দ্বারাও গর্ভ হয়। ফাল্গুনের শেষ ও চৈত্রমাসের শীতল রাত্রিভাগে মাঝে মাঝে সমস্ত রাত্রি ধরিয়া দোর চলিয়া গর্ভ নিষ্পন্ন হয়। এইরূপ অল্পক্ষণস্থায়ী হইলে প্রশস্ত নহে; এবং এ প্রকার গর্ভে স্বকীয়নক্ষত্রানুযায়ী প্রাতেই বর্ষণ হইয়া থাকে। শুষ্কনক্ষত্রে বা অন্য কোন মাসে এরূপ গর্ভে কদাচ বৃষ্টি দেখা যায়।

(৪) দারুণ উত্তাপে মেঘ সকল জমিয়া "কসের" আকার ধারণ করে। চৈত্রমাসেই এইরূপ প্রশস্ত গর্ভ দেখা যায়। ইহার বর্ষণকাল অপরাহ্ণ হইতে মধ্যরাত্র পর্য্যন্ত। অন্যান্য মাসে এরূপ গর্ভে বর্ষণ হইলেও, কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসে মোটেই বর্ষণ হয় না।

(৫) সকল মাসেই কোদালে-মেঘের গর্ভ দেখা যায়, কিন্তু ইহা ৭।৮ ঘণ্টাকাল স্থায়ী না হইলে কোন ফল হয় না; এবং কার্ত্তিকও অগ্রহায়ণ মাসের এরূপ গর্ভে প্রায়ই বৃষ্টি হয় না। কোদালে-মেঘ চলিলেই একটু উষ্ণতা অনুভব হয়; এজন্য ফাল্গুন-চৈত্রমাসে কখন কখন তিন চারি দিবস ধরিয়া ক্রমাগত কোদালে-মেঘ প্রবাহিত হইয়া গর্ভ নিষ্পন্ন হয়। এরূপস্থলে সাধারণ বৃষ্টির আশা করা যায়; এবং ইহার

বর্ষণকাল মধ্যাহ্ন। কখন কখন কোদালে-মেঘের উপর, সূর্য্যকিরণ পতিত হইয়া, বিচিত্রবর্ণ উৎপন্ন হয়; কোদালে-মেঘের এই প্রকার গর্ভ সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত।

(৬) এ দেশের কৃষকেরা পর্য্যন্ত পৌষমাসের কুয়াসায় যে বৃষ্টি হয়, তাহা অবগত আছে। কুয়াসা-গর্ভ প্রশস্ত হইলেও সকলসময়ে বর্ষণ হয় না। পৌষ ও মাঘ মাসের কুয়াসায় অধিক এবং ফাল্গুন ও চৈত্রমাসের কুয়াসায় মধ্যম বর্ষণ হয়; কিন্তু অগ্রহায়ণমাসের কুয়াসা নিষ্ফলা। যে সকল কুয়াসা পরিমাণে অধিক ও অধিকক্ষণস্থায়ী এবং সূর্য্যের উত্তাপে উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া তরলিত তুলা-রাশির মত বা ছোট বড় নানাপ্রকার মেঘের আকার ধারণ করে, সেই সমস্ত কুয়াসায় বর্ষণ হয়। ইহার বর্ষণকাল অপরাহ্ণ এবং এই প্রকার কুয়াসা-গর্ভ কদাচ নিষ্ফল হইতে দেখা যায়। যে সকল কুয়াসা, পরিমাণে অধিক হইলেও, আম্রাদির মুকুল নষ্ট করে এবং উক্তরূপ লক্ষণবিশিষ্ট না হয়, তাহা প্রায়ই নিষ্ফলা হইয়া থাকে। কখন কখন উপর্য্যুপরি ৩।৪ দিন ধরিয়া একনির্দ্দিষ্টসময়ে কুয়াসা-গর্ভ হয়; এরূপ-স্থলে কখন কখন একদিবস অন্তর, কখন বা কোন জলীয়-নক্ষত্রেই বর্ষণ হইয়া থাকে। অল্পক্ষণস্থায়ী কুয়াসায় কোনপ্রকার গর্ভ হয় না। কুয়াসার সময় দক্ষিণ বা নৈর্ঋত-বায়ু প্রবাহিত হইলে গর্ভোপঘাত হয়; কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে শীত ও উত্তরদিকের বায়ু প্রবাহিত হইলে গর্ভের বিশেষ পুষ্টি হয়। কুয়াসায় মেঘ না জন্মিলেও, শীত ও উত্তরে-বায়ু প্রবাহিত হইলে গর্ভ হয়; কিন্তু তাহার বর্ষণ সূক্ষ্ম। অল্পথা স্থূলবর্ষণ হয়।

(৭) যে সকল শুক্ল শ্বেতবর্ণ, বিক্রমাকৃতি বা লম্বা লম্বা, যাহা দেখিতে তুলাখণ্ড বা স্থূলকপির আকার-বিশিষ্ট, যাহা পরিমাণে অধিক, বা যাহার গতি পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখ, গাঢ়তর শীতসংযোগ হইলে, সেই সকল শুক্ল-গর্ভ অতীব প্রশস্ত; এবং তাহাতে প্রচুর বর্ষণ হয়। সাধারণতঃ, শুক্লর স্থিতি একদিবস হইতে ৫।৬ দিবস পর্য্যন্ত হয়। শুক্ল কদাচ অল্পক্ষণস্থায়ী দেখা যায় এবং সেরূপ হইলে গর্ভও হয় না। সকল মাসে শুক্ল দেখা যাইলেও, কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লয় কোনরূপ বর্ষণ হয় না। শীতকালে অধিক পরিমাণে শুক্ল দেখা যাইলে, তৎপরবর্ত্তী বৎসরের বর্ষায় ভালরূপ বৃষ্টি হয় না। শুক্ল-গর্ভে বর্ষণ-কালের স্থিরতা নাই। ফুলকপি বা তুলার আকারের শুক্লয় স্থূলবর্ষণ হয়; অল্পথা অনবরত সূক্ষ্মবর্ষণ হয়। কখন কখন দেখা যায় যে, শুক্ল-গর্ভের শেষে আকাশ পরিষ্কার ও প্রবল উত্তরে-বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। এরূপস্থলে বর্ষণকালে দেখা যায় যে, যে কএকদিবস শুক্ল ছিল, সে কয়দিবস বৃষ্টি না হইয়া, যে মুহূর্ত্তে শীতলবায়ু প্রবাহিত হইয়াছিল, ঠিক সেই সময়েই বর্ষণ আরম্ভ হইয়াছে। শুক্ল-গর্ভের বর্ষণ-কালে প্রচণ্ড বাতপ্রকোপ দেখা যায়। যদি শুক্ল পরিমাণে অধিক, অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও অতি দূরস্থ হয়, এবং সেইসময় বায়ু প্রবলরূপে বহিতে থাকে, তাহা হইলে বর্ষায় সেইসময় একবল ঝটিকা হইবে, এরূপ আশা করা যায়। বস্তুতঃ, বর্ষার অধিকাংশ ঝড়যুক্ত বৃষ্টি শুক্ল হইতেই উৎপন্ন।

(৮) শুষ্ক বাতপ্রবাহ দ্বারাও গর্ভ হয়। গ্রীষ্মকালে যেরূপ দক্ষিণা বা নৈর্ঋত বায়ু প্রবাহিত হয়, শীতকালে তদ্রূপ উত্তর ও ঈশান কোণ হইতে বায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে। কার্ত্তিক হইতে ফাল্গুনের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত উক্ত কএক দিকের বায়ু এবং অবশিষ্টকাল দক্ষিণ বা নৈর্ঋত কোণের বায়ু প্রবাহিত হয়। ইহার মধ্যে কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসে প্রায়ই বায়ুকোণের বায়ু এবং পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুনে প্রায়ই উত্তরদিকের মিশ্রবায়ু রহে। শুষ্ক উত্তরদিক হইতে বায়ু প্রবাহিত হইলে প্রচণ্ড শীত এবং বায়ু ও ঈশান কোণের বাতাসে অপেক্ষাকৃত অল্প শীত হয়। একাদিক্রমে ৭।৮ ঘণ্টাকাল বায়ু প্রবাহিত না হইলে গর্ভনিষ্পন্ন হয় না। উত্তর ও ঈশান কোণের বায়ু একাদিক্রমে কদাচ দুই দিনের উর্দ্ধ বহে; কিন্তু বায়ু-কোণের বায়ু ৪।৫ দিবস হইতে কখন কখন ১০।১২।১৫ দিবস পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত প্রবাহিত হইতে দেখা যায়। ইহার মধ্যে শুষ্ক উত্তর ও ঈশান কোণের বায়ুতেই প্রকৃষ্ট বাতগর্ভ নিষ্পন্ন হয়। বায়ুকোণের বায়ু যদি শীতল, প্রবল ও মেঘাদিযুক্ত হয়, তবে গর্ভ প্রশস্ত; অল্পথা নহে। একমাত্র ঈশান ভিন্ন অন্য কোন বাতগর্ভের বর্ষণকালের স্থিরতা নাই। নির্ম্মল আকাশে

শুষ্ক উত্তরে-বায়ু প্রবাহিত হইলে, ঠিক মধ্যাহ্নকালে বা সমস্ত দিন ধরিয়া মধ্যমরূপ বৃষ্টি হয়। বায়ু প্রবল বহিলে, বর্ষণকালেও বায়ু প্রবল রহে ও সূক্ষ্মধারে বর্ষণ হয়। বায়ুকোণের বায়ুতে গর্ভস্থায়ী কখন কখন পাঁচ ছয় দিন ধরিয়া মধ্যমরূপ বর্ষণ হয়; এবং তাহাও দিবসে একবার মাত্র; কখন বা বর্ষণ হয় না। অজলীয়-নক্ষত্রে গর্ভ, বায়ুর অপ্রাবল্য, অশৈত্য বা বাত-প্রবাহের অল্পক্ষণ স্থায়িত্বই ইহার প্রধান কারণ। কখন বা পর্য্যায়ক্রমে একদিবস অন্তর বর্ষণ হয়; তবে এ বায়ুতে জলীয় নক্ষত্রেই অধিক বর্ষণ হয়। কিন্তু ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে এই বায়ু অধিকক্ষণ প্রবাহিত হইলেই গর্ভ নিষ্পন্ন হয়; এবং তাহার বর্ষণফলও স্থিরনিশ্চয়। যে বৎসর অল্প শীত হইবে এবং মাসে মাসে দশ পনর দিবস ধরিয়া একাদিক্রমে বায়ুকোণের বায়ু প্রবাহিত হইবে ও মেঘ দেখা না যাইবে, তাহার পরবর্ত্তী বৎসর বর্ষায় মন্দ বৃষ্টি হইবে; ইহা স্থিরনিশ্চয়। বাতগর্ভের মধ্যে ঐশানগর্ভ সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। এই বায়ু অগ্রহায়ণ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত প্রায় সকলমাসেই মাঝে মাঝে প্রবাহিত হয়; এবং ইহা এক বা দুই ঘণ্টা হইতে কদাচ দুই দিনের উর্দ্ধ বহে। অতি অল্পকালমধ্যে এই বাতগর্ভ নিষ্পন্ন হয়; এবং যথাগর্ভোৎপত্তিকালে প্রচুর পরিমাণে বর্ষণ হইয়া থাকে। উপরোক্ত সকলপ্রকার গর্ভ কখন কখন মিথ্যা হইতে পারে; কিন্তু ইহা মিথ্যা হইবার নহে। ঐশানবায়ু থাকিয়া থাকিয়া দিবসে যতবার প্রবাহিত হইবে, বর্ষাকালে সেদিনে ততবার বর্ষণ হইবে। কার্ত্তিক ও পৌষ ব্যতীত শীতকালে পূর্ব্বে-হাওয়া বহে না; এবং বহিলেও বর্ষায় পরিণত হয় ও অধিক বর্ষণ হইলে গর্ভ নিষ্ফল হইয়া যায়। এদিকের বাতগর্ভের বর্ষণফল ঐশানবায়ুর ন্যায়। অগ্নি-কোণের বায়ুফল ঠিক পূর্ব্বদিকের ন্যায়—কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। শীতকালে দক্ষিণ, নৈর্ঋত বা পশ্চিম বায়ু প্রবাহিত হইলে গর্ভোপঘাত হয়। যদি এই সকল শুষ্ক বাতগর্ভের সহিত মেঘ, কুয়াসা, ধোঁর, কোদালে-মেঘ বা অন্য কোন লক্ষণ বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে সে গর্ভ অধিকতর প্রশস্ত এবং তাহার বর্ষণফলও প্রচুর।

গর্ভকালে অতিশয় শীত, প্রবলবায়ু বা শীতযুক্ত প্রবল বায়ু বহিলে, গর্ভ অতীব প্রশস্ত। এইরূপ গর্ভ প্রায়ই পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুনের প্রথমভাগেই দেখা যায়। গর্ভকালে যেসকল মেঘ অতিশয় উজ্জ্বল, শুভ্রবর্ণ ও সূর্য্যতাপ-তাপিত, বা যাহা "রং" হইয়া ঘন নীলিমাযুক্ত হইবে, বা যে সকল মেঘ হইতে বিন্দু বিন্দু বা মধ্যমরূপে বৃষ্টিপাত হইবে, বা গর্ভকালে আকাশ কাকডিম্বের ন্যায় বর্ণযুক্ত এবং বায়ু সজল ও উষ্ণ বোধ হইবে, সে সকল গর্ভ অতীব প্রশস্ত ও তাহাতে প্রচুর বৃষ্টি হইবে। অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ—এই তিনমাস প্রায়ই সূর্য্যের উদয়াস্ত, বিশেষতঃ উদয়কালে, আকাশ ঘোরতর রক্ত বা তাম্রবর্ণে রঞ্জিত থাকে; অন্যান্য মাসে, ততদূর ঘোর না হইয়া, ফিকা বর্ণের হয়। এই রাগ সকলদিন সমভাবে পরিস্ফুট হয় না; এবং পরিস্ফুট না হইলেও গর্ভ প্রশস্ত নহে। সুতরাং, যেপ্রকার গর্ভ হউক না কেন, অতিশয় স্ফুটরাগ জন্মিলেই, সে দিবসের গর্ভ বিশেষ প্রশস্ত। যে বৎসর শীতকালে এই রাগ অল্প জন্মে বা ফিকা হয়, তৎপরবর্ত্তী বর্ষায় ভালরূপে বর্ষণ হয় না।

প্রচুর মেঘ, মেঘমণ্ডল, বিশাল রং বা স্তরমেঘ বা বিদ্যুৎ ও বজ্রাঘাতযুক্ত গর্ভ বা চতুঃ বা পক্ষ নিমিত্তক গর্ভ হইলে, বিশাল বিস্তৃত ভূমিভাগে প্রচুরপরিমাণে বৃষ্টি হইয়া থাকে। অল্পথা সামান্য পরিমিত স্থানে বৃষ্টি হয়। যে ভূমিখণ্ডের উপরিভাগে গর্ভ হইবে, ঠিক সেই খণ্ডেই বর্ষণ হয়; কদাচ, ইহার ব্যতিক্রম ঘটিতেও দেখা যায়। বর্ষাকালে দেখা যায় যে, একস্থানে বৃষ্টি হইতেছে, অথচ তাহার পরবর্ত্তী স্থানে কিছুই নাই; আবার তাহার পার্শ্বেই প্রচুর বৃষ্টি হইতেছে। স্থানবিশেষে গর্ভ নিষ্পন্ন হয় বলিয়াই, এই প্রণালীতে বর্ষণ হয়। বর্ষাকালে যেরূপ ২।৪ দিবস অন্তর ৫।৭ দিন ধরিয়া বাদল দেখা যায়, শীতকালেও ঠিক সেইরূপভাবে ২।৪ দিবস অন্তর ৫।৭ দিন ধরিয়া গর্ভ হইয়া থাকে।

সকল নক্ষত্রেই গর্ভ হইয়া থাকে; এবং যে নক্ষত্রে গর্ভ হয়, গর্ভপুষ্টির কারণ বিদ্যমান থাকিলে, সেই নক্ষত্রে বৃষ্টির প্রাচুর্য্যও লক্ষিত হয়। কিন্তু নক্ষত্রবিশেষে বৃষ্টির পরি-মাণের বিশেষ তারতম্য দেখা যায়। সাধারণতঃ নক্ষত্রগুলি

চারিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে ; যথা :—বৃষ্টির কারণ বিদ্যমান থাকিতেও যাহাতে সহজে বৃষ্টি হয় না, তাহা শুষ্ক নক্ষত্র ; অশ্বিনী, ভরণী, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, ধনিষ্ঠা ও রেবতী এই শ্রেণীর অন্তর্গত। যেসকল নক্ষত্রে উষ্ণতার আধিক্য হইবার পর অনুকূল কারণে বর্ষা হয়, তাহা আগ্নেয়-নক্ষত্র ; কৃত্তিকা, অশ্লেষা, মঘা, হস্তা, বিশাখা—এই শ্রেণীর অন্তর্গত। যেসকল নক্ষত্রে বর্ষণকালে বায়ুর প্রাবল্য হয়, তাহা বায়ব্য-নক্ষত্র ; স্বাতী ও শতভিষা—এই শ্রেণীর অন্তর্গত। যাহা আগ্নেয় ও শুষ্ক নক্ষত্রের মধ্যবর্ত্তী গুণবিশিষ্ট, তাহা সমধাতু-নক্ষত্র ; পুনর্ব্বসু, পুষ্যা, চিত্রা ও ভাদ্রপদদ্বয়—এই শ্রেণীর অন্তর্গত। যে সকল নক্ষত্রে সাধারণতঃ অধিক বৃষ্টি হয়, তাহা জলীয়নক্ষত্র ; রোহিণী, মৃগশিরা, আর্দ্রা, ফল্গুনীদ্বয়, মূলা, আষাঢ়াদ্বয় ও শ্রবণা—এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ভরণী, অশ্লেষা, মঘা, বিশাখা, অনুরাধা, ধনিষ্ঠা ও রেবতী নক্ষত্রের বর্ষণসংখ্যা অল্প ; রোহিণী, আর্দ্রা, স্বাতী, হস্তা, মূলা, আষাঢ়াদ্বয় ও শতভিষা নক্ষত্রে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক-সংখ্যক বর্ষণ হয়। অবশিষ্ট নক্ষত্রগুলির বর্ষণসংখ্যা মধ্যম। রোহিণী, আর্দ্রা, পুনর্ব্বসু, ফল্গুনীদ্বয়, হস্তা, বিশাখা, মূলা, আষাঢ়া ও ভাদ্রপদদ্বয়—এই কএক নক্ষত্রে প্রচুরপরিমাণে বহুক্ষণস্থায়ী বৃষ্টি হয়। কৃত্তিকা, স্বাতী ও শতভিষা নক্ষত্রে সর্ব্বাপেক্ষা অল্পপরিমাণ বৃষ্টি হয় ; এবং অবশিষ্টগুলিতে মধ্যম পরিমাণ বৃষ্টি হয়।

ধারণা—জ্যৈষ্ঠমাসের পূর্ণিমার অন্তে পূর্ব্বাষাঢ়াদি নক্ষত্রে বর্ষণ না হইলে, বর্ষায় অতি অল্প বৃষ্টিপাত হয় ; অন্যথা প্রচুর বর্ষণ হইয়া, শস্যোৎপত্তির বিশেষ সহায়তা করে। আবার জ্যৈষ্ঠমাসে যে যে নক্ষত্রে বর্ষণ হইবে, বর্ষায় প্রায় সেই সেই নক্ষত্রেই বর্ষণ হইবে ; ইহা স্থিরনিশ্চয়। কখন কখন এমনও দেখা যায় যে, দুইবার উপর্য্যুপরি বর্ষণ হইয়া তৃতীয়বার শুষ্ক যায় এবং পুনরায় চতুর্থ ও পঞ্চমবারে বর্ষণ হইয়া থাকে। বস্তুতঃ, জ্যৈষ্ঠমাসের প্রবর্ষণের উপর ভবিষ্যৎ বর্ষা নির্ভর করে। এতদ্ব্যতীত, আরও কতগুলি যোগ আছে, যদ্দ্বারা ভবিষ্যৎ বর্ষা নিরূপিত হইয়া থাকে। রোহিণী, স্বাতী ও আষাঢ়ী—এই তিনটী যোগের ফলাফল প্রায় সমান ; তবে রোহিণীযোগের ফলাধিক্য সর্ব্বপ্রধান। আষাঢ়মাসের কৃষ্ণপক্ষে যখন চন্দ্র রোহিণীনক্ষত্রে প্রবেশ করে, তখন রোহিণী-যোগ হয়। ঐ দিবস প্রচুর মেঘ, পূর্ব্ব বা ঈশান বায়ু প্রবহমান, বিদ্যুৎ, বজ্রাঘাত ও মধ্যমপরিমাণ বৃষ্টি হইলে, ভবিষ্যৎ বর্ষা প্রশস্ত ; অন্যথা অল্পবৃষ্টিজ্ঞাপক। আষাঢ়মাসের শুক্লপক্ষে স্বাতীনক্ষত্রে চন্দ্রের প্রবেশ হইলে স্বাতীযোগ হয়। ঐ দিবস বর্ষণ না হইলে, ভবিষ্যৎ বর্ষায় ভালরূপ বৃষ্টি হয় না ; এবং যদি মাঘ-মাসের কৃষ্ণা-সপ্তমীতে স্বাতীনক্ষত্রযোগে হিমপাত দ্বারা বা চতুঃ ও পঞ্চ নিমিত্তক গর্ভ হয়, তবে ভবিষ্যৎ বর্ষা প্রশস্ত। আষাঢ়মাসের পূর্ণিমার অন্তে যখন চন্দ্র পূর্ব্বাষাঢ়া-নক্ষত্রে প্রবেশ করে, তখন আষাঢ়ী যোগ হয়। ঐ দিবস বর্ষণ না হইলে, ভবিষ্যৎ বর্ষা প্রশস্ত নহে।

পৌষমাসকে দ্বাদশভাগ করিলে, প্রতিভাগে ২৷৷০ দিবস হয় ; উহার যে যে ভাগে বর্ষা বা অবর্ষা হইবে, পৌষ হইতে ততসংখ্যক মাসে বর্ষা বা অবর্ষা হইবে।

যদি বর্ষারম্ভে—বৈশাখমাসে ৫।৭ দিবস পূবে-চালানে বৃষ্টি হয়, তবে সে বৎসরে ভাল বর্ষা ও শস্য উৎপন্ন হইবে। যদি মাঘ হইতে বৈশাখ পর্য্যন্ত প্রতিমাসে ৪।৫ টা বৃষ্টি হয়, ফাল্গুনমাসে ঝড়-হাওয়া বহিতে থাকে, চৈত্রমাসে নৈর্ঋত বা দক্ষিণ দিক হইতে ক্রমাগত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মেঘ চলিতে থাকে ও অকাশ সর্ব্বদা বাষ্পাবৃত ও মলিন দেখায়, বৈশাখমাসে প্রায় কালবৈশাখী হয় এবং জ্যৈষ্ঠে প্রখর রৌদ্র হয়, তবে সে বৎসর প্রচুর বৃষ্টি হইবে।

অগ্রহায়ণমাসে সূর্য্যের বৃশ্চিকরাশিতে প্রবেশকালে, যদি শুভগ্রহের দৃষ্টি থাকে, বা তাহারা স্বীয় স্বীয় কেন্দ্রে অবস্থান করে, বা কুম্ভ বা সিংহ রাশিতে বৃহস্পতি বা চন্দ্র অবস্থান করে, বা শুক্র কিম্বা বুধ সূর্য্যের দ্বিতীয় বা দ্বাদশ রাশিগত হয়, বা সূর্য্যের অগ্র-পশ্চাতে শুভগ্রহদ্বয় অবস্থান করে, তাহা হইলে ভবিষ্যবর্ষে অতি উৎকৃষ্ট গ্রীষ্মশস্য উৎপন্ন হইবে। যদি সূর্য্যের অগ্র-পশ্চাতে ক্রূর গ্রহদ্বয় অবস্থান করে, বা পাপগ্রহগণ বৃষরাশিতে বা কেন্দ্রে বা সূর্য্যের সপ্তমে অবস্থান করে, তবে ভবিষ্যবর্ষে উত্তম শস্য উৎপন্ন হইবে না। সূর্য্যের বৃষ রাশিতে প্রবেশ

কালে, গ্রহগণের উক্তরূপ সংস্থান নির্ণয় করিয়া, শরৎকালীন শস্যের শুভাশুভ নির্ণয় করিতে হইবে।

সচরাচর নানাপ্রকার মেঘ দৃষ্ট হয়। ইউরোপীয়েরা মাত্র চারিপ্রকারভেদ ব্যাখ্যা করেন ; কিন্তু গর্ভাদি নির্ণয় করিতে হইলে, উক্ত চারিপ্রকার ব্যতীত, আরও নানা প্রকার মেঘের স্বরূপজ্ঞান থাকা আবশ্যক।

রং—বর্ণশব্দের লৌকিক বা সাধারণ ভাষা। যখন কোনদিকে মেঘ সকল স্তরে স্তরে সজ্জিত হইতে থাকে, এবং নীলাঞ্জন বা ভ্রমরকৃষ্ণ সদৃশ বর্ণধারণ করে, তখন সেই অবস্থাকে 'রং' কহে। ইহা বৃষ্টির পূর্ব্বরূপ ; এবং এই রংএর গাঢ়তানুযায়ী বৃষ্টির তারতম্য ঘটিয়া থাকে।

পালি—যখন গাঢ়বর্ণ মেঘ সকল বিশাল, বিস্তীর্ণ, শান্ত উদধিজলের মত আকাশের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পরিলিপ্তপ্রায় হইয়া ঘোরতর বর্ষণ করিতে করিতে অভিমুখে অগ্রসর হয়, তখন সেই অবস্থাকে পালি কহে। ইংরাজীতে ইহা ও পূর্ব্বোক্ত রং—এই উভয়কেই "Nimbus" কহে। সাধারণতঃ, এই পালির বিস্তার প্রায় ১৫।২০ মাইল ; কিন্তু বিপুল মেঘসঞ্চার হইলে, ইহার বিস্তার কখন কখন পঞ্চাশ মাইলও দেখা গিয়াছে।

অবো—তুলার আকারবিশিষ্ট, অথচ গাঢ় মেঘগুলিকে " অবো " বলে। আকাশ যখন সমশীতোষ্ণ থাকে, তখন এইপ্রকার মেঘ সকল খণ্ড খণ্ড রূপে দেখা যায়। ইহা সদ্যোবৃষ্টির একটী পূর্ব্বরূপ ; এবং ইহার বর্দ্ধনশক্তি এত অদ্ভুত যে, অনুকূল বায়ু প্রবাহিত হইলে, অন্যান্য মেঘের সংশ্রব না থাকিলেও, ২।৩ ঘণ্টার মধ্যেই বিশাল পালির আকার ধারণ করে।

স্তরমেঘ বা আড়ং—পরস্পর সংশ্লিষ্ট অথচ শ্বেতবর্ণ বৃহৎ বৃহৎ মেঘখণ্ডকে আড়ং কহে। এইরূপ বহু-সংখ্যক মেঘরাশি পরস্পর জমিয়া যাইলে " পালি " বা " রং " আকার ধারণ করে। এই অবস্থায় বৃষ্টি না হইলে, এবং তদুপরি সূর্য্যকিরণ নিপতিত হইলে, হিমানী-বিজড়িত পর্ব্বতশিখর বলিয়া ভ্রম হয়।

চুর্ণমেঘ বা লোর—বর্ষণোন্মুখ পালি হইতে বিশ্লিষ্ট অণুপ্রমাণ মেঘরাশি, যাহা বৃষ্টির পূর্ব্বে বা ঘোর বর্ষায় আকাশ আচ্ছন্ন করতঃ প্রবাহিত হয়, তাহাকে লোর কহে। স্থূলকথা, বাতবেগবিশ্লিষ্ট ও প্রবাহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বা অণুপ্রমাণ মেঘ সকলকে লোর কহে। ইহার নানাপ্রকার ভেদ দেখা যায়।

ছিৎরি—ছত্রশব্দের অপভ্রংশ ; ইহা বৃষ্টির পূর্ব্বরূপ। ইহা অন্যান্য ঋতুতে দৃষ্ট হইলেও, বসন্ত বা গ্রীষ্মকালে যে দিবস বৃষ্টি হইবে, সে দিবস পরিষ্কার আকাশে বৈকালে প্রায়ই দেখা যায়। ইহাকে "জল ছিৎরি" কহে। ইহা লোর পূর্ব্বে উঠিয়া থাকে এবং মেঘের উচ্চস্তরেই অবস্থান করে। যে সমস্ত মেঘে বর্ষণ হইবে, তাহা হইতে সূক্ষ্ম বাষ্পকণাসমূহ নির্গত হইয়া, মৎস্যজীবীর জালের মত, অতি বিস্তৃত আকারে আকাশ আচ্ছন্ন করে ; এবং ইহা যে স্থানে দৃষ্ট হইবে, সেই স্থানেই বৃষ্টি হইবে। মেঘশূন্য ও শুষ্ক অবস্থায় আকাশে আর একপ্রকার ছিৎরি দেখা যায় ; সেগুলি অনাবৃষ্টির পূর্ব্বরূপজ্ঞাপক। ইহাদিগকে "শুকা-ছিৎরি" কহে।

কস—অবর্ধিত বিশাল মেঘখণ্ড অনুকূল কারণে কোনস্থানে স্থির থাকিয়া, ক্রমে ক্রমে স্থূল পটাবরণের মত বিস্তৃত হয় এবং আকাশমণ্ডল আবৃত করে। ইহাকে "কস" কহে। বিগলিত ধাতুনিঃস্রব বিস্তৃত হইয়া শীতসংযোগে যেরূপ অকুঞ্চিত সমতলভাব ধারণ করে, ইহাও তদ্রূপ। ইহা একটী প্রকৃষ্ট গর্ভলক্ষণ। ইহাতে শীতলবায়ু সংযোগ হইলে টিপ্‌টিপে বৃষ্টি হয়। প্রচুর বৃষ্টি হইবার পর, কখন কখন পটাবরণসদৃশ স্থিরমেঘ হইতে যে ২।৪ ঘণ্টাকাল ধরিয়া টিপ্‌টিপে বৃষ্টি হয়, তাহাও কস।

শুকা—ইংরাজীতে ইহাকে সিরাস (cirrus) কহে। আকাশের অতি উচ্চভাগে রেখা বা সূচী বা পেঁজাতূলা বা বিক্রমের আকারবিশিষ্ট অতি শুভ্রবর্ণ যে সকল সূক্ষ্মমেঘ দেখা যায়, তাহাকে "শুকা" কহে। ইহা অতি শুভ্র, অতি উচ্চস্থানস্থিত ও অল্পপরিমিত হইলে শুকা বা অবর্ষাজ্ঞাপক। ইহা আকাশে কখন কখন প্রচুর বা অল্পপরিমাণে দেখা যায় ; এবং কখন কখন ৭।৮

দিব্য পর্যন্ত প্রবাহিত হয়। ইহা যখন আকাশের নিম্নভাগ হইতে ক্রমাগত ঊর্দ্ধগামী হইতে থাকে, তখনও অবর্ষাজ্ঞাপক। এইরূপ শুকা শীতকালেই প্রচুর দেখা যায়। কিন্তু যখন উপর হইতে সহসা প্রভূতপরিমাণে নিম্নে অবতরণ এবং অপেক্ষাকৃত স্থূলভাব ধারণ করে, তখন ইহা মহাবৃষ্টির পূর্ব্বরূপ। বর্ষাকালেই এইরূপ দেখা যায়; এবং এ অবস্থায় ইহা বিক্রমের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট হয়। মহার্ণবস্থিত নাবিকগণ ইহা দেখিয়া আশুবৃষ্টিলক্ষণ অবগত হইয়া থাকে। ইহা শুষ্কতাব্যঞ্জক হইলেও, গাঢ়শীতে মধ্যপথাবলম্বী ও তুলার আকৃতি-বিশিষ্ট হইলে প্রকৃষ্ট গর্ভলক্ষণজ্ঞাপক; এবং এইরূপ গর্ভে শ্রাবণের ন্যায় ধারাবাহিক বর্ষণ হয়। ইহা কখন কখন ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে দৃশ্যমান বিশাল স্তরমেঘ হইতেও উৎপন্ন হয়। ইহাও প্রকৃষ্ট গর্ভ। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এ প্রকার গর্ভ প্রসবকালে যে সময়ে উৎপন্ন হইয়াছিল, ঠিক সেইসময়েই বর্ষিত হইয়া থাকে;—সময়ের তিলমাত্রও প্রভেদ হয় না। গর্ভসংক্রান্ত অর্দ্ধেক লক্ষণ এই শুকার অন্তর্নিবিষ্ট।

কাকডিম্ব—কাকডিম্ব যেরূপ নীলমিশ্রিত শ্বেত-বর্ণের হয়, ইহাও তদ্রূপ। অতিশয় গুমট হইলে, মেঘ সকল বাষ্পাকারে আকাশের ঊর্দ্ধস্তরে শীতসংযোগে সংলগ্ন হইয়া কাকডিম্বের মত দেখায়। যে দিবস এরূপ অবস্থা হইবে, সে দিবস নিশ্চয়ই বৃষ্টি হইবে; এরূপ বলা যাইতে পারে।

তিৎরি—তিত্তিরিশব্দের অপভ্রংশ। অনেকসময় মেঘ জমিলেও বৃষ্টি হয় না। কিন্তু যে দিবস "রং"এর উপরিভাগে তিত্তিরিপক্ষীর পাখার ন্যায় মেঘের আকার ও বর্ণ দেখা যাইবে, সে দিবস নিশ্চয় বৃষ্টি হইবে; ইহার অন্যথা হইবার নহে।

মেঘমণ্ডল—কোন উচ্চস্থানে দণ্ডায়মান হইলে, কোনও কোনও দিবস চক্রবালের চতুর্দ্দিকে অবিচ্ছিন্ন-ভাবে প্রভূত মেঘরাশি স্তরে স্তরে সজ্জিত ও মধ্যভাগ পরিষ্কার দেখা যায়, তাহাই মেঘমণ্ডল। এইরূপ মেঘের মণ্ডল অগ্রহায়ণ, ফাল্গুন, চৈত্র প্রভৃতি মাসে দেখা যায়। মেঘমণ্ডল-গর্ভ অতীব প্রশস্ত ও প্রচুরবর্ষী।

চন্দ্রশোভা—চন্দ্রের চতুষ্পার্শ্বে জলীয়বাষ্প কর্তৃক অতি বিশাল ও হৃষ্ক, কুন্দ বা মৃণালধবলবর্ণের মণ্ডল হইলে, উহাকে চন্দ্রশোভা বহে। ইহা এতদূর পরিষ্কার হয় যে, নক্ষত্রগুলি পর্য্যন্ত দেখা যায়। ইহা প্রচুরপরিমাণে আসন্ন-বৃষ্টিজ্ঞাপক।

অনেকানেক গ্রন্থে দেখা যায় যে, গ্রন্থকার যখনই আবশ্যক বুঝিয়াছেন, কোথাও পূর্ব্বাভাষ না রহিলেও, তখনই মহা ঝড় ও বৃষ্টির অবতারণা করিয়াছেন। অস্তগমনোন্মুখ রবিসন্তাপে বিরহিণীর মূর্চ্ছা যেরূপ কবিপ্রসিদ্ধি, অথচ তাহাতে যেরূপ সারবত্তা নাই; বৃষ্টিসম্বন্ধে, এই সকল গ্রন্থকারগণের বর্ণনাও সেইরূপ। বস্তুতঃ, এমন বৃষ্টি কদাচ দেখা যায় না, যাহার কোনরূপ পূর্ব্বনিমিত্ত লক্ষিত না হয়। সচরাচর বৃষ্টির ৬।৮ ঘণ্টা পূর্ব্ব হইতেই মেঘের সঞ্চার আরম্ভ হয়; কখন কখন বা ২।৩ দিবস পূর্ব্ব হইতেই আড়ম্বর হইয়া থাকে। চৈত্র বৈশাখ মাসে সচরাচর যে "কালসাঁঝির" বৃষ্টি হইয়া থাকে, ৭।৮ ঘণ্টা পূর্ব্ব হইতেই তাহার সূচনা আরম্ভ হয়। অতিশয় নিপুণব্যক্তি ব্যতীত আর কেহই, বৈশাখী মধ্যাহ্নসূর্য্যের তীক্ষ্ণকিরণ ভেদ করিয়া, মেঘের সঞ্চার নির্ণয় করিতে সমর্থ হয়েন না। গ্রীষ্মকালে যে দিবস "কালসাঁঝি" হইবে, সে দিবস বৈকালে কোন উচ্চ-মঞ্চ বা ছাদের উপরিভাগে দণ্ডায়মান হইলে দেখা যাইবে যে, চক্রবালের পশ্চিমপ্রান্তে একখান গাঢ় নীলবর্ণ স্থূলমেঘ-প্রাচীর দণ্ডায়মান রহিয়াছে। সূর্য্য তৎপশ্চাতে লুক্কায়িত হইবা মাত্রই, তাহা প্রশান্ত মহাসাগরের স্থির বারিরাশির মত ধীরে ধীরে তরঙ্গিত হইতে থাকে; এবং তাহাতে বায়ুর সংযোগ হইবা মাত্র, মদমত্ত মাতঙ্গকুলের অথবা অপ্রশান্ত ভীষণ সাগরোর্ম্মির ন্যায়, স্তরে স্তরে সজ্জিত সেই মেঘরাশি লুটাইতে লুটাইতে যুগপৎ ঝড়, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ ও বজ্রাঘাতের সহিত চরাচরজগৎ ছাইয়া ফেলে। গ্রীষ্মকালের মেঘের এইরূপ ভীষণ ক্রীড়া দেখিলে, মন স্বতঃই ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়ে। সকল কাল-সাঁঝিতেই যে এইরূপ বৃষ্টি হয়, তাহা নহে; কখন কখন মেঘ উঠিয়া, উপযুক্ত শৈত্য বা বিদ্যুতাদির অভাবে, গাঢ় কসরূপে আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া থাকে; কখনও বা প্রসরণশীল

মেঘের বিস্তার ও ভারবশতঃ বায়ুরাশি বিপর্য্যস্ত হওয়ায়, বা অস্বাভাবিক উষ্ণতাবশতঃ প্রবল ঝটিকা উৎপন্ন হইয়া, মেঘরাশি ছিন্নভিন্ন করিয়া দেয়। এই প্রকার মেঘের গতি কখন কখন এত দ্রুত হয় যে, ১০।১৫ মিনিটের মধ্যে ২০।২৫ ক্রোশ ভূভাগ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। বোধ হয় এইরূপ আকস্মিকতা দেখিয়াই, গ্রন্থকারগণ উক্তরূপ কল্পনা করিয়া থাকেন।

আকাশ যতক্ষণ পরিষ্কার রহিবে, ততক্ষণ বৃষ্টির সম্ভাবনা নাই। তৎপর, ক্রমে মেঘের সঞ্চার ও অনুরূপ শীতোষ্ণাদির অনুকূলতা জন্মিলেই বৃষ্টি হইয়া থাকে। এইজন্য বর্ষাকালে দেখা যায় যে, অতিরিক্ত বৃষ্টির পর আকাশ পরিষ্কার থাকিলে শীঘ্র বৃষ্টি হয় না। আবার শীতকালে প্রচুর মেঘের সঞ্চারসত্ত্বেও আদানজ রৌক্ষ্য ও কালস্বভাববশতঃ বৃষ্টি হয় না।

গ্রীষ্মকালে সাধারণতঃ পশ্চিম ও নৈর্ঋতকোণের মেঘেই বৃষ্টি হইয়া থাকে। কখন কখন পূবে-বৃষ্টিও দেখা যায়; এবং যে বৎসর বৈশাখমাসে পূবে-বৃষ্টি হয়, সে বৎসর প্রচুর শস্যোৎপত্তি হইয়া থাকে। বর্ষাকালে সাধারণতঃ সকল দিকের মেঘ হইতে বৃষ্টি হইলেও, পূবে-মেঘের বৃষ্টিরই আধিক্য লক্ষিত হয়; কিন্তু সকলকালেই পশ্চিমে-মেঘে বৃষ্টির পরিমাণ অত্যন্ত অধিক। পূর্ব্বদিকের ৪।৫ দিবসের অনবরত বর্ষায় যত জল না হইবে, পশ্চিমের একদিবসের ঘোর বর্ষায় তদপেক্ষা অধিক জল হইবে। বোধ হয় অনেকেরই স্মরণ থাকিতে পারে, ১৮৮৯ সালের ২৪শে বা ২৫শে আগষ্ট তারিখে দিবারাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পশ্চিমে-মেঘে এত বৃষ্টি হইয়াছিল যে, কলিকাতার অভ্যন্তরস্থ জলরাশি গঙ্গার সহিত সমসূত্রপাতে মিশিয়াছিল। গত বর্দ্ধমান-প্লাবণও এইরূপ দুই দিবসের নিরবচ্ছিন্ন বৃষ্টিপাতে ৩।৪টী জিলা উৎসন্ন করিয়াছিল। পূর্ব্বদিগের মেঘে বর্ষা যেরূপ স্থায়ী হয়, অন্যদিকের মেঘে সেরূপ স্থায়ী হয় না। বায়ু, ঈশান, অগ্নি ও দক্ষিণ দিকাগত মেঘ হইতেও প্রচুর বৃষ্টি হইয়া থাকে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে অগ্নিকোণের বর্ষা অপেক্ষাকৃত স্থায়ী। ফলকথা, যে সকল মেঘ বহুদিন বা বহুক্ষণ ধরিয়া আতপতাপিত, যাহা স্তরে স্তরে সজ্জিত, যাহা নীলাঞ্জন বা ভ্রমরকৃষ্ণ বর্ণ, যাহা বিমল রজতসঙ্কাশ ও সূক্ষ্মবারিকণাবর্ষী, যাহা সমুদ্রবিক্ষিপ্ত ফেনরাশির ন্যায় সর্ব্বদা প্রবর্দ্ধনশীল, যাহার সূর্য্যকিরণোজ্জ্বল প্রত্যন্তগুলি সুশোভিত মুক্তাকলাপের ন্যায় শোভমান, যাহা পীতবর্ণ, যাহা বিদ্রুমবর্ণ, যে পালি সমুদ্রের ন্যায় বিশাল-বিস্তীর্ণ, ঘন হইতে ঘনতর ও নিবিড় নীলিমাচ্ছন্ন, সেই সকল মেঘ হইতেই প্রচুর বৃষ্টি হইয়া থাকে। বায়ু, ঈশান, অগ্নি, দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকের অল্পস্থায়ী বর্ষায় উক্তরূপ মেঘ লক্ষিত হয়; কিন্তু বর্ষা এক বা দেড়দিনের অধিক স্থায়ী হয় না। আষাঢ়মাসে মাঝে মাঝে দক্ষিণদিক হইতে বিপুল মেঘ আসিয়া বর্ষা উপস্থিত করে; কিন্তু তাহা ৭।৮ ঘণ্টার অধিক স্থায়ী হয় না; এবং স্তর-মেঘ বলিয়া বৃষ্টির পরিমাণও অধিক হয়।

দক্ষিণের বর্ষা পূর্ব্বাহ্নেই হয়, অপরাহ্নে হয় না। কিন্তু কখন কখন রাত্রে বৃষ্টি হয়। আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে বাতপ্রবাহে ছিন্নভিন্ন পূবে-মেঘরাশি অসংহত চূর্ণ (লোর) রাশিতে পরিণত হইয়া, অনবরত ঝিরঝিরে বৃষ্টি করে; এবং বর্ষাও মাঝে মাঝে একাদিক্রমে ৩।৪ দিবস হইতে ৭।৮ দিবস পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়া থাকে। এইরূপ পূবে-মেঘ না হইলে বর্ষাও হয় না, এবং শস্যের পক্ষেও উপকার হয় না। পূর্ব্ব-দিকের চূর্ণমেঘে ঝিরঝিরে বৃষ্টি হইলেও, কখন কখন আকাশ পরিষ্কার ও দিবস উত্তপ্ত হইলে, উহাতে স্তরমেঘ জমিয়া প্রচুর বারিপাত হয়। বর্ষায় পূর্ব্বদিকে যতদিন সূক্ষ্মমেঘপটাবরণ অর্থাৎ পাতলা রেখা-কস দেখা যাইবে, বৃষ্টিও ততদিন স্থায়ী হইবে। কেহ কেহ বলেন যে, ঘোর বর্ষায় পূর্ব্বদিকে যখন বজ্রনাদ শ্রুত হইবে, তখনই বৃষ্টির বিরাম হইবার সম্ভাবনা। সাধারণতঃ, পূবে-মেঘে মধ্যাহ্ন ৮টা হইতে অপরাহ্ন ৩টার মধ্যেই বৃষ্টি হইয়া থাকে। ইহাতে রাত্রে কদাচ বৃষ্টি দেখা যায়; এবং যে দিবস সূর্য্যের তেজ প্রখর ও আকাশ পরিষ্কার থাকে, সে দিবস ৩।৪ বারও বৃষ্টি হইতে পারে। অন্যথা, একবার বৃষ্টি হইয়া আকাশ "কসে" অর্থাৎ মেঘপটাবরণে আচ্ছন্ন হইয়া যায়। ভাদ্র আশ্বিন মাসে, সূর্য্যের প্রাখর্য্যের সহিত, ঈশানকোণ হইতে বড় বড় জমাট মেঘ আসিয়া প্রচুর বৃষ্টি করে। সাধারণতঃ

ঈশানকোণের মেঘে প্রাতঃকাল হইতে অপরাহ্ণ ৫টা পর্য্যন্ত দিনের মধ্যে একবার হইতে ৩।৪ বার বৃষ্টি হইয়া থাকে ; এবং এরূপ বৃষ্টি ২।৩ দিবসের উর্দ্ধ স্থায়ী হয় না। সমগ্র বর্ষাকালে বায়ুকোণ হইতে ২।৩ বার বৃষ্টি হয় ; এবং বৃষ্টির পরিমাণও মধ্যমরূপ। সচরাচর, মধ্যাহ্ন হইতে রাত্র দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত, এই দিকের মেঘে থাকিয়া থাকিয়া বর্ষণ হয়। আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্র—এই তিনমাসে মধ্যে মধ্যে দুই তিন দিন ধরিয়া অগ্নিকোণের বর্ষা হয়। উহা কখন কখন ৪। ৫ দিবস স্থায়ী হয়। এই দিকের মেঘে কখনও বা পূর্ব্বের ন্যায় ঝিরঝিরে, কখনও বা ঈশানের ন্যায় ক্ষণিক-প্রবল, কখনও বা পশ্চিমের ন্যায় প্রবলধারায় বর্ষণ হয় ; অর্থাৎ যখন যেপ্রকার মেঘের চালান থাকে, সেইরূপই বৃষ্টি হয়। এ দিকের বৃষ্টির সময়ের স্থিরতা নাই—সর্ব্বক্ষণই হইয়া থাকে ; তবে দিবাভাগেই অধিকতর বর্ষে। আমাদের দেশের অধিকাংশ ঝটিকা এইদিক হইতেই উৎপন্ন হয়। আষাঢ় ও ভাদ্র মাসে পশ্চিম-মেঘের ২।৪ টা বর্ষণ দেখা যায়। ২।১ বৎসর অন্ন বৃষ্টি হইলে বা বর্ষায় অল্প বৃষ্টি হইলে, মাঝে মাঝে শত শত যোজনপরিমিত বিশাল ভূমিখণ্ডের মেঘরাশি ঘনীভূত স্তরাকার ধারণ করতঃ অনুকূল বায়ু ও শীতেরসংযোগে মুষলধারে অবিশ্রান্ত বর্ষণ করিয়া থাকে। দুই দিন ধরিয়া কদাচ এইপ্রকার বৃষ্টি স্থায়ী হয়। কারণ, এইরূপ বৃষ্টি অধিকদিন স্থায়ী হইলে, প্রবলবন্যায় গ্রাম-নগরাদি উৎসন্ন যাইবার সম্ভাবনা। গত ৪।৫ বৎসরের মধ্যে, এই জাতীয় মেঘ হইতেই হয়দরাবাদ ও দামোদরের বন্যা হইয়াছিল। এইরূপ বৃষ্টি কোন কোন বৎসর ২।৩ বার হয় ; আবার কোন কোন বৎসর মোটেই হয় না। কখন কখন বর্ষায় অত্যন্ত গুমট হইলে চতুর্দ্দিকস্থ মেঘরাশি অনুকূল স্থানবিশেষে একত্রিত হইয়া, উক্তরূপ প্রচুর বর্ষণ করিয়া থাকে। কিন্তু তাহা ২।১ ঘণ্টার জন্য। কার্ত্তিক মাসে সাধারণতঃ শরৎকালের ন্যায় বৃষ্টি হয়। কখন কখন অগ্নিকোণ হইতে মেঘ আসিয়া বর্ষা বা প্রবল ঝটিকা উৎপন্ন করে। শীতকালে কখন কখন বৃষ্টি দেখা যায় ; কিন্তু অত্যন্ত উত্তাপ না বাড়িলে সেরূপ হয় না।

গ্রীষ্মকালে বায়ুকোণের বাতাসেই প্রায় বৃষ্টি হয় ; এবং মেঘ জমিবার পক্ষে বিশেষ সহায়তা করে। বর্ষাকালে ২।৪ দিবস এ বায়ু বহে ; কিন্তু শীতের প্রথম ও শেষভাগে, এই বাতাসের প্রাধান্য লক্ষিত হয়। পরে যত গভীর শীত পড়িতে আরম্ভ করে, ততই প্রবল উত্তরে-বায়ু বহিতে থাকে। দক্ষিণা-বায়ুতে মেঘের সঞ্চার হইলেও বর্ষণ হয় না। নৈর্ঋতবায়ুও ঐ প্রকার। তবে কখন কখন দশ, পনর দিবস শুষ্ক যাইতে যাইতে একদিন হয়ত বৃষ্টি হইল। কিন্তু বর্ষার প্রথমে, এই বায়ু প্রবাহিত হইলে দেশব্যাপী অপর্য্যাপ্ত মেঘোৎপত্তির পক্ষে বিশেষ সহায়তা করে। এই বায়ু সাধারণতঃ জ্যৈষ্ঠ-মাসের শেষ পর্য্যন্ত ও ভাদ্রমাসের কএকদিবস প্রবাহিত হইতে দেখা যায়। বর্ষার প্রথমে দশহরা, অম্বুবাচী প্রভৃতিতে পশ্চিমাবায়ু প্রবাহিত হইতে থাকিলে, নৈর্ঋত-জাত মেঘ সকল আর দক্ষিণ বা পূর্ব্বে যাইতে সক্ষম হয় না ; সুতরাং এ সময়ে প্রায়ই পশ্চিমা-বায়ুতে বৃষ্টি হয়। বর্ষার কএকমাসই পূর্ব্বদিকের বায়ু প্রবাহিত হয় ; এবং অধিকাংশসময় প্রবলরূপে প্রবাহিত হওয়ায়, শিথিলিত চূর্ণমেঘ হইতে সূক্ষ্মধারায় বর্ষণ হয়। কখন কখন উষ্ণতা পাইলে জমাট-মেঘেও বৃষ্টি হইয়া থাকে। সাধারণতঃ এই বায়ু দুইভাগে বিভক্ত হইয়া, স্বাভাবিক নিয়মে ও অনুকূল কারণবশে, কখনও বা ঈশান, কখন বা অগ্নিকোণ হইতে প্রবাহিত হয়। নৈর্ঋত বা দক্ষিণা বায়ু যেমন বৃষ্টির উপঘাতক, ঐশানবায়ু তদ্রূপ বৃষ্টির প্রবর্ত্তক। শীতকালে অনেকসময় ঐশানবায়ু প্রবাহিত হয় ; এবং জলজনকতাহেতু, ইহা দ্বারা অতিশয় গর্ভপুষ্টি হইয়া থাকে।

যদি সূর্য্যের উদয় ও অস্তকালে আকাশের বর্ণ, শীতকালে তাম্রবর্ণ, বসন্তকালে পীতমিশ্রিত রক্তবর্ণ, গ্রীষ্মকালে সুবর্ণবর্ণ, বর্ষাকালে উজ্জ্বল শুক্লবর্ণ, শরৎ-কালে পদ্মগর্ভের ন্যায় এবং হেমন্তকালে রক্তবর্ণ হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যৎ বৃষ্টি ও শস্যোৎপত্তির পক্ষে বিশেষ শুভ হয়।

সাধারণতঃ, আমাদের দেশে প্রবাদ আছে যে, "উন বর্ষায় দুন শীত।" আবার এই শীতাধিক্যই প্রচুর বর্ষার পরিচায়ক। ইহা বাস্তব হইলেও, কিছু বিশেষত্ব আছে।

যে বৎসর বর্ষায় অল্পবৃষ্টি হয়, সে বৎসর যথাকালে প্রচুর শীত হয় ; সুতরাং ভবিষ্যবর্ষের বর্ষাও প্রশস্ত। বর্ষার প্রথমভাগে বৃষ্টি অধিক হইলে, শেষভাগে ভাল বর্ষণ হয় না ; পক্ষান্তরে, প্রথমভাগে বৃষ্টি অল্প হইলে, শেষভাগে প্রচুর বর্ষা হয়। আবার যে বৎসর প্রথমে শীত পড়ে, সে বৎসরের শেষভাগে অল্প শীত হয়। সুতরাং বর্ষার প্রথমভাগে বর্ষণও অধিক হয়। সেইরূপ শেষভাগে শীতাধিক্য হইলে, বর্ষার শেষে প্রচুর বর্ষা হয়।

বৃষ্টিসম্বন্ধে স্থূলভাবে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা ব্যতীত আরও কতকগুলি লক্ষণ আছে, যদ্দ্বারা সদ্যোবৃষ্টি স্থিরনিশ্চয় করিতে পারা যায়। যথা :—

১। শীতঋতুর অন্তঃসন্ধিসময়ে আকাশে প্রচুর মেঘ-সঞ্চার ও অল্প অল্প উষ্ণতা অনুভব হয়। যদি এই পরিবর্ত্তন ধীরে ধীরে না হইয়া সহসা হয়, তবে সেই দিবস বা তৎপর দিবস অপরাহ্ণে বৃষ্টি হইবে।

২। যদি পশ্চিম ও বায়ু কোণে প্রচুর মেঘ বিদ্যমান থাকে, উত্তরদিক হইতে শীতল ও মন্দ মন্দ বায়ু প্রবাহিত হয়, এবং আকাশ পরিষ্কার থাকে, তবে সে দিবস নিশ্চয়ই বৃষ্টি হইবে।

৩। আকাশে প্রচুর পরিমাণে মেঘ ও অন্যান্য অনুকূল কারণ বর্ত্তমান থাকিলেও, যদি ৩।৪ দিবস বৃষ্টি না হয়, তবে যে দিবস মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত প্রচুর পরিমাণে মেঘ চলিয়া, হঠাৎ তাহার পর বন্ধ হইয়া যাইবে ও সেই সঙ্গে সঙ্গে আকাশ নির্ম্মল হইবে, সেই দিবস নিশ্চয় বৃষ্টি হইবে।

৪। গ্রীষ্ম বা বর্ষাকালে আকাশে যে দিবস অনেকক্ষণ কাকচিমে-রং দৃষ্ট ও অত্যন্ত গুমট বোধ হইবে, সেই দিবস নিশ্চয় বৃষ্টি হইবে।

৫। গ্রীষ্মকালের উভয়সন্ধ্যা ঘোরতর রক্তবর্ণরাগে রঞ্জিত হইলে, তাহা অবর্ষাজ্ঞাপক।

৬। যদি নির্ম্মল আকাশের মধ্য দিয়া ক্রমাগত ২।৩ ঘণ্টা ধরিয়া শ্বেতবর্ণ বহুল বাষ্পরাশি প্রবাহিত হয় ও তজ্জন্য আকাশ কাকচিমেসদৃশবর্ণের হয়, তবে সে দিবস নিশ্চয় বায়ুকোণ হইতে মহা বৃষ্টি হইবে।

৭। যে দিবস প্রশিথিল চূর্ণ-মেঘরাশি আকাশের অতি নিম্নভাগ দিয়া প্রবাহিত হইবে, সে দিবস নিশ্চয় বৃষ্টি হইবে।

৮। মেঘের অগ্রভাগে তিত্তিরপক্ষীর পক্ষসদৃশ বর্ণের মেঘ দৃষ্ট হইলে, অচিরাৎ বৃষ্টি হইবে।

৯। যে দিবস আকাশ বিমল বাষ্পপরিপূর্ণ ও প্রচুর মেঘযুক্ত এবং সূর্য্যকিরণ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও শরীর হইতে অত্যন্ত ঘর্ম্ম নির্গত হইবে, সেই দিবস নিশ্চয় বৃষ্টি হইবে।

১০। দিবাভাগ ঈষৎ উষ্ণ, সূর্য্য পরিষ্কার ও তীক্ষ্ণ কিরণবিশিষ্ট এবং ঈশানকোণ হইতে মৃদু মন্দ বায়ু প্রবাহিত হইলে, সে দিবস নিশ্চয় বৃষ্টি হইবে।

১১। বর্ষাকালে যে দিবস উত্তর ও বায়ু কোণ হইতে প্রচুর মেঘ চলিতে থাকিবে, সে দিবস মধ্যাহ্নের পর বৃষ্টি হইবে।

১২। বর্ষা বা শীতকালে সমস্তরাত্র আকাশের চারিদিকে বিদ্যুৎ চমকাইলে, পর দিবস নিশ্চয় বৃষ্টি হইবে।

১৩। যে দিবস আকাশের আভা শিরিষকুসুমসদৃশ বর্ণের হইবে, সে দিবস অচিরেই প্রবল বৃষ্টি হইবে।

১৪। যখন আকাশের অতি নিম্নভাগ দিয়া স্থূলপ্রবাহ চূর্ণমেঘ (গোর) রাশি ক্রমাগত চলিতে থাকিবে ও তজ্জন্য দিক সকল অন্ধকারের ন্যায় বোধ হইবে, তখন মহাঝটিকা আসন্ন বুঝিতে হইবে।

১৫। বর্ষাকালে প্রাতে সূর্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, যদি রামধনুছটার ন্যায় কিরণজাল বহির্গত হয়, তবে সে দিবস বৃষ্টি হইবে।

১৬। যখন পক্ষীকুল বৃক্ষশাখায় বসিয়া মুখাগ্রভাগ দ্বারা পক্ষপুট লালাযুক্ত করিতে থাকিবে, তখন মহাঝটিকা ও প্রবল বৃষ্টির আশঙ্কা আছে বুঝিতে হইবে।

১৭। বর্ষাকালে পিপীলিকাগণ ডিম্ব লইয়া উর্দ্ধগামী হইলেই, সে দিবস নিশ্চয় বৃষ্টি হইবে।

১৮। আর্দ্রানক্ষত্রে সূর্য্যের অবস্থানকালে স্বভাবতঃই প্রচুর বৃষ্টি হইয়া থাকে।

১৯। যদি লতাবৃক্ষের পত্রসমূহ আকাশের দিকে উন্মুখী হয়, যদি পক্ষিগণ অল্পজলে বা ধূলিতে স্নান করে, এবং সর্পগণ তৃণোপরি শয়ন করে, তবে অচিরে বৃষ্টি হইবে।

সুধীবর্গের বিরক্তির ভয়ে, অতি স্থূলভাবে, মেঘ ও বৃষ্টি বিচারসম্বন্ধীয় এই প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে। বস্তুতঃ, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিখিতে হইলে, এইরূপ ৩।৪ টা প্রবন্ধও হইতে পারে। ইহা "বৃহৎ সংহিতা"র উক্ত জলগণনাসম্বন্ধীয় মূল শ্লোকগুলির বিস্তৃত ভাষাটীকা মাত্র।

শ্রীহেমচন্দ্র দেব।

আর্য্যশাস্ত্রে কৃষিতত্ত্ব।

[শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের লিখিত।]

প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়।

[ভারতবর্ষে কৃষিনীতির প্রচলনকাল—শাস্ত্রে কৃষির প্রশংসা—হলকর্ষণে গবাদির সংখ্যা— বীজবপন— বীজ রোপণ—বপন ও রোপণের দিন নির্ণয়—রোপণাদির ব্যবধান-বিধান—মদিকাদান— বীজবপন-মন্ত্র — বীজরোপণ-মন্ত্র — নিস্তৃণীকরণ—বপন ও রোপণ মন্ত্র—বৃক্ষে জলসেচন— বৃক্ষরক্ষার উপায়বিধান — বৃক্ষের পোষণ — নানাবিধ সারপ্রস্তুতপ্রণালী—কুণপ জল—উপসংহার।]

কৃষিজাতদ্রব্যই ভারতবাসীর মুখ্যখাদ্য। এই কৃষিজাত ফলমূলশস্যাদি ব্যতীত আর্য্যজাতির জীবনধারণ করা অসম্ভব। বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই ভারতবর্ষে কৃষিনীতি প্রচলিত রহিয়াছে। বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবতাদি পাঠে জানা যায়, বেণের পুত্র পৃথুরাজ বাণ দ্বারা পৃথিবী সমতল করিয়া, উহা দোহন করিয়াছিলেন। এই দোহনব্যাপার কৃষিকার্য্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইহাতে অনুমিত হয়, সৃষ্টির প্রথমেই ভারতে কৃষিকার্য্যের প্রচলন হইয়াছিল। এই কৃষিবিষয়ে আর্য্যঋষিগণ অনভিজ্ঞ ছিলেন না। তাঁহারা যেমন ধর্ম্মশাস্ত্র ও ব্যবহারশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন, তেমনি কৃষিশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াও বৈশ্যদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহারা জানিতেন, ধর্ম্মসাধন করাই মানবের প্রধানকার্য্য। এই ধর্ম্মসাধনের প্রধান উপাদান শরীর; সুতরাং, শরীরকে রক্ষা করিতে না পারিলে ধর্ম্মসাধনে ব্যাঘাত হয়। তাই, "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"—এই মহাবাক্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। মহর্ষি পরাশর বলেন :—

"কণ্ঠে হস্তে চ কর্ণে চ সুবর্ণং যদি বিদ্যতে।
উপবাসস্তথাপি স্যাদন্নাভাবেন দেহিনাম্॥
অন্নং প্রাণা বলঞ্চান্নংমন্নং সর্ব্বার্থসাধকম্।
দেবাসুরমনুষ্যাশ্চ সর্ব্বে চান্নোপজীবিনঃ॥"

অর্থাৎ কণ্ঠে, হস্তে এবং কর্ণে সুবর্ণালঙ্কার বিদ্যমান রহিলেও, অন্নাভাবে দেহিদিগকে উপবাস করিতে হয়। দেবতা, অসুর ও মনুষ্য—এই সকলেই অন্নোপজীবী। ইঁহাদিগের পক্ষে, অন্নই প্রাণ, অন্নই বল এবং অন্নই সর্ব্বার্থসাধক। আমরা ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্য; কৃষককে আদর করা আমাদের অভ্যাস নাই। বরং, কেহ অনভিজ্ঞের ন্যায় একটা কাজ করিলে, আমরা তাহাকে চাষা (কৃষক) বলিয়া গালি দিয়া থাকি। কিন্তু সেকালের অসভ্য ঋষিগণ কৃষকদিগকে আদরের চক্ষে দেখিতেন; এবং সেই কৃষককুলকে উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক স্বদেশের মঙ্গলসাধন করিয়াছিলেন।

"সুবর্ণরৌপ্যমাণিক্য-বসনৈরপি পূরিতাঃ।
তথাপি প্রার্থয়ন্ত্যেব কৃষকান্ ভক্ততৃষ্ণয়া॥"

গৃহিদিগের গৃহ সোণা, রূপা, মাণিক্য ও বস্ত্রাদি দ্বারা পরিপূর্ণ থাকিলেও, তাঁহারা অন্নের জন্য কৃষকদিগের নিকট প্রার্থনা করেন। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, একালের কৃষকদিগকে যেরূপ আমরা ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকি, সেকালে সেরূপ ছিল না। প্রত্যুত, সকলেই তাহাদিগকে আদর করিতেন। ইহার পর অন্নপ্রাপ্তির উপায় বলিতেছেন—

"অন্নস্তু ধান্যসম্ভূতং ধান্যং কৃষ্যা বিনা নচ।
তস্মাৎ সর্ব্বং পরিত্যজ্য কৃষিং যত্নেন কারয়েৎ॥"

ধান্য হইতে অন্ন উদ্ভূত হয়; ধান্যও আবার কৃষিকার্য্য ব্যতীত উৎপন্ন হয় না। সুতরাং, অন্নার্থিগণ সকল পরিত্যাগ করিয়া যত্নের সহিত কৃষিকার্য্য করিবে।

এখন যাঁহারা কৃষিকার্য্য করেন, তাঁহাদিগকে আমরা কৃষক বা চাষা বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকি বটে, কিন্তু সেকালে তাহা ছিল না। সেকালে ছিল—

"কৃষির্ধন্যা কৃষির্ম্মেধ্যা জন্তূনাং জীবনং কৃষিঃ।"

কৃষির্ধন্যা অর্থাৎ প্রশংসনীয়া, কৃষির্ম্মেধ্যা অর্থাৎ পবিত্র এবং কৃষিই জীবসমূহের জীবনস্বরূপ। এই কৃষিকার্য্যে স্বয়ং তত্ত্বাবধান করিলে স্বর্ণ (উত্তম ফল) এবং তাহা না করিলে দৈন্যলাভ হইয়া থাকে। অন্য ঋষিরাও বলেন :—

"পিতুরন্তঃপুরং দদ্যান্মাতুর্দদ্যান্মহানসম্।
গোষু চাত্মসমং দদ্যাৎ স্বয়মেব কৃষিং ব্রজেৎ॥"

অন্তঃপুরের তত্ত্বাবধানভার পিতৃতুল্য ব্যক্তিকে, রন্ধনশালার ভার মাতৃতুল্যব্যক্তিকে এবং আত্মসমব্যক্তিকে গোশালার ভার দিয়া, স্বয়ং কৃষিক্ষেত্রে গমন করিবে। তদ্ভিন্ন, কৃষকসমাজে যে কতকগুলি কৃষি-প্রবচন প্রচলিত আছে, তাহা আলোচনা করিলেও জানা যায় যে, কৃষিকার্য্য স্বয়ং পরিদর্শন না করিলে ফললাভে বঞ্চিত হইতে হয়। যথা—

"নিজে চাষা উত্তম ক্ষেতী।
তা'র অর্দ্ধেক কাঁধে ছাতি॥
ঘরে ব'সে পুছে বাত,
চিরদিন তার হাভাত॥"

যাহা হউক, এই কৃষিকার্য্যের উপাদান বাহক (গবাদি) এবং লাঙ্গল। আমাদের দেশে গরু ও মহিষ দ্বারা কৃষিকার্য্য সম্পন্ন হয়। অন্যান্য দেশে ঘোটকের ব্যবহার-প্রথাও আছে। কিন্তু তাহা ভারতবর্ষের উপযোগী নহে। মহিষ দ্বারা পূর্ব্বকালে কৃষিকার্য্য হইত কিনা, সে বিষয়েও বিশেষ সন্দেহ আছে। কেননা, বাহনস্থলে কেবল গরুরই উল্লেখ দেখা যায়। তবে বর্ত্তমানকালে মহিষের কৃষিও বিরল-প্রচার নহে। প্রাচীন ঋষিদিগের উপদেশ যে, সেইরূপ কৃষিকার্য্য করিবে, যাহাতে বাহনদিগের কোনরূপ পীড়া না হয়।

বাহনকে পীড়া দিয়া যে শস্য উৎপন্ন হয়, তাহা দ্বারা কোন দৈবকার্য্যাদি সাধিত হয় না। যথা :—

"বাহপীড়ার্জ্জিতং শস্যং ফলিতঞ্চ চতুর্গুণং।
বাহনিশ্বাসবিফলঃ কৃষকো নিস্বতাং ব্রজেৎ॥"

বাহনদিগের পীড়া দ্বারা উৎপন্ন চতুর্গুণ শস্যও বাহন-পশুর নিশ্বাসে বিফল হয়; সুতরাং কৃষক নিঃস্ব হইয়া পড়ে। এই বাহনদিগের প্রতি কৃষকগণ কিরূপ ব্যবহার করিবেন, এবং তাহাদিগকে কিরূপে পালন করিতে হয়, তাহাও কৃষিশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে।

"গুণ্ডকৈর্যবসৈর্ধূমৈস্তথান্যৈরপি পোষণৈঃ।
বাহাঃ ক্বচিন্ন সীদন্তি স্বায়ং প্রাতশ্চ চারণাৎ॥"

গুণ্ডক অর্থাৎ খইল, ভূষী প্রভৃতি গুঁড়াদ্রব্য, ঘাস, অন্যান্য পোষণোপযোগী খাদ্য ও ধূমপ্রদান করিলে এবং প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে গরুদিগকে বিচরণ করাইলে, তাহারা অবসন্ন হয় না। ধূমসেবন অর্থে, সন্ধ্যাকালে গোশালায় মশকনিবারণের জন্য ধোঁয়া দেওয়া বুঝিতে হইবে। বাহনকে পীড়া দেওয়া নিষিদ্ধ; ইহাই শাস্ত্রের বিধি। সেই পীড়া কাহাকে বলে, তাহাও তাঁহারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বর্ত্তমানকালে কৃষকগণ নিতান্ত দরিদ্র বলিয়া, কোনরূপে দুইটী গরু সংগ্রহ করিতে পারিলেই, তাহারা একখানি লাঙ্গল চালাইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, কেহ কেহ একটী গরুতেও একখানি লাঙ্গল কৌশলে চালাইবার চেষ্টা করেন। কখন কখন এক-গ্রামের দুইজন কৃষক প্রত্যেকে এক একটী করিয়া দুইটী গরু সংগ্রহ করিয়া, সেই দুইটী গরু দ্বারা উভয়ের ক্ষেত্রই কর্ষণ করে। ইহা অপেক্ষা নৃশংস ব্যবহার আর কি হইতে পারে? এ সম্বন্ধে ঋষিগণের ব্যবস্থা দেখুন—

"হলমষ্টগবং ধর্ম্ম্যং ষড়গবং ব্যবসায়িনাম্।
চতুর্গবং নৃশংসানাং দ্বিগবঞ্চ গবাশিনাম্॥"

আটটি গরু দ্বারা হলচালন করাই ধর্ম্ম। তবে যাহারা ব্যবসায়ী, তাহারা ছয়টি গরু দ্বারা একখানি লাঙ্গল চালাইবে। আর যাহারা চারিটি গরুতে একখানি লাঙ্গল চালায়, তাহারা নৃশংস। কিন্তু যাহারা গবাশন অর্থাৎ গোখাদক তাহারাই দুইটি গরু দ্বারা একখানি লাঙ্গল চালাইয়া থাকে। কি ভয়ানক কথা! চারিটি গরুতে একখানি লাঙ্গল চালানও নৃশংসের কার্য্য। তবে আর দরিদ্র ভারতের উপায় কি? আমরা অনুমান করি যে, চাষী বলদের দীর্ঘনিঃশ্বাসেই বহু

শস্তশালিনী ভারতভূমির শস্যাদি অন্তর্হিত হইতেছে; এবং তজ্জন্যই বুঝি বারংবার দুর্ভিক্ষপীড়িত ভারতবাসী ক্রমশঃ অধঃপাতে যাইতেছে। গাভীগণ দুগ্ধ দ্বারা এবং বলীবর্দ্দগণ শস্যাদি দ্বারা মানবগণকে প্রতিপালন করেন; এ নিমিত্ত গাভী মাতৃস্থানীয়া ও বলীবর্দ্দ পিতৃস্থানীয় বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। আমরা মাতৃপিতৃদ্বয়কে যত্ন করিতে ভুলিয়া গিয়াছি বলিয়াই, আমাদের অসীম দুর্গতি ঘটিয়াছে। মহর্ষি পরাশর গোপালনসম্বন্ধে কতকগুলি বিধি প্রণয়ন করিয়াছেন; তাহা সকলেরই প্রতিপালন করা উচিত। বীজবপনসম্বন্ধে মহামুনি-পরাশর বলেন—

"বৈশাখে বপনং শ্রেষ্ঠং জ্যৈষ্ঠে তু মধ্যমং স্মৃতম্।
আষাঢ়ে চাধমং প্রাহুঃ শ্রাবণে চাধমাধমম্॥"

বৈশাখে বীজবপন শ্রেষ্ঠ, জ্যৈষ্ঠে মধ্যম, আষাঢ়ে অধম এবং শ্রাবণে অধমাধম বলিয়া কথিত হয়। খনা বলিয়াছেন:—"বৈশাখী বুনা ফলে দুনা।"

"বৃষান্তে মিথুনাদৌ চ ত্রীণ্যহানি রজস্বলা।
বীজং ন বাপয়েৎ তত্র জনঃ পাপাদ্বিনশ্যতি॥"

বৃষের (জ্যৈষ্ঠের) অন্ত ও মিথুনের (আষাঢ়ের) আদিতে তিনদিবস পৃথিবী রজস্বলা হয়েন। এই সময় বীজ বপন করিবে না। কারণ, তদবস্থায় উপ্ত বীজ অফলপ্রদ বা বিনাশপ্রাপ্তহয়।

রোপণবিধি—

"রোপণার্থন্তু বীজানাং শুচৌ বপনমুত্তমম্।
শ্রাবণে চাধমং প্রোক্তং ভাদ্রে চৈবাধমাধমম্॥"

রোপণার্থ আষাঢ়মাসে বীজবপন উত্তম, শ্রাবণমাসে অধম এবং ভাদ্রে অধমেরও অধম বলিয়া উক্ত হয়।

"বৈশাখী বাওয়া, জ্যৈষ্ঠের জাওয়া।
আষাঢ়ে রোওয়া, শ্রাবণে গাওয়া॥" (খনা)

বৈশাখমাসে বীজবপনের পর গাছ বাহির হইয়া যাওয়াকে বাওলা বা বাওয়া, জ্যৈষ্ঠমাসে রোপণার্থ যে বীজ বপন করা হয়, তাহার গাছ বাহির হওয়াকে জাওলা বা জাওয়া, আষাঢ়মাসের রোপণকে রোওয়া এবং শ্রাবণ মাসের গাছকে গাওয়া বলে। যদি এইরূপ হয়, তাহা হইলেই চাষ ভাল হয়। সময়ে সবই ভাল। আর অসময়ের কৃষি কষ্টসাধ্য এবং তাদৃশ ফলদায়কও নহে।

বপন ও রোপণের দিন নির্ণয়।

"বপনে রোপণে চৈব বারযুগ্ম বিবর্জ্জয়েৎ।
মূষিকাণাং ভয়ং ভৌমে মন্দে শলভকীটয়োঃ॥
ন বাপয়েৎ তিথৌ রিক্তে ক্ষীণে সোমে বিশেষতঃ।
এবং সম্যক্ প্রযুঞ্জানঃ শস্যবৃদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ॥"

বপনে এবং রোপণে শনি ও মঙ্গলবার ত্যাগ করিবে। মঙ্গলবারে মূষিকের এবং শনিবারে শলভ (পতঙ্গ) ও কীটাদির ভয় হয়। আর রিক্তা তিথিতে, বিশেষতঃ সোম মঙ্গলবার হইলে, কদাচ বপন করিবে না। এইরূপ হইলে নিশ্চয়ই শস্যবৃদ্ধি হয়। খরবারে বা খরতিথিতে বপন ও রোপণ করিলে, সেই বার বা তিথির যে গুণ তাহা ঐ বীজের সহিত মৃত্তিকায় নিহিত হইয়া থাকে; এবং যথাকালে গাছ যদি ভাল হয়, তাহা হইলেও ঐ গুণ গাছে সঞ্চার হইয়া শলভ ও কীটাদি আগমেরই উপযোগী হয়। চতুর্থী, নবমী, চতুর্দ্দশী ও অমাবস্যা—এই সকল খরতিথি; সুতরাং ইহাতে বীজবপন বা রোপণের কার্য্য করিবে না।

রোপণাদির ব্যবধান-বিধান।

"বপনং রোপণঞ্চৈব বীজং স্যাদ্বভয়াত্মকং।
বপনং গদনির্ম্মুক্তং রোপণং সগদং বিদুঃ।
ন বৃক্ষরূপধান্যানাং বীজাকর্ষণমাচরেৎ।
ন ফলন্তি দৃঢ়া বীজা বৃক্ষাঃ কেদারসংস্থিতাঃ॥
হস্তান্তরং কর্কটে চ সিংহে হস্তার্দ্ধমেব চ।
রোপণং সর্ব্বধান্যানাং কন্যায়াং চতুরঙ্গুলং॥"

বপন এবং রোপণ—এই উভয়প্রকারেই বীজের চারা তুলিলে পারা যায়। বীজবপন করিতে হইলে, জমি কর্ষিত ও মৃত্তিকা চূর্ণীকৃত এবং আগাছাদি বর্জ্জিত হওয়া আবশ্যক। আর রোপণের জমি জল এবং কাদাযুক্ত হওয়া চাই। যে ধান্যগাছ শক্ত হইয়াছে, এরূপ গাছের বীজ লইবে না। এই গাছের বীজ ও বীজক্ষেত্রের আইল-পার্শ্বস্থ গাছের বীজে ফল ভাল হয় না। শ্রাবণে একহস্ত,

ভাদ্রে অর্দ্ধহস্ত এবং আশ্বিনে চারি অঙ্গুলী ব্যবধানে বীজবপন করাই রীতি।

"কোল পাতলা ঘন গুছি।
লক্ষ্মী বলেন ঐ থানে আছি।" (খনা)

ধানের ঝাড় যদি মোটা অথচ ফাঁক ফাঁক হয়, তাহা হইলে অধিক ধান জন্মে।

মদিকাদান-বিধি।

"বীজস্য বপনং কৃত্বা মদিকাং তত্র দাপয়েৎ।
বিনা মদিপ্রদানেন সমজন্ম ন জায়তে॥"

বীজবপন করিয়া, ক্ষেত্রে মৈ দিবে। মৈ না দিলে ধান্যাদি ভাল জন্মে না। কিন্তু জমি ভিজা থাকিলে কদাচ মৈ দিবে না।

বীজবপন-মন্ত্র।

"বসুধেতি সুশীতেতি পুণ্যদেতি ধরেতিচ।
নমস্তে সুভগে! নিত্যং বীজোঽয়ং বর্দ্ধতামিতি॥"
(ক্রমোঽয়ং বর্দ্ধতামিতি পাঠান্তরং)

হে বসুধে! হে সুশীতলে! হে পুণ্যদে! হে ধরিত্রি! হে সুভগে! তোমাকে নমস্কার; তুমি এই বীজকে সতত বর্দ্ধন কর। (পাঠান্তরে গাছকে বর্দ্ধন কর)। পৃথিবীই যাবতীয় রত্নের নিদান, শান্তি ও সুখের আকর, পুণ্যের আধার ও ধারণের আশ্রয়; অর্থাৎ পৃথিবীই ধনরত্ন, সুখ-সম্পদ, ধর্ম্ম-অর্থ ও সংস্থানসুখের মূলাধার। পৃথিবীতে সকল শক্তিই অবস্থিত; পৃথিবী হইতেই সমুদায় হইতেছে। অতএব ধান্য বা গাছ বর্দ্ধনের জন্য পৃথিবীর নিকট প্রার্থনা করা অজ্ঞতার কার্য্য নহে। এই মূলমন্ত্রই যাঁহার অবলম্বন, তাঁহার কৃষিকার্য্যে কখনই অবনতি হয় না। অতএব, উহার প্রতি আস্থা স্থাপন করিয়া, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে সম্যক ফল পাওয়া যায়।

বীজরোপণ-মন্ত্র।

"ওঁ বসুধে হেমগর্ভাসি বহুশস্যফলপ্রদে।
বসুপূজ্যে নমস্তভ্যং বসুপূর্ণাস্তু মে কৃষিঃ॥
রোপয়িষ্যামি ধান্যানাং বৃক্ষবীজানি প্রাবৃষিঃ।
সুস্থা ভবন্তু কৃষকা ধনধান্যসমৃদ্ধিভিঃ॥
বাসবো নিত্যবর্ষী স্যান্নিত্যবর্ষাস্তু তোয়দাঃ।
শস্যসম্পত্তয়ঃ সর্ব্বাঃ সফলাঃ সন্তু নীরুজঃ॥
ইতি প্রণম্য বসুধাং কৃষকান্ ঘৃতপায়সৈঃ।
ভোজয়িত্বা গৃহী ভূরি নির্ব্বিঘ্নাং কুরুতে কৃষিং॥"
(বরাহ সংহিতায়াং)

হে বসুধে! হে স্বর্ণগর্ভে! হে বহুশস্যফলপ্রদে! হে বসুপূজ্যে! তোমাকে নমস্কার। তুমি আমার কৃষি-সম্পদ পূর্ণ কর। আমি বর্ষাকালে ধান্যের বীজ রোপণ করিব। তোমার প্রসাদে কৃষকগণ ধনধান্যসমৃদ্ধিশালী হইয়া সুখে কালাতিপাত করুক। বাসব নিত্য বর্ষণ করুন; এবং মেঘ সকলও নিত্য বর্ষণশীল হউক। এইরূপে সকল শস্য নির্ব্বিঘ্নে অপর্য্যাপ্তরূপে ফলিত হউক। গৃহী এই মূলোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া বসুধাকে প্রণাম করিবে। পরে কৃষকদিগকে যথেষ্ট ঘৃত এবং পায়সাদির সহিত প্রচুর ভোজন করাইবে। এইরূপ নিয়মে কৃষিকার্য্য সম্পন্ন করিলে, গৃহীর যথেষ্ট শস্য-সম্পদ বৃদ্ধি হইবে। হলচালন, বীজবপন ও বীজ রোপণের প্রথম দিনে কৃষকদিগকে ঘৃত, পায়স ও মিষ্টান্নাদি ভোজন করাইবার প্রথা অদ্যাপিও এ দেশের কৃষক-সমাজে প্রচলিত আছে।

ধান্যনিস্তৃণীকরণ।

"নিষ্পন্নমপি যদ্ধান্যমকৃত্বা তৃণবর্জ্জিতম্।
ন সম্যক ফলমাপ্নোতি তৃণক্ষীণা কৃষির্ভবেৎ॥
কুলীরভাদ্রয়োর্ম্মধ্যে যদ্ধান্যং নিস্তৃণং ভবেৎ।
তৃণৈরপি তু সম্পূর্ণং তদ্ধান্যং দ্বিগুণং ভবেৎ॥
দ্বিবারমাশ্বিনে মাসি কৃত্বা ধান্যস্য নিস্তৃণম্।
অথ পাকবিহীনং হি ধান্যং ফলতি মাষবৎ॥
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন নিস্তৃণাং কারয়েৎ কৃষিম্।
নিস্তৃণা হি কৃষকানাং কৃষিঃ কামদুঘা ভবেৎ॥"

বীজ রোপণের পর চারাগাছ জন্মিলে, ধান্যক্ষেত্রকে তৃণ-শূন্য করিয়া দিবে। তাহা না করিলে সম্যক ফল হইবে না; এবং চাষও ক্ষীণ অর্থাৎ একেবারে মাটী হইবে। শ্রাবণ ও

ভাদ্রের মধ্যে যে ধান্যক্ষেত্র তৃণশূন্য হয়, তৎপর তাহা তৃণপূর্ণ হইলেও, তাহাতে দ্বিগুণ ধান্য ফলিবে। আশ্বিনমাসে দুইবার ধান্যক্ষেত্র নিড়াইলে, মাষকলায়ের ন্যায় প্রচুর ধান্য জন্মিবে। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে ধান্যকে তৃণশূন্য করিবে। তৃণশূন্য কৃষি কৃষকদিগের কামদুঘা অর্থাৎ অভীষ্টদায়িকা হইয়া থাকে।

"নাই ধান নিড়ায়ে আন (খনা)।" ধান না থাকিলেও নিড়াণের দ্বারা ধান হয়। ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, জমির ধানগাছ বড় হইতেছে না; উহা নিড়াণ মাত্রেই বড় হইবে অথবা যে জমিতে ঘাসের আধিক্যে ধান দৃষ্ট হয় না, তাহা নিড়াণ মাত্রেই ধানগাছ আশাজনক দৃষ্ট হইবে। মৃত্তিকা হইতে যে আহারীয় গ্রহণ করিয়া ধান্য পুষ্ট হইবে, তৃণ সকল সেই আহার লইয়াই বর্দ্ধিত হইলে সে জমিতে ভালরূপে ধান্য জন্মে না। অভিজ্ঞ কৃষকমাত্রেরই জমি তৃণশূন্য বলিয়া, তাহারা সহজেই আশাতীত ফললাভ করে।

বৃক্ষে জলসেচনবিধি।

"সর্ব্বস্থাপি নবোত্থস্য সায়ম্প্রাতর্নিষেচনং
শীতাতপসমীরেভ্যো রক্ষেচ্চ সুবিধানতঃ
হেমন্তেশিশিরেদেয়ং জলঞ্চৈকান্তরে দিনে। ১।
বসন্তে প্রত্যহং গ্রীষ্মে সায়ম্প্রাতর্নিষেচনং। ২।
বর্ষাসুচ শরৎকালে যদাবৃষ্টির্ণদৃশ্যতে
তদা দেয়ং জলংতজ্জৈস্তেরাণ বালেমহীরুহাং। ৩।
বারিণা যাবতাযস্য মূলে সৌহিত্যমিষ্যতে
তাবত্তস্য তয়োর্দ্দেয়ং কিংঘটার্থ বিবক্ষয়া। ৪।
আলবালেস্থিতং তোয়ং শোষংনভজতে যদা
অজীর্ণং তদ্বিজানিয়াৎনদেয়ং তাদৃশে জলং। ৫।
সমীপজাতং যত্নেন তৃণগুল্মলতাদিকং।
স্ফোটনীয়ং বিধিজ্ঞেনদ্রুমানাং বৃদ্ধিমিচ্ছত॥ ৬।

অর্থ—নব রোপিত বৃক্ষের যে পর্য্যন্ত পত্রাঙ্কুরের উদ্গম না হয়, ততদিন সায়ং ও প্রাতঃকালে জলসেক করিবে; এবং উহা শীত, রৌদ্র ও ঝড় হইতে বিবিধ উপায়ে রক্ষা করিবে॥ ১॥ অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ এবং ফাল্গুন—এই কএকমাসে একদিন অন্তরে, চৈত্র ও বৈশাখ মাসে প্রতিদিন এবং জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে প্রত্যহ প্রাতে ও সায়ংকালে জলসেক করিবে। ২। শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে যে দিন বৃষ্টি না হয়, কেবল সেই দিনমাত্রই বৃক্ষের আলবালে জলসেচন করিবে। ৩। যে পরিমাণ জল দিলে বৃক্ষের হিত হয় বলিয়া অনুমান করা যায়, সে পরিমাণই জলসেচন করিবে। ইহাতে কত ঘট বা ঘটি জল দিবে, তাহা বলিবার কিছু প্রয়োজন নাই। ৪। তরু-মূলে—আলিবদ্ধের মধ্যে, জল দিলে, যদি উহা শোষিত না হয়, তবেই বুঝিতে হইবে, বৃক্ষের অজীর্ণ-রোগ হইয়াছে। তখন আর জল দিবে না। ৫। রোপিত বৃক্ষের নিকটে যে সকল তৃণ, গুল্ম বা লতাদি জন্মে, মালী সেই সকল উৎপাটন করিয়া ফেলিবে। ইহাতে তরু সবলে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ৬।

বৃক্ষরক্ষা।

"নীহারাচ্চণ্ড বাতাচ্চ ধূমাবৈশ্বানরাদপি।
জালকায়াঃ প্রযত্নেন রক্ষণীয়া ক্ষমারুহা। ১।
পঙক্তিমধ্যেতু সুফলা বাহ্যেতৎপরতোঽপরে
বৃক্ষাঃ কার্য্যা বৃতা বৃক্ষা সাচাপিপরিখাবৃতা। ২।
বিদ্যাদাহত বৃক্ষস্য ভূতিমাদায় সর্ব্বতঃ।
রক্ষার্থ বিকিরেদেষাং তথানহিমবাধনম্
দীপ্তোগাগ্নিঃ শমং যাতি বজ্রদগ্ধদ্রুতম্মণা। ৩
সিতশালোদনং দগ্ধা সৈন্ধবেনযুতংবনে।
ক্ষেপণীয়ঞ্চ পরিতো গয়ানাং বৃষ্টিবারণম্
শলভাখুপতঙ্গানাং পিপীলাদিভয়েসতি। ৪।
অষ্টোত্তরশতং জপ্ত্বাতং লিখনেভূবি।
ক্ষেত্রে কীটপতঙ্গাদাখু পিপীলাদি বিনশ্যতি। ৬।

অর্থ—রোপিত বৃক্ষসকলকে কুয়াসা, প্রচণ্ড বায়ু, ধূম, অনল এবং মাকড়সার জালের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবে। ১। উদ্যানের মধ্য পঙক্তিতে উত্তম ফলের বৃক্ষ, তৎপরেও ঐ বৃক্ষ এবং পরে অপরাপর বৃক্ষসমূহের পরে বেড়া ও বেড়ার চতুর্দ্দিকে বারমাস জল থাকে এরূপ পরিখা খনন করিবে। ২। বজ্রাঘাতে যে বৃক্ষ মরিয়াছে, তাহার ছাই সমস্ত বাগানে ছড়াইয়া দিবে; ইহাতে হিমপাতের আশঙ্কা থাকিবে না। অধিক কি বলিব, ঐ বাগানে যদি কখন আগুন লাগে, তাহাও বজ্রাহত বৃক্ষের ছাই-স্পর্শে নির্ব্বাপিত হইয়া যাইবে। ৩। শুক্লবর্ণ তণ্ডুলের পক্ব, অন্ন, দধি ও সৈন্ধব একত্র মিশ্রিত করিয়া উদ্যানে ছড়াইলে, আর গরলবৃষ্টির ভয় থাকিবে না। ৪। পঙ্গপাল, মূষিক, পক্ষী এবং পিপীলিকা প্রভৃতির উপদ্রব উপস্থিত হইলে, "স্বস্তি কিষ্কিন্ধ্যা"—এই মন্ত্র অষ্টোত্তরশতবার জপ করিবে এবং উহা কোন পত্রে লিখিয়া, পুনর্ব্বার ১০৮ বার জপ করিয়া উদ্যানে বা ক্ষেতে পুতিয়া রাখিবে। তবে আর পূর্ব্বোক্ত পঙ্গপালাদির কেহই অনিষ্ট করিবে না। ৫, ৬।

বৃক্ষের পোষণ।

"ফলকুসুমসম্পত্তচিতা রোপণতো ভবতি কেবলায় যতঃ।
পোষণবিধিমথসম্মতমনোকহানামতোবক্ষ্যে॥ ১॥
খর্জ্জুর বিল্বলকুচাঃ সিতসর্ষপেণ,
পিণ্যাকতচ তুষকামিবশেনচাম্রাঃ।
ঐরাবতা নিচুলপত্র জলোক্ষণেন,
সব্রীহিমাংসসলিলেনচ যান্তিবৃদ্ধিং॥ ২॥
প্রাচীনামলকতরোঃপ্রিয়াহিমাষাঃ
ক্ষীরাম্ভোহিতমিহ যালতিন্দুকানাং:
প্রীয়ন্তে যবরজসাচ নারিকেলাঃ
সর্ব্বেষাং ভবতিরুচিহি নিম্নভূমৌ।৩।
কুরঙ্গ কিটি মাতঙ্গ শৃগালাশ্বাদি মেদসা।
কথিতেন সদুগ্ধেন পঞ্চ পল্লববারিণা।
কৃতসেকোভবেদাশু সহকারোঽতি সৌরভঃ। ৪।
ঘৃত-কুণপবচা বরাহবিষ্ঠা সলিলমতীব সুখায় দাড়িমানাং।
কথিতমথ কুলত্থচূর্ণকং বা জলমপি বৃদ্ধিকরং সদা সফর্য্যাঃ।৫।
যম্লিফলা শফরী ঘৃতলিপ্তো ধূপিতো আম্রফলধূপৈঃ।
আমফলৈরিহ দাড়িমশাখী তালফলানি বিড়ম্বয়তীব।৬॥
দধিমস্তু কাঞ্জিকসুরা বদরী তিলমেথিকা কুণপনীধুপয়ঃ।
ফলিনী কদম্ব করিকেসরকান্
কুরুতে সুগন্ধি বহুপুষ্পবৃতান।৭।
প্রিয়ঙ্গু গুঞ্জাফল নিম্ব পিপ্পলী
বচা হরিদ্রা তিলসর্ষপৈ সমৈঃ।
ঘৃতাশ্চকর্ণাম্বু বিলোড্য পায়য়েৎ
সচম্পকে নাগতরৌ সুবৃদ্ধিদম্।৮॥
সিক্তাম্ভোভিঃ পললতুষয়োঃ কুক্কুটানাং পুরীষং
মূলে দত্বা সকুসুমফলা গোস্তনী বৃদ্ধিমেতি।
স্কন্ধস্থৈস্তৈঃপনসতরবোঽপ্যাশু পলাল ভারৈর্মূলদত্তং
দধতিচ বচাবারি সিক্তাঃ ফলানি॥৯।

অর্থ—কেবল বৃক্ষাদি রোপণ করিয়া রাখিলেই, তাহা হইতে প্রচুর পরিমাণে ফলপুষ্প ভোগ করিতে পারা যায় না; যথাবিধি তাহার পোষণও করিতে হয়। অতএব বৃক্ষের পোষণবিধান বলিব।১। খর্জ্জুর, বিল্ব, ডেহুয়া প্রভৃতি শ্বেত সর্ষপ এবং খৈল দ্বারা, আম্র তুষ ও জল দ্বারা, কামরাঙ্গা হিজলপাতার জলসেচন দ্বারা এবং ধান্যযুক্ত মাংসজল দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।২। পুরাতন আমলকীবৃক্ষের মূলে মাষকলাই, চারাতিন্দুকে দুগ্ধমিশ্রিত জল ও নারিকেলের মূলে যবের খোসা দিলে পুষ্ট হয়; এবং সকল বৃক্ষের পক্ষেই নিম্নভূমি প্রশস্ত।৩। হরিণ, শূকর, হস্তী, শৃগাল ও অশ্বের বসা দুগ্ধমিশ্রিত পঞ্চপল্লবের জলে সিদ্ধ করিয়া, সেই জল মূলে সেচন করিলে আমের অতি সদগন্ধ হয়।৪। ঘৃত ও কুণপজল, বচ ও শূকরবিষ্ঠামিশ্রিত জল এবং কুলথকলাই সিদ্ধ জল ও পুঁটি মাছের জলেও দাড়িম্ব পুষ্ট হয়।৫। দাড়িম্ববৃক্ষে ত্রিফলা, পুঁটিমাছ ও ঘৃতের লেপ দিয়া কচি দাড়িম্বের ধূম লাগাইলে, দাড়িম তালের মত বড় হয়।৬। দধির মাৎ, কাঁজির জল, মদ, বরুই (কুল), তিল, মেথি ও কুণপজলসেকে প্রিয়ঙ্গু, কদম্ব ও নাগকেশর অতি সদগন্ধযুক্ত বহুপুষ্পে সুশোভিত হয়।৭। সমভাগে প্রিয়ঙ্গু, গুঞ্জা, নিম্বফল, পিপ্পলী, বচ, হরিদ্রা, তিল এবং সর্ষপকে ঘৃত ও শালপত্রজল দ্বারা বিলোড়ন করিয়া, উহা চম্পক ও নাগকেশর মূলে সেচন করিলে বিশেষরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।৮। কুক্কুটের বিষ্ঠা মূলে দিয়া খড় ও তুষের জল দ্বারা সেক করিলে, দ্রাক্ষালতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। আর কাঁঠালগাছের গুড়ির উপরে বোঝায় বোঝায় খড় রাখিয়া, উহার মূলে জল দিলে, গোড়া হইতে আগা পর্য্যন্ত কাঁঠাল ফলে।৯।

সর্পিগুড়ক্ষীরমধুপচারং, দত্তানিষিক্তোচ কপিত্থবিম্বৌ।
পীযূষকল্যাণাতিমাংসলানি, ফলাণানন্তীনি সদাদধাতে।১০।

কোষাতকীদলশিকাকথিতামিবাম্ভঃ সংসেচনাচ্চ সুকণা
রজসচেযুক্তঃ।
লব্ধোপচারমথ ধূপজলাভিষিক্তঃ।
শোভাং বিভর্ত্তিনিতরাং কুসুমৈর্ণধুকঃ।১১।
তিল যষ্টি মধুকমধুভির্ম্মিশ্রিত জলসেকতির্পিতাবদরী।
কুণপৈরুপচিতমূলা ফলতি ফলং শর্করামধুরম্।১২।
অজৈড়কা শূকর বিড় বিড়ঙ্গ
কিম্বোপচারেণ চ বীজপুরঃ।
ভূয়োঽশ্বমূত্রাবিল বারিসিক্তঃ।
ফলানি ধত্তে সুবহুনিশ্বশ্বৎ।১৩।
বৃশ্চিককণ্টকবিদ্ধাঃ সুরভি ঘৃতধূপিতাহি নিখিল লতাঃ
মূষককোলবসাভিঃ সংসিক্তাঃস্যুঃফলৈর্ণম্রাঃ।১৪।
সুরভী জল নিষেকতো নিদাঘে
কুণপজলেনচ কেতকী নিষিক্তাঃ।
জলধরসময়ে সুগন্ধ সূচী
চয়নিচিতানি বিভর্ত্তি পল্লবানি।১৫।
যস্য কস্যাপি পুষ্পস্যসৌরভেণাধিবাসিতান।
মৃত্তিকাসকলাম্মূলে বৃক্ষানাং বহুলানক্ষিপেৎ।১৬
কুষ্ঠপত্রমুরামুস্তা ভগদেশীর চূর্ণকৈঃ।
মিশ্রিতেনাম্ভমামেকম্মাসং সৌরভসম্ভব।১৭।

অর্থ—ঘৃত, গুড়, ক্ষীর এবং মধু দ্বারা কপিথ ও বিম্বকে সেচন করিলে, তাহার ফল অমৃততুল্য সুস্বাদু, স্থূল এবং অল্পবীজযুক্ত হইবে এবং ঐ সকল গাছে বারমাসে ফল ফলিবে।১০। কোষাতকীর (ঝিঙ্গা, ধুন্দুল, তরই ও ঢেড়স) পাতা ও শাখা সিদ্ধ জলসেচনে এবং বালুকণা মূলে দিয়া ধূমসংযোগ করিলে, মৌয়াগাছ বহুপুষ্পে সুশোভিত হয়।১১। তিল, যষ্টিমধু ও মধুমিশ্রিত জলসেচনে এবং মূলে মৃতজন্তুর মাংস দিলে, কুলফল চিনির মত মিষ্ট হয়।১২। অজ, মেষ, শূকরের বিষ্ঠা, বিড়ঙ্গ এবং চাউল ও গম প্রভৃতির ক্ষুদ মূলে দিয়া, তদুপরি ঘোড়ার চনা-মিশ্রিত জলসেচন করিলে, বাতাপিলেবু বহুলপরিমাণে ফলে।১৩। যাবতীয় লতাই বৃশ্চিকের কণ্টক দ্বারা বিদ্ধ করিয়া ও তাহাতে ঘৃতের ধূম লাগাইয়া, তদুপরি ইঁদুর ও শূকরের বসামিশ্রিত জলসেচন করিলে বহুতর ফল জন্মে।১৪। কেতকীবৃক্ষে গ্রীষ্মেরসময় যে কোন সদ্‌গন্ধ-যুক্ত বা কুণপজল সেচন করিলে, তাহাতে বর্ষাকালে অতি মনোহরগন্ধি পুষ্প হইয়া থাকে। ১৫। যে কোনও সুগন্ধিপুষ্পবৃক্ষের মূলে যে কোন সুগন্ধি পুষ্পবাসিত মৃত্তিকা সঞ্চিত করিয়া, তদুপরি কুড়, তেজপত্র, মুরামাংসী, মুথা, ভগর ও বীরণমূলের চূর্ণমিশ্রিত জল-সেচন করিলে, ঐ সকল পুষ্পের সুগন্ধ একমাস পর্য্যন্ত স্থায়ী রহিবে। ১৬। ১৭।

"কুল্মায দন্তিদন্তানাং চূর্ণযুক পঙ্কসম্ভবা
প্রত্যহং পুষ্পিতাঙোজমণ্ডিতা পদ্মিণী ভবেৎ। ১৮।
সিদ্ধার্থঃ কদলীদলানি শফরী বিট কোল মার্জ্জারয়োঃ
রেতেষাং সমভাগমাজ্যসহিতং চূর্ণং তরুভোহিতং
দত্তং ধূপবিলেপপনোপচরণে রাপ্যায়ণং রোগহৃৎ
শাখাঃপল্লবয়ত্যনংমধুকর ব্যালোল পুষ্পচ্ছদাঃ। ১৯।
অঙ্কোলক্কাথতোয়েন মিশ্রিতং ঘৃতমাক্ষিকং
বসাক্ষিটিতুরঙ্গানামেভিঃ সিক্তামহীরুহাঃ। ২০।
সিদ্ধার্থ ফলোপেতাঃ সর্ব্বদা ফলশোভিতাঃ।
জায়ন্তে পুষ্পপত্রাঢ্যাঃ সচ্ছায়াঃ রোগবর্জ্জিতাঃ। ২১।
যষ্টীমধুক পুষ্পাণি সিতাকুষ্ঠং মমাক্ষিকং
নিক্ষিপ্য গুলিকা কৃত্বামূলে সর্ব্বত্র নিক্ষিপেৎ। ২২।
দুগ্ধসেকঞ্চ বৃক্ষস্য যস্য কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ
ফলং সুনিশ্চিতং তস্য মধুরং জায়তে ভৃশং। ২৩।

অর্থ—অর্দ্ধসিদ্ধ ছোলা, গম, মাষকলাই ও হস্তিদন্তের চূর্ণমিশ্রিত কর্দ্দমে পদ্ম জন্মাইয়া রোপণ করিলে, প্রত্যহই ঐ পদ্মের শোভায় পুষ্করিণী সুশ্রী থাকিবে। ১৮। শ্বেতসর্ষপ, কদলীপত্র, পুঁটীমাছ, শূকর ও বিড়ালের বিষ্ঠার চূর্ণ সমভাগে লইয়া ও উহা ঘৃতযুক্ত করিয়া বৃক্ষমূলে সার দিলে এবং উহারই ধূমপ্রয়োগ ও বিলেপন করিলে, বৃক্ষ পরিপুষ্ট ও নীরোগ হয় এবং শাখাপল্লবে শোভিত ও ভ্রমররবে মনোহর হয়। বৃক্ষমাত্রেরই পক্ষে, এই সার প্রশস্ত জানিবে। ১৯। অঙ্কোণের ক্বাথযুক্তজলমিশ্রিত ঘৃত এবং মাক্ষিক শ্বেতসর্ষপ, ঘোড়া ও শূকরের বসার সার দিলে, তাহাতে বৃক্ষের কোনরূপ রোগ হয় না এবং বৃক্ষ পত্রপুষ্পে সর্ব্বদা শোভিত হয়।২০।২১। যষ্টীমধুর পুষ্প, চিনি, কুড় ও মধু দ্বারা

মিশাইয়া ও গুলি পাকাইয়া, উহা বৃক্ষমূলে স্তূপাকার করিবে; তাহার উপরে দুগ্ধসেচন করিলে, নিশ্চয়ই বৃক্ষের ফল সুমিষ্ট হইবে।২২।২৩।

কুণপজল।

কুরঙ্গ কীটমৎস্যানাং মেষচ্ছাগল খড়্গিণাং
মাংসং গ্রাহ্যং যথানাভং মেদোমজ্জা রসস্তথা।২৪।
তানসর্ব্বানেকতঃ কৃত্বা বঙ্কোনীরেণ পাচয়েৎ
সপক্বংহি ক্ষিপেস্তাণ্ডে তত্র দুগ্ধঞ্চ নিক্ষিপেৎ। ২৫।
চূর্ণীকৃত্য খলির্দ্ধিয়া তিলানাং মাক্ষিকং তথা
স্বিন্নাংশ্চ সরসান্মাষাণ তত্র দদ্যাদ্‌ঘৃতং তথা।২৬।
উষ্ণং জলং ক্ষিপেত্তত্রমাত্রানাস্তীহ কস্যচিৎ।
পক্কৈকং স্থাপিতে ভাণ্ডেকোষ্ণস্থানে মনীষিণ।
কুণপস্ত ভবেদেব তরুণাং পুষ্টিকরকঃ।২৭।

হরিণ, শূকর, মৎস্য, মেষ, ছাগল ও গণ্ডারের মাংস, মেদ, মজ্জা ও রস একত্র করিয়া জলে সিদ্ধ করিবে এবং উত্তমরূপে সিদ্ধ হইলে পাত্রান্তরে নামাইয়া, তন্মধ্যে দুগ্ধ নিক্ষেপ করিবে। তৎপরে, উহাতে আন্দাজমত জল দিয়া ১৫ দিন ঈষৎ উষ্ণস্থানে রাখিয়া দিবে। তাহা হইলেই "কুণপ" প্রস্তুত হইল। এই কুণপজল সকল বৃক্ষেরই হিতকারী।

প্রবন্ধের বিস্তৃতি আশঙ্কায়, বর্ত্তমান প্রবন্ধে, কৃষিকার্য্যে মহর্ষিগণের উপদেশ সম্বন্ধে, এ স্থলে অনেকবিষয়ই সন্নিবেশিত হইতে পারিল না।

শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

তামাক ও তামাকচাষের ঐতিহাসিক তত্ত্ব।

[রংপুর-বুড়িরহাট গবর্ণমেণ্ট কৃষি-পরীক্ষা-ক্ষেত্রের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত যামিনীকুমার বিশ্বাস বি, এ লিখিত।]

ঐতিহাসিক সংক্ষিপ্ত—তামাক আমাদের দেশীয় উদ্ভিদ নহে। তামাক শব্দটী ইংরেজী টুবাকো (Tobacco) শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। অপর পক্ষে, টুবাকো শব্দও ইংরেজী ওয়াইর (y) আকারানুরূপ একপ্রকার যন্ত্রের নামানুসারে সৃষ্ট হইয়াছে। প্রাচীনকালে সেণ্টডেমিঙ্গ দেশীয় লোকেরা এইরূপ যন্ত্রের উপরিস্থ দুইটী নল নাসিকার উভয় ছিদ্রে এবং নিম্নস্থ নলটী জ্বলিত তামাকের মধ্যে রাখিয়া ধূমপান করিত। ফলে, যন্ত্রের নাম হইতেই সেবনীয় দ্রব্যের নামও 'টুবাকো' হইয়াছে।

পাশ্চাত্যদেশে ও ভারতে তামাকের প্রচলন—১৪৯২ খৃঃ অব্দে, কলম্বস্ কর্ত্তৃক আমেরিকা আবিষ্কৃত হয়। তৎপূর্ব্বে, য়ুরোপ কিম্বা এসিয়াতে তামাকের ব্যবহার-প্রথা প্রচলিত ছিল না। পক্ষান্তরে, অতি প্রাচীনকাল হইতেই আমেরিকা এবং উহার দ্বীপপুঞ্জে তামাকের প্রচলন ছিল। তত্তৎস্থানের অধিবাসিগণ যে কেবল তামাকের ধূমপান করিতেন, তাহা নহে; নস্য-ব্যবহার ও মুখে চিবাইয়া খাওয়ার পদ্ধতিও তাঁহারা জ্ঞাত ছিলেন। আমেরিকা হইতেই ক্রমশঃ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তামাকের চাষ ও ব্যবহার-প্রথা প্রচলিত হইয়াছে।

কলম্বস্ ও তাঁহার সহচরগণ প্রথমতঃ কোন্ স্থানের অধিবাসীদিগকে ধূমপান করিতে দেখিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়; অর্থাৎ কেহ কেহ বলেন কিউবা, আবার কাহারও কাহারও মতে, স্যান সাল্‌বেডর। করটিজ উত্তর আমেরিকার অন্তর্গত মেক্সিকো-দেশে তামাকের গাছ এবং তামাকের ধূমপান করিতে দেখিয়াছিলেন। স্পেনবাসীরা দক্ষিণ আমেরিকার উপকূলে, ১৫০২ খৃঃ অব্দে, তামাক-পাতা চর্ব্বণ করিয়া খাইবার পদ্ধতি সন্দর্শন করিয়াছিলেন। ১৫১৮ খৃঃ অব্দে, ফরণাণ্ডো করটিজ্ টুবাগো-দ্বীপ অধিকার

করিয়া, তথায় তামাকের চাষ সন্দর্শন করেন। ১৫৩১ খৃঃ অব্দে, স্পেনবাসীরা 'সেণ্টডেমিঙ্গ' নামক দ্বীপে তামাকের চাষ আরম্ভ করিয়াছিলেন। ফরাসী রাজদূত 'জিন্ নিকট' (Jean Nicot) পর্ত্তুগালে তামাক-চাষ সন্দর্শন করিয়া, ১৫৬০ খৃঃ অব্দে, কেমারিণ ডি মেডিসির নিকট ইহার বীজ প্রেরণ করেন। এই অব্দে, টমাস্ হ্যারিয়ট ইংলণ্ডে তামাকের বীজ আনয়ন করিয়াছিলেন। উক্ত 'জিন্ নিকট' সর্ব্বপ্রথম তামাকের গুণ ও ব্যবহার-প্রণালীসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহারই নামানুসারে তামাককে "নিকটিয়ানা" জাতির অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। ১৫৭০ খৃঃ অব্দ হইতে ১৫৮৪ খৃঃ অব্দের মধ্যে সার ফ্রান্সিস্ ড্রেক্, সার ওয়াল্টার রেলী প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তির চেষ্টায় ইংলণ্ডে তামাকের প্রচলন বর্দ্ধিত হইয়াছিল। মহারাণী এলিজাবেথের রাজত্বকালে, তাঁহার সভাসদ্গণের মধ্যে যাঁহারা তামাকসেবনে বিশেষরূপে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তন্মধ্যে সার ওয়াল্টার রেলীর নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি তামাকের এতই অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, ফাঁসীকাষ্ঠে উঠিবার পূর্ব্বেও একবার উহা সেবন করিবার জন্য বড়ই আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

১৫৯৯ হইতে ১৫২৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে, তৎকালীন নানাবিধ প্রয়োজনীয় প্রাণী ও উদ্ভিদ সম্বন্ধে মোগল-সম্রাট বাবর যে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহাতে তামাকের উল্লেখ দেখা যায় না। তৎপর, ১৫৬৩ খৃঃ অব্দে, 'গার্সিয়া ডি ওরেটা' ভারতীয় ভেষজসম্বন্ধে যে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, তাহাতেও তামাকের নাম পাওয়া যায় না। আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে কলঞ্জ-পত্রের ধূমপানের উল্লেখ রহিলেও, উহা তামাক কিনা, সে মীমাংসা করা সহজ নহে। মোগল-সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে, পর্ত্তুগীজ পাদরী সাহেবেরাই প্রথমতঃ এ দেশে তামাকগাছ আনয়ন করেন; এবং উহার চাষ ও ব্যবহার-পদ্ধতি তাঁহারাই এ দেশবাসীদিগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে, আকবর বাদসাহকে তামাক সেবন করিতে দেওয়া হইয়াছিল; কিন্তু চিকিৎসকগণ উহা সেবন করিতে নিষেধ করেন।

প্রবাদ এই যে, ভারতবর্ষের মধ্যে দাক্ষিণাত্যেই সর্ব্বপ্রথম তামাকের চাষ আরম্ভ হয়; এবং তথা হইতেই ক্রমশঃ সমগ্র ভারতে ইহার চাষ-প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। ১৬১৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই, এ দেশে তামাকের এত অধিক প্রচলন হইয়াছিল যে, জাহাঙ্গীর বাদসাহ সর্ব্বসাধারণকে ইহা ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

অধিক দিনের কথা নহে—শতবৎসর পূর্ব্বেও, এ দেশে তামাকের বিশেষ আদর ছিল না। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে আবালবৃদ্ধবনিতার প্রায় ঠু অংশ লোকেই, কোন-না-কোনও প্রকারে, তামাক ব্যবহার করিয়া থাকেন। যদিও অধুনা, এ দেশে প্রচুর পরিমাণ তামাকের চাষ হইতেছে সত্য, কিন্তু তথাপি, এখন পর্য্যন্তও উৎকৃষ্ট চুরট কিম্বা সিগারেট প্রস্তুত-উপযোগী তামাকের চাষ-প্রথা প্রচলিত হয় নাই। এ সম্বন্ধে আমেরিকার সহিত তুলনা করিলে, আমরা প্রায় শতবৎসর পিছনে পড়িয়া রহিয়াছি বলিতে হইবে।

সমগ্র ভারতবর্ষে ইংরেজাধিকৃত এবং স্বাধীন রাজ্যমধ্যে ৬৭২০০০,০০০ বিঘা জমিতে নানাবিধ শস্যের চাষ করা হয়। তন্মধ্যে, ৩০৩০০০০ বিঘায় তামাকের চাষ হইয়া থাকে। তামাক-চাষের মোট জমির পরিমাণের প্রায় অর্দ্ধাংশই বঙ্গদেশ ও বিহার মধ্যে অবস্থিত। বিহার ও বঙ্গদেশের প্রায় সকল জেলাতেই স্থানীয় লোকের ব্যবহারোপযোগী অল্পাধিক পরিমাণে তামাকের চাষ হইয়া থাকে। সমগ্র বঙ্গের মধ্যে উত্তরবঙ্গেই অত্যধিক পরিমাণে তামাকের চাষ হয়। তথায় কেবল গুরুক-তামাকের এবং ব্রহ্মদেশে রপ্তানি করিবার উপযোগী তামাকের চাষ করা হয় বলিলেও, বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। গোদাবরীর চড় (লঙ্কা) সমূহে এবং চট্টগ্রামের পাহাড়-অঞ্চলে বর্ম্মা-চুরট প্রস্তুতোপযোগী তামাকের চাষ করা হয়। মান্দ্রাজে চুরটের অভ্যন্তরস্থ তামাকের চাষ হইয়া থাকে। কিন্তু উৎকৃষ্ট চুরটের বহিরাবরণের এবং সিগারেটের তামাকের চাষ-প্রথা এ দেশের কুত্রাপিও প্রচলিত হয় নাই। অল্পকাল যাবৎ মান্দ্রাজে চুরট প্রস্তুত করণের নিমিত্ত অনেকগুলি কারখানা স্থাপিত হইয়াছে।

এই সকল কারখানার তৈয়ারী চুরট ভারতের সর্ব্বত্র এবং ইয়ুরোপের অনেকস্থানে রপ্তানি হইয়া যায়।

এ দেশে চুরটের কারবার বেশ চলিতে পারে মনে করিয়া, ১৮৭৬ খৃঃ অব্দে, কাপ্তান ই, এ, কেম্পবেল মান্দ্রাজের মাদুরা-জেলার অন্তর্গত দিন্দিগালে, পরীক্ষার্থ প্রথমতঃ একটী চুরটের কারখানা স্থাপন করিয়াছিলেন। ইঁনি দেশী তামাক দ্বারা চুরট প্রস্তুত করিয়া সন্তোষজনক ফললাভ করিতে পারেন নাই। ফলে, দুইবৎসর পরেই, কারখানার কার্য্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ১৮৮১ খৃঃ অব্দে দেখ' গেল, জাভা ও সুমাত্রা-তামাকের বহিরাবরণে এ দেশীয় তামাক প্রয়োগ করিতে পারিলে সুন্দর চুরট তৈয়ার করা যায়। এই আবিষ্কারের ফলেই চুরটের কারখানা লাভজনক হইয়া উঠিয়াছে; এবং বর্ত্তমান সময়ে ৩০।৪০টী কারখানাতে বহুলোক কার্য্য করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছে। রঙ্গপুরের মৃত্তিকা ও আবহাওয়া উৎকৃষ্ট জাতীয় তামাক-চাষের উপযোগী। সুতরাং, এ স্থানে সুমাত্রা-তামাকের চাষ হইতে পারে কিনা, তাহার পরীক্ষা হওয়া বাঞ্ছনীয়। উৎকৃষ্ট সুমাত্রা-তামাকের প্রতিমণের দর ১৪০০৲—১৫০০৲ টাকা পর্য্যন্ত হয়। সুতরাং সুমাত্রা-তামাকের চাষ করিতে পারিলে যে কিরূপ লাভ হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমেয়। রঙ্গপুরের মৃত্তিকায় চুরটের বহিরাবরণ প্রস্তুতোপযোগী বহুমূল্যবান সুমাত্রাতামাকচাষের একটী বিজ্ঞান-সম্মত উপায় আবিষ্কার করা কি এ দেশের কৃষিতত্ত্ববিদগণের সর্ব্বথা কর্ত্তব্য নহে?

সমগ্র ভারতবর্ষের উৎপন্ন তামাকের প্রায় একতৃতীয়াংশ উত্তরবঙ্গেই জন্মে। কিন্তু তথাপি, এখানে চুরট ও সিগারেটের তামাকচাষের প্রচলনের নিমিত্ত বিশেষ কোনও চেষ্টা করা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। ১৭৯০ খৃঃ অব্দে, গভর্ণমেণ্ট রঙ্গপুরের স্থানীয় কৃষকদিগকে ভার্জ্জিনিয়া-তামাকের চাষপরীক্ষা করিবার নিমিত্ত অল্প পরিমাণ বীজ দিয়াছিলেন। কিন্তু পরীক্ষার ফল কিরূপ হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। ১৮৬৭ খৃঃ অব্দে, প্যারিসের মেলায় উৎকৃষ্ট হেভানা-তামাকের নমুনা পাঠাইয়া দিয়া, রঙ্গপুরের জনৈক জমিদার একটী পদক পুরস্কার পাইয়াছিলেন।

১৮৭৮—৭৯ খৃঃ অব্দে, কুচবেহার ষ্টেইটে চুরটের তামাক-চাষের চেষ্টা করা হইয়াছিল; কিন্তু বিশেষ কোনও ফললাভ হয় নাই। ১৯০৬ খৃঃ অব্দ হইতে ক্রমাগত ৩.৪ বৎসর পর্য্যন্ত এই ষ্টেইটে উৎকৃষ্ট সিগারেটের চাষ-পরীক্ষা করা হইয়াছিল; কিন্তু ফল সন্তোষজনক না হওয়াতে, এক্ষণ আর সিগারেটের তামাক-চাষ করা হয় না।

বিগত ১৯০৫ খৃঃ অব্দে, চুরট ও সিগারেটের উপযোগী বৈদেশিক তামাকের চাষ-পরীক্ষার উদ্দেশ্যে, রংপুর কৃষি-সমিতি (The Rangpur District Agricultural Association) রঙ্গপুর-কৃষিপরীক্ষার ফল-প্রদর্শন-ক্ষেত্রের (Demonostrations Farm) ভূমি ক্রয় করেন; এবং ইহার পরিচালনভার তৎকালে গভর্ণমেণ্টের হস্তে প্রদত্ত হয়। ভূতপূর্ব্ব ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার দেশপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত আশুতোষ লাহিড়ী বি, সি, ই মহাশয়ের বিশেষ উদ্যোগ ও অধ্যবসায়ের ফলেই রঙ্গপুর-কৃষি-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে! এই সমিতির কৃষি-পরীক্ষা-ক্ষেত্রে ১৯০৫ খৃঃ অব্দ হইতে ১৯০৮ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত, (১) চুরটের বহিরাবরণের উপযোগী সুমাত্রা-তামাক, (২) মার্কিণদেশীয় সিগারেটের তামাক এবং (৩) তুরস্কদেশীয় সিগারেটের তামাক—এই প্রধান তিনপ্রকার তামাকের চাষপরীক্ষা করা হইয়াছিল। ক্রমাগত তিনবৎসরকাল পরীক্ষায় দেখা গেল, রঙ্গপুর-কৃষি-পরীক্ষা-ক্ষেত্রের মৃত্তিকা তামাক-চাষের উপযোগী নহে; বিশেষতঃ, ঐ ক্ষেত্রে তামাক শুষ্ক ও জাত করিবার উপযুক্ত ঘর তৈয়ার না হওয়ায়, সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায় নাই। সুতরাং, ১৯০৮ খৃঃ অব্দে, রঙ্গপুরের প্রায় পাঁচ মাইল উত্তরে, বুড়িরহাট নামক স্থানে, তামাক-চাষপরীক্ষার্থ গভর্ণমেণ্ট এক কৃষি-ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই কৃষি-ক্ষেত্রে সুমাত্রা-তামাকচাষের ফল অত্যুৎকৃষ্ট ও সন্তোষজনক হইতেছে। ১৯১০—১১ খৃঃ অব্দে, বুড়িরহাট ফার্ম্মে উৎপন্ন সুমাত্রা-তামাকের প্রতিমণ ৬০৲ হইতে ১০০৲ দরে বিক্রীত হইয়াছিল; এবং প্রতি একরে (কিঞ্চিদধিক তিন বিঘা) খরচ বাদে

প্রায় ১১৮০৲ লাভ হয়। তৎপর, ক্রমাগত ৪।৫ বৎসর যাবৎ প্রতি একরে ২২৫৲ হইতে ৬০০৲ টাকা পর্য্যন্ত লাভ হইতেছে। দেশী-তামাকের চাষে প্রতি একরে খরচ বাদে ১০০৲ হইতে ১৫০৲ টাকার অধিক কখনও লাভ হয় না। সুতরাং, সুমাত্রা-তামাকের চাষ কিরূপ লাভজনক হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমেয়।

তামাক-চাষের জমি—১৯০৬ খৃঃ অব্দের জানুয়ারী মাসে, ভারতগভর্ণমেণ্টের কৃষিবিভাগের দ্বিতীয় সভার অধিবেশনে জানা গিয়াছে যে, ভারতবর্ষে প্রায় ১০, ৬১০০০ একর জমিতে তামাকের চাষ হইয়া থাকে। এই হিসাবে, ধান্যপ্রমুখ ৩।৪টি ফসলের পরই, ইহার নাম উল্লেখযোগ্য। একমাত্র বঙ্গদেশেই অন্যূন ৩৫০০০০ একরে তামাকের চাষ হয়। এতন্মধ্যে, রঙ্গপুর জেলায় ১৭১০০০ একর, জলপাইগুড়ী জেলায় ৯১৪০০ একর এবং কুচবিহারে ৩৫০০০ একরে অর্থাৎ একমাত্র উত্তরবঙ্গেই মোট প্রায় ৩০০০০০ একরে তামাকের চাষ হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন, বঙ্গদেশের প্রায় প্রত্যেক জেলায়ই অল্লাধিকপরিমাণে তামাকের চাষ আছে। সমগ্র বঙ্গের উৎপন্ন তামাক প্রতি একরে গড়ে ১২/০ মণ এবং প্রত্যেক মণের মূল্য ১২৲ টাকা ধরিয়া মোটামুটিভাবে হিসাব ধরিলেও, বার্ষিক ৫০৪০০০০০৲ বা কিঞ্চিদধিক পাঁচ কোটি টাকা হইবে। এইরূপ একটী প্রধান-শস্যের চাষে উন্নত-প্রণালী অবলম্বন করিয়া, প্রতি একরে অন্ততঃ দশটী টাকা অধিক লাভ করিতে পারিলেও, একমাত্র বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীতেই বার্ষিক অন্ততঃ ৩৫০০০০০৲ টাকা আয় বৃদ্ধি হইতে পারে। উৎকৃষ্ট চুরটের তামাকের চাষের প্রকৃষ্ট পদ্ধতি প্রচলন এবং ইহার বাজার ঠিক করিতে পারিলে, প্রতিবৎসর আরও অধিক টাকা লাভ দাঁড়াইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত, এদেশীয় তামাকের উন্নতিসাধন এবং আমদানী ও রপ্তানি বৃদ্ধি দ্বারাও যথেষ্ট অর্থলাভ করা যাইতে পারে।

বর্ত্তমানসময়ে এদেশে সিগারেটের প্রচলন এত অধিকরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, হাটে, ঘাটে, মাঠে, বাজারে, রেলে, ষ্টিমারে—সর্ব্বত্রই ইহার ব্যবহার হইতেছে। কিন্তু এই বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও এদেশে সিগারেটের বিশেষ কোনও প্রচলন ছিল না। বিগত ১০।১২ বৎসর মধ্যেই সিগারেটের অত্যধিক প্রচলন দেশব্যাপী হইয়া পড়িয়াছে। ইউরোপের কএকটী বণিক এদেশে আমেরিকার তামাক চালাইবার উদ্দেশ্যে, তদ্দেশজাত তামাকে সিগারেট প্রস্তুত করিয়া, উহা এদেশে রপ্তানি করিতে থাকেন; এবং যাহাতে দেশী তামাকের বিক্রয় কম হয়, তাহারই চেষ্টা করেন। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এত অল্পকালমধ্যেই তাঁহাদের চেষ্টা একপ্রকার ফলবতী হইয়াছে। এক্ষণে সস্তাদরে অতি নিকৃষ্ট সিগারেট বিক্রীত হইতেছে। ইহা বিস্বাদযুক্ত ও ক্রমাগত কিয়ৎকাল ইহার ধূমপান করিলে স্বাস্থ্য নষ্ট হইতে পারে। গভর্ণমেণ্ট বৈদেশীক তামাকের উপর অধিক শুল্ক স্থাপন করিয়াছেন বলিয়া, উৎকৃষ্ট সিগারেটের দরও অধিক হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং, এক্ষণ উৎকৃষ্ট সিগারেট ব্যবহার করা অনেকের পক্ষেই কষ্টসাধ্য। এমতাবস্থায় অভ্যাসবশে অনেকেই নিকৃষ্ট সিগারেটের ধূমপান করিয়া অল্লাধিক পরিমাণে স্বাস্থ্যনষ্ট করিতেছেন। এই জন্যই, যাহাতে এ দেশে উৎকৃষ্ট সিগারেটের উপযোগী তামাকের চাষপ্রথা প্রচলিত হয়, এবং এ দেশের লোকে অল্পব্যয়ে সুস্বাদু ও সুগন্ধযুক্ত সিগারেট ব্যবহার করিয়া তৃপ্তিলাভ ও স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করা অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। সিগারেট প্রস্তুতোপযোগী তামাকের চাষ করা, এ দেশের পক্ষে অসম্ভব নহে। তবে যথোচিত কৃষি-শিক্ষার অভাবেই আমাদিগকে বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইতেছে।

তাম্রকূট-সেবন-প্রসঙ্গ—তামাকের ধূমপান করা ভাল কি মন্দ, এ সম্বন্ধে অনেকেই প্রশ্নজিজ্ঞাসু হইয়া থাকেন। যাঁহারা ইহার বিরোধী, তাঁহারা বলেন যে, ক্রমাগত ইহা ব্যবহার করিলে শরীর ও মন দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। তদ্ভিন্ন, অত্যন্ত কড়া তামাক সেবন করিলে চক্ষুরোগ জন্মিতে পারে। তামাকের মধ্যে একপ্রকার তৈল আছে, উহা ভয়ানক বিষাক্ত; এবং তন্মধ্যে যে মাদকপদার্থ আছে, উহাও বিষাক্ত। এই

নিমিত্তই অনেকসময় ঔষধার্থে তামাক ব্যবহৃত হয়। এই সকল যুক্তি অমূলক নহে। কিন্তু তথাপি, বলা যাইতে পারে যে, পরিমিতরূপে ব্যবহার করিলে, তামাকসেবনে মানসিক কিম্বা শারীরিক পরিশ্রমজনিত ক্লান্তি এবং অনবধানতা কিম্বা অস্থিরতা দূরীভূত হইয়া থাকে। এ কারণেই ইহার প্রচলন এত অধিক। তামাকসেবন উপকারী কি অপকারী, তাহার মীমাংসা করা বড়ই কঠিন। তবে ইহা যে সর্ব্বাংশেই অপকারী, তাহাও বলা যায় না।

এ ভূমণ্ডলের প্রায় একচতুর্থাংশ লোক তামাক সেবন করিয়া থাকে। (১) ধূমপান, (২) নস্যরূপে ব্যবহার এবং (৩) মুখে চিবাইয়া খাওয়া—প্রধানতঃ এই ত্রিবিধ উপায়েই তামাক ব্যবহৃত হয়। এতন্মধ্যে, ধূমপায়ীর সংখ্যাই অত্যধিক, এবং ইহাদের সংখ্যা ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছে। এদেশে ধূমপায়ীর সংখ্যা যেরূপভাবে বর্দ্ধিত হইতেছে, এবং তামাক এক্ষণ যেরূপ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষ হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে ইহার চাষের প্রতি উপেক্ষা করিলে চলিবে না। যাহাতে ভবিষ্যতে এদেশবাসীদিগকে তামাকের জন্য পরমুখাপেক্ষী হইতে না হয়, তদুপায়বিধান করা কর্ত্তব্য।

বিদেশে দেশী তামাক রপ্তানি—বর্ত্তমানসময়ে যেভাবে দেশী তামাকের চাষ ও উহা প্রস্তুত করা হয়, তাহাতে উহা ইউরোপে রপ্তানি করিবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী হয় না। সাধারণতঃ, নিম্নলিখিত দোষগুলিই রপ্তানির পক্ষে প্রধান অন্তরায় বলিয়া বিবেচিত হয়।

(১) রপ্তানিকৃত তামাক অল্পসময়েই (নির্দ্দিষ্টস্থানে পৌঁছছিবার পূর্ব্বেই) "ছাতা" ধরিয়া অব্যবহার্য্য হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে, এত শুষ্কাবস্থায় তামাকের বস্তা-বাঁধাই করা হয় যে, উহা ভাঙ্গিয়া গুঁড়া হইয়া যায়। এই গুঁড়া-তামাকে একমাত্র নস্য ব্যতীত অন্য কিছুই প্রস্তুত করা যায় না।

(২) দেশী তামাক এত কড়া, বিবর্ণ ও মোটা যে, তদ্দ্বারা চুরট কিম্বা সিগারেট প্রস্তুত হইতে পারে না।

(৩) দেশী তামাক সুগন্ধ ও সুস্বাদযুক্ত নহে; বিশেষতঃ, ইহাতে মৃত্তিকা ও বদ্ধ পচাজলের গন্ধ অনুভূত হয়।

এই সমস্ত দোষাপসারণ করিতে পারিলে, ফ্রান্স, ইটালী, হলাণ্ড প্রভৃতি ইউরোপের নানাস্থানেই এ দেশীয় তামাক রপ্তানি করা যাইতে পারে। এ দেশে মজুরের বেতন, অন্যান্য দেশের তুলনায়, অনেক কম। সুতরাং, তামাক উৎপাদনের খরচও বেশী নহে। এমতাবস্থায়, এ দেশে যেরূপ অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে তামাকের চাষ হয়, তাহার যথোচিত উৎকর্ষসাধন করিতে পারিলে যে কেবল বিদেশী তামাকের আমদানী বন্ধ হইয়া যাইবে এবং তাহাতে স্থানীয় লোকের আর্থিক উন্নতি হইবে, এমত নহে। পক্ষান্তরে, উহা বিদেশে রপ্তানি করিয়াও যথেষ্ট অর্থলাভ করা যাইতে পারে।

বিভিন্ন জাতি—প্রোফেসর কোমস্ (Prof. Comes of Naples) একচল্লিশ রকম তামাকজাতীয় উদ্ভিদের (Nicotiana) বর্ণনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে, কএকপ্রকার মাত্র ফিলিপাইনদ্বীপপুঞ্জ, অষ্ট্রেলিয়া এবং নিউ কেলেডানিয়া প্রভৃতি স্থানে দেখা যায়। অবশিষ্ট অধিকাংশেরই আদি জন্মস্থান আমেরিকা। কোমস্ প্রত্যেক জাতিরই বহুসংখ্যক অন্তর্জ্জাতির উল্লেখ করিয়াছেন। নিম্নে তিনটী প্রধান জাতির বিষয় বিবৃত হইল।

১। **মেরিল্যাণ্ড তামাক** (N. tabacum Macrophylla) — ইহার আদি জন্মস্থান মেক্সিকো। ইহা যে জন্মস্থানেই নিবদ্ধ রহিয়াছে, তাহা নহে; ভারতবর্ষ, পারস্য, ইজিপ্ট, পেরু, পোটরিকো প্রভৃতি স্থানে ব্যাপ্ত হইয়া পরিয়াছে। ইহার পত্রভাগ বৃহৎ ও হৃৎপিণ্ডাকার। কিউবা, মেনিলা এবং অত্যুৎকৃষ্ট তুরস্কদেশীয় তামাক এই জাতীয়। ইহা সবৃন্তক ও অবৃন্তক—এই উভয়প্রকারেরই হয়; এবং ইহার বহুসংখ্যক অন্তর্জ্জাতি আছে। ইহা সেবনের পক্ষে বেশ উপযোগী।

২। **ভার্জিনিয়া-তামাক** (N. tabacum-angustifolia)—ইহা অতিশয় তীব্র ও মোটা বলিয়া নস্যপ্রস্তুতের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ইহাও সবৃন্তক ও

অবৃন্তক ভেদে দুইপ্রকারের হয়; এবং ইহারও অনেক অন্তর্জাতি আছে।

৩। **হামাকু** (N. Rustica)—কোমস্ ইহার আদি জন্মস্থান মেক্সিকো অথবা টেকসাস্ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। ইহা সাধারণতঃ তুরস্কদেশীয় তামাক বলিয়া পরিচিত। অতি অল্পকাল যাবৎ এ দেশে হামাকুর চাষ হইতেছে। ইহা অনেকস্থানে 'আমেরিকা', 'বিলাতী' কিম্বা 'মতিহারী' তামাক নামে কথিত হয়। পত্রের আকৃতিভেদে হামাকু প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত; (ক) বৃহৎ ও হৃৎপিণ্ডাকার পত্রবিশিষ্ট হামাকু (N. Rustica Cordute)। রঙ্গপুরের হামাকু এই জাতীয়। (খ) ক্ষুদ্র, সুগন্ধযুক্ত ও সূক্ষ্মাগ্র গোলাকার পত্রবিশিষ্ট হামাকু (N. Rustica Ovata)। জলপাইগুড়ীর 'হাতীকান' এই জাতীয়। ইহার ফলন কম হয়।

তামাকু ও হামাকুর পুষ্পদল ও পুষ্পদণ্ডের অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। তামাকুর পুষ্পদলের নলভাগ বর্দ্ধিত ও লালবর্ণ; এবং উহার পুষ্পদণ্ডে ডালপালা রহে। পক্ষান্তরে, হামাকুর পুষ্পদলের নলভাগ স্ফীত ও হরিদ্রাভ; এবং ইহার পুষ্পদণ্ড খর্ব্বাকার ও শাখা-প্রশাখাবিহীন হয়।

উত্তরবঙ্গে তামাকের চাষ—উত্তর বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বিভিন্নপ্রকার তামাকের চাষ করা হয়। একমাত্র রঙ্গপুর জেলাতেই ১৫।১৬ রকমের তামাক জন্মে। এই সকল তামাক প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা :—

(১) দেশী তামাক—ভেঙ্গী, মেনা-ভেঙ্গী, সিন্দুর-খাটুয়া প্রভৃতি এই জাতীয়।

(২) উজানী তামাক—গোদ্‌রা, চামুয়া-গোদ্‌রা, শকুনী-গোদ্‌রা প্রভৃতি।

(৩) বাঁশদহ তামাক—বাঁশদহ-তামাক আকার ও আয়তনে দেশী হইতে বিভিন্ন।

এই ত্রিবিধ রকমের তামাক রঙ্গপুরের বিভিন্ন স্থানে জন্মে। তদ্ভিন্ন, হামাকু কিম্বা মতিহারী তামাকের চাষও রঙ্গপুরের নানাস্থানেই হয়। ইহার পাতার আকৃতি ও আয়তন তামাকপাতা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক; এবং ইহা অতিশয় তীব্র, মোটা ও ভঙ্গপ্রবণ। গত কএক বৎসর যাবৎ রঙ্গপুরে হামাকুর চাষ বিস্তৃতিলাভ করিতেছে। সাধারণতঃ তিস্তানদীর উভয়পার্শ্বস্থ উচ্চ বালি-মৃত্তিকায় তামাকের চাষ হয়। কিন্তু প্রকৃতির এমনই সৃষ্টিকৌশল যে, দেশী তামাকের চাষ-ভূমিতে উজানী কিম্বা বাঁশদহ তামাক ভাল জন্মে না। পক্ষান্তরে, উজানী কিম্বা দেশী তামাকের চাষস্থানে বাঁশদহের চাষ লাভজনক হয় না। তিস্তানদীর পূর্ব্ব ও উত্তরদিকে উজানী-তামাকের চাষ হইয়া থাকে। রঙ্গপুর জেলার লালমনির হাট রেলষ্টেশন হইতে আরম্ভ করিয়া বি, ডি, রেল লাইনের উভয়পার্শ্বে জলপাইগুড়ী পর্য্যন্ত তামাকের চাষ হয়। তদ্ভিন্ন, জলপাই-গুড়ি জেলায় জলপাইগুড়ীর উত্তর-পশ্চিমস্থ নেপাল-টেরাই এবং কুচবিহারে বহুলপরিমাণে তামাকের চাষ হইয়া থাকে। তিস্তানদীর পশ্চিমপার্শ্বে অবস্থিত বুড়ির হাট হইতে চিলাখাল ও বদরগঞ্জ পর্য্যন্ত দেশী তামাকের চাষ হয়। নীলফামারি সব্‌ডিভিশনে দারওয়ানী ডোমার রেলষ্টেশনের সন্নিকটবর্ত্তী ভূভাগে বাঁশদহ-তামাকের চাষ হইয়া থাকে। এইরূপে দেখা যাইবে যে, একমাত্র রঙ্গপুর জেলারই বিভিন্নস্থানে বিভিন্নপ্রকারের তামাকের চাষ করা হয়; এবং উহাদের বাজার দরও স্বতন্ত্র। ১৮৯৩ খৃঃ অব্দে, কুচবিহারে পুণ্যাহ উপলক্ষে যে মেলা বসিয়াছিল, উহাতে স্থানীয় ১৯ রকম তামাক প্রদর্শিত হয়। কুচবিহারের তামাক অনেকাংশে রঙ্গপুরের উজানীতামাকের অনুরূপ দেখা যায়। কিন্তু স্থানীয় মৃত্তিকা ও আবহাওয়া ভেদে, উক্ত উভয়স্থানের তামাকের স্বাদ ও গন্ধের পার্থক্য রহিয়াছে। জলপাইগুড়ীতে পাটুয়াখোল ও হাঁসগলা তামাকের চাষই অত্যধিকরূপে হয়।

চট্টগ্রামে তামাকের চাষ—চট্টগ্রামেও নানাপ্রকার উৎকৃষ্ট তামাকের চাষ হইয়া থাকে। এই স্থান বহুসংখ্যক পাহাড় ও নদী দ্বারা সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে বলিয়া, স্থানীয় মৃত্তিকা ও আবহাওয়া উৎকৃষ্ট চুরট ও সিগারেটের তামাকচাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। চট্টগ্রামের পাহাড়-অঞ্চলে উৎকৃষ্ট বর্ম্মা-চুরটের উপযোগী

তামাকের চাষ করা হয়। এতদ্ব্যতীত, এই জেলায় প্রধানতঃ তিনটি তামাক-চাষের স্থান আছে।

(১) **মাতামৌরী-ভুভাগ**—ইহা মাতা-মৌরী-নদীর উভয়পার্শ্বে অবস্থিত। এই স্থানে চুরটের তামাকের চাষ হয়। তামাকের আয়তন ক্ষুদ্র হইলেও, উহা পাতলা, স্থিতিস্থাপক ও সুমিষ্ট। এ স্থানের তামাকের মধ্যে, নপাটা, কাটালীপাতা, চাকপাতা প্রভৃতি তামাকের নামই উল্লেখযোগ্য।

(২) **রামু ও গর্জ্জনিয়া ভুভাগ**—এই স্থানের তামাক মোটা ও তীব্র; এবং তন্মধ্যে, কালী-নগরী, সগণী, ডাহা, শালপাতা, বেগুণীপাতা প্রভৃতির নামই উল্লেখযোগ্য।

(৩) **সাতকানিয়া-ভুভাগ**--এই স্থানে বহুপরিমাণে তামাক জন্মিয়া থাকে। কিন্তু আমি স্বয়ং দেখি নাই বলিয়া, সাতকানিয়ার তামাকসম্বন্ধে কোনও কথাই লিখিত হইল না।

বিভিন্ন স্থানে, মৃত্তিকা ও আবহাওয়া ভেদে, বিভিন্ন রকমের তামাকের চাষ হইয়া থাকে; এবং বিভিন্ন বাজারে উহা বিভিন্ন মূল্যে বিক্রীত হয়। বর্ত্তমান বৎসরে বুড়ীরহাট কৃষি-পরীক্ষা-ক্ষেত্রে বিভিন্ন জেলার নিম্নলিখিত ৩৩ প্রকার তামাকের চাষ-পরীক্ষা করা হইয়াছে।

(১) পুসা নং ২৪; ঢাকার তামাক—(২) বাঙ্গালা, (৩) শিবকোষ, (৪) ফিরিচ, (৫) গামছামোরা, (৬) পানবট, (৭) হাতিকাণ; ফরিদপুরের তামাক—(৮) দেশী, (৯) কালিকা-জিহ্বা, (১০) মহিষকাণ, (১১) শিবজট, (১২) পানবট; বাঁকুরার তামাক—(১৩) দেশী; পাবনার তামাক—(১৪ ও ১৫) পাবনা ১নং ও ২নং; ময়মনসিংহের তামাক—(১৬) দেশী, (১৭) বিবিরজাত; রঙ্গপুরের তামাক—(১৮) নাওখোল, (১৯) সূর্য্যভেদী, (২০) চামা, (২১) গোদরা, (২২) মেনাভেঙ্গী, (২৩) সিন্দুরখাটুয়া, (২৪) ভেঙ্গী, (২৫) মতিহারী; চট্টগ্রামের তামাক—(২৬) নপাতা, (২৭) শকুনী, (২৮) ডাহা; মালদহের তামাক—(২৯) মালদহ ১নং; বরিশালের তামাক—(৩০) গাছ, (৩১) বাটাই; (৩২) মাণিকগঞ্জের তামাক এবং (৩৩) নাটোরের তামাক।

এই সকলপ্রকার তামাক একই জমিতে চাষ করা হইয়াছিল; এবং প্রত্যেক রকম তামাকেই একরূপ সার ও সমপরিমাণ জলসেচন করিয়া ফলাফল পরীক্ষা করা হইয়াছিল। পরীক্ষার ফল দেখিয়া অনুমিত হয় যে, রঙ্গপুরের তামাকই রঙ্গপুরের মৃত্তিকায় উত্তমরূপে জন্মে। কারণ, অন্যান্য জেলার তামাকের অপেক্ষা, রঙ্গপুরের তামাকেরই প্রতি একরে ফলন ও মূল্য অধিক হইয়াছিল। ফরিদপুরের কালিকা-জিহ্বা ও মহিষকাণ প্রভৃতি কএক প্রকার তামাক একই রকমের; অর্থাৎ ইহাদের পাতা অত্যন্ত লম্বা, সরু ও বৃন্তহীন—অনেকাংশে কালিকার-জিহ্বা বা মহিষের কাণেরই অনুরূপ। সুতরাং উহাদের আকৃতি অন্যান্য প্রকার দেশী তামাক অপেক্ষা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কালিকাজিহ্বা ও মহিষকাণ তামাকের আকৃতি মার্কিণ-দেশীয় ভার্জিনিয়ান তামাকের ন্যায়; সুতরাং, এই সকল যে ভার্জিনিয়ান তামাকেরই ক্রমাবনতির ফলে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভার্জিনিয়ার তামাক কিরূপে ফরিদপুরে আনীত হইয়াছে, অল্প কি অধিক স্থানে ইহার চাষ হয়, এবং উহা কোনস্থানে কিরূপ মূল্যে বিক্রীত হয়, তাহা নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক। পাবনা ১নং ও পাবনা ২নং তামাক একইরূপ; ইহা বেশ লাল কোষ্কাযুক্ত, মোটা ও তীব্র। কিন্তু ক্ষুদ্রায়তন ও বৃন্তহীন বলিয়া, ইহার মূল্য অধিক হয় না। নাটোরের তামাকপাতা বড় বড় ও মোটা; কিন্তু উহাও বৃন্তহীন হয়। অন্যান্য জেলার তামাকের ফলন কম এবং ঐ সকল প্রায়ই বৃন্তহীন হইয়া থাকে। রঙ্গপুরের তামাকের বোঁটা আছে; কিন্তু অন্যান্য জেলার তামাকের প্রায়ই বোঁটা নাই। ইহার কারণ কি? এই তামাকের বীজ কোথা হইতে আসিল, এবং যাহারা উত্তরবঙ্গের তামাক খাইতে ভালবাসেন, তাহারা রঙ্গপুরের তামাকের বীজ ব্যবহার না করিয়া, অন্তস্থানের তামাকের বীজ ব্যবহার করেন কেন—এই সকল বিষয়েরও অনুসন্ধান করা আবশ্যক। যদি রঙ্গপুরের তামাকের ফলন ও মূল্য অধিক

হয়, তবে সর্ব্বত্রই এই স্থানের তামাকচাষের প্রচলন করিতে পারিলে, সকলস্থানেই তামাকের বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে। রঙ্গপুরের তামাকের যে ফলন অধিক হয়, তাহা মাত্র একবারের পরীক্ষায় জানিতে পারা গিয়াছে। সুতরাং, এ সম্বন্ধে বারম্বার চাষপরীক্ষা এবং অন্যান্য বিষয়ে ক্রমান্বয়ে অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

তামাকের দোষগুণের কারণ অনুসন্ধান—মৃত্তিকা, আবহাওয়া এবং চাষের উপরই তামাকের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ বিশেষরূপে নির্ভর করে। এক ভূভাগের উৎকৃষ্ট তামাক-বীজ আনিয়া, উহা অপর ভূভাগে চাষ করিলে, উৎপন্ন তামাক তত সুস্বাদু ও গুণযুক্ত হয় না। ফরিদপুরের বাঁশদহ-তামাকের চাষ রঙ্গপুরের চিলাথাল কিম্বা বুড়রহাটে করিলে, উহা ফরিদপুরের ন্যায় তত ভাল হয় না। পক্ষান্তরে, উক্ত উভয়স্থানেই স্থানীয় সর্ব্বোৎকৃষ্ট তামাক উত্তমরূপে জন্মে। সুতরাং, একস্থান হইতে অন্যস্থানে বীজ আনয়ন করিয়া, নূতন রকমের তামাক-চাষ করিতে হইলে, প্রথমতঃ অল্পপরিমাণ স্থানে উহার চাষ-পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য ; এবং যাহাতে মৃত্তিকা ও চাষ-প্রণালীর সামঞ্জস্য রাখিতে পারা যায়, তাহারও চেষ্টা করা আবশ্যক। পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক হইলে, ক্রমান্বয়ে চাষের জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। যে জেলায় যেরূপ তামাকের চাষ-প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে, সেই জেলায় সেরূপ তামাকের চাষ হইলে, তামাক বিক্রয়ের সুবিধা হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু তথাপি, স্থানীয় তামাকের উৎকর্ষসাধন করিয়া অথবা ভিন্ন স্থানের তামাকের চাষ-প্রথার প্রচলন করিয়া—যে ভাবেই হউক, তামাক-চাষে যাহাতে লাভের পরিমাণ অধিক হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য।

তামাকের বীজ-নির্দ্ধারণের উপরই ফসলের গুণাগুণ অধিক পরিমাণে নির্ভর করে। চাষসম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ও নৈপুণ্য রহিলেও, অনুপযুক্ত বীজের ব্যবহার করিলে সুফল লাভ করা যায় না। সুতরাং কোন জেলায় কোনপ্রকার তামাকের চাষ বিশেষ লাভজনক হইতে পারে, তাহা পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য।

রপ্তানি—রঙ্গপুর, জলপাইগুড়ী ও কোচবিহার হইতে বাঙ্গালার প্রায় সকল জেলাতেই তামাকের রপ্তানি হইয়া থাকে। এই তিন জেলাতেই যে অত্যধিক পরিমাণে তামাক জন্মে, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। রঙ্গপুরের উৎকৃষ্ট তামাক ব্রহ্মদেশে রপ্তানি হয় ; এবং মধ্যম ও নিকৃষ্ট তামাক এ প্রদেশের বিভিন্ন জেলায় ও আসামে রপ্তানি হইয়া যায়। শেষোক্ত স্থানসমূহে দা-কাটা তামাক ব্যবহৃত হয় বলিয়া, তত্তৎস্থানে উৎকৃষ্ট তামাকের বড় আবশ্যক হয় না। প্রত্যেক জেলাতে পৃথক রকমের তামাক রপ্তানি করা হয়। পাবনা ও যশোহরে ফোস্কাযুক্ত কড়া ও ছোটপাতার তামাক আদরণীয় হইয়া থাকে। আবার ঢাকা ও বরিশাল—ঝালকাটীতে বড়পাতার তামাকেরই আদর বেশী। এই সকল স্থানে যে তামাক রপ্তানি হয়, তাহাতে ফোস্কা থাকার বড় আবশ্যক হয় না। শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম প্রভৃতি জেলাতে চেপ্টা-তামাকেরই চালান হইয়া থাকে।

তাম্রকূটপত্র-বিচার — বিভিন্ন জাতীয় তামাকের পত্র বিভিন্নপ্রকারের হয়। দেশী তামাক দৈর্ঘ্যে প্রস্থ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক লম্বা, পাতলা, কম আঁঠা ও বেশ ফোস্কাযুক্ত হয়। ব্রহ্মদেশবাসীরা ইহা বেশ পছন্দ করে। উজানী-তামাক দৈর্ঘ্যে প্রস্থের প্রায় দ্বিগুণ, মোটা, ভারী ও অধিক আঁঠাযুক্ত। স্থানবিশেষে ইহাতে বেশ ফোস্কা পড়ে। বাঁশদহ-তামাকপত্রের আকার অনেকটা দেশী ও উজানী তামাকের মাঝামাঝি রকমের হইলেও, ইহা দেশী তামাকেরই মত। কিন্তু উহার আয়তন ক্ষুদ্র, ফোস্কাযুক্ত এবং অত্যধিক দহনশক্তিসম্পন্ন হয়। ব্রহ্মদেশীয় লোকেরা, এই প্রকার তামাক বেশ সুস্বাদু বলিয়া বিবেচনা করে।

বীজ-বাছাই—উক্ত তিনপ্রকার তামাকেরই অন্তর্জ্জাতি আছে। কি প্রকারে বিভিন্নপ্রকার তামাক-চাষে বিস্তৃতিলাভ ঘটিয়াছে, তাহা বলা যায় না। কোনও কৃষকের তামাক-ক্ষেত্র পরীক্ষা করিলে, তাহাতেও নানাপ্রকারের গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন তামাকের বিভিন্ন প্রকার নামকরণ হয় সত্য, কিন্তু উহার কোন্‌টী কোন্

জাতীয়, অনেকসময় কৃষকেরা তাহা বলিতে পারে না—জানেও না। এই জন্যই তামাক-ক্ষেত্রে একই রকমের উৎকৃষ্ট তামাকের চাষ করিলেও যেরূপ ফলন হইবার ও মূল্যপ্রাপ্তির সম্ভাবনা, তাহার অন্যথা হইতে দেখা যায়। এইরূপ দোষের অপসারণ করিতে হইলে, বীজরক্ষার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। উৎকৃষ্ট গাছ বাছাই করিয়া ও উহার পুষ্পদণ্ড কাপড়ের থলিয়া দ্বারা ঢাকিয়া দিয়া, যাহাতে সঙ্কর উৎপাদন হইতে না পারে, তাহার চেষ্টা করা আবশ্যক।

মহাপণ্ডিত ডারুইণের মতে, তামাকের আত্মনিষেকই প্রাকৃতিক নিয়ম ; কিন্তু তথাপি, সময় সময় ভিন্ন জাতির পুষ্পপরাগ-নিষেকও হইয়া থাকে। এই বিষয়ে অন্যান্য শস্যের সহিত তামাকের বিশেষ অসামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, বহুকাল যাবৎ নিয়মিতরূপে বীজরক্ষা না করাতেই, এ দেশে অনেক সঙ্করজাতির সৃষ্টি হইয়াছে। নিম্নলিখিত দৃষ্টান্ত দ্বারা উহা বেশ বুঝা যাইবে।

(১) রঙ্গপুরের ভেঙ্গী, মেনা-ভেঙ্গী, গোদ্‌লা-ভেঙ্গী, শকুনী-ভেঙ্গী তামাক যে এক ভেঙ্গীরই বিভিন্ন অন্তর্জ্জাতি, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভেঙ্গী একটী প্রধান জাতি ; ইহার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ প্রায় সমান। মেনা (বড়) ভেঙ্গীর দৈর্ঘ্য প্রস্থ হইতে অধিক। গোদ্‌লা (মোটা) ভেঙ্গী দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে অপেক্ষাকৃত বড় ও অধিকতর স্থূল হয়। শকুনী-ভেঙ্গী দৈর্ঘ্যে গোদ্‌লা হইতেও বড় ও স্থূল।

(২) নাওথোল, পাটুয়াথোল ও হাঁসগলা পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, ইহারাও প্রায় একই রকম। নাওথোলের পত্রভাগ নৌকার আকৃতিবিশিষ্ট ; উহার মধ্যভাগ গভীর। পাটুয়াথোলের গভীরতা কম এবং হাঁসগলার বোঁটা অধিকতর লম্বা হয়। একজাতীয় তামাক হইতেই উক্ত ত্রিবিধপ্রকার অন্তর্জ্জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। এ দেশে স্বভাবতঃই অনেকপ্রকার সঙ্কর-জাতির সৃষ্টি হইয়াছে ও হইতেছে। তামাকের উৎকর্ষ সাধন করিতে হইলে, সর্ব্বপ্রকার নিকৃষ্ট সঙ্করজাতির বিলোপসাধন করিয়া, যাহাতে একই রকমের তামাক একই ক্ষেত্রে উৎপাদন করা যায়, তাহারই চেষ্টা করা আবশ্যক। ইহাতে তামাকের ফলন ও মূল্য অধিক হইবে।

শ্রীযামিনীকুমার বিশ্বাস।

কৃষির আবশ্যকতা ও আমাদের কর্ত্তব্য।

[শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম, এ, এস্ লিখিত।]

প্রবন্ধের সার-সংগ্রহ।

লোকসংখ্যার-বৃদ্ধিতে কৃষির আবশ্যকতা—কৃষিই মানবের মৌলিক শিল্প—কৃষিকার্য্যে অনুরক্তি—দৃষ্টান্ত-প্রদর্শন—(১) রাজর্ষি জনক, (২) ইজিপ্ত, গ্রীস, রোম, স্পেন প্রভৃতি দেশ, (৩) চীনসম্রাটের দৈনিক কৃষিপর্ব্বে ধান্য-বপন প্রভৃতি—মহাপুরুষ-বাণী—(১) ফরাসী সাধারণ-তন্ত্রের সভাপতি লুবে, (২) মার্কিণ-প্রেসিডেন্ট এব্রাহাম লিঙ্কন, (৩) জর্জ্জ ওয়াশিংটন—আমেরিকা ও কৃষি—জর্ম্মাণীর জাতীয় শক্তির ভিত্তিপ্রতিষ্ঠায় কৃষি—জাপানী শিল্প ও জাপানী কৃষি—মিকাদো-বাণী—কৃষিবৃত্তিতে ভূপালের বেগম সাহেবা—সামরিক প্রস্তাব—কৃষি-কলেজে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের অধ্যয়নার্থী পুত্র—জীবন-সংগ্রামে কৃষির স্থান—পেটের দায়ে কৃষি—আমাদের লক্ষ্য ও কর্ত্তব্য।

আমার বক্তব্য-বিষয় কৃষির আবশ্যকতা ও আমাদের কর্ত্তব্য। কৃষির আবশ্যকতা না বুঝিতে পারিলে, বর্ত্তমান বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিকসমস্যার যুগে, আমাদের কর্ত্তব্য কি তাহাও সম্যক বুঝিতে পারা যায় না। তাই আমার বক্তব্য-বিষয়টীকে প্রধানতঃ দুইভাগে প্রথমেই বিভক্ত করিয়া লইয়াছি।

আমরা অল্পাধিক পরিমাণে সকলেই কৃষির আবশ্যকতা বুঝি—স্বীকার করি। তথাপি বলিব—এদেশবাসীর জীবন-সংগ্রামে জয়যুক্ত হইবার পক্ষে কৃষিই একমাত্র অমোঘ অস্ত্র। সাময়িক যুদ্ধবিগ্রহ নাই, রোগ-শোক অথবা মড়ক কিছুই নাই, অথচ অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টির নিমিত্ত যে বৎসর

কৃষির অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় হয়, সে বৎসরই এ দেশের বহুসংখ্যক ব্যক্তিকে দুর্ভিক্ষের প্রপীড়নে অকালে কালকবলে নিপতিত হইতে দেখা যায়। ইহাতেই কৃষির গুরুত্ব উপলব্ধি হইতে পারে। সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই মানবের জীবিকার্জ্জনের উপায়নির্দ্ধারণ একটী বিষম সমস্যার বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। প্রকৃতিপ্রদত্ত উদ্ভিজ্জফলমূলে আদিমাবস্থায় সন্তুষ্টান হইলেও, লোকসংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই কৃষির আবশ্যকতা অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে।

বিভিন্ন দেশের প্রাচীনতমকালের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীতি জন্মে, কৃষি কত আদিম। বর্ত্তমান-যুগে শিল্প-বাণিজ্যই সভ্যতার মাপকাটী হইয়া দাঁড়াইয়াছে; কিন্তু অতি প্রাচীনকালে ইহার কিছুই ছিল না। তৎকালে, একমাত্র কৃষিই ছিল সভ্যতার মাপকাটী—কৃষিবৃত্তিতে যে দেশ যেরূপ উন্নত ছিল, পৃথিবীতে সে দেশই তদনুরূপ সভ্যদেশ বলিয়া ধর্ত্তব্য হইত। এক্ষণ কৃষক বলিতে যেমন নিরক্ষর, অকর্ম্মণ্য এবং কাণ্ডজ্ঞানবিহীন ব্যক্তিকে বুঝায়, তখন তেমন ছিল না। অধিকন্তু, কৃষি অতি পবিত্র ব্যবসায়মধ্যে পরিগণিত হইত। বস্তুতঃ, কৃষি যেরূপ নির্দ্দোষ ব্যবসায়, পৃথিবীতে সেইরূপ আর একটিও ব্যবসায় বর্ত্তমান নাই। ইহাতে মিথ্যা, চৌর্য্য, শঠতা প্রভৃতি অধর্ম্মের আদৌ স্থান নাই। কৃষিতে যে যেমন শরীর খাটাইবে, সে তদনুপাতে পুরস্কৃতও হইবে। এখন আমরা কেতাবের দু'পাতা পড়িয়াই যেমন কৃষিকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে লজ্জাবোধ করি, তজ্রূপ অনুচিত লজ্জা সভ্যজগতের ক্ষুত্রাপিও পরিলক্ষিত হয় না।

যখন কৃষিতে আমাদের শ্রদ্ধা ছিল, যখন রাজর্ষি জনক প্রমুখাৎ কৃষিতে তৃপ্তিবোধ করিতেন, তখন আমরাও সুসভ্য ছিলাম। এখন আমাদের কৃষিতে অবজ্ঞা, অথচ সামান্য চাকুরীরদিকে লোলুপদৃষ্টি রহিয়াছে। ফলে, আমরা সর্ব্বপ্রকারেই পরমুখাপেক্ষী হইয়া পড়িয়াছি। আমাদের মত পরমুখাপেক্ষী জাতি অসভ্য বা অর্দ্ধসভ্য বলিয়া বিবেচিত না হইবে কেন? একমাত্র কৃষির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে গিয়াই যে, আমরা জগতে উপেক্ষিত হইয়াছি, তাহা নিঃসন্দেহেই বলা যায়।

ঈজিপ্তও কৃষিতে নির্ভর করিয়া একদিন সভ্যতার চরম-শিখরে অধিরোহণ করিয়াছিল। গ্রীস, রোম এবং স্পেনের ইতিহাসও বোধ হয় আমাদের শিক্ষিত-সমাজের অবিদিত নহে। বলা বাহুল্য, এই সকল দেশও কৃষির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই চরমোন্নতি লাভ করিয়াছিল। ধান্যকৃষির ইতিহাসে দেখিতে পাই, খৃষ্টজন্মের দুই হাজার আট শত বৎসর পূর্ব্বেও, চীনদেশে একটি কৃষি-সম্পৃক্ত পর্ব্বের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সেই পর্ব্বে সম্রাট স্বহস্তে কোনও বিশেষ রকমের ধান্য ক্ষেত্রে বপন করিতেন; এবং তৎপর, দেশস্থ কৃষকগণ স্বীয় স্বীয় ক্ষেত্রে ধান্য বপন করিত। ইহা চৈনিক সম্রাট ও চীনবাসীর কৃষি-প্রীতিরই সমাক্ পরিচায়ক। বস্তুতঃ, এইরূপ অত্যধিক কৃষি-প্রীতির ফলেই চীনদেশও একদিন অত্যুন্নতি লাভ করিতে পারিয়াছিল।

প্রাচীনকালের কথা ছাড়িয়া, যদি বর্ত্তমানেরদিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, তাহা হইলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, কৃষি কোনক্রমেই অবজ্ঞার বস্তু নহে। ফরাসী সাধারণ-তন্ত্রের সভাপতি (President) লুঁবে কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণকালে বলিয়াছিলেন—"জীবনের অবশিষ্টভাগ পবিত্র কৃষিকর্ম্মে অতিবাহিত করিব।" মার্কিণ-যুক্তরাজ্যের সভাপতি প্রাতঃস্মরণীয় এব্রাহাম লিঙ্কন, জর্জ্জ ওয়াশিংটন প্রভৃতি কৃষকসন্তান ছিলেন; এবং তাঁহারা স্বহস্তে কৃষি-কার্য্য করিয়া বিশেষ তৃপ্তিবোধ করিতেন। বেশী দিনের কথা নহে, প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট তাঁহার বিদায়-ভোজে ফরাসী প্রেসিডেণ্ট লুঁবের উক্তির অনুরূপ অভিমতই প্রকাশ করিয়াছিলেন।

অনেকেই হয়ত অবগত আছেন যে, আমেরিকার যুক্তরাজ্য নূতন দেশ। এখনও ইহার বয়স—সুসভ্যজাতির অধিবাসের পর—দেড়শত বৎসর অতিক্রম করে নাই। কিন্তু তথাপি, কৃষিবলে সে দেশ এত বলীয়ান হইয়া উঠিয়াছে যে, তদ্দেশবাসীরা পৃথিবীর অনেক দেশকেই নগদ মূল্যে ক্রয় করিতে পারে।

আমাদের রাজশত্রু জার্ম্মেনীরও কি জাতীয়-শক্তির মূলভিত্তি কৃষি নহে? পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বে জার্ম্মেনীর অবস্থা কিরূপ ছিল; তাহা অনুসন্ধান ও পর্য্যালোচনা

করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, সে দেশও কৃষিপ্রাণ ছিল।

আজ ভারতের লোকে ঘরে ঘরে জাপানী শিল্পের অব্যাহত গতি ও প্রাচুর্য্য, উপলব্ধি করিতেছে। ফলে, অনেকেরই দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিয়াছে—জাপান শিল্প-প্রধান-দেশ, এবং একমাত্র শিল্পের উপর নির্ভর করিয়াই, জাপান উন্নতির চরমশিখরে উত্থিত হইয়াছে। বস্তুতঃ, ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বিশ্বাস। জাপান শিল্পসম্পর্কে বহির্জ্জগতে অনেকাংশে পরিচিত হইলেও এবং সমগ্র দেশের শতকরা পনরভাগ মাত্র চাষ-বাসের উপযোগী হইলেও, জাপানকে কৃষিপ্রধান-দেশ বলা যায়। কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে, যখন এই প্রবন্ধলেখক সেই দেশেই অবস্থান করিতেছিল, তখন জাপসম্রাট (মিকাদো) এক সভায় বলিয়াছিলেন,—"কৃষি এখনও আমাদের দেশের প্রধান শিল্প; এবং কৃষককুল আমাদের জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ডস্বরূপ।" বাস্তবিক পক্ষে, এখনও জাপানবাসীর শতকরা ৬৫ জন কৃষিকার্য্যে লিপ্ত রহিয়াছে। নব্যজাপানের অভ্যুদয়-কর্ত্তা প্রবল প্রতাপান্বিত সম্রাট্ মিংছুহিতো তেন্নো প্রতিদিন স্বহস্তে স্বীয় কক্ষপার্শ্বস্থ উদ্যানের বৃক্ষলতায় জলসেচন করিতেন। আমাদের প্রাচীন ভারতেও, যে সকল ঋষির পদতলে রাজাধিরাজ অষ্টাঙ্গে প্রণত হইতে পারিলেও জীবন সার্থক বোধ করিতেন, তাঁহাদের পুত্রকন্যা-কলত্র সকলেই যে তপোবনের পাদপনিচয়েরও উক্তরূপে পরিচর্য্যা করিতেন, তাহা কাহারও অজ্ঞাত নহে।

প্রায় তিনবৎসর পূর্ব্বে, ভূপালের বেগম সাহেবার সঙ্গে বিশেষ কোনও কার্য্যোপলক্ষে আমার দুই ঘণ্টাকাল কৃষিসম্পর্কে নানারূপ আলোচনা হয়। বেগম সাহেবার সবিশেষ পরিচয় দেওয়া বোধ হয় অনাবশ্যক। তিনি বর্ত্তমানসময়ে কি হিন্দু কি মুসলমান সকল জাতির মধ্যেই একজন শ্রেষ্ঠা রমণী। তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি যিনি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, তিনিই তাঁহাকে বর্ত্তমান ভারতের অতুলনীয়া ললনা বলিয়া গণ্য করিবেন। কৃষিতে তাঁহার অনুরাগের কথা উল্লেখ করিয়া, তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন,—তিনি প্রত্যহ সকালে ও বিকালে এক ঘণ্টা করিয়া স্বীয় বাগানের কার্য্যে লিপ্ত রহেন। যে দিন তাঁহাকে স্থানান্তরে অন্য কোনও কার্য্যে আবদ্ধ থাকিতে হয়, সে দিনও তিনি মনে করেন, যেন তাঁহার কি একটা গুরুতর কার্য্য অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল। দীর্ঘ আলোচনায় যাহা বুঝিলাম, তাহাতে তাঁহার প্রতি আমার ভক্তির মাত্রা যার-পর-নাই বাড়িয়া গেল। পক্ষান্তরে, অহঙ্কারে স্ফীতবক্ষ, অর্দ্ধশিক্ষিত, ধনমদমত্ত যে সকল ব্যক্তি সুপবিত্র কৃষিকার্য্যকে বর্ব্বরের কার্য্য মনে করিয়া কৃষকদের সহিত মিলিতে-মিশিতেও ঘৃণা বোধ করেন, তাঁহাদের গুরুত্ব ও মনুষ্যত্বের পরিমাণ কতটুকু তাহাও বুঝিবার বাকী রহিল না।

এক্ষণ অবস্থায় সংক্ষেপে আমাদের কর্ত্তব্যসম্পর্কে দু'একটা কথার প্রসঙ্গ উত্থাপন করা অত্যাবশ্যক মনে করি। পাঠক বুঝিতে পারিয়াছেন যে, কৃষি ঘৃণিত কার্য্য ত নহেই, বরং অতি পবিত্র কার্য্য। ইহাতে অপরের এক কপর্দ্দকেরও ক্ষতি না করিয়া—সম্পূর্ণ সৎপথে রহিয়া, পবিত্রভাবে ও সুখস্বচ্ছন্দে জীবন অতিবাহিত করিতে পারা যায়। লাঙ্গলের খুঁটী ধরিলে জাতিচ্যুত—সমাজ বহির্ভূত এবং নরকে পতিত হইবার ভয় নেহাৎ উন্মাদের উক্তির ন্যায়ই মনে হয়। পশ্চিম-অঞ্চলে, বিশেষতঃ রাজপুতনার ব্রাহ্মণসন্তানেরা (যাঁহারা আপনাদিগকে বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ অপেক্ষা সর্ব্বাংশেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করেন) অদ্যাপিও স্বহস্তে হলচালনা করেন। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবর হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নাম কাহারও অবিদিত নহে। তাঁহার ন্যায় সুপণ্ডিত ও ব্রাহ্মণেরাই হিন্দু-সমাজের রক্ষাকর্ত্তা এবং ব্যবস্থাপক। পাঠক শুনিয়া সুখী হইবেন, উক্ত শাস্ত্রী মহাশয়ের পুত্র আজ কএকবৎসর যাবৎ কৃষি-কলেজে অধ্যয়ন করিতেছেন। বলা বাহুল্য, কৃষি-কলেজে যিনি অধ্যয়ন করেন, তাঁহাকে কৃষকের কার্য্যই শিক্ষা করিতে হয়। কৃষি যদি নীচকার্য্য হইত, তাহা হইলে সুপণ্ডিত শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার পুত্রকে কখনও কৃষি-কলেজে অধ্যয়ন করিতে দিতেন না।

এক্ষণ আমার বক্তব্য এই, কৃষিকার্য্যে সকলেই হস্তক্ষেপ করিতে পারেন; এবং জীবিকার্জ্জনের জন্য যেরূপ ঘোর প্রতিযোগিতার কাল পড়িয়াছে, তাহাতে সকলেরই সাগ্রহে

কৃষিতে অনুরক্ত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। চোখে আঙ্গুল দিয়া কর্ত্তব্য বুঝাইবার দিন অতিবাহিত হইয়াছে। এক্ষণ স্বীয় স্বীয় স্বার্থের নিমিত্ত নিজের কর্ত্তব্য নিজে নির্দ্ধারণ করিতে শৈথিল্য চলে কি? স্বীয় ধর্ম্ম বজায় রাখিয়া মহা সুখ-স্বচ্ছন্দে জীবিকানির্ব্বাহ করিতে হইলে, এ দেশবাসীর যে একমাত্র কৃষি ভিন্ন গত্যন্তর নাই, তাহা দৃঢ়তার সহিতই বলা যাইতে পারে। আমাদের সম্রাটের জাতির কত উচ্চপদস্থ সাহেব ও তাঁহাদের মেমদিগকে আমাদের সম্মুখে প্রতি-নিয়ত তাঁহাদের দৈনিক কত গুরুতর কার্য্যসম্পাদনের পরও, অবসর সময়টুকুতে স্বীয় স্বীয় উদ্যানস্থ উদ্ভিদ-পরিচর্য্যায় নিযুক্ত দেখিতে পাই। তাঁহারা ততটুকু না করিলেও তাঁহাদের তেমন কিছু আইসে যায় না। তাঁহারা কৃষি-প্রীতিবশে যাহা করেন, আমরা পেটের দায়েও কি আগ্রহের সহিত ততটুকু করিতে পারি না? বাড়ীর চতুষ্পার্শ্বস্থ তৃণ-জঙ্গলাচ্ছাদিত পতিত ভূমিটুকু পরিষ্কার করিয়া লইয়া, তাহাতে আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় শাক-সব্জী প্রভৃতির চাষ করাও কি আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে?

পাঠকগণ আসুন, আমাদের প্রত্যেকেরই যতটুকু জমি পতিত রহিয়াছে, তাহা বেশ সুন্দরভাবে শস্যক্ষেত্রে পরিণত করি; যেস্থলে এবং যেসময়ে যেরূপ শস্যের বীজ বপন বা চারা রোপণ করা কর্ত্তব্য, 'যো' বুঝিয়া তদ্রূপ শস্যচাষেই সচেষ্ট হই; অনুর্ব্বর ভূমিকে কৃত্রিম উপায়ে উর্ব্বর করিয়া লই; মূলধনের অভাব হইলে, দশজনে মিলিয়া-মিশিয়া সমবায়-পদ্ধতিতে কার্য্য আরম্ভ করি; সুবিধা ঘটিলে কৃষিতে প্রয়োজনানুরূপ কল-কব্জা প্রবর্ত্তন করিতে আরম্ভ করি; এবং আমাদের অশিক্ষিত কৃষকদিগের আদর্শস্থলবর্ত্তী হইয়া, তাহাদিগকে উন্নত-প্রণালীতে চাষ-বাস শিক্ষা দেই। বাঙ্গালার সর্ব্বত্রই অনেক অনাবাদী পতিত জমি আছে; প্রায় প্রতি জিলায়ই হাজার হাজার বিঘা জমি এমন অবস্থায় রহিয়াছে, যাহা সহজেই কৃষি-কার্য্যোপযোগী করিয়া তুলিতে পারা যায়। স্থলবিশেষ আবার গোচারণ-ভূমির পক্ষে বিশেষ উপযোগী। দশে মিলিয়া এই সকল অনাবাদী স্থান গোচারণ মাঠে পরিণত করিয়া তুলিতে পারিলে, ধ্বংসোন্মুখ গোরক্ষারও একটা উপায় হইতে পারে। যে ভাবেই হউক, দেশের কৃষক ও কৃষির উন্নতিসাধন করা এবং গোরক্ষা—এই দুইটাই আমাদের জাতীয় উন্নতি এবং বর্ত্তমান অন্ন-সমস্যা-সমাধানের একমাত্র সহজ পন্থা। সুতরাং, কর্ত্তব্যবোধেই আমাদিগকে ঐ সকল কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে।

চাকুরীর অভাবে—পেটের দায়ে, অথবা কর্ত্তব্যবোধে আজকাল অনেক ভদ্রসন্তানই কৃষিকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। তাঁহারা যে সকল কৃষকসন্তানকে ১২৲।১৪৲ মাহিয়ানায় নিয়োগ করিয়া থাকেন, তাহাদের অধিকাংশই কর্ত্তব্যজ্ঞানবিহীন, কৃষি-কার্য্যে অনভিজ্ঞ এবং অলস। এইরূপ অকর্ম্মণ্য লোকের উপর নির্ভর করিয়া রহেন বলিয়াই, কেহ কেহ কৃষিকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াও ক্ষতিগ্রস্ত হ'ন। চাষের কাজে সুফললাভ করিতে হইলে, চাষার নেশা লইয়া হাতে-হেতেড়েই সকল কার্য্য করিতে হয়। শুধু ঘরে বসিয়া 'বাত পুছিলে' চলে না। বেতনভোগী কয়জন লোক যথোচিত আগ্রহের সহিত আপনার কাজ মনে করিয়া মনিবের কার্য্য করিয়া থাকে? ১৪৲ কি ১৫৲ টাকা বেতনের একজন কৃষাণ যে কার্য্য করে, আপনার বোধে হাতে-হেতেড়ে কার্য্যভার গ্রহণ করিলে, প্রত্যেক ভদ্র-সন্তানই যে তাহার দ্বিগুণ বা ততোধিক কার্য্যও করিতে পারেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে স্বাধীনভাবে কৃষিবৃত্তি পরিচালনার পরিবর্ত্তে, আমরা ১৫৲ কি ২০৲ টাকা মাহিয়ানার চাকুরীর প্রলোভনে পরের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াই কেন? চাকুরীতে আত্মসম্মান বিসর্জ্জন দিতে হয়, পরের অঙ্গুলিনির্দ্দেশে পুত্তলিকাবৎ পরিচালিত হইতে হয়। তাহার কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম ঘটিলেই, লাঞ্ছিত হইয়া চাকুরীর মায়া ছাড়িয়া দিতে হয়; এবং তদবস্থায় অন্নবস্ত্রের যোগারে চোখে 'সরিষাফুল ফোটে'। এমতাবস্থায় কৃষির আবশ্যকতা ও আমাদের কর্ত্তব্য কি, তাহা সহজেই অনুমেয়।

শ্রীযদুনাথ সরকার।

Printed by Jatindra Mohan Das at the Wari Printing Works, Dacca and published by Nishi Kanta Ghosh at the "Krishi-Sampada" office, 66 Narinda, Dacca.

কৃষি-সম্পদ

কৃষি, কৃষি-শিল্প এবং যৌথ ঋণ-দান-সমিতি-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নূতন ধরণের সচিত্র মাসিক পত্র।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩৲ মাত্র।

প্রবন্ধ-সম্পদে অতুলনীয়, চিত্র-সৌন্দর্য্যে
অপূর্ব্ব ও সর্ব্বত্র উচ্চ-প্রশংসিত
বাঙ্গালার কৃষি-বিষয়ক
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও বৃহত্তম পত্র।

লেখক—"কৃষি-সম্পদে" রহিয়াছেন—

আমেরিকা-প্রত্যাগত শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী বি, এ, এম, এস, এ।
" " শ্রীযুক্ত দ্বিজদাস দত্ত এম, আর, এ, সি,
" " " অনাথবন্ধু সরকার এম, এ, সি, এস,
জাপান-প্রত্যাগত শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম, এ, এস।
" " " রসিকরঞ্জন ঘোষ এম, এস, এ।
" " " মন্মথনাথ দে " " "
" " " যোগেশচন্দ্র চৌধুরী " " "
" " মিঃ এ, সি, ঘোষ এম, এ, এস্।
" " " এন্, এল, দত্ত " " "
" " ডাঃ পি, কে, বিশ্বাস পি এইচ, ডি।
ফ্রান্স-প্রত্যাগত শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস এম, ই
" ঈশ্বরচন্দ্র গুহ এফ, আর, এইচ, এস্
" প্রবোধচন্দ্র দে " " " "
" রাজেশ্বর দাসগুপ্ত এম, আর, এ, এস
" প্রকাশচন্দ্র সরকার " " " "
" রঘুনাথ দাস জি, বি, ভি, সি
" কামিনীকুমার লাহিড়ী B. A. G.
" হেমচন্দ্র দেব (মেডিকো বোটানিষ্ট)

রংপুর গবর্ণমেণ্ট কৃষি-পরীক্ষাক্ষেত্রের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত যামিনীকুমার বিশ্বাস বি, এ, কটক গবর্ণমেণ্ট কৃষি-পরীক্ষাক্ষেত্রের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত রাজনাথ রায় বি, এ, ঢাকা-বিভাগের স্কুল-ইন্‌স্পেক্টার রায় সাহেব শ্রীযুক্ত প্রমোদ কুমার বসু এম, এ, আমেরিকার বার্কলী কৃষি-কলেজের শ্রীযুক্ত স্বর্ণকুমার মিত্র, শ্রীযুক্ত নিরুপমচন্দ্র গুহ প্রভৃতি।

বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী।

১। "কৃষি-সম্পদে" তিনমাসের কম কোনও বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় না।

২। অশ্লীল বিজ্ঞাপন গ্রহণ করা হয় না।

৩। একাদিক্রমে তিনমাস, বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইলে পর, বিজ্ঞাপনদাতা ইচ্ছা করিলে তাহার পরিবর্ত্তন করিতে পারেন।

৪। চুক্তির সময় পূর্ণ হইবার ১৫ দিবস পূর্ব্বে বিজ্ঞাপন বন্ধ করিবার নিষেধ-পত্র না পাইলে, পূর্ব্বোক্ত রূপে বিজ্ঞাপন চলিবে এবং এ বিষয়ে বিজ্ঞাপনদাতার মত আছে বুঝিয়া লওয়া হইবে।

৫। অন্য কোনরূপ চুক্তির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের সহিত বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

৬। "কৃষি-সম্পদ" সম্বন্ধীয় সমস্ত চিঠি-পত্র, প্রবন্ধ, বিনিময়ের সংবাদ-পত্র, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি "কৃষি-সম্পদ" পত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত ঘোষের নিকট কৃষি-সম্পদ আফিস, ৬৬নং নারিন্দা, ঢাকা—এই ঠিকানায় এবং টাকাকড়ি আমার নামে পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয়—
৬৬নং নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীরমনীকান্ত ঘোষ
কার্য্যাধ্যক্ষ।

বিজ্ঞাপনের হার।

১। "কৃষি-সম্পদে" বিজ্ঞাপনের হার সুলভ। মাসিক প্রতিপৃষ্ঠা ৯৲ টাকা; প্রতিকলম ৪৲ টাকা। সিকি কলম ২৷৹ টাকা; ⅛ কলম ১৷৹ টাকা।

২। কাভারিং-এর দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ পৃষ্ঠায়ও বিজ্ঞাপন গৃহীত হইবে। দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় মাসিক ১০৲, ৩য় পৃষ্ঠায় ৮৲ টাকা এবং চতুর্থ পৃষ্ঠায় ১২৲ টাকা দেয়।

ক্রোড়পত্র ৮ পৃষ্ঠা মাসিক ৩০৲ টাকা, ৪ পৃষ্ঠা ২০৲ ২ পৃষ্ঠা ১২৲ টাকা এবং ১ পৃষ্ঠা—১০৲ টাকা মাত্র।

বাৎসরিক চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

আমাদের বিজ্ঞাপনের দর-দস্তুর নাই—ইহাই নির্দ্দিষ্ট নিয়ম।

বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

কৃষি-তত্ত্বের বহুল প্রচার-কামনায়, বিগত ১৩১৭, ১৩১৮, ও ১৩১৯—

এই তিন সালের "কৃষি-সম্পদ" অর্দ্ধমূল্যে প্রদত্ত হইবে।

স্মরণ রাখিবেন—

এ আশাতীত সুযোগ অধিক দিন স্থায়ী হইবে না।

প্রথম বর্ষের অর্থাৎ ১৩১৭ সালের "কৃষি-সমাচারে" ("কৃষি-সম্পদের" প্রথমবর্ষে নাম ছিল "কৃষি-সমাচার") ন্যূনপক্ষে ৫০টীরও অধিক তথ্যবহুল কৃষি-প্রবন্ধে এবং ৫০টী কৃষি-প্রসঙ্গে নানা কৃষি-কথা আলোচিত হইয়াছে। ইহাতে ১৫ খানি হাফ্‌টোন ছবি ও ৬ খানি লাইন ব্লক আছে।

দ্বিতীয় বর্ষের অর্থাৎ ১৩১৮ সালের "কৃষি-সম্পদে" ৪৫টী প্রবন্ধ ও ধারাবাহিক প্রবন্ধের আকারে প্রকাশিত ৪ খানি গ্রন্থের কতকাংশ প্রকাশিত হইয়াছে। কৃষি-প্রসঙ্গের সংখ্যাও অন্যূন ৭৫টী হইবে। প্রত্যেক প্রবন্ধ গড়ে কৃষি-সম্পদের ৮ পৃষ্ঠাব্যাপী হইয়াছে। সুতরাং কোন প্রবন্ধের কলেবরই ক্ষুদ্র হয় নাই। ১২শ সংখ্যায় মোট ২১ খানি হাফ্‌টোন ছবি প্রকাশিত হইয়াছে।

তৃতীয় বর্ষের অর্থাৎ ১৩১৯ সালের "কৃষি-সম্পদে" ৬৫টী কৃষি-প্রবন্ধ ও ৪৩টী কৃষি-প্রসঙ্গ প্রকাশিত হইয়াছে। এই বৎসরে ৪৮ খানি চিত্র রহিয়াছে। তন্মধ্যে ৪৭ খানাই কৃষি-চিত্র, এবং ৩০ খানাই এক পৃষ্ঠাব্যাপী।

পুস্তকের হিসাবে, এই তিন বৎসরের প্রত্যেক বর্ষের "কৃষি-সম্পদকে" প্রায় এক হাজার পৃষ্ঠার একখানি কৃষি-গ্রন্থ বলা যায়। এইরূপ একখানি সচিত্র পুস্তকের মূল্য ১০৲ টাকার কম হয় না। সুতরাং তিন বৎসরের "কৃষি-সম্পদকে" ৩০৲ টাকা মূল্যের একখানি বিরাট কৃষি-গ্রন্থ বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। কিন্তু আপনি ডাকমাশুলসহ ৫৲ টাকা পাঠাইয়া দিলেই, ৩০৲ টাকার সমান বিগত ১৩১৭, ১৩১৮, ১৩১৯ সালের—এই তিন বৎসরের তিন সেট কৃষি-সম্পদ প্রাপ্ত হইবেন।

অদ্যকার ডাকেই টাকা পাঠাইয়া দিউন—

উক্ত তিন বৎসরের পত্রিকার অর্দ্ধমূল্য ও রেজেষ্টরী করিয়া পাঠাইবার ব্যয় বাবদ মাত্র ৫৲ টাকা মানি অর্ডার করিয়া পাঠাইয়া দিলেই, ঘরে বসিয়া আপনি তিন বৎসরের পত্রিকা প্রাপ্ত হইবেন। মূল্য অগ্রিম পাঠাইতে হইবে। পুরাতন "কৃষি-সম্পদ" ভিঃ পিঃ ডাকে পাঠাইতে পারিব না।

নামমাত্র ৫৲ টাকা পাঠাইয়া দিয়া—

এ অমূল্য রত্ন সংগ্রহ করিয়া রাখুন ; ইহাই আমাদের বিনীত অনুরোধ। অল্পসংখ্যক পত্রিকা আছে।

টাকা পাঠাইবার ঠিকানা—শ্রীনিশিকান্ত ঘোষ। কৃষি-সম্পদ আফিস, ঢাকা।

Selected by the Director of Public Instruction, Bengal, for use in Schools, Colleges and Attached Hostels (Cal. Gazette, 2nd Oct. 12).

Krishi-Sampad, শ্রাবণ, ১৩২৩

Vol. VII. No. IV. ৭ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা।

কৃষি-সাহিত্য-সম্মিলন-সংখ্যা—

(রঙ্গপুর-কৃষি-সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত প্রবন্ধ-চতুষ্টয়)

কৃষি-সম্পদ

একমাত্র কৃষিবিষয়ক মাসিক পত্র।

শ্রীনিশিকান্ত ঘোষ কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

"I am glad to know that in other directions the agricultural practice of India has improved. The cultivator has always been patient, laborious and skilful, though his methods have been based upon tradition. Latterly the resources of science have been brought to bear upon agriculture and have demonstrated in a very short time the great results that can be secured by its application."

H. M. The KING EMPEROR.

কৃতজ্ঞতা স্বীকার।

রংপুর-কৃষি-সাহিত্য-সম্মিলনকর্তৃপক্ষ মহোদয়েরা অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক সম্মিলনে পঠিত প্রবন্ধগুলি "কৃষি-সম্পদে" প্রকাশ করিতে দিয়াছেন। তজ্জন্য, এ স্থলে, তাঁহাদের নিকট আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। সকল প্রবন্ধ একবারে প্রকাশ করাই আমাদের অভিপ্রেত ছিল; কিন্তু দৈব-দুর্ঘটনায় বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়াতে আমাদের অভিপ্রায়ানুযায়ী কার্য্য সম্পন্ন হইল না। এ জন্য আমরা বিশেষ দুঃখিত। আশা করি সম্মিলনকর্তৃপক্ষও আমাদের অনিচ্ছাকৃত ত্রুটী ক্ষমা করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

বিনয়াবনত—

ম্যানেজার, কৃষি-সম্পদ।

অন্নং বহু কুর্ব্বীত ॥ তদ্‌ব্রতম্ ॥

তৈত্তিরীয়োপনিষদি ভৃগুবল্লী।

সূচী।

[লেখকদিগের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।]

বিষয়	পত্রাঙ্ক
কৃষি-কথা ... ... —শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দে এফ্, আর, এইচ, এস	৮৯
কৃষি ও কৃষক ... ... —শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র গুহ এফ্, আর, এইচ, এস	৯৭
কৃষকের শোচনীয় অবস্থা ... ... —শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ সান্যাল বি, এল্	১১২

দ্রষ্টব্য।

বর্ত্তমান সংখ্যাতে এক ফর্ম্মা অধিক দিয়াও, রঙ্গপুর-কৃষি-সাহিত্য সম্মিলনের প্রথম বার্ষিক অধিবেশনের পঠিত প্রবন্ধচতুষ্টয়মধ্যে তিনটির অধিক প্রকাশ করিতে পারা গেল না। সুতরাং অবশিষ্ট 'কৃষি-শিক্ষা ও গোরক্ষা' নামক প্রবন্ধটি ভাদ্র ও আশ্বিনের যুগ্মসংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

ম্যানেজার, কৃষি-সম্পদ।

কৃষি-কথা।

[শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দে এফ্, আর, এইচ, এস্ মহাশয়ের লিখিত।]

বিহিত সম্মানপুরঃসর নিবেদন—

উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন-সংশ্রবে, কৃষি-সাহিত্যের আলোচনার উদ্দেশ্যে, আপনারা যে একটী বিশেষ কৃষি-সভার আয়োজন করিয়াছেন, এ জন্য সমগ্র বঙ্গবাসী আপনাদিগের নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিবে বলিয়াই আমার মনে হয়। অতঃপর, উক্ত সভার অধিবেশনে উপস্থিত হইবার জন্য মৎসদৃশ ক্ষুদ্রজনকে আহ্বান করিয়া, আপনারা আমাকে একান্ত অনুগৃহীত করিয়াছেন। তজ্জন্য আমি আপনাদিগকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। কিন্তু নিতান্ত পরিতাপের বিষয় যে, বিগত দ্বাদশমাসব্যাপী স্বল্পকালমধ্যে, আমি চারিটী অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বিয়োগে কাতর হইয়া পড়িয়াছি; এবং তাহারই অনিবার্য্য ফলে, শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতা এত অধিক হইয়াছে,—চিত্ত এত চঞ্চল রহিয়াছে যে, আপনাদের সভাক্ষেত্রে উপস্থিত হওয়া, আমার

পক্ষে, একেবারেই অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। তাহা হইলেও, যে কৃষির জন্য ক্রমাগত বিগত ত্রিশবৎসরকাল, সময়ে অসময়ে, অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়াছি,—দেশবাসীদিগকে কৃষিকার্য্যে মনোযোগী হইবার জন্য তারস্বরে চিৎকার করিয়াছি, এবং বাঙ্গালাভাষায় কৃষি-সাহিত্যের সেবা করিয়া আসিতেছি, আজ সেই কার্য্যে আপনাদিগকে সমষ্টিভাবে ব্রতী দেখিয়া কত তৃপ্তিলাভ করিলাম, তাহা বর্ণনাতীত।

বৃত্তি বা পেশা হিসাবে, আমি কৃষিকর্ম্মোদ্যিত নহি। বিগত ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে, 'ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং ও প্ল্যান্টিং' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকার অনুষ্ঠাতা ও সম্পাদক মিঃ সেণ্ট জন্ জ্যাকসনের তত্ত্বাবধানে, আমি উদ্যানতা শিক্ষা করি; এবং সেই উদ্যানতাই আমার বৃত্তি। কার্য্যগতিকে আমাকে কৃষিকার্য্যবিষয়ে মনোনিবেশ করিতে হয়। আমি প্রথমতঃ মুরসিদাবাদ নওয়াব-সরকারে, এবং তৎপরে, ঘারবঙ্গ-রাজ সরকারে কৃষি ও উদ্যান-বিভাগের তত্ত্বাবধায়কতা করি। এই সূত্রে মুরসিদাবাদে থাকিতে কৃষি ও উদ্যানতা সম্বন্ধে বাঙ্গালাভাষায় কি পুস্তক বা কি পত্রিকা ছিল, তাহার অনুসন্ধান করি। কিন্তু তাহাতে ব্যর্থমনোরথ হইয়া, ইংরেজি পুস্তক ও পত্রিকাদির সাহায্য লই। সেই সকল পুস্তকাদির সাহায্য না পাইলে, আমি যে অগ্রসর হইতে পারিতাম না, তাহা বলাই বাহুল্য। অতঃপর, যে যে সরকারে উদ্যান-বিভাগের তত্ত্বাবধায়কের কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছিলাম, সেই সকল সরকারে উদ্যান-বিভাগের জন্য যথেষ্ট অর্থ মঞ্জুর ছিল; বিশেষতঃ, লোকজনেরও অভাব ছিল না এবং তত্ত্বাবধায়করূপে কার্য্যসম্পাদনেরও প্রচুর ক্ষমতা ছিল। তদ্ভিন্ন, কৃষিকার্য্যশিক্ষালাভ করিবার জন্য—সে বিষয়ে স্বদক্ষ হইবার জন্য—নিজেরও যথেষ্ট অধ্যবসায় ও সখ ছিল। যতই ভিতরে প্রবেশ করিতে লাগিলাম, ততই সখ ও চেষ্টা বাড়িতে লাগিল। এই সময় হইতে ধান্য গোধূমাদি মেঠোফসল, আলু-বেগুনাদি তরকারী এবং আম-কাঁঠালাদি ফল প্রভৃতি চাষবিষয়ে মনোযোগী হইয়া, আমি নানাভাবে অশেষবিধ পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হই। কৃষি-পরীক্ষার বিষয় ও ফলাফল একখানি খাতায় 'নোট' করিয়া রাখিতাম; এবং সময়ে সময়ে, "Englishman," "Pioneer," "Agri-Horticultural Society's Journal," "Amrita Bazar Patrika" প্রভৃতি ইংরাজী পত্রিকায়, এতৎসম্বন্ধীয় অনেক প্রবন্ধ লিখিতাম। এজন্য সাহেবদিগের নিকট হইতে যথেষ্ট উৎসাহ পাইতাম। সাহেবেরা এ সকল বিষয়ের মর্য্যাদা বুঝিতে পারেন; সুতরাং আদর করিতেও জানেন। আমার উৎসাহ দিন দিন বাড়িয়া গেল। একদিন সহসা মনে হইল যে, ইংরাজীতে প্রবন্ধ লিখিলে, তদ্দ্বারা দেশের বা জাতীয় ভাষার কোনও উপকার নাই; তবে এ পণ্ডশ্রম করি কেন? ভাবিয়া দেখিলাম যে, আমার যৎকিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা আমার দেশবাসীর ও বঙ্গভাষা-জননীর প্রাপ্য। জন্মভূমির ক্রোড়ে লালিতপালিত হইয়াছি—জন্মভূমির স্তন্যপান করিয়া শরীরের বলাধান, মনের পরিপুষ্টি ও মস্তিষ্কের বিকাশ হইয়াছে। সুতরাং, প্রত্যেকব্যক্তির কার্য্য, অভিজ্ঞতা ও কার্য্যফল—এ সকলের উপর দাবী সর্ব্বাগ্রে দেশবাসীর ও ভাষা-জননীর। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে, মুরসিদাবাদে থাকিতে, বাঙ্গালাভাষায় "হিতবাদী", "বঙ্গবাসী", "সঞ্জীবনী", এবং ক্রমে "কৃষক" পত্রিকায় নিয়মিতভাবে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিতে প্রবৃত্ত হই। সংবাদপত্রে আমার প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পর হইতেই, আমি দেশের নানাদিক্ হইতে পত্র পাইতে লাগিলাম;—অনেকেই কৃষি ও উদ্যান বিষয়ে অনেক প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। ব্যক্তিগত-ভাবে সকলের পত্রের উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল। অতঃপর, সেই সকল প্রশ্নমধ্যে সাধারণের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি অবলম্বন করিয়া প্রবন্ধ লিখিতে লাগিলাম। তখন মনে হইল, দেশ ইহা চাহে। সুতরাং, আর কালবিলম্ব না করিয়া, প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি সংগ্রহ করি এবং পুস্তক রচনা করিতে প্রবৃত্ত হই। এইরূপে আমার প্রথম পুস্তক "কৃষিক্ষেত্র" (১ম ও ২য় খণ্ড একত্রে) প্রকাশিত হইল। ইহাতে দেশে যেন একটা সাড়া পড়িয়া গেল। দেশ বিদেশ হইতে বহুলোক আশীর্ব্বাদ ও বহুলোক আমার মঙ্গলকামনা করিয়া, আমার নিকট পত্র লিখিতে লাগিলেন। তদ্ভিন্ন, কত লোক কত বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণোদ্দেশ্যে যে পত্র লিখিতে লাগিলেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। ক্রমে ক্রমে ১৫। ১৬ খানি পুস্তক হইল। ইহার অনেক

পুস্তকেরই ৫। ৬টী সংস্করণ হইয়া গিয়াছে। ইহা আমার পক্ষে কম শ্লাঘার কথা নহে। আমার ন্যায় অকিঞ্চিৎকর ব্যক্তির লিখিত পুস্তকের যে দ্বিতীয় সংস্করণও হইবে, তাহা কখনও স্বপ্নেও ভাবি নাই। এখন বুঝিতেছি, আমার ন্যায় অকিঞ্চিৎকর ব্যক্তির লিখিত পুস্তকগুলি দ্বারা দেশের একটা অভাবের কিঞ্চিন্মাত্রও পূর্ণ হইয়াছে—বাঙ্গালা-কৃষি-সাহিত্যের কলেবরেও উপকার দর্শিয়াছে। বাঙ্গালাদেশে, বাঙ্গালীর মধ্যে কৃষি ও উদ্যান বিষয়ে যে কিঞ্চিন্মাত্রও স্পৃহার উদ্রেক করিতে পারিয়াছি, ইহাই আমার যথেষ্ট পুরস্কার। কার্য্য-ক্ষেত্রে নানাবিষয়ের পরীক্ষা, সংবাদপত্রে প্রবন্ধলিখন, পত্র-লেখকদিগকে অকাতরে পরামর্শদান, পুস্তকরচনা, বহুদেশ ভ্রমণ প্রভৃতির জন্য শরীরপাত করিয়াছি; এবং এই সকল কার্য্যে নিজস্ব অর্থও যে ব্যয় না করিয়াছি, তাহা নহে। ৩০ বৎসর পূর্ব্বে যে বাঙ্গালাভাষায় কৃষি ও উদ্যান বিষয়ক পুস্তকের অভাব অনুভব করিয়াছিলাম, তাহার অভাব যে কতকটা পূরণ করিবার অবসর পাইয়াছি, এজন্য সর্ব্বসিদ্ধি-দাতা পরমেশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। কিন্তু যতটা আশা করিয়াছিলাম, বুঝি বা তাহা হয় নাই।

বিগত শতাব্দীর শেষভাগ হইতে বর্ত্তমানসময় পর্য্যন্ত বাঙ্গালাদেশ অতি ক্ষিপ্রগতিতে অগ্রসর হইতেছে;—সকলবিষয়েই কৃতীব্যক্তির আবির্ভাব হইতেছে। কিন্তু কৃষি-বিভাগে তাহা দেখা যাইতেছে না; ইহাই পরিতাপের বিষয়। "বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের" ষষ্ঠ অধিবেশনে—চট্টগ্রামেও, আমি এই কথা বলিয়াছিলাম। কিন্তু গরিবের কথা শুনে কে? এ অধমের অস্ফুট করুণ-রোদন বুঝি বা জগদীশ্বরের মধ্যস্থতায় উত্তরবঙ্গের সাহিত্য-সম্মিলনের উদ্যোগকারীগণের "কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া গেল।" আজ আমি জীবিত না থাকিলেও, বোধ হয় আমার প্রেতাত্মা অন্তরীক্ষ হইতে আপনাদিগকে অভিবাদন করিতেন।

যা'ক সে কথা। আজ আপনারা বাঙ্গালার নানাদিক হইতে—অনেক দূর হইতে আসিয়া বর্ত্তমান সভাক্ষেত্রে সমবেত হইয়াছেন; এবং কি জন্য আসিয়াছেন, তাহাও আপনারা সকলেই জানেন। আমি যে নিমন্ত্রণ-পত্রখানি পাইয়াছি, তাহা হইতে জানা যায়, দুইটী গুরুতর বিষয়ের আলোচনা হইবার কথা আছে। তাহা এই:—

(১) কৃষি-সাহিত্যের উন্নতি-সাধনের উপায়নির্দ্দেশ।

(২) জনসাধারণের মধ্যে কৃষি-বিষয়ক জ্ঞানবিস্তারের পথ-নির্ণয়।

ঈষৎ নিবিষ্টচিত্তে ভাবিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায়, উক্ত বিষয় দুইটীমধ্যে পার্থক্য অতি কম। কারণ, বিষয় দুইটী পরস্পর এত সমভাবের যে, একটি ধরিলে অপরটী বিনা আয়াসেই আসিয়া পড়ে। এক্ষণ মূল-প্রশ্ন—

কৃষি-সাহিত্য কাহাদের জন্য?

শিক্ষিত-সম্প্রদায়ই সাহিত্য অন্বেষণ করেন; এবং কার্য্যোপযোগী সাহিত্য পাইলে, তাঁহাদের দ্বারা অনেক কাজ হইতে পারে; ইহা আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু সেই শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের সহিত কৃষির কি সম্বন্ধ ভাবিয়া দেখুন দেখি! প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ কৃষিকে উঞ্ছবৃত্তি-মধ্যে স্থান দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তৎপ্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করেন নাই। যে কার্য্যে শারীরিক কঠোর পরিশ্রম করিয়াও উদরান্নের সংস্থান হয় না, তাহা অথবা স্থগিতভাবে অর্থোপার্জ্জন প্রভৃতি উঞ্ছবৃত্তিমধ্যে পরি-গণিত। বোধ হয়, এই কারণেই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ কৃষিকার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন না। এই জন্য নিরন্তরের গরিব-দুঃখীগণই চিরকাল চাষ-বাস করিয়া আসিতেছে। ইংরেজের আমলে, আমরা পাশ্চাত্য-শিক্ষা, পাশ্চাত্য সভ্যতা, পাশ্চাত্য সামাজিকতা ও আচার-ব্যবহার অনেকটা আয়ত্ত করিয়া লইয়াছি। এই জন্য হয়ত আমরা কৃষি-কার্য্যকে অবহেলার চক্ষে দেখি না। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও, আমরা কয়জন কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছি? আমাদের মধ্যে কয়জন নিজ নিজ পুত্রদিগকে কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছে; এবং কৃষিকার্য্যশিক্ষার জন্য কয়জন বা লালায়িত? আজ প্রায় ৪০।৫০ বৎসর হইল, লর্ড মেয়োর শাসনকাল হইতে গবর্ণমেণ্ট ভারতে কৃষিবিভাগের সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রত্যেক প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টেরও এক একটা স্বতন্ত্র কৃষি-বিভাগ আছে। নানাস্থানে আদর্শ কৃষিক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে;

এবং তৎসমুদয়ের পরিচালনার্থ যথোপযুক্ত কর্ম্মচারীও নিযুক্ত আছেন। প্রতিবৎসরই যথাসময়ে গবর্ণমেণ্টের কৃষিক্ষেত্র-সমূহের রিপোর্ট প্রকাশিত হইতেছে। সবই 'কেতা-দুরস্ত'; কিন্তু তাহার ফল কি হইয়াছে? কয়জন শিক্ষিতব্যক্তি একমাত্র কৃষিকার্য্যকে জীবিকানির্ব্বাহের উপায়রূপে গ্রহণ করিয়াছেন? আজ দুইবৎসরের কথা হইল, কলিকাতা 'Student's Hall' গৃহে বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগের সহকারী অধ্যক্ষ (Assistant Director of Bengal Agricultural Department) মিঃ স্মিথ (Mr. Smith) সাহেব কৃষিবিষয়ে এক বক্তৃতা করেন। আমি সভাস্থলে উপস্থিত ছিলাম। তিনি হিসাব-কিতাব করিয়া প্রদর্শন করেন যে, একশত বিঘা জমিতে ধান্যের চাষ করিলে বার্ষিক দুই হাজার টাকা আয় হইতে পারে। এই কথাটী সভাস্থলে প্রচার করিবার পূর্ব্বে, তাঁহার ভাবিবার অনেক বিষয় ছিল। প্রথমতঃ, ১০০ বিঘা জমি সংগ্রহ করা ভারতের অনেকস্থলে,—বিশেষতঃ বাঙ্গালাদেশে, একেবারেই অসম্ভব। দ্বিতীয় কথা, যদিও বা জমিসংগৃহীত হয়, তাহা হইলে সেই একশত বিঘা জমিকে চাষী-জমিতে পরিণত করিতে কত টাকার প্রয়োজন? মনে করুন, তাহাও সংগৃহীত হইল। তারপরের কথা—বিষম ভাবনার কথা—জন-মজুর সংগ্রহ করা। মেঠো-ফসলের চাষে বারমাসের সমান কাজ থাকে না; কিন্তু প্রথমাবস্থায় জমীচষা, বীজ বপন, নিড়ানী প্রভৃতিতে অনেক লোকের কাজ থাকে। আবার ফসলসংগ্রহের সময়ও অনেক লোকের আবশ্যক হয়। কিন্তু এতদুভয় সময়ের মধ্যবর্ত্তী দীর্ঘকালে বেশী কাজ থাকে না; সুতরাং তখন জন-মজুরেরা কি করিবে? আসাম-প্রদেশে বহুলপরিমাণে জমি পাওয়া যায়; কিন্তু সেখানে কুলি পাওয়া সমস্যার কথা। হাজার হাজার একার ব্যাপিয়া এক একটী চা-বাগান। কুলির বিশেষ অভাব বলিয়া, ঐ সকল চা-বাগানে দেশ-দেশান্তর হইতে,—বিশেষতঃ ঢুমকা, সাঁওতালপরগণা, ছোটনাগপুর, উড়িষ্যা, বেহার প্রভৃতি স্থান হইতে কুলি সংগ্রহ করিতে হয়। প্রত্যেক কুলির জন্য, সংগ্রহের স্থান হইতে বাগানে পহুঁছিতে একশত হইতে দেড়শত টাকা ব্যয় পড়ে। বাগানের আয়তন অনুসারে, এক একটী চা-বাগানে একহাজার হইতে চারি হাজার বা ততোধিক কুলি রহে। সুতরাং, এক একটী বাগানের জন্য কুলি সংগ্রহ করা যে কিরূপ ব্যয়সাধ্যব্যাপার, তাহা সহজেই অনুমেয়। ইহা সাহেবদিগের পক্ষেই সম্ভব-পর। কারণ, প্রত্যেক বাগানই যৌথ-মূলধনে প্রতিষ্ঠিত। লক্ষ লক্ষ টাকা মূলধন! আমাদিগের পুঁজি-পাটা কি? আমাদিগের ন্যায় সাধারণ মধ্যবিত্তের পক্ষে হাজার টাকা—অধিক কি পাঁচশত টাকাও সংগ্রহ করা কঠিন কার্য্য। আর এক কথা,—কৃষিকার্য্যে নিয়োজিত অর্থ ঘরে ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব হয়। শ্রমশিল্পকার্য্যে যাহারা নিযুক্ত আছে, তাহারা এ বিষয়ে অনেকটা স্বাধীন। কারণ, তাহারা পণ্য উৎপন্ন করিলেই, হাতে-হাতে মূলধন ও শ্রমের মূল্য ফিরিয়া পায়। পক্ষান্তরে, কৃষিকার্য্যে জমি-তৈয়ার হইতে ফসল গৃহজাত—এই দীর্ঘকাল কৃষককে ঘরের খাইয়া দিনপাত করিতে হয়। অথচ, তাহার গৃহে তত অর্থ বা শস্য থাকে না, যদ্দ্বারা সে সপরিবারে কয়মাস চালাইতে পারে। কাজেই তাহাদিগকে জন-মজুরী কাজে নিযুক্ত হইতে হয়। জন-মজুরীও সর্ব্বত্র সহজপ্রাপ্য নহে। গরিব কৃষক কষ্ট করিয়া—কোনরূপে দিনপাত করিতে পারে; কিন্তু ভদ্র-কৃষকের পক্ষে তাহা সহজ নহে। তাহাকে সকল কাজের জন্য মজুর নিযুক্ত করিতে হইবে। কৃষক নিজে খাটে; তাহার পরিবারস্থ ছেলে-মেয়ে-স্ত্রী প্রভৃতি মাঠে গিয়া ক্ষেত নিড়ায়, ফসল কাটে, ফসল রোয় ইত্যাদি অনেক কাজ করিয়া থাকে। কিন্তু ভদ্রলোক-কৃষককে সকল কাজেই ঠিকা লোক লাগাইতে হয়। অনেক সময়, কাজের ভিড়ের সময়, লোক পাওয়া কঠিন হয়, কিম্বা মজুরী অধিক হারে দিতে হয়। এই জন্য আমার বিশ্বাস, সেরূপ কৃষি ভদ্র ও শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের পক্ষে তত সুবিধাজনক নহে।

শিক্ষিত-সম্প্রদায়কে আমি অন্যরূপ কৃষির পরামর্শ দেই; এবং তাহাই তাঁহাদিগের প্রকৃতির উপযোগী হইবে। উক্ত কৃষি—পার্শ্বস্থ কুক্ষি। গত বৎসর "ভারতবর্ষ" পত্রিকায় 'পল্লীগৃহস্থ' শীর্ষক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, তাহাতে গার্হস্থ-কৃষিসম্বন্ধেই আলোচনা করা হইয়াছে। প্রবন্ধটী অতি বৃহৎ বলিয়া, এ স্থলে তাহার কোনও অংশই

উদ্ধৃত বা আবৃত্তি করা চলে না। আমি পল্লীগৃহস্থ-প্রবন্ধে বলিয়াছিলাম যে, পল্লীগ্রামের বাসস্থানে যে আঙ্গিনা, খিড়কীর বাগান বা পতিত জমি আছে, তাহাতে নানাবিধ তরিতরকারী উৎপন্ন করিলে এবং পুষ্করিণীতে মৎস্য ও গোয়ালে গাভী পালন করিলে গৃহস্থলীর অনেক সাহায্য হইয়া থাকে। এই সাহায্যকে আমরা আয় মনে না করি কেন? গৃহস্থলী-কৃষি পরিবারস্থ মহিলাগণ—এমন কি, বালক-বালিকাগণও চালাইতে পারে। ইহাতে কষ্ট নাই, অধিক ব্যয় নাই; অথচ আনন্দ আছে। তদ্ব্যতীত, বাজার হইতে তরিতরকারী প্রভৃতি ক্রয় করিতে হইলে প্রতিদিন যে অর্থব্যয় হয়, তাহা বাঁচিয়া যায়। অধিকন্তু, প্রতিদিনই টাট্‌কা ও তাজা জিনিষ পাওয়া যায়। এখনও সহরবাসীর সহিত পল্লীগ্রামবাসীর তুলনা করিলে দেখা যায়, পল্লীগ্রাম-বাসীরাই সহরবাসী অপেক্ষা অনেক স্বচ্ছন্দে আছেন। অথচ পল্লীবাসিগণ সহরের বাহ্যিক বিলাসবিভবে মুগ্ধ হইয়া সহরে গিয়া আশ্রয় লইতেছেন। ভূমাধিকারীসম্বন্ধে এ কথা বেশী সত্য।

বঙ্গদেশে কৃষি-সাহিত্যের সম্যক প্রচারবৃদ্ধির উপযুক্ত সময় আসিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। যখন লোকে কৃষি-সাহিত্যের অভাব অনুভব করিবে, তখন উহা আপনা হইতেই বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। আগে 'চাহিদা' বা demand, পরে যোগান বা supply—ইহা ব্যবহার-শাস্ত্রের প্রথম সূত্র। বাঙ্গালাভাষায় কৃষিসম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত বে কএকখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তৎসমুদায়ের কয়টী করিয়া সংস্করণ হইয়াছে, প্রত্যেক সংস্করণ নিঃশেষিত হইতে কতসময় লাগিয়াছে, প্রত্যেক সংস্করণে কতসংখ্যক পুস্তক ছাপা হইয়াছে ইত্যাদি হিসাব করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, কৃষিসম্পর্কীয় সাহিত্যের প্রসার-বৃদ্ধির সময় আসিয়াছে কিনা? বাঙ্গালাদেশের আয়তন ১৪১,০০০ বর্গমাইল; এবং ইহার অধিবাসীর সংখ্যা ৫ কোটী ৪০ লক্ষ। বাঙ্গালার প্রতি বর্গমাইলে ৩৮৩ জন লোকের বাস। এই সুবৃহৎ ভূখণ্ডে,—প্রায় ৫॥০ কোটী লোকের বসতিপূর্ণ ভূভাগমধ্যে—কয়খানি কৃষিবিষয়ক পুস্তক এবং কয়খানি কৃষিবিষয়ক মাসিক পত্র আছে, তাহা দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, এক্ষণ দেশের কৃষি-সাহিত্যের কলেবর বৃদ্ধি করিবার,—অন্ততঃ চেষ্টা করিয়া বাড়াইবার সময় আসিয়াছে কিনা। দেশমধ্যে বা বাঙ্গালীজাতির মধ্যে কৃষিকর্ম্মনিরত ব্যক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে, কৃষি-সাহিত্য স্বতাই পরিপুষ্ট হইয়া উঠিবে। কৃষি-সাহিত্যের অঙ্গপুষ্টি করিবার জন্য যোগ্যলোকেরও প্রয়োজন। কারণ, ইহা সাহিত্যের একটী বিশেষ অঙ্গ। কৃষি-বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক কৃষি—উভয়ই যাঁহারা শিক্ষা করিয়াছেন বা করিবেন, তাঁহারাই কৃষি-সাহিত্যের পুষ্টি-সাধন করিতে সমর্থ হইবেন। শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে ব্যবহারিক-কৃষকের উদ্ভব হইলেই, উচ্চাঙ্গের কৃষি-সাহিত্য আবির্ভূত হইবে। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায়, বলপূর্ব্বক কৃষি-সাহিত্য রচনা করিতে গেলে, সে সাহিত্য উচ্চাঙ্গের ত হইবেই না, উপরন্তু ভাবী কৃষি-চর্চ্চাকারিগণ ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন। সে ক্ষতিকে আমি ব্যক্তিগত ক্ষতি মনে না করিয়া, জাতীয় ক্ষতি—বাঙ্গালীজাতির ক্ষতি বলিয়াই মনে করি। কৃষিবিষয়ক জ্ঞানপ্রচারের জন্য যদিই সাহিত্যের প্রয়োজন মনে করেন, তাহা হইলে এদেশে যে দু'একখানি কৃষি-বিষয়িণী মাসিক পত্রিকা রহিয়াছে, সেই সব পত্রিকার প্রত্যেকখানি যাহাতে প্রতিমাসে অন্ততঃপক্ষে দশহাজার করিয়া প্রকাশিত হইতে পারে, সর্ব্বাগ্রে তাহার ব্যবস্থা করিতে পারিলে ভাল হয়। সেই সহস্র সহস্র খণ্ড মাসিক পত্রিকার ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য প্রত্যেক ভূম্যধিকারী ৫০ বা ১০০ খণ্ডের গ্রাহক হইয়া, তাহা নিজ নিজ জমিদারীমধ্যে বিতরণ করুন; প্রত্যেক ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড ১০।২০ খণ্ড বা ততোধিক বিতরণ করুন; স্কুল ও পাঠশালায় কৃষি-পুস্তক পাঠ্য হউক, প্রত্যেক স্কুল-লাইব্রেরীতে কৃষি-পত্রিকা গৃহীত হউক; গ্রন্থকারদিগকে উৎসাহিত করুন, সম্পাদকদিগকে উৎসাহিত করুন। জেলায় জেলায় যে সকল জেলা-সমিতি (District Association) হইয়াছে, তাহার মেম্বরগণও কৃষি-গ্রন্থ ও কৃষি-পত্রিকা-প্রচারের সহায়তা করিতে পারেন। কৃষি-সাহিত্যের সৃষ্টি, পরিপুষ্টি ও প্রচারের, এই সকল সহজ উপায় বলিয়া মনে হয়। বলা বাহুল্য, এ প্রচার

শিক্ষিতদিগের নিমিত্ত। অতঃপর, কৃষিজীবিদিগের মধ্যে কৃষিশিক্ষা ও কৃষির উন্নত-প্রণালীসমূহের প্রচার অতি গুরুতর কার্য্য। লেখা-পড়া না জানিলে পুস্তক ও পত্রিকা পড়িবে কে? এ দেশের কৃষক ও কৃষিজীবিগণ অশিক্ষিত। প্রথমতঃ, ইহাদিগের মধ্যে বহুলপরিমাণে সাধারণ শিক্ষা-প্রচার করিতে—গ্রামে গ্রামে অবৈতনিক স্কুল-পাঠশালা স্থাপন করিতে হইবে। দেশের শিক্ষিত উৎসাহী যুবক ও বেকার ভদ্রসন্তানদিগকে, এই সকল স্কুল-পাঠশালায়, বিনা পারিশ্রমিকে শিক্ষাদানে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

আপামর-সাধারণকে শিক্ষাদান করিতে হইলে, আর একটী কথা ভাবিবার আছে। কৃষক ও শ্রমজীবিদিগের সন্তানগণ ৬।৭ বৎসর বয়সে পদার্পণ করিলেই উপার্জ্জনক্ষম হয়; সুতরাং ইহাদের সকলকেই, উপার্জ্জন হইতে বঞ্চিত করিয়া, স্কুল-পাঠশালায় লইয়া যাওয়া উচিত নহে। যাহারা ৬।৭ বৎসর বয়ঃক্রম হইলেই উপার্জ্জন করিয়া আপন আপন পেট ভরাইতে পারে, তাহারা সমাজের অতি প্রয়োজনীয় উপকরণ—বোধ হয়, তাহারা ভদ্রসন্তানগণের অপেক্ষাও প্রয়োজনীয়। সেই কুটীরবাসী বালক-বালিকাদিগকে গৃহস্থলীর কাজ হইতে অপসৃত করিয়া স্কুলে আনিতে হইলে, প্রত্যেক স্কুলের সংশ্রবেই একটী করিয়া অন্নসত্র রাখা আবশ্যক। কারণ, সংসারের আর্থিক ক্ষতিস্বীকার করিয়া যাহারা বিদ্যালাভ করিতে আসিবে, তাহাদের উদরান্নটাও যদি বিদ্যালয় হইতে দেওয়া হয়, তাহা হইলেও তাহারা বা তাহাদিগের অভিভাবকগণ উৎসাহিত হইতে পারে। ইহাদিগের শিক্ষালাভে যে, কেবল ইহাদিগেরই ব্যক্তিগত বা পারিবারিক লাভ, তাহা নহে; অন্ততঃ আমি তাহা মনে করি না। আমার মনে হয়, ধনী-দরিদ্রনির্ব্বিশেষে প্রত্যেক নর-নারী—প্রত্যেক বালক-বালিকা মানবসমাজের এক একটী বিশেষ অঙ্গ। সুতরাং, ইহাদিগকে শিক্ষিত ও সদাচারী করিতে পারিলে, দেশের ও সমাজের কল্যাণ হইবে; ভূম্যধিকারী সৎ-প্রজা পাইবেন; পল্লীবাসীগণ সৎ প্রতিবেশী পাইবেন; এবং গভর্ণমেণ্টও শান্ত-স্বচ্ছল প্রজা পাইবেন। এই সকল কারণে, গভর্ণমেণ্ট, জমিদার ও মধ্যবিত্ত—সকলে একমত হইয়া, ইহাদিগের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারে যত্নবান হউন; এবং তদর্থে যাহা প্রয়োজন, তাহা করিয়া গরিব প্রজাপুঞ্জকে রক্ষা করুন। প্রজা-সাধারণের ঘরে প্রচুর অন্ন হইলে, এ দেশ হইতে ম্যালেরিয়া, বিসূচিকা প্রভৃতি মহামারী অন্তর্হিত হইবে, দেশের বাণিজ্য ও শ্রম-শিল্প বৃদ্ধি পাইবে, দেশ সম্পদশালী হইয়া উঠিবে। আবার সকলে বলিষ্ঠ হইবে—আবার সকলের মুখে হাসি ফুটিবে। এ কথা যখন আমার মনে হয়, তখন হৃদয় আনন্দে ভরিয়া যায়। কিন্তু বিনা শিক্ষায় কোন কাজ হইবে না। 'আমাদিগের সেবা-শুশ্রূষার নিমিত্ত চাকর পাইব না'—এই ভয়ে কোন্‌ও মহাজন—বাঙ্গালা-দেশের কোন মহাজন, ইহাদিগের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের বিরোধী! এই বাক্যকে মহাজন বলিব, না মূঢ়জন বলিব, প্রতিধ্বনি তাহার উত্তর দিউক।

গৃহস্থলী-কৃষির কথা সংক্ষেপে বলিয়াছি। আর একটী প্রয়োজনীয় কৃষি-কথা বলিব; এবং আমার বিশ্বাস, তাহা শিক্ষিত ও সম্পন্নদিগের যোগ্য বা করণীয় কৃষি—তাহা উদ্যান-চর্চ্চা বা 'gardening.'। আমাদের প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট সকল উদ্যান-চর্চ্চাকে কেন যে কৃষিবিভাগের অন্তর্ভূত করেন না, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। আমি যখন দ্বারভাঙ্গার ছিলাম, তখন বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের কৃষি-বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীগণ সফরে বাহির হইলে, তথায় আমার কার্য্যাদি দেখিতে যাইতেন। সেই সূত্রে শ্রদ্ধেয় বন্ধু ৺ নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় ১৯০৬ খৃঃ অব্দে, এবং বর্ত্তমান সহকারী ডিরেক্টর মিঃ ডি, এন, মুখার্জ্জি ১৯০৪ খৃঃ অব্দে, এ অধমের 'মোসাফের খানায়' পদার্পণ করিয়াছিলেন। আমি ইঁহাদের উভয়কেই উদ্যান-চর্চ্চা-বিষয়ে কৃষি-বিভাগের যাহাতে দৃষ্টি পড়ে, সে জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলাম। কলিকাতার একখানি বিশিষ্ট ইংরেজি দৈনিক-পত্রে আমি কৃষিবিষয়ক প্রবন্ধ লিখিয়া থাকি। তাহা ব্যতীত, উহাতে গভর্ণমেণ্টের কৃষি-বিভাগের বার্ষিক রিপোর্টের সমালোচনাও করি। ঐ পত্রিকাতে, সুবিধা পাইলেই, উদ্যান-চর্চ্চার প্রয়োজনীয়তা বুঝাইবার বিশেষ চেষ্টা করিয়া আসিতেছি। বর্ত্তমান ক্লাব-বিভাগগুলি

অতিশয় সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ। ধান্য, মাঠ-কড়াই (চীনাবাদাম), আলু প্রভৃতি দুই চারিটী ফসলের চাষ-পরীক্ষা, বিভিন্ন প্রকার লাঙ্গলের কার্য্যকারিতা ও বিশেষ বিশেষ সারের পরীক্ষা—প্রধানতঃ, এই কএকটী বিষয় লইয়াই সরকারী কৃষি-বিভাগের কর্ম্মচারীগণ ব্যস্ত রহিয়াছেন। এ সকল যে অকিঞ্চিৎকর, তাহা আমি বলি না। তবে, উহাতে জনসাধারণের, বিশেষতঃ শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের কোন স্বার্থ নাই। কৃষির উদ্যানাঙ্গ উক্ত বিভাগে সংযোজিত হইলে অনেক উপকার হয়। উদ্যানাঙ্গকে প্রধানতঃ তিনটী শাখায় বিভক্ত করিতে পারা যায়। যথা:—(১) তরিতরকারী, (২) ফল-পাকুড় এবং (৩) ফুল। এই তিনটী বিভাগে কাজ করিবার প্রশস্ত ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে; এবং এই সকলের উন্নতিসাধন করিবারও যথেষ্ট ক্ষেত্র রহিয়াছে। মেঠো-ফসল অপেক্ষা, ঐ সকল ঔদ্যানিক ফসলের চাষে অল্প জমিতে অধিক আয় হইয়া থাকে। মেঠো-ফসল-উৎপাদনকারী সাধারণ কৃষকগণ অতি গরিব; সুতরাং, তাহারা অতি কষ্টে চাষ-বাস করে, এবং তাহাতে যাহা উৎপন্ন করে, তদ্দ্বারা কোনরূপে তাহাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহিত হয়। কৃষির তুলনায়, উদ্যানতা অত্যধিক ব্যয়সাপেক্ষ বলিয়া, তাহা ভদ্র ও শিক্ষিতব্যক্তিদিগের পক্ষে সহজসাধ্য। অপর বিষয়কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াও উদ্যানিক ফলাদির চাষ করিতে পারা যায়। পাঁচ বিঘা জমিতে তরিতরকারী, ফলমূল বা ফুলের চাষ করিতে পারিলে বার্ষিক যত টাকা আয় হইতে পারে, ধান্যাদি মেঠো-ফসলে তাহা সম্ভবপর নহে। তাহা ব্যতীত, ইহাও দেখিতে হইবে যে, শিক্ষিত ভদ্রলোকদিগের সংসারযাত্রানির্ব্বাহের ব্যয় কৃষক বা শ্রমজীবিদিগের অপেক্ষা অনেক অধিক। আমাদিগের আহার্য্য, পরিধেয়, বাসস্থান, সামাজিকতা, পাল-পার্ব্বণ এবং অন্নপ্রাসন, উপনয়ন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, প্রভৃতি সকলবিষয়েই ব্যয় এত অধিক যে, তাহা কৃষি-জাত পণ্য হইতে অধায় করিতে হইলে যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন এবং প্রচুর জমির আবশ্যক। সাধারণ গৃহস্থ-ভদ্রলোকের ঘরে তত অর্থ নাই বলিয়া, তাঁহারা কৃষিকার্য্যে অগ্রসর হইতে পারেন না। কিন্তু অপর কার্য্য দ্বারা কিছু অর্থোপার্জ্জন করিয়া, সেই অর্থের কিয়দংশ বা সমুদয় গৃহস্থলী-কৃষি বা ঔদ্যানিক ফলল-চাষে ব্যয় করিতে পারিলে সমধিক লাভবান হইতে পারেন। বিগত ত্রিশ বৎসরকালমধ্যে, আমি অনেক শিক্ষিতব্যক্তিকে কৃষিকার্য্য করিতে দেখিলাম; কিন্তু কাহাকেও সফলকাম হইতে দেখিলাম না। বরং, অনেকে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন; এবং কেহ কেহ ঋণগ্রস্তও হইয়া পড়িয়াছেন। অনেক সম্পাদক, সমালোচক ও উপদেষ্টা শিক্ষিত যুবকদিগকে কৃষি-কার্য্যে মনোনিবেশ করিতে পরামর্শ দিয়া থাকেন। তাঁহারা কিন্তু নিজে কৃষিকার্য্য কখনই করেন নাই—কৃষির সকল দিক্ বিশেষভাবে ভাবিয়াও দেখেন নাই। এই সকল অনভিজ্ঞ ও দারিদ্র-জ্ঞানহীন ব্যক্তিদিগের পরামর্শ দ্বারা ঘোর অনিষ্ট হইয়া থাকে। এই সকল উপদেষ্টা কৃষিকেই যদি জীবিকানির্ব্বাহের প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারা স্বয়ং এবং তাঁহাদিগের নিজ নিজ পরিবারস্থ যুবকগণ কৃষিকর্ম্মে নিযুক্ত হ'ন না কেন? যে উপদেশ অপরকে দিতে হয়, অগ্রে নিজের জীবনে তাহা দেখাইতে হয়;—নিজ নিজ পরিবারস্থ সকলে যাহাতে সেই মতে কার্য্য করে, তাহাও সর্ব্বাগ্রে করা উচিত। বিষধর দেখিয়া আপনার পুত্রকে সাবধান করা, এবং সেই সর্প বিনাশ করিবার জন্য পার্শ্বস্থিত অপরের পুত্রকে উৎসাহ দান করা যেরূপ স্বার্থপরতা-মূলক, বর্ত্তমানক্ষেত্রে, আপনারা অপর কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়া, প্রতিবেশীদিগকে লাঙ্গল-বলদ লইয়া ক্ষেত্রকর্ষণের পরামর্শ দেওয়াও সেইরূপ একই কথা।

পত্রখানি সুবৃহৎ হইয়া পড়িল; অগত্যা এই খানেই ক্ষান্ত হইলাম। উপসংহারে জগদীশ্বরসমীপে একান্ত-প্রার্থনা যে, সম্মিলনের কার্য্য সুশৃঙ্খলে নির্ব্বাহিত হউক।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

রঙ্গপুর-কৃষি-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথমবার্ষিক অধিবেশনে, আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দে এফ্, আর, এইচ্, এস্ মহাশয় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। তিনি তাঁহার মন্তব্য একখানি নয়পৃষ্ঠাব্যাপী-পত্রে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। সম্মিলনীতে ঐ সুদীর্ঘ পত্রখানাই প্রবন্ধরূপে পঠিত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে; এবং আমরাও উহা 'কৃষিকথা' নাম দিয়া প্রকাশ করিলাম। ইহার কোন কোন স্থলে মতদ্বৈধ রহিলেও, আমরা তাহার উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন মনে করি। তবে নিম্নলিখিত দুইটী বিষয় আমাদের সম্পূর্ণ মতবিরুদ্ধ বলিয়া, এ স্থলে তাহার উল্লেখ না করিয়া নীরব রহিতে পারিলাম না। প্রবোধবাবু লিখিয়াছেন,—(১) "প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ কৃষিকে উঞ্ছবৃত্তিমধ্যে স্থান দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তৎপ্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করেন নাই। যে কার্য্যে শারীরিক কঠোর পরিশ্রম করিয়াও উদরান্নের সংস্থান হয় না, তাহা অথবা ঘৃণিতভাবে অর্থোপার্জ্জন প্রভৃতি উঞ্ছবৃত্তিমধ্যে পরিগণিত। বোধ হয়, এই কারণেই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ কৃষিকার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন না। এই জন্য নিম্নস্তরের গরিব-দুঃখীগণই চিরকাল চাষ-বাস করিয়া আসিতেছেন। ইংরেজের আমলে, আমরা পাশ্চাত্য-শিক্ষা, পাশ্চাত্য সভ্যতা, পাশ্চাত্য সামাজিকতা ও আচার-ব্যবহার অনেকটা আয়ত্ত করিয়া লইয়াছি। এইজন্য হয়ত আমরা কৃষিকার্য্যকে অবহেলার চক্ষে দেখি না।" এবং (২) "বিগত ত্রিশবৎসরকালমধ্যে, আমি অনেক শিক্ষিতব্যক্তিকে কৃষিকার্য্য করিতে দেখিলাম; কিন্তু কাহাকেও সফলকাম হইতে দেখিলাম না। বরং, অনেকে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন; এবং কেহ কেহ ঋণগ্রস্তও হইয়া পড়িয়াছেন। অনেক সম্পাদক, সমালোচক ও উপদেষ্টা শিক্ষিতযুবকদিগকে কৃষি-কার্য্যে মনোনিবেশ করিতে পরামর্শ দিয়া থাকেন। তাঁহারা কিন্তু নিজে কৃষিকার্য্য কখনই করেন নাই—কৃষির সকলদিক্ বিশেষভাবে ভাবিয়াও দেখেন নাই। এই সকল অনভিজ্ঞ ও দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যক্তিদিগের পরামর্শ দ্বারা ঘোর অনিষ্ট হইয়া থাকে। এই সকল উপদেষ্টা কৃষিকেই যদি জীবিকা-নির্ব্বাহের প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারা স্বয়ং এবং তাঁহাদিগের নিজ নিজ পরিবারস্থ যুবকগণ কৃষিকর্ম্মে নিযুক্ত হ'ন না কেন? যে উপদেশ অপরকে দিতে হয়, অগ্রে নিজের জীবনে তাহা দেখাইতে হয়;—নিজ নিজ পরিবারস্থ সকলে যাহাতে সেই মতে কার্য্য করে, তাহাও সর্ব্বাগ্রে করা উচিত। বিষধর দেখিয়া আপনার পুত্রকে সাবধান করা, এবং সেই সর্প বিনাশ করিবার জন্য পার্শ্বস্থিত অপরের পুত্রকে উৎসাহ দান করা যেরূপ স্বার্থপরতামূলক, বর্ত্তমানক্ষেত্রে, আপনারা অপর-কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়া, প্রতিবেশীদিগকে লাঙ্গল-বলদ লইয়া ক্ষেত্রকর্ষণের পরামর্শ দেওয়াও সেইরূপ একই কথা।" আমরা কিছুতেই তাঁহার এই সকল ব্যক্তিগত ভ্রান্তমতের সমর্থন করিতে পারি না। তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা যে সত্য নহে, তাহা তাঁহার লিখিত দু'একটী প্রবন্ধ হইতে কোনও কোনও স্থল উদ্ধৃত করিয়াই, আমরা প্রমাণ করিতে পারিব। প্রবোধবাবুর মত প্রবীণ কৃষিতত্ত্ববিদের অভিমত উপেক্ষণীয় নহে। এই জন্যই আমরা তাহার উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম। প্রবোধবাবুর মত-পরিবর্ত্তনের এবং কাল্পনিক মতপ্রচারের উদ্দেশ্য কি, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে আমাদের বলিবার রহিল অনেক।

প্রবোধবাবুর প্রবন্ধের পরেই শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র গুহ এফ্, আর, এইচ্, এস্ মহাশয়ের 'কৃষি ও কৃষক' নামক প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা এই প্রবন্ধটির আদ্যন্ত মনোযোগের সহিত পাঠকগণকে পাঠ করিতে অনুরোধ করি। ইহাতে প্রবোধবাবুর উক্তির আংশিক প্রকৃত উত্তর রহিয়াছে।

কৃষি ও কৃষক।

[শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র গুহ এফ্, আর, এইচ্, এস্ লিখিত।]

মাননীয় সভাপতি মহাশয় এবং সমবেত কৃষি-সাহিত্যিক ও কৃষি-সাহিত্যানুরাগী সহোদরগণ! এই সম্মিলনীর কৃষি-সাহিত্যবিভাগের উদ্যোগকারীগণ, কৃষিবিষয়ে কোনও একটী প্রবন্ধ লিখিতে আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন। আমি সেই অনুরোধ শিরোধার্য্য করিয়া লইয়াছি সত্য, কিন্তু কৃষিতত্ত্ববিদ্‌গণের সম্মিলন-ক্ষেত্রে পাঠোপযোগী রচনায় যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিলে কৃষি-সাহিত্যসেবীগণের হৃদয়-রঞ্জন সম্ভবপর হইয়া থাকে, আমার নিকট আপনারা তাহার কিছুই প্রত্যাশা করিতে পারেন না। যদিও আমি প্রায় সমগ্র জীবন—চত্বারিংশৎবর্ষকাল, বাঙ্গালার একটি নগণ্য পল্লীতে, হৃদয়ের একটি দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষার তাড়নায়, স্বোপার্জ্জিত সমস্ত বিত্ত-সম্পত্তি কৃষি ও নার্শেরী উদ্যানের কার্য্যে বিনিয়োগ করিয়া কৃষি-চর্চ্চা করিতেছি সত্য, কিন্তু তথাপি, কৃষিবিষয়ে আমার সম্যক্ জ্ঞানলাভ হয় নাই। ফলে, তদ্বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়া, সর্ব্বপ্রথমেই আমি আমার অযোগ্যতা উপলব্ধি করিতেছি। নিজের অযোগ্যতা অনুভব করিলেও, দেশের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলাম না। কৃষি ও ঔদ্যানিক কার্য্যে লিপ্ত রহিয়া ও হাতে-হেতেড়ে চাষ-বাস করিয়া, আমি কৃষিবিষয়ে যে যৎকিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, আজ তাহাই মাত্র সম্বল লইয়া, আপনাদিগকে এ দেশের কৃষি ও কৃষক সম্বন্ধে কএকটি কথা বলিতে সাহসী হইয়াছি।

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনীর বিজ্ঞান-বিভাগে, কএক বৎসর যাবতই, কৃষিকথাও আলোচ্যবিষয়মধ্যে স্থানলাভ করিয়াছে। ইহা বড়ই আনন্দের ও আশার কথা বলিতে হইবে। কিন্তু এ দেশের শিক্ষিত (?) সম্প্রদায়ের অতি অনাদরের—অতি তুচ্ছ ও উপেক্ষিত কৃষিকথা যে ভাবে সম্মিলনীতে আলোচিত হইয়া থাকে, তাহা নামমাত্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আজ দুই তিন বৎসর যাবৎ কৃষিকথা সাহিত্য-সম্মিলনীতে আলোচ্যবিষয়রূপে স্থানলাভ করিয়াছে সত্য, কিন্তু আলোচনা ও আন্দোলনের ফল দাঁড়ায়—"এস বন্ধ্যা সুতর্য্যাতি খ-পুষ্পকৃতশেখর"। সম্মিলন-মণ্ডপে প্রবন্ধ পঠিত হয় সত্য, কিন্তু প্রবন্ধের উদ্দিষ্টবিষয়কে কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার চেষ্টা কদাচিৎ হইয়া থাকে। সুতরাং, আলোচনা ও আন্দোলনে কিছুই লাভ হয় না। সম্মিলনীর বার্ষিক অধিবেশনের কার্য্য শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, সকল আলোচনা কাল-কক্ষে বিলীন হয়। অধুনা, বাঙ্গালা-সাহিত্য কৃষিবিষয়ে নিতান্ত হীন, নিতান্ত গরীব; কিন্তু চিরদিনই এরূপ ছিল না। বৈদিকযুগ বা সভ্যতার আদিযুগ হইতে অৰ্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্ব পর্য্যন্তের ইতিহাসই তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। বাঙ্গালা-সাহিত্যের সকল বিভাগ বা অঙ্গকে উপেক্ষা করিলেও, আর্য্যনামের পরিচয় দিয়া, 'সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা' বঙ্গের—এ কৃষিপ্রাণ দেশের অধিবাসী হইয়া, কৃষিকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না।

অধুনা বঙ্গীয় কৃষি-সাহিত্যের যেরূপ দুরবস্থা, বাঙ্গালার কৃষি ও কৃষকের অবস্থাও তদ্রূপ। বাঙ্গালা-সাহিত্যের ও বাঙ্গালীর পক্ষে, ইহা নিতান্তই লজ্জার কথা। বাঙ্গালী-জাতিকে রক্ষা করিতে হইলে, বাঙ্গালার কৃষির উন্নতি-বিধান করিতেই হইবে; এবং তদুপলক্ষে কৃষি-সাহিত্যেরও পুষ্টিবৃদ্ধি করিতে হইবে। রংপুরের জমিদার-সম্প্রদায়, রংপুরের তথা বঙ্গের কৃষির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিসাধনে বদ্ধ-পরিকর হইয়া, এ দেশের আদর্শস্থল এবং দেশবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। তাঁহারা কৃষি-সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গীন পুষ্টিসাধনের উদ্দেশ্যে, এ বৎসর সাহিত্য-সম্মিলনীর সংশ্রবে, কৃষি-সাহিত্য-বিভাগের প্রতিষ্ঠা করিয়াও দেশে এক নূতন মাঙ্গল্য শক্তিসঞ্চারণের সূত্রপাত এবং বাঙ্গালার কৃষি-সাহিত্যকে সম্মানিত করিয়াছেন। যাহা হউক, সভার উদ্যোগকারীগণ, সভাপতি মহাশয় এবং সমাগত কৃষি-সাহিত্যিক বন্ধুবর্গকে, এই শুভ-সম্মিলনের জন্য অন্তরের সহিত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া, এক্ষণ আমি আমার বক্তব্য বিষয়েরই অবতারণা করিতেছি।

দেশে এই যে একটা অতৃপ্তি, অসন্তুষ্টি ও অন্নাভাবের হাহাকার উঠিয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নহে। বাঙ্গালী দেশ না চিনিলেও, দেশের অবস্থা কি, এক্ষণ তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছে। বর্ত্তমান অন্ন-সমস্যাসম্বন্ধে

সমগ্র দেশব্যাপী যে আন্দোলন চলিতেছে, তাহা হইতেই আমরা বাঙ্গালার আভ্যন্তরীণ বর্ত্তমান অবস্থা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। অধুনা, উদরপূর্ত্তির ব্যবস্থা করিতে গিয়াই, আমাদিগকে বাধ্য হইয়া দেশের অবস্থা বুঝিতে ও ভাবিতে হইতেছে। গৃহে অন্নাভাব হইলে, গৃহিণীর ভ্রুকুটি-কুটিল-মুখ এবং শিশুসন্তানগণের অনশন বা অর্দ্ধাশন-জনিত ক্লিষ্টতা ও রোদনধ্বনিই আমাদিগকে দেশের অবস্থা বুঝাইয়া দিতেছে। বস্তুতঃ, অন্নসমস্যা হইতেই, এ দেশের কৃষির যে শোচনীয় অবনতি ঘটিয়াছে, তাহা অল্লাধিক পরিমাণে আমরা সকলেই বুঝিতে পারিতেছি। যে দেশের কৃষির এত দুরবস্থা ঘটিয়াছে, সে দেশের কৃষকের অবস্থা যে কিরূপ হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমেয়।

এ দেশের কৃষি ও কৃষকের অবস্থা যে দিন দিনই অতিশয় হীন হইয়া পড়িতেছে, তাহা স্বীকার্য্য। এরূপ হইল কেন? ইহার প্রকৃত কারণ নির্ণয় করিতে হইলে, আমাদিগকে বর্ত্তমানকালের কৃষি ও কৃষকের অবস্থা সম্যক্‌রূপে বুঝিতে হইবে। একাল বা বর্ত্তমানকালের কৃষি ও কৃষকের অবস্থা যথাযথভাবে বুঝিতে হইলে, সেকালের কৃষি ও কৃষকের পরিচয় লওয়া আবশ্যক। সেকালের চিত্র সম্মুখে না রহিলে, একালের চিত্র পরিস্ফুট হইতে পারে না। আবার সেকালের কথা বুঝিতে হইলে, অতি প্রাচীনকালের কথাও শুনিতে হইবে। কারণ, অতি প্রাচীনকালের ভিত্তির উপরেই সেকালের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। অতি প্রাচীনকালের উপর স্মরণাতীত প্রাচীনকালের প্রভাব বিদ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং, তৎকাল বা বৈদিকযুগ হইতেই, স্তরে স্তরে, এ দেশের কৃষি ও কৃষকের কথা বিশদরূপে আলোচনা না করিলে, বর্ত্তমানকালের কৃষি ও কৃষকের দুরবস্থার বিষয় বা দুরবস্থা ঘটিবার প্রকৃত কারণ নির্ণয় করা সম্ভবপর হইবে না। এইজন্য আমি বৈদিকযুগ হইতে বর্ত্তমানকালকে (১) স্মরণাতীত প্রাচীনকাল বা বৈদিকযুগ, (২) অতি প্রাচীনকাল, (৩) তৎপরবর্ত্তী সেকাল এবং (৪) একাল বা বর্ত্তমানকাল—প্রধানতঃ, এই চারিটী ভাগে বিভক্ত করিয়া লইতেছি।

বৈদিকযুগ হইতেই এ দেশে কৃষিকার্য্যারম্ভ হইয়াছে। তৎপূর্ব্বে হলচালনা করিয়া শস্যোৎপন্ন করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল না; মৃগয়ালব্ধ পশু, পক্ষী প্রভৃতির মাংস এবং প্রকৃতিদত্ত ফল-মূলাদির দ্বারাই জীবিকানির্ব্বাহ করা হইত। কৃষিকার্য্যে সংলিপ্ত হইয়াই, মানুষ প্রথমতঃ সভ্য বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল। সুতরাং, সভ্যতার ইতিহাস কৃষকের ইতিহাস ব্যতীত আর কিছুই নহে। কৃষিকার্য্য ও কৃষিতত্ত্ব সম্বন্ধে ঋগ্বেদে বহু প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে। বৈদিকযুগে, আর্য্যগণ যে স্বহস্তে কৃষিকার্য্য করিতেন, তাহা তাঁহাদের যজ্ঞস্থলে উচ্চারিত প্রায় প্রত্যেক শ্লোক হইতেই প্রতিপন্ন হয়। এই জন্যই বেদকে কেহ কেহ "চাষার গান" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বেদের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া, আমি এই প্রবন্ধটীকে সুদীর্ঘ করিতে চাহি না। পণ্ডিত রমানাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ হইতে এ স্থানে কিয়দংশ মাত্র উদ্ধৃত করা হইল। "ইন্দ্র! এই মহাযজ্ঞে তুমি আনন্দে সোমরস পান কর, এবং আমাদিগকে শতবর্ষ পরমায়ু, সবল পুত্র ও উত্তম গো সকল প্রদান কর। * * মিত্র, তুমি আমাদিগকে ভূমিকর্ষণের শক্তি প্রদান কর" ইত্যাদি। বৈদিককালে আর্য্যগণ ভূমিকর্ষণ করিতেন বলিয়াই, ভূমি-কর্ষণের শক্তি প্রার্থনা করা হইয়াছে।

স্মরণাতীত প্রাচীনকালে বা বৈদিকযুগে আর্য্যগণ মনের আনন্দে হলচালন করিতেন, প্রচুর অন্ন উৎপাদন করিতেন, উদর পূর্ণ করিয়া ভোজন করিতেন, আর ইন্দ্র-পূষার উদ্দেশ্যে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি ঢালিয়া দিতেন;—উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিতের সমবায়ে স্বর পঞ্চমে সপ্তমে জাগাইয়া, প্রান্তরে কান্তারে সুরের লহরী তুলিয়া, বিশ্বপাতা অন্নদাতার মহিমা কীর্ত্তন করিতেন। তাঁহারা বোদর পূরণের জন্য অন্নোৎপাদনে ব্যাপৃত না হইয়া, "অন্নং ব্রহ্ম" মনে করিয়াই, পরমা শ্রদ্ধার সহিত অন্নোৎপাদন ও অন্নবৃদ্ধির জন্য কৃষিকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতেন। তৈত্তিরীয়োপনিষদের ভৃগুবল্লীতে ত কেবল অন্ন-ব্রহ্মেরই কথা— "অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ॥ অন্নাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে॥ অন্নেন জাতানি জীবন্তি॥" (দ্বিতীয় অনুবাক)—অন্নই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। অন্ন

হইতেই প্রাণীদিগের উৎপত্তি হয়, এবং অন্নেই প্রাণী সকল জীবিত থাকে। আবার—"অন্নং ন নিন্দ্যাৎ॥ তদ্‌ব্রতম্॥" (ষষ্ঠ অনুবাক)—অন্নকে নিন্দা করিও না; উহাই ব্রত। পুনশ্চ—"অন্নং বহু কুর্ব্বীত॥ তদ্‌ব্রতম্॥" (৯ম অনুবাক)—প্রচুর অন্ন উৎপাদন করিবে; উহাই ব্রত। বৈদিকযুগে আর্য্যগণ কৃষিকর্ম্মকে পরম পুরুষার্থ, পরম ব্রত ও পরম মঙ্গলের নিদান বলিয়াই মনে করিতেন। কৃষি-ধর্ম্মাচরণই তাঁহাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল।

যে "ঋ" ধাতু হইতে 'আর্য্য' শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার অর্থ কর্ষণ করা—হলচালন করা। তৎকালে হলচালনকার্য্য গো-শক্তিতেই নির্ব্বাহিত হইত, বিশেষতঃ যজ্ঞেও হবি অর্থাৎ ঘৃতের প্রয়োজন। প্রধানতঃ, এই দুই কারণেই আর্য্যগণ গোপালন ও গোসেবা করিতেন। গোজাতি আর্য্যপরিবারের এক অঙ্গবিশেষ ছিল। কৃষি ও তদানুষঙ্গিক গোপালনই বৈদিকযুগে আর্য্যগণের প্রধান কর্ত্তব্য কার্য্য ছিল। গো-গ্রাস প্রদান না করিয়া, কেহই জলগ্রহণ করিতেন না। ইহা হিন্দুমাত্রেরই নিত্যকর্ম্ম-মধ্যে পরিগণিত ছিল। ইহাই ছিল তাৎকালিক কৃষি-ধর্ম্ম।

তারপর—অতি প্রাচীনকালে আর্য্য ঋষিগণও স্বহস্তে হলচালনা করা গৌরববোধ করিতেন। যিনি সাংসারিক সুখ ত্যাগ করিয়া জ্ঞানপথে গমন করিয়াছেন, যাঁহা হইতে বিদ্যা, সত্য, তপঃ ও শ্রুতি—এই সকল সম্যক্‌রূপে নিরূপিত হইয়াছে, তিনিই ঋষি। একমাত্র পরমার্থ তত্ত্বালোচনাই যাঁহাদের জীবনের লক্ষ্য ছিল, সেই সকল ঋষিরাও স্বহস্তে হলচালনা করিতেন। ঋষিগণমধ্যে জনক, বিশ্বামিত্র ও পরাশর প্রভৃতি প্রবীণ কৃষক ছিলেন। সকলেই জানেন, শ্রীরামচন্দ্রের পত্নী ও জনকনন্দিনী বৈদেহী সীতা, যজ্ঞভূমিকর্ষণকালে, লাঙ্গলের মুখে, পৃথিবী হইতে উৎপন্না হইয়াছিলেন। সীতা-শব্দের অর্থ লাঙ্গল-চিহ্নিত রেখা বা ভাঁওর—(ভাঁপর—Furrow)। রাজর্ষি জনক স্বহস্তে হলচালনা করিতে গিয়াই, সীতাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জনক শুধু ঋষি ছিলেন না;—তিনি রাজাও ছিলেন। কিন্তু তথাপি, তিনি হলকর্ষণ করিতেন। বিশ্বামিত্রও রাজর্ষি ছিলেন; তিনিও স্বহস্তে ভূমিকর্ষণ করিতেন। মুনিপুঙ্গব পরাশর যে প্রবীণ কৃষক (Expert agriculturist) ছিলেন, তৎকৃত "পরাশর সংহিতাই" তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

আর্য্যগণের বংশপরিচয়, তাঁহাদিগের গোত্র দ্বারাই নিরূপিত হইয়া থাকে। গো-ত্রাণকারীই এক এক গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। কাশ্যপ, ভরদ্বাজ, শাণ্ডিল্য, বশিষ্ঠ, পরাশর ও গৌতম প্রভৃতি ঋষিই কৃষিকার্য্য ও তদানুষঙ্গিক গোপালন করিতেন। এক একজন ঋষির অধীনে অগণিত গো প্রতিপালিত ও রক্ষিত হইত। আমরা যে আর্য্য ঋষিগণের বংশধর বা যজমান, গোত্রই তাহার সম্যক্ পরিচায়ক। সুতরাং আমরা যে চাষার জাতি, তাহাও নিঃসঙ্কোচেই বলা যাইতে পারে। কারণ, গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষিমাত্রেই কৃষিকার্য্য বা চাষ-বাস করিতেন। অতি প্রাচীনকালে, ঋষিদিগের ন্যায়, রাজারাও নিজের হাতে হলচালন করিতেন; এবং রাজ-পতাকায় হলচিহ্ন ব্যবহার করিতেন। তৎকালে হল বড় গৌরবের — বড় আদরের জিনিষ ছিল। তাই "হলধর", "সীরধ্বজ" উপাধি যার তার ভাগ্যে ঘটিত না। শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ সহোদর বলরাম স্বহস্তে ভূমি-কর্ষণ করিতেন; সেই জন্যই তিনি হলধর উপাধিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইনি বিষ্ণুর দশ অবতারের অষ্টম অবতার। জয়দেব দশাবতার-স্তোত্রে লিখিয়াছেন:—

"বহসি বপুষি বিশদে বসনং জলদাভং।
হলহতিভীতিমিলিতযমুনাভং।
কেশবধৃতহলধররূপ
জয় জগদীশ হরে!"

জগদীশ বলরামরূপে আবির্ভূত হইয়াও স্বহস্তে হলধারণ এবং হলচালন করিতে কুণ্ঠিত হ'ন নাই। বৈদিকযুগ হইতে কৃষ্ণ-বলরামের সময় পর্য্যন্ত এ দেশে কৃষিকার্য্যই যে সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানের কার্য্য ছিল, হিন্দুর প্রাচীন ইতিহাসই তাহার সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে। বেদ হইতে পুরাণ পর্য্যন্ত হিন্দুশাস্ত্রগুলি পাঠ করিলে, আর্য্যগণের কৃষি-প্রীতির

সমাজ পরিচয় পাওয়া যায়। রামায়ণ ও মহাভারত পাঠেও তাৎকালিক কৃষি ও কৃষকের উন্নত অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। অরণ্যনিবাসী রামের সহিত ভরতের চিত্রকূট-পর্ব্বতে মিলনকালে, রাম ভরতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ;—"তাতঃ! কৃষকেরা তোমার উপর প্রীত আছে ত? বৎস, জনসাধারণের সুখ-সমৃদ্ধি কৃষির উপরই নির্ভর করে।" (রামায়ণ—অরণ্যকাণ্ড)। নারদ মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ;—"সৎক্রিয় লোক দ্বারা কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহিত হইতেছে ত? পৃথিবী কৃষি ও গোপালনের উপর স্থাপিত হইয়া স্বচ্ছন্দে চলিতেছে ত?" এই সকল প্রশ্ন হইতেই তৎকালীন কৃষির অবস্থা বেশ বুঝিতে পারা যায়। তবে ঐ সময়ে সকলেই কৃষিকর্ম্ম করিতেন না—কৃষি ও তদানুষঙ্গিক গোপালন প্রভৃতি বৈশ্যেরই প্রধান কর্ত্তব্যমধ্যে পরিগণিত ছিল।

মনু বলিয়াছেন, স্বকর্ম্ম ভিন্ন কৃষিকার্য্য ও গোপালন ব্রাহ্মণাদি সকল উচ্চ জাতিরই কর্ত্তব্যমধ্যে পরিগণিত। ক্ষত্রিয়ের স্বকর্ম্ম—শস্ত্র ও অস্ত্রধারণ; বৈশ্যের বার্ত্তাকর্ম্ম অর্থাৎ পশুপালন ও কৃষিকার্য্য, এবং ব্রাহ্মণের অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ—এই একএকটী স্বকর্ম্ম।

"অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনন্তথা
দানং প্রতিগ্রহশ্চৈব ষট্ কর্ম্মাণ্যগ্রজন্মন।"

প্রমৃত অর্থাৎ কৃষিবৃত্তিই সকল প্রকার সুখ-সম্পদ-প্রদ। সুতরাং কৃষিবৃত্তি অবলম্বন দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করা সকল জাতিরই কর্ত্তব্যমধ্যে পরিগণিত। মনু আরও বলিয়াছেন—"ঋতৃত্তি অর্থাৎ কুক্কুরবৃত্তি বা সেবাবৃত্তি (চাকুরী) দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ কদাচ করিবে না।"

"সত্যানৃতন্তু বাণিজ্যং তেনচৈবাপি জীব্যতে
সেবাশ্বৃত্তিরাখ্যাতা তস্মাত্তাং পরিবর্জ্জয়েৎ।"

অধুনা আমরা শ্বৃত্তি বা কুক্কুরবৃত্তিরই দাস হইয়াছি। প্রাচীনসময়ে, প্রমৃতবৃত্তিই যে ব্রাহ্মণাদি সকল জাতির জীবনের লক্ষ্য ছিল, তাহা কৃষি-প্রিয় প্রাচীন কবি মুকুন্দরাম তৎপ্রণীত "চণ্ডীকাব্যে" মহানন্দে কীর্ত্তন করিয়াছেন :—

"ধন্য অগ্রহায়ণ মাস, ধন্য অগ্রহায়ণ মাস,
বিফল জনম তার নাহি যার চাষ।"

ইহা হইতেই উপলব্ধি হইতেছে যে, মুকুন্দরামের সময়ও কৃষিকার্য্যের আশ্রয় ব্যতীত কোনও গৃহস্থেরই সুখে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহের উপায় ছিল না। ব্রাহ্মণ-কবি মুকুন্দরাম, ধর্ম্মশাস্ত্রালোচনা করিতে বসিয়াও, আপন বংশের মর্য্যাদা বৃদ্ধির জন্য মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন :—

"সহর সেলিমাবাজ, তাহাতে সজ্জনরাজ
নিবসে নোয়াগী গোপীনাথ।
তাহার তালুকে বসি, দামুন্যার চাষ-চষি,
নিবাস পুরুস ছয় সাত।"

মুকুন্দরামের সময়ও যে, বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ স্বহস্তে হালচাষ করিয়া গৌরব বোধ করিতেন, কৃষককবি মুকুন্দরামের উক্তিই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তাঁহার পর হইতেই বাঙ্গালার ব্রাহ্মণগণ স্বহস্তে হলচালনার কার্য্য ছাড়িয়া দিয়াছেন। কিন্তু ভারতের অনেকস্থলে, অদ্যাপি ব্রাহ্মণেরা স্বহস্তে হাল-চাষ করিতেছেন।

বৈদিকযুগের প্রভাব মুকুন্দরামের সময়েও অক্ষুণ্ণই ছিল। সুতরাং, তৎকালকে আমরা অতি প্রাচীনকালের মধ্যেই গণ্য করিয়া লইয়াছি। বৈদিকযুগের পর হইতে কৃষক-কবি মুকুন্দরামের সময় পর্য্যন্তই, আমাদের হিসাবে, অতি প্রাচীনকাল। অতি প্রাচীনকালে, এ দেশের কৃষি ও কৃষকের অবস্থা বেশ সচ্ছল ও উন্নত ছিল; এবং কৃষিকার্য্য বিশেষ সম্মানের ও পবিত্র কার্য্য বলিয়াই গণ্য হইত।

তারপর—সেকাল। সেকাল আর কতদিন! খুব বেশী হয়ত ৫০।৬০ বৎসর হইবে। আমি আমার যৌবনকালের শেষভাগ পর্য্যন্ত সময়কেই সেকাল ধরিয়া লইতেছি। আমার কৃষি-জীবনের অন্ততঃ স্থূলীর্ঘ ৩০টী বৎসর সেকালের মধ্যে পড়িয়াছে। সুতরাং, সেকালের কথা আমি বেশ বলিতে পারিব; এবং একটু বিস্তৃতভাবেই বলিব। একালেও সেকালের কথা আলোচনা করিয়া লাভ আছে। কারণ, উহা আমাদের জাতীয় জীবনের ইতিহাস।

বেশী দিনের কথা নহে—আমার যৌবনকালেও দেখিয়াছি, অগ্রহায়ণমাসেই প্রায় সকল গৃহস্থের গোলা নানাবিধ ধান্যে পরিপূর্ণ হইত। আশানুরূপ ফসল সংগ্রহ করিয়া গোলা পূর্ণ করিতে পারিলে, কৃষকদিগের মনে যে বিমল আনন্দের উদ্রেক হইত, তাহা বর্ত্তমানকালের অসীম ও অতুল ধনরত্নের অধিকারীগণও সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না। ধান্য-শস্য ধন-শস্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ধান্যই আমাদের প্রধান ধন। ধান্যধন এবং গোধন, এই দুইটীই আমাদের সুখ-সম্পদের প্রধান সম্বল। কৃষকের ঘরে তৎকালে অন্নাভাব কদাচিৎ ঘটিত। দুর্ভিক্ষ-জনিত কষ্ট কাহাকে বলে, সেকালের কৃষক তাহা জানিত না। "সুভিক্ষং কৃষকে নিত্যম্"—এই কএকটী কথা সেকালে বেদবাক্যের ন্যায় গণ্য হইত। তৎকালে, অগ্রহায়ণ মাসেই শস্যের ফলাফল দেখিয়া, কৃষকেরা সংবৎসরের ভাগ্য-ফল নির্ণয় করিতে সমর্থ হইত; সুতরাং সুজন্মার বৎসর বার মাসই তাহাদের মহানন্দে অতিবাহিত হইত। সেকালে বঙ্গের কৃষক অথবা কৃষিজীবী ভদ্রলোকের মধ্যে অনেকেই ২।৩ শত মণ ধান ঘরে আনিতে পারিত; গৃহস্থমাত্রেরই গোশালায় অন্ততঃ ২।৪টী দুগ্ধবতী গাভী থাকিত; এবং বাড়ীর পুকুরেও প্রচুর পরিমাণ মৎস্য রক্ষিত হইত। তদ্ভিন্ন, নদ, নদী, খাল ও বিল প্রভৃতিও প্রচুর মৎস্যপূর্ণ ছিল। সুতরাং, তৎকালে অধিকাংশ গৃহস্থই সারাবৎসর মিষ্টান্ন, পরমান্ন, ঘৃতান্ন, পিষ্টক, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মাখন, ছানা এবং মৎস্যের নানাবিধ সামগ্রীতে ভোজন করিতে এবং আপনার পরিবারস্থ সকলকেই পরমা তৃপ্তির সহিত ভোজন করাইতে সমর্থ হইত। তৎকালে পরিবার বলিতে, বর্ত্তমানসময়ের ন্যায়, কেবল স্ত্রী, পুত্র ও কন্যা বুঝাইত না;—আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু, বান্ধব এবং আশ্রয়প্রার্থী ব্যক্তিমাত্রেই সেকালের পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ছিল। নূতন সভ্যতার প্রভাবে, আজকাল মাতা-পিতাও পুত্রের পরিবারভুক্ত হইবার যোগ্য নহেন! তাৎকালিক কৃষিজীবীমাত্রেরই অন্নে উপায়হীন আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতিও সুখ-স্বচ্ছন্দে প্রতিপালিত হইত। কৃষকের অধীনে কার্য্য করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে, এরূপ লোকের সংখ্যা তৎকালে অতি অল্পই ছিল। সেকালে, যাহারা উদরবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকার্জ্জন করিত, তাহাদের মনেও অন্নচিন্তা ছিল না। উদরপূর্ত্তির জন্য যে চিন্তা করিতে হয়, তাহা সেকালের প্রায় সকল লোকেরই অজ্ঞাত ছিল। সেকালেও এ দেশে কৃষির আদর ছিল; পল্লীসমাজে কৃষকের স্থানও উচ্চে ছিল। তৎকালেও মাতব্বর গ্রাম্যকৃষককে কাকা, ভাই, দাদা ও বাপা ইত্যাদি ভাষায় ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর জাতিমাত্রেই সম্বোধন করিত—তাহাদিগকে সকলেই সম্মান করিত—ভয় করিত—আদর করিত এবং তাহাদের সুখে-দুঃখে সমবেদনা প্রকাশ করিত। সেকালের চাষা চাষ-বাস করিত বলিয়া ঘৃণার পাত্র ছিল না;—চাষা কথাটী সেকালে সম্মানসূচকই ছিল।

সেকালে সকল দ্রব্যই সুলভ ছিল; বিশেষতঃ, অন্ন-বস্ত্রের অভাব দূর করিবার জন্য কাহারও বেশী কিছু ক্রয় করিবারও আবশ্যক হইত না। সেকালে হাট-বাজারের সংখ্যাও খুব কম ছিল। যাহাও ছিল, তাহাতে ক্রেতা অপেক্ষা অধিকসংখ্যক বিক্রেতাই উপস্থিত হইত। গৃহস্থ-মাত্রেই ক্ষেত্রোৎপন্ন তিল বা সর্ষপের বিনিময়ে তৈল, তূলার বা কার্পাসসূত্রের বিনিময়ে বস্ত্র এবং অন্যান্য শস্যের বিনিময়ে আবশ্যকীয় অন্যান্য দ্রব্য ঘরে বসিয়াই অনায়াসে প্রাপ্ত হইতেন। সেকালে অন্নচিন্তা কাহারও গৃহে প্রবেশ করিতে পারিত না। তৎকালে মোটা কাপড় ও মোটা ভাতের জন্য সাধারণ কৃষককেও ভাবিতে হইত না। কারণ, তাহাদেরও গোলার সংবৎসরের ধানা সঞ্চিত রহিত। তদতিরিক্ত ধান্যের বিনিময়েই, তাহারা জুগী-জোলায় তৈয়ারী কাপড় এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্য প্রাপ্ত হইত। এক-মাত্র লবণ ব্যতীত, অধিকাংশসময়েই তাহাদিগকে অন্য কোন দ্রব্যই ক্রয় করিতে হইত না। নদী, বিল, খাল ও পুকুর হইতে মৎস্য ধৃত করিয়া এবং স্বীয় স্বীয় গোহাইনের গাভী দোহন করিয়াই, তাহারা মৎস্য ও দুগ্ধের অভাব পূরণ করিতে সক্ষম হইত। দুগ্ধ ও মৎস্যের জন্য তাহাদিগকে কোন চিন্তাই করিতে হইত না। সেকালে দুগ্ধ বিক্রয়ের

প্রথাও তত প্রচলিত ছিল না। কাহারও কোন কারণে অধিক পরিমাণ দুগ্ধের প্রয়োজন হইলে, প্রতিবেশীগণ তাহার সেই অভাব পূরণ করিয়া দিত। কিন্তু এজন্য তাহাদিগকে দুগ্ধের মূল্য দিতে হইত না। তবে কোন কোন স্থানে ধারাণ-ওয়ানের * রীতি প্রচলিত ছিল। সেকালে রাজা, জমিদার ও অর্থশালী লোকেরাও দেশীয় মুচিদের তৈয়ারী নাগড়াই বা দিলোয়াল জুতা, বেত্র বা বংশনির্ম্মিত ছাতি, জুলী-জোলার তৈয়ারী ধুতি-চাদর এবং মোটা কাপড়ের আঙ্গা (অঙ্গরক্ষা) ব্যবহার করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন; এবং ঐ সকল দ্রব্যই তাঁহাদের অঙ্গভূষণ ছিল। তখন চর্ব্য-চুষ্য-লেহ্য-পেয় খাদ্যের প্রতি ব্যক্তিমাত্রেরই বিশেষ দৃষ্টি ছিল; খাদ্য সামগ্রী সুলভে প্রচুর পাওয়া যাইত—লোকে খাইতেও পারিত যথেষ্ট। কিন্তু বিলাসিতার প্রতি কাহারও আদৌ লক্ষ্য ছিল না। সেকালে ষাইট বৎসর বয়সের বৃদ্ধও কদাচিৎ চস্‌মা ব্যবহার করিতেন। তৎকালীন ৵০ আনা—।০ আনা মূল্যের কাচের চস্‌মাতেই বর্ত্তমান কালের ২০।২৫৲ টাকা মূল্যের ব্রাজীল-পেবলের চস্‌মার কার্য্য সাধিত হইত।

সেকালে, কি কৃষক, কি ভদ্রলোক, কি ধনী, কি নির্ধন—সকলেই নিজ নিজ বাস্তুভূমিতে নানাবিধ ফল, মূল ও শাক-সব্জী উৎপন্ন করিত। সুতরাং, তাহাদের ঐ সকল দ্রব্যেরও অভাব হইত না। নিজ পারিবারিক অভাব পূরণ করিয়া,তাহারা উদ্বৃত্তাংশ প্রতিবেশীদিগের মধ্যে-বিতরণ করিত। সুতরাং, কাহারও শাক-সব্জী ও তরকারী প্রভৃতির অভাব হইত না। তৎকালে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের অভাব-মোচনের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য ছিল—প্রবৃত্তিও ছিল। সুতরাং অভাবের কথা, অর্থাৎ 'নাই' কথা মুখে উচ্চারণ করাও দোষ বলিয়া গণ্য হইত। তৎকালে, অভাব-বুঝাইতে হইলে, 'বাড়ন্ত হইয়াছে'—এই কথাই বলা হইত। তৎকালে প্রত্যেকেই জাতিগতব্যবসায় অবলম্বন করিয়া দশের কার্য্য করিত। পক্ষান্তরে, দশের সাহায্যেই তাহারা সপরিবারে প্রতিপালিত হইত। ধোপা, নাপিত প্রভৃতি তাহাদের কার্য্যের জন্য বেতন পাইত না; কিন্তু যাহাদের কার্য্য করিত, তাহাদের নিকট হইতেই আবশ্যকীয় সকল দ্রব্য প্রাপ্ত হইত।

সেকালের কৃষকেরা, দশে মিলিয়া-মিশিয়া কার্য্য করিতে ভালবাসিত এবং সকলসময়েই তাহা করিত। আপনার কার্য্য শেষ হইয়া গেলে, মধ্যসাধ্য অপরের কৃষিকার্য্যের সহায়তাও করিত। এজন্য কখনও পারিশ্রমিক গ্রহণ করিত না। তবে একালের ন্যায়, সেকালেও ভাগদারী কৃষাণ ছিল। তাহারা অপরের ক্ষেত্রে কার্য্য করিয়াই জীবিকানির্ব্বাহ করিত; এবং পারিশ্রমিক বা বেতনের পরিবর্ত্তে, উৎপন্ন ফসলের ভাগ গ্রহণ করিত। সুতরাং, যাহাতে অধিক পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হইতে পারে, তৎপ্রতি তাহাদের বিশেষ লক্ষ্য ছিল; এবং তজ্জন্যই তাহারা অতি যত্নের ও পরিশ্রমের সহিত চাষ-বাসের কার্য্য নির্ব্বাহ করিত। ফলে, ক্ষেত্রস্বামী সুফললাভে কখনও বঞ্চিত হইতেন না।

সেকালে কৃষকদিগের গ্রামসমিতি ছিল। সেই সমিতিতেই কৃষকগণ আপনাদের অভাব-অভিযোগ জানাইয়া প্রতিকারপ্রার্থী হইত। গ্রামের মণ্ডল বা মাতব্বর কৃষকেরা দশে মিলিয়া যে বিচার করিতেন, দোষীর যে দণ্ডবিধান করিতেন, অপরাধীব্যক্তি নতমস্তকে তাহা গ্রহণ করিত। অপরাধ কিছু গুরুতর হইলে, ঐ বৈঠকে গ্রামের ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তিদিগকে সাদরে আহ্বান করিয়া আনা হইত; এবং তাঁহাদের সহিত মিলিয়া মিশিয়াই প্রাচীন কৃষকেরা ন্যায়বিচারে অর্থী-প্রত্যর্থী, উভয়কেই সন্তুষ্ট করিয়া দিতে পারিত। ভূস্বামী স্বয়ং বা তাঁহাদের কর্ম্মচারীগণও অনেকসময় দোষীর বিচার করিয়া যথোচিত শাস্তি দিতে পারিতেন ও দিতেন। ভূমিসংক্রান্ত বিরোধ, কলহ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা প্রভৃতি অপরাধের অভিযোগও তখন রাজদ্বারে পহুঁছিতে পারিত না। যে সকল গুরুতর অপরাধের বিচার কৃষকসমিতি কর্ত্তৃক নিষ্পন্ন হওয়া সম্ভবপর ছিল না, কেবল ঐ সকল অপরাধের বিচারের জন্য কৃষক রাজদ্বারে উপস্থিত হইত। মোকদ্দমা ও কলহ করিবার স্পৃহা সেকালের কৃষকদিগের আদৌ ছিল না;—শান্তিতে বাস করাই তাহাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। সেকালের কৃষক নিরক্ষর হইলেও নির্ব্বোধ ছিল না। অক্ষর-জ্ঞানের অভাবহেতুই, তাহারা বিনয়ী, শান্তিপ্রিয়, অল্পে-সন্তুষ্ট, সত্যবাদী, পরিশ্রমী, কষ্টসহিষ্ণু, সরল ও সরল-বিশ্বাসী ছিল। তখন এ দেশের কৃষকদিগের বড় অন্নাভাব ছিল না। সুতরাং, তাহাদের স্বভাবও অবিকৃত ছিল। লোকে বলে—"অভাবে স্বভাব নষ্ট।" কথাটা খাঁটী সত্য। অধুনা, অভাবের তাড়নায়, তাহাদিগকে বাধ্য হইয়াই নানাবিধ কুবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইতেছে। সেকালের কৃষক সর্ব্বদাই রক্ষণশীল ছিল। তাহারা নূতন কিছু করিতে সহজে রাজি হইত না সত্য, কিন্তু চিরদিনই যাহা করিয়া আসিয়াছে, তাহাই সর্ব্বপ্রযত্নে ও সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দররূপে সম্পন্ন করিত। সেকালের কৃষকেরা তাহাদের গ্রামসমিতি বা বৈঠকে বসিয়াই অভিনব চাষ-বাস-প্রণালী শিক্ষা করিত। তাহাদের জ্ঞাতব্যবিষয়ের সমাধান ঐ সমিতি কর্ত্তৃকই হইত। প্রবীণ কৃষকগণই তাহাদের শিক্ষা ও দীক্ষা গুরু ছিলেন। তাহারা যে প্রণালীতে চাষ-বাস করিত, তাহাকে অনুন্নত-প্রণালী বলা যায় না। আমি তাহাদিগকে যে প্রণালীতে চাষ-বাস করিতে দেখিয়াছি, তদপেক্ষা উন্নত-প্রণালী যে অদ্যাপি এ দেশে আবিষ্কৃত ও প্রচলিত হয় নাই; ইহা মুক্তকণ্ঠেই বলিতে পারি। তাহারা আধুনিক বিজ্ঞান কি তাহা জানিত না সত্য, কিন্তু যাহা করিত, তাহার যুক্তিপ্রদান করিতে বা গূঢ় বৈজ্ঞানিকতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতে না পারিলেও, কি কার্য্য করিলে কি ফল দাঁড়ায়, তাহা তাহারা বলিতে সমর্থ হইত। তাহারা "যো" বুঝিয়া ভূমিকর্ষণ এবং বীজ বপন বা চারা রোপণ করিত। তাহারা আকাশের অবস্থা বুঝিয়া কখন বৃষ্টিপাত হইবে, তাহাও বলিতে পারিত। তাহারা ক্ষেত্রে 'বারমেসে' চাষ করিত। অদ্যাপি এই প্রণালীতেই ভূমিকর্ষণ হইতেছে। ভাদুই, হৈমন্তিক বা রবিশস্য সংগ্রহের পরেই, সুদিন দেখিয়া, তাহারা ক্ষেত্রে হলসংযোগ করিত। সাধারণতঃ ভাদুই-ফসল উঠিবার পরে দ্বিতীয় ফসলের জন্য ভূমিকর্ষণ করাকেই 'বারমেসে চাষ' বলা যায়। এই চাষ দ্বারা ভূমিকে উত্তাপ, আলো ও শীত খাওয়ান হয়। বিজ্ঞান ইহাকে 'wintering' বা 'শীতখাওয়ান' বলে। ইহার উদ্দেশ্য তৎকালীন কৃষকেরা বলিতে না পারিলেও, ইহা দ্বারা যে ক্ষেত্রের উপকার সাধিত হয়, তাহারা মোটামুটীভাবে তাহা বুঝিতে পারিত। দীর্ঘকাল অর্থাৎ কার্ত্তিক হইতে ফাল্গুন পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ ভূমিতে চাষ দিয়া মৃত্তিকা উলট্-পালট্ করিয়া দিলে, কর্ষিত মৃত্তিকা বায়ুস্থিত স্বাভাবিক সার ও ভূমিস্থিত উদ্ভিজ্জ ও ধাতব সার দ্বারা বিশেষ উর্ব্বরতা লাভ করিয়া থাকে; ইহাই বিজ্ঞানের উক্তি। কৃষক এ বিজ্ঞান শিক্ষা না করিলেও, এই কার্য্য দ্বারা ভূমি যে উর্ব্বরতা লাভ করে, তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারে। এই মোটা-মুটী জ্ঞানের উপরে সামান্য শিক্ষালাভ করিলেই, একালের কৃষক বৈজ্ঞানিক-কৃষকরূপে দাঁড়াইতে সক্ষম হইবে। এ বিষয়ে অধিক ভূমিকা লিখিয়া, প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করি না।

একালের ন্যায়, সেকালে বঙ্গদেশে বলিষ্ঠ ও সুস্থ বলদের অভাব ছিল না। কৃষকদিগের অধিকাংশেরই অন্ততঃ ২।১ জোড়া বলদ ছিল। তৎকালে গোচারণ-মাঠের অভাব ছিল না; সুতরাং গো-খাদ্যেরও অভাব হইত না। ফলে, সুস্থ ও সতেজ গাভী ও বলদ এ দেশের সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হইত। তৎকালে কৃষকেরা জষ্ট-পুষ্ট বলদের দ্বারাই উত্তমরূপে ভূমিকর্ষণ করিতে পারিত ও করিত। একালের ন্যায়, সেকালে গাভী দ্বারা হলকর্ষণ করিবার নৃশংস-প্রথা এদেশের কুত্রাপি প্রচলিত ছিল না। তৎকালে গোচারণ-মাঠের অভাব ছিল না বলিয়াই, গাভীও প্রচুর দুগ্ধ প্রদান করিত। একালের এদেশীয় উৎকৃষ্ট গাভী যে পরিমাণ দুগ্ধ প্রদান করে, সেকালে তদনুরূপ দুগ্ধপ্রদায়িনী গাভী সকল নিকৃষ্ট গাভী বলিয়াই গণ্য হইত। একালে পল্লীগ্রামে মনুষ্যের পানীয় জলের অভাব হইয়াছে; কিন্তু সেকালে মনুষ্য কেন, পশ্বাদি জন্তুরও নির্ম্মল পানীয় জলের অভাব ছিল না। সুতরাং, তৎকালে, একালের ন্যায়, দূষিত জলপানজনিত রোগাদি গোগণকে কদাচিৎ আক্রমণ করিতে সমর্থ হইত। প্রচুর

* কোনও ব্যক্তির নিকট হইতে আবশ্যকমত কোন বস্তু গ্রহণ করিয়া, সুবিধামত তাহা প্রত্যর্পণ করাকে "ধারাণ-ওয়ান" বলা হইত।

খাদ্য ও বিশুদ্ধ পানীয় জল সুলভ থাকায়, সেকালের গোগণ অতিশয় সুস্থ, সবল ও কর্ম্মঠ ছিল। একালের কৃষকদের তদ্রূপ লাঙ্গলবাহী পশুর অভাব ঘটিয়াছে। জীর্ণ, শীর্ণ ও রুগ্ন পশু দ্বারাই অধুনা কৃষকগণ হলচালনা করিয়া থাকে। ঐরূপ পশু দ্বারা রীতিমত হালের কার্য্য চলে না। লোকে বলে,—"আছে গরু না বয় হাল, তার দুঃখ চিরকাল"। বর্ত্তমানসময়ে কৃষকের গতি হইয়াছে তাহাই। সুস্থ ও সবল বৃষের অভাবে, অধুনা গো-জাতির উন্নতি বিধানের ও গোজননকার্য্যের বিষম ব্যাঘাত ঘটিতেছে। সেকালে ধর্ম্মোদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধের বৃষ উৎসর্গ করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইত। উহারা স্বাধীনভাবে বিচরণ করিয়া অত্যন্ত সবল হইয়া উঠিত এবং উৎকৃষ্ট গো উৎপাদন করিত। একালে "ধর্ম্মের ষাড়" কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। যদি দৈবাৎ ঐরূপ ষাড় কেহ ছাড়িয়া দেয়, তাহা হইলে পল্লীগ্রামের মুসলমান কৃষক ভায়ারা উহাকে উদরসাৎ করিয়া ফেলে। সহরে ঐরূপ বৃষ ছাড়িয়া দিলে, মিউনীসিপালিটী উহাকে মলবাহী পশুর কার্য্যে নিযুক্ত করেন। এবিষয়ে আইন আমাদের প্রতিকূল। কেননা, ধর্ম্মোদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত বৃষ হনন বা উহাকে অন্তকার্য্যে নিয়োগ করা আইনতঃ অপরাধের কার্য্য নহে। "It is no offence to kill or steal a bull set at large or dedicated for religious purposes".—ইহাই হইল আইনের অভিমত। সুতরাং বর্ত্তমান আইন, সহরের মিউনীসিপালিটী ও মুসলমান ভায়াদের অনুগ্রহে, ধর্ম্মোদ্দেশ্যে বৃষোৎসর্গ করিবার রীতি এ দেশ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অধুনা বিদেশ হইতে আমদানীকৃত ষণ্ড দ্বারা অধিকাংশস্থলেই জননকার্য্য নির্ব্বাহ করা হয়। কিন্তু এ দেশের গাভীর পক্ষে বিদেশীয় ষাড় অনেকস্থানেই অনোপযোগী হইতে দেখা গিয়াছে। ইহা আমি নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। হিসার ও বোগদাদী ষাড় দ্বারা আমি ইহা পরীক্ষা করিয়াছি।

সেকালে এ দেশের গোশালা-প্রস্তুত-প্রণালীও বিজ্ঞানসম্মতই ছিল। গবাদির স্বাস্থ্য যাহাতে নষ্ট হইতে না পারে, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াই, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গোশালা প্রস্তুত হইত। অদ্যাপি ভারতের—বিশেষতঃ বঙ্গের, কোন কোন স্থানে প্রাচীন প্রণালীতে গোশালা-নির্ম্মাণ-প্রথা প্রচলিত আছে। সেকালের কৃষক কৃষিসংক্রান্ত সকল বিষয়ই অবগত ছিল। গভীর কর্ষণের (Deep or thorough cultivation) ফলও তাহারা অনবগত ছিল না। এ সম্বন্ধে এ দেশে একটী কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে; এবং ইউরোপীয় কৃষিগ্রন্থেও ইহার উল্লেখ রহিয়াছে। কোনও কৃষক মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহার পুত্রগণকে একটী ক্ষেত্র নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন—বৎসগণ! ঐ ক্ষেত্রে গুপ্তধন নিহিত আছে; তোমরা উহা খনন করিলে প্রভূত সম্পত্তি প্রাপ্ত হইবে। পিতার মৃত্যুর পর, পুত্রগণ পিতার নির্দ্দেশানুসারে, অতিশয় গভীর করিয়া, ঐ ক্ষেত্র খনন করিল। কিন্তু কোন ধনই প্রাপ্ত না হইয়া নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইল; তৎপর, কৃষকসন্তানেরা গভীররূপে কর্ষিত ক্ষেত্রে শস্যবীজ বপন করিল। ঐ ক্ষেত্রে আশাতীত ফসল উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহাতেই তাহারা বুঝিতে পারিল, গভীর কর্ষণের ফলেই ক্ষেত্রে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হইয়াছে। বীজ-নির্ব্বাচনকার্য্যেও এ দেশের কৃষকেরা অনভিজ্ঞ ছিল না। ক্ষেত্রজাত সুপুষ্ট ও সুপক্ক ফসলই তাহারা বীজের জন্য রক্ষা করিত। পূর্ব্বে ধান্যবীজ যে প্রণালীতে রক্ষিত হইত, তাহা সম্ভবতঃ কেহ কেহ অবগত আছেন। সেকালের কৃষক অতি সুস্থ, সুপক্ক, অরুগ্ন ও সবল ধান্যসিজ * বাছিয়া বাছিয়া—ক্ষেত্রের নানাস্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া, উহার আটী ও মোচা (Ball) বান্ধিয়া রাখিত। ঐ আটীর নাম ছিল—'নোচ' (Bundle)। ঐ বীজধান্যকে উত্তমরূপে সূর্য্যোত্তাপে শুষ্ক করিয়া এবং উহা হইতে চিটা অর্থাৎ শাঁসহীন ধানগুলিকে বাছিয়া ফেলিয়া, নোচ বা মোচার আকারেই বীজের জন্য উহা রক্ষা করিত। তাহারা ক্ষেত্রোৎপন্ন ধান্যকে ভোজন ও বিচন বা বিছন—এই দুইভাগে বিভক্ত করিত। যে ধান খাইতে হইবে, উহার নাম ভোজন এবং যাহা বীজের জন্য

* ধানগাছের বীজসহ অগ্রভাগের নাম 'সিজ' (Blade) বা আগিলা ধান।

রক্ষা করিতে হইবে, তাহার নাম ছিল বিচন বা বিছন ধান। কৃষিকার্য্যে সফলতা লাভ করিতে হইলে, গভীর কর্ষণ ও বীজ-নির্ব্বাচনের প্রতিই বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। এদিকে প্রাচীন কৃষকের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। মনু বলিয়াছেন,—সুক্ষেত্রে সুবীজ বপন করাই কৃষিকার্য্যে সফলতালাভের মূলভিত্তি।

"সুক্ষেত্রে বপিতং বীজং।
সুপুত্রে দাপিতং ধনং॥"

সুতরাং, বহু প্রাচীনকাল হইতেই, এ দেশের কৃষক এ সকল বিষয় অবগত ছিল। ভূমিতে সারব্যবহারের উপকারিতাও তাহারা সম্যক অবগত ছিল। তাহারা ভূমির দোষগুণও বুঝিতে পারিত। তাহা বুঝিয়াই, তাহারা কোন্ ভূমিতে কোন্ ফসল স্বভাবতঃ উৎপন্ন হইতে পারে, শস্যবীজ বপনের পূর্ব্বে, ইহা স্থির করিয়া, ক্ষেত্রসমূহে তদুপযোগী ফসলের বীজ বপন করিত। কোন্ ক্ষেত্রের কোন্ অংশে কি ফসল জন্মিতে পারিবে, তাহাও তাহারা পূর্ব্বেই স্থির করিয়া লইত।

"হাত্‌কে রাঙ্গ, হাতকে সোণা।"

এইটী প্রাচীন চাষার কথা। ইহার অর্থ এই যে, একই ক্ষেত্রের বিভিন্ন স্থানে উত্তম ফসল বা সোণা এবং নিকৃষ্ট ফসল বা রাঙ্গ (দস্তা) উৎপন্ন হইতে পারে। সেইজন্য ভূমির দোষগুণ বিবেচনায়, উহাতে নানাবিধ শস্যবীজ বপন করিত। প্রকৃতির সহিত বিরোধ করিয়া কৃষিকার্য্যে সফলতা লাভ করা যায় না; ইহাও তাহারা জানিত। তৎপর, কৃষির আনুষঙ্গিক গোসেবা,—কিরূপে গৃহপালিত গাভী ও লাঙ্গলবাহী পশুর যথোচিত সেবা করিতে হয়, তাহাও তাহারা বেশ জানিত। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে বলদগুলিকে পেট ভরিয়া খাওয়াইয়া, তাহারা উহাদিগকে লইয়া মাঠে যাইত; এবং প্রাতঃকাল হইতে এক 'ক দেড় প্রহর বেলা পর্য্যন্ত ভূমিকর্ষণ করিত। ক্ষেত্রেই নকুল বা খড়সান খাওয়ার কার্য্য শেষ করিয়া, বেলা চড়িলেই (প্রখর সূর্য্যোত্তাপ আরম্ভ হইলেই), হাল ছাড়িয়া, তাহারা বলদসহ গৃহে প্রত্যাগমন করিত। এদিকে কৃষক-পরিবারস্থ মহিলারা পশ্বাদির আহার্য্য দ্রব্য ও পানীয় জল প্রস্তুত রাখিত। ক্লান্তপশুগণকে অপরাহ্নের কিয়দংশ পর্য্যন্ত আহার দিত। তৎপর, কিঞ্চিৎ বেলা থাকিতে, পুনরায় উহাদিগকে কর্ষণ-কার্য্যে নিযুক্ত করিত। সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে কৃষকেরা লাঙ্গলবাহী বলদসহ গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া, পুনরায় রাত্রি ৯।১০ টা পর্য্যন্ত উহাদিগকে পুষ্টিকর খাদ্য খাইতে দিত। তাহারা বলিত,—"পেট ভরিয়া খাওয়াও, আর পিঠ ভরিয়া কিলাও" অর্থাৎ পশুকে পেট ভরিয়া খাওয়াইয়া, উহাকে ইচ্ছানুযায়ী খাটাইলেও, উহার শক্তি অব্যাহত থাকে। তৎকালে পশুদের শ্রম ও বিশ্রামের সময় নির্দ্ধারিত ছিল। ভূমিকর্ষণের বা বীজবপনের "যো" হইলে, কখন কখন এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিত সত্য, কিন্তু তৎকালে কৃষকেরা পশুদের আহারের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিত।

গোচিকিৎসাসম্বন্ধেও তৎকালীন কৃষকদিগের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। তাহারা পশুর রোগ ও রোগের নিদান সহজেই নির্ণয় করিতে সমর্থ হইত। রোগানুযায়ী ঔষধের ব্যবস্থা তাহারা নিজেরাই করিতে পারিত ও করিত। আবশ্যক হইলে, গো-চিকিৎসার জন্য অন্য কোনও প্রবীণ লোকেরও বড় অভাব হইত না। সাধারণতঃ গোপজাতিই গবাদি পশুর সুচিকিৎসক ছিল। ইহারা পূর্ব্ববঙ্গে "ডাক-গোয়াল" নামে প্রসিদ্ধ। ইহাদের চিকিৎসায় কদাচিৎ পশুর মৃত্যু ঘটিত। অধিকাংশস্থলেই, সুচিকিৎসার ফলে, রুগ্নপশু আরোগ্য লাভ করিত। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, সে দিন চলিয়া গিয়াছে। অধুনা, পশু-চিকিৎসক (Veterinary surgeon) নামে একশ্রেণীর পশু-চিকিৎসকের সৃষ্টি হইয়াছে। ঘোটক ও কুক্কুর চিকিৎসার জন্যই এই পদের সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। ইহাদের দ্বারা গোচিকিৎসার যে বিশেষ কোনও উপকার হয়, ইহাতে আমার বিশ্বাস নাই। কেননা, আমি কোনও কোনও সময়, ইহাদের দ্বারা গাভীর চিকিৎসা করাইয়া, কিছুই ফললাভ করিতে সক্ষম হই নাই। বরং দেশীয় মূর্খ কৃষকজাতীয় গোচিকিৎসকের চিকিৎসায় অনেক সময় সুফললাভ করিয়াছি।

সেকালের কৃষক সারব্যবহারের উপকারিতা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতে সমর্থ ছিল। তাহারা ভূমিতে গোবিষ্ঠা ও সমুত্র গোশালার আবর্জ্জনাই সর্ব্বদা ব্যবহার করিত। ইহাই প্রকৃতি-সুলভ সার। তদ্ভিন্ন, ২।৪ বৎসর ভূমিকে পতিত রাখিয়া, উহা উদ্ভিজ্জসারের দ্বারা উর্ব্বর করিয়া লইত। জমি পতিত রাখিলে, উহা উর্ব্বর হয় কেন, ইহার বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব অবগত না থাকিলেও, পতিত রাখিলেই যে ভূমি উর্ব্বরতা লাভ করে, ইহা তাহারা জানিত। ছাই, চূণ, পলিমাটী, পচামাটী, খইল, পচাপাতা ও উদ্ভিজ্জিসার প্রভৃতির উপকারিতাও তাহারা বেশ বুঝিতে পারিত। সাররূপে ধইঞ্চা ও শণ ব্যবহারের উপকারিতাও তাহারা জানিত। বলিতে গেলে, এ দেশীয় কৃষকই শেষোক্ত দ্বিবিধ প্রকার সারের আবিষ্কর্ত্তা। তাহাদের দৃষ্টান্তানুসরণ করিয়াই, অধুনা সুদূরবর্ত্তী ইউরোপে ও আমেরিকায় এই সকল সারব্যবহারের রীতি প্রবর্ত্তিত হইতেছে। এ দেশের কৃষক জানিত না কি, এবং তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়ারই বা আছে কি? অধুনা রসায়নবিজ্ঞানের সাহায্যে নাইট্রোজেন প্রমুখ যে সকল সারের আবিষ্কার হইয়াছে, পূর্ব্বোক্ত সারে, উহাদের অধিকাংশেরই অস্তিত্ব লক্ষিত হয়। সুতরাং নূতন কিছুই নহে; কেবল রসায়নশাস্ত্রের প্রভাবে, উহাদের উৎকর্ষ-সাধন ও উন্নতিবিধান ক্রিয়া সাধিত হইয়াছে। যথা:—ভূমির টীকা দেওয়া। আমাদের কৃষকদিগকে কৃষি-রসায়নশাস্ত্র মোটামুটভাবে শিক্ষা দিলেই, উহারা কৃষি-বিজ্ঞানশাস্ত্রে অনেকটা অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারে।

এদেশেও কৃষি-বিজ্ঞানসম্বন্ধে নানাবিধ গ্রন্থ ও শাস্ত্রগ্রন্থ রহিয়াছে। মনুসংহিতা, পরাশরসংহিতা ও খনার বচন প্রভৃতিই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কালধর্ম্মে কৃষিকার্য্যে আমাদের বীতস্পৃহা জন্মিয়াছে। ফলে, উহার ক্রমাবনতিই ঘটিতেছে। কি উপায়ে আমাদের এ কৃষিপ্রাণ-দেশের কৃষির যথোচিত উন্নতি হইতে পারে, সে বিষয়ে আমরা নিশ্চেষ্ট। পক্ষান্তরে, কুক্কুরবৃত্তি অবলম্বন করিতেই আমরা অধিকতর প্রয়াসী। যে দেশে কৃষির অনাদর, ভগবান সে দেশের মঙ্গলবিধান কখনই করিবেন না। আমরা চিরকালই পরের গোলামী করিয়া খাইব; এইটাই বোধ হয় আমাদের ভাগ্যলিপি!

তারপর, একাল—একালের কৃষি ও কৃষকের অবস্থা কেহই অজ্ঞাত নহেন। সুতরাং, তৎসম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে কোন কথা না বলিয়া, এ দেশের কৃষি ও কৃষকের অবনতি ঘটিবার কারণ কি, তদ্বিষয়ে সংক্ষিপ্তভাবে কএকটী কথা বলিয়াই, বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব। এই অবনতির ভিতর দিয়াই, একালের কৃষি ও কৃষকের পরিচয় পাওয়া যাইবে।

১। **গোচারণ-ভুমির অভাব**—প্রাচীনকালে এ দেশে গোচারণ-ভূমির অভাব ছিল না। সুতরাং গোসকল অবাধে উদরপূর্ত্তি করিয়া আহার করিবার সুবিধা পাইত। একালে, ভূম্যধিকারী মহাশয়গণের অনুগ্রহে, সূচ্যগ্র পরিমাণ ভূমিও গোচারণের জন্য পতিত রহে না। গো সকল সেই জন্যই রীতিমত খাইতে পায় না; এবং আহারের অভাবে দিন দিন ক্ষীণ, দুর্ব্বল ও রুগ্ন হইয়া পড়ে। ফলে, ঐরূপ দুর্ব্বল পশু দ্বারা হলকর্ষণ কার্য্য অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে।

২। **গোজাতির ক্রমধ্বংস**—এ দেশের গোজাতি নানাকারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে। প্রথমতঃ, দেশব্যাপী সংক্রামক-রোগের প্রাদুর্ভাব ও তাহার প্রতিকারোপায়ের অভাব। অধিকাংশসময়ে বসন্ত, জ্বর, পেটের পীড়া প্রভৃতি নানাবিধ রোগ দ্বারা গোজাতির মহামারী উপস্থিত হয়। কিন্তু উপযুক্ত চিকিৎসকের অভাবে, উহার প্রতিকারবিধান কিছুই হইতে পারে না। ফলে, প্রতি বৎসর, এই সকল রোগ দ্বারা সহস্র সহস্র গো মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তৎপর, অবাধ গোহত্যা—প্রতিবৎসর মুসলমান ভ্রাতৃগণ শুধু উদরের পরিতৃপ্তির জন্য সহস্র সহস্র গোহত্যা করিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে, দেশীয় খৃষ্টান ও সাহেবদিগের উদরপূর্ত্তির জন্যও প্রতিবৎসর অসংখ্য গোহত্যা হয়। চর্ম্মব্যবসায়ীগণও, চামড়ার লোভে, দেশীয় মুচি ও কসাইদের দ্বারা বহু গোহত্যা করাইয়া থাকে। ইহারা বিষপ্রয়োগ করিয়া বা প্রকারান্তরে প্রতিদিন শত শত গোহত্যা করিতেছে। কখন কখন কৃষকের গোশালা হইতে গরু

অপহরণ করিয়াও, উহারা তাহার চর্ম্ম উঠাইয়া নিতেছে। ইহার শত শত দৃষ্টান্ত সুলভ। আজকাল বঙ্গের প্রায় সর্ব্বত্রই, এই চর্ম্মব্যবসায়ীগণ চামের গুদাম উঠাইয়া বসতি করিতেছে। তাহাদের ব্যবসায়ের উন্নতিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই, এ দেশে গোজাতিও ক্রমেই অত্যধিকরূপে হ্রাস পাইতেছে। এই জন্যই, পূর্ব্বের ন্যায়, এক্ষণ আর কৃষকমাত্রেরই হালের বলদ নাই। যে সকল কৃষকের একজোরা বলদ আছে, চাষের সময়, উপরোক্ত কোনও কারণে, উহার একটীর অভাব হইলেও, গরীব কৃষক ঋণ গ্রহণ না করিয়া আর ঐ অভাব পূরণ করিতে সক্ষম হয় না। অত্যধিক হারে সুদ দিয়াও, অনেক কৃষকই অর্থসংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারে না। কারণ, উহারা ক্রমেই এত অধিক পরিমাণে ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছে যে, এক্ষণ আর উহাদিগকে মহাজনেরা সহজে টাকা ধার দিতে রাজি হয় না। ফলে, একবার বলদের অভাবে হইলে, সকল কৃষকই নূতন বলদ ক্রয় করিতে পারে না। কেহ কেহ, বলদের অভাবে, দেশী দুর্ব্বল ও রুগ্ন ষাড় অথবা গাভী দ্বারাই হলকর্ষণ করিতে বাধ্য হয়। এ দেশে কৃষির ক্রমাবনতি ঘটিবার ইহাও একটী প্রধান কারণ।

৩। **দৈব প্রতিকূলতা**—কোনও বৎসর দৈবাৎ সময়মত বৃষ্টির অভাব হইলে, কৃষককে সে বৎসর ভাগ্যচক্রের ঘোর আবর্ত্তনে পতিত হইতে হয়। অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টিহেতু বা অন্য কোন দৈবকারণে, কোনও কোনও বৎসর কোন ফসল না জন্মিলেও কৃষককে অভাবনীয় অভাবে পতিত হইতে হয়। তখন তাহাকে বাধ্য হইয়াই, উদরপূর্ত্তির জন্য, উচ্চসুদে ঋণ গ্রহণ করিতে হয়। এই ঋণ তাহারা পুরুষানুক্রমেও শোধ করিতে পারে না। ঋণের সুদ যোগাইতেই কৃষকের কষ্টার্জ্জিত অর্থ ব্যয়িত হইয়া যায়। ফলে, তাহারা কৃষিকার্য্যে যথোচিত অর্থব্যয় করিতে সমর্থ হয় না। এ দেশের কৃষি ও কৃষকের ক্রমাবনতি ঘটিবার, ইহাও একটী প্রধান কারণ বলা যায়।

৪। **চাষের নেশার অভাব বা কৃষিকার্য্যে বীতস্পৃহা**—সুশিক্ষিত ব্রাহ্মণসন্তানেরাও যতদিন হালের কোটী বা মুঠী ধরিয়া—চাষ-বাস করিয়া, জীবিকানির্ব্বাহ করিতে দ্বিধাবোধ করিতেন না, হালের কোটী ধরিলে যতদিন বাঙ্গালার উচ্চশ্রেণীর লোকেরও জাতি যাইত না—যতদিন চাষের কাজ বা চাষার কাজ বঙ্গদেশে গৌরবের বিষয় ছিল, ততদিন পর্য্যন্ত এ দেশের কৃষক বা চাষার চাষের নেশা অক্ষুণ্ণ ছিল; ফলে, বাঙ্গালীকেও কাঙ্গালী সাজিতে হয় নাই। কিন্তু যে দিন হইতে বাঙ্গালী বাবু সাজিতে শিখিয়াছে, যে দিন হইতে চাষা কথাটা এ দেশে গালি হইয়া দাঁড়াইয়াছে, যে দিন হইতে আমাদের চাষা-কাকা, চাষা-দাদা ও চাষা-বাপা পাঁড়াগেঁয়ে ভূতের স্থান অধিকার করিয়াছে, সেইদিন হইতেই চাষের প্রতি এদেশের চাষার নেশা ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে। ফলে, বাঙ্গালীরও পোড়া-কপালের সূত্রপাত হইয়াছে।

কৃষি, কৃষকের কার্য্য; চাষ করিতে হইলেই চাষা হওয়া চাই—চাষার নেশা থাকা চাই। যে নিজে চাষা হইয়া খাটিতে পারে, সেই পূর্ণ সুফল লাভ করিতে পারে। যে নিজে না খাটিয়াও, সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া, চাকরকে খাটাইতে পারে, সেও আংশিক সুফললাভে বঞ্চিত হয় না। কিন্তু যাহারা চাকরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়াই ঘরে বসিয়া থাকেন বা অন্য কার্য্যে লিপ্ত হ'ন, তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রকারেই নিরাশ হইতে হয়।

"বাপ বেটায় চাষ চাই।
তা অভাবে সোদর ভাই॥
*   *   *   *
খাটে খাটায় লাভের গাতি।
তার অর্দ্ধেক কাঁধে ছাতি॥
ঘরে বসে পুছে বাত।
তরে ঘরে হা ভাত॥" (খনা)।

চাষ করিতে হইলে, চাষা হওয়ার আবশ্যকতা কি, তাহা উদ্ধৃত খনার বচনে স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে। বস্তুতঃ, চাষে সুফললাভ করিতে হইলে, চাষা হওয়া চাই—চাষার পুরা নেশা থাকা চাই। তাহা না হইলে চাষে সুফললাভ দুরাশা মাত্র। কিন্তু অধুনা, চাষার ছেলেও, শিক্ষাভিমানী বাবুদের আদর্শানুকরণে, চাষানাম ঘুচাইয়া—চাষ-বাস ছাড়িয়া,

'বাবু' হইয়া উঠিতেছে। তাহারাও এখন জুতা, মোজা পড়িয়া—সার্ট-কোর্ট গায়ে দিয়া—বাঙ্গালাভাষার দুই চারিখানি প্রাথমিক শিক্ষার বই পাঠ করিয়া—হালের মুঠি ধরা অসম্মানজনক মনে করে! ফলে, কৃষকদিগের মধ্যেও আজকাল বেতনভোগী ভৃত্য বা ভাগদারী কৃষাণের দ্বারা চাষবাস করাইবার প্রথা প্রচলিত হইয়া উঠিতেছে। চাষাদের যে চাষের নেশা কমিয়া যাইতেছে, উহা তাহারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। একালের কৃষকসন্তানদিগের মধ্যে যাহারা কিছুমাত্র লেখাপড়া শিখিয়াছে, তাহাদের প্রায় অধিকাংশই, পৈতৃক ব্যবসায় — হালচাষ পরিত্যাগ করিয়া, চাকুরীর জন্য লালায়িত। ঢাকার সরকারী কৃষি-পরীক্ষা-ক্ষেত্রে প্রতি বৎসর কএকজন শিক্ষানবীশ লওয়া হয়। সাধারণতঃ সামান্য লেখাপড়াজানা কৃষকসন্তানেরাই এই কার্য্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সরকারী কৃষিক্ষেত্রে পনর টাকা বেতনে কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া, স্বহস্তে হলকর্ষণ ও অন্যান্য কৃষিকার্য্য করিবার জন্য ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বরিশাল, ত্রিপুরা, নোয়াখালী প্রভৃতি স্থানের শত শত কৃষকসন্তান — ইহাদের কেহ বা নিম্নপ্রাইমারী পাশ, কেহ বা উচ্চপ্রাইমারী পাশ, কেহ বা ছাত্রবৃত্তি পর্য্যন্ত পড়িয়াছে, কেহ বা যৎসামান্য ইংরাজিও পড়িয়াছে—প্রতিনিয়তই ঢাকা যাতায়াত করিতেছে। এমন দিন খুব কম যায়, যে দিন "কৃষি-সম্পদ" আফিসে ও আমার নিকট উক্তরূপ চাকরীর উমেদার অন্ততঃ ২।১ জন উপস্থিত না হয়। আমি কৃষি-সম্পদ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত নিশি বাবুর মুখে শুনিয়াছি, তিনি প্রায়ই নামমাত্র শিক্ষিত কৃষকসন্তানদিগের নিকট হইতে চাকরীর দরখাস্ত ও চাকরী-সংক্রান্ত বহু প্রশ্নসমন্বিত পত্র পাইয়া থাকেন। যাহারা নিশিবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহার অনুরোধ-পত্র লইতে আইসে, তিনি তাহাদিগকে আপনাদের ক্ষেতেই স্বহস্তে চাষ-বাস করিতে পরামর্শ দিয়া থাকেন। কিন্তু যাহাদিগকেই চাকরীর চেষ্টা ত্যাগ করিতে বলা হয়, তাহাদের প্রায় সকলেই বলিয়া থাকে—"স্বহস্তে চাষ-বাস করিলে যে বেশ সুখে থাকা যায়, তাহা বুঝি; কিন্তু তাহা হইলে আর সম্মান থাকে না।" আশ্চর্য্যের বিষয়, এই সকল কৃষকসন্তানদিগের প্রায় সকলেরই বাড়ীতে ২।৪ জন করিয়া বেতনভোগী চাকর বা ভাগদারী কৃষাণ রহিয়াছে। কৃষক-সন্তানদিগের চাষের প্রতি কিরূপ নেশা আছে, ইহা তাহারই প্রমাণ। চাষার ছেলের চাষের নেশার অল্পতা বা অভাবই, এ দেশের কৃষির অবনতি ঘটিবার আর একটি প্রধান কারণ।

৫। **অনুচিত সম্মানবোধ** — চাকুরী করিলেই বাবু—সম্মানের পাত্র হওয়া যায়, আর চাষ করিলে অবজ্ঞার পাত্র হইতে হয়;—এই দৃঢ় বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই, অধিকাংশ কৃষক স্বীয় স্বীয় সন্তানদিগকে বাল্যকাল হইতেই হাতে-হেতেড়ে চাষ-বাস শিক্ষা না দিয়া, উহাদিগকে গ্রাম্য পাঠশালায় ভর্ত্তি করিয়া দেওয়াই শ্রেয়স্কর মনে করে। তাহাদের অনেকের মুখেই শুনিয়াছি—"নিজে চাষাগালি শুনিতেছি; ছেলেকে চাষের কাজে রাখিয়া আর অবজ্ঞার পাত্র করিব কেন?"—কথাটা, একহিসাবে, অসঙ্গত বলা যায় না। কারণ, একালে কৃষক বা চাষা বলিলে, সাধারণতঃ নিরক্ষর, অনশনক্লিষ্ট, অৰ্দ্ধনগ্ন, নীচজাতীয় লোককেই বুঝায়। যে ভদ্রলোকের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতে পারে না, যাহার গায়ে পিরণ, পায়ে জুতা নাই, তাহাকেই আমরা চাষা বলিয়া ঘৃণা করি ও গালি দিয়া থাকি। চাষা কথাটা একালে সম্মানের নহে — চাষ-বাসও সম্মানজনক নহে। সুতরাং কৃষকদিগের অনুচিত সম্মানবোধ অস্বাভাবিক বলা যায় না। সেকালের কৃষকের আত্মসম্মানবোধ ছিল। তাহারা যে দেশের মেরুদণ্ডস্বরূপ—দেশের অন্নদাতা বা প্রতিপালক, তাহাদের শ্রমোৎপন্ন শস্যেই যে দেশবাসী জীবিত রহে এবং তাহারা যে অতি পবিত্র, সুখশান্তিপূর্ণ ও বিশেষ সম্মানজনক কৃষিকার্য্যে লিপ্ত রহিয়াছে, তাহা তাহারা বেশ বুঝিত। বিশেষতঃ, তৎকালে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তিরাও স্বহস্তে হলচালনা করিয়া ও কৃষকদিগের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়া, তাহাদের কার্য্যের মহত্ব নীরবে প্রকাশ করিত। সুতরাং, সেকালের কৃষকেরা চাষ-বাসে সংলিপ্ত রহিয়াই আত্ম-গৌরব অনুভব করিত। একালের কৃষকেরা তাহাদের মহত্বের কথা ভুলিয়া গিয়াছে;— বিশেষতঃ, চাকরী-প্রিয় শিক্ষিত

বাবুরাও কৃষকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা দূরে থাকুক, তাহাদিগকে অযথা ঘৃণা করিতেই শিখিয়াছেন। এমতাবস্থায় কৃষকের হৃদয়ে আত্মসম্মানবোধের বিলোপসাধন এবং অনুচিত সম্মানবোধের উৎপত্তি অস্বাভাবিক নহে। একালে কৃষকদিগের হৃদয়ে অনুচিত সম্মানবোধ জন্মিয়াছে বলিয়াই, উহারা চাষা-নাম ঘুচাইয়া বাবু সাজিয়াছে;—ক্রমশঃই উহারা বিলাসী হইয়া পড়িতেছে। এই বিলাসিতাই, এ দেশের কৃষি ও কৃষকের সর্ব্বনাশসাধন করিতেছে। কৃষকদিগের আত্মসম্মানবোধ না থাকিলে, তাহাদের আত্মোন্নতির চেষ্টা হইবে কেন?

৬। **শিক্ষার অভাব:** —এ দেশে কৃষক-সন্তানদিগের কৃষিশিক্ষার কোনরূপ বিদ্যালয় বা কৃষি-বৈঠক নাই। গ্রাম্য-পাঠশালায় নামমাত্র শিক্ষালাভ করিয়া, তাহাদিগকে বাবু সাজিতে ও কৃষির প্রতি বীতস্পৃহ অথবা মোকদ্দমা-প্রিয় হইতেই দেখা যায়। সুতরাং, এ দেশের নিম্নশিক্ষাপ্রণালীকে কৃষকসন্তানদিগের ভাবী শুভঙ্কর বলিতে পারি না। কৃষকসন্তানদিগের অধিকাংশই, প্রধানতঃ অর্থাভাবে, উচ্চবিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতে পারে না; তাহাদিগকে প্রাথমিক শিক্ষালাভ করিয়াই পাঠসমাপন করিতে হয়। তাহারা যাহা শিক্ষালাভ করে, তাহাতে ভাল চাকুরীও যোটে না, অথচ কার্য্যকরী শিক্ষালাভও হয় না। সুতরাং তদ্রূপ শিক্ষা—"গুণ হ'য়ে দোষ হ'ল বিদ্যার বিদ্যায়"—এদেশের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী বলিয়াই মনে হয়। পক্ষান্তরে, কৃষকসন্তানদিগের প্রকৃত শিক্ষার অভাবকেও এদেশের কৃষি ও কৃষকের অনুন্নতির একটি প্রধান কারণ বলা যায়। মার্কিন ও জাপ-কৃষকদিগের মধ্যে প্রকৃত শিক্ষাবিস্তারের ফলেই যে, তাঁহাদের এত উন্নতি ঘটিয়াছে, তাহা শিক্ষিতব্যক্তিদিগের অজ্ঞাত নহে।

৭। **অর্থের অভাব**—কৃষকদিগের বর্ত্তমান দারিদ্র্য বা অর্থের অভাবই, এ দেশের কৃষি ও কৃষকের অনুন্নতির মুখ্যকারণ। এমন কৃষক অতি অল্পই আছে, যাহার ঋণ নাই। কৃষকেরা বেশ জানে, তাহাদের জমিতে সার দিলে, ভাল একজোড়া বলদ ও একখানি লাঙ্গল কিনিয়া উত্তমরূপে চাষ করিতে পারিলে এবং অর্থব্যয় করিয়া সুবীজ সংগ্রহ ও জলসেচনাদি করিতে পারিলে, খরচ বাদেও তাহার বেশ লাভ দাঁড়ায়। কিন্তু এই নিমিত্ত যে 'পুজি' অথবা মূলধনের প্রয়োজন, তাহা তাহার আদৌ নাই। সুতরাং, ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিয়া যে সুফললাভ করিবে, সে শক্তিও তাহার নাই। এ দেশের নিরক্ষর ও নির্ধন কৃষকেরা যেরূপ নিকৃষ্ট লাঙ্গল, রুগ্ন ও নিস্তেজ বলদ—স্থানবিশেষে বলদের পরিবর্ত্তে গাভী—দ্বারা নামমাত্র চাষ করিয়া, মহাজনের নিকট হইতে অথবা স্থানীয় হাট-বাজার হইতে সংগৃহীত অতি নিকৃষ্ট বীজবপন করিয়া, এবং সার-প্রদান, জলসেচন অথবা যথোচিত যত্ন ও পাইট না করিয়াও, যেরূপ শস্য জন্মাইতেছে, তাহাতে তাহাদিগকে কৃষিবিষয়ে অনভিজ্ঞ বলিতে পারা যায় না। বস্তুতঃ, এ দেশের কৃষক-দিগকে কৃষিকার্য্যে অনভিজ্ঞ বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। বর্ত্তমানকালের শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মতে, কৃষক-দিগকে বিজ্ঞানসম্মত-উন্নত-প্রণালীর চাষ-বাস শিক্ষা দিতে না পারিলে, এদেশের কৃষি ও কৃষকের উন্নতি সুদূর-পরাহত। কিন্তু আমরা সর্ব্বাংশে, এ মতের সমর্থন করিতে পারি না। কারণ, এ দেশের কৃষক বিজ্ঞান-অসম্মত বা এ দেশের পক্ষে অনুপযোগী কিছুই করে না। সুতরাং, তাহাদিগকে কৃষি-শিক্ষা দেওয়ার জন্য চেষ্টা না করিয়াও, তাহাদের অর্থাভাব দূর করিবার জন্য চেষ্টা করিলেই প্রকৃত কাজ করা হইবে। যে দেশের কৃষক সারের উপকারিতার বিষয় বেশ বুঝিতে পারিয়াও, জ্বালানী-কাষ্ঠের অভাবে, গোময় শুষ্ক করিয়া জ্বালাইতে বাধ্য হয়, যে দেশের কৃষক ভাল বীজের উপকারিতার বিষয় জানিয়াও, দু'পয়সা বেশী পাইবার লোভে বীজধান্য বিক্রয় করিয়া ফেলিতে বাধ্য হয় অথবা পেটের দায়ে বীজধান্যের দ্বারাও উদরপূর্ত্তি করে, যে দেশের কৃষক বলদের ক্রয়োপযোগী অর্থের অভাবে, অস্থিচর্ম্মসার দুগ্ধবতী গাভী দ্বারা হলচাষ করিয়া থাকে, যে দেশের কৃষক জমি প্রস্তুত করিয়াও, অর্থের অভাবে, বীজ কিনিয়া তাহাতে বপন করিতে পারে না, যে দেশের কৃষক যৎসামান্য পয়সা বাঁচাইবার অভিপ্রায়ে, এবং তেজী বলদের অভাবে, লাঙ্গলের লোহার ফালখানি সুকর্ষণোপযোগী করিয়া লইতে পারে না, সে দেশের পক্ষে উন্নত-প্রণালীর কৃষিশিক্ষা

অপেক্ষা প্রয়োজনীয় অর্থলাভই বিশেষ শুভজনক নহে কি? কৃষকের অর্থের অভাব দূর করিয়া দিতে পারিলে, এবং চাষে চাষার পুরা নেশা জন্মাইয়া দিতে পারিলে, এ দেশের কৃষকেরাই আবার সোণা ফলাইতে পারিবে। এ দেশের কৃষককে নির্ধন বলিতে পারি; কিন্তু তাহাদিগকে কৃষিতত্ত্বে অনভিজ্ঞ বলিতে পারি না। তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়ার যে কিছুই নাই, এমন কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নহে। তবে, ইহাও বলিতে পারি যে, এ দেশের কৃষি ও কৃষকের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিসাধন করিতে হইলে, কৃষকের অর্থাভাব দূর করিবার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে; কিন্তু কৃষি-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তাহার তুলনায় অতি অকিঞ্চৎকর।

৮। মহাজনের অত্যাচার—এ দেশীয় কৃষককুল নির্ধন; সুতরাং, অভাবের সময়, তাহারা শোণিত-শোষণকারী মহাজনদের নিকট হইতে অতি উচ্চসুদে (কখন কখন শতকরা মাসিক ১২।০ টাকা হইতে ৩৭।০ বা তদূর্দ্ধে) ঋণগ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। কেহ কেহ ধর্ত্তা, পর্ত্তা ও ভাওকর হিসাবেও ঋণগ্রহণ করিয়া থাকে। কখন কখন আবশ্যকীয় বীজ গ্রহণ করিয়া, তাহার চতুর্গুণ মূল্যের শস্য মহাজনকে দেয়। বীজ, কৃষি-যন্ত্র ও লাঙ্গলবাহী বলদের অভাব হইলে, অথবা উদরপূর্ত্তির ব্যবস্থা করিতে না পারিলে, কৃষকগণ বাধ্য হইয়াই মহাজনের দ্বারস্থ হয়, এবং উচ্চসুদের ও চক্রবৃদ্ধির হারে ঋণগ্রহণ করে। একবার মহাজনের কবলে পড়িলে আর উদ্ধারের উপায় নাই। দৈবাৎ একটী ফসল মারা গেলে—অর্থের অভাবে, একটী বৎসর সুদ যুগাইতে না পারিলে, ইহজীবনে জলৌকারূপী মহাজনগণের গ্রাস হইতে দুস্থ কৃষকেরা আর মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয় না। এমন কি, পুরুষানুক্রমেও তাহারা ঋণের দায়ে আবদ্ধ রহে। এইরূপেই দেশীয় কৃষককুল ধ্বংসের পথে পতিত হইতেছে। মহাজনের অত্যাচারের বিষয় অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। মহাজনের অত্যাচারকেও এ দেশের কৃষি ও কৃষকের অনুন্নতির একটী প্রধান কারণ বলা যায়।

৯। জমিদারের অমনোযোগিতা—এ দেশের অধিকাংশ জমিদারই, নানা উপায়ে, প্রজার রক্তশোষণ করিতে জানেন; কিন্তু কি উপায়ে কৃষকের আয়ের পথ বাড়াইয়া দিতে হয়, কিরূপে আপনার পুত্রসম প্রজাকে পালন করিতে হয়, এবং কিরূপে প্রজার আয়ের পথ বাড়াইয়া দিয়া, নিজের আয় বৃদ্ধি করিতে হয়, তাহা অনেকেই জানেন না। প্রজার কল্যাণার্থ অর্থব্যয় করিলে, উহা বিফলে যায় না—লাভসহ উহা প্রত্যর্পিত হয়। ভূস্বামীগণ বিলাসিতার জন্য এবং মামলা-মোকদ্দমায় যে অর্থ ব্যয় করেন, তাহার কতকাংশ কৃষির ও কৃষকের উন্নতিকল্পে বিনিয়োগ করিলে দেশের মহতী উপকার সাধিত হইতে পারে। এ বিষয়ে তাঁহাদের অমনোযোগিতাও কৃষকের উন্নতির পক্ষে একটী প্রধান অন্তরায়।

(১০) কৃষক-সম্প্রদায়ের মধ্যে কৃষিকথা প্রচারের চেষ্টার অভাব—এ দেশের কৃষক-সম্প্রদায়ের মধ্যে কৃষিকথা প্রচারের যথেষ্ট আবশ্যকতা রহিয়াছে। অনুচিত সম্মানলাভের প্রত্যাশী হইয়া, একালের কৃষকসন্তানেরা তাহাদের স্বর্ণপ্রসূ জন্মভূমির আদরত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছে। কৃষিকথা প্রচার করিয়া, কৃষক-সম্প্রদায়ের মনে, সেই পুরাতন স্মৃতিকে জাগাইয়া না দিলে, এ দেশে কৃষির উন্নতিবিধান সম্ভবপর হইবে না। এই কার্য্যে অগ্রবর্ত্তী হওয়া, শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। আদর রহিল, আদর্শানুযায়ী কার্য্যে সংলিপ্ত রহিয়া, কৃষকেরা স্বতঃই স্বীয় স্বীয় দুঃখ-দুর্গতিনাশের উপায়বিধান করিয়া লইতে পারিবে। শিক্ষিত ভদ্রসন্তানেরা চাকরীর মায়া ত্যাগ করিয়া, হাতে-হেতেড়ে চাষ-বাসে প্রবৃত্ত না হইলে, দেশের নানাস্থানে আদর্শ কৃষিক্ষেত্র খুলিয়া, আদর্শ শিক্ষাদাতারূপে কৃষকের উন্নতিসাধনে যত্নপর না হইলে, কার্য্যের ফলাফল প্রত্যক্ষ না দেখিয়া কৃষকেরা নূতনত্বের পক্ষপাতী হইবে না—কৃসংস্কারও ত্যাগ করিবে না। কৃষি-কথা প্রচারের উহাও একটী সহজ উপায়। কৃষক-সম্প্রদায়ের মধ্যে কৃষি-কথা প্রচারের আরও নানা উপায় আছে। ঐ সকল উপায় অবলম্বন করিয়াই, এ দেশের সর্ব্বত্র কৃষি-কথার প্রচার করিতে হইবে। কৃষক-সমাজে কৃষিকথা প্রচারকে দেশের মঙ্গলের নিদান বলা যায়। কিন্তু আজ পর্য্যন্তও, এ চেষ্টা বড় করা

হয় নাই। এ দেশের কৃষি ও কৃষকের উন্নতির ইহাও একটী প্রধান অন্তরায়।

(১১) কৃষিজাত দ্রব্যাদির রপ্তানি ও বিক্রয়ের বেবন্দোবস্ত—কৃষকেরা ভালরূপে শস্যোৎপাদন করিয়াও, অনেকসময়েই আশানুরূপ অর্থ প্রাপ্ত হয় না। কৃষিজাত দ্রব্যাদির রপ্তানি ও বিক্রয় সম্বন্ধে বিশেষ কোন সুবন্দোবস্ত না থাকায়, প্রচুর পরিমাণে ফল-শস্যাদি লাভ করিয়াও, এ দেশের কৃষকেরা প্রায় সকল সময়েই যথোচিত অর্থলাভ করিতে পারে না। ফলে, কৃষকের লাভ বড় কম হয়। এ দেশের কৃষকেরা বহু অর্থব্যয় ও বহু পরিশ্রম করিয়া পাটের চাষ করে; কিন্তু পাট না জন্মিতেই, তাহার দর স্থির হয় বিলাতে! বিলাতের নির্দ্দিষ্ট দরে পাট বিক্রয় করা ব্যতীত কৃষকের গত্যন্তর নাই। ফলে, বিশেষ লাভজনক পাটের চাষ করিয়াও, কৃষকেরা বড় লাভ করিতে সমর্থ হয় না। এ কথা প্রায় সকল ফল-শস্যাদির সম্বন্ধেই বলা যায়। কৃষকের দুর্গতি এবং কৃষির প্রতি তাহাদের আন্তরিক যত্নের অভাব ঘটিবার ইহাও একটী প্রধান কারণ। পাশ্চাত্য-দেশের অনুকরণে, এ দেশের কৃষিজাত দ্রব্যাদির বিক্রয় ও রপ্তানির সুবন্দোবস্ত করিয়া দিতে না পারিলে, এ দেশের কৃষি ও কৃষকের দুঃখ-দুর্গতি দূর হইতে পারে না।

(১২) জোতস্বত্ব—যাহার একটী সন্তান, তাহার হয়ত ২০।২৫ বিঘা চাষের জমি আছে; আবার যাহার দশটী সন্তান, তাহার হয়ত ২।৩ বিঘার অধিক চাষের জমি নাই। ফলে, প্রথমোক্ত কৃষকের জমি, লোকের অভাবে, পতিত রহে বা নামমাত্র চাষ হয়; পক্ষান্তরে, শেষোক্ত কৃষকের সন্তানেরা কার্য্যের অভাবে বসিয়া থাকিতে বাধ্য হয়। ইহা অত্যুক্তি নহে। জোতস্বত্ব হস্তান্তরিত করিবার শক্তি কাহারও নাই। সেকালের কৃষকের ন্যায়, একালের কৃষকের যদি দীন-দরিদ্র আত্মীয়-স্বজন প্রতিপালনের প্রবৃত্তি অক্ষুণ্ণ রহিত, তাহা হইলে কখনও লোকের অভাবে চাষের জমি পতিত রহিত না। কিন্তু একালের কৃষকের সে উদার প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির অভাব হইয়াছে। ফলে, জোতস্বত্ব স্বজাতিপোষক না হইয়া, স্বজাতিনাশক হইয়াই দাঁড়াইয়াছে। এ দেশের কৃষি ও কৃষকের অনুন্নতির ইহাও একটী প্রধান কারণ।

(১৩) শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের অজ্ঞতা ও ভ্রম—এ দেশের শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেরই বিশ্বাস, এ দেশের নির্ধন ও নিরক্ষর কৃষকেরা ভালরূপে চাষ-বাস করিতে জানে না। বস্তুতঃ, ইহা প্রায় অনেকাংশেই সত্য নহে। তাঁহাদের এই অজ্ঞতার ফল ক্রমেই বিষময় হইয়া উঠিতেছে। শিক্ষিত বাবুদের মুখে এইরূপ অযথা উক্তি শুনিয়া, কৃষকেরা আত্ম-শক্তিতে বিষম সন্দিহান হইয়া পরিয়াছে। এ দেশের কৃষি ও কৃষকের অনুন্নতির ইহাও একটী প্রধান কারণ। এ সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা না করিলে, কথাটা স্পষ্টরূপ বুঝান কষ্টকর। কিন্তু প্রবন্ধটী সুদীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে মনে করিয়া, এ স্থলে তদ্বিষয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইল না।

(১৪) কৃষকের অকাল-মৃত্যু—আজকাল ওলাউঠা, বসন্ত ও ম্যালেরিয়া প্রভৃতি নানাবিধ রোগের প্রভাব কৃষককুলের উপরেই অধিক পরিমাণে বিস্তৃত হইয়া থাকে। প্রতিবৎসর এই সকল রোগ দ্বারা লক্ষ লক্ষ কৃষক অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। তাহাদের এই দুঃসময়ে সহায়তা করিবার, চিকিৎসা করিবার, তাহাদিগকে ঔষধ-পথ্য দিবার এবং তাহাদিগের বিপদে বন্ধুরূপে দাঁড়াইবার কেহই নাই। সুতরাং নিঃসহায় গরীব কৃষক রোগগ্রস্ত হইলে, উপযুক্ত চিকিৎসা ও শুশ্রূষার অভাবেই মানবলীলা সম্বরণ করিয়া থাকে। আমরাও গরীব। কিন্তু আমাদের কোন ব্যারাম হইলে, আমাদিগের চিকিৎসা ও সেবা-শুশ্রূষা করিবার লোকের অভাব কদাচিৎ হইয়া থাকে। উপায়হীন গরীব কৃষক সে সুবিধা হইতে বঞ্চিত। ইহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য আমাদেরই অগ্রবর্ত্তী হওয়া সঙ্গত। ভীষণ বসন্ত ও ওলাউঠা প্রভৃতি সংক্রামক-রোগে প্রতিবৎসরই অগণিত কৃষক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। ইহা আমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, তাহাদের দুঃখে সমবেদনা প্রকাশ করিতে—বিপদসময়ে তাহাদিগকে উপযুক্ত সাহায্য করিতে,

আমরা সর্ব্বদাই পরাঙ্মুখ। কৃষক দেশের বল, কৃষক দেশের জীবন এবং কৃষকই দেশের মেরুদণ্ড। তাহাদিগকে রক্ষা করিতে না পারিলে, আমাদের দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। দারুণ দুর্ভিক্ষসময়েও, উপযুক্ত সাহায্যের অভাবে, সহস্র সহস্র কৃষকের জীবননাশ হইতেছে। তখনও তাহাদিগকে সাহায্য করিতে বড় কেহ দণ্ডায়মান হয় না। তাহাদের জীবনেরও যে একটা মূল্য আছে, ইহা কেহ স্বপ্নেও ভাবেন না! সুতরাং, আমাদিগকে আমাদের অপরিণামদর্শিতার ফল একদিন ভুগিতেই হইবে। আজ যদি দেশের কৃষককুল একেবারে নির্ম্মূল হয়, তাহা হইলে আমাদের পরিণাম যে কি হইবে, তাহা কি কেহ কখনও ভাবিবার সময় পাইয়াছেন? কৃষককুল নির্ম্মূল হইলে, কি ভূম্যধিকারী, কি কুসীদ-ব্যবসায়ী, কি বণিক-সম্প্রদায়, কি চিকিৎসা-ব্যবসায়ী—সকলের গতিই একরূপ হইবে। যে স্থলে এরূপ ভীষণ পরিণামের সম্ভাবনা, সে স্থলে যাহাতে উহার প্রতিবিধান হইতে পারে, তদ্বিষয়ে অগ্রেই সকল সম্প্রদায়েরই সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন। কৃষিবৃত্তির বিড়ম্বনা ঘটিয়াছে বলিয়াই, এ দেশের অন্ন-সমস্যা দিন দিন ভীষণাকার ধারণ করিতেছে। আমাদের পক্ষে, উহা গভীর চিন্তার বিষয় নহে কি? দেশের সকল সম্পদ নির্ভর করে কৃষকের উপরে; কিন্তু কৃষক নির্ভর করে কাহার উপরে? কৃষকের এ দেশে সহায় নাই, সুহৃদ্ নাই, আশ্রয় নাই, অবলম্ব নাই;—নাই বলিতে কিছুই নাই। সে রৌদ্রে পুড়িয়া, বৃষ্টিতে ভিজিয়া, সারাদিন ভয়ঙ্কর খাটুনি খাটিয়া, যাহা কিছু উৎপাদন করে, তাহা বার ভূতে লুঠিয়া খায়। ফলে, তাহার দু'মুঠা অন্নের সংস্থানও রহে না! হায়! সে এমন অবস্থায় কৃষির উন্নতিসাধন করিবে কিসে? এই কৃষিই যখন ইদানীং ভারতের, বিশেষতঃ বঙ্গের, একমাত্র আশাস্থল, তখন কিসে ইহার উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে অগ্রসর হওয়াই এ দেশবাসীর প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। এ দেশের কৃষি ও কৃষক সম্বন্ধে সংক্ষিপ্তভাবে কএকটী কথা বলিয়াই, আমি বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুহ।

কৃষকের শোচনীয় অবস্থা।

[শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ সান্যাল বি, এল মহাশয়ের লিখিত।]

বাঙ্গালার কৃষক আমাদের উপার্জ্জনশীল বড় ভাই; আর আমরা তা'দের অকৃতজ্ঞ বাবুগিরিপরায়ণ উপার্জ্জনে বিমুখ ছোট ভাই। দিনের পর দিন আধপেটা খাইয়া, সূর্য্যের উদয় হইতে অস্ত পর্য্যন্ত মাথার ঘাম পায়ে ফেলাইয়া, কৃষক যে টাকা উপার্জ্জন করে, আমরা কোন-না-কোন উপায়ে কৃষকের সেই কষ্টোপার্জ্জিত অর্থ হইতে আপনার প্রয়োজনীয় অর্থ অবৈধ বল-প্রয়োগে সংগ্রহ করিয়া লই; এবং তাহা দ্বারা অর্থকরী বিদ্যাশিক্ষা করি ও আত্মতৃপ্তির জন্য নানাপ্রকারে কৃষকের কষ্টার্জ্জিত অর্থ ধ্বংস করিয়া থাকি। কৃষক আমাদের অর্থ-শোষণে নিরন্ন—দু'বেলা পেট পুরিয়া খাইতে পারে না। তথাচ, আমাদের তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ নাই;—আমরা ধনাগমের আদৌ কোন চেষ্টা করি না। আমরা কিপ্রকারে কৃষকের অর্থ অপহরণ করিব, তাহারই নানাপ্রকার উপায়-উদ্ভাবনে ব্যস্ত রহি। কৃষক অশিক্ষিত; সুতরাং তাহার আপনার মঙ্গলামঙ্গল বুঝিবার আদৌ শক্তি নাই। তাহাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিলে, প্রতারণা করিয়া তাহার কষ্টার্জ্জিত অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিব না; তাই তাহাদিগকে অশিক্ষিত রাখাই আমাদের স্বার্থ। সেই আত্মস্বার্থের নিকট তাহাদিগকে বলি দিতেও আমরা কুণ্ঠিত নহি। যাহাদের অনুগ্রহে আমাদের উদরান্নের সংগ্রহ হইতেছে, তাহাদের অবস্থার উন্নতিসম্বন্ধে সাহায্য করা যে আমাদের অবশ্যকর্ত্তব্য, স্বার্থান্ধ আমরা, তাহা আদৌ ধারণা করিতে পারি না। পক্ষান্তরে, তৎসম্বন্ধে কোন চেষ্টা করিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। আমরা কেহ রাজনৈতিক অধিকার, কেহ বা গভর্ণমেণ্টের নিকট উচ্চপদ পাইবার জন্য ব্যস্ত; কেহ বা বহুকালাগত সামাজিক নিয়মাদি চূর্ণ করিয়া, বিলাতি ছাঁচে নূতন সমাজগঠন করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব; কেহ বা দারুণ গ্রীষ্মে শীতপ্রধান-দেশের বস্ত্র ব্যবহার করিয়া—গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া সভ্য হইবার অভিলাষী। আবার, আমাদের মধ্যে কেহ বা জাতিভেদ উঠাইয়া দিয়া, সমস্ত লোককে এক জাতিতে পরিণত করিতে চাই। কিন্তু এই সকল সংস্কারকগণ আমরা, তুলিয়াও চিন্তা করি না যে, যদি দেশের লোক ভিখারী হইয়া যায়—অন্নাভাবে ক্লিষ্ট হইয়া পড়ে এবং দুর্ভিক্ষে ও ম্যালেরিয়া, কলেরা প্রভৃতি রোগে অকালমৃত্যুতে দেশ লোকশূন্য হইয়া যায়, তবে রাজনৈতিক অধিকার ও তথাকথিত উন্নত সমাজের সুখ-সমৃদ্ধিকে ভোগ করিবে? আমাদের দেশের শিক্ষিত-সম্প্রদায় কৃষক দেখিলেই ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করেন; কৃষকের প্রতি যে আমাদের একটা কর্ত্তব্য আছে, তাহার ক্ষীণরেখাও আমাদের শিক্ষাগর্ব্বিত মনে আদৌ স্ফূরিত হয় না। কিন্তু বড়ই সৌভাগ্যের বিষয়, শ্রীহরির কৃপায়, দেশে সুবাতাস বহিতেছে—আমাদের দেশীয়েরা আজ বস্তুদিন পরে বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন, কৃষক সমাজের মেরুদণ্ড—কুটীরের অধিবাসী কৃষকের উন্নতি না হইলে, দেশের ও জাতির উন্নতি কখনও হইতে পারে না। তাই আজ সাহিত্য-সম্মিলনে কৃষকের ও কৃষিকার্য্যের আলোচনার সূত্রপাত হইয়াছে। দশ বৎসর পূর্ব্বে, যে প্রস্তাব উপস্থিত করিলে, আপনাদের নিকট হাস্যাস্পদ হইতে হইত, আমাদের সৌভাগ্য—দেশের সৌভাগ্য—আজ আপনারা সেই কৃষিকার্য্য ও কৃষক সম্বন্ধে আলোচনা করিতে নানাপ্রকার কষ্টস্বীকার করিয়া—নানাস্থান হইতে আসিয়া, রংপুরে সমবেত হইয়াছেন।

কৃষিসম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকতত্ত্বালোচনা করিবার আজ সময় নাই; সুতরাং তৎসম্বন্ধে কোনও কথা বলিয়া, আপনাদের বিরক্তি উৎপাদন করিব না। তাহা কৃষিসম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণ করিবেন। আমি চাষা—চাষারও চাষের অবস্থা আমার অজ্ঞাত নহে। আজ উত্তরবঙ্গের কৃষকের অবস্থাসম্বন্ধে মাত্র দু'চারিটী কথা বলিয়া, তাহাদের দুরবস্থার বিষয়, তাহাদের দৈনিক কষ্টের ও অদূরবর্ত্তী বিপদের কথা আপনাদের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিতে চেষ্টা করিব। আপনারা দেখিতে পাইবেন যে, আমাদের দেশের কৃষকের ক্রমশঃ কি শোচনীয় অবস্থা ঘটিতেছে—তাহারা ক্রমশঃ কেমন অবনতির নিম্নস্তর হইতে তদ্নিম্নস্তরে পতিত হইতেছে। এখনও দেশের দশের সমবেত চেষ্টা হইলে, তাহারা উদ্ধার হইতে পারে। কিন্তু আর কিছুদিন আপনারা উদাসীন রহিলে, এ দেশের কৃষক-

শ্রেণী ধ্বংস হইয়া যাইবে; আর তাহাদের উদ্ধারের কোনই উপায় রহিবে না। তাই আজ আপনাদিগকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি যে, একবার আপনারা দেশের কৃষক-কুলের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন—তাহাদের অবস্থার উন্নতি-সাধনের উপায় উদ্ভাবন করুন—তাহাদিগকে আশু-ধ্বংস হইতে রক্ষা করুন।

আমাদের দেশ কৃষি-প্রাণ বা কৃষি-প্রধান দেশ; সুতরাং কৃষিকার্য্যের উন্নতি বা অবনতির সহিত আমাদের জাতীয় উন্নতি বা অবনতি অচ্ছেদ্যবন্ধনে বদ্ধ। এই কৃষিকার্য্য অশিক্ষিত কৃষকের হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে। তাহাদের আবার এমনই বদ্ধসংস্কার যে, হাজার বলুন—হাজার উপদেশ প্রদান করুন, চিরপ্রচলিত প্রথার অন্যথা করিতে তাহারা সহজে রাজি হইবে না। এ দেশের সর্ব্বত্রই যে উন্নত-প্রণালীতে কৃষিকার্য্য চলিতে পারে, এবং তাহাতে উৎপন্নের পরিমাণ অধিক হয়; ফলে, তাহাদের অবস্থার উন্নতি অবশ্যম্ভাবী—এই সকল কথা তাহাদের ধারণার অতীত। 'হাতে-ছেতেড়ে' দেখাইয়া দিতে না পারিলে, এ দেশের কৃষকদিগের কেহই প্রবর্ত্তিত নূতন প্রথাদ্বয়ায়ী চাষ-বাস করিতে রাজি হইবে না।

দেশের দুর্ভাগ্য, আমাদের শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের কেহই আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপন এবং তাহাতে উন্নত উপায়ে কৃষিকার্য্য করিয়া, এ দেশের নিরক্ষর কৃষকের চক্ষু খুলিয়া দিতে রাজি নহেন। আমাদের সদাশয় গভর্ণমেণ্ট একটী আদর্শ কৃষিক্ষেত্র খুলিয়াছেন সত্য, কিন্তু সেই সকল কৃষিক্ষেত্র দ্বারা কৃষকের যে বিশেষ উপকার হইতেছে, তাহাও বলিতে পারি না। সেগুলি 'সমুদ্রে গোষ্পদ' মাত্র; সুতরাং তাহার দ্বারা সকলের উপকার হইতেছে না। রাজসাহী-বিভাগের সকল জিলায় সরকারী আদর্শ কৃষিক্ষেত্র নাই; যে যে জিলায় আছে, তাহাও এতদূরে যে, তথায় যাইয়া আপন চক্ষে উন্নত-প্রণালীর চাষ-বাস দেখিয়া আসিয়া, সেই প্রথা প্রবর্ত্তন করিবার সুবিধা পল্লীবাসী কৃষকের পক্ষে আদৌ ঘটিয়া উঠে না। সুতরাং, আমাদের কৃষকগণ পুরাতন পদ্ধতিতেই চাষ-বাস করিয়া থাকে। কিন্তু সেই প্রথায় উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি না হইয়া, বরং হ্রাসই

পাইতেছে। ফলে, এ দেশের কৃষকেরও দুঃখ-দুর্গতি ঘুচিতেছে না।

সভ্যদেশে কৃষির ও কৃষকের অবস্থা সমুন্নত। কি কি উপায় অবলম্বনে কৃষি ও কৃষকের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিলাভ হইতে পারে, সভ্যদেশের কৃষিসম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণ সেই সকল উপায় পরীক্ষাগারে পরীক্ষা দ্বারা নির্দ্ধারণ করিতেছেন। তাঁহাদের নির্দ্ধারণানুযায়ী কৃষক-সমিতি বা কৃষক নিজ নিজ জমিতে সেই উন্নত প্রথার প্রবর্ত্তন করিয়া, প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপন্ন করিতেছে; এবং তাহাতে বিশেষ লাভবান হইতেছে। এই উপায়ে কৃষিকার্য্য দ্বারা দেশেও প্রচুর ধনাগম হইতেছে। আমাদের দেশের শিক্ষিত-সম্প্রদায় কৃষিকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে পরাঙ্মুখ,—স্বাধীনভাবে জীবিকানির্ব্বাহ করিতে নারাজ। যাঁহারা মাসিক ২০৲ টাকা বেতনের জন্য আত্মবিক্রয় করিয়াছেন,—মুনিবের রক্তনেত্র দর্শনে প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্তে আত্মহারা হইতেছেন,—জীবন দুর্ব্বিসহ বোধ করিতেছেন, তাঁহারাও স্বাধীনভাবে কৃষিকার্য্য করিয়া উদরপূর্ত্তির ব্যবস্থা করিতে রাজী নহেন। আমাদের শিক্ষিত-সম্প্রদায় কৃষকের কার্য্য হেয় বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা দেশের চিরপ্রচলিত কথা—"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীস্তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি"—সত্যটি ভুলিয়া যা'ন। তাঁহারা চিরদিন পদাঘাত অঙ্গের ভূষণ করিতে রাজী; কিন্তু তথাপি, পরমুখাপেক্ষী না হইয়া, স্বাধীনভাবে জীবিকার্জ্জনে রাজী নহেন। আমাদের দেশের শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহই কৃষিকার্য্য শিক্ষা করিতে রাজী নহেন, এ কথা বলিলে সত্যের অপলাপ করিতে হয়। কিন্তু যাঁহারা কৃষিবিষয়ে বিশেষজ্ঞ, বাঙ্গ লাদেশের জনসংখ্যার তুলনায়, তাঁহারা ক'টি?—এই শ্রেণীর কৃষিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতের মধ্যে অনেকেই আমেরিকা বা ইংলণ্ডে কৃষিকার্য্য শিক্ষা করিয়াছেন। সুতরাং, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা বিলাতি জমির বিভিন্ন শ্রেণীর কথা, সেই দেশের আবহাওয়া ও মৃত্তিকার উপর তাহার প্রভাব প্রভৃতি সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিতে পারেন; কিন্তু বাঙ্গালাদেশের মৃত্তিকা, আবহাওয়া ও বাঙ্গালার বিভিন্নস্থানের বিভিন্ন প্রকার মৃত্তিকার উপর আবহাওয়ার প্রভাব প্রভৃতি সম্বন্ধে তাঁহাদের অনেকেরই উপযুক্ত জ্ঞান নাই বা অল্প জ্ঞান আছে। ঐ সকল কৃষিবিষয়ক পণ্ডিতগণ দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, দেশের কোনও স্থানে আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করেন নাই;—সরকারী কৃষিক্ষেত্রে বেতন লইয়া কার্য্য করিতেছেন। সুতরাং, তাঁহাদের পরীক্ষালব্ধ ফল দেশের নিরক্ষর কৃষককুলের নিকট পঁহুচাইতেছে না। তাঁহাদের কৃষিসম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক আলোচনা সকল—তাঁহাদের পরীক্ষার বিভিন্ন ফল কৃষিবিভাগের প্রকাশিত পুস্তিকার (Agricultural Department's Bulletin) মধ্যেই নিবদ্ধ রহে। সদ্গদয় গভর্ণমেণ্ট কখনও কখনও আলু অথবা অন্যান্য ২।১টী শস্যের চাষসম্বন্ধে অর্থাৎ ঐ সকল শস্য কিরূপে চাষ করিলে সুফল লাভ করা যায়, তাহা পুস্তিকাকারে বঙ্গভাষায় মুদ্রিত করিয়া বিনামূল্যে বিতরণ করিতেছেন সত্য, কিন্তু তদ্দ্বারা বিশেষ কোন উপকার ঘটিতেছে না। আমাদের কৃষক নিরক্ষর; সুতরাং কৃষিতত্ত্ব অধ্যয়ন করিবার তাহার শক্তি বা সুযোগ নাই। ফলে, গভর্ণমেণ্টের এ শুভ চেষ্টা, 'ভস্মে ঘি ঢালা'র ন্যায়, বৃথা হইয়া যাইতেছে।

গভর্ণমেণ্ট প্রত্যেক গ্রামে আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করিবেন, এরূপ আশা করা কাহারও উচিত নহে। ঐরূপ কৃষি-ক্ষেত্র স্থাপনের উপযোগী অর্থ রাজকোষ দিতে পারেন না। জমিদারগণ প্রজার 'মা-বাপ';—প্রজার উন্নতির সহিত তাঁহাদের উন্নতি বিশেষভাবে জড়িত। তাঁহারা যদি বিশেষজ্ঞ রাখিয়া, নিজ নিজ জমিদারীতে আদর্শ কৃষি-ক্ষেত্র স্থাপন করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রজার অবস্থার উন্নতি ঘটিতে পারে; এবং প্রজার আয়বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, তাঁহাদেরও আয়বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। আমাদের দেশের জমিদারবর্গের এবং ভূমাধিকারীমাত্রেরই, এই বিষয়ে মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। জাতীয় উন্নতি—ব্যক্তিগত উন্নতির সমষ্টি মাত্র। এ দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষি ও তদানুষঙ্গিক কার্য্য করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া থাকে। সুতরাং, সর্ব্বাগ্রেই তাহাদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিকল্পে চেষ্টা করা, সকলেরই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

আর আপনারা—দেশের শিক্ষিত-সম্প্রদায়—আপনাদের নিকট আমার বিনীত নিবেদন, আপনারা সামান্য

বেতনের জন্য আত্মবিক্রয় না করিয়া কৃষিকার্য্যের উন্নতিকল্পে বদ্ধপরিকর হউন। মনে রাখিবেন,—হালের ফালের মুখে যে অর্থাগম হয়, নিবের মাথায় সেই অর্থ উপার্জ্জন হয় না। কৃষকের উন্নতির সহিত আপনাদের উন্নতি হইবে;—"নিত্য ভিক্ষা তদুরক্ষা" আর করিতে হইবে না। আপনারা কৃষিকার্য্যের উন্নতপ্রথা শিক্ষা করুন; এবং সেই উপায়ে কৃষিকার্য্য করিয়া, উন্নতপ্রথার উপকারিতা চক্ষে আঙ্গুল দিয়া নিরক্ষর কৃষককে বুঝাইয়া দি'ন—মৃতপ্রায় কৃষকজাতিকে পুনরুজ্জীবিত করুন—অকালমৃত্যু হইতে কৃষককুলকে রক্ষা করুন। আপনাদের কর্ত্তব্যের কথা আপনাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিয়া, আমি কৃষকের বর্ত্তমান দুরবস্থার কথা মহাশয়দিগের নিকট জ্ঞাপন করিতেছি। এ দেশের কৃষক এখনও অবনতির সর্ব্ব নিম্নস্তরে উপস্থিত হয় নাই; সুতরাং, এখনও চেষ্টা করিলে, আপনারা তাহাদিগকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিতে পারেন। আসুন, আসন্ন মৃত্যু হইতে কৃষককুলকে রক্ষা করুন;—কি উপায়ে তাহাদের উদ্ধার হইবে, তাহা সমবেতভাবে নির্দ্ধারণ করুন।

* * * *

পূর্ব্বে এদেশের কৃষকের অভাব যৎসামান্য ছিল। মাটীর 'সানকী', মাটীর পাকপাত্র ও জলপাত্র এবং ২।১ খানি কাঁসার থাল ও একটা পিতলের ঘটী হইলেই কৃষকের কাজ চলিত। রৌদ্রের সময় ৵১০ মূল্যের 'মাথুল' দ্বারা তাহার মস্তক রক্ষা হইত। এখন আর সেদিন নাই;—এখন আর তাহাতে চলে না। এখন কৃষকের এনামেলের থাল, বাটী, বেলওয়ারি গ্লাস, কাপড়ের ছাতা, গায়ের কোট, এবং পায়ের জুতা না হইলে আর চলে না। এখন তাহারা আমাদের দেখা-দেখি সিগারেট খায়; বর্ষার সময়, জমিবপন-কালে, ঠাণ্ডা হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য ৸০ আনা পাউণ্ডের 'M. S. De.' মার্কা চা পান করে এবং সময় সময়, টাইম্ (time) দেখিবার জন্য ২৸০ মূল্যের ট্যাক্‌ঘড়ি ক্রয় করে। কৃষক-রমণী পূর্ব্বে 'লা'র চুড়ি পড়িত; কিন্তু এখন পড়ে,—বেলওয়ারি চুড়ি। এক্ষণ আর লার চুড়িতে তাহাদের ভব্যতা রক্ষা হয় না। এনামেলের পাত্র ফুটা হইলে, আর তাহা মেরামত করিবার উপায় নাই; বেলওয়ারি গ্লাস ভাঙ্গিলেও, তাহা আর জোড়া লাগে না। হাতের বেলওয়ারি চুড়ি ভাঙ্গিলেও, তাহা ফেলাইয়া দিতে হয়। এই সকল হইতে কিছুই পাওয়া যায় না। সুতরাং মাটীর জিনিসে ও উক্ত এনামেল বা বেলওয়ারি জিনিসে কেবল মূল্যেরই পার্থক্য রহিয়াছে;—অন্য কোনরূপ পার্থক্য দেখিতে পাই না। পক্ষান্তরে, কাঁসার থালা ভাঙ্গিলে কি পিতলের ঘটী বা 'বদ্না' মেরামতের অযোগ্য হইলেও, তাহা বিক্রয় করিয়া পূর্ব্বে কিছু অর্থাগম হইত; এবং অল্প কিছু মূল্য দিলেই, ভাঙ্গা লার চুড়ির পরিবর্ত্তে, নূতন লার চুড়ি মিলিত। এখন আর তাহার 'বো' নাই। সুতরাং, আপনারা বেশ বুঝিতে পারিতেছেন যে, কৃষকপরিবারে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্যের তৈজসপত্র ব্যবহৃত হইলেও, তাহা মৃৎপাত্রেরই ন্যায় অকর্ম্মণ্য বলিয়া ফেলিয়া দিতে হইতেছে। কৃষকেরা এখন আর মাটীর পাত্র ব্যবহার করিতে চাহে না; অথচ কাঁসা বা পিতলের জিনিষ খরিদ করিবার অর্থও সকলের নাই। ফলে, বাধ্য হইয়াই, কমমূল্যের অল্পকালস্থায়ী ও আপাত-মনোহর এনামেল ও বেলওয়ারি জিনিসেই, তাহাদিগকে তৃপ্ত রহিতে হয়। ইহাতে কৃষকের পূর্ব্বাপেক্ষা খরচ অনেক বেশী হইয়াছে। আগে কৃষক জমিচাষ করিতে গেলে, ঘরের তৈয়ারী তামাক 'বুনি'র আগুনে খাইত। কিন্তু আমাদের দেখাদেখি এখন তাহাদের মধ্যে সিগারেট খাওয়ার প্রথাও প্রচলিত হইয়াছে। সিগারেট ও দেহ বাক্সের দরুণ কৃষকের অনেক পয়সা অযথা ব্যয় হইতেছে। এ দোষ কাহার? এ নিরক্ষর অল্পে-সন্তুষ্ট কৃষককুলের মধ্যে বিলাসিতার ঢেউ কে জাগাইয়া তুলিল?—উত্তরে, আমি বলিব—আমরা! আমাদের দোষেই কৃষকের শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছে। গ্রামে যাঁহারা অবস্থাপন্ন লোক থাকেন, তাহারা যেভাবে চলেন—যাহা করেন, তাহার অনুকরণ করা দেশের একটা সাধারণ রোগ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই বাবু আমরা, আমাদের দেখা-দেখি দরিদ্র কৃষকেরাও ১৲ টাকা মূল্যের 'দোহরে'র স্থলে ৫৲ হইতে ১০৲ টাকা মূল্যের আলোয়ান, এবং ৷৷০ আনা মূল্যের পিরণের পরিবর্ত্তে ৩৲ হইতে ৫৲ টাকা মূল্যের কোট ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। পূর্ব্বে এ দেশের ভদ্রসন্তানেরা ফুলপুথরিয়ার চাট, দিল্লীর নাগরা

অথবা ১৷৷০ টাকা হইতে ২৲ টাকা মূল্যের গোড়া-তোলা জুতা ব্যবহার করিতেন। কিন্তু এক্ষণ তাঁহাদের বংশধর-দিগের ৫৲ টাকা হইতে ১০৲ টাকা মূল্যের জুতা না হইলে চলে না। তাই দেখাদেখি নিরন্ন কৃষকও নিজের জন্য ১৷৷০ টাকা দামের চটিজুতা ও আপনার পুত্রের জন্য ৩৲ টাকা দামের জুতা খরিদ করিয়া, স্বীয় স্বীয় ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে কুণ্ঠিত হইতেছে না। আমি ব্যবহারজীব। শীত-কালে আমার ব্যবসায়ের ঘরে একদিন বহু মক্কেলের সমাগম হইয়াছিল। তন্মধ্যে, দরিদ্র, মধ্যবিত্ত ও অবস্থাপন্ন—এই তিন শ্রেণীর লোকই সেদিন উপস্থিত ছিল। তাহাদের গায়ে নানাবর্ণের নানামূল্যের শীতবস্ত্র; আর আমার নিজের গায়ে ছিল ৪৲ টাকা মূল্যের সাদা 'বৃন্দাবনী টুসা' কাপড়। উপস্থিত মক্কেলদিগের যে ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা গরীব, তাহার গায়ে একখানি জার্ম্মাণ-দেশী আলোয়ান ছিল। ঐ আলোয়ানের মূল্য ৮৲ টাকার কম নহে; কিন্তু কাবুলীর নিকট হইতে বাকীতে খরিদ করিতে হইয়াছিল বলিয়া, তাহাকে ১৫৲ টাকা মূল্য দিতে হইয়াছে। উপস্থিত মক্কেলেরা আমার গায়ের দুশার মূল্য ২৫। ৩০৲ টাকা অনুমান করিয়াছিল। আমি উকিলবাবু, সুতরাং আমার গায়ের কাপড় নেহাত কম মূল্যের হইতে পারে না;—এই আন্তধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই, মক্কেলেরা আমার গায়ের কাপড়ের মূল্য স্থির করিয়াছিল। যাহা হউক, আমি তাহাদের আলোচনার বিষয় জানিতে পারিয়া—উক্ত গরীব কৃষকের আলোয়ানের মূল্য ১৫৲ টাকা শুনিয়া, যখন আমি আমার গাত্রবস্ত্রের মূল্য ৪৲ টাকা বলিলাম, তখন সকলেই লজ্জায় অধোবদন হইল। সে লজ্জায় ভবিষ্যতে কোন ফল হইল কিনা জানি না। তবে এই দৃষ্টান্তেই আপনারা অনুমান করিতে পারিবেন—কৃষক সমাজে কিরূপ বিলাসের স্রোত বহিতেছে!

কৃষকের ঋণ—এদেশের অধিকাংশ কৃষকেরই ঋণ না করিলে সংসার চলে না। এই ঋণ করিবার জন্য প্রত্যেক কৃষকেরই একজন করিয়া মহাজন নির্দ্ধারিত আছে। সে ভবিষ্যতে কৃষকের একমাত্র সম্বল জোতটুকু গ্রাস করিবার অভিপ্রায়ে, যখন দরকার তখনই কৃষককে টাকা ধার দিতেছে; এবং তাহার নিকট কাপড় ও অন্যান্য দ্রব্যাদি অগ্নিমূল্যে ধারে বিক্রয় করিতেছে। মহাজনেরা কৃষকদিগের নিকট হইতে 'নানাবন্দে নানাছন্দে' বাকী-পড়া টাকার ও নূতন করজ-লওয়া টাকার সুদ লিখাইয়া লইতেছে। এই সুদের হার বার্ষিক শতকরা ৭৲ টাকা হইতে ১৫০৲ টাকা। কেহবা এইরূপ উচ্চহারে সুদ লিখাইয়া লইয়াও তৃপ্ত হইতে পারে নাই;—খত ও আসল টাকার কড়া-ক্রান্তি পর্য্যন্ত শোধের নিমিত্ত খাতক কৃষকের প্রতিবর্ষে যে শস্য উৎপন্ন হইবে, তাহার কোনও কোনও শস্য (যথা—পাট) মহাজনের ইচ্ছামত মূল্যে তাহার নিকট বিক্রয়ের চুক্তি লিখাইয়া লইতেছে। ফলে, কৃষক ঋণের দায়ে নিজের জমির বিশেষ লাভজনক উৎপন্ন শস্য বিক্রয় করিয়াও মহাজনের ঋণমুক্ত হইতে পারিতেছে না;—দিনের পর দিন কৃষকের ঋণবৃদ্ধি হইতেছে। পক্ষান্তরে, নানা কারণে, তাহার জমি হইতে সংবৎসরের খাদ্যোপযোগী ধান্যাদিও উৎপন্ন হইতেছে না। জমি হইতে কোনও কৃষকের তিন মাসের, কাহারও বা ছয়মাসের আহার জুটিতেছে। সাধারণ কৃষকদিগের মধ্যে অনেকেই যে সারাবৎসরের খাদ্যোপযোগী ধান্যাদি প্রাপ্ত হয় না, তাহা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। যে কএকমাস ফেত্রোৎপন্ন শস্যে চলে, সেই সময়টুকু কৃষকের একটুকু শান্তিতে অতিবাহিত হয়। কিন্তু তৎপরই, অগ্নিমূল্যে শস্যসংগ্রহ করিতে গিয়া, তাহাকে বিশেষ অস্থির হইয়া পড়িতে হয়। ইহার উপর আবার ছেলে-মেয়ের বিবাহ চলিতেছে। বিবাহের ব্যয়নির্ব্বাহার্থে প্রতি টাকায় ৵০ আনা হইতে ৵১০ হারে সুদ দিয়া টাকা কর্জ্জ করিতেও কৃষকেরা পশ্চাৎপদ হয় না। বলা বাহুল্য, বিবাহাদির সময় কৃষকেরা কখনও কম সুদে টাকা ধার করিতে পারে না। কারণ, কৃষকের প্রয়োজন বুঝিয়াই, মহাজনেরা সুদের একটা উচ্চহার স্থির করিয়া লয়; এবং তদপেক্ষা কম সুদে টাকা ধার দিতে কিছুতেই রাজি হয় না। ফলে, বাধ্য হইয়াই, কৃষককে উচ্চ সুদেই ঋণগ্রহণ করিতে হয়।

কৃষক পেটের দায়ে যে ঋণ গ্রহণ করে, তাহার সুদ যোগাইতেই সে একরূপ সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়ে। সুতরাং

সুদে-আসলে তাহার ঋণের পরিমাণ ক্রমশঃই বাড়িয়া যাইতে থাকে। এমতাবস্থায় পুত্র-কন্যাদির বিবাহ উপলক্ষে, তাহারা যে নূতন ঋণগ্রহণ করে, সেই ঋণের প্রতিভূস্বরূপ তাহাকে নিজের জোত মহাজনের নিকট 'খাইখালাসী' দিতে হয়। আপনার জোত খাইখালাসী দিয়া—জোতস্বত্ব মহাজনের দখলে ছাড়িয়া দিয়া—কৃষকেরা ঋণশোধের ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছে। এখন ভাবুন, দিনের পর দিন তাহার অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে।

এ সম্বন্ধে আর একটী কথা এইস্থলে বলা আবশ্যক। আপনারা সকলেই জানেন, সাধারণতঃ প্রতিবিঘা জমির খাজনা ৷৷০ হইতে ১৷৷০ টাকা জমিদারকে দিতে হয়। তাহার উপর স্কুল-খরচা, হাতি-খরচা, পূজা-খরচা, গ্রাম-খরচা এবং জমিদারের পুত্র বা কন্যার বিবাহের ভিক্ষা প্রভৃতি নানা প্রকার আবুয়াব, চাঁদা, মাথট, মাগুনি এবং নাএব ও তহশীলদার প্রভৃতির নির্দ্দিষ্ট পাওনা যোগাইতে হয়। দুষ্ট প্রজা অধিকাংশস্থলেই কিন্তু খাজানাদি পরিশোধ করিতে পারে না। সুতরাং, তাহাকে খাজনা এবং ভিক্ষা, মাথট প্রভৃতি আবুয়াবের কিস্তিখেলাপী সুদ দিতে হয়। প্রজারা যে পরিমাণ খাজনা দেয়, অনেকস্থলে তাহার অর্দ্ধাংশ পরিমাণ এবং কোনও কোনও স্থলে, তৎপরিমাণ টাকা আবুয়াব দিতে হয়। সুতরাং প্রজার খাজানাদি পরিশোধ হয় না। পূর্ব্বে প্রজারা জমিদারের প্রাপ্য খাজনাদি তামাদির তর্ক উঠাইয়া উড়াইয়া দিত না; পক্ষান্তরে, জমিদারগণও কৃপা করিয়া, প্রজা খাজনা বাবদ যখন যে টাকা দিতে পারিত, তাহাই লইতেন। জমিদারের এক বৎসরের প্রাপ্য খাজনা কখন কখন ৫। ৬ বৎসরেও আদায় হইত। এখন আর সেদিন নাই। এখন দেশে প্রজাস্বত্ববিষয়ক আইনের বিধানমত, একবৎসরের প্রাপ্য খাজনা চারি বৎসরমধ্যে আদায় করিতে না পারিলে, তাহা তামাদি হয়;—প্রজাকে আর তাহা দিতে হয় না। একথা প্রজা বেশ বুঝিতে পারিয়াছে,—দেয় খাজানা তামাদির আপ-ত্তিতে উড়াইয়া দিতে শিক্ষা করিয়াছে। সুতরাং জমিদারও কোন স্থলে বৎসরে চারি কিস্তিতে, কোন স্থলে বৎসর বৎসর নালিশ করিয়া, ১৲টাকা খাজানার বাবদ ১৫৲ টাকা আদায় করিয়া লইতেছে। কখনও বা জমিদারের চার-পরগণ্ড ওয়াশীল ছাট করিতেছে; কখন বা তামাদি খাজানা প্রকারান্তরে আদায়ের নিমিত্ত, বুদ্ধিজমা ধরিয়া ও ক্রমাগত মামলা চালাইয়া, প্রজার সর্ব্বনাশসাধন করিতেছেন। কৃষকেরা ঐরূপ ডিক্রীর টাকা পরিশোধের জন্যও বাধ্য হইয়া টাকা কর্জ্জ করিতেছে। তাহার সুদও পূর্ব্বোক্ত হারে দিতে হইতেছে। যখন ঋণের বোঝা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া পড়ে—ঋণশোধের অন্য কোন উপায় থাকে না, তখন অধিকাংশ-স্থলেই দেনা শোধের জন্য কৃষক তাহার জোত মহাজনের নিকট খাইখালাসী দেয়। মহাজনও যে জমিতে বার্ষিক ২০৲ টাকা উৎপন্ন হইবে, সেই জমিতে বার্ষিক ২৲ লাভ ধরিয়া দীর্ঘকালমাদে খাইখালাসী লইতেছে। এইরূপে খাইখালাসী-দাতা তাহার জোতের সম্পূর্ণ জমি মহাজনের দখলে ছাড়িয়া দিয়া ভূমিশূন্য হইয়া পড়ে;—তাহার চাষ-বাসের জমি কিছুই রহে না। সুতরাং তাহাকে খাইখালাসী গৃহীতা মহাজনের নিকট হইতে নিজ জমির কতকাংশ পত্তন লইয়া, পরিবার রক্ষার্থে চাষ-আবাদ করিতে হয়। কোন কোন স্থলে মহাজন প্রতিবিঘায় ৫৲ হইতে ৭৲ টাকা জমা ধার্য্য করিয়া, খাইখালাসী-দাতার নিকট জমি পত্তন করে। আবার কোনও স্থলে বা প্রতিবিঘায় ৫/০ মণ ধান্য দেওয়ার চুক্তিতে আবদ্ধ করিয়া, মহাজন কৃষকের নিকট জমি পত্তন করিয়া থাকে। এখন ভাবুন, যদি পাঁচ বিঘা জমি পত্তন হয়, তাহার খাজানা বার্ষিক ৩৫৲ টাকা খাইখালাসীদায়ককে দিতে হয়। আর যদি প্রতিবিঘায় ৫/০ মণ ধান্য দেওয়ার নিয়মে জমি পত্তন হয়, তবে কৃষককে ২৫/ মণ ধান্য অথবা তদভাবে, বাজারদরে উক্ত ধান্যের মূল্য (প্রতি মণ ২৲ ধরিলেও) ৫০৲ টাকা দিতে হয়। জমিদারের প্রাপ্য ৫/০ বিঘা জমির খাজানা (প্রতি বিঘায় ১৲ হিসাবে) ৫৲ টাকা ও আবুয়াব প্রভৃতি ৫৲ ধরিলেও, ৫/০ বিঘাতে প্রজাকে বার্ষিক ১০৲ টাকা খাজানা দিতে হইত। তাহা সে পরিশোধ করিতে পারে নাই বা করে নাই; কিন্তু এখন তাহাকে সেইস্থলে ৩৫৲ টাকা বা অন্যস্থলে ৫০৲ টাকা খাজানা দিতে হইতেছে। ঐ টাকা দেওয়ার শক্তি কৃষকের আদৌ নাই;—কৃষক তাহা দিতে পারে না। ফলে, খাইখালাসী

দায়ের প্রাপ্য বাকী খাজানার পরিমাণ বৎসরের পর বৎসর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। থাইথালাদীদার ৪ বৎসর পর, প্রথমোক্ত বন্দোবস্তে ২৫৲ হারে ক্ষতিপূরণসহ ১৭৫৲ টাকার এবং শেষোক্ত বন্দোবস্তে ২৫০৲ টাকার দাবীতে নালিশ করে; এবং মামলার খরচাদি সহ এক স্থলে ২০০৲ টাকা ও অপরস্থলে ২৩০৲ টাকা হইতে ২৫০৲ টাকার ডিক্রী হাসিল করে। এই ডিক্রী জারী করিয়া, কখন ১০৲ মূল্যে, কখন বা ২০৲ টাকা মূল্যে প্রজার জোত নিলাম খরিদ করিয়া লয়। প্রজা জমি হারাইয়া কখন ফকির হয়—ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করে, কখন বা পূর্ব্বপুরুষের বাস্তুভিটা, জোতজমি অথবা গ্রাম বা জিলা পরিত্যাগ করিয়া দেশান্তরিত হয়! আইনের মারপ্যাঁচে জমিদারের সম্মতিব্যতিরেকে প্রজার জোত হস্তান্তরিত হইবার প্রথা না থাকায়, বিক্রয়ে প্রজাই-স্বত্বের উপযুক্ত মূল্য হয় না। কিন্তু তদ্দ্বারা জমিদারের আদৌ কোন ক্ষতিস্বীকার করিতে হয় না। নূতন খরিদ-দার মহাজনকে প্রজা স্বীকার করিবার পূর্ব্বে, ক্রীত জোতের নয়সুদ বকেয়া খাজনাদি ও প্রতিবিধায়, অবস্থা-ভেদে, ২৫৲ টাকা হইতে ১০০৲ টাকা নজর এবং জমা বৃদ্ধি লইয়া, জমিদার নিলাম খরিদদার মহাজনকে প্রজা স্বীকার করিয়া থাকেন। সুতরাং খরিদ-বিক্রয়ের প্রথা থাকুক বা না থাকুক, তাহাতে জমিদারের কোনও প্রকারেই লোকসান হয় না। খরিদ-বিক্রয়ের প্রথা থাকুক বা না থাকুক, প্রজার জোত নিলাম হয়;—তাহার প্রজাস্বত্বের উপযুক্ত মূল্য সে প্রাপ্ত হয় না। এই প্রকারে দেশে মহাজন-জোতদার নামক একপ্রকার জোতদারের সৃষ্টি হইতেছে; এবং প্রজাস্বত্ব হস্তান্তরযোগ্য করিবার একটা চেষ্টা আমাদের গবর্ণমেণ্ট করিতেছেন। গভর্ণমেণ্ট মনে করেন, প্রজাস্বত্ব হস্তান্তরযোগ্য করিলে, তদ্দ্বারা প্রজা একটা উপযুক্ত মূল্য পাইবে। প্রজাস্বত্ব হস্তান্তরসম্বন্ধে জমিদার মহাশয়গণের বড়ই আপত্তি। কিন্তু উভয়পক্ষই একটা ভুল বুঝিতেছেন বলিয়া আমার ধারণা হয়। প্রজা যখন আকণ্ঠ ঋণে ডুবু ডুবু, তখন জোতস্বত্ব বিক্রয় করিয়া ঋণশোধ করা তাহার আবশ্যক। সুতরাং জোত হস্তান্তরযোগ্য হউক বা না হউক, সে তাহা বিক্রয় করিতে বাধ্য। ঋণজালে তাহার মস্তক বিক্রীত; সুতরাং মহাজন যে মূল্যে খরিদ করিবার প্রস্তাব করিবেন, সেই মূল্যেই তাহাকে মহাজনের নিকট জোত বিক্রয় করিতে হইবে। জোত বিক্রয় করিয়াও যখন তাহার সমস্ত দেনা পরিশোধ হইবে না, তখন সকল অবস্থাতেই তাহাকে মহাজনের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করিতে হইবে। নতুবা তাহার ঘর-বাড়ী, তৈজস-পত্র মহাজন নিলাম করিয়া টাকা আদায় করিবে; এবং তাহাতেও টাকা আদায় না হইলে, দেওয়ানী জেলে তাহাকে বাস করিতে হইবে। এমতাবস্থায়, বাজার দর যাহাই হয় হউক, মহাজনের দরই অগ্রগণ্য করিয়া, ঋণগ্রস্ত কৃষককে তাহার পৈতৃক জোত মহাজনের নিকট বিক্রয় করিতে হইবে। প্রজাস্বত্ব হস্তান্তরযোগ্য হইলেও, প্রজা স্বীকার করা বা স্বীকার না করিবার অধিকার জমিদারের থাকিবেই থাকিবে। এই অধিকার থাকিলেই, জমিদার নিজ পাওয়ানা কড়া-ক্রান্তিতে বুঝিয়া লইতে পারিবেন; সুতরাং তাঁহার কোন ক্ষতি হইবে না। কিন্তু মরিবে দরিদ্র প্রজা—সকল অবস্থাতেই তাহার দারিদ্র্য অনিবার্য্য। দারিদ্র্য-প্রপীড়িত হওয়াই চিরন্তন প্রথা; সুতরাং এক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হইবে না।

চাষী-জমির ভ্রমাবনতি—আপনা-দিগকে বোধ হয় আমার বুঝাইয়া দিতে হইবে না, একখণ্ড জমিতে প্রতিবৎসর একই ফসল উৎপন্ন করিলে, ঐ জমির উৎপাদিকা-শক্তি ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে; এবং পরিশেষে এতই হ্রাস হইয়া পড়ে যে, যে জমিতে পূর্ব্বে ১০/০ মণ শস্য জন্মিত, সেই জমিতে মাত্র ২৷৷০ মণ অর্থাৎ পূর্ব্বের একচতুর্থাংশ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভূমির উৎপাদিকা-শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে, অর্থাৎ উদ্ভিদের খাদ্যাভাব পূরণার্থে, তাহাতে নানাপ্রকার মূল্যবান সার দিতে হয়। একই জমিতে প্রত্যেক বৎসর একরূপ শস্যের চাষ না করিয়া, এক একবৎসর এক একপ্রকার শস্যের চাষ বা পর্য্যায়-ক্রমে বিভিন্ন শস্য রোপণ (Rotation of crops) করিতে হয়। ইহাতে ভূমির উৎপাদিকা-শক্তি অপেক্ষাকৃত অধিক সময় স্থায়ী হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন, ভূমির উৎপাদিকা-শক্তির

হ্রাস ঘটিলে, উহা কিয়ৎকাল পতিত রাখা আবশ্যক। পর্য্যায়ক্রমে শস্য রোপণ করিলে এবং ভূমিতে আবশ্যকানুযায়ী সার উপযুক্ত পরিমাণে প্রয়োগ করিতে পারিলে, ভূমির উৎপাদিকা-শক্তি অক্ষুণ্ণ রহিতে পারে। আমাদের দেশের কৃষকেরা সারব্যবহারের উপকারিতা বুঝিতে পারিলেও, তাহাদের দারিদ্রতাবশতঃ, উপযুক্ত পরিমাণে ভাল সার মূল্য দিয়া খরিদ করিয়া, তাহা জমিতে ব্যবহার করিতে পারে না। তাহারা সাধারণতঃ সহজলভ্য সার অর্থাৎ নদী, নালা কি পুরাতন জলাশয়ের নিম্নভাগস্থ পলিপড়া-মাটী, গরু বা মহিষের বিষ্ঠা (পাউস্) ও মূত্র প্রভৃতি জমিতে সাররূপে ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু তাহারও পরিমাণ এতই কম যে, তদ্দ্বারা জমির অভাব অনেকাংশেই পূরণ হয় না। মনে করুন, একখানা জমিতে ৩০০/০ মণ গোময়সার দেওয়া আবশ্যক; কিন্তু সে জমিতে ২৫/০ মণ সারও কৃষক দিতে পারে না। সুতরাং, অত্যল্পপরিমাণ সার দেওয়ার কোনরূপ ফল বুঝিতে পারা যায় না। কৃষকেরা যথোপযুক্ত পরিমাণে সারব্যবহার করিতে পারে না; আবার যেরূপে বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে গোময় রক্ষা করিতে হয়, তাহাও তাহারা জানে না। কৃষকেরা যেভাবে গোময় রক্ষা করে, তাহাতে সারের অনেকাংশ রৌদ্র ও বৃষ্টিতে নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং তদ্দ্বারা অরক্ষিত গোময় সাররূপে ব্যবহার করিলেও সমাক্ ফললাভ করা যায় না। ফলে, উৎপন্ন ধান্যাদি শস্যের পরিমাণ ক্রমশঃই হ্রাস হইয়া পড়িতেছে। কৃষকগণ এই অভাব অন্য উপায়ে পূরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। মনে করুন, একজন কৃষক-পরিবারে বার্ষিক ১০০/০ মণ ধান্যের প্রয়োজন। পূর্ব্বে ১০/০ বিঘা জমি হইতেই ১০০/০ মণ ধান্য পাওয়া যাইত। কিন্তু এক্ষণ সেইস্থলে মোট উৎপন্ন হইতেছে ৩০/০ মণ; সুতরাং তাহার ৭০/০ মণ ধান্যের প্রয়োজন। এই অভাব পূরণের জন্য তাহাকে ২৮/০ বিঘা জমি অতিরিক্ত সংগ্রহ করিতে হইতেছে। সে তাহাই অগ্নিমূল্যে সংগ্রহ করিয়া, বার্ষিক ১০০/০ মণ ধান্য উৎপন্ন করিবার নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে। ইহাতে দেশে আর একটী দুর্দ্দৈব উপস্থিত হইতেছে। নিম্নে তদ্বিষয়ই সংক্ষিপ্তভাবে বিবৃত হইল।

গোচর নাশ—২৮/০ বিঘা চাষী-জমি আজকাল সংগ্রহের উপায় নাই। সুতরাং পতিত জমি হইতেই উহা সংগ্রহ করা হইতেছে। আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে, পূর্ব্বে প্রতিগ্রামের বহির্ভাগেই অনেক জমি পতিত রহিত। উহা জঙ্গলে ও ঘাসে পূর্ণ থাকিত; এবং উহাতে গ্রামের সকল গরু চরিয়া থাইত। দেশের হিন্দু বা মুসলমান জমিদার গোচর-ভূমির খাজানা লইতেন না;—ইহাই ছিল পূর্ব্বের নিয়ম। কিন্তু নানাকারণে আজকাল দেশের ভূম্যধি-কারী পাড়াগাঁয়ে বাস করিতে রাজি নহেন;—তাঁহারা প্রায় সকলেই রাজধানী কলিকাতায় অথবা অন্য কোনও সহরে স্থায়ীভাবে বাস করেন; এবং দেশের জমিদারী হইতে আদায়ী টাকা লইয়া, তাহা সুখাভিলাষে নানাপ্রকার আমোদ-প্রমোদে বা কালোচিত সম্মানলাভের প্রত্যাশায় নানাভাবে স্বচ্ছন্দে ব্যয় করিয়া থাকেন। নানাকারণে, তাঁহাদের টাকার অভাব বড় বেশী। পক্ষান্তরে, প্রজারও জমি সংগ্রহ করা আবশ্যক। জমিদার চাহেন টাকা, আর প্রজা চাহে জমি। সুতরাং গ্রামের চতুঃপার্শ্বস্থ পতিত গোচরভূমি এক্ষণ প্রজারা পত্তন লইতেছে; আর অর্থসংগ্রহার্থে ভূম্যধিকারী গোচর-ভূমি পত্তন করিতেছেন। ইহাতে ফল দাঁড়াইতেছে যে, যে জমি শতাধিক বৎসর পূর্ব্ব হইতেই পতিত ছিল, সেই জমি বিঘাপ্রতি ১৷৷০ টাকা হইতে ২৲ টাকা জমায় ও প্রতি বিঘায় ৭৫৲ হইতে ১০০৲ টাকা নজরে কৃষক পত্তন লইতেছে; আর জমিদার পত্তন করিতেছেন। ফলে, গোচর লুপ্ত হইয়া যাইতেছে;—গবাদির চরিবার স্থানের ক্রমশঃ অভাব হইতেছে। আজকাল কৃষকের বাড়ী ব্যতীত গরু দাঁড়াইবার অন্য কোনও স্থান নাই। গোচারণের স্থান আজকাল আর মিলিতেছেনা। এখন আর একটা বিষয় দেখুন—মনে করুন, ২৮/০ বিঘা জমির বাবদ প্রজাকে ২১০০৲ টাকা হইতে ২৮০০৲ টাকা নজর দিতে হইতেছে। প্রজা জমিতে চাষ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই, উক্ত ২৮/০ বিঘা জমি মহাজনের নিকট রেহানে আবদ্ধ রাখিয়া, নজরের ২১০০৲ হইতে ২৮০০৲ টাকা সংগ্রহ করিয়া জমিদারকে দিতেছে। তাহাকে উক্ত টাকার সুদ শতকরা মাসিক ২৲ হারে, জমি পত্তনের সময়

হইতেই দিতে হইতেছে। পতিত জমিতে কি পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হইবে, তাহার স্থিরতা নাই;—আদৌ চাষ-যোগ্য হইবে কিনা বা কত সময় পরে হইবে, তাহাও বলা যায় না। সুতরাং আপনারা বুঝিতেছেন, একদিনেই তাহার ঋণের পরিমাণ আরও কিরূপ বৃদ্ধি পাইল। এমতাবস্থায় কৃষকের ভাবীফল যে কিরূপ হইবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। অনেকস্থলেই, 'ঢাকী শুদ্ধ বিসর্জ্জন' অর্থাৎ উৎপন্নবৃদ্ধির দুরাশায় ঋণ করিয়া নূতন জমি পত্তন লওয়াতে, ঋণের দায়ে উহার সহিত পৈতৃক জমিও বিক্রীত হইয়া যায়। সুতরাং কৃষক যে উদ্দেশ্যে গোচর ধ্বংস করিয়াছিল, তাহার সে উদ্দেশ্য বিফল হইয়া গেল।

এখন দেখা যাউক, সংগৃহীত জমি সুফলপ্রসূ হইলেই বা তাহাতে কৃষকের অবস্থার কিরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে। আমাদের দেশের সাধারণ কৃষকের অবস্থা অতীব শোচনীয়। যখন কৃষকেরই খাদ্যাভাব, তখন তাহাদের প্রতিপালিত গবাদি পশুর যে খাদ্যাভাবে শীর্ণ, দুর্ব্বল ও মৃতকল্প, তাহা বোধ হয় আপনারা স্বীকার করিবেন। ১২০৲ মূল্যের সুস্থ ও সবল একজোড়া বলদ বা মহিষের দ্বারা মাত্র ১৫/০ বিঘা জমির সুন্দররূপে চাষ হইতে পারে। তদতিরিক্ত জমি চাষ করিতে হইলে, একাধিক জোরা বলদ বা মহিষের প্রয়োজন। আমাদের দেশের অধিকাংশ কৃষকেরই চাষের উপযুক্ত ভাল বলদ নাই। সাধারণ কৃষক দরিদ্র বলিয়া, তাহারা অধিক মূল্যের ভাল বলদ ক্রয় করিতে পারে না। ফলে, আমাদের দেশে সাধারণতঃ ২০৲ টাকা হইতে ২৫৲ টাকা মূল্যের বলদ অথবা একটী গাভী ও একটী বলদ দ্বারা জমি চাষ হইয়া থাকে। এইরূপ রুগ্ন ও দুর্ব্বল দুই জোড়া বলদ ও দুইখানি হাল না হইলে ১০/০ বিঘা জমি যথোপযুক্ত রূপে চাষ হইতে পারে না। যাহা হউক, প্রতি হালে ১৫/০ বিঘা করিয়া চাষ করিলেও, নূতন জমি-সংগ্রাহক কৃষকের অন্ততঃ তিন জোড়া বলদ বা মহিষের দরকার হইবে। কারণ, তাহাকে পৈতৃক ১০/০ বিঘা এবং নূতন সংগৃহীত ২৮/০ বিঘা—এই মোট ৩৮/০ বিঘা জমি চাষ করিতে হইবে। তিন জোড়া বলদ বা মহিষের মূল্য, প্রতি জোড়া ১২০৲ হিসাবে, ৩৬০৲ টাকার কম হইবে না। সকল জমি চাষ করিতে হইলে কৃষকের বলদ ক্রয় করিবার জন্য ৩৬০৲ টাকার প্রয়োজন। কিন্তু সে এত অধিক টাকা ব্যয় করিয়া হলবাহী বলদ বা মহিষ সংগ্রহ করিতে পারে না। সুতরাং সে নিজ সামর্থ্যানুসারে ৭৫৲ টাকা হইতে ১০০৲ টাকায় তিন জোড়া দেশী বলদ ক্রয় করে; এবং ঐ তিন জোড়া বলদের দ্বারাই ৩৮/০ বিঘা জমি চাষ করিয়া লয়। বলা বাহুল্য, ইহাতে উপযুক্তরূপে জমি চাষ হয় না; সুতরাং নামমাত্র কর্ষিত জমিতে কখনও উপযুক্ত পরিমাণ ফসল জন্মে না। ফলে, কৃষকের উদ্দেশ্য সফল বা তাহার অভাব মোচনও হয় না;—লাভের মধ্যে ঋণের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। শেষে ঋণের দায়ে কৃষকের সর্ব্বস্ব মহাজনের হাতে চলিয়া যায়। ইহাতে কৃষক ভিখারী হয়, দেশের দারিদ্র্যও বৃদ্ধি করিয়া দেয় এবং গোচর-ভূমির সম্পূর্ণ অভাব হইয়া পড়ে।

পাট—এ দেশের কৃষকের আর একটী দুরবস্থার কারণ পাটের চাষ। বহু পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিয়া কৃষক পাটের চাষ করে; এবং পাটের চাষে কৃষকের হাতে একসঙ্গে কতকগুলি টাকাও আইসে। কিন্তু তথাপি, উহাকে কৃষকের লাভ হওয়া দূরে থাকুক, বিশেষ ক্ষতিরই কারণ হয়। কথাটা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দিতেছি।

একবিঘা জমিতে যদি ৫/০ মণ কোষ্টা উৎপন্ন হয় (সাধারণতঃ ইহার অধিক হয় না), এবং উহার প্রতিমণ যদি ৫৲ টাকা দরে বিক্রয় হয় (কোনও কোনও বৎসর পাটের দর ৮।১০৲ টাকা হইলে কৃষক কিছু বেশী পায়), তাহা হইলেও একবিঘা জমির পাট বিক্রয় করিয়া কৃষক মোট ২৫৲ প্রাপ্ত হয়। তাহা হইতে জমিদারের খাজনা ১৲ টাকা ও চাষের মোট ব্যয় ৮৲ একুন ৯৲ টাকা ব্যয় বাদে কৃষকের ১৬৲ টাকা লাভ হইয়া থাকে। এই লাভ দেখিয়া, পাটের চাষ যে কৃষকের পক্ষে অহিতকর তাহা আপনারা বোধ হয় সহজে স্বীকার করিতে রাজি হইবেন না। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমার যে বক্তব্য আছে, তাহা যদি আপনারা অনুগ্রহ করিয়া শুনেন, তবে আপনারাও আমার মতাবলম্বী হইবেন বলিয়া আমার মনে হয়। যাহাদের সংবৎসরের খাদ্য—ধান্যাদি উৎপন্ন হইবার উপযোগী জমি

বাদেও উদ্বর্ত্ত জমি থাকে, তাহারাই ধান্যাদির চাষ করিয়াও অতিরিক্ত জমিতে কোষ্টার চাষ করিলে লাভবান হইতে পারে। কিন্তু যে কৃষকের জমির পরিমাণ ৫/০ হইতে ১০/০ বিঘা, তাহার কখনও পাটের চাষ করা উচিত নহে। কারণ, পাটের চাষে তাহার দুরবস্থা বৃদ্ধি হওয়া ব্যতীত হ্রাস হয় না।

আজকাল দেশে যেরূপ ঋতু-বিপর্য্যয় দেখিতে পাই, তাহাতে কোনও ফসল—আউশ কি আমন ধান্য প্রভৃতি আশানুরূপ উৎপন্ন হইবে কিনা, তাহা স্থির করা বড়ই দুরূহ। সুতরাং, 'মো' বুঝিয়া ধান্যের চাষ এবং সংবৎসরের আহার্য্য ধান্যের সংস্থান করা, দরিদ্র কৃষকের পক্ষে বিশেষ আবশ্যক। কৃষকের ঘরে সংবৎসরের ধান্য মজুত রহিলে, তাহাকে উদরপূর্ত্তির নিমিত্ত মহাজনের দ্বারস্থ হইতে হয় না: এবং মহাজন যে সুদ চাহে, সেই সুদেই টাকা ধার করিতেও হয় না। যে কৃষকের ৯/০ বিঘা জমির জোত আছে, তাহার যদি ৭/০ বিঘা ধানী-জমি থাকে, তাহা হইলে ৭/০ বিঘা জমিতেই আউশধানের চাষ করা কর্ত্তব্য। বাকী ১/০ বিঘা জমিতে পাট এবং ১/০ বিঘা জমিতে তামাক, তরিতরকারী, পিয়াজ ও মরিচ প্রভৃতি চাষ করা আবশ্যক। মনে করুন, কৃষক তাহাই করিল। ফলে হইল—

৭/০ বিঘা জমিতে আউশ—
প্রতি বিঘায় ৩/০ হিসাবে ২১/০ মণ।
১/০ বিঘা জমিতে কোষ্টা—
প্রতি বিঘায় ৫/০ হিসাবে ৫/০ "

এই ৫/০ মণ পাটের ১/০ মণ নিজের ব্যবহারের নিমিত্ত রাখিয়া, সে বিক্রয় করিল ৪/০ মণ। ইহাতে সে পাইল ২০৲ টাকা।

এখন একটা কথা ভাবুন,—কৃষক আউশধান ও কোষ্টা ভাদ্রমাসে পাইল। প্রতিদিন কৃষকের /৪ সের করিয়া ধানের প্রয়োজন হইলে, তাহার মাসে লাগিতেছে ১২০ সের অর্থাৎ ৩/০ মণ। এই হিসাবেও, ২১/০ মণ ধান্য দ্বারা কৃষকের ৭ মাস অর্থাৎ ভাদ্র হইতে ফাল্গুন পর্য্যন্ত চলিবে। কোষ্টা ও তরি-তরকারী প্রভৃতি বিক্রয়লব্ধ অর্থে কৃষকের সাত মাসের প্রয়োজনীয় খরচ বাদেও যৎকিঞ্চিৎ মজুত রহিতে পারে। আউশ উঠিবার পর, সে যদি পুনরায় ৭/০ বিঘা ধানী-জমিতে আমনধান্য উৎপন্ন করে, তবে ঐ জমিতে পুনরায় ২১/০ মণ ধান্য উৎপন্ন হইতে পারে; এবং এই ধান্যেও তাহার ৭ মাস চলিবে। চৈত্র হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত ৭ মাস। প্রতিবৎসর বৈশাখমাসের পূর্ব্বেই আউশ ও কোষ্টার চাষ করিতে হয়; এবং ভাদ্রমাসে ধান্য ও পাট পাওয়া যায়। সুতরাং দেখিতে পাইতেছেন, পর বৎসরে আউশ ও কোষ্টা না পাওয়া পর্য্যন্ত কৃষককে আর খাওয়ার ধান খরিদ করিতে হয় না। মনে করুন, দুর্ব্বৎসরে যদি কৃষকের আমনধান উৎপন্ন না হয়, তথাপি তাহাকে মাত্র ৭ মাসের খাদ্যোপযোগী ধান্য খরিদ করিতে হইবে। গড়ে প্রতিজনের খাদ্যের নিমিত্ত, ধান্যের মূল্য হিসাবে ধরিলে, কৃষকের মাসিক ১০৲ (সাধারণ কৃষকপরিবারে গড়ে ৫ জন ধরিয়াই হিসাব করা হইল) হিসাবে ৭ মাসের মোট ৭০৲ টাকা লাগিবে। এই টাকা ব্যয় হইতে না হইতেই, সে পরবৎসরের কোষ্টা ও আউশধান পাইবে। এই হিসাবে নেহাত দুর্ব্বৎসরেও কৃষককে ৭০৲ টাকার অধিক ঋণ গ্রহণ করিবার আবশ্যক হইতে পারে না।

এইক্ষণ মনে করুন, কৃষকের কোষ্টার চাষের প্রতি ঝোঁক পড়িল। সে এক বিঘার স্থলে দুই বিঘায় কোষ্টার চাষ করিল। কোষ্টার চাষে অত্যধিক পরিশ্রম করিতে হয়। সুতরাং, ২/০ বিঘা জমিতে কোষ্টার চাষ করিলে, ২/০ বিঘার অধিক জমিতে আউশধানের চাষ করিতে পারিল না। সেই চাষে ফল হইল:—

কোষ্টা ২/০ বিঘা জমিতে—
৫/০ মণ হিসাবে—১০/০ মণ
মধ্যে নিজের ব্যবহারের ১/০ মণ বাদে
বাকী ৯/০ মণের মূল্য ৪৫৲
আউশ ২/০ বিঘায় উৎপন্ন হইল—
৩/০ মণ হিসাবে—৬/০ মণ।

এই আউশধানে ভাদ্র ও আশ্বিন—দুই মাস চলিবে। সুতরাং কার্ত্তিকমাস হইতেই তাহাকে ধান খরিদ করিয়া খাদ্যাভাব দূর করিতে হইবে। সুতরাং আপনারা দেখিতেছেন, তাহাকে কোষ্টার মূল্য ৪৫৲ টাকা দিয়াই

কার্ত্তিক হইতে পরবৎসরের ভাদ্রমাস পর্য্যন্ত সংসার চালাইতে হইবে। এই এগারমাসে, মাসিক ১০৲ টাকা হিসাবে, তাহার ১১০৲ টাকার প্রয়োজন। যদি আমনধান না জন্মে, তবে ইহার কমে তাহার চলিবে না। তাহার হাতে যে ৪৫৲ টাকা আছে, তাহার ১৫৲ টাকাই হয়ত সে বাজেখরচ করিয়া ফেলিবে। কারণ, কৃষকের হাতে টাকা পড়িলেই, তাহার খরচের মাত্রা যে অত্যধিক হইয়া পড়ে, ইহা কাহারও অজ্ঞাত নহে। ৪৫৲ টাকার ১৫৲ টাকা বাদে, বাকী ৩০৲ টাকায় কৃষকের তিনমাস চলিবে। সুতরাং, বাকী আটমাস তাহাকে টাকা ধার করিয়াই উদরপূর্ত্তির ব্যবস্থা করিতে হইবে। মাসিক ১০৲ হিসাবে আটমাসের জন্য কৃষক যে ৮০৲ টাকা ধার করিবে, ইহার সুদ আটমাসে, কম করিয়া ধরিলেও, ২০৲ টাকার কম হইবে না। সুতরাং কৃষকের সুদে-আসলে মোট ঋণের পরিমাণ ১১০৲ টাকা হইবে। একবিঘা জমিতে পাটের চাষ করিলে কৃষকের ঋণের পরিমাণ ৭০৲ টাকার অধিক হইতে পারে না। এই হিসাবে, ২/০ বিঘা জমিতে পাটের চাষ করিয়া, তাহার ঋণের পরিমাণ ৩০৲ টাকা অধিক হয়। সে যতই অধিক পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ করিবে, ততই তাহার ঋণের পরিমাণ অধিক হইবে। কারণ, পাটের চাষ অধিক হইলে, কৃষককে বারমাসই ঋণ করিয়া খাইতে হইবে; এবং এই টাকার সুদ যোগাইতেই তাহার 'লাভের গুড় পিপীড়ায় খাইবে'।

আমরা যেভাবে টাকা মজুত রাখিতে পারি, সেভাবে কৃষকের হস্তে টাকা মজুত রহে না। কোষ্টা বিক্রয়ের মূল্য কৃষকের হস্তগত হইবামাত্রই, মহাজন তাহার প্রাপ্য যতদূর পারে আদায় করিয়া লইতে চেষ্টা করে। কৃষকও মনে করে, মহাজনকে অধিক টাকা দিতে পারিলে, সে ভবিষ্যতে ইচ্ছানুযায়ী টাকা ধার করিতে পারিবে। সুতরাং সে মহাজনকে টাকা দিতে আপত্তি করে না। মহাজন যে টাকা পায়, তাহার অধিকাংশই সুদের বাবদ কাটিয়া লয়। সুতরাং কৃষকের ঋণ যাহা ছিল, প্রায় তাহাই রহিয়া যায়। অধিকন্তু, অধিক পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ করাতে তাহাকে বারমাসই টাকা ধার করিয়া খাইতে হয়। ফলে, উত্তরোত্তর তাহার ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া, তাহাকে ধ্বংসের পথে আনয়ন করে।

হাতে টাকা হইলে ভাল করিয়া খাইবার ও পড়িবার ইচ্ছা স্বতঃই কৃষকের মনে প্রবল হইয়া উঠে। সুতরাং অধিক পরিমাণে পাটের চাষ করিয়া, যতই অধিক টাকা কৃষকের হস্তগত হয়, সে ততই অধিক টাকা অনাবশ্যক ব্যয় করিয়া ফেলে। মহাজনকে টাকা দিয়া সন্তুষ্ট করিতে পারিলেই কৃষকের আর কোনও ভাবনা রহে না। চাহিবা মাত্রই টাকা ধার পাইবে,—এই আশায় সে টাকা ব্যয় করিতে ইতস্ততঃ করে না। ফলে, যতই অধিক টাকা কৃষকের হস্তগত হউক না কেন, তাহা ২।১ মাসের মধ্যেই ফুরাইয়া যায়। কখনও বা কোষ্টার টাকা হাতে আসিলে, কৃষক টাকার গরমে অস্থির হইয়া উঠে; এবং পুরাতন বিবাদ জাগাইয়া তোলে। তদবস্থায়ই কৃষক ফৌজদারী মোকদ্দমা আরম্ভ করে। মোকদ্দমা-খরচে অনেকসময়ই গরিব কৃষকের পাট-বিক্রয়লব্ধ অর্থ বৃথা ব্যয়িত হইয়া যায়। কখন কখন ধার করিয়াও তাহাকে মোকদ্দমার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হয়। এই সব নানাকারণে, লাভজনক কোষ্টার চাষ করিয়াও, কৃষকের দুরবস্থা ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতেছে।

পাটের চাষে দেশে আর একটা দুর্দ্দৈব উপস্থিত হইয়াছে। তৎসম্বন্ধে আমি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। দেশে যে সকল ক্ষুদ্র নদী, পুষ্করিণী, ডোবা প্রভৃতি পুরাতন জলাশয় ছিল, তাহাতে প্রচুর পরিমাণে জলজঘাস—দলঘাস প্রভৃতি জন্মিত। ঐ ঘাস ও দল-দাম প্রভৃতি গো-মহিষাদি গৃহপালিত পশুর কাঁচাখাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইত। তদ্ভিন্ন, পুরাতন জলাশয়ে গবাদি অবাধে স্নান করিত এবং তাহার জল পান করিত। যে বৎসর চাষের সময় ধারাপাত হইত না, সেইসময়, আমাদের দেব-মাতৃক-দেশে, ঐ সকল জলাশয় হইতেই ক্ষেত্রে জলসেচন করিয়া শস্য রক্ষা করা হইত। এখন লোকের একটা জমি-বাই-রোগ জন্মিয়াছে। যাহাদের উচ্চহারে নজর দিয়া জমি সংগ্রহ করিবার শক্তি নাই, তাহারা পুরাতন ডোবা, পুষ্করিণী, ক্ষুদ্র নদী প্রভৃতি ক্রমশঃ পত্তন লইতে আরম্ভ করিয়াছে; এবং ঐ সকল জলাশয়ের চতুষ্পার্শ্বস্থ পাড় কোদাল দ্বারা

কাটিয়া, জলাশয়গুলি ভরট—পাটচাষের উপযুক্ত নিম্নভূমিতে পরিণত করিয়া লইতেছে। ইহাতে গো-মহিষের কাঁচাঘাসের বিশেষ অভাব হইয়া পড়িতেছে এবং উহাদের স্নানের স্থানও মিলিতেছে না। এক্ষণ কৃষকেরা কূপ হইতে জল তুলিয়া, তদ্দ্বারা গবাদিকে স্নান করাইতেছে। ঐভাবে স্নান যে উপযুক্ত নহে, তাহা আর আপনাদিগকে বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। এক্ষণ গবাদি পশু খাদ্যাভাবে শীর্ণ—অস্থি কঙ্কালসার; এবং দূষিত জলপানে (পাটপচান ডোবার জল ভয়ানক দূষিত; জলাভাবে এই জলই গবাদি পশুরা পান করিয়া থাকে) রুগ্ন হইয়া পড়িতেছে। পেটের পীড়া ও অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া, প্রতিনিয়তই দলে দলে গবাদি পশু মরিয়া যাইতেছে। এক্ষণ প্রায় সকলসময়েই গ্রামে গ্রামে গো-মড়ক লাগিয়াই রহিয়াছে। ফলে, দেশ ক্রমশঃ গবাদি শূন্য হইয়া পড়িতেছে।

আর এক কথা;—পূর্ব্বে দেশে জলাশয়-খনন একটা পুণ্যের কার্য্য বলিয়া সকলেরই ধারণা ছিল। এইজন্য জলাশয় খনন করিবার প্রার্থনা করিলে, জমিদারমাত্রেই প্রজার প্রার্থনা বিনা ওজরে মঞ্জুর করিতেন। আজকাল দেশের আর সেভাব নাই। জমিদার প্রজার উপকারার্থে জলদৈন্যস্থানে পুষ্করিণী খনন করাইয়া দেন না; পক্ষান্তরে, প্রজাও আর পুষ্করিণী দেয় না। যদি কোনও কৃষকের মনে জলাশয়-প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা হয় ও তাহার উহা খনন করাইবার উপযুক্ত অর্থ থাকে, তথাচ তাহার আশা পূর্ণ হয় না। এক্ষণ জমিদারের নিকট পুকুর কাটাইবার জন্য জমি মোকররী করিয়া লইতে হয়। কিন্তু সেই মোকররী ও পুকুর কাটাইবার অনুমতি লইবার বাবদ জমিদারকে প্রায়ই যে টাকা নজর দিতে হয়, তাহা দিয়া পুষ্করিণী-খননের প্রয়োজনীয় ব্যয়সঙ্কুলন হয় না। সুতরাং কৃষকের বলবতী বাসনা প্রায়ই অপূর্ণ রহিয়া যায়। পুরাতন জলাশয়গুলি ক্রমশঃই চাষী-জমিতে পরিণত হইতেছে; অথচ এক্ষণ আর কুত্রাপি নূতন জলাশয়ের প্রতিষ্ঠা হইতেছে না। ফলে, গ্রামে গ্রামেই মহা জলকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। এই জলকষ্ট নিবারণের একটা প্রকৃষ্ট উপায় নির্দ্ধারণ করা অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। ঐ সঙ্গে আরও একটা কথা ভাবিতে হইবে। আমাদের এদেশ দেব-মাতৃক দেশ। বর্ষার যথোপযুক্ত পরিমাণে বৃষ্টিপাত না হইলেই, জলসেচন করিয়া চাষ করিতে হয়। আমি পূর্ব্বে নিবেদন করিয়াছি, জলাশয়ের সংখ্যা ক্রমশঃই কমিয়া যাইতেছে। এমতাবস্থায়, যে বৎসর অল্প বৃষ্টি হয় বা যথাকালে বৃষ্টি না হয়, সেই বৎসরই বীজবপনকালে ও তৎপর জলের প্রয়োজন হয়। কিন্তু এক্ষণ জলাশয়ের অভাব ঘটিয়াছে বলিয়া, সেচন করিবার উপযোগী জলের অভাবে, মাঠে প্রায়ই ফসল শুষ্ক হইয়া যায়। কূপজলে কি একটা মাঠের শস্যের জলাভাব মোচন হইতে পারে? এইজন্য সুবৃষ্টির বৎসর ব্যতীত, অন্যান্য বৎসরে জলাভাবেই শস্য নষ্ট হইয়া যায় বা আশানুরূপ শস্য জন্মে না। ইহার উপায় কি?

দুর্ভিক্ষের কারণ—আমরা বাল্যকালে দেখিয়াছি, আমাদের দেশের ছোট বা বড় সকল কৃষকই নিজ প্রয়োজনীয় খাদ্য গোলায় সঞ্চিত রাখিত। অবস্থানুযায়ী কোনও কৃষকের বাড়ীতে একটী, কাহারও বাড়ীতে তদতিরিক্ত সংখ্যক ধান্য-গোলা দেখা যাইত। আজ সেগুলি না থাকিবার কারণ কি? আজকাল কৃষকেরা প্রয়োজনীয় খাদ্যসংগ্রহ করিয়া রাখিতে পারে না কেন, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া স্থির করা এবং তাহার প্রতিকারের উপায় নির্দ্ধারণ করা আপনাদের সকলেরই অবশ্যকর্ত্তব্য।

পূর্ব্বে এক অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চলে শস্য প্রেরণ করা এক বিষম সমস্যা ছিল। এই ক্ষণ রেলপথ হওয়াতে রপ্তানির কোনও অসুবিধা হয় না। কোনও প্রদেশে অন্নাভাব উপস্থিত হইলে, ভিন্ন প্রদেশ হইতে সেইস্থানে চাউলাদি অতি সহজে ও অল্প ব্যয়ে রপ্তানি করা যাইতে পারে। সমগ্র বঙ্গে প্রতিবৎসর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় না;—কোনও বৎসর রাজসাহী-বিভাগে, কোনও বৎসর বা ঢাকা-বিভাগে দুর্ভিক্ষ হইয়া থাকে। কোনও স্থানে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে, স্থানীয় মহাজনগণ অন্যত্র হইতে চাউল আনয়ন করিয়া দুর্ভিক্ষের স্থানে মজুত করিয়া দেয়। সুতরাং কখনও খাদ্যদ্রব্যের অভাব হয় না। কিন্তু তথাপি, কোনও স্থানে দুর্ভিক্ষ হইলেই, তথায় অন্নসত্রের বা চাউল বিতরণের আয়োজন করিতে হয়।

দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত স্থানে খাদ্যদ্রব্যের অভাব না হইলেও, তথাকার অনেক লোক অনাহারে কঙ্কালসার হইয়া পড়ে। ফলে, তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য সমগ্র দেশের সমবেত চেষ্টা এবং সদাশয় গভর্ণমেণ্টের সাহায্যের প্রয়োজন হইয়া থাকে। ইহার কারণ কি?—আমার মনে লয়, প্রজার ক্রয় করিবার শক্তির অভাবই ইহার একমাত্র কারণ।

বাজারে আমার প্রয়োজনীয় রাশিকৃত জিনিষ উপস্থিত। কিন্তু আমার যে পরিমাণ ক্রয় করা আবশ্যক, তাহার ক্রয়োপযোগী অর্থ আমার নাই। এমতাবস্থায় জিনিষ থাকিতেও আমি উহা কিনিতে পারিতেছি না। সুতরাং খাদ্য থাকিতেও অনাহারে মরিতেছি। আবার মনে করুন, আমার একেবারেই অর্থাভাব হয় নাই; কিন্তু দেশে যে পরিমাণ জিনিষের দরকার, তাহা অপেক্ষা কম জিনিষ উঠিয়াছে। সুতরাং প্রত্যেকেরই মনে ভয়, আগে ক্রয় করিতে না পারিলে উপযুক্ত পরিমাণ পাইব না। তাই ক্রমশঃ দরবৃদ্ধি হইতে লাগিল। অবশেষে এত দূর দর বাড়িয়া গেল যে, আপনি অর্থশালী বলিয়া অগ্নি-মূল্যেও আপনার প্রয়োজনীয় দ্রব্য খরিদ করিতে পারিলেন সত্য, কিন্তু মূল্য অত্যধিক বলিয়া, যেস্থলে আমার ১৴০ মণ দরকার আমি সেস্থলে ৴৫ সের মাত্র খরিদ করিতে পারিলাম। অর্থাভাববশতঃ, আমার যে পরিমাণ আবশ্যক তদপেক্ষা কম কিনিতে বাধ্য হইলাম; এবং এই কারণেই প্রয়োজন অপেক্ষাও কম জিনিষ খাদ্যরূপে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলাম। ফলে, একবেলাও পেট পূরিয়া আহার করিতে পারিলাম না। ইহাকে দুর্ভিক্ষের ফল বলিতে হয় বলুন; আমি কিন্তু ইহাকে অর্থাভাব বলিয়াই মনে করিব। পাটের চাষে এ দেশের কৃষকের প্রচুর অর্থাগম হয় সত্য, কিন্তু তথাপি, তাহাদের অর্থের অভাব হয় কেন, তাহা পূর্ব্বেই আপনাদিগকে জানাইয়াছি। পূর্ব্বে কৃষকের অর্থ ছিল না, কিন্তু ঘরে প্রচুর খাদ্য মজুত রহিত। আজকাল অর্থের লোভে পড়িয়াই কৃষকের বিষম দুরবস্থা ঘটিয়াছে।

গভর্ণমেণ্ট প্রত্যেক প্রজার গড়ে বার্ষিক আয় ৩০৲ টাকা বা মাসিক ২॥০ টাকা ধরিয়াছেন। আপনারা প্রত্যেকেই বাড়ীতে চাকর রাখিয়া থাকেন; সুতরাং সকলেই জানেন যে, একজন লোক কোনও পরিবার-ভুক্ত হইলে, তাহার খাইখরচা বাবদ মাসিক ৪৲ টাকা হইতে ৬৲ টাকা পড়ে। সুতরাং নিম্নহার ধরিলেও আজ-কাল বার্ষিক ৪৮৲ টাকার কমে একজনের খোরাকী হয় না। এমতাবস্থায় বার্ষিক ৩০৲ টাকা যাহার আয়, তাহার উপায় কি?—তাহার অন্নকষ্ট অবশ্যম্ভাবী। কৃষক-কুলকে রক্ষা করিতে হইলে, আপনাদের আর উদাসীন-ভাবে বসিয়া থাকিলে চলিবে না। আপনারা উঠুন,—জাগ্রত হউন,—জ্যেষ্ঠভ্রাতা কৃষকগণকে রক্ষা করিবার জন্য অগ্রসর হউন। যাহাতে কৃষিকার্য্যে উৎপন্নের পরিমাণ বৃদ্ধি হয়, যাহাতে দেশের সর্ব্বত্র নূতন নূতন শস্যচাষে কৃষকগৃহে আবার ধনাগম হয়, তাহা শিক্ষা দিবার জন্য আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরকে কৃষিশিক্ষা দিউন;—গ্রামে গ্রামে আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করুন;—কৃষককে হাতে-হেতেড়ে উন্নত-প্রথার চাষ-বাস চাক্ষুষ দেখাইয়া দিউন। আমাদের শস্য-শ্যামলা দেশ হইতে দুর্ভিক্ষ বা অন্নকষ্ট দূর করিয়া দিয়া, দেশমাতৃকার আশীর্ব্বাদভাজন হউন। স্মরণ রাখিবেন, এ দেশের কৃষকের শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছে; এবং তাহারা ধ্বংসের পথে ক্রমেই অগ্রসর হইতেছে। সুতরাং তাহাদিগকে রক্ষা করিতেই হইবে। এই কৃষকেরাই আমাদের অন্নদাতা—আমাদের সমাজের মেরুদণ্ডস্বরূপ। তাহাদিগের উন্নতি বা অবনতির সহিত আমাদেরও উন্নতি বা অবনতির নৈকট্যসম্বন্ধ রহিয়াছে বলিয়া, আজ কৃষকের শোচনীয় অবস্থা বা দুরবস্থার বিষয় আপনাদের নিকট সংক্ষিপ্তভাবে বিবৃত হইল।

শ্রীবৈদ্যনাথ সান্যাল।

Printed by Jatindra Mohan Das at the Wari Printing Works, Dacca and published by Nishi Kanta Ghosh at the Krishi-Sampada office, 66, Narinda, Dacca.

কৃষি-সম্পদ

কৃষি, কৃষি-শিল্প এবং যৌথ ঋণ-দান-সমিতি-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নূতন ধরণের সচিত্র মাসিক পত্র।
অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩৲ মাত্র।

প্রবন্ধ-সম্পদে অতুলনীয়, চিত্র-সৌন্দর্য্যে
অপূর্ব্ব ও সর্ব্বত্র উচ্চ-প্রশংসিত
বাঙ্গালার কৃষি-বিষয়ক
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও বৃহত্তম পত্র।

লেখক—"কৃষি-সম্পদে" রহিয়াছেন—

আমেরিকা-প্রত্যাগত শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী বি, এ, এম, এস, এ।
" " শ্রীযুক্ত দ্বিজদাস দত্ত এম্, আর, এ, সি,
" " " অনাথবন্ধু সরকার এম্, এ, সি, এস,
জাপান-প্রত্যাগত শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম্, এ, এস।
" " " রসিকরঞ্জন ঘোষ এম্, এস, এ।
" " " মন্মথনাথ দে " " "
" " " যোগেশচন্দ্র চৌধুরী " " "
" " মিঃ এ, সি, ঘোষ এম্, এ, এস্।
" " " এন্, এল, দত্ত " " "
" " ডাঃ পি, কে, বিশ্বাস পি এইচ, ডি।
ফ্রান্স-প্রত্যাগত শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস এস, ই
" ঈশ্বরচন্দ্র গুহ এফ, আর, এইচ, এস
" প্রবোধচন্দ্র দে " " " "
" রাজেশ্বর দাসগুপ্ত এম, আর, এ, এস
" প্রকাশচন্দ্র সরকার " " " "
" রঘুনাথ দাস জি, বি, ভি, সি
" কামিনীকুমার লাহিড়ী B. A. G.
" হেমচন্দ্র দেব (মেডিকো বোটানিষ্ট)

রংপুর গবর্ণমেণ্ট কৃষি-পরীক্ষাক্ষেত্রের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত যামিনীকুমার বিশ্বাস বি, এ, কটক গবর্ণমেণ্ট কৃষি-পরীক্ষাক্ষেত্রের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত রাজনাথ রায় বি, এ, ঢাকা-বিভাগের স্কুল-ইন্‌স্পেক্টার রায় সাহেব শ্রীযুক্ত প্রমোদ কুমার বসু এম, এ, আমেরিকার বার্কলী কৃষি-কলেজের শ্রীযুক্ত স্বর্ণকুমার মিত্র, শ্রীযুক্ত নিরুপমচন্দ্র গুহ প্রভৃতি।

বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী।

১। "কৃষি-সম্পদে" তিনমাসের কম কো[illegible] বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় না।

২। অশ্লীল বিজ্ঞাপন গ্রহণ করা হয় না।

৩। একাদিক্রমে তিনমাস বিজ্ঞাপন [illegible] হইলে পর, বিজ্ঞাপনদাতা ইচ্ছা করিলে ভাষার পরিবর্তন করিতে পারেন।

৪। চুক্তির সময় পূর্ণ হইবার ১৫ দিবস পূর্ব্বে বিজ্ঞাপন বন্ধ করিবার নিষেধ-পত্র না পাইলে, পূর্ব্বোক্ত হারেই বিজ্ঞাপন চলিবে এবং এ বিষয়ে বিজ্ঞাপনদাতার মত আছে বুঝিয়া লওয়া হইবে।

৫। অন্য কোনরূপ চুক্তির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের সহিত বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

৬। **"কৃষি-সম্পদ" সম্বন্ধীয় সমস্ত চিঠি-পত্র, প্রবন্ধ, বিনিময়ের সংবাদ-পত্র, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি** "কৃষি-সম্পদ" পত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত ঘোষের নিকট কৃষি-সম্পদ আফিস, ৬৬নং নারিন্দা, ঢাকা,—এই ঠিকানায় এবং টাকাকড়ি আমার নামে পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয়—
৬৬নং নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীরমনীকান্ত ঘোষ
কার্য্যাধ্যক্ষ।

বিজ্ঞাপনের হার।

১। "কৃষি-সম্পদে" বিজ্ঞাপনের হার সুলভ। মাসিক প্রতিপৃষ্ঠা ৬৲ টাকা; প্রতিকলম ৪৲ টাকা। সিকি কলম ২॥০ টাকা; ৳ কলম ১॥০ টাকা।

২। কাভারিংএর দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ পৃষ্ঠায়ও বিজ্ঞাপন গৃহীত হইবে। দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় মাসিক ১০৲, ৩য় পৃষ্ঠার ৮৲ টাকা এবং চতুর্থ পৃষ্ঠায় ১২৲ টাকা দেয়।

ক্রোড়পত্র ৮ পৃষ্ঠা মাসিক ৩০৲ টাকা; ৪ পৃষ্ঠা ২০৲; ২ পৃষ্ঠা ১২৲ টাকা এবং ১ পৃষ্ঠা—১০৲ টাকা মাত্র।

বাৎসরিক চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

আমাদের বিজ্ঞাপনের দর-দস্তুর নাই—ইহাই নির্দ্দিষ্ট নিয়ম।

বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

১২৪
প্রপীড়িত
ব অনেক
হাদিগ
ঃ সদাশ
ইহ

...দের বহুল প্রচার-কামনায়, বিগত ১৩১৭, ১৩১৮, ও ১৩১৯—

...সালের "কৃষি-সম্পদ" অর্দ্ধমূল্যে প্রদত্ত হইবে।

স্মরণ রাখিবেন—

এ আশাতীত সুযোগ অধিক দিন স্থায়ী হইবে না।

... বর্ষের অর্থাৎ ১৩১৭ সালের "কৃষি-সমাচারে" ("কৃষি-সম্পদের" প্রথমবর্ষে নাম ছিল "কৃ... ...াচার") ন্যূনপক্ষে ৫০টীরও অধিক তথ্যবহুল কৃষি-প্রবন্ধে এবং ৫০টী কৃষি-প্রসঙ্গে নানা কৃষি কথা আলোচিত হইয়াছে। ইহাতে ১৫ খানি হাফ্‌টোন ছবি ও ৬ খানি লাইন ব্লক আছে।

দ্বিতীয় বর্ষের অর্থাৎ ১৩১৮ সালের "কৃষি-সম্পদে" ৪৫টী প্রবন্ধ ও ধারাবাহিক প্রবন্ধের আকারে প্রকাশিত ৪ খানি গ্রন্থের কতকাংশ প্রকাশিত হইয়াছে। কৃষি-প্রসঙ্গের সংখ্যাও অন্যূন ৭৫টী হইবে। প্রত্যেক প্রবন্ধ গড়ে কৃষি-সম্পদের ৮ পৃষ্ঠাব্যাপী হইয়াছে। সুতরাং কোন প্রবন্ধের কলেবরই ক্ষুদ্র হয় নাই। ১২শ সংখ্যায় মোট ২১ খানি হাফ্‌টোন ছবি প্রকাশিত হইয়াছে।

তৃতীয় বর্ষের অর্থাৎ ১৩১৯ সালের "কৃষি-সম্পদে" ৬৫টী কৃষি-প্রবন্ধ ও ৪৩টী কৃষি-প্রসঙ্গ প্রকাশিত হইয়াছে। এই বৎসরে ৪৮ খানি চিত্র রহিয়াছে। তন্মধ্যে ৪৭ খানাই কৃষি-চিত্র, এবং ৩০ খানাই এক পৃষ্ঠাব্যাপী।

পুস্তকের হিসাবে, এই তিন বৎসরের প্রত্যেক বর্ষের "কৃষি-সম্পদকে" প্রায় এক হাজার পৃষ্ঠার একখানি কৃষি-গ্রন্থ বলা যায়। এইরূপ একখানি সচিত্র পুস্তকের মূল্য ১০৲ টাকার কম হয় না। সুতরাং তিন বৎসরের "কৃষি-সম্পদকে" ৩০৲ টাকা মূল্যের একখানি বিরাট কৃষি-গ্রন্থ বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। কিন্তু আপনি ডাকমাশুলসহ ৫৲ টাকা পাঠাইয়া দিলেই, ৩০৲ টাকার সমান-বিগত ১৩১৭, ১৩১৮, ১৩১৯ সালের—এই তিন বৎসরের তিন সেট কৃষি-সম্পদ প্রাপ্ত হইবেন।

অদ্যকার ডাকেই টাকা পাঠাইয়া দিউন—

উক্ত তিন বৎসরের পত্রিকার অর্দ্ধমূল্য ও রেজেষ্টরী করিয়া পাঠাইবার ব্যয় বাবদ মাত্র ৫৲ টাকা মানি অর্ডার করিয়া পাঠাইয়া দিলেই, ঘরে বসিয়া আপনি তিন বৎসরের পত্রিকা প্রাপ্ত হইবেন। মূল্য অগ্রিম পাঠাইতে হইবে। পুরাতন "কৃষি-সম্পদ" ভিঃ পিঃ ডাকে পাঠাইতে পারিব না।

নামমাত্র ৫৲ টাকা পাঠাইয়া দিয়া—

এ অমূল্য রত্ন সংগ্রহ করিয়া রাখুন; ইহাই আমাদের বিনীত অনুরোধ। অল্পসংখ্যক পত্রিকা আছে।

টাকা পাঠাইবার ঠিকানা—শ্রীনিশিকান্ত ঘোষ। কৃষি-সম্পদ আফিস, ঢাকা।

Approved by the Director of Public Instruction Bengal, for use in Schools & Colleges (Vide, Calcutta Gaz...

Krishi-Sampad. ভাদ্র ... নিয়মাবলী।
Vol. VII No. V. & VI. একমাত্র কৃষিবিষয়ক মাসিক পত্র।

...নও বিজ্ঞা...
...নী।
...কাশিত

আমাদের অন্নসমস্যা-সমাধানের প্রধান উপায় কৃষি।

আমাদের শ্রম-শিল্পের প্রধান উপকরণও কৃষি।

কৃষি-তত্ত্বের বহুল প্রচার-কামনায়, বিগত ১৩১৭, ১৩১৮, ও ১৩১৯—

এই তিন সালের "কৃষি-সম্পদ" অর্দ্ধমূল্যে প্রদত্ত হইবে।

স্মরণ রাখিবেন—

এ আশাতীত সুযোগ অধিক দিন স্থায়ী হইবে না।

প্রথম বর্ষের অর্থাৎ ১৩১৭ সালের "কৃষি-সমাচারে" ("কৃষি-সম্পদের" প্রথমবর্ষে নাম ছিল "কৃষি-সমাচার") ন্যূনপক্ষে ৫০টীরও অধিক তথ্যবহুল কৃষি-প্রবন্ধে এবং ৫০টী কৃষি-প্রসঙ্গে নানা কৃষি-কথা আলোচিত হইয়াছে। ইহাতে ১৫ খানি হাফ্‌টোন ছবি ও ৬ খানি লাইন ব্লক আছে।

দ্বিতীয় বর্ষের অর্থাৎ ১৩১৮ সালের "কৃষি-সম্পদে" ৪৫টী প্রবন্ধ ও ধারাবাহিক প্রবন্ধের আকারে প্রকাশিত ৪ খানি গ্রন্থের কতকাংশ প্রকাশিত হইয়াছে। কৃষি-প্রসঙ্গের সংখ্যাও অন্যূন ৭৫টী হইবে। প্রত্যেক প্রবন্ধ গড়ে কৃষি-সম্পদের ৮ পৃষ্ঠাব্যাপী হইয়াছে। সুতরাং কোন প্রবন্ধের কলেবরই ক্ষুদ্র হয় নাই। ১২শ সংখ্যায় মোট ২১ খানি হাফ্‌টোন ছবি প্রকাশিত হইয়াছে।

তৃতীয় বর্ষের অর্থাৎ ১৩১৯ সালের "কৃষি-সম্পদে" ৬৫টী কৃষি-প্রবন্ধ ও ৪৩টী কৃষি-প্রসঙ্গ প্রকাশিত হইয়াছে। এই বৎসরে ৪৮ খানি চিত্র রহিয়াছে। তন্মধ্যে ৪৭ খানাই কৃষি-চিত্র, এবং ৩০ খানাই এক পৃষ্ঠাব্যাপী।

পুস্তকের হিসাবে, এই তিন বৎসরের প্রত্যেক বর্ষের "কৃষি-সম্পদকে" প্রায় এক হাজার পৃষ্ঠার একখানি কৃষি-গ্রন্থ বলা যায়। এইরূপ একখানি সচিত্র পুস্তকের মূল্য ১০৲ টাকার কম হয় না। সুতরাং তিন বৎসরের "কৃষি-সম্পদকে" ৩০৲ টাকা মূল্যের একখানি বিরাট কৃষি-গ্রন্থ বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। কিন্তু আপনি ডাকমাশুলসহ ৫৲ টাকা পাঠাইয়া দিলেই, ৩০৲ টাকার সমান বিগত ১৩১৭, ১৩১৮, ১৩১৯ সালের—এই তিন বৎসরের তিন সেট কৃষি-সম্পদ প্রাপ্ত হইবেন।

অদ্যকার ডাকেই টাকা পাঠাইয়া দিউন—

উক্ত তিন বৎসরের পত্রিকার অর্দ্ধমূল্য ও রেজেষ্টরী করিয়া পাঠাইবার ব্যয় বাবদ মাত্র ৫৲ টাকা মানি অর্ডার করিয়া পাঠাইয়া দিলেই, ঘরে বসিয়া আপনি তিন বৎসরের পত্রিকা প্রাপ্ত হইবেন। মূল্য অগ্রিম পাঠাইতে হইবে। পুরাতন "কৃষি-সম্পদ" ভিঃ পিঃ ডাকে পাঠাইতে পারিব না।

নামমাত্র ৫৲ টাকা পাঠাইয়া দিয়া—

এ অমূল্য রত্ন সংগ্রহ করিয়া রাখুন; ইহাই আমাদের বিনীত অনুরোধ। অল্পসংখ্যক পত্রিকা আছে।

টাকা পাঠাইবার ঠিকানা—শ্রীনিশিকান্ত ঘোষ; কৃষি-সম্পদ আফিস, ঢাকা।

অন্নং বহু কুর্বীত ॥ তদ্‌ব্রতম্ ॥

তৈত্তিরীয়োপনিষদি ভৃগুবল্লী।

সূচী।

[লেখকদিগের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।]

বিষয়				পত্রাঙ্ক
কৃষি-প্রসঙ্গ	...	...	...	১২৫
আমার ইক্ষুচাষ	...	...	...	১২৯
—শ্রীযুক্ত দেবেশ্বর গোস্বামী (বড়পাথার ইক্ষুক্ষেত্রের স্বত্বাধিকারী)				
খেকুরের চাষ	...	...	...	১৩২
—শ্রীযুক্ত নিরুপমচন্দ্র ওহ (বাকলী-কৃষি-কলেজ)				

কৃষি-প্রসঙ্গ

কচুরি-সার—স্থানবিশেষে কচুরি, টাগই বা বিলাতি পানা নামেও অভিহিত হয়। ইহাকে ইংরেজিতে 'ওয়াটার হায়েসিন্থ' (Water Hyacinth) কহে। কচুরি গাছের নূতন পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। কারণ, কচুরির উপদ্রবে জলপথে গমনাগমন করা যে কিরূপ কষ্টকর হইয়া পড়িয়াছে, তাহা কাহারও অজ্ঞাত নহে। ধান্য ও অন্যান্য শস্যের পক্ষেও, ইহা যে কিরূপ ক্ষতিকারক, তাহাও বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। এই সব নানা কারণে, সকলেই কচুরিকে অতি তুচ্ছ অজ্ঞাল এবং বড়ই অনিষ্টকর ও অনাবশ্যক পদার্থ বলিয়া মনে করিতেছেন। বিশ্বস্রষ্টার কোনও পদার্থই অতি তুচ্ছ বা অনাদরের নহে;—বিনা প্রয়োজনে কোনও পদার্থের সৃষ্টিও হয় নাই। এতদিন কচুরির অনিষ্টের

কথাই শুনিয়াছেন, আজ উহার ইষ্টের কথাই শুনাইতেছি। অতঃপর, কচুরিকে বিধাতার অযাচিত কৃপা-দান ভিন্ন আর কি বলিবেন ?

ঢাকা গভর্ণমেণ্ট ফার্ম্মের অভিজ্ঞ তন্তুবিদ্ (Fibre Expert) মহোদয় কচুরি-সারসম্বন্ধে যে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার স্থূলমর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

কচুরি পাটের পক্ষে উৎকৃষ্ট সার। অনেক স্থানেই কচুরি পচিয়া গিয়া মৃত্তিকার সহিত সংমিশ্রিত হইয়াছে ; এবং উহার উর্ব্বরতা-শক্তি বর্দ্ধিত করিয়াছে। ফলে, বিঘাপ্রতি অন্ততঃ এক মণ করিয়া পাটের ফলন অধিক হইয়াছে। ঢাকার সরকারী কৃষিপরীক্ষা-ক্ষেত্রে সাররূপে কচুরি ব্যবহার করা হইয়াছিল ; ইহাতে অন্যান্য সার অপেক্ষা বিঘাপ্রতি ২/০ মণেরও অধিক পাট জন্মিয়াছে। একশত মণ কচুরি হইতে প্রায় ৬/০ মণ ভাল পচাসার পাওয়া যায়। এই সার গোময়সার অপেক্ষাও ৫।৬ গুণ উৎকৃষ্ট। কচুরির (১) পচাসার এবং (২) ছাই—এই দ্বিবিধ প্রকার সারই ব্যবহার করিতে পারা যায়। কচুরি-গাছগুলি ক্রমাগত ২।৩ দিন পর্য্যন্ত রৌদ্রে শুকাইয়া লইয়া, উহা স্তূপাকারে রাখিয়া দিতে হয়। ইহাতেই গাছগুলি পচিয়া গিয়া সাররূপে পরিণত হয়। গাছগুলি সংগ্রহ করিয়াই স্তূপ-আকারে রাখিলে, উপরের গাছের চাপে নীচের গাছের অনেকটা রস (সার) বাহির হইয়া যায়। ইহাতে সারভাগ কিয়ৎপরিমাণে কম হয়। কচুরি খুব ভালরূপে রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া পোড়াইলে অতি উৎকৃষ্ট সার পাওয়া যায়। একটী শুষ্ক গর্ত্তের মধ্যে কচুরি পোড়াইলে, উহার সামান্য অংশও বৃথা নষ্ট হইতে পারে না। ১০০/ মণ কচুরি হইতে প্রায় দেড় মণ উত্তম ছাই পাওয়া যায়। কচুরির ছাই কাঠের ছাই অপেক্ষা ৭।৮ গুণ উৎকৃষ্ট। কলিকাতার শণ ওয়ার্কস্ কোম্পানী (Messrs Shaw Wallace & Co) কচুরি-ভস্মের প্রতিমণ ২/০ আনা হইতে ৩।০ টাকা মূল্যে ক্রয় করিতে রাজি হইয়াছেন। বলা বাহুল্য, গুণানুসারেই কচুরি-ভস্মের মূল্যেরও তারতম্য ঘটিয়া থাকে। যাঁহারা কচুরির ছাই বিক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ঢাকা গভর্ণমেণ্ট ফার্ম্মের 'Fibre Expert' মহোদয়ের নিকট আবেদন করিবেন।

নারিকেল সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত—

সিংহলে বিঘাপ্রতি পঁচিশটির অধিক নারিকেলগাছ রোপিত হয় না দক্ষিণ ভারতে এবং সিংহলে নারিকেলগাছ রোপণ করিবার ৭।৮ বৎসর পরেই, উহা ফলপ্রসূ হইয়া থাকে ; এবং তৎপর, ক্রমশঃই ফলের সংখ্যা বর্দ্ধিত হয়। দশ বৎসরের পর গাছ 'ভরিয়া' (প্রচুর পরিমাণে) নারিকেল জন্মে; এবং ক্রমাগত প্রায় ৭০ বৎসর পর্য্যন্ত ফলপ্রসব করে। সাধারণতঃ, সিংহলের নারিকেলগাছে সংবৎসরমধ্যে ৪০ হইতে একশতটি পর্য্যন্ত নারিকেল ধরে। গড়ে প্রতিগাছ হইতে প্রায় ৪৫টী করিয়া নারিকেল পাওয়া যায়। প্রত্যেকবৎসর গুছ হইতে প্রায় ৫।৬ বার নারিকেল সংগ্রহ করা হয়। খুব ঘন করিয়া নারিকেলগাছ রোপণ করিলে যে ফলন কম হয়, এবং ফলের আকৃতি ক্ষুদ্র হইয়া যায়,—ইহা সিংহলবাসীরা বিশেষরূপেই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে। সুতরাং, এক্ষণ তাহারা আর প্রতিবিঘায় পঁচিশটীর অধিক নারিকেলগাছ রোপণ করে না।

সিংহল, জাভা, সিঙ্গাপুর, পিনাং, ম্যাকেসার, মলাক্কা, ম্যানিলা, ফিলিপাইন প্রভৃতি দ্বীপে অত্যধিক পরিমাণে নারিকেল জন্মে; এবং এই সকল স্থান হইতেই প্রচুর পরিমাণে ইউরোপের নানাস্থানে রপ্তানি হইয়া যায়। সাধারণতঃ ফিলিপাইনদ্বীপ হইতেই অত্যধিক পরিমাণে নারিকেল ফ্রান্স, স্পেন, ইতালী, জার্ম্মেনী, ইংলণ্ড, বেলজিয়াম প্রভৃতি ইউরোপের নানা স্থানে এবং আমেরিকায় রপ্তানি হইয়া থাকে। খুব ঘন করিয়া নারিকেলগাছ রোপণ করিলে যে ফলন কম হয়, ইহা ফিলিপাইনদ্বীপবাসী কৃষকেরাও বিশেষরূপে বুঝিতে পারিয়াছে। তদ্ভিন্ন, অন্যান্য দ্বীপবাসীরাও ঘনরোপণের পক্ষপাতী নহে।

কাদামাটিতে কিম্বা স্যাৎসেতে জমিতে নারিকেলগাছ যথোচিতভাবে বর্দ্ধিত হয় না। শিথীধারী গাছ নারিকেল-গাছের সারির মধ্যে পুতিয়া রাখিলে, উহা পচিয়া গিয়া সারের কাজ করে ; এবং, ইহাতে জমিও রসাল রহে।

নারিকেলের পাতাশুদ্ধ ডাঁট বহুলপরিমাণে সংগ্রহ করিয়া, উহা নারিকেলের সারির মধ্যে মাটির নীচে পুতিয়া রাখিলেও সার দেওয়ার কাজ চলে। নারিকেলগাছের গোড়ায় পচা পানা, ঘাস কিংবা মাছ সাররূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

নারিকেলের মালার ছাই, নারিকেলের ছোবড়া এবং পচা পাতা প্রভৃতি নারিকেলগাছের পক্ষে উৎকৃষ্ট সার।

নারিকেলগাছের গোড়ার চতুর্দ্দিক হইতে যে বহুলপরিমাণ শিকড় বহির্গত হয়, ঐ সকল শিকড় মৃত্তিকার অধিক নিম্নে প্রবিষ্ট হয় না। সুতরাং অনাবৃষ্টির সময় অথবা আবশ্যকমত নারিকেলগাছের গোড়ায় জলসেচন করা কর্ত্তব্য।

নারিকেলচারা রোপণ করিবার পর, ক্রমাগত ২।৩ বৎসর পর্য্যন্ত, উহা ছাতাধরা-রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইতে পারে। কোনও গাছে এই রোগের উপদ্রব ঘটিলেই, উহা কাটিয়া আনিয়া পোড়াইয়া ফেলা কর্ত্তব্য। ইহাতে রোগ বিস্তৃত হইয়া পড়িতে পারে না।

বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগের বিজ্ঞাপন—

বর্ত্তমান বর্ষে বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগ, ঢাকা অনেক বিষয়েই স্থির-সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিয়াছেন। ফলে, বাঙ্গালার সর্ব্বাপেক্ষা বড় হরফে (ডবল গ্রেট) আজন্ত মুদ্রিত বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া, তাঁহাদের দীর্ঘকাললব্ধ অভিজ্ঞতার কথা প্রচার করিতেও সমর্থ হইয়াছেন। আমরা কএকখানি বিজ্ঞাপনের সবটুকু অংশই নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

১। "সরকারী ধানের রোয়া লাগাইলে, বিঘাপ্রতি ২/ মণ ধান বেশী পাইবে। দাম পাঁচ টাকা মণ।"

২। "সরকারী পাটের বীজ খরিদ কর। ইহা দ্বারা বিঘাপ্রতি আধ মণ পাট বেশী পাইবে। প্রতি সেরে চারি আনা। একসের পাঁচ ছটাক সরকারী বীজে একবিঘা জমি বোনা যাইবে।"

৩। "লাল মাটীতে ৩ মণ ১৩ সের চুণা—দাম ২।০ টাকা, ১মণ হাড়ের গুঁড়া—দাম ৩।০ টাকা ও গোবর দিলে, ২/ মণ আউশ ধান—মূল্য পাঁচ টাকা ও ১/ মণ সরিষা—মূল্য ৬৲ অথবা ১/০ পাট—মূল্য ৭৲ টাকা ও ১/০ মণ সরিষা—মূল্য ৬৲ বিঘাপ্রতি বেশী পাইবে। ৬৲ টাকা খরচে ১১৲ হইতে ১৩৲ পাইতে পারিবে।"

৪। "বিলাতি পানা (কচুরি) হইতে সার তৈয়ারির নিয়ম :—ভাদ্র আশ্বিন মাসে জল হইতে ঐ পানা উঠাইয়া জমির উপর ছড়াইয়া শুকাইতে দিবে। অল্প শুকাইলে পর বাড়ীর নিকট পালা দিয়া রাখিবে। চৈত্র বৈশাখ মাসে বিঘা প্রতি দশমণ হিসাবে গোবরের স্তর ছড়াইয়া দিবে।"

এইরূপ বিজ্ঞাপনপ্রচারে যে এ দেশের কৃষকদিগের প্রভূত উপকার সাধিত হইতে পারে, তাহা নিঃসন্দেহেই বলা যায়।

বেহারে নীলের চাষ—অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বেও

বাঙ্গালার নানাস্থানে ও বেহারে বহুল পরিমাণে নীলের চাষ হইত। তৎকালে, একমাত্র বেহার-অঞ্চলেই ১৫০০০০০ একর জমি নীলের চাষে আবদ্ধ ছিল; এবং বেহার হইতে ৩ কোটি টাকার নীল বিদেশে রপ্তানি হইত। বাঙ্গালা-দেশ হইতেও নীলের রপ্তানির পরিমাণ বড় কম ছিল না। জার্ম্মেনীর রসায়নশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতেরা কৃত্রিম নীলের আবিষ্কার করিয়া, এ দেশের স্বাভাবিক নীলের চাষ ও ব্যবসায় একরূপ বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। সম্প্রতি যুদ্ধের ফলে, জার্ম্মেনীর কৃত্রিম নীলের রপ্তানি বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ইহাতে রঙ্গের নিমিত্ত সর্ব্বত্রই নীলের অভাব ঘটিয়াছে। এই অভাব পূরণের উদ্দেশ্যে, বেহারের নীল-ব্যবসায়ীরা খুব উৎসাহের সহিত নীলের চাষ আরম্ভ করাইয়া দিয়াছেন। যুদ্ধের পূর্ব্ব বৎসরে বেহার-অঞ্চলে যে পরিমাণ জমিতে নীলের চাষ হইয়াছিল, এ বৎসর তাহার চতুর্গুণ ভূমিতে (৬২৬০০০ একার) নীলের চাষ হইয়াছে।

আফ্রিকার স্বভাবজাত ধান্য—

আফ্রিকার নানা স্থানে একপ্রকার স্বভাবজাত ধানের গাছে প্রচুর পরিমাণে ধান্য জন্মে। টেঙ্গানিয়াকা হ্রদের পশ্চিম তীরস্থ ভূভাগে, নাইগার নদীর তীরে, আশান্তি কঙ্গো ও নিয়াফাউনকির নিকটবর্ত্তী স্থানে এবং উত্তর সেনিগালের অন্তর্গত রিচার্ডটোলে স্বভাবজাত ধানের গাছ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই জাতীয় ধানের গাছ শিকড় হইতে স্বতঃই উৎপন্ন হয় ; সুতরাং ধান্য-বীজ বপন করিবার কোনও প্রয়োজন হয় না। স্বভাবজাত ধানের গাছে বৎসরের সকল সময়েই ধান্য জন্মে। এই ধান্য চাষীজমির ধান্য অপেক্ষা

অনেকাংশেই উৎকৃষ্ট। সেণ্ট লুইস্ দেশবাসীরা স্বভাবজাত ধান্যের এক্সের চাউলের বিনিময়ে বিদেশীয় তিনসের চাউল প্রাপ্ত হয়। ইহা ধান্যের উৎকর্ষতারই সম্যক পরিচায়ক।

স্বভাবজাত ধান্য বৎসরের সকল সময়েই ফলিয়া থাকে; এই নিমিত্ত উহা সম্বৎসর-ব্যাপীধান্য নামেও অভিহিত হয়। এই ধানের গাছ এবং শুষ্ক খড় গরু, ঘোড়া প্রভৃতির উৎকৃষ্ট খাদ্য। রিচার্ডটোলের বালুকামিশ্রিত দো-আঁশ মৃত্তিকায়ই, (যাহাতে পটাস্ ও নাইট্রোজেনের ভাগ বেশী আছে, কিন্তু ফস্ফোরিক এসিড্ ও চূণের ভাগ কম) সাধারণতঃ, সম্বৎসর-ব্যাপী ধান্যগাছ প্রচুর পরিমাণে জন্মে। ঐরূপ মৃত্তিকায় শতকরা প্রায় •·১ ভাগ লবণ রহিয়াছে। সুতরাং, লবণাক্ত ভূমিই ইহার চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইবে বলিয়া অনুমিত হয়। যে সকল জমিতে লবণের ভাগ অধিক রহিয়াছে, উহাতে অন্যান্য শস্য না জন্মিলেও, উক্ত ধানের গাছ সতেজে বর্দ্ধিত ও ফলপ্রসূ হইয়া থাকে। ইজিপ্টের লবণাক্ত ভূমি হইতে লবণের ভাগ দূর করিয়া, উহাতে তূলার চাষ করিবার উদ্দেশ্যে এবং ফরাসীদেশের ক্যামারজেল্সীতে অন্যান্য গাছ রোপণ করিবার অভিপ্রায়ে, যে জমিতে লবণের ভাগ অধিক, তাহাতেই আফ্রিকার স্বভাবজাত ধান্যের চাষ করা হয়। এই জাতীয় ধানের চাষে ক্রমশঃ লবণের অংশ দূর হইয়া যায়। আমাদের দেশের সুন্দরবনে ও বরিশালের চড়া-জমিতে এবং চট্টগ্রাম ও নোয়াখালি প্রভৃতি স্থানে, ইহার চাষ বেশ লাভজনক হইতে পারে।

কারি-ফলের মাখন—পশ্চিম আফ্রিকাতে কারিগাছের (Butyrospermum Parkii) ফলে এক প্রকার সুখাদ্য মাখন প্রস্তুত হয়। এইজাতীয় গাছ দৈর্ঘ্যে প্রায় ২০।২৫ হাত হয়, এবং গাছের গোড়ার ব্যাস প্রায় আড়াই হাত হইয়া থাকে। কারিগাছের ফল আমাদের দেশের কুলের ন্যায় বড় হয়; এবং ঐ ফলের মধ্যে সাধারণতঃ একটি করিয়াই বীজ রহে। তবে কখনও কখনও কারিফলে ২।৩টি বীজও দেখা যায়। মধ্য আফ্রিকাবাসীগণ ঐ বীজের পাতলা আবরণ ফেলিয়া দিয়া, তন্মধ্যস্থ শাঁস হইতে মাখন নিঃসৃত করিয়া থাকে। কারিগাছ সাধারণতঃ বালি ও কর্দ্দম বহুল মৃত্তিকায়ই প্রচুর পরিমাণে জন্মে। কিন্তু বালুকা-বহুল মৃত্তিকায় উহারা সতেজে বর্দ্ধিত হয় না। বর্ষাকালে যে সকল স্থানে জল দাঁড়ায়, তদ্রূপ ভূমিও কারিগাছের পক্ষে বিশেষ উপযোগী নহে। কারণ, জলমগ্নস্থানের গাছও যথোচিতরূপে বাড়িতে পারে না। মিঃ আমানের মতে, এই ফলের শাঁসভাগের ওজন, ফলের ওজনের প্রায় অর্দ্ধাংশের কম হয় না; শাঁসভাগে শতকরা প্রায় ৪৫ হইতে ৫০ ভাগই মাখন রহে। ফলের শাঁসগুলি রৌদ্রে শুকাইয়া লইয়া, ঐ সকল শুষ্ক শাঁস ঘানিতে দিলেই মাখন নিঃসৃত হইয়া থাকে। ঘানির পরিবর্ত্তে, কোনও যন্ত্রের চাপেও মাখন বাহির করিতে পারা যায়। ফ্রান্সের মার্শেলিশ্ বন্দরের একটি কারখানাতে কারি-ফলের মাখন প্রস্তুত হইয়া, তথা হইতে ইউরোপের প্রধান প্রধান দেশে উহা রপ্তানি হইতেছে। বাঙ্গালাদেশের মৃত্তিকা ও আবহাওয়া কারিগাছের পক্ষে অনুপযোগী নহে। এদেশে উহার চাষ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ঈশ্বরবাবুর পত্র—শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র গুহ এফ্, আর্, এইচ্, এস্ মহাশয় সম্প্রাত আমাদিগের নিকট যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহার একাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল:— "বর্ত্তমান বর্ষের শ্রাবণের সংখ্যা "কৃষি-সম্পদে" রংপুর-কৃষি-সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত 'কৃষি ও কৃষক' নামক আমার যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে পশু-চিকিৎসকদিগের সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত অভিমত রহিয়াছে। যে সময়ে ঐ প্রবন্ধটী লিখিত হইয়াছিল, তৎকালে আমার যাহা ধারণা ছিল, তাহাই প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম। কিন্তু তৎপর পশু-চিকিৎসক-দিগের চিকিৎসায় সুফল সন্দর্শন করিয়া, আমার মতপরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সুতরাং, আমি আমার লিখিত "অধুনা, পশু-চিকিৎসক (Veterinary Sergeon) নামে একশ্রেণীর পশু-চিকিৎসকের সৃষ্টি হইয়াছে। ঘোটক ও কুক্কুর চিকিৎসার জন্যই এই পদের সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। ইঁহাদের দ্বারা গোচিকিৎসায় যে বিশেষ কোনও উপকার হয়, ইহাতে আমার বিশ্বাস নাই।"—এই মতের প্রত্যাহার করিতেছি।" শ্রদ্ধেয় ঈশ্বরবাবুর এই মত পরিবর্ত্তনে আমরাও বস্তুতঃই সুখী হইয়াছি।

আমার ইক্ষুচাষ।

আত্ম-নিবেদন—প্রায় একবৎসর অতীত হইল, আপনারা আমার ইক্ষুচাষবিষয়ে একটী প্রবন্ধ লিখিবার জন্য অনুরোধ করিয়া, আমাকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। তৎপর, এ সম্বন্ধে আপনাদের আরও কএকখানি পত্র পাইয়াছি। কিন্তু আমার অবসর খুব কম; তদুপরি বহুদিন পর্য্যন্ত আমার স্বাস্থ্যও ভাল ছিল না। এই সকল নানা কারণে, সময়মত প্রবন্ধটী পাঠাইতে না পারিয়া, আমি বিশেষ লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়াছিলাম। আশা করি, আপনারা আমার অনিবার্য্য ক্রটী গ্রহণ করিবেন না। ইক্ষুচাষে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, আমি কি করিতাম, কেন আমার কৃষিকার্য্য করিতে বাসনা জন্মিল ইত্যাদি আমার জীবনের ঘটনাবলীর বিষয় অনেক কথাই প্রবন্ধে লিখিতে বলিয়াছেন। সে সকল কথা লিখিতে আমার ইচ্ছা না রহিলেও, আপনাদের অনুরোধ রক্ষার্থ, সংক্ষিপ্তভাবে, আমার কৃষি জীবনের ও তৎপূর্ব্ব সময়ের অনেক কথাই লিখিত হইল। ইহা "কৃষি-সম্পদে" প্রকাশ করিতে পারেন! আমার কৃষি-জীবনের কথা পাঠ করিয়া, ২১ জন শিক্ষিত ভদ্রসন্তানেরও কৃষির প্রতি আন্তরিক অনুরাগ জন্মিলে, এবং তাঁহাদিগকে কৃষিকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে দেখিলে, আমি বিশেষ সন্তোষ লাভ করিব।

বাল্যকালে—১০।১২ বৎসর বয়সের সময়, আমার মনে ধারণা ছিল যে, আমি ইংরেজি-ভাষায় উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইব; এবং তদ্দ্বারা আমার অবস্থার উন্নতি ঘটিবে। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া, বাড়ীতেই সামান্যরূপ আমাদের আসামী ভাষা শিক্ষা করিবার পর, আমি ইংরেজি স্কুলে ভর্ত্তি হইয়াছিলাম। আসামের প্রাচীন গোস্বামী-বংশে আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আমাদের বংশ-মর্য্যাদা এদেশে কম নহে। কিন্তু শুধু বংশমর্য্যাদা থাকিলে কি হয়. আমার বাল্যকালে আমাদের আর্থিক অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল। ফলে, ৩৪ বৎসর স্কুলে পড়িয়াই, অর্থাভাব-বশতঃ, ইংরাজি শিক্ষা করিবার আশা একরূপ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম। অপরের সাহায্য গ্রহণ করিতে পারিলে, কোনও উপায়ে, আমার লেখা-পড়া শিক্ষার সুবিধা হইতে পারে মনে করিয়া, আমি সাহায্যপ্রার্থীরূপে গৌহাটী, কলিকাতা ও কাশীধাম প্রভৃতি নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলাম। গৌহাটী ও কাশীতে অবস্থানকালে—ক্রমাগত ২।৩ বৎসর পর্যান্ত, আমার অতিকষ্টে শিক্ষালাভ করিবার সুবিধা ঘটিয়াছিল সত্য, কিন্তু নানা কারণে, বিশেষতঃ অর্থের অভাবে, আমার লেখাপড়া শিক্ষা হইল না। সুতরাং, ইংরাজি শিক্ষা করিয়া মুন্সেফ হইবার আশা একেবারেই ত্যাগ করিলাম। বিদ্যাশিক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে, ক্রমাগত ৪৫ বৎসর নানাস্থানে অবস্থান করিয়া, অবশেষে বাড়ীতেই ফিরিয়া আসিলাম। বাড়ী আসিয়া দেখিলাম, আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতাদ্বয়ও অর্থাভাবে পড়াশুনা করিতে পারিতেছে না। আমার পিতৃদেব অতি কষ্টে সংসারের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেছেন সত্য, কিন্তু আমার ভাই দুইটীর বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত যে যৎকিঞ্চিৎ অর্থব্যয়ের আবশ্যক, তিনি তাহারও সংস্থান করিতে পারিতেছেন না। আমাদের দৈন্যদশা দেখিয়া, আমার অত্যন্ত দুঃখ হইল। আমি তৎকালে, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছাড়িয়া দিয়া, কিপ্রকারে পারিবারিক কষ্ট দূর হয়, পিতাকে সুখী করিতে ও ভাই দুইটীকে কিছু লেখাপড়া শিখাইতে পারি, এবং নিজেরও উদরান্নের সংস্থান হয়—এই চিন্তায় মগ্ন রহিয়া ও অনন্তকর্ম্মা হইয়া চাকরির চেষ্টা করিতে লাগিলাম। অত্যল্পকালমধ্যেই, আমাদের বাড়ী হইতে প্রায় দুই মাইল ব্যবধানে অবস্থিত, একজন সাহেবের চা বাগানে ২০৲ টাকা বেতনে কেরাণী নিযুক্ত হইয়াছিলাম। আমি কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছি দেখিয়া, পিতার আনন্দের সীমা রহিল না। জীবনে আমার এই প্রথম চাকরি; বিশেষতঃ বাড়ীর সন্নিকট ও আশানুরূপ বেতন বলিয়া, আমিও যে কিরূপ আনন্দিত হইয়াছিলাম, তাহা সহজেই অনুমেয়। আমার মুনিব সাহেবকে সন্তুষ্ট করিয়া, কিপ্রকারে আমার মাহিনা বেশী করিতে পারি তৎপ্রতি আমার বিশেষ লক্ষ্য ছিল; এবং তজ্জন্য আমি প্রাণ-প্রাণ চেষ্টা করিতে লাগিলাম। রবিবার ও অন্যান্য ছুটীর দিনে, অন্যান্য মুহুরী ও কেরাণীরা সকলেই বাড়ী যাইত; কিন্তু আমি তৎকালেও সাহেবের কার্য্যেই ব্যস্ত রহিতাম। তদ্ভিন্ন, কখনও

সাহেবের একটী পয়সাও চুরি করিতাম না। কার্য্য জীবনে উন্নতিলাভ করিতে হইলে যেরূপ সততা ও অধ্যবসায় আবশ্যক আমার তাহা ছিল। ফলে, কএকবৎসর পরেই, আমার মাহিনা ৫০৲ টাকা হইল; এবং সাহেবও আমাকে অত্যন্ত ভালবাসিতে লাগিলেন। আমি পারিবারিক সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতে সমর্থ হইয়াছি দেখিয়া, আমার পিতৃদেব সংসারের সকল ভার আমার উপর অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। আমিও আমার কর্ত্তব্যপালনে বিমুখ হইলাম না। আমার একটী ভ্রাতার বয়স তখন ২০।২১ বৎসর হইয়াছিল। এত অধিক বয়স হইয়াছে বলিয়া, উহাকে স্কুলে দেওয়া উচিত বিবেচনা করিলাম না। অপরটীর বয়স কিছু কম ছিল বলিয়া, তাহাকে জিলার উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দিলাম; এবং তাহার পড়ার খরচ বাবদ মাসে মাসে টাকা পাঠাইয়া দিতে লাগিলাম। পক্ষান্তরে, পরিবারের সমস্ত খরচ-খরচাও চালাইতে লাগিলাম। অতি কষ্টে কোনরূপে সংসার চলিতে লাগিল। আমি একটি পয়সাও অপব্যয় করি না;—যাহা না করিলে চলে না, তাহাই মাত্র করিয়া থাকি। সুতরাং, আমার কষ্টার্জ্জিত অর্থের অধিকাংশই পারিবারিক ব্যয়নির্ব্বাহার্থ ব্যয়িত হইত।

আমার মুনিব সাহেব জিমখানা-ক্লাবের সম্পাদক (Secretary) এবং সখের সৈনিকদিগের (Volunteers) অবৈতনিক অধ্যক্ষ (Honorary Captain) ছিলেন। তদ্ভিন্ন, তিনি চা-সমিতির (Tea-Association) কাজও করিয়া থাকেন। এই সকল বাজে কাজের হিসাব-পত্রও তিনি আমাকে দিয়া লিখাইয়া লইতেন। সে জন্য, কএক বৎসর পর হইতেই, আমার নির্দ্ধারিত চা-বাগানের কাজের-মাহিনা ৫০৲ টাকা ছাড়াও, বিভিন্ন বাজে কাজের নিমিত্ত, তিনি আমাকে কিছু অতিরিক্ত মাহিনা দিতে লাগিলেন। বাগানের ম্যানেজার, এসিষ্টেণ্ট ম্যানেজার এবং ডাক্তার সাহেব—ইঁহাদের প্রত্যেকেরই নিজ নিজ টাকার হিসাবও আমি রাখিয়া থাকি বলিয়া, তাঁহারাও আমাকে মাহিনা বাবদ মাসে মাসে কিছু কিছু দিতে লাগিলেন। ইহাতে আমার আয়ের পরিমাণ কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হইয়াছিল। আমিও নিজের শরীরের দিকে না দেখিয়া দিনরাত খাটিতে লাগিলাম।

চা-বাগানের কার্য্যে যদিও আমার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়াছিল সত্য, কিন্তু তথাপি, কএকবৎসর কার্য্য করিবার পরই, আমার হৃদয়ে আবার সেই উচ্চাকাঙ্ক্ষা আসিয়া কখনও কখনও উদয় হইতে লাগিল। আমার মনে এক অভিনব চিন্তা উপস্থিত হইল;—"বাগানে চাকরি করিয়া আমার কি হইবে? সাহেবকে যদি খুব সন্তুষ্ট করিতে পারি, তাহা হইলেও, অনেক বৎসর পরে, ঊর্দ্ধসংখ্যা হয়ত মাসিক ১০০৲ টাকা আমার মাহিনা হইতে পারে। তাহাতে কি হইবে?"—এই ভাবনায় বাস্তবিকই আমি সময় সময় একটু ব্যাকুল হইয়া পড়িতাম। সামান্য লেখাপড়া শিক্ষা করিয়া যে কার্য্য করিতেছি, তাহাতেই আমার সন্তুষ্ট হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ভগবৎ বিধানে, আমার ভবিষ্যৎ জীবন স্বতন্ত্র-ভাবে পরিচালিত হইবে বলিয়াই, বোধ হয়, আমি বাল্যকাল হইতেই উচ্চাকাঙ্ক্ষা হইয়া উঠিয়াছিলাম। যাহা হউক, অনেক ভাবনা-চিন্তা করিয়া, মনে মনে স্থির করিলাম—আমি কএক বৎসর চাকরি করিব; এবং এই চাকরি অবলম্বন করিয়াই, যে যৎকিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চয় করিতে পারিব, তদ্দ্বারা কোনরূপ ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করিব। তৎপর চাকরি ছাড়িয়া গিয়া, যাহাতে ব্যবসায়ের উন্নতি করিতে পারি, তাহারই আপ্রাণ চেষ্টা করিব। এইরূপ স্থিরসঙ্কল্প করিলাম সত্য, কিন্তু আমার মনোগতভাব কাহারও নিকট প্রকাশ করিলাম না। কি কারবার করিলে, আমার পক্ষে, লাভজনক ও ভবিষ্যৎ উন্নতির কারণ হইতে পারে, তাহা প্রায় একবৎসর পর্য্যন্ত স্থিরভাবে চিন্তা করিলাম। অনেক চিন্তা ভাবনা করিয়া,—আমার অবস্থা ও দেশ-কাল-পাত্র সকলদিক এবং আয়-ব্যয়ের বিষয় হিসাব করিয়া দেখিয়া, ব্যবসায় অপেক্ষা কৃষিকার্য্যই—বিশেষতঃ ইক্ষুচাষ করাই, আমার পক্ষে বিশেষ লাভজনক ও ভাবী উন্নতিকর বলিয়া সুস্থির করিলাম। চা-চাষ বিশেষ লাভজনক সত্য, কিন্তু তাহাতে বহু অর্থের প্রয়োজন হয়। পক্ষান্তরে, অল্প অর্থব্যয়েই ইক্ষুচাষ চলিতে পারে। সাহেবেরা চা-চাষ করিয়া প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করিতেছেন, আর আমি

ইক্ষুচাষ করিয়া কি যৎকিঞ্চিৎ অর্থও লাভ করিতে পারিব না?—যখন আমার মনে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইত, তখনই নিঃসন্দেহে মনে লইত,—অবশ্যই পারিব। চাকরি করিয়া আমার আশা পূর্ণ হয় নাই—সাধ মিটে নাই। কিন্তু আমার মনে লয়, কৃষিকার্য্য দ্বারাই আমার আশা পূর্ণ হইবে এবং আকাঙ্ক্ষাও মিটিবে। জানি না কেন, কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বেই, এ বিশ্বাস আমার হৃদয়ে দৃঢ়বদ্ধ হইয়া গিয়াছিল।

যে সময়ের কথা লিখিতেছি, তৎকালে আসামে একমাত্র চা ব্যতীত, ব্যবসায়ের হিসাবে, কেহই অন্য কোনও প্রকার শস্যের চাষ করেন নাই। ফলে, সমগ্র আসামে বিস্তৃত কৃষিক্ষেত্রও ছিল না। আখের চাষ করিয়াও যে লাভ করিতে পারা যায়, এ কথা কখন কথা-প্রসঙ্গে কহিলেও, লোকে আমাকে পাগল মনে করিয়া হাসিত! লোকে যাহাই কহুক না কেন, আমি দীর্ঘকাল চিন্তা-ভাবনা করিয়া যাহা সুস্থির করিয়াছিলাম, তাহা সম্পূর্ণ নির্ভুল বলিয়াই স্থিরচিত্তে বিশ্বাস করিলাম। লোকের কথায় নিরাশ হওয়া দূরে থাকুক, বরং দিন দিনই কৃষির প্রতি আমার একান্ত শ্রদ্ধা জন্মিতে লাগিল। তৎকালে বাঙ্গালা খবরের কাগজে কখনও কখনও দু'একটি কৃষিবিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত। আমি বিশেষ আগ্রহের সহিত সেই সকল প্রবন্ধ পড়িতাম। কৃষি-প্রবন্ধ পাঠ করিতে আমার খুব ইচ্ছা হইত; কিন্তু অধিকাংশ সময়েই আমার বলবতী বাসনা অপূর্ণ রহিয়া যাইত। কারণ, সে সময়ে কদাচিৎ দু'একটি কৃষি-প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত মাত্র। আমি স্থানীয় চাষাদের সহিত কৃষিবিষয়ক কথা কহিতেও বড় ভালবাসিতাম। তাহাদের অনেক কথাই শুনিতাম, কিন্তু তাহা হইতে দু'একটি সারবান কথা হৃদয়ের সহিত গ্রহণ করিতাম। চাষের কাজ দেখিয়া ও চাষাদের কথা শুনিয়া, আমি কৃষিবিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। যেসকল কুলী জাভা ও মরিশাষ প্রভৃতি দ্বীপ হইতে ইক্ষুক্ষেত্রে কার্য্য করিয়া আসিয়া, চা-বাগানের কুলী হইয়া আবার আসামে আসিয়াছে, তাহাদের সহিত উক্ত স্থানসমূহের ইক্ষুচাষসম্বন্ধে নানা কথা কহিয়াও, আমি তৎসম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলাম। ইহাই হইল, আমার প্রাথমিক কৃষি শিক্ষা।

কৃষিবিষয়ে মোটামুটিভাবে যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষালাভ করিয়াই, আমি আমার কর্ম্মক্ষেত্রের (চা-বাগানের) নিকটে, ইক্ষুচাষ-পরীক্ষার উদ্দেশ্যে, মাত্র ৪।৫ বিঘা জমি বন্দোবস্ত করিয়া লইলাম। তৎপর, আমার বাড়ী হইতে ৪।৫ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত একটি গ্রাম হইতে ২০৲ টাকার কালপুরা-জাতীয় আখের 'দগা' (ডগা বা আগা) খরিদ করিয়া আনিয়াছিলাম। যে সময়ের কথা লিখিতেছি, সেই সময়ে আখের ডগা অতি মহার্ঘ ছিল; এবং তাহাও সর্ব্বত্র পাওয়া যাইত না। কোনও কোনও স্থানে কালপুরা, মগ এবং তেনী জাতীয় ইক্ষুর ডগা পাওয়া যাইত। তৎকালে, এই তিনপ্রকার ইক্ষু ব্যতীত অন্য কোনও প্রকার ইক্ষুর চাষ-প্রথা আসামে বড় প্রচলিত ছিল না। কালপুরাজাতীয় আখের ডগা খরিদ করিয়াই, আমি প্রথমতঃ ইক্ষুচাষ-পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলাম।

'কুড়ি টাকার আখের ডগা কিনিয়াছি'—এ কথা শুনিয়া, আমার পিতৃদেব এবং গাঁয়ের অন্যান্য ভাল লোক আমাকে পাগল বলিয়া নানাপ্রকার ভৎসনা করিতে লাগিলেন। (১) ২০৲ টাকার ডগা কিনিয়া, অন্য কেহ ইতঃপূর্ব্বে আখের চাষ করে নাই, (২) ইহাতে যত গুড় হইবে, এত গুড় খাইবে কে? আর (৩) পয়সা দিয়া কাজ করাইলে, গুড় বিক্রয়ে লাভ হইতে পারে না—প্রধানতঃ, এই তিনটিই ছিল তাঁহাদের ভৎসনা করিবার মুখ্যকারণ। বাগানে চাকরি করিয়া, যাহা কিছু উপার্জ্জন করিয়াছি, তাহা অপব্যয় করিয়া নষ্ট করিতে প্রস্তুত হইয়াছি, আমার মাথার দোষ ঘটিয়াছে ইত্যাদি নানা কথাই গ্রামময় রটিয়া গেল। সকলেই একবাক্যে আমার নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য যথেষ্ট নিন্দা করিতে লাগিলেন। ঘরে ও পরে সকলেই আমার লাঞ্ছনার একশেষ করিয়াছিলেন। সমস্ত দিন পরের চাকরি করিয়া—হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটিয়া, রাত্রে ঘরে গিয়াও আমার শ্রান্তি ও শান্তি লাভের উপায় ছিল না। অপরের অযথা তিরস্কার নীরবে সহ্য করা যায় সত্য, কিন্তু আপনার জনের নিকট অযথা তিরস্কৃত হইলে, তাহা বড়ই মর্ম্মান্তিক হইয়া পড়ে। বিনা দোষে সর্ব্বত্রই লাঞ্ছনাভোগ

করা, আমার পক্ষে, কিপ্রকার দুঃসহ কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, এমন কি পিতৃদেবের নিষেধ-বাক্য ও তিরস্কার শুনিয়াও, আমি ভগ্ন-মনোরথ হই নাই। নানা জনের নিকট নানা কথা শুনিয়া, আমার মনে যে আশঙ্কা উপস্থিত না হইত, তাহা নহে। কিন্তু কখন কোনরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইলেই, আমি নির্জ্জনস্থানে গিয়া বসিতাম; এবং কাগজ, পেন্সিল নিয়া স্থিরচিত্তে এক বিঘা জমিতে ইক্ষুচাষের আয়ব্যয় হিসাব করিয়া দেখিতাম। হিসাব করিয়া যাহা বুঝিতে পারিতাম, তাহাতে আমার সকল সন্দেহ দূর হইয়া যাইত। আমি যে সময়ের কথা লিখিতেছি, তৎকালে আসামে আখের চাষ খুব কম ছিল; এবং গুড়ের মণ ৮।৯৲ টাকা দরে বিক্রয় হইত।

বাগানের সাহেবেরা, উঁহাদের অধীনস্থ কর্ম্মচারীগণের স্বাধীনভাবের কোনও কার্য্য প্রায়ই পছন্দ করেন না। বিশেষতঃ, মুহুরী অথবা কেরাণীদের পক্ষে, ইহা অতি দোষাবহ। সে জন্য আমার মুনিবকে অগ্রেই আমার চাষের কথা বলা সঙ্গত মনে করিলাম। আমি বিনীতভাবে আমার মুনিবকে বলিলাম,—"হুজুর, আমি যাহা মাহিনা পাই, তাহাতে আমার ঘর চলে না। আমি পেটের দায়ে চুরি করিতেও ইচ্ছা করি না। অর্থের অভাব দূর করিবার নিমিত্ত আমি আখের চাষ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। আপনার কাজের কোনও অনিষ্ট করিব না; এবং অন্য লোক রাখিয়া কাজ চালাইব। তবে অবসরমত সময় সময় আমি গিয়া দেখিয়া আসিব মাত্র। আপনি অনুমতি করিলেই, আমি চাষের কাজ আরম্ভ করিতে পারি।" আমার কথায় সাহেব কোনরূপ আপত্তি করিলেন না। আমিও নিশ্চিন্ত মনে চাষের কাজে হাত দিলাম।

প্রথম বৎসর আমি প্রায় চারি বিঘা জমিতে আখ লাগাইয়াছিলাম। আখের ডগা দুষ্পাপ্য বলিয়া, ইহার অধিক রোপণ করিতে পারিলাম না। ভগবৎ কৃপায়, আমার ইক্ষুর ফলন খুব ভালই হইল। ইহাতে আমার আনন্দ ও উৎসাহ খুব বাড়িয়া গেল। আমি সুফললাভে বিশেষ আশান্বিত হইলাম সত্য, কিন্তু তখনও আমার চাকরির মোহ সম্পূর্ণরূপে দূর হয় নাই। বিশেষতঃ, চাকরি করিয়া অর্থসংগ্রহ করাও, তৎকালে অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং, চাকরি বজায় রাখিবার অভিপ্রায়ে, আমি আমার এক ভাইকে সাক্ষীস্বরূপ পরীক্ষাক্ষেত্রে রাখিয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত রহিলাম। যদিও সাহেবের অনুমতি গ্রহণ করিয়াই আমি কৃষিকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি সত্য, কিন্তু তথাপি, ভবিষ্যতে যাহাতে কোনও দোষের কারণ না হয়, তজ্জন্যই ভ্রাতাকে নামমাত্র কৃষি-পরিদর্শক নিযুক্ত করিয়াছি। বস্তুতঃ, আমিই আমার ক্ষুদ্র কৃষি-ক্ষেত্রের একমাত্র পরিদর্শক ও তত্ত্বাবধায়ক। দিনের ১২টার পর, দুই ঘণ্টার ছুটি পাইলে, অন্যান্য বাবুরা বাসায় গিয়া আরাম করিতেন; আর আমি, বিশ্রামের পরিবর্ত্তে, নিজের ইক্ষু-চাষ-পরীক্ষা ক্ষেত্রে গিয়া সকল কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতাম। আমার কার্য্যের জন্য যাহাতে মুনিবের কার্য্যের ক্ষতি না হয়, সে ভাবনা আমার বিলক্ষণ ছিল! এই জন্য দৈনিক ছুটির পর, অন্যান্য বাবুদের পূর্ব্বেই আমি আফিসে উপস্থিত হইতাম। ইহাতে কাহারও কিছু বলিবার ছিল না। মোটকথা, আমি পূর্ব্বাপেক্ষাও অধিক মনোযোগের সহিত সাহেবের কার্য্য করিতে লাগিলাম। কারণ, কোনও দোষে চাকরি গেলে, আমার কৃষিও যাইবে। কিছুকাল অত্যধিক পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিয়াও, যদি আমি আমার চাকরি বজায় রাখিতে ও কৃষির উন্নতি করিতে পারি তাহা হইলে যে চিরদিনের নিমিত্ত আমার সর্ব্ববিধ দুঃখ-কষ্ট দূর হইবে, তাহা আমি পূর্ব্ব হইতেই নিশ্চয়রূপে ধারণা করিয়াছিলাম। সুতরাং, কোনও কার্য্যেই আমি কষ্টবোধ করিতাম না। মনের আনন্দেই আমি আমার কর্ত্তব্য পালন করিতাম। আমি বাগানের কার্য্যে নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে, জনৈক কেরাণীবাবু কোম্পানীর ৭০০৲ টাকা আত্মসাৎ করিয়া কর্ম্মচ্যুত হইয়াছিলেন। তদবধি, কেরাণীমাত্রেই চোর,—সাহেবের মনে এ ধারণা জন্মিয়াছিল। কিন্তু কয়েকবৎসর আমার কার্য্যকলাপ সন্দর্শন করিয়া, সাহেবের ভ্রমবিশ্বাস কতকটা দূর হইল। আমি কখনও সাহেবের একটি পয়সাও চুরি করি নাই। সুতরাং নির্ভয়েই সাহেবকে বলিয়াছিলাম,—বিশেষ অভাবে পড়িলেও, "আমার চুরি

করিবার ইচ্ছা নাই।" এ কথার সত্যতা বুঝিতে পারিয়া, সাহেব আমাকে বড় বিশ্বাস করিতেন—খুব ভালবাসিতেন। এমন কি, তিনি কোনও সময়, আমার ইক্ষুচাষের সাহায্যও করিয়াছিলেন। চাকরি করিয়া যাহা পাই, তদ্দারা আমাদের খাওয়া-পড়া, ছোট ভাইর পড়ার খরচ এবং ইক্ষুচাষের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হয়। তৎকালে চাকরিই আমার একমাত্র অবলম্বন ছিল। চাকরি গেলে, আমার বড় সাধের কৃষিও আর চলিবে না। সুতরাং, যতদিন পর্য্যন্ত কৃষির আয়ের উপর নির্ভর করিয়া যাবতীয় ব্যয়নির্ব্বাহ করিতে পারিব না, ততদিন পর্য্যন্ত আমাকে চাকরিতে নিযুক্ত রহিতেই হইবে। ইহা আমি বেশ বুঝিতাম; এবং বুঝিতে পারিয়াছিলাম বলিয়াই, শরীরের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়াও, বিশেষ মনোযোগের সহিত সাহেবের কাজ করিতে লাগিলাম। বলা বাহুল্য, আমার অবসরকাল কৃষিকার্য্যের তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শনেই ব্যয়িত হইত।

আমি ক্রমশঃ—বৎসরের পর বৎসর, ২।৫ বিঘা বেশী জমিতেই আখের চাষ করিতে লাগিলাম। আমার কর্ম্ম-স্থলের (চা-বাগানের) সন্নিকটবর্ত্তী ইক্ষুচাষ পরীক্ষা ক্ষেত্রে ক্রমাগত ৩।৪ বৎসর আখের চাষ করিয়া, প্রায় ৫০০৲ লাভ পাইলাম। সে স্থানে অধিক জমি সংগ্রহ করিবার সুবিধা ছিল না; বিশেষতঃ, চা-বাগানের এত নিকটে বিস্তৃতভাবে চাষ-বাস করাও, আমার পক্ষে উচিত মনে করিলাম না। প্রধানতঃ, এই দুইটী কারণেই, আমার কৃষি-ক্ষেত্র হইতে ছয় মাইল ব্যবধানে, এক ভয়ানক জঙ্গলের মধ্যে—বর্ত্তমানে যে স্থানে আমার ইক্ষুক্ষেত্র রহিয়াছে—প্রথমতঃ দুইশত বিঘা জমি বন্দোবস্ত করিয়া লইলাম; এবং সেই স্থানেই আখের চাষ করিতে আরম্ভ করিলাম। বলা বাহুল্য, আমার পূর্ব্বোক্ত ইক্ষু-চাষ-পরীক্ষা-ক্ষেত্র অনাবাদী অবস্থায় পতিত রহিল। নূতন স্থানে প্রথম বৎসর কুড়ি বিঘা জমিতে আখের চাষ করিয়াছিলাম। তৎপর, বৎসর বৎসর ক্রমশঃ জমির পরিমাণও বাড়াইতে লাগিলাম, এবং সঙ্গে সঙ্গে আখের চাষেও জমির পরিমাণ বাড়িতে লাগিল। আমি আমার প্রথম ইক্ষুক্ষেত্রে কাঠের আখমাড়া-কলে আখ মাড়িয়া, সেই রসে পিতলের গোল কড়াতে গুড় প্রস্তুত করিতাম। কিন্তু এই নূতনক্ষেত্রে ইক্ষুচাষের জমির পরিমাণ অধিক বলিয়া, প্রথমতঃ মহিষ-চালিত দুইটী লোহার কল আনাইলাম। জমি সংগ্রহ করিতে, জঙ্গলা-জমি চাষ-বাসের উপযোগী করিয়া লইতে এবং লোহার আখমাড়া কল প্রভৃতি কিনিতে আমার বহু অর্থ ব্যয়িত হইয়া গেল। সে সময়ে অর্থের অভাবে আমাকে যে কিরূপ দুঃসহ কষ্টভোগ করিতে হইয়াছিল, তাহা মনে হইলে, এখনও আমার হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়! মাসে মাসে যে মাহিনা পাইতাম, তদ্দারা (১) নিজের ও স্ত্রী-পুত্রের খাওয়া পড়া, (২) বাড়ীতে বৃদ্ধ মাতা-পিতা, ভগিনী প্রভৃতি যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদের ভরণ-পোষণ-ব্যয়, এবং (৩) ছোট ভাইটীকে যোরহাট রাখিয়া স্কুলে পড়াইতেছিলাম, তাহার যাবতীয় খরচ—এই ত্রিবিধ প্রকার ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া, যাহা কিছু উদ্বর্ত্ত হয়, তাহাই কৃষিকার্য্যে ব্যয় করিতে পারিতাম। ইক্ষুর চাষ করিয়া যে ১৫০০৲ টাকা লাভ করিয়াছিলাম, নূতন স্থানে কৃষিক্ষেত্র খুলিবার কএক মাস পরেই, তাহা খরচ হইয়া গেল। তৎকালে ব্যয়ের পরিমাণ অত্যধিকরূপে বাড়িয়া গেল, অথচ আয় পূর্ব্বেও যাহা ছিল, তাহাই রহিল। সুতরাং কিছুকালের জন্য আমাকে বড়ই আর্থিক কষ্টভোগ করিতে হইয়াছিল। আমি উপার্জ্জনের এক পয়সায়ও অপব্যয় করি না বলিয়া, কোনও প্রকারে আমার সকল কার্য্যই চলিতে লাগিল। মানুষের বলবতী বাসনা সর্ব্বসিদ্ধিদাতা পরমেশ্বর কখনও অপূর্ণ রাখেন না। তাঁহারই কৃপায়, আমার চাকরির উপার্জ্জনের দ্বারাই ধীরে ধীরে আমার কৃষিক্ষেত্রের কাজ চলিতে লাগিল। ভগবৎ কৃপায়, ৩।৪ বৎসর পর হইতেই, সমস্ত খরচ বাদেও, আমার কৃষিক্ষেত্রে কিছু কিছু লাভ হইতে লাগিল। নিজে সকল সময় কৃষিক্ষেত্রে রহিয়া, কাজ করাইতে ও দেখিতে শুনিতে পারি না; সে জন্য লাভের মাত্রাও আশানুরূপ ছিল না। আমি না থাকাতে চাষ-বাসের কাজও আমার মনের মত হয় না; অথচ, পরের চাকরি করিলে, আমার অবসরও বড় কম। এক্ষণ চাষের কাজ

উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে বলিয়া, একাকী চাকরি ও কৃষি—এই দুই কাজ চালান বিষম কষ্টকর হইয়া পড়িল। সেই জন্য বাগানের কাজ ছাড়িয়া, নিজের কৃষিক্ষেত্রের কার্য্য গ্রহণ করাই স্থির করিলাম। তৎকালে আসামের কৃষি-বিভাগের এসিষ্ট্যাণ্ট ডিরেক্টর আমার পরম হিতৈষী শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু রায় শ্রীল শ্রীযুক্ত ভূপালচন্দ্র বসু মহাশয়ের সহিত আমার সাক্ষাৎ ও আলাপ হয়। তৎপর, তিনি দয়া করিয়া, প্রায় প্রতিবৎসরই আমার ফারম্ বা কৃষিক্ষেত্র পরিদর্শন করিয়াছেন; এবং আমাকে কৃষিবিষয়ে নানা প্রকার উপদেশ প্রদান করিয়া ও অনেক ভাল জাতীয় আখের ডগা নানাস্থান হইতে আনাইয়া দিয়া, আমাকে বিশেষ অনুগৃহীত, প্রীত, উপকৃত ও চিরবাধিত করিয়াছেন। সে জন্য আমি তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিয়াছি। কৃষির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির নিমিত্ত চেষ্টা করা, কৃষি-বিভাগের কর্ম্মচারীমাত্রেরই কর্ত্তব্য কার্য্য হইলেও, কয়জন তাহা করিয়া থাকেন? আমার পরম সৌভাগ্য—শুধু আমার কেন, সমগ্র আসামবাসীর পরম সৌভাগ্য—ভূপালচন্দ্রকে আমরা পাইয়াছি। এই মহাত্মার কি আসামী, কি বাঙ্গালী, কি হিন্দুস্থানী—সকলেরই প্রতি সমভাব—সকলেরই যাহাতে ভাল হয়, ইহাই তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা। আসামের কৃষির উন্নতিবিধানের নিমিত্ত তিনি কিরূপ আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন, তাহা আসামের শিক্ষিতব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন। আমি তাঁহাকে দেবতুল্য জ্ঞান করি। আত্মকথা বলিতে বসিয়া, কথা-প্রসঙ্গে রায় ভূপালচন্দ্র বসু বাহাদুরের নামোল্লেখ করিবার কারণ এই যে,—আমি যখন চাকরি ছাড়িয়া দিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াও, কিছুদিন পরে ছাড়িব, কি এখন ছাড়িব,—এই চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম, ঠিক সেই সময়ই ভূপালচন্দ্রের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। ইহা বিশ্ব-নিয়ন্তারই বিধান কিনা জানি না। তাঁহার সহিত আলাপ হওয়ার পরই আমার প্রাণে নবরসের সঞ্চার হইল,—চাকরির প্রতি যে একটুকু মায়া ছিল, তাহা সম্পূর্ণরূপে দূর হইয়া গেল। আমি বাগানের চাকরি ছাড়িয়া দিতেই কৃতসঙ্কল্প হইলাম। আমার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া, এ সময়ও আমার বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন ও পরিচিত ব্যক্তিমাত্রেই আমাকে নিষেধ ও পাগল বলিয়াছিলেন; এবং সকলেই একবাক্যে আমাকে চাকরি ছাড়িতে বারম্বার নিষেধ করিয়াছিলেন। বাড়ীর সন্নিকটে একটা ভাল চাকরি পাইয়াও, তাহা ত্যাগ করা যে কিরূপ অসঙ্গত কার্য্য তাহা সকলেই আমাকে নানাভাবে বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কারণ, চাকরি ছাড়া আর নিজের সর্ব্বনাশ করা—তাঁহার একই কথা বলিয়া মনে করেন। হায়রে চাকরি!! সে সময়ে বাগানে যে সাহেব ম্যানেজার ছিলেন (Honourable C. Ferbes), তিনি অতি সজ্জন। তিনিও আমাকে আরও মাহিনা বৃদ্ধির প্রলোভন দেখাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। আমি কিন্তু একবার ভাবনা-চিন্তা করিয়া যাহা স্থির করিয়াছি, কিছুতেই তাহার অন্যথা করিলাম না;—বাগানের চাকরি ছাড়িয়া নিজের কৃষিক্ষেত্রেই আসিলাম। আমি আসিবার পর, দিন দিনই আমার ইক্ষুক্ষেত্রের আয় বাড়িতে লাগিল; এবং ক্রমশঃ অত্যল্পকালমধ্যেই অর্থের অভাব দূর হইল।

আমি চাকরি ছাড়িয়া আসিয়া, ক্রমেই আখের চাষ বাড়াইতে লাগিলাম। বিহিয়ার "Thomson & Mylne' কোম্পানীর ৮ট মহিষ-চালিত লোহার আখমাড়া-কল এবং গুড় প্রস্তুত করিবার জন্য, তাঁহাদের ১০।১২টি লোহার অগভীর কড়া (Shallow pan) ক্রয় করিয়া আনিলাম। ইহাতেই কএকবৎসর একপ্রকার কার্য্য চলিতে লাগিল। মহিষ কিম্বা গরু দিয়া আখমাড়া তত সুবিধাজনক নহে। প্রতিকলে বদলা-বদলি করিয়া তিনটি মহিষ লাগাইলেও রীতিমত কাজ চলে না। কল ঘুরাণ অত্যন্ত জোরের কাজ বলিয়া, অনেক সময়, অত্যধিক পরিশ্রমে মহিষ মরিয়া যায়। বিশেষতঃ, এ প্রকার বলদ অথবা মহিষ পরিচালিত যন্ত্র (Cattle power mill) দ্বারা ১০০/০ মণ আখ হইতে, খুব সাবধানে আখ লাগাইলেও, ৫০/০ মণের বেশী রস বাহির করিয়া লওয়া যায় না। কঠিন জাতীয় আখ (যেমন খাড়ি) হইলে রসের মরিমাণ আরও কম হয়। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া, আমার একটী বাষ্প-পরিচালিত আখমাড়া কল (Steam power cane mill) ক্রয় করিতে

ইচ্ছা হইল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, 'Steam power cane mill' যে কিপ্রকার এবং তাহা দ্বারা কি পরিমাণ ইক্ষুরস নিষ্কাশন করিতে পারা যায়, তাহা এ দেশের কোনও ইঞ্জিনিয়ার সাহেব বা অন্য কেহ কিছুই বলিতে পারিলেন না। পুস্তকগত বিদ্যার উপর নির্ভর করিয়া, বা ক্যাটলেগে কলের কথা পড়িয়া, ৮।৯ হাজার টাকা মূল্যের একটা কলের অর্ডার দেওয়া অসঙ্গত মনে করিলাম। এ সকল কল (Sugar Machinery) কলিকাতায় কিনিতে পাওয়া যায় না; বিলাত হইতে অর্ডার দিয়া আনাইতে হয়। সুতরাং, প্রত্যক্ষভাবে দেখিয়া-শুনিয়া ক্রয় করিবার সুবিধা নাই বলিয়া, অর্ডার দিতেও আশঙ্কা হয়। এমতাবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য, তাহা ভাবিয়া আমি আকুল হইয়া পড়িলাম। যাহা হউক, অনেক অনুসন্ধানের পর জানিতে পারিলাম, বিহারের মজঃফরপুর জিলায় ২০।২৫ জন নীলকর সাহেব (Indigo planter) সম্মিলিত হইয়া, যৌথ মূলধনে, 'Athar Factory' নামে এক বৃহৎ চিনির কারখানা খুলিয়াছেন; সেখানে গেলে বাষ্পপরিচালিত ইক্ষুরস-নিষ্কাশন-যন্ত্র (Steam power cane mill) দেখিতে পাওয়া যায়। আমি আমার পরম হিতৈষী শ্রদ্ধেয়পাদ শ্রীযুক্ত ভূপালচন্দ্র বসু মহাশয়ের নিকট একখানি পত্র লিখিলাম। তিনি আমার পত্রাহুযায়ী কৃষি-বিভাগের অধ্যক্ষ (Director of Agriculture) মহোদয়ের একখানি সুপারিস-পত্র আমাকে পাঠাইয়া দিলেন। এই পত্রখানি সঙ্গে লইয়াই আমি বিহার রওনা হইলাম; এবং মজঃফরপুরের 'অথর ফ্যাক্টরী'র (Athar Factory) কল কারখানা সন্দর্শন করিলাম। কারখানার ম্যানেজার সাহেব অনুগ্রহ প্রকাশপূর্ব্বক, আমাকে তাঁহাদের সকল কলই দেখাইয়াছিলেন। তাঁহাদের কল-কারখানা অতি বৃহৎ। এই কারখানায় আমি যে সকল কল সন্দর্শন করিয়াছিলাম, শুনিলাম, সেই সকল কল ক্রয় করিতেই কোম্পানীর প্রায় দুই লক্ষ টাকা লাগিয়াছে। আমি যে প্রকার নাতি-বৃহদাকারের কল আনাইতে ইচ্ছা করিয়াছি, তাহা শুনিয়া সাহেব বলিলেন,—সেই কল বসাইতে গেলে পঁচিশ হাজার টাকার অধিক লাগিবে না। কল বলিতে, কেবল আখমাড়া-কল বুঝিলেই চলিবে না;—ইক্ষুরস-নিষ্কাশন করিয়া, তদ্দ্বারা চিনি প্রস্তুত করিতে হইলে, 'Crushing mill', 'Boiling pans' & 'Centrifugal' ইত্যাদি যতগুলি বিভিন্ন প্রকার কলের আবশ্যক, তাহাই বুঝিতে হইবে। মজঃফরপুর হইতে ফিরিয়া আসিবার কালে, আমি কলিকাতার মেসার্স অক্টেভিয়াস্ ষ্টীল এণ্ড কোংর (Messrs. Octavius Steel & Co.) মারফতে কল আনাইবার বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়াছিলাম। বলা বাহুল্য, আমি 'অথর ফ্যাক্টরী'র ম্যানেজার সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিয়া, বিলাতের একটি কোম্পানীর (Sugar machinery maker—Engineer) নাম ও ঠিকানা লিখিয়া আনিয়াছিলাম। সুতরাং, কলের অর্ডার দিতে, আমাকে কোনরূপ বেগ পাইতে হয় নাই। উক্ত কোম্পানী সকলের মধ্যে 'Manlove Elliot' কোম্পানীই ভাল কল-নির্ম্মাতা (Engineer) বলিয়া প্রসিদ্ধ;—ইহা আমাকে পূর্ব্বোক্ত ম্যানেজার সাহেব বলিয়াছিলেন। আমি তাঁহারই নির্দ্দেশানুযায়ী, 'Manlove Elliot & Co' নামক কোম্পানীর নিকট হইতেই আমার পছন্দমত কল ও কল চালাইবার ইঞ্জিন প্রভৃতি আনয়ন করিবার ব্যবস্থা করিলাম। মজঃফরপুরে গিয়া যে, কেবল কল-কারখানাই সন্দর্শন করিয়াছিলাম, তাহা নহে। তথায় অনুসন্ধানকালে, আমার পক্ষে চিনি প্রস্তুত করা অথবা গুড় প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করা অধিক লাভজনক, তদ্বিষয়েও 'অথর ফ্যাক্টরী'র ম্যানেজার এবং অন্যান্য অভিজ্ঞ লোকের সহিত পরামর্শ করিয়া আসিয়াছিলাম।

অভিজ্ঞব্যক্তিদিগের সহিত স্থিরভাবে পরামর্শ করিয়া বুঝিতে পারিলাম,—চিনির মূল্য প্রতিমণ ৯।১০ টাকা হইলে, ছোট কলে চিনি প্রস্তুত না করিয়া, ৫।৬ টাকা মণ দরে গুড় বিক্রয় করাই অধিকতর লাভজনক। 'অথর ফ্যাক্টরী'র ন্যায় বড় কলে খরচ অনেক কম হয়; সুতরাং তাঁহারা সস্তায় চিনি বিক্রয় করিতে পারে; এবং তাহাতেও তাঁহাদের বেশ লাভ হয়। যে সময়ের কথা লিখিতেছি, তখনও আমাদের এ অঞ্চলে গুড়ের মূল্য খুব বেশী—প্রত্যেক মণের মূল্য ৫৲ টাকা হইতে ৭৲ টাকার

কম প্রায়ই হয় না। আমি যখন প্রথম ইক্ষুর চাষ করিয়া গুড় প্রস্তুত করিয়াছিলাম, তৎকালে, গুড়ের প্রতিমণ ৮।৯৲ টাকার কমে পাওয়া যাইত না। পূর্ব্বাপেক্ষা গুড়ের মূল্য কম হইলেও, গুড়ের দাম খুব চড়াই বলিতে হইবে। সুতরাং তদবস্থায়, গুড় প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করাই সঙ্গত মনে করিলাম; এবং বাষ্পচালিত-যন্ত্র দ্বারা আখ মাড়িয়া—রস বাহির করিয়া, বিহিয়ার (Thomson & milne Co's pan) অগভীর কড়ায়, সেই রসে গুড় প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিব বলিয়াই সুস্থির করিলাম। এই কার্য্যের জন্য একটি ও ও' roller cane crushing mill' আনাইলাম। ইঞ্জিন বয়লার সমেত কলের মূল্য প্রায় ৭০০০৲ টাকা লাগিয়াছিল। তদ্ভিন্ন, কলের ভাড়া, কল বসাইবার জন্য মিস্ত্রী-সাহেব ও রাজমিস্ত্রীর মজুরি এবং বিলাতী মাটি (Cement) ইত্যাদি বাবদ আরও প্রায় ১০০০৲ টাকা খরচ হইয়াছিল। আমি পূর্ব্বে যে বাগানে কেরাণীর কাজ করিয়াছিলাম, সেই চা-বাগানের সহৃদয় ম্যানেজার (Honourable C. Forbes) সাহেব, কল বসাইবার সময়, তাঁহার মিস্ত্রী-সাহেব ও রাজমিস্ত্রী দিয়া, আমার যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। অনেক চা-বাগানের সাহেবই নেটিভের স্বাধীনভাবের কার্য্যে উৎসাহ দিতে নারাজ; এমন কি, তাঁহারা আমাদিগের কল কারখানা স্থাপন আদৌ পছন্দ করেন না। কিন্তু সুখের বিষয়, ফরবস্ সাহেব সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তাঁহার মৃত্যুর পর যে, আসামের শাসনকর্ত্তার মন্ত্রণা-সভা (Counsil) পর্য্যন্ত শোকের ঢেউ উঠিয়া ছিল, তাহা আপনারাও শুনিয়া থাকিবেন। ইহা তাঁহার সহৃদয়তারই পরিচায়ক, সন্দেহ নাই। আমাদের আসামের জমিদারস্বরূপ চা-কর সাহেবদিগের সকলেই যদি ফরবস্ সাহেবের মত হৃদয়িক লোক হইতেন, তাহা হইলে আসামবাসীর আর সুখের সীমা রহিত না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কতকগুলি সঙ্কীর্ণমনা প্লেণ্টার (Planter) সাহেব আমাদিগের চাকরি ব্যতীত অন্য কোনও কার্য্যেই ভাল দেখিতে পান না; এবং তাঁহারাই নানাপ্রকার প্রতিবন্ধক হইয়া থাকেন। বলা বাহুল্য, তাঁহারা অর্থশালী বলিয়া সকল কার্য্যেই জয়যুক্ত হয়েন। আমার পরম সৌভাগ্য যে, আমি ভগবৎ কৃপায় কোনও কার্য্যে বাধা প্রাপ্ত হই নাই। আর একটি কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি আমি প্রায় ৮০০০ টাকা ব্যয় করিয়া যে কল বসাইয়াছি, ইহার জন্য আমাকে কাহারও দ্বারস্থ হইয়া ঋণ গ্রহণ করিতে হয় নাই। আমি চাকরি ছাড়িয়া আসিয়া, যাহা কিছু অর্থব্যয় করিতেছি, তাহা আমার ইক্ষুক্ষেত্রের আয় হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছিলাম।

আমি যে প্রণালীতে ইক্ষুচাষ এবং গুড় ও চিনি প্রস্তুত করাইয়া থাকি, তাহার সকল কথা—আমার দীর্ঘকাললব্ধ অভিজ্ঞতার কথা—মোটামুটিভাবে নিম্নে লিখিত হইল। এ স্থলে, অপ্রাসঙ্গিক হইলেও, চাষ-বাস সম্বন্ধে দু' একটী কথা বলিয়াই, আমি আমার বক্তব্যের উপসংহার করিতেছি।

আমরা যেরূপ যত্ন, যেরূপ পরিশ্রম ও যেরূপ অর্থব্যয় করিয়া, দাসত্ব করিবার অভিপ্রায়ে, বিদ্যাশিক্ষা করি; এবং ৪০।৫০৲ টাকা মাহিয়ানায় চাকরি করিয়া—দিনরাত হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটিয়াও, স্বীয় জীবন সার্থক বোধ করিয়া থাকি, তাহার শতাংশের একাংশ পরিশ্রমসহকারে কৃষি-শিক্ষা করিয়াও, কৃষি-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, দাসত্বের অপেক্ষাও যে অধিক অর্থোপার্জ্জন করিয়া, মহা সুখ-শান্তিতে জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পারা যায়, তাহা আমি মুক্তকণ্ঠে ও নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। পরের গোলামী না করিয়া, স্বাধীনভাবে কৃষিকার্য্য করিতে পারিলে, সৎপথে রহিয়া দেবচরিত্র লাভ করিয়াও, আপনার পরিবারস্থ সকলকেই বিবিধ সামগ্রীতে পরমা তৃপ্তির সহিত অন্ন যোগাইতে পারে। এমন পবিত্র, শান্তিপ্রদ ও বিমল আনন্দদায়ক কার্য্যও আর নাই। পক্ষান্তরে, পরের গোলামীতে যে কি সুখ, তাহা আর কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না। আমাদের দেশের কেরাণীবাবুদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই, তাহা সম্যকরূপে উপলব্ধি হইবে। দাসত্বই বা এখন মিলে কোথায়? সরকার বাহাদুর কয়জনকে চাকরি দিবেন? সকলেই চাকরির জন্য লালায়িত; কিন্তু এক্ষণ চাকরির

চাকরির মায়া ছাড়িয়া, কৃষির দিকে মনোযোগ করা কি উচিত নহে? আমাদের মধ্যে অনেকেরই যে মূলধনের অভাব এবং আমাদিগকে উৎসাহ দেয় বা আর্থিক সাহায্য করে, এমত বড় কেহ নাই;—ইহা স্বীকার্য্য। কিন্তু তথাপি, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, মানুষের একান্ত ইচ্ছা রহিলে, শত সহস্র বাধা-বিঘ্ন দূর করিয়া—শত শত শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াও, সর্ব্বসিদ্ধিদাতা ভগবান্ কোন-না-কোন প্রকারে কার্য্যসিদ্ধির উপায় করিয়া দিবেন। ইচ্ছা থাকিলেই উপায় হয়;—আমার জীবনে এ মহাবাক্যের সত্যতা সততই প্রত্যক্ষ করিতেছি। সুতরাং, কাহারও নিরাশ হইবার কারণ নাই। কেবল "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন"—এই মূলমন্ত্র বিশেষভাবে স্মরণ করিয়াই, কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হয়। বলবতী বাসনা থাকিলে, কিরূপে সিদ্ধিলাভ করা যায়, আসামের এ দেশীয় লোকদিগের পরিচালিত চা-বাগানসমূহের মালিকগণই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তাঁহারা অল্প জমি ও সামান্য মূলধন লইয়াই চা-চাষে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু এক্ষণ তাঁহারা সাহেবদিগের মতই উন্নতি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কৃষি পুণ্যময় ও পবিত্র কার্য্য; ইহাতে পাপের লেশমাত্রও নাই;—আছে সরলতা, বদান্যতা, নম্রতা, সহৃদয়তা এবং সর্ব্বোপরি মনুষ্যত্ব। কৃষির উন্নতিতে রাজা-প্রজা সকলেরই মঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে;—দেশের সকল বিষয়েই শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতি ঘটে। কৃষিজাত দ্রব্য না হইলে বাণিজ্য চলে না; সুতরাং কৃষিকে বাণিজ্যের মূল বলা যায়। বাণিজ্য অর্থের মূল। অর্থ—ইহলৌকিক সুখ-সম্পদের মূল; অর্থ—জাতীয় উত্থানের মূল। সুতরাং, সাক্ষাৎভাবে ও পরোক্ষভাবে, কৃষি সর্ব্ববিধ উন্নতির, সকল প্রকার সুখ ও ঐশ্বর্য্যের মূল। এহেন কৃষি কি ঘৃণার কাজ? আজকাল কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ক্রমশঃই যেরূপ বৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে চাষার পেশা লইয়া যে কোন কৃষিই করুন না কেন, ৪০।৫০৲ অথবা ১০০৲ টাকা মাহিয়ানার চাকরি অপেক্ষাও, তাহা যে অধিকতর লাভজনক হইবে, ইহা নিশ্চয়। প্রাদেশিক কৃষি-বিভাগসমূহ নিম্নশ্রেণীর অশিক্ষিত কৃষকদের দ্বারা কৃষির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিসাধনের নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু তাহারা চির-প্রচলিত প্রথা ছাড়িয়া, বৈজ্ঞানিক উন্নত-প্রণালীতে চাষ-বাস করিতে সহজে রাজি হইবে বলিয়া মনে লয় না। কারণ, এ শ্রেণীর লোক প্রায়ই নূতন কিছু করিতে ইচ্ছুক নহে—করেও না। শিক্ষার অভাববশতঃ, ইহাদের হৃদয়ে যে সকল কুসংস্কার বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে, তাহা সহজে দূরীভূত হইবে না। অশিক্ষিত কৃষকেরা কাহারও কথায় আস্থাস্থাপন করিতে পারে না বা করে না; বিশেষতঃ, ইহাদের উন্নত-প্রথায় চাষ-বাস করিবার মত অর্থেরও বিশেষ অভাব। এমতাবস্থায়, আমার মনে লয়, মধ্যবিত্ত শিক্ষিত ভদ্রসন্তানদিগকে উৎসাহ দিলে এবং জমি-সংগ্রহের সুব্যবস্থা করিয়া দিতে পারিলে ও কৃষিক্ষেত্রস্থাপনকালে আংশিক অর্থসাহায্য করিতে পারিলে, অত্যল্পকালমধ্যেই এ দেশের কৃষির বিশেষ উন্নতি ঘটিবে। এ বিষয়ে প্রাদেশিক কৃষি-বিভাগসমূহ এবং দেশের জমিদার-সম্প্রদায়ের অশেষ কর্ত্তব্য রহিয়াছে। শিক্ষিত ভদ্রসন্তানেরা সরকারী কৃষি-বিভাগের প্রচারিত কৃষিক্ষেত্রসমূহের কার্য্য-বিবরণী, পুস্তিকা প্রভৃতি এবং কৃষি-পত্রিকা ও পুস্তকাদিতে কৃষি-পরীক্ষক বা লেখকদিগের দীর্ঘকাললব্ধ অভিজ্ঞতার কথা পাঠ করিয়া, সহজেই কৃষি-বিষয়ক জ্ঞানলাভ করিতে পারেন। তাঁহারা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ-বাস আরম্ভ করিলে, তাঁহাদের কার্য্যের সুফল সন্দর্শন করিয়া, অশিক্ষিত কৃষকেরাও উন্নত-প্রণালীতে চাষ-বাস আরম্ভ করিবে। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত ভদ্রসন্তানেরা কৃষি-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে, তাঁহাদের কৃষিক্ষেত্রসমূহ সময়ে এক একটী আদর্শ কৃষি-ক্ষেত্রস্বরূপ হইবে। রায়তেরা যখন ক্রমাগত ইঁহাদের উন্নতি হইতে দেখিবে, তখন তাহাদেরও বৈজ্ঞানিক কৃষির উপর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিবে। সুতরাং, তাহারা বিশেষ আগ্রহের সহিতই বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করিবে। ইহাতেই কৃষির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। নচেৎ, শুধু রিপোর্ট (তাহারও অধিকাংশই ইংরেজি-ভাষায় প্রকাশিত হয়।) প্রকাশ করিয়া, অবৈতনিক রিপোর্টার রাখিয়া, অথবা ২।৪ জন

কৃষকের কৃষি-ক্ষেত্রে উন্নত-প্রণালীর চাষ-প্রথা হাতে-হেতেড়ে প্রদর্শন করিয়া (সামান্য শিক্ষিত অত্যল্পসংখ্যক লোককে যৎকিঞ্চিৎ বা নামমাত্র কৃষি-শিক্ষা দিয়া, তাহাদের দ্বারাই এই কার্য্য করান হয়। ইহারা বেতনভোগী কর্ম্মচারী। ইহাদের বেতন কৃষি-বিভাগ হইতেই প্রদত্ত হয়।), এ দেশের কৃষির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিসাধনের পক্ষে, কৃষি-বিভাগের চেষ্টা ফলবতী হইবে বলিয়া মনে লয় না। শিক্ষিত ভদ্রসন্তানেরা কৃষি কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে—চাষের নেশা লইয়া চাষ-বাস আরম্ভ করিলে, তাঁহারা পরস্পর সদ্ভাব রক্ষা করিয়া, একের অভিজ্ঞতা বা পরীক্ষার ফল অপরকে জানিতে দিয়া, এবং আরও নানা উপায়ে, পরস্পর সাহায্যের আদান-প্রদান করিতে সমর্থ হইবে। সুতরাং, তাঁহাদের সংখ্যা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই, অর্থসমস্যাও অনেকাংশেই বিদূরীত হইতে এবং সহজেই কৃষির উন্নতি ঘটিতে পারে। কিপ্রকারে পরস্পরের সাহায্যে কৃষির উন্নতি ও বিস্তার ঘটিয়া থাকে, তাহা প্রত্যক্ষ দেখিবার জন্য অধিক দূর যাইতে হইবে না;—সাহেবদের চা-বাগানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাইবে। কোনও সাহেব আসিয়া, তাঁহার পরিচিত সাহেবের চা-বাগানে, হয়ত মাসিক ৬০৲ বেতনে কাজে ভর্ত্তি হইল। কএকবৎসর কাজ করিয়া, তাঁহার মাহিনা বৃদ্ধি হইল এবং চা-চাষবিষয়েও অভিজ্ঞতা জন্মিল। তৎপর, তিনি অর্থসঞ্চয়ে যত্নবান্ হইলেন; এবং কিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চিত হইলেই, তদ্দ্বারা হয় চা-বাগানের অংশ ক্রয় করিলেন, না হয় নিজেই এক বাগান খুলিয়া বসিলেন। এইরূপভাবে অল্প মূলধনে বাগান খুলিয়াও, অনেক সাহেব লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক হইয়া থাকেন। বাগানে কাজ করিয়া কার্য্যশিক্ষা ও অর্থোপার্জ্জন দুই-ই হয়; তদ্ভিন্ন, শিক্ষাদাতা গুরু ও শিক্ষার্থী শিষ্যের মধ্যে গুরু-শিষ্যের ন্যায় ভাব এবং ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা চিরদিনই বর্ত্তমান রহে। ইহাতে শিষ্যের কোনও প্রকার সাহায্য আবশ্যক হইলে, তাহা করিতে গুরু কখনও পরাঙ্মুখ হয়েন না। শিষ্যও গুরুর নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিয়া, তাঁহার সুসময়ে গুরুর ঋণ পরিশোধ করিতে যত্নবান্ হইয়া থাকেন। এইরূপভাবে একে অন্যের সাহায্যেই সম্পদশালী হইয়া পড়েন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের জাতীয় চরিত্রে, অনেক স্থলে, ইহার বিপরীত ভাবই দৃষ্ট হইয়া থাকে। আমরা সাহেবদের ন্যায় পরস্পরের সহিত সদ্ভাব রাখিয়া কার্য্য করিতে শিখি নাই;—আমাদের মধ্যে সে প্রকার সদ্ভাব বড় একটা দেখা যায় না। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সমধর্ম্মীর সাহায্য করা, বা কেহ উপকার করিলে, তজ্জন্য সারাজীবন কৃতজ্ঞতা-স্বীকার করা—এই দুইটী আমাদিগের জাতীয় চরিত্রে বড় কম দেখা যায়। যে পর্য্যন্ত স্বার্থ, সে পর্য্যন্ত সদ্ভাব; কিন্তু স্বার্থ ফুরাইয়া গেলে, অর্থাৎ আর উপকার পাইবার আশা না রহিলেই, সদ্ভাবও ফুরাইয়া যায়! এখানে আমি নিজে এ প্রকার লোকও দেখিয়াছি, যাহারা স্বার্থ ফুরাইয়া গেলে, পূর্ব্বকৃত উপকারের জন্য কৃতজ্ঞতাস্বীকার করা দূরে থাকুক, যাঁহার কৃপায় কপর্দ্দক-শূন্য ভিক্ষুকের ন্যায় লোক হইয়াও সম্পত্তিশালী—বড়লোক হইল, যাঁহার অর্থ-সামর্থ্য এবং চিন্তা-ভাবনার ফল অদ্যাপি সে ভোগ করিতেছে, এমন কৃতজ্ঞতাভাজন উপকারী গুরুতুল্য লোকের পূর্ব্বকৃত উপকারের কথা ভুলিয়া গিয়া, নানাপ্রকারে তাঁহার অনিষ্টেরই চেষ্টা করিয়াছে। এই প্রকৃতির লোকের অসদ্ব্যবহারের ফলেই, একে অন্যের সাহায্য করিতে ইচ্ছুক হয় না;—লোকমাত্রেরই উপর অবিশ্বাসের ভাব জন্মে। ইহার বিষময় ফল, কাহারও অজ্ঞাত নহে। অকৃতজ্ঞ লোকেরা দেশের ও দশের শত্রু। এই শ্রেণীর লোকের সংখ্যা অত্যধিক বলিয়াই, এ দেশবাসী যৌথ-মূলধনে বা পরস্পরের সাহায্যে, ব্যবসায়-বাণিজ্য অথবা কৃষি প্রভৃতি কোনও কার্য্যেই সুফললাভ করিতে পারে না। মারোয়াড়ি অথবা কাইঞা, কপর্দ্দকহীন অবস্থায়ও, এদেশে লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যবসায় চালাইয়া প্রভূত অর্থলাভ করিতেছে। পরস্পর সাহায্যলাভই কি ইহার একমাত্র কারণ নহে? দশে মিলিয়া-মিশিয়া কার্য্য করিতে শিখিলে, কৃষি-কার্য্যে বা ব্যবসায়-বাণিজ্যে কখনও মূলধনের অভাব হইতে পারে না। শিক্ষিত ভদ্রসন্তানেরা এবং জমিদারসম্প্রদায় বিস্তৃতভাবে কৃষি করিতে পারিলে, তাঁহাদের কৃষিক্ষেত্রে কার্য্য করিয়াও, বহু লোক কৃষি-শিক্ষা ও মূলধন সঞ্চয় করিয়া লইতে পারে। ইহাতে সহজেই শিক্ষিত

ভদ্রকৃষকের সংখ্যা বৰ্দ্ধিত হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং, উহা দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক বলিতেই হইবে। আবারও বলি,—কৃষি নীচ অথবা নিন্দনীয় কার্য্য নহে। পরসেবা বা দাসত্ব অপেক্ষা, উহা শতগুণে শ্রেয়, সন্দেহ নাই। বুঝিয়া-শুনিয়া কৃষি করিতে পারিলে, সামান্য পরিমাণ জমি হইতেও উদরান্নের সংস্থান করা যায়।

আমার কৃষিজাত গুড়—আমার ইক্ষু-ক্ষেত্রে কল বসাইবার পর, ক্রমাগত কএক বৎসর পর্য্যন্ত, আমি আমার কলে আখ মাড়াইয়া লইয়া, উপরোক্ত লোহার কড়াতে রস জাল দিতে এবং গুড় প্রস্তুত করাইতে লাগিলাম। বলা বাহুল্য, ব্যবসায়ের হিসাবেই গুড় প্রস্তুত করাইতাম। আমার আখমাড়া-কলে সাবধানে আখ 'খাওয়াইলে', ১০০/০ মণ আখ হইতে, আখের কোমলতা ও কঠিনতা অনুসারে, ৬০ হইতে ৭০/০ মণ পর্য্যন্ত রস বাহির করিয়া লইতে পারা যায়। কিন্তু আবশ্যকানুরূপ সাবধানতা অবলম্বনে 'আখ খাওয়ান' অশিক্ষিত মজুরদের পক্ষে সম্ভবপর নহে। ফলে, আমরা অনেক কম রসই পাইয়া থাকি। আমার কলে ৮ ঘণ্টায় প্রায় ৩৫০/০ মণ ইক্ষু নিষ্পেষণ করিতে পারা যায়। কল চালাইতে, বয়লার ও পানীওয়ালা একটি, কল-চালক একটি, আগুনওয়ালা (fireman) একটি এবং কলে আখ খাওয়াইবার নিমিত্ত কুলী দুইজন, কলের নিকট আখ আনয়ন করিবার জন্য ২।৩ জন ও ছোবড়াগুলি (refuses) স্থানান্তরিত করিবার জন্য দুইজন—এই মোট ৬।৭ জন কুলীর আবশ্যক হয়। তদ্ভিন্ন, অগ্নির উত্তাপে রস জাল দেওয়ার নিমিত্তও কএকজন কুলী রাখা আবশ্যক। জ্বালানী কাষ্ঠ ও তৎসহ ইক্ষুর রসহীন ছোবড়াগুলি জ্বালাইয়াই রস জাল দেওয়া হয়। আমার এখানে রস জাল দিয়া, প্রত্যেকটী কুলী প্রত্যহ অন্যূন ৩/০ মণ গুড় প্রস্তুত করিয়া থাকে। কলসীতে গুড় ভরণ এবং গুড় ঘুটিয়া ঠাণ্ডা করণের নিমিত্ত অন্য লোক রহে।

অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে ৭।৮ ভাগ রসে একভাগ গুড় প্রস্তুত হয়। তৎপর, ক্রমশঃই ইক্ষুরস গাঢ় হইতে থাকে। সুতরাং গুড় প্রস্তুত করিতে রসও কম লাগে। চৈত্রমাসে চারিভাগ রসেই একভাগ গুড় হয়। বৈশাখ মাসের প্রথমভাগের মধ্যে আখমাড়া শেষ না হইলে, আখে ছোবড়া বেশী হয়; এবং আবার ক্রমশঃ রসে জলের ভাগ অধিক হইতে থাকে। জ্যৈষ্ঠমাসের শেষে যে রস বাহির হয়, তাহাতে গুড় ভাল হয় না। তৎকালীন ইক্ষুরস জাল দিলে, লালীর মত পাতলা গুড় হয়; অর্থাৎ উহাতে দানা অতি কম রহে, এবং উহা প্রায়ই জমাট বান্ধে না। তবে, ঐ সময়ের রৌদ্র ও বৃষ্টির উপর গুড়ের ভাল-মন্দ অনেকটা নির্ভর করে। একাদিক্রমে কিছুদিন রৌদ্র হইলে, জ্যৈষ্ঠমাসেও গুড় কিছু ভাল হয়; আর রৌদ্রের পরিবর্ত্তে বৃষ্টি হইলে, গুড় ভাল হয় না। মোটের উপর বলিতে গেলে, বৈশাখমাসের মধ্যেই আখমাড়া শেষ করা উচিত। তাহা না হইলে, লোকশান ভিন্ন লাভ হয় না। মাঘ হইতে চৈত্রমাস পর্য্যন্তই আখমাড়িবার পক্ষে উপযুক্ত সময়। কিন্তু তথাপি, এই তিনমাসের মধ্যে আখমাড়া শেষ করিতে না পারিলে, পৌষ ও মাঘ মাসে 'মুড়ার আখ' (ratoon cane—আখ কাটিয়া লইলে পর, গাছের গোড়া হইতে পুনরায় যে আখ জন্মে), এবং ফাল্গুন হইতে বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত 'নূতন আখ' (plant cane) মাড়িয়া গুড় তৈয়ারি করা যাইতে পারে। ফাল্গুন, চৈত্র ও বৈশাখ মাসে যে আখ কাটা হয়, উহাদের গোড়া হইতে অধিক পরিমাণ চারা বাহির হয়। সুতরাং, মুড়ার আখে সুফললাভ করিতে হইলে, উক্ত তিনমাসের মধ্যেই ইক্ষু কর্ত্তন করা উচিত। তৎপূর্ব্বের কর্ত্তিত ইক্ষুর গোড়া হইতে প্রায়ই 'গজানি' (চারা বা ফেকড়ী) বাহির হয় না।

কলসীতে গুড় ভরিবার পূর্ব্বে, প্রথমতঃ শূন্য কলসী ওজন করিয়া, তাহা কলসীর গায়ে লিখিয়া রাখা হয়। তৎপর, গুড়পূর্ণ কলসী পুনরায় ওজন করিয়া, তাহা হইতে শূন্য কলসীর ওজন বাদ দিলে যাহা হয়, তাহাই গুড়ের পরিমাণ। কলসীর উপরিভাগে কালী দিয়াই ওজন লেখা থাকে বলিয়া, গুড় বিক্রয় করিবার সময় গোলযোগ ঘটিতে পারে না। আমি আমার ইক্ষু-ক্ষেত্রোৎপন্ন গুড় প্রায়ই খুচরা বিক্রয় করি না;—কোনও একজন কেইঞা

মহাজনকে নির্দ্ধারিত দামে বৎসরের সমস্ত মাল দিয়া থাকি। যাহার নিকট পাইকারী হিসাবে চুক্তি করিয়া গুড় বিক্রয় করি, সেই মহাজন আমার গুদাম হইতে ক্রমে ক্রমে মাল লইয়া যায়; এবং গুড় বিক্রয় করিয়া, দুইমাসমধ্যে, আমাকে মূল্য প্রদান করে। আশ্বিনমাস হইতে ফাল্গুনমাস পর্য্যন্ত গুড়ের দাম চড়া থাকে; আবার চৈত্র-বৈশাখমাস হইতে ভাদ্রমাস পর্য্যন্ত কিছু সস্তা হয়। এই দুইদিক্ দেখিয়া, কোন বৎসর গুড়ের মূল্য কিরূপ হইতে পারে, তাহা স্থির করিয়া লইতে পারি; এবং তদনুযায়ীই একটা মূল্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া, ক্রেতার সহিত চুক্তির বন্দোবস্ত করি। পূর্ব্বে আসামে অধিক পরিমাণে ইক্ষু-চাষ হইত না; ফলে, গুড়ও অধিক প্রস্তুত হইত না। অভাব ছিল বলিয়াই, তৎকালীন মহাজনেরা ২।৩ হাজার মণ গুড়ের ঠিকা-বন্দোবস্ত করিতেও শঙ্কিত হইত না; কিন্তু এক্ষণ, আসামেও অধিক পরিমাণে গুড় তৈয়ারি হইতেছে বলিয়াই, মহাজনেরা আর হাজার হাজার মণ গুড়ের ঠিকা বন্দোবস্ত করিতে সাহসী হয় না। সুতরাং, অধুনা ৪।৫ শত মণ গুড়ের এক একপ্রকার মূল্য স্থির করিয়াই, (বাজার দর ধরিয়াই মূল্য স্থির করা হয়।) মহাজনকে গুড় দিতে হয়। আমার গুড় বিক্রয় সম্বন্ধে এত কথা লিখিবার তাৎপর্য্য এই যে, আমাদের দেশের যেসকল শিক্ষিত যুবক চাষ-বাসে হস্তক্ষেপ না করিয়াই, মাল সরবরাহের নিমিত্ত বৃথা ভাবিয়া আকুল হইয়া পড়ে, তাহাদিগের আশা ও উৎসাহ বর্দ্ধন করা। কৃষিজাত দ্রব্যের পরিমাণ যতই অধিক হউক না কেন, তাহা বিক্রয়ের জন্য ভাবনার কোনও কারণ নাই। গোলাপ যেখানেই প্রস্ফুটিত হউক না কেন, ভ্রমর যেরূপ সেস্থানে গিয়া আপনা হইতেই উপস্থিত হয়, তদ্রূপ, যে স্থানেই কৃষিজাত দ্রব্য উৎপন্ন হউক না কেন, তাহার ক্রেতা আপনা হইতেই উপস্থিত হইবে। আসামের জঙ্গলেও যখন আমার ক্রেতার অভাব হয় নাই, তখন অন্যত্র যে অভাব হইবে বা হইতে পারে, তাহা আমার মনে লয় না। মাল পাঠাইবার সুবিধা হইবে না মনে করিয়া, যাহাদের কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার বাসনা দূর হইয়া যায়, তাহারা আশ্বস্ত হউন। চাষ আরম্ভ করিলে, কৃষিজাত দ্রব্যের রপ্তানির সুবিধাও আপনিই আসিবে। রপ্তানির সুবন্দোবস্ত করিয়া, তৎপর চাষে প্রবৃত্ত হওয়া অনাবশ্যক।

আখমাড়া-কল বসাইবার পর, আমি ক্রমাগত ৪।৫ বৎসর পর্য্যন্ত কেবল গুড় প্রস্তুত করাইয়াই বিক্রয় করিয়াছিলাম। আখের চাষ করিয়া, আমি সুফললাভ করিতে পারিয়াছি, এ কথা আমাদের এখানের প্রায় সর্ব্বত্রই প্রচারিত হইয়া পড়িল। ফলে, ক্রমশঃই অনেকেরই আখের চাষের প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট হইল। পঞ্চাস্তরে, নেপালীরা আসিয়া, আসামের নানা স্থানে ইক্ষু-চাষ করিতে আরম্ভ করিল। ইহাতে প্রতিবৎসরই, আসামে বহুপরিমাণ গুড় উৎপন্ন হইতে লাগিল। ক্রমাগত ৪।৫ বৎসর পর্য্যন্ত গুড় প্রস্তুত করিবার পর, একবার উৎপন্নের পরিমাণ বেশী হওয়াতে, হঠাৎ গুড়ের মণ ৩৲ টাকা হইল। আমি কিন্তর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া, বারাণসী-চিনি-প্রস্তুত-প্রণালী অবলম্বনে, গুড় হইতে চিনি করিবার ব্যবস্থা করিলাম। বারাণসী-চিনি তৈয়ারি করিতে কল-কারখানার আবশ্যক হয় না। ৩০।৪০ মণ জল ধরে, এপ্রকার একটী লোহার বড় কড়া, কতকগুলি মাটীর 'নাদ' (পাত্র) অথবা ৩।৭ মণ গুড় ধরে, এপ্রকার কাঠের পিপা এবং কতকগুলি বাঁশের টুকরী হইলেই কার্য্য চলে। এই সকল সংগ্রহ করিয়া লইয়া, এবং পশ্চিম হইতে একটী অভিজ্ঞ চিনি-প্রস্তুতকারক (sugar maker) আনাইয়া, বারাণসীর প্রক্রিয়ায় (process) চিনি প্রস্তুত করাইয়াছিলাম। চিনি-প্রস্তুত-প্রণালী নিম্নে লিখিত হইল।

কাশীর চিনি প্রস্তুত করিবার নিয়ম—প্রথমতঃ, গুড়ের কলসী হইতে ১৫।২০ মণ গুড় বাহির করিয়া লইতে এবং উহা উপরোক্ত বৃহৎ কড়াতে রাখিয়া অগ্নির জালে চড়াইতে হইবে। তৎপর গুড়ের সমপরিমাণ পরিষ্কৃত জল, ভালরূপে ছানিয়া দিয়া, তৎসহ মিশ্রিত করিতে হইবে। এই রস জাল

দেওয়ার পূর্ব্বেই, একসের দুধে ১৩।১৪ সের জল মিশ্রিত করিয়া, চুণীর নিকটস্থ একটী পাত্রে রাখিয়া দেওয়া আবশ্যক। কড়ার রস গরম হইয়া, যখন উথ্‌গাইবার উপক্রম হইয়াছে—অথচ উথলিয়া উঠে নাই—তখন ঐ কড়ার রসের উপর দুগ্ধমিশ্রিত জল উৎসেচন করিতে হইবে। এই জল রসের উপর অল্পে অল্পে ছিটাইয়া দেওয়ার পরই, তাহা রসের সহিত ভালরূপে হাতা দিয়া মিশাইয়া দিতে হয়। ইহাতে রসের 'গাদ' (ময়লা) কাটে। রসের উপর গাঁদ ভাসিয়া উঠিলেই, উহা ছিদ্র-যুক্ত হাতা দ্বারা উঠাইয়া লওয়া আবশ্যক। ক্রমাগত ৬।৭ বার দুগ্ধমিশ্রিত জলের দ্বারা কড়ার রসের গাঁদ কাটিলে, উহা বেশ পরিষ্কার হইয়া থাকে। এ সময় মৃদু জাল দেওয়া কর্ত্তব্য। কারণ, তদবস্থায় জাল চড়াইলে, অধিক উত্তাপে ঘন রস উথলিয়া উঠে, এবং রসের সঙ্গে সঙ্গে গাঁদ মিশ্রিত হইয়া পড়ে। সুতরাং, উহা হাতা দ্বারা কাটিয়া ফেলা বা উঠাইয়া লওয়া সুবিধাজনক হয় না। রস অধিক গাঢ় হইয়া উঠিলে, তাহা হইতে আর গাঁদ বা ময়লা উত্থিত হয় না। রস গাঢ় হইলে, তৎসহ আরও জল মিশ্রিত করিয়া লইতে পারা যায়। এ অবস্থায় রস যত পরিষ্কার হইবে, চিনিও তত পরিষ্কার হইবে; ইহা স্মরণ রাখিয়াই কার্য্য করা উচিত। পরিষ্কার রসের বর্ণ পরিষ্কার মধুর ন্যায় দেখা যায়। গুড় ভাল না হইলে চিনির রসও তত পরিষ্কার হয় না। সে জন্য গুড় প্রস্তুত করিবার সময় হইতেই, পরিষ্কারের দিকে মনোযোগী হইতে হইবে। মিঠাইওয়ালারা সন্দেশ বানাইবার জন্য যেরূপে দুগ্ধমিশ্রিত জল দ্বারা গাঁদ কাটিয়া চিনির রস প্রস্তুত করে, ঠিক সেইরূপেই গুড়ের রসও পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়। ৬।৭বার গাঁদ কাটিবার পর, কড়ার রস উপরোক্তরূপে পরিষ্কার হইলে, জাল চড়াইয়া দিয়া, উহা মধুর ন্যায় গাঢ় করিয়া লওয়া আবশ্যক। তৎপর, কড়া নামাইয়া লইয়া ও রস ছাঁকিয়া, উহা অন্য কোনও পাত্রে রাখিতে হয়। ছাঁকা-রস যে পাত্রে রাখিতে হইবে, তদুপরি একটা ঝুড়ি বসাইয়া ও ঝুড়ির মুখে একখানা চাদর বাঁধিয়া দিয়া, ঐ চাদরের উপর পাককরা গাঢ় রস ঢালিয়া দিলেই, সহজে রস ছাঁকা হইবে। বলা বাহুল্য, ইহাতে পরিষ্কার রস পাত্রে পড়ে, এবং গাঁদ ও ময়লা চাদরে থাকিয়া যায়। রস ছাঁকা হইলে পর, উহার ২০।২৫ সের রস উক্ত বড় কড়াতেই (প্রথমবার যাহাতে রস জাল দেওয়া হইয়াছে) হউক, কি অন্য কোনও ছোট কড়াতে হউক—কোন একটা পাত্রে পুনরায় পাক করিতে হইবে। কড়াতে রস ঢালিয়া দেওয়ার পর, তাহার উপর ৩। ৪ ড্রাম আন্দাজ এড়ণ্ড-তৈল ছিটাইয়া দিতে হয়। ইহাতে কড়া জলে না (রস পোড়া লাগে না); বিশেষতঃ, চিনি হইতে লালী (ঝোলা) বাহির হইয়া যাওয়ার সাহায্য করে। এইবার গাঢ় রস জাল দিয়া, উহা গুড়ের মত গাঢ় করিতে হয়। ফুট বা পাক (চানুনী) ঠিক হইয়াছে কিনা, তাহা আঙ্গুল দিয়া 'তার' দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায়। তদ্ভিন্ন, অল্পপরিমাণ গরম গাঢ় রস হাতা দিয়া মাটীতে কিংবা কলাপাতার উপর ঢালিয়া দিলে, যদি উহা শুকাইয়া উঠে, তাহা হইলেও বুঝিতে হইবে যে, রস ঠিক পাক হইয়াছে। যে গুড় প্রস্তুত করিতে পারে, 'রাব'ও সে প্রস্তুত করিতে পারিবে। তবে গুড় অপেক্ষা রাব অল্প পাতলা হইলেই ভাল হয়। চিনি প্রস্তুত করিবার জন্য গুড় হইতে পুনরায় যে গুড় প্রস্তুত করা হয়, উহাকেই রাব কহে।

প্রত্যেকবারে, উক্ত প্রণালীতে, ২০।২৫ সের রস (গুড়ের সহিত জলমিশ্রিত করিয়া, রস প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়।) পাক করিয়া, ২৫।৩০ মণ রাব প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। এই রাব ঠাণ্ডা করিয়া, পূর্ব্বোক্ত মাটীর 'নাদে' (কটাহে) কিংবা কাঠের পিপায় (Cask) ৭।৮ দিন রাখিয়া দিতে হয়। এই সময়ের মধ্যে রাবে দানা বাঁধে। পূর্ব্বে যে বাঁশের টুক্‌রীর কথা বলিয়াছি, সেই টুক্‌রীগুলি এক মাচার উপর রাখিয়া, তাহার নীচে লালী পড়িবার জন্য কোনও পাত্র বসাইতে হয়। বলা বাহুল্য, ঐ সকল টুক্‌রীর নীচে, লালী বাহির হইবার জন্য, ফুটা রহে। যাহাতে লালীর সহিত ছিদ্র-পথে চিনি বাহির হইয়া না যায়, তদুদ্দেশ্যে ফুটার মুখে উলুখড়ের এক একটি ঝরা বসাইয়া দেওয়া আবশ্যক।

এই খড়ের ঝরার কিনারায় কাপড়ের টুকরা মোড়াইয়া দিতে পারিলে ভাল হয়।

নাদে বা পিপায় রক্ষিত দানাদার রাব টুকরী পুণ করিয়া ঢালিয়া দিতে হইবে। রাব ঢালিবার সময় টুকরীর কিয়দংশও খালি রাখা অনাবশ্যক। আগের প্রস্তুত রাব আগে ও পরের রাব পরে অর্থাৎ বিভিন্ন সময়ে প্রস্তুত রাব বিভিন্নসময়ে টুকরীতে ঢালিতে হয়। হিন্দুস্থানে কাশীর চিনি তৈয়ারি করিবার কারখানায়, টুকরীর পরিবর্ত্তে, পাকা নাদ বা চতুষ্কোণ চৌবাচ্চা (Tank) ব্যবহৃত হয়। টুকরীতে রাব ঢালিয়া দেওয়ার পর, উহা হইতে, ক্রমে ক্রমে, ঐ ছিদ্রপথে লালী নিঃসারিত হইতে আরম্ভ করে। তদবস্থায় তিনদিন রাখিয়া দিতে হইবে। এই তিনদিনেই রাব হইতে অনেক লালা বাহির হইয়া, টুকরীর নিম্নস্থ পাত্রে পতিত হয়। টুকরীতে রাব ঢালিবার তিনদিন পরে, অর্থাৎ চতুর্থদিন, প্রায় সবটুকু লালী ঝরিয়া গেলে পর, টুকরীতে যাহা অবশিষ্ট রহে, উহাই লালচে দানাদার চিনি। এই চিনিতেও কিঞ্চিৎ লালী রহে। উহা বাহির করিতে এবং চিনির রং পরিষ্কার করিয়া লইতে পারিলেই হইল। টুকরীর লাল চিনির উপর প্রায় এক ফুট পুরু করিয়া সেওলা, (শেবাল), সিউয়া বা সেওয়ার (Vallisnaria Spiralis) নামক একপ্রকার জলজ ঘাস বিছাইয়া দেওয়া আবশ্যক। বিল প্রভৃতি জলাশয় হইতেই, এই ঘাস সংগ্রহ করিয়া লইতে হয়। সংগৃহীত ঘাসগুলি ভালরূপে না ধুইয়া, উহা ব্যবহার করা অনুচিত। সেওলাগুলি তিনদিন পর্য্যন্ত চিনির উপরেই রাখিয়া দিতে হয়। তৎপর, চতুর্থদিনে সেওলাগুলি ফেলিয়া দিলেই, তন্নিম্নস্থ ৩।৪ ইঞ্চি পরিমিত চিনি বেশ পরিষ্কার হয়; এবং লালী নীচে পড়িয়া যায়। এই পরিষ্কার চিনি খুরপী দিয়া চাঁচিয়া লইতে পারা যায়। পাত্রে যে লাল চিনি রহিবে, উহা একটি বাঁশের বা লোহার শলাকা দ্বারা খোচাইয়া আল্‌গা করিয়া লইয়া, তদুপরি পূর্ব্ববৎ সেওয়ার চাপা দিতে হয়। বলা বাহুল্য, তিন দিন পরেই, প্রথমবারের ন্যায়, সেওলা বা সেওয়া সরাইয়া ফেলিয়া, টুকরীর ৩।৪ ইঞ্চি আন্দাজ পরিষ্কার চিনি চাঁচিয়া লইতে এবং অবশিষ্ট অপরিষ্কার চিনির উপর আবার সেওলা চাপা দিতে হইবে। এই প্রকারে সমস্ত লাল চিনি পরিষ্কার চিনিতে পরিবর্ত্তিত হয়।

আট ফুট উচ্চ এবং প্রায় ৮।৯ ফুট বেড়ের একটি টুকরীর অপরিষ্কার চিনিগুলি পরিষ্কার করিয়া লইতে ৪৭ দিন সময় লাগে। টুকরীর উপরিভাগের চিনি নিম্নভাগের চিনি অপেক্ষা বেশী পরিষ্কার হয় বলিয়া, উপরের চিনি এক নম্বরের এবং নীচের চিনি দুই নম্বরের হয়। টুকরী হইতে পরিষ্কার চিনি সংগৃহীত হইলে পর, উহা 'পল' কিংবা বাঁশের চাটাইর উপর ছড়াইয়া শুকাইয়া, এবং উহার ডেলা ভাঙ্গিয়া লইলেই, কাশীর চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই চিনিতে কোনও প্রকার দোষণীয় বস্তু অর্থাৎ হিন্দু বা মুসলমানের অধাদ্য কিংবা অস্পর্শ দ্রব্যের সংশ্রব রহে না। তবে দোষের মধ্যে এই যে, ছড়ান চিনি শুকাইবার সময়, হিন্দুস্থানবাসীরা স্ত্রী-পুরুষ সকলে মিলিয়া, উহা পা দিয়া দলে এবং চিনির ডেলা ও মোটা দানা ভাঙ্গিয়া দেয়। উহারা যেভাবে পা দিয়া চিনি দলিয়া-মলিয়া থাকে, তাহাতে সহজেই চিনির দানা পালিশ্ করা দ্রব্যের ন্যায় চকচকে হয়। পক্ষান্তরে, জাতা কিংবা কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা চিনির ডেলা ভাঙ্গিলে, চিনি ময়দার ন্যায় মিহি হয় সত্য, কিন্তু উহার দানা তত চকচকে হয় না। হাত দিয়াও চিনির ডেলা ভাঙ্গিতে পারা যায়; কিন্তু উহা কষ্টসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ বলিয়া, হিন্দুস্থানীরা তাহা করে না। পাটনার কএকজন চিনির কুঠিওয়ালার সহিত আলাপ করিয়া জানিতে পারিয়াছিলাম, তাহারা একমণ রাব হইতে মোট ১৫।১৬ সের ১নং ও ২নং চিনি প্রাপ্ত হয়েন। আমি বার সেরের অধিক চিনি পাই নাই।

চিনি প্রস্তুতের কাজ শেষ হইলে পর, গাঁদ এবং লালী বা ঝোলা হইতেও একপ্রকার নিকৃষ্ট চিনি পাওয়া যায়। এই চিনিকে 'দোমা' কহে। আমি প্রত্যেক মণ রাবের লালী হইতে দুই সের মাত্র দোমা-চিনি পাইয়াছিলাম। চিনি-প্রস্তুতের যে নিয়ম দোমা প্রস্তুত করিবারও সেই নিয়ম: অর্থাৎ প্রথমতঃ লালী আল

দিয়া রাব করিতে হয়, এবং তৎপর, পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে টুকরীতে রাব ঢালিয়া ও তদুপরি সেওয়ার চাপা দিয়া চিনি প্রস্তুত করা যায়। দ্বিতীয়বার চিনি প্রস্তুত করা হয় বলিয়াই, দুই হইতেই বোধ হয় দোমা-শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। দোমা-চিনি অপরিষ্কার হয়। হিন্দুস্থানের কোনও কোনও কারখানায় দেখিয়াছি, দোমা-চিনি বাহির করিয়া লইলেও, যে লালী অবশিষ্ট রহে, তাহা দ্বারা রাব প্রস্তুত করিয়া, তৃতীয়বার চিনি তৈয়ারি করা হয়। এই চিনিকে 'তেমা-চিনি' কহে। তেমা-চিনির বর্ণ কালচে; এবং ইহা অতি অপরিষ্কার। তেমা-চিনি বাহির করিয়া লইবার পর, যে লালী অবশিষ্ট রহে, তাহা তামাক মাখিবার নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়। আমি কখনও তেমা-চিনি প্রস্তুত করি নাই। দোমা-চিনি বাহির করিয়া লওয়ার পর, যে লালী অবশিষ্ট রহিত, তাহাই তামাক মাখিবার লালী করিয়া বিক্রয় করিতাম।

কাশীর চিনি-প্রস্তুত-প্রণালী অবলম্বনে চিনি করিয়া, আমার কোনও সুবিধা হইল না। কারণ, (১) চিনি তৈয়ারি করিতে অনেক খরচ পড়ে, (২) চিনিও ভাল হয় না, (৩) চিনি প্রস্তুত করিতে অনেক দিন লাগে, (৪) অনেকবার লাঠাচাড়া করিতে হয় বলিয়া, অনেক লোকশান হয়, এবং (৫) কুলী-মজুরেরা চুরি করিতে বিশেষ সুবিধা পায়। এই সকল নানা কারণে, আমি একাধিকবার উক্ত পদ্ধতিতে চিনি প্রস্তুত করি নাই। এখন হিন্দুস্থানেও এ ধরণের চিনির কুঠী বড় নাই। কুঠিওয়ালাদের লোকশান হয় বলিয়াই, তাঁহারাও ক্রমে ক্রমে কুঠির কাজ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। স্বদেশী পিটি প্রভৃতি নকল চিনি, যাহাতে ইক্ষুচিনি এবং জার্ম্মেনী ও অষ্ট্রীয়ার বিটচিনি প্রভৃতি নানারূপে বারাণসী-চিনির স্থানাধিকার করিয়াছে।

উপরোক্ত ১নং চিনি সমপরিমাণ পরিষ্কার জলে মিশ্রিত করিয়া, পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে উহা আলে চড়াইয়া ও দুগ্ধমিশ্রিত জল দ্বারা গাঁদ কাটিয়া রাব প্রস্তুত করিতে হয়। এই রাব টুকরীতে ঢালিয়া (লালী নিঃসরণের জন্য), তদুপরি সেওলার চাপা দিলে যে চিনি প্রস্তুত হয়, উহাকে 'দোবারা' (দুইবারের) চিনি কহে। দোবারা চিনি যে কিরূপ পরিষ্কার ও শ্বেতবর্ণের হয়, তাহা সকলেই বোধ হয় দেখিয়াছেন। আমি উহা প্রস্তুত করিয়া দেখিয়াছি। কিন্তু উহার প্রতিমণ ১২৲ টাকার কমে বিক্রয় করিলে, লোটের উপর কিছুই লাভ হয় না বলিয়া, আমি কখনও ব্যবসায়ের হিসাবে দোবারা চিনি প্রস্তুত করি নাই।

উপরোক্ত কাশীর চিনি প্রস্তুতের প্রণালী অবলম্বনে, আমি এক বৎসরমাত্র চিনি প্রস্তুত করিয়াছিলাম। কিন্তু উহা লাভজনক না হওয়াতে, তৎপর ক্রমাগত একএক বৎসর পর্য্যন্ত গুড়ই প্রস্তুত করিয়াছি। আমি বিশেষ যত্নের সহিত গুড় প্রস্তুত করিতাম বলিয়া, অন্যান্য কৃষকের গুড় হইতে আমার গুড় অনেক ভাল হইত। এইজন্যই তৎকালে "গোসাঁইর" (আমার) গুড় পাইলে, কেহই আর অন্য গুড় কিনিত না। ফলে, অন্যের গুড় অপেক্ষা কিছু বেশী মূল্যেই আমি বিক্রয় করিতাম। কিন্তু তথাপি, পূর্ব্বের ন্যায় অধিক লাভ হইত না। গুড় বিক্রয় করিয়া সুবিধা না হওয়াতে, চিনি প্রস্তুত করিবার প্রতিই আমার বিশেষ মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছিল। কি উপায় অবলম্বনে চিনি প্রস্তুত করিতে পারিলে, গুড় বিক্রয়ের লাভ হইতেও, আমার অধিক লাভ হইতে পারে, ইহাই তৎকালে আমার একমাত্র চিন্তার বিষয় হইয়াছিল।

চিনি-প্রস্তুত-প্রণালী—আগ্রা ও অযোধ্যা-প্রদেশের (United Provinces of Agra & Oudh) কৃষি-বিভাগের সহকারী অধ্যক্ষ (Assistant Director) হাদি সাহেব (Mr. S. M. Hadi) চিনি প্রস্তুত করিবার এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। ইহা হাদির প্রক্রিয়া (Hadi process) নামে খ্যাত। আমি যে সময়ে চিনি-প্রস্তুত-প্রণালী জানিবার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত হইয়াছিলাম, সে সময়ে কাশীধামের এক প্রদর্শনীতে হাদি সাহেব তাঁহার উদ্ভাবিত উপায়ে চিনি প্রস্তুত করিয়া দেখাইয়াছিলেন। কলিকাতার একখানি সংবাদপত্রে হাদি সাহেবের চিনিপ্রস্তুত-প্রণালীর বিষয় পাঠ করিয়া, আমি তাঁহার নিকট একখানি পত্র লিখিয়া-

ছিলাম। তিনি আমার পত্রের উত্তরের সহিত একখানি পুস্তিকাও পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তাহা পাঠ করিয়া, আমি মোটামুটিভাবে হাদি সাহেবের চিনি-প্রস্তুত-প্রণালীর বিষয় অবগত হইতে পারিয়াছিলাম। আমি যে সময়ের কথা লিখিতেছি, তাহার একবৎসর পরে পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের কৃষি-বিভাগ কার্য্যোপযোগী হাদি সাহেবের এক সেট্ কল (Hadi apparatus) আনাইয়া, রাজসাহী সরকারী কৃষি-পরীক্ষা-ক্ষেত্রে তাহার কার্য্যকল পরীক্ষা করিয়াছিলেন। আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু ভূপালচন্দ্রের (Mr. B. C. Bose) নিকট আমি এ সংবাদ অবগত হইলাম। আমি বন্ধু মহাশয়কে বলিয়া এবং কৃষি-বিভাগের অধ্যক্ষ বাহাদুরকে পত্র লিখিয়া, রাজসাহীর পরীক্ষার পর, হাদি সাহেবের কল (Hadi apparatus) আমার ইক্ষুক্ষেত্রে আনয়ন করিয়াছিলাম। মাননীয় কৃষি-বিভাগের অধ্যক্ষ মহোদয় দয়া করিয়া, আমার প্রার্থনানুযায়ী, পরীক্ষা করিবার জন্য হাদি সাহেবের চিনি-প্রস্তুত করিবার কল আমাকে দিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন, চিনি-প্রস্তুতবিষয়ে অভিজ্ঞ দুইজন বয়-প্রদর্শকও (Boiler and centrifugaler) হাদি সাহেবের কারখানা হইতে আনাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রায় একমাসকাল আমার এখানে রহিয়া, আমাকে রাব ও চিনি প্রস্তুত করিতে শিখাইয়াছিলেন। রায় ভূপালচন্দ্র বসু বাহাদুরও হাদি সাহেবের নিকট আমার জিজ্ঞাস্তবিষয় অবগত হইবার নিমিত্ত পত্র লিখিয়া, এবং নিজে আমার ইক্ষুক্ষেত্রে আসিয়া ও আমাকে পরামর্শ দিয়া, আমাকে নানাপ্রকারেই সাহায্য করিয়াছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের কৃষি-বিভাগের অধ্যক্ষ মহোদয়ও তৎকালে নানাপ্রকারে আমার বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সাহায্যলাভ করাতেই, আমি হাদি সাহেবের যন্ত্র-ব্যবহার করিবার সুযোগ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। এ জন্য আমি তাঁহাদিগের নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিয়াছি।

হাদি সাহেবের উদ্ভাবিত নিম্নলিখিত কল কএকটীকে 'Hadi apparatus' বলা হয়।

(১) রিজার্ভ ট্যাঙ্ক—ইহা একটী গোলাকার কড়া। এই কড়াটী চুলার চিমনির নিকটে রহে। আখমাড়া কল হইতে রস আনিয়া রিজার্ভ ট্যাঙ্কে বা কড়াতে রাখা হয়। এই কড়াতেই রস গরম হইতে থাকে।

(২) ক্লেরিফায়ার—ইহাও একটী গোলাকার কড়া; ইহাতে রসের গাঁদ কাটা হয়।

(৩) এভেপরেটর—ইহাও একটী চতুষ্কোণ কড়া; ইহাতে খুব গাঢ় করিয়া রস পাক করা হয়।

(৪) কন্‌সেন্‌ট্রেটার—ইহা এক পার্টিশন-যুক্ত চতুষ্কোণ কড়া; ইহাতে গুড় বা রাব প্রস্তুত হয়।

রাব প্রস্তুত হইবার পর, যে কল দিয়া চিন আর নালী পৃথক করিয়া লওয়া হয়, তাহাকে "সেন্‌ট্রিফুগেল মেসিন" কহে। রাজসাহী সরকারী কৃষি-পরীক্ষা-ক্ষেত্রে যে সেন্ট্রিফুগেল মেসিন ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহা হস্তচালিত। সে কলে ১২ ঘণ্টায় ৩/০ মণ মাত্র চিনি প্রস্তুত হইতে পারে। উপরোক্ত চারিটী কড়াই হাদি সাহেবের উদ্ভাবিত। কিন্তু সেন্ট্রিফুগেল মেসিন হাদি সাহেবের নিজস্ব জিনিষ নহে—বিলাতি কল। বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই ভারতসাগরের দ্বীপসমূহের ও অন্যান্য স্থানের চিনির কুঠিতে সেন্ট্রিফুগেল মেসিনের ব্যবহার প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে। হাদি সাহেবের পুস্তিকা পাঠে জানা যায় যে, তিনি বিলাতের অনেক কোম্পানীর ৩০। ৪০টী সেন্ট্রিফুগেল মেসিন আনাইয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু কার্য্যের ফল সন্তোষজনক না হওয়াতে, অবশেষে "ব্রড্ বেণ্ট এণ্ড সনস্" (Broad Bent & Sons) কোম্পানীর মেসিন আনয়ন করেন; এবং উহাই ভারতবর্ষের চিনিদানার উপযোগী হওয়াতে, তিনি এই কলই ব্যবহার করিয়া থাকেন। রাজসাহীতে যে হস্তচালিত সেন্ট্রিফুগেল মেসিন আনয়ন করা হইয়াছিল, তাহাও শেষোক্ত কোম্পানীর নিকট হইতেই হাদি সাহেব আনিয়াছিলেন।

হাদি সাহেবের প্রক্রিয়াতে চিনি প্রস্তুত করিতে হইলে, বারাণসী-চিনি-প্রস্তুত-প্রণালীতে, প্রথমতঃ গুড় প্রস্তুত করিয়া লইয়া, তৎপর আবার জলমিশ্রিত গুড় পাক করিতে হয় না। উহাতে আখের রস জ্বাল দিয়া, একবারেই রাব প্রস্তুত করিতে পারা যায়। হাদি

সাহেবের কলে চিনিও খুব ভাল হয়। বিলাতি উপায়ে, অর্থাৎ ভাকুয়াম পান্ (Vacuum-pan) ইত্যাদি বহুমূল্যের আধুনিক কলে চিনি প্রস্তুত করিতে পারিলে, হাদি সাহেবের কল অপেক্ষাও কম খরচ এবং বিশেষ সুবিধা হইতে পারে সত্য, কিন্তু তথাপি, বারাণসী-প্রক্রিয়া অপেক্ষা, উহা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ।

কৃষি-বিভাগের নিজস্ব হাদি সাহেবের আবিষ্কৃত কলে আমি এ সময়ের মাত্র চিনিপ্রস্তুত-প্রণালী পরীক্ষা ও শিক্ষা করিয়াছিলাম। পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক হওয়াতে, তৎপরবর্ত্তী বৎসরে, হাদি সাহেবের পরামর্শানুযায়ী, তাঁহার কারখানা হইতে তিন 'প্রস্ত' (set) Boiling plant প্রস্তুত করাইয়া আনিয়াছিলাম। তদ্ভিন্ন, যাহাতে ২০/০ মণ চিনি প্রস্তুত করা যাইতে পারে, এরূপ একটী বাষ্পচালিত 'সেন্ট্রিফুগেল মেসিন' এবং তাহা চালাইবার নিমিত্ত '8 Horse power Engine & Boiler' ও রাবের ডেলা (clot) ভাঙ্গিবার উপযোগী একটী 'পাগ্ মিল'—এই কএকটী কল বিলাতের 'Broad Bent & sons' নামক কোম্পানীর নিকট হইতে আনয়ন করিয়াছিলাম। এ সকলের মূল্য বাবদ প্রায় ৭০০০৲ টাকা লাগিয়াছিল। আমি উক্ত চিনিপ্রস্তুতোপযোগী কলগুলি আনয়ন করিবার পর হইতে, উহাতেই চিনি প্রস্তুত করিতেছি। প্রথমাবস্থায় যখন গুড়ের মূল্য বেশী থাকে, তখন চিনি না করিয়া গুড়ই করিয়া থাকি; আর যখন গুড়ের দাম কম হয়, তখনই চিনি প্রস্তুত করি। এই নিয়মেই কার্য্য চলিতেছে।

বিলাতি উপায়ে, অর্থাৎ আধুনিক বহুমূল্যের কল দ্বারা চিনি প্রস্তুত করিতে না পারিলে, হাদি সাহেবের প্রক্রিয়ায় চিনি প্রস্তুত করিয়া, জাভার চিনির সহিত প্রতিযোগিতা করা সম্ভবপর নহে। কিন্তু তথাপি, আমার চিনি বিশুদ্ধ বলিয়া, কাঁইএ মহাজন এবং অন্যান্য নিষ্ঠাবান হিন্দুরা, অধিক মূল্য দিয়াও, আমার চিনি ক্রয় করিয়া থাকেন। সে জন্য চিনি বিক্রয় করিতে আমি কখনও অসুবিধাভোগ করি না; চিনি বিক্রয়ের জন্য কখনও আমাকে ভাবিতে হয় নাই। আমার চিনি প্রথমাবধি আজ পর্য্যন্ত কাশীর চিনির সমমূল্যেই বিক্রয় হইতেছে। আমি যে ভাল চিনি প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছি, ইহা হাদি সাহেবেরই (Khan Bahadur S. M. Hadi) অনুগ্রহের ফল বলা যায়। তাঁহার ন্যায় পরম উদার প্রকৃতির দেশহিতৈষী লোক বড় কম দেখা যায়। বিলাত হইতে কল আনাইয়া দিতে, তিনি আমার জন্য নিঃস্বার্থভাবে যেরূপ কষ্টস্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। এজন্য আমি তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিয়াছি।

হাদির প্রক্রিয়ায় চিনি প্রস্তুত-প্রণালী—প্রথমতঃ, হাদি সাহেবের উদ্ভাবিত চারিটি কড়া বসাইবার উপযোগী চুলা প্রস্তুত করিয়া, তদুপরি কড়াগুলি বসাইয়া দিতে হয়। চুলার সহিত কড়া চারিটি যাহাতে দৃঢ়রূপে সংবদ্ধ রহে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই, কড়াগুলি চুলার উপর বসাইতে হইবে। 'Clarifire' এবং 'Concentrater' এর নীচে—দুইখানে লোহার 'firebar' বিছাইয়া বেষ্টিত চুল্লী (furnace) প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। চুলার উপরে, ধূমনির্গমনের নিমিত্ত, একটী ১০।১২ ফুট লম্বা লোহার চিমনি সংযোগ করিয়া লওয়া আবশ্যক। চুলার উপরোক্ত দুইস্থানে আখের ছোব্‌ড়া (refuse) বা আলানী কাষ্ঠ দ্বারা অগ্নি জ্বালাইলেই, চারিটি কটাহের প্রত্যেকটীতেই যে পরিমাণ উত্তাপের আবশ্যক তাহা লাগে। এক কড়া হইতে অন্য অন্য কড়াতে রস চালিত করিবার নিমিত্ত, প্রত্যেক কড়াতেই এক একটী পিত্তলনির্ম্মিত 'Tap' সংযোজিত রহে। ইহার নীচে এক একটি নালা থাকে। 'Tap' এর মধ্য দিয়া উত্তপ্ত রস বাহিরা হইয়া, উহা নালাপথেই এক কড়া হইতে অন্য কড়াতে পতিত হয়। ইচ্ছামত 'Tap' খুলিতে ও বন্ধ করিতে পারা যায়। Tap হইতে রসনির্গমনকালে, উহার মুখের নীচে, কোনও উপায়ে, একখণ্ড কম্বল বা মার্কিন কাপড় বিস্তৃত করিয়া দিলে, তন্মধ্য দিয়া রস ঝরিয়া গিয়া অন্য পাত্রে পড়ে; এবং তদুপরি গাঁদ বা ময়লা রহিয়া যায়।

রস পাক করিবার উপযোগী চুল্লী-প্রস্তুত-প্রণালী জানা না থাকিলে, কিম্বা উহা কোনও অভিজ্ঞব্যক্তির দ্বারা প্রস্তুত করাইয়া লইতে না পারিলে, কাজের সুবিধা হয় না। কখনও কখনও চুলার দোষে ইক্ষুরস পাক করিতে বিলম্ব

ঘটে; এবং উহাতে ভালরূপে আগুন জ্বলে না। চুলার মধ্যে জ্বালানী কাষ্ঠ ফেলিয়া দিয়াই, উহার মুখ বন্ধ করিয়া রাখিবার নিমিত্ত, 'furnace' এর মুখে, বয়লারের অনুরূপ, লোহার দরজা প্রস্তুত করিয়া দিতে হয়। ইহাতে কড়ার রসে অধিক উত্তাপ লাগে বলিয়া, উহা শীঘ্র পাক হইয়া যায়। এক সেট্ 'Boiling plant'এ চারিটি কড়া থাকে। আমার ইক্ষুক্ষেত্রে এ প্রকার তিন সেট্ Boiling plant আছে। 'fireheated pan' এর মধ্যে, এই pan সর্ব্বাপেক্ষা ভাল। গবাদি চালিত আখমাড়া-কলে (Cattle power mill) অথবা বাষ্পচালিত আখমাড়া-কলে (steam power mill)—যাহাতেই হউক, আখ মাড়িয়া ও উহা উত্তমরূপে কম্বল দ্বারা ছাঁকিয়া লইতে হইবে। ছাঁকা-রস 'রিজার্ভ ট্যাঙ্কে' রাখিতে হয়। উহাতে রস গরম হইতে থাকে। রিজার্ভ ট্যাঙ্কটী লোহার হইলেও চলে; কিন্তু অপর তিনটী কড়া পিত্তল কিংবা তাম্রের হওয়া চাই। নচেৎ, চিনি খুব শাদা হয় না। কারণ, লোহার কড়াতে চিনির রং খারাপ করে। নীচে আগুন থাকিলে, এবং তদুপরিস্থ কোনও কড়াতে রস না পড়িলে, কড়া জ্বলিয়া যায়। সে জন্য যেসকল কড়াতে রস পড়ে নাই, সেইসকল কড়াতে কিছু কিছু জল ঢালিয়া দেওয়া আবশ্যক। রিজার্ভ ট্যাঙ্কে যখন এক 'চার্জ্জ' (charge) পরিমিত, অর্থাৎ প্রায় ১২/০ মণ রস জমা হইবে, তখন Tap বা cock খুলিয়া দিয়া, উহা হইতে সমস্ত রস 'clarifire'এর মধ্যে আনয়ন করিতে হইবে। তথায় রস ফুটিয়া উঠিবার পূর্ব্বে, উহার গাঁদ বা ময়লা উঠাইয়া ফেলিতে হয়। একটি কেরোসিনের টিনে যে পরিমাণ জল ধরে, সেই পরিমাণ জলে, ট্যাড়স্, শিমুল কিংবা মেস্তা পাট—উহার কোনও একটীর ছাল কিছু-ক্ষণ উত্তমরূপে চট্কাইলেই একরূপ শীত-কষায় পিচ্ছিল রস নির্গত হইয়া থাকে; এবং উহা জলের সহিত সংমিশ্রিত হয়। তদবস্থায় জল হইতে ছালগুলি ছাঁকিয়া ফেলিয়া দিয়া, উহা কড়ার উত্তপ্ত ইক্ষুরসে ছিটাইয়া দিতে হয়। ইহাতেই রসের গাঁদ কাটিয়া যায়। ভাল জাতীয় ইক্ষুর রস হইলে, একবার মাত্র উক্ত কষায় জল প্রক্ষেপ করিলেই, সমস্ত গাঁদ উপরে উঠিয়া যায়; এবং তাহাতে রস পরিষ্কার হয়। পক্ষান্তরে, নিকৃষ্ট জাতীয় ইক্ষুর অপরিষ্কার রসে, উক্ত কষায় জল দুইবার ছিটাইয়া দিয়া, দুইবার গাঁদ না কাটিলে রস পরিষ্কার হয় না। রসের উপর যে গাঁদ উঠে, তাহা ঝাঁঝরা (বহুছিদ্রযুক্ত হাতা) দিয়া কাটিয়া ফেলিতে হয়। কর্ত্তিত ইক্ষু অধিকসময় পরে মাড়াইলে, যে রস নির্গত হয়, সেই রস বা অধিককাল পাত্রেরক্ষিত ইক্ষুরস জ্বালে চড়াইলে, উহা 'মাতিয়া' উঠে। তদবস্থায়, প্রথমতঃ আন্দাজ মত, অল্প চুণ বা চুণের জল রসের সহিত মিশাইয়া দেওয়া ভাল। তৎপর, উহাতে ৩।৪ তোলা সোডা বাইকার্ব্ব দিয়া, আবার গাঁদ কাটিতে হইবে। সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার না হইতেই রস খুব গাঢ় হইয়া পড়িলে, উহাতে কিছু জল ঢালিয়া দিয়া পাতলা করিয়া লওয়া আবশ্যক। নতুবা, গাঢ় রসের গাঁদ সহজে উপরে ভাসিয়া উঠিবে না। রস উথলিয়া বা ফুটিয়া উঠিলেও, উহার সহিত গাঁদ মিশ্রিত হইয়া যায়। সুতরাং, তদবস্থায় গাঁদ কাটিয়া ফেলিতে নিতান্ত অসুবিধা হয়। রস খুব পরিষ্কার হইলে ঈষৎ হরিদ্রাভ দেখায়; আর রসের নীচে কোনও একটি অতি ক্ষুদ্র পদার্থ পড়িয়া রহিলেও, যেন রসের উপর হইতে, তাহা দেখা যায়। রস যত পরিষ্কার হইবে, চিনিও ততই শুভ্র ও উৎকৃষ্ট হইবে। রস পরিষ্কার না হইলে চিনি ময়লা ও নিকৃষ্ট হয়। রস পরিষ্কার হইলে পর, জ্বাল একটু বাড়াইয়া দিয়া, উহা ফুটাইয়া লইতে হয়। গাঁদ কাটিবার পর, 'ক্লেরিফায়ার' মধ্যেই রস কিছু গাঢ় করিতে হইবে। তৎপর, Tap খুলিয়া দিয়া, ঐ গাঢ় রস 'এভেপরেটর' মধ্যে আনয়ন করিতে হইবে। রিজার্ভ ট্যাঙ্ক, ক্লেরিফায়ার ও এভেপরেটর—এই তিনটী পাত্রের ছিদ্রের (Tap) নীচেই কম্বলের টুকরা বিছাইয়া রাখিতে হইবে। রস পরিষ্কার করাই যে ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। হাতা দিয়া উঠাইবার সময় যেটুকু গাঁদ বা ময়লা রসের সঙ্গে মিশিয়া রহে, তাহা ঐ সকল কম্বলের উপর লাগিয়া রহিবে। সুতরাং, কম্বলে ছাঁকা হইয়া, পরিষ্কার রসই পাত্রান্তরে পতিত হইবে। মার্কিণ কাপড় অপেক্ষা, সস্তা দেশী কম্বল এ কাজের পক্ষে ভাল।

'এভেপরেটর' মধ্যে রস আরও গাঢ় করিয়া, উহা 'কন্‌সেনট্রেটর' মধ্যে পাঠাইতে হয়। এই কড়াতে ৫।৬টী

পার্টিশন্ বা ভাগ রহে। উহার একভাগে গাঢ় রস পড়িলে, অপরভাগে রাব প্রস্তুত হয়। কড়ার যেভাগে রাব প্রস্তুত হয়, সেই ভাগে এড়ণ্ডতৈল ছিটাইয়া দিতে হইবে। ইহাতে কড়া জ্বলে না; বিশেষতঃ, নলের ছিদ্রপথে রাবও সহজেই বাহির হইতে পারে। রাব প্রস্তুত হইলে পর, কড়ার সহিত যুক্ত নলের (Pipe) ছিদ্রপথে রাব বাহির করিয়া লইতে এবং উহা মৃত্তিকাপাত্রে ঢালিয়া ঠাণ্ডা করিতে হইবে। প্রথমোক্ত তিনটী কড়াতেই Tap রহে; কিন্তু শেষোক্ত কড়াতে, 'Tap'এর পরিবর্ত্তে একটী নল (Pipe) রহিয়াছে। এই নলের ছিদ্রপথে পাত্র হইতে অনায়াসেই রাব বাহির করিয়া লইতে পারা যায়। নলের ছিদ্রপথের নীচে শ্রেণীবদ্ধভাবে ৩।৪টী মৃত্তিকানির্ম্মিত গামলা পুতিয়া রাখা হয়। রাব প্রস্তুত হইলে পর, নলের মুখের নীচে যে পাত্র বসান রহে, তাহাতেই রাব পড়িতে আরম্ভ করে। এই পাত্র হইতে, ক্রমান্বয়ে তৎপরবর্ত্তী দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ পাত্রে, হাতা দিয়া রাব আনয়ন করিতে হয়। প্রথম পাত্র হইতে দ্বিতীয় পাত্রে, দ্বিতীয় পাত্র হইতে তৃতীয়পাত্রে—এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন পাত্র ঘুরিয়া, চতুর্থ পাত্রে রাব গেলেই, উহা অনেকটা ঠাণ্ডা হইয়া যায়। রাব ভালরূপে ঠাণ্ডা হইলে পর, উহা কেরোসিনের পরিষ্কৃত টিনে অথবা মাটীর কলসীতে ভরিয়া, দশদিন গুদামে রাখিতে হইবে। এই সময়ের মধ্যে রাবে দানা বাঁধিয়া থাকে। এক সেট্ কড়াতে (One boiling plant) পৌষমাসে ১২ ঘণ্টায় ১০/ মণ এবং ফাল্গুন চৈত্র মাসে ১৩/ মণ রাব প্রস্তুত হইয়া থাকে। আখমাড়া-কল হইতে রিজার্ভ ট্যাঙ্কে রস আনয়ন করিবার নিমিত্ত একটি, ক্লেরিফায়ার মধ্যে গাঁদ কাটিবার জন্য একটি, পাক বুঝিতে পারে, এরূপ মিস্ত্রী একজন, রাব ঠাণ্ডা করিতে একটি এবং চুলায় জ্বাল দেওয়ার জন্য দুইজন—এই মোট ছয়জন লোক হইলেই রাব প্রস্তুত করা যায়। এক সেট্ কড়াতে আমি প্রতিদিন সাত 'চার্জ্জ' রস জ্বাল দিয়া থাকি। তাহাতে মোট যে পরিমাণ রাব প্রস্তুত হয়, তাহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। গুদামে-রক্ষিত রাবে দানা বাঁধিলে পর, কলসী বা টিন হইতে উহা বাহির করিয়া লইতে হয়। তৎপর, হস্ত দ্বারাই হউক, কিংবা 'পগ্ মিল' দ্বারাই হউক, রাবের ডেলা ভাঙ্গিয়া লওয়া আবশ্যক। আমি Pug mill দ্বারা রাবের ডেলা ভাঙ্গাইয়া থাকি। দুইটী লোকে এই কল চালাইতে পারে; এবং উহাতে দৈনিক ৬০/ মণ রাবের ডেলা ভাঙ্গিয়া যায়। ডেলা ভাঙ্গা হইলে, রাবের সহিত ২।৩ তোলা সোডা বাই কার্ব্ব মিশ্রিত করিয়া, উহা 'Centrifugal machine'এ দিতে হয়। এই কল অতি দ্রুতবেগে ঘুরিতে থাকে। রাব দেওয়ার ৬।৭ মিনিট পরে, যখন কলের মধ্যস্থ টুক্রীর (Basket) তামার পাতের ঝাঁঝরার (Perforated copper sheet) ছিদ্রপথে প্রায় সমস্ত লালী বাহির হইয়া যায়, এবং কলসংযুক্ত নল (pipe) দিয়া ট্যাঙ্কে (লালী পড়িবার জন্য কলের নলের মুখের নীচে যে পাত্র বা ট্যাঙ্ক রহে, তাহাতে) পতিত হইতে আরম্ভ করে, তখন গরম জলে রিঠাফল (Soapnut fruit) 'ফেটাইয়া' ও ছাঁকিয়া লইয়া, সেই জল কলের মধ্যস্থ চিনির উপর ছিটাইয়া দিতে হয়। খড়ের ঝাড়ু দ্বারা জল ছিটাইয়া দেওয়াই সহজ ও সুবিধাজনক। রিঠার জলে চিনি খুব পরিষ্কার হইয়া থাকে। রিঠার জল ছিটাইয়া দেওয়ার পর, একবার শুধু পরিষ্কার জলও চিনির উপর ছিটাইয়া দিতে হয়। একমুঠা উলুখড় ব্রুসের (Brush) মত বান্ধিয়া লইয়া, তদ্দ্বারা রিঠার জল ও পরিষ্কার জল চিনির উপর ছিটাইয়া দিতে হইবে। যখন দ্রুতবেগে কল ঘুরিতে থাকে, তখনই চিনির উপর রিঠার জলাদির ছিটা দেওয়া আবশ্যক। এই সকল কার্য্য শেষ হইলেই, চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে। পরিষ্কার চিনি কলের তামার পাতের ঝাঁঝরার উপরে—তামার পাতের গায়ে লাগিয়া রহে; আর লালী ও জল মিশ্রিত হইয়া, উহা তামার পাতের ছিদ্রপথে বাহির হইয়া পড়ে, এবং কলের বহিঃ-আবরণের ভিতর গিয়া সঞ্চিত হয়। তৎপর, সেস্থান হইতে নলের ছিদ্রপথে লালীর ট্যাঙ্ক বা পাত্রে (Molasses tank) পড়িতে থাকে। ঐ ট্যাঙ্ক হইতে, নলসংযোগে, ইচ্ছামত যে-সে স্থানে লালী নিতে পারা যায়। রাব হইতে চিনি প্রস্তুত করিবার কলটি (Centrifugal machine) ভূমি হইতে কিছু উপরে ঝুলিয়া রহে। চিনি বাহির করিয়া

লওয়ার নিমিত্ত, এই কলের নীচে একটি দরজা আছে। ঐ দরজা খুলিয়া দিলেই, চিনি নীচে পড়িয়া যায়। তথা হইতে চিনি উঠাইয়া আনিয়া, উহা রৌদ্রে শুকাইয়া লইতে হয়।

আমার কলে এক "চার্জ্জে" ২৷৹ মণ রাব দিতে পারা যায়। রাব খুব ভাল হইলে, ২৷৹ মণ রাব হইতে ৵২ সের চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই চিনি রৌদ্রে শুকাইলে, প্রত্যেক মণে ৵১ সের কমিয়া যায়। 'সেণ্ট্রিফুগেল মেসিনে' ৵২ সের চিনি প্রস্তুত করিতে মাত্র ১৮ মিনিট সময় লাগে। আমার কলে, আমি ৮ ঘণ্টায় ৩০ 'চার্জ্জ' অর্থাৎ ৬০৷৹ মণ রাব হইতে চিনি প্রস্তুত করিয়া থাকি। চিনি প্রস্তুত করিবার কল (Centrifugal machine) ছোট, বড়—অনেক আকরেরই (size) হয়। আমি আমার ৩০ ইঞ্চ কলের কথাই লিখিলাম। ভাল দানাদার রাব হইলেই, এক মণ রাব হইতে ৷৬ সের শাদা চিনি (No 1 white sugar) পাওয়া যায়। কিন্তু রাব খারাপ (কম দানাদার) হইলে, চিনির পরিমাণও কম হয়। এমন কি, ১৷৹ মণ খারাপ রাব হইতে ৮৷৯ সের চিনিও হইতে পারে। রাবের সমস্ত চিনি একবারে বাহির করিয়া লইতে পারা যায় না;—লালীর সঙ্গে কিছু মিহি দানা বাহির হইয়া গিয়া থাকে। সেই জন্য ২নং চিনি (লাল চিনি) বাহির করিয়া লওয়ার উদ্দেশ্যে, লালী জাল দিয়া, ২নং বার তৈয়ারী করিতে হয়। এ রাবও, ১নং রাবের ন্যায় (গুড় হইতে প্রথমবার যে রাব প্রস্তুত করা হয়, তাহাই ১নং রাব।) কলসী বা টিনে ভরিয়া ১৫৷২০ দিন গুদামে রাখিতে হয়। ২নং রাবে দানা বাঁধিতে অপেক্ষাকৃত অধিক সময়ের আবশ্যক হয় বলিয়াই, প্রথমবারের ন্যায়, দশ দিনের মধ্যেই উহাতে দানা জন্মে না। ২নং রাবে দানা জন্মিলে, উহাও আবার চিনি প্রস্তুত করিবার কলে দিতে হয়। এই রাব এক প্রকার লাল চিনি পাওয়া যায়। প্রত্যেক মণ ১নং (প্রথম পাকের) রাব হইতে ৵৫ সের লাল চিনি পাওয়া যায়। ২নং (দ্বিতীয় পাকের) রাব ভাল না হইলে, চিনির পরিমাণ আরও কম হইতে পারে। ২নং রাব কলে দিয়া, উহা হইতে ২নং চিনি বাহির করিয়া লওয়ার পর, যে লালী অবশিষ্ট রহে, তাহা পুনরায় জাল দিয়া কিছু গাঢ় করিয়া লইলেই তামাক মাখিবার লালী প্রস্তুত হইয়া থাকে। আসামে এই লালী দ্বারাই তামাক মাখা হয়। সুতরাং, ইহারও ক্রেতার অভাব হয় না। সুবিধা থাকিলে ভাটিখানায়ও (Distillery) লালী বিক্রয় করিতে পারা যায়। সরাব প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত ভাটিখানায় লালীর প্রয়োজন হয়; কিন্তু সেখানে ইহা অতি সস্তা দামে দিতে হয়। এই জন্য টিনে বন্ধ করিয়া, উহা তামাকের লালী করাই লাভজনক।

আমি একমণ রাব হইতে বৎসরের শেষে গড়ে ৷৪ সের ১নং চিনি, ৵৫ সের ২নং লাল চিনি এবং ৷১ সের 'দাঠ' (তামাক মাখিবার গাঢ় লালী) পাইয়া থাকি। প্রতি মণ রাবের ৷০ সের কমিয়া যায়। তিনবার জাল দেওয়াতে কিছু কম হয়; আর বারম্বার নাড়াচাড়া করাতেও কিয়দংশ পড়িয়া যায়। তদ্ভিন্ন, কিয়ৎপরিমাণ চুরিও হয়। এই সব নানা কারণেই, প্রতিমণ রাব হইতে মোট দুইপ্রকারের ৷৯ সের চিনি এবং ৷১ সের লালী পাইয়া থাকি। ইক্ষু ও রাবের গুণানুসারে ও অন্যান্য কারণে, কোনও কোনও বৎসর, উক্ত পরিমাণের কিঞ্চিৎ কম অথবা বেশীও হয়।

হাদি সাহেবের উদ্ভাবিত কড়া কএকটী দ্বারা পরিষ্কার রাব প্রস্তুত করিতে পারা যায়। ইহাতে কম্বল দিয়া রস ছাঁকিবারও বিশেষ সুবিধা আছে। গাঁদ কাটিতে ও চিনি প্রস্তুত করিতে যে সকল মসলা ব্যবহার করিতে হয়, তাহাতে কি হিন্দু, কি মুসলমান,—কাহারও অখাদ্য, আপত্তিজনক বা অপবিত্র কোনও সামগ্রী নাই। বিশেষতঃ, কাশীর চিনির ন্যায়, হাদি সাহেবের কলে প্রস্তুত চিনি রৌদ্রে শুকাইবার সময়, পা দিয়া ডলিয়া-মলিয়া উহার ডেলা ভাঙ্গিবার আবশ্যক হয় না। কলেই চিনির ডেলা ভাঙ্গিয়া যায়; এবং উহার বালির ন্যায় মিহি দানা হইয়া থাকে। সুতরাং, হাদির কলে প্রস্তুত চিনি রৌদ্রে শুকাইয়া ও ছানিয়া লইলেই চলিতে পারে। তবে চিনিতে ২৷১টা ডেলা রহিলে, তাহা একটুকরা কাঠ দিয়া অনায়াসেই ভাঙ্গিয়া লইতে পারা যায়। সুতরাং, ইহা অতি বিশুদ্ধ চিনি। কাজের সুবিধা করিতে ও ব্যয়ের পরিমাণ কমাইতে হইলে,

বাষ্পোত্তাপে রস পাক করাই বিশেষ সুবিধাজনক। হাদির প্রক্রিয়ায়, এক এক Boiling palnt এ ছয়জন হিসাবে, তিন সেট্ Boiling plant এ মোট ১৮ জন লোকের আবশ্যক হয়। পক্ষান্তরে, বাষ্পোত্তাপে (Steam heat) ৩৷৪ জন লোকের দ্বারাই রসপাকের কার্য্য বেশ চলিতে পারে। হাদির প্রক্রিয়ায়, তিনটী চুলায় ছয় জায়গায় জাল দিতে (আগুন ধরাইতে) হয়; ইহাতে অনেক জ্বালানী কাষ্ঠের আবশ্যক। পক্ষান্তরে, বাষ্পোত্তাপে রস পাক করিতে কেবল একস্থানেই—বয়লারে (Boiler) জাল দিতে হয়। তদ্ভিন্ন, উহাতে চুরি বা জিনিষ বৃথা নষ্ট হইবারও সম্ভাবনা বড় কম রহে। এই সব নানা কারণে, বাষ্পোত্তাপে রস পাক করাই সর্ব্বপ্রকারে ভাল। তবে, ইহা অধিক ব্যয়সাধ্যব্যাপার, সন্দেহ নাই। চিনি-প্রস্তুতের জন্য কল-কারখানা করিতে হইলে বহু অর্থের প্রয়োজন। খুব ছোট রকমের কারখানা হইলেও, বোধ হয়, সকল প্রকার কল ক্রয় করিতে এবং কারখানা প্রস্তুত করিয়া, উহাতে কল স্থাপন করিতে অন্ততঃ ত্রিশ হাজার টাকার আবশ্যক হইবে। '3 roller mill' এর জন্যই ঐরূপ ব্যয় পড়িবে। '14 roller mill', Vacuum pan প্রভৃতি দ্বারা কার্য্য করিতে হইলে, আরও বহু টাকার আবশ্যক।

আখের চাষ—নূতন (বহু বৎসরের অনাবাদী জঙ্গলা-জমি) এবং পুরাতন (চাষী জমি)—এই উভয়প্রকার ভূমিতেই আখের চাষ করা যায়। আমি কিরূপ ভূমিতে ও কিপ্রকারে ইক্ষুচাষ করিয়া থাকি, তাহা সংক্ষিপ্তভাবে নিম্নে বিবৃত হইল :—

নূতন জমিতে আখের চাষ করিতে হইলে, প্রথমতঃ, আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে ছোট ছোট জঙ্গলাগাছগুলি বা ঝোপের গাছগুলি গোড়া-ঘেষিয়া কাটিতে হয়। তৎপর, বড় গাছগুলি কাটিয়া আনিয়া, রস জাল দেওয়ার নিমিত্ত ঐ সকল রাখিয়া দিতে হইবে। অতি ছোট ছোট গাছ ও লতা-পাতা সকলের কতক শুকাইয়া ও কতক পচিয়া গিয়া জমিতেই মিশিয়া যায়। সুতরাং, ঐ সকল ক্ষেত্রে রহিয়া গেলেও কোন ক্ষতি হয় না। লতা-পাতাগুলি পচিয়া গিয়া সারের কার্য্য করে। কেহ কেহ, জঙ্গল কাটিবার পর, মাঘ ফাল্গুন মাসে, আগুন লাগাইয়া—জমির তৃণাদি পুড়িয়া, জমি পরিষ্কার করিয়া লয়। এই উপায়ে অল্পব্যয়ে জমি পরিষ্কার হয় সত্য, কিন্তু তাহাতে মূল্যবান দাহ্য সারপদার্থগুলি পুড়িয়া যাওয়াতে, জমির বিশেষ ক্ষতি হইয়া থাকে। পরীক্ষার ফলে, নিশ্চিতভাবে জানা গিয়াছে যে, জমি অত্যন্ত পুড়িয়া গেলে, উহাতে পোড়ামাটি ও ছাই-সার ভিন্ন আর কিছুই রহে না। সে জন্য জমি হইতে বৃক্ষাদি কাটিয়া ফেলিয়াই, উহা পরিষ্কার করা ভাল। অগত্যা যদি জঙ্গল পুড়িতেই হয়, তবে অধিক জ্বলিয়া যাহাতে মাটি ইটের মত না হয়,—কাল হইয়াই রহে, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াই জমি পোড়াইতে হইবে। মোটকথা, যাহাতে পোড়াইবার উদ্দেশ্য সাধিত হয়, অথচ জমিও অধিক না পোড়ে, তাহারই ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

জমি পরিষ্কার হইলে পর, পৌষ, মাঘ অথবা ফাল্গুন মাসে, দুইহাত ব্যবধানে, ৭।৮ ইঞ্চ গভীর ও 'কোরভর' (কোর বা কোদালের মুখ যত চওড়া, তদনুরূপ) প্রস্থ নালা বা জুলি খনন করিতে হইবে। নালার প্রস্থ কিঞ্চিৎ অধিক হইলেও লাভ ভিন্ন লোকশান নাই। নালার পরিবর্ত্তে, দুইহাত ব্যবধানে, এক একটী এক ফুট দৈর্ঘ্য, এক ফুট প্রস্থ এবং ৭৷৮ ইঞ্চ গভীর গর্ত্ত খনন করিলেও চলিতে পারে। আমি পূর্ব্বে গর্ত্তে 'দগা' (আখের আগা) রোপণ করিতাম; কিন্তু বিগত ৪৷৫ বৎসর হইতে নালা খনন করিয়া, তাহতেই দগা (ডগা) রোপণ করিতেছি। গর্ত্ত অপেক্ষা নালাতে ডগা রোপণ করাই সুবিধাজনক; বিশেষতঃ, ইহাতে ব্যয়ও অনেক কম হয়। বৈশাখ মাসে ক্রমাগত কএকদিন পর্য্যন্ত বৃষ্টি হইয়া জমি উত্তমরূপে ভিজিয়া গেলে, প্রত্যেক গর্ত্তে দুইটী করিয়া আগা লাগাইতে হইবে। গর্ত্ত খনন করিবার সময় যে মৃত্তিকা উত্থিত হয়, উহা গর্ত্তের পার্শ্বেই রাখিয়া দিতে হইবে। আগা বসাইবার পূর্ব্বে, গর্ত্তের মৃত্তিকা উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া লইয়া, তাহার কতকাংশ দ্বারা প্রথমতঃ গর্ত্তের ২৷৩ ইঞ্চ পূর্ণ করিতে হয়; তৎপর, তাহার উপর গর্ত্তের দুই পার্শ্বে দুইটি ডগা বসাইয়া, আবার তিন ইঞ্চি আন্দাজ মাটি চাপা দিয়া ডগার নীচের অংশ ঢাকিয়া দেওয়া আবশ্যক।

নালাতে ডগা-রোপণ-প্রণালীও গর্ত্তে রোপণ-প্রণালীরই অনুরূপ। নালার মধ্যে এক ফুট অন্তর এক একটী ডগা রোপণ করিয়া, পূর্ব্ববৎ ডগার নীচে ও উপরে মিহি মৃত্তিকা-চূর্ণ দিতে হইবে। বৈশাখমাসে যে আখ কাটা হয়, তাহার আগা দিন দিন আনিয়া রোপণ করিতে পারা যায়। তৎপূর্ব্বে কর্ত্তিত ইক্ষুর ডগা কোনও ছায়াযুক্ত স্থানে রাখিতে হয়। মৃত্তিকা ধূলিবৎ সূক্ষ্মচূর্ণ করিয়া, উহাতে আখের আগার দুইটী গাঁইট পুতিতে এবং আগাগুলি ঈষৎ হেলানভাবে খাড়া করিয়া রাখিতে হইবে। প্রখর রৌদ্রের সময়, ঐ সকল আখের ডগায় জল ছিটাইয়া দেওয়া আবশ্যক। নতুবা ডগাগুলি শুকাইয়া যাইতে পারে। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে, এ সকল ডগার শুষ্ক পাতা ছরাইয়া আনিয়া, পূর্ব্বোক্ত নিয়মে ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হয়। সমস্ত আখগাছের তিনটী গাঁইটযুক্ত এক একখণ্ড ক্ষেত্রে রোপণ করিলেও আখ জন্মিয়া থাকে। কিন্তু উপরের প্রায় দুইহাত আন্দাজ আখের ডগার 'গজানি' (চারা) যেপ্রকার শীঘ্র শীঘ্র বাড়ে ও তেজাল হয়, নীচের দিকের গাঁইটের চারা সেরূপ হয় না। সুতরাং, ডগার অকুলান না হইলে, আখগাছের উপরের একহাতেই রোপণের ডগা করা ভাল। উহাতে না কুলাইলে, উপরের (আগার নীচের) দুইহাত আখে তিনটী করিয়া গাঁইট রাখিয়া এক একু খণ্ড করিতে এবং খণ্ডগুলি রোপণ করিতে হয়। আখের নীচের অংশ বেশী মিষ্ট হয়; সুতরাং, উহা হইতে অধিক গুড় পাওয়া যায়। বিশেষতঃ, সে অংশ হইতে চারাও ভাল হয় না। এই সকল নানা কারণে, ইক্ষুর নিম্নভাগ হইতে চারা না করাই উচিত। তিনটী গাঁইটসহ এক একটী খণ্ড কর্ত্তন করিলে, তাহাও ডগা বা পাব্ নামে অভিহিত হয়। ইক্ষুদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া, তখনই প্রত্যেকটি ডগার উভয়পার্শ্ব ও চোখগুলি ভালরূপে দেখা আবশ্যক। যে সকল ডগার কোনও একপার্শ্বে লাল দাগ অথবা ডগার গায়ে 'Moth-borer' পোকার ছিদ্র বা রন্ধ্র দৃষ্ট হয়, সেই সকল ডগা বাঁছিয়া ফেলিতে হইবে। তদ্ভিন্ন, যে ডগার তিনটি গাঁইটের একটি বা দুইটি চোখ শুকাইয়া গিয়াছে, তাহাও রোগাক্রান্ত বলিয়া ফেলিয়া দিতে হইবে। কারণ, 'রেড্‌রট্' ও ধসা-রোগের কীটাণু-সমুহ, কোনও কোনও স্থলে, প্রথমতঃ ইক্ষুদণ্ডের কোনও একটী চোখ আক্রমণ করে; এবং তৎপর সমস্ত গাছেই বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ইহাতে রোগাক্রান্ত স্থান পচিয়া যায়। রোগাক্রান্ত ইক্ষু গুরপ্রস্তুত করিবার উপযোগী হইলে, তাহা আখমাড়া-কলে দিতে হইবে; আর তাহা না হইলে, উহা খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া গরু-বাছুরকে খাইতে দিতে পারা যায়। আখের চোখ ছাতাধরা-রোগের (Fungus disease) আক্রমণে, কি অন্য কোনও কারণে শুকাইয়া গিয়াছে, তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। যাহা হউক, আখের ডগার একটী চোখও শুষ্ক দেখিলে, উহা রোপণ না করাই ভাল। আখের ছাতাধরা-রোগ নিবারণের উদ্দেশ্যে, বাছাইকরা ডগা রোপণ করা নিতান্ত আবশ্যক। এই সকল রোগ যে আখের পক্ষে কিরূপ অনিষ্টকর, তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত অন্যে জানিতে পারে না। কোনও কোনও সময় 'রেড্ রট্' রোগে আখের খেতকে খেত শুকাইয়া গিয়া, কৃষকের সর্ব্বনাশসাধন করে। সে জন্যই ডগা বাছাই করা সম্বন্ধে এত কথা লিখিত হইল। রোগ জন্মিলে, উহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করা অপেক্ষা, যাহাতে সহজে রোগ জন্মিতে না পারে, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখাই কর্ত্তব্য। আমি বাছাইকরা ডগা ব্যবহার করিয়া, রোগ-নিবারণের পক্ষে সুফললাভ করিয়াছি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, অনেক বৎসরের পতিত সারবান জঙ্গলা-জমিতে আখ লাগাইতে হইলে, জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া, তাহাতে প্রথমতঃ গর্ত্ত বা নালা খনন করিতে হয়; এবং তৎপর, বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে গর্ত্ত বা নালায় আখের ডগা রোপণ করিতে হইবে। এ প্রকার উর্ব্বরা ভূমিতে (ক্রমাগত অনেক বৎসর লতাপাতা পচিয়া, যে জমি সারবান হইয়াছে।) আষাঢ়মাসে আখের ডগা রোপণ করিলেও আখ ভাল হইয়া থাকে। নূতন জঙ্গলা-জমিতে অধিক পূর্ব্বে, অর্থাৎ ফাল্গুন চৈত্র মাসে ডগা রোপণ করিলে, আখের গাছ অত্যন্ত উচ্চ হইয়া উঠে বলিয়া, ঐ সকল হেলিয়া পড়িবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা রহে।

আখগাছ হেলিয়া পড়িলে অনেক ক্ষতি হয়। সুতরাং, নূতন জমিতে ফাল্গুন চৈত্র মাসে ডগা রোপণ না করাই ভাল। নূতন জমিতে জঙ্গল পরিষ্কার করা ভিন্ন, রোপণের পূর্ব্বে, অন্য কোনও প্রকার পাইটের আবশ্যক হয় না। রোপণের পর, ইক্ষুক্ষেত্রে যাহাতে ঘাস, জঙ্গল ও আগাছা প্রভৃতি জন্মিতে না পারে, তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। পত্রসহ আখগাছ ৩।৪ ফুট লম্বা না হওয়া পর্য্যন্ত, আবশ্যকমত ৩।৪ বার আখের খেত কোবাইয়া দিতে হয়। শ্রাবণমাসে পাতাসমেত চারাগুলি ৩।৪ ফুট লম্বা হইয়া উঠিলে, উহাদের গোড়ায় মাটি 'ধরাইয়া' দিতে হয়। ইহাতে দুই সারি আখের মধ্যে এক একটা নালা হইবে, আর আখগাছের গোড়ায় মাটির স্তুপ পড়াতে 'আইলের' মত দেখা যাইবে। আখের খেত পাহারী ধরণের উচ্চ অর্থাৎ স্থানে স্থানে অসমতল হইলে, তাহাতে জলনিঃসরণের নালার বড় আবশ্যক হয় না। কারণ, নালাপথে উচ্চস্থানের জল গিয়া 'হোলা'তে (নিম্নস্থানে) পড়িবে; এবং তাহাতে হোলাজমির আখের বিশেষ ক্ষতি হইবে। পক্ষান্তরে, জমি সমতল বা যাহাতে জল দাঁড়ায়, এরূপ হইলে, আখের সারির মধ্যস্থ নালার বিপরীত দিকে, প্রায় এক ফুট গভীর করিয়া জলনিঃসরণের এক একটী নালা খনন করিতে হয়। মোটকথা, ক্ষেত্রে যাহাতে বৃষ্টির জল জমিয়া রহিতে না পারে, তাহারই উপায়বিধান করিতে হইবে। ইক্ষুক্ষেত্রে জল জমিলে বিশেষ ক্ষতি হইয়া থাকে। এমন কি, ৮।৯ দিন পর্য্যন্ত আখগাছের গোড়ায় ৭।৮ ইঞ্চি জল জমিয়া—আবদ্ধ হইয়া রহিলে, কোন কোন জাতীয় আখগাছ মরিয়া যাইতেও পারে। আবদ্ধ জলে আখের যেরূপ মহা অনিষ্ট সাধিত হয়, স্রোতজলে সেরূপ হয় না। স্রোতজলে আখগাছের গোড়া ডুবিয়া রহিলে, সে জল ঠাণ্ডা বলিয়া তত ক্ষতি হয় না। কিন্তু আবদ্ধ জল রৌদ্রের সময় অত্যন্ত গরম হইয়া উঠে বলিয়া, উহাতে আখগাছ শীঘ্র মরিয়া যায়।

উপরোক্ত নূতন জমিতে দুইবৎসর পর্য্যন্ত বিনা সারেও আখের চাষ করা যায়। কিন্তু জমি তত উর্ব্বরা না হইলে, বিনা সারে চাষ চলে না। ঐ রূপ জমিতে পুরাতন জমির ন্যায় সার দিতে ও অন্যান্য সকল কার্য্যই করিতে হইবে। আখগাছ ৩।৪ ফুট উচ্চ হইলে, শ্রাবণমাসে বা তৎপূর্ব্বে গাছের গোড়ায় যে মাটি ধরাইয়া দেওয়ার কথা লিখিয়াছি, তাহার পর ইক্ষুক্ষেত্রের আর কোনরূপ পাইট করিতে হয় না। তখন ক্ষেত্রে আগাছা জন্মিলেও ইক্ষুর তত অনিষ্ট করিতে পারে না। তৎকালে, আখগাছগুলি যাহাতে মাটিতে পড়িয়া না যায়, তাহার উপায়বিধান করা আবশ্যক। আমি কিন্তু তাহা করিতে পারি না; ফলে, আমার আখ খুব লম্বা হইয়া থাকে। ৩।৪ টী ঝার একত্রে বান্ধিয়া দিয়া দেখিয়াছি, তাহাতে পতন নিবারিত হয় না। যে সকল ক্ষেত্রের আখ খুব উচ্চ হইয়া উঠে, উহা ভাদ্র আশ্বিন মাসের প্রবল বাতাস লাগিলেই পড়িয়া যায়। বাঁশের বা কাঠের খুঁটী পুতিয়া, তাহাতে আখ বাঁধিয়া দিতে পারিলে পতননিবারণ হয় সত্য, কিন্তু কুলী-মজুরের অভাবে, আমার বিস্তৃত ইক্ষুক্ষেত্রে আমি তাহা করিতে পারি না। সুতরাং, আমার যে সকল আখ ৭।৮ হাতের বেশী উচ্চ হয়, তাহাই পড়িয়া যায়; অন্য সকল পড়ে না। গাছ পড়িয়া গেলে, উহার রসে জলের ভাগ অধিক হয় বলিয়া গুড় ভাল হয় না। তদ্ভিন্ন, আখের প্রত্যেক গাঁইটে শিকড় জন্মে বলিয়া, আখ কাটিবার সময়, উহা পরিষ্কার করিয়া লইতে অধিক ব্যয় হয়। ঐ প্রকার ইক্ষুরসে চিনি প্রস্তুত করিবার রাব করিতে হইলে, উহা ময়লাশূন্য করিতেও অধিক যত্ন ও খরচের আবশ্যক।

মাঘ ফাল্গুন মাসে, প্রবল বাতাস প্রবাহিত হওয়ার সময়, ইক্ষুক্ষেত্রে হঠাৎ আগুন লাগিলে মহা বিপদ উপস্থিত হয়। এই বিপদ নিবারণের উদ্দেশ্যে, আখের শুকনা পাতাগুলি গাছ হইতে পৃথক করিয়া লইয়া, ঐ সকল ক্ষেত্রের বাহিরে ফেলিয়া দিতে হইবে। কিন্তু কখনও গাছের তাজা পাতা ছিড়িতে নাই। যখন পত্রের সকল অংশ শুকাইয়া যায় ও উহা গাছের গা হইতে আংশিক পৃথক হইয়া পড়ে, তদবস্থায়ই পত্রগুলি সংগ্রহ করিতে হয়। সংগৃহীত শুষ্কপত্রগুলি ক্ষেত্রের বহির্ভাগে দূরে ফেলিতে হইবে। গাছ হইতে সম্পূর্ণ অথবা আংশিক কাঁচা পাতা (গাছের সহিত যাহার সম্পর্ক রহিয়াছে,—আপনা হইতেই খুলিয়া যায় নাই) ছিড়িয়া লইলে, গাছে যে

সামান্য ক্ষত হয়, গ্রন্থির সেই ক্ষতস্থান দিয়াই ছাঁতাধরা-রোগ ইক্ষুকাণ্ডের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়; এবং উহা রোগাক্রান্ত করিয়া তোলে। নীরোগ ডগা হইতে যে ইক্ষু জন্মে, তাহাতে কোনও ক্ষতস্থান না পাইলে, সহজে রোগবীজাণু ইক্ষুমধ্যে প্রবেশলাভ করিতে পারে না। তবে ডগা বাছাই করিয়া লইলেই যে রোগের হস্ত হইতে একেবারে মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়, তাহাও নহে। যতই সাবধানতা অবলম্বন করা হউক না কেন, ইক্ষুক্ষেত্রে অল্পবিস্তর 'Fungus disease' রহিবেই রহিবে। আমার এ সকল পুস্তকগত বিদ্যার কথা নহে; আমি ইহার ফলভোগ করিতেছি। এখানে বিস্তৃতভাবে আখের চাষ করিবার প্রায় চারিবৎসর পরে, একবৎসর আমি প্রায় অর্দ্ধেক ক্ষেত্রের (৫০ বিঘা জমির) ইক্ষুর শুষ্ক ও অর্দ্ধশুষ্ক পাতা ছিড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছিলাম। ইহাতে আখের কাঁচা পাতা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল; এবং আখের গাঁইটের স্থানে স্থানে অল্প অল্প ছাল উঠিয়া ক্ষত হইয়াছিল। ফলে, সে বৎসর আমার ইক্ষুক্ষেত্রে এমন প্রবলভাবে ধসা-রোগ দেখা দিল যে, রোগাক্রান্ত ক্ষেত্রের ইক্ষু শুকাইয়া যাইতে ও পচিতে লাগিল। পচা আখের দুর্গন্ধে ক্ষেত্রে প্রবেশ করা একরূপ অসাধ্য হইয়া পড়িয়াছিল। পক্ষান্তরে, যে অর্দ্ধাংশের ইক্ষুর কাঁচাপাতা ছিড়িয়া ফেলি নাই, তাহাতে আদৌ রোগ দেখা দেয় নাই। নীরোগ ইক্ষু হইতে প্রতি বিঘায় ২৫/০ মণ করিয়া গুড় পাইয়াছিলাম; কিন্তু রোগাক্রান্ত ক্ষেত্রের প্রতিবিঘার ইক্ষু হইতে ৮।৯ মণেরও কম গুড় হইয়াছিল। গুড়ের পরিমাণই যে শুধু কম হইয়াছিল, তাহা নহে; উহা লালীর মত পাতলা, দুর্গন্ধযুক্ত এবং অম্লাস্বাদযুক্ত হইয়াছিল। সে অবধি আখগাছের গোড়ায় মাটী ধরাইবার পর, বিশেষ আবশ্যক না হইলে, আমি ক্ষেত্রে কোনও লোক প্রবেশ করিতে দেই না।

ধসাধরা-রোগের প্রতিকারোপায় নির্দ্ধারণ করিবার নিমিত্ত আমি নানাপ্রকার পরীক্ষা করিয়াছিলাম। ধসাধরা-রোগে যে সময়ে আমার ইক্ষুক্ষেত্রের বিশেষ অনিষ্টসাধন করিয়াছিল, তৎকালে আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু ভূপালচন্দ্র বসু মহাশয় নিজে আসিয়া দেখিয়া, আমাকে নানাপ্রকার প্রতিকারের উপায় অবলম্বন করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন, তিনি কলিকাতায় ডাঃ ওয়াল (Dr. Wall—Reporter of Agricultural products) সাহেবের নিকট চিঠি লিখিয়া এবং তাঁহার নিকট রোগাক্রান্ত ইক্ষুর নমুনা পাঠাইয়া দিয়া, তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎপর, তিনি ধসারোগের প্রতিকারোপায়সম্বন্ধে আমাকে যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা এই :—

(১) আখের ডগা বাছিয়া, নীরোগ ডগা রোপণ করা।

(২) একভাগ তুঁতিয়া ও একশতভাগ জল একত্র মিশ্রিত করিয়া, ঐ তুঁতিয়ামিশ্রিত জলে আখের ডগা ডুবাইয়া লইয়া রোপণ করা।

(৩) আখ কাটিয়া নেওয়ার পর, ক্ষেত্রে আগুন জ্বালাইয়া, শুষ্কপত্রাদি পোড়াইয়া ফেলা।

(৪) রোগাক্রান্ত ক্ষেত্রের মুড়া (ratoon Cane) না রাখা।

(৫) রোগাক্রান্ত ইক্ষুক্ষেত্রে পুনরায় ইক্ষুচাষ না করিয়া, বৎসর বৎসর নূতন ক্ষেত্রে ইক্ষুচাষ করা।

এই পাঁচটী প্রতিকারোপায় অবলম্বন করিয়াই, আমি ফলাফল পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। তুঁতিয়ার জল ব্যবহারে আমি আশানুরূপ ফললাভ করিতে পারি নাই; তদ্ভিন্ন, অন্যান্য কার্য্য দ্বারা বিশেষ সুফললাভ করিয়াছিলাম। আমি এখনও পূর্ব্বোক্তরূপে ডগা বাছিয়া লইয়া রোপণ করিয়া থাকি; এবং আখ কাটিয়া লইবার পর, ক্ষেত্রের শুষ্কপত্রাদি আগুন জ্বালাইয়া পোড়াইয়া ফেলি। আমি যেভাবে ক্ষেত্রে আগুন দেই, তাহাতে জমির সার নষ্ট হয় না—জমির উপরস্থিত শুষ্কপত্রাদি পুড়িয়া যায় মাত্র। এ প্রকার সাবধানতা অবলম্বন করাতে, এখন আমার ক্ষেত্র ও আখ প্রায় রোগশূন্য হইয়াছে। কোনও কোনও জাতীয় ইক্ষুতে রোগ জন্মিবার আশঙ্কা বেশী; আবার কোন কোন জাতিতে কম। কোমলত্বকযুক্ত ভাগ জাতীয় ইক্ষু অপেক্ষা, কঠিনত্বকযুক্ত নিকৃষ্ট জাতীয় ইক্ষুতে রোগের আশঙ্কা কম। এ সকল কথা অন্যত্র বিস্তৃতভাবে লিখিত হইয়াছে।

পুরাতন জমি অর্থাৎ যে জমি ইক্ষু কিম্বা অন্যান্য ফসলের চাষে দুর্ব্বল (কিঞ্চিৎ অসার) হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে ইক্ষুর চাষ করিতে হইলে, জমির ঘাস-জঙ্গল কাটিয়া—জমি পরিষ্কার করিয়া, অগ্রহায়ণ পৌষ মাসে এক ফুট গভীর করিয়া কোদালি দ্বারা কোবাইতে এবং তদবস্থায় মাঘমাস পর্য্যন্ত রাখিতে হইবে। অগ্রহায়ণ পৌষ মাসের সাতমাস পূর্ব্বে, অর্থাৎ বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে, উক্তরূপ জমিতে ৪।৫ বার হালচাষ করিয়া, তাহাতে ধইঞ্চা, বরবটী প্রভৃতি শিম্বীধারী (Leguminous) গাছের চাষ করিতে পারিলে ভাল হয়। ধইঞ্চাগাছ প্রায় দুই ফুট উচ্চ হইলে, আর বরবটীগাছে ফুল ধরিলে, ঐ সকল গাছগুলিকে হল দ্বারা কর্ষণ করিয়া জমির সহিত মিশাইয়া দিতে হইবে। গাছগুলি মৃত্তিকায় রহিয়া বর্ষার জলে পচিয়া যায়; এবং তাহাতে তেজস্কর সারের কার্য্য সাধিত হয়। এইরূপ সারকেই কাঁচাসার (green manure) কহে। মোটকথা, পুরাতন জমিতে কাঁচাসার দেওয়ার পর, অগ্রহায়ণ পৌষ মাসে উহা এক ফুট গভীর করিয়া কোবাইয়া লইতে পারিলে খুব ভাল হয়। আমি পরীক্ষার্থ ৬।৭ বিঘা জমিতে কাঁচাসার ব্যবহার করিয়া সুফললাভ করিয়াছিলাম। কুলী-মজুরের অভাবে, এখনও আমার সমস্ত ইক্ষু-ক্ষেত্রে কাঁচাসার ব্যবহার করিতে পারি নাই। আমার ইক্ষুক্ষেত্রের মৃত্তিকা এখনও তত অনুর্ব্বরা হয় নাই; সুতরাং, উহাতে কাঁচাসার ব্যবহারের আবশ্যকতাও বড় হয় না। এক্ষণ আমার ইক্ষুক্ষেত্রে কিছু গোময় ও সরিষার খৈল ব্যতীত আর কিছুই সাররূপে ব্যবহার করি না। কিন্তু ভবিষ্যতে আমাকেও বোধ হয় আখের জমিতে কাঁচাসার ব্যবহার করিতেই হইবে।

কোদালি দ্বারা গভীররূপে জমি কোবাইবার পর, মাঘমাস পর্য্যন্ত উহা শুকাইবার জন্য ফেলিয়া অর্থাৎ চাষ অথবা মই না দিয়া রাখিতে হয়। ফাল্গুন চৈত্র মাসে বৃষ্টি-পাতের পর জমির ঢেলাগুলি ভিজিয়া উঠিলে, উহাতে প্রথমতঃ মই দিতে এবং তৎপর হাল চাষ করিতে হইবে। হাল না চালাইয়া, দ্বিতীয়বারও কোদালি দ্বারা ক্ষেত্র কোবাইয়া দিলে চলে। কোবাইবার সময়ই মৃত্তিকার ঢেলাগুলি টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া ভাঙ্গিয়া যায়। ঘন করিয়া কোবাইলেই এ কার্য্য সহজে সাধিত হয়। মৃত্তিকার কঠিনতা ও কোমলতা অনুযায়ী, কোন কোন জমিতে ৪।৫ বার হাল দিলেই জমি প্রস্তুত হইয়া থাকে; আবার কোন কোন জমিতে ততোধিক চাষেরও আবশ্যক হয়। কেহ কেহ, ইক্ষুক্ষেত্রের মৃত্তিকা ধূলিবৎ চূর্ণ করিয়া লইতে পরামর্শ দিয়া থাকেন। আমি কিন্তু ধূলিবৎ চূর্ণ-মৃত্তিকায় সুফললাভ করি নাই। পরীক্ষার্থ একবৎসর প্রায় একবিঘা জমি, ফাল্গুন চৈত্র মাসে, ধূলিবৎ চূর্ণ করিয়া লইয়াছিলাম। বৈশাখমাসে এক পশ্‌লা বৃষ্টি হইবার পর দেখা গেল, বৃষ্টিজলের আঘাতে জমির মৃত্তিকা, 'ছরজ' করিলে যে প্রকার হয়, সেই প্রকার কঠিন হইয়া ডাবিয়া গিয়াছে। এই উত্তমরূপে কর্ষিত ও ধূলিবৎ চূর্ণীকৃত মৃত্তিকার অবস্থা, এক পশ্‌লা বৃষ্টির পর, এরূপ কঠিন হইয়াছিল যে, তাহাতে হাল চালাইলে বা কোবাইলেই, অকর্ষিত জমির ন্যায়, ঢেলা উঠিতে লাগিল। বলা বাহুল্য, ঐ জমি প্রস্তুত করিতে, আবার হালচাষ ও মই দেওয়া প্রভৃতি সকল কার্য্যই করিতে হইয়াছিল। ধূলিবৎ চূর্ণীকৃত জমি এবং বৃষ্টিপাতের পূর্ব্বে যে জমি প্রস্তুত করিয়াছিলাম,—এই উভয়প্রকার জমিতেই, বৃষ্টির দিনে কুলী-মজুরেরা ক্ষেত্রের মধ্যে গিয়া কাজ করিলে, তাহাদের পদের ভরে ভিজামাটি কঠিন হইয়া যায়। ঐরূপ জমিতে, বর্ষাগমের পূর্ব্বে—ফাল্গুন চৈত্র মাসে, আখের ডগা-রোপণের কার্য্য শেষ করিতে পারিলে, আখের চাষ চলিতে পারে। কিন্তু বৃষ্টির অভাবে, তৎকালে মৃত্তিকা অত্যন্ত শুষ্ক রহে বলিয়া, পুরাতন জমিতে ইক্ষুরোপণের পক্ষে, ঐ সময় প্রশস্ত নহে। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে আখের আগা রোপণ করিলে, জলের অভাবে, উহা শুকাইয়া যায়। বিশেষতঃ, তৎকালের রোপিত ডগায় উই ধরিয়া, উহা খাইয়া ফেলিতে পারে। বর্ষাকালে বা বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে বৃষ্টিপাতের পর গর্ত্তের বা নালার নীচের মৃত্তিকা ভিজা রহে বলিয়া, তথায় উই রহে না;—নালা বা গর্ত্তের উপরিভাগের মৃত্তিকা-স্তূপেই সে সময় উই বাস করে। বর্ষাকালে বা বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে রোপিত ডগায় উই না ধরিবার ইহাই প্রধান কারণ।

আখের চারাগুলি এক কি দেড় ফুট উচ্চ হইয়া উঠিলে, উই আর তত অনিষ্ট করিতে পারে না।

ইক্ষুক্ষেত্রের মৃত্তিকা, যাহাতে ধূলিবৎ মিহি না হয়, অথচ, উহাতে বড় বড় ঢেলাও না রহে,—এইরূপভাবেই প্রস্তুত করিতে হইবে। হালের দ্বারা হউক, কি কোদাল দ্বারা হউক,—যেভাবেই সুবিধা হয়, জমি প্রস্তুত করিয়া, নূতন মাটিতে ইক্ষুচাষের নিয়মানুসারে, উহাতে নালা বা গর্ত্ত খনন করিতে এবং ডগা রোপণ করিতে হয়। আমি ক্ষেত্রের সকল স্থানে সার ছিটাইয়া দিয়া ব্যবহার করি না। আখের ডগা বসাইবার সময় গর্ত্তে বা নালায় একবার এবং আখের গাছ ২।৩ ফুট লম্বা হইয়া উঠিলে, উহাদের গোড়ায় গোড়ায় অন্যবার—এই দুইবার সার দিয়া থাকি। প্রত্যেক বিঘা জমিতে প্রায় দুই হাজার গর্ত্ত করা হয়; এবং উহার প্রত্যেক গর্ত্তে দুইখানি করিয়া, মোট চারি হাজার ডগা রোপণ করিয়া থাকি। নালাতে রোপণ করিলে, জোড়া জোড়া আগা রোপণ না করিয়া, এক এক ফুট ব্যবধানে, এক একটী করিয়া ডগা বসাইয়া থাকি। প্রত্যেক বিঘার ৫০/ মণ গোময়সার অথবা ১২/ মণ সরিষার খৈল—এই দুইপ্রকার সারের কোনও একপ্রকার সার স্বতন্ত্রভাবে ব্যবহার করি। এই উভয়প্রকার সার মিশ্রিতভাবে ব্যবহার করিতে হইলে, বিঘাপ্রতি ২৫/ মণ গোবর ও ৬/ মণ খৈল দিয়া থাকি। আখের জমির পক্ষে রেড়ির খৈল খুব ভাল হইলেও, এখানে তাহা পাওয়া যায় না। একবৎসর একবিঘা জমিতে রেড়ির খৈল ব্যবহার করিয়া সুফললাভ করিয়াছিলাম। আমি ৮।১০টী বালক-বালিকার দ্বারা ইক্ষুক্ষেত্রের চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রাম হইতে সারা-বৎসরই গোবর সংগ্রহ করিয়া থাকি। ইহাতে প্রচুর পরিমাণেই গোবর সংগৃহীত হয়। সুতরাং, অধিকাংশ জমিতেই সাররূপে গোময় ব্যবহার করিতে পারি। যদি গোবরের অকুলান হয়, তবে আবশ্যকমত কিয়ৎপরিমাণ জমিতে খৈল দিয়া থাকি।

গর্ত্ত বা নালার যেস্থানে ডগা বসাইতে (রোপণ করিতে) হইবে, রোপণের পূর্ব্বে, সে স্থানে চারিভাগের একভাগ সার দেই; এবং অবশিষ্ট তিনভাগ সার, গাছগুলি ২।৩ ফুট উচ্চ হইয়া উঠিলেই, উহাদের গোড়ায় গোড়ায় সমভাবে ব্যবহার করি। জমি প্রস্তুত হইলে পর, প্রথমতঃ পূর্ব্বোক্ত ব্যবধানে গর্ত্ত বা নালা খনন করি; এবং তৎপর, গর্ত্তের বা নালার যেসকল স্থানে ডগা রোপণ করিতে হইবে, সেই সকল স্থানের নিম্নভাগের প্রায় তিন ইঞ্চি পরিমিত সার-মিশ্রিত মিহি (সূক্ষ্ম) মৃত্তিকা দ্বারা ভরিয়া রাখি। তিন ভাগ মৃত্তিকার সহিত একভাগ সার ব্যবহার করি। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে ক্রমাগত বৃষ্টিপাতের পর জমি রসাল হইয়া উঠিলে, বাছাইকরা (রোগশূন্য) ডগা সারমিশ্রিত প্রত্যেক স্থানেই দুইখানি করিয়া রোপণ করি। কিপ্রকারে ডগা রোপণ করিতে হয়,অর্থাৎ গর্ত্তের নীচেও উপরিভাগে কত ইঞ্চি হিসাবে মিহি মাটি দিতে হইবে, নূতন মৃত্তিকায় ইক্ষুরোপণ সম্বন্ধেই তদ্বিষয়ে বিবৃত হইয়াছে; সুতরাং, এস্থলে উহার পুনরোল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। পুরাতন মৃত্তিকায়ও যেভাবে ইক্ষু রোপণ করিতে হয়, নূতন মৃত্তিকায়ও ঠিক সেইভাবেই রোপণ করিতে হইবে। ডগা রোপণ করিবার পর, ক্ষেত্রে আগাছা বা তৃণাদি জন্মিলে, তাহা নিড়াইয়া তুলিয়া দুই সারির মধ্যে রাখিয়া দিতে হয়। কারণ, ঐ সকল পচিয়া গিয়াও সার হইবে।

যতই সাবধানে কাজ করা যাউক না কেন, শুকাইয়া যাওয়াতে, উইপোকার উপদ্রবে এবং অন্যান্য নানা কারণে, ক্ষেত্রের স্থানে স্থানে কিছু ডগা বা চারা মরিবেই মরিবে। এই অভাব পূরণের নিমিত্ত, রোপণকালে (৬।৭ দিন পূর্ব্বে বা পরে হইলেও কোন ক্ষতি নাই), জমির পরিমাণানুসারে, আবশ্যকমত একখণ্ড জমির মৃত্তিকা ধূলিবৎ মিহি ও কাদা করিয়া, উহাতে কতকগুলি ডগা শায়িতভাবে বসাইয়া রাখিতে হয়। এই ডগাগুলি ছায়াযুক্ত স্থানেই রাখিতে হইবে। কএক দিনের মধ্যেই শায়িত ডগায় শিকড় বাহির ও অঙ্কুরোদ্গম হইবে। ক্ষেত্রের চারা যেরূপ বাড়িতে থাকিবে, এই বীজতলার (Nursery) চারাও ঠিক সেইরূপই বর্দ্ধিত হইবে। যখন ক্ষেত্রের সমস্ত চারা প্রায় একফুট লম্বা হইয়া উঠে, তৎকালে বীজতলা বা নার্শারী হইতে সমপরিমাণ উচ্চ 'গজানি' (চারা) উঠাইয়া নিয়া, ঐ সকল চারা ইক্ষুক্ষেত্রের শূন্যস্থানে রোপণ করিতে

হয়। যেদিন অনবরত বৃষ্টি পড়িতে থাকে, আর ক্ষেত্রের জমি খুব সিক্ত-অবস্থায় রহে, সেইদিনই ক্ষেত্রের শূন্যস্থানের অভাব পূরণ করিতে হইবে। নার্শারীর চারার শিকড় রৌদ্র লাগিলে, ঐ সকল চারা ঝিমাইয়া যায়; সুতরাং ক্ষেত্রের চারার সহিত সমান তোরে বাড়িতে পারে না। এই জন্যই ছায়াযুক্ত স্থানে নার্শারী করিতে হয়। নূতন জমির ইক্ষুচাষেও নার্শারীতে চারা প্রস্তুত করিয়া রাখা আবশ্যক। কারণ, নূতন জমিতেও অল্প-বিস্তর চারা মরিয়া যায় বলিয়া, অভাব পূরণের জন্য নার্শারীর চারা চাই।

ক্ষেত্রে ডগা লাগাইবার পর, তাহাতে ঘাস বা আগাছাদি জন্মিবামাত্রই নিড়াইয়া ফেলিতে হয়। মোট কথা, আগাছাদি যাহাতে জন্মিতে বা জন্মিলেও বর্দ্ধিত হইতে না পারে, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। ক্ষেত্রে আগাছা হইলে চারাগুলি নিস্তেজ ও লালচে রকম হয়; আর সতেজে বাড়িতে পারে না। চারাগুলি একফুট উচ্চ হইলেই, ক্ষেত্র কোবাইয়া সমতল করিয়া দিতে হইবে। তদবস্থায় গর্ত্ত বা নালার চিহ্নমাত্রও রহিবে না। আগাছাদির আধিক্যানুসারে, ৩।৪ বার ক্ষেত্র কোবাইবার আবশ্যক হয়। ইক্ষুক্ষেত্র কোবাইবার জন্য ক্ষুদ্রাকারের লম্বা ও পাতলা একপ্রকার ভিন্নধরণের কোদালের আবশ্যক হয়। ইহাতেই ভাসা কোবের (light Hoeing) কাজ চলে। বলা বাহুল্য, ইক্ষুর জমি প্রস্তুত করিবার সময় যেরূপ গভীররূপে কোবাইতে হয়, চারা জন্মিলে সেরূপ কোব্ দেওয়ার প্রয়োজন হয় না; তৎকালে, নিস্তৃণ করিবার উপলক্ষেই, ভাসা-কোবের প্রয়োজন হইয়া থাকে। ইক্ষুক্ষেত্র কোবাইবার পর, ঝাড়ের প্রত্যেক ইক্ষুর গোড়ার চতুর্দ্দিকে, অবশিষ্ট গোবর ও খৈল 'ধরাইয়া' দিয়া—সার ব্যবহার করিয়া, তৎপর দুই সারির মধ্যস্থ মাটি আখের গোড়ায় ধরাইয়া (উচ্চ করিয়া) দিতে হয়। ইহাতে প্রত্যেক দুই সারির মধ্যে এক একটী নালা ও আখের গোড়ায় এক একটী আইলের মত হইবে। আবশ্যক হইলে, এই সকল নালার বিপরীত দিকে, উহা অপেক্ষাও গভীর করিয়া, এক একটী জলনিঃসরণের নালা খনন করিতে হয়। ইক্ষুচাষে অন্য কোনপ্রকার পাইট্ বা কার্য্যের আবশ্যক হয় না।

আখ কাটিবার সময়, যতদূর সম্ভব নীচে অর্থাৎ গাছের গোড়া-ঘেঁষিয়া কাটিতে হয়। স্বভাবতঃই ইক্ষুর নিম্নাংশের রস অধিক মিষ্ট, এবং উহাতে গুর বা চিনির অংশ অধিক রহে। সুতরাং, উহা বৃথা নষ্ট করা কোনমতেই উচিত নহে। বিশেষতঃ, আখের গোড়া ঘেঁষিয়া না কাটিয়া—উপরে কাটিলে, মুড়া (ratoon) ভাল হয় না। কারণ, আখের গোড়ার উপরের গ্রন্থিতে অঙ্কুর ও শিকড় জন্মিলে, ঐ সকল শিকড় বাহির হইয়া, সহজে মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইতে পারে না; ফলে উপরে রহিয়াই শুকাইয়া যায়। ইহাতে চাগা সতেজ হইতে পারে না। আখ কাটিয়া আনিবার পর, আখের শুক্না পাতা ইত্যাদিতে আগুন ধরাইয়া দিয়া, ক্ষেত্র পোড়াইয়া দিতে হয়। ইহাতে মৃত্তিকা সামান্য গরম হয় মাত্র; কিন্তু উহা পুড়িয়া কঠিন হইতে পারে না। সুতরাং, তাহাতে মৃত্তিকাস্থিত সারের কোনরূপ ক্ষতিও হইতে পারে না। অধিকন্তু, ক্ষেত্রে আগুন জ্বালিলে, (১) ইক্ষুর অনিষ্টকর নানাপ্রকার কীটাণু বিনাশপ্রাপ্ত হয়, এবং (২) ছাই-সার পাইয়া, আখের গোড়া হইতে সতেজ 'গজানী' (চারা) বাহির হইয়া থাকে—এই উভয় প্রকারেই ইষ্ট সাধিত হয়। কাটারি-পোকা (Moth borer) নামক একপ্রকার পোকা আখের চারাগাছের বিশেষ অনিষ্টসাধন করে। উহারা চারার কোমলপাতার গোড়া কাটিয়া দেয়; ইহাতে গাছ নিস্তেজ হইয়া পড়ে। এই পোকাগুলি পাতার নীচে ছিদ্র করিয়া, তাহাতেই লুকাইয়া রহে। চারার মাথার কোমল পাতাটী শুকাইয়া গেলেই বুঝিতে হইবে, কাটারি-পোকার উপদ্রব ঘটিয়াছে। তদবস্থায় ছোট ছোট বালক-বালিকার সাহায্যে পোকা ধরিয়া আনাইতে, এবং ঐ সকল মাটির গর্ত্তে পুতিতে কিম্বা পোড়াইয়া ফেলিতে হয়। যে গজানীর মধ্যের কোমল পাতাটী শুকাইয়া গিয়াছে, উহার নিম্নের অংশ হাত দিয়া দু'ফাঁক করিলেই পোকা বাহির হইয়া পড়ে। আখের পাতায় যখন প্রজাপতি ডিম্বপ্রসব করে, তখন উহাদিগকে মারিয়া ফেলিতে পারিলে ভাল হয়। ডিম হইতে পোকা জন্মিবার পূর্ব্বেও, ডিমগুলি নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারা যায়। প্রথমাবস্থায় এ শত্রু নষ্ট করিতে না পারিলে, ক্রমেই

উহাদের বংশবৃদ্ধি হইতে থাকে; এবং সময়ে আখের গায়ে ছিদ্র করিয়া, ইক্ষুক্ষেত্রের বিশেষ অনিষ্ট করে। আমার ইক্ষুক্ষেত্রে একবার অত্যধিকরূপে 'Moth borer' উপদ্রব ঘটিয়াছিল। উহারা আখের মধ্যে ছিদ্র করিয়া প্রবেশ করে। সেই ছিদ্র দিয়া, করাতে কাটা কাঠের গুঁড়ার ন্যায়, গুঁড়া বাহির হয়। কাটারি-পোকার উপদ্রব বেশী হইলে, ধসা ইত্যাদি 'Fungus disease' বেশী হয়। কারণ, কাটারি-পোকার কৃত ছিদ্রপথে ধসা প্রভৃতি রোগের বীজাণু সহজেই আখের মধ্যে প্রবেশ করিতে সুবিধা পাইয়া থাকে। আখকাটার পর ক্ষেত্র পোড়াইয়া দিলে, কাটারি-পোকার ডিম্বাদি পুড়িয়া ভস্মীভূত হইয়া যায়। ফলে, ভবিষ্যতে উপদ্রব ঘটিবার সম্ভাবনাও কম রহে।

বিভিন্ন জাতীয় ইক্ষু—বগাপুরা, কলাপুরা, মগ, তেলী, সামসারা, খাড়ি, পাউণ্ডা, দিক্‌চান্দ, বি ১৪৭, বি ৩৭৬ এবং ডোরাগার মরিশাস্—আমি এই এগার প্রকার ইক্ষুর চাষ করিয়াছি। এতদ্মধ্যে, বগাপুরা, কলাপুরা, বি ১৪৭, বি ৩৭৬ এবং ডোরাদার মরিশাস্ জাতীয় ইক্ষু সর্ব্বাংশেই ভাল বলিয়া, আমি এক্ষণ এই পাঁচপ্রকার ইক্ষুরই চাষ করিতেছি। বাকী ছয় জাতীয় ইক্ষু আমার কৃষিক্ষেত্রে ভালরূপে জন্মে নাই। বিশেষতঃ, ঐ কএকজাতীয় ইক্ষুর নানাপ্রকার দোষও আছে; এ জন্য আমি উহাদের চাষ করি না। এক্ষণ যে পাঁচ জাতীয় ইক্ষুর চাষ করিতেছি, তাহাদেরই পরিচয় নিম্নে লিখিত হইল:—

ডোরাদার মরিশাস্ (Striped Mauritious)—ইহার গাছ ৮।৯ হাত দীর্ঘ হয়। ইক্ষুর ব্যাস প্রায় দুই ইঞ্চি, ও উহাতে ডোরা রহে; রসে মিষ্টতা অধিক এবং ইক্ষুত্বক মধ্যমরকমের দৃঢ়। ডোরাদার মরিশাস্-ইক্ষু ভালরূপে জন্মিলে, প্রতি বিঘার ইক্ষুরসে অন্যূন ৩০/০ মণ গুড় হইতে পারে। এই গুড়ে চিনি প্রস্তুত করিলে, প্রতি মণ গুড় হইতে ।৩ সের চিনি পাওয়া যায়। ইহার গুড় ঈষৎ লালাভ বর্ণের হয় বলিয়া, উহা হইতে চিনির জন্য রাব প্রস্তুত করিতে হইলে, একটু বেশী করিয়া পাঁদ কাটিয়া রস পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়। ডোরাদার মরিশাস্-ইক্ষুর গোড়া হইতে দুই বৎসর পর্য্যন্ত মুড়ার আখ (ratoon cane) জন্মে।

বি ১৪৭—ইহা প্রায় সর্ব্বাংশেই পূর্ব্বোক্ত জাতির সমতুল্য। কিন্তু ইহার বর্ণ শামসাড়ার ন্যায় শাদা। এই জাতীয় ইক্ষুর গোড়া হইতে একবৎসর মাত্র মুড়ার আখ পাওয়া যায়। ইহার গুড় অতি পরিষ্কার ও শাদা বলিয়া, চিনির জন্য রস পরিষ্কার করিতে, ডোরাদার মরিশাসের অপেক্ষা, কম পরিশ্রম করিতে হয়। ইহাও ভালরূপে জন্মিলে, বিঘা প্রতি ৩০/০ মণ গুড় পাওয়া যায়; এবং ঐ গুড়েরও প্রতিমণে ।৬ সের চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে। বি ১৪৭ ইক্ষুর বিশেষ গুণ এই যে, আখ লম্বা হইয়া উঠিলেও, সহজে হেলিয়া পড়ে না।

বি ৩৭৬—ইহাও প্রায় সর্ব্বাংশেই ডোরাদার মরিশাসের সমতুল্য; কিন্তু ইহার রং কাজলা-আখের মত। ইহার পাবের গাঁইট উপরোক্ত দুইজাতির অপেক্ষা ঘন হয়। ডোরাদার মরিশাস্, বি ১৪৭ এবং বি ৩৭৬—এই তিন জাতীয় বিদেশীয় ইক্ষু প্রাদেশিক কৃষি-বিভাগ কর্ত্তৃক কএক বৎসর যাবৎ এ দেশে আনীত হইয়াছে। এই তিন জাতীয় ইক্ষুই চিনি প্রস্তুত করিবার পক্ষে সর্ব্বপ্রকারে উপযোগী; উহাদের গুড়ও ভাল হয়। আমি প্রথমতঃ জোড়হাটের সরকারী কৃষি-পরীক্ষা-ক্ষেত্র হইতেই, উক্ত তিন প্রকার ইক্ষু প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। আসাম-কৃষি-বিভাগের ডিপুটী ডিরেক্টার মাননীয় মিঃ বার্ট (Mr. Birt) সাহেব মহোদয় আমাকে পরীক্ষার জন্য উক্ত তিনপ্রকার ইক্ষু প্রদান করিয়াছিলেন। এজন্য আমি তাঁহার ও কৃষি-বিভাগের নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিয়াছি।

বগাপুরা—ইহার দৈর্ঘ্য ৮।৯ হাত, ব্যাস প্রায় তিন ইঞ্চি, ত্বক কোমল উক্ত তিন জাতি অপেক্ষা), রস গাঢ় এবং বর্ণ শামসাড়ার ন্যায় শাদা। বগাপুরার রসে অতি পরিষ্কার চাকা-গুড় হয়। ইহার রসও সহজেই পরিষ্কার করা যায়। একবৎসর মাত্র গোড়া হইতে মুড়া আখ জন্মে। বিঘাপ্রতি ২৫/০ মণ গুড় এবং প্রত্যেক মণ রাব হইতে।৬ সাফা চিনি পাওয়া যায়।

কলাপুরা—ইহারও দৈর্ঘ্য ৮।৯ হাত; ব্যাস ৷৷০ ইঞ্চি, পাব্ ঘন, ত্বক অত্যন্ত কোমল, রং বেগুণে-কাল এবং রস তত গাঢ় নহে। কলাপুরার রসে জলের ভাগ বেশী বলিয়া সহজেই রস পরিষ্কার হইয়া থাকে। ইহার রসেও পরিষ্কার গুড় ও চিনি হয়। কলাপুরা-ইক্ষুর ত্বক কোমল বলিয়া, উহা হইতে কলে সহজেই রস বাহির করা যায়। গোড়া হইতে দুই বৎসর মুড়ার আখ জন্মে। কলাপুরা-ইক্ষুরস হইতেও বিঘাপ্রতি ২৫/০ মণ গুড় পাওয়া যায়।

বগাপুরা ও কলাপুরা—এই দুই জাতীয় ইক্ষুই গুড় ও চিনি প্রস্তুত করিবার পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী। কিন্তু ইহাতে 'রেড্ রট্' বা ধসা-রোগের উপদ্রব বেশী হওয়াতে বিঘাপ্রতি গুড়ের পরিমাণ কিছু কম হয়। নচেৎ স্থানীয় এই দুইপ্রকার ইক্ষুর ফলনও ডোরাদার মরিশাস্ প্রভৃতি বৈদেশিক পূর্ব্বোক্ত তিন জাতিরই সমান হইতে পারে। বগাপুরা ও কলাপুরা জাতীয় ইক্ষু কখন ও কি-প্রকারে আসামে আনীত হইয়াছিল, তাহা আজিও ঠিক-ভাবে জানা যায় নাই। প্রবাদ এই যে, কএকজন সাহেব বহুপূর্ব্বে গৌহাটী, হমনীগড় প্রভৃতি স্থানে আখের চাষ করিয়াছিলেন; এবং তাঁহারাই পশ্চিম হইতে উক্ত দুইপ্রকার ইক্ষু আসামে আনয়ন করেন।

খাড়ি-নামক যে এক জাতীয় আখের কথা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, আমি তাহারও চাষ-পরীক্ষা করিয়াছি। আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু ডুপালচন্দ্র (Mr. B. C. Bose) উহা আমাকে বর্দ্ধমান হইতে আনাইয়া দিয়াছিলেন। খাড়ি-ইক্ষু দৈর্ঘ্যে ১২।১৩ হাত; এবং ইহার ব্যাস এক ইঞ্চি ও ত্বক অত্যন্ত কঠিন হয়। অন্যান্য জাতির ন্যায়, খাড়ি-আখের শুক্‌না পাতা আখের গা হইতে পৃথক হইয়া পড়ে না;—উহা গাছের গা জড়াইয়া রহে। সে জন্য কোনও প্রকার ধসাধরা-রোগ খাড়ি-আখ আক্রমণ করিতে পারে না। ইহার গোড়া হইতে ৪।৫ বৎসর পর্য্যন্ত সমপরিমাণ আখ জন্মে। ইহা সরু হইলেও, সংখ্যায় বেশী হয় বলিয়া, প্রতিবিঘার খাড়ি-ইক্ষু হইতেও ২৫।২৬ মণ ভাল গুড় পাওয়া যায়। ইহার চিনিও উপরোক্ত পরিমাণে ও ভাল হয়। কিন্তু অত্যন্ত কঠিন ত্বক বলিয়া, ইহা কলে মাড়িতে অধিক পরিশ্রম লাগে। তদ্ভিন্ন, শুক্‌না পাতা আখের গা জড়াইয়া রহে বলিয়া, উহা কাটিয়া পরিষ্কার করিতে অধিক ব্যয় ও পরিশ্রম করিতে হয়। একজন লোক দৈনিক ৮ ঘণ্টা খাটিয়াও ৩২/০ মণের অধিক আখ কাটিতে ও কর্ত্তিত ইক্ষু পরিষ্কার করিতে পারে না। আমার কলে অন্যান্য জাতীয় ইক্ষু হইতে দৈনিক ৫০/০ মণ রস বাহির হয়; কিন্তু খাড়ি আখের মাত্র ২৫/০ মণ রস বাহির করিতে পারা যায়। আখ কাটিবার পর, উহা পরিষ্কার করা এবং মাড়িয়া লওয়া—এই উভয় কার্য্যেই বিশেষ অসুবিধা রহিয়াছে সত্য, কিন্তু তথাপি, খাড়িকেও ভাল জাতীয় আখ বলা যায়।

অন্যান্য যে সকল জাতির চাষ আমি ছাড়িয়া দিয়াছি, তাহা আসামের কোনও কোনও স্থানে ভালরূপে জন্মিয়া থাকে; এবং জন্মিতেও পারে। কিন্তু সে সকল জাতির বিষয় আমি বিস্তৃতভাবে কিছুই লিখিলাম না। মোটামুটি ভাবে বলিতে গেলে, মগজাতির রস খুব পাতলা হয়; কিন্তু উহার মুড়া (ratoon) হয় না। তেলীর গুড় ভাল হয় না; বিশেষতঃ, উহার ফলনও কম হয়। শামসাড়া ও পাউণ্ডা আখ ভাল; কিন্তু আমার ইক্ষুক্ষেত্রে ৩।৪ হাতের অধিক লম্বা হয় নাই। খাড়ির ন্যায়, দিক্‌চান্দ-জাতীয় আখও কাটিয়া সাফ্ করিতে ও মাড়িয়া রস বাহির করিতে অধিক ব্যয় ও লোকের আবশ্যক হয়। এই নিমিত্ত, খাড়ি ও দিক্‌চান্দ ইক্ষুর চাষও আমি ছাড়িয়া দিয়াছি। মগ ও তেলী—এই দুই জাতীয় ইক্ষুচাষ-প্রথা আসামে বহুকাল যাবতই প্রচলিত রহিয়াছে। আসামী রায়তেরা উহাদেরই চাষ বেশী করিয়া থাকে। আসামবাসী নেপালী কৃষকেরা কলাপুরা ও বগাপুরা—এই দুই জাতীয় আখের চাষ করে। মগ ও তেলী জাতীয় ইক্ষুতে ধসাধরা-রোগ জন্মে না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই দুই জাতি আসামের নিজস্ব সম্পত্তি। তেলীজাতির মুড়ার আখ তিনবৎসর পর্য্যন্ত জন্মে; এবং জমি অধিক সারবান্ না হইলেও, উহার ফলন একপ্রকার মন্দ হয় না। তেলী-আখের গুড় ভাল

হয়; কিন্তু চিনি তত পরিষ্কার হয় না; বিশেষতঃ পরিমাণেও কম হইয়া থাকে। কলাপুরা ও বগাপুরা জাতীয় আখের চাষও রায়তেরা করিয়া থাকে; কিন্তু তাহা অধিক নহে। কেহ কেহ, মগ ও তেলীর সঙ্গে, ২৷১ কাঠা জমিতে উক্ত প্রকার ইক্ষুর চাষ করে। প্রায় ২৪ বৎসর পূর্ব্বে, আমি একবার জনৈক কৃষকের ইক্ষুক্ষেত্রে প্রায় অর্দ্ধকাঠা জমিতে বগাপুরা-জাতীয় আখ দেখিয়াছিলাম; এবং আমি তাহাকে অতিরিক্ত মূল্য দিয়া, তাহার সমস্ত আখ গোড়াসমেত কাটিয়া আনিয়াছিলাম। এই গুলি খণ্ডীকৃতভাবে আমার ইক্ষুক্ষেত্রে রোপণ করিয়াছিলাম। উহা হইতেই ক্রমে ক্রমে আমার ইক্ষুক্ষেত্রে বগাপুরা-জাতীয় ইক্ষুচাষ বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে; এবং এই দীর্ঘকালের মধ্যে এ অঞ্চলেরও প্রায় সর্ব্বত্রই বগাপুরা-ইক্ষুচাষ-প্রথা প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে। বলা বাহুল্য, আমিই প্রথমতঃ এ অঞ্চলের কৃষকদিগকে বগাপুরা-ইক্ষুর ডগা দিয়াছিলাম; এবং উহা হইতেই চাষের বিস্তার ঘটিয়াছে। আমি কলাপুরা-জাতির চাষে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বেই, উহা অনেক কৃষকের ক্ষেত্রে ছিল।

আমার গুড়-প্রস্তুত-প্রণালী—প্রথমতঃ, ২৷৩ বৎসর, আমি দেশীয় পিত্তলনির্ম্মিত গোল কড়াতে রস জ্বাল দিয়া গুড় করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহাতে বিশেষ সুবিধা না হওয়াতে, তৎপর সাহাবাদের বিহিয়ার থম্‌সন্ মিলনী কোম্পানীর (Thomson & Mylne & Co) লৌহনির্ম্মিত অগভীর কড়া ব্যবহার করিয়াছিলাম। এই কড়া গুড়-প্রস্তুত করিবার পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী; এবং ইহার এক চার্জ্জে আধ মণ গুড় হয়। থম্‌সন্ মিলনী কোম্পানীর কড়াতে রস দিয়া, প্রথমতঃ খুব চড়া জ্বাল দেওয়া আবশ্যক; ইহাতে রসের গাঁদ উপরে উঠিলে, ছিদ্রযুক্ত হাতা দ্বারা গাঁদ কাটিয়া ফেলিতে হয়। তৎপর আরও অগ্নি চড়াইয়া দিয়া রস গাঢ় করা আবশ্যক। রস গাঢ় হইয়া আসিলে, আগুন ক্রমশঃ কমাইয়া দিতে হইবে। নচেৎ, গাঢ়-অবস্থাপ্রাপ্ত রসে অধিক উত্তাপ লাগিলে গুড় জ্বলিয়া যাইতে (পোড়া লাগিতে) পারে। হাত দিয়া দেখিলে, যখন ক্ষণকালমধ্যেই রস কঠিন হইয়া যায়, এবং দুই আঙ্গুল দিয়া ঘষিলে যখন শুকাইয়া শাদা ধূলিবৎ হইয়া পড়ে, তখনই গুড় প্রস্তুত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। গুড় প্রস্তুত হইবামাত্রই, উহা কড়াসমেত চুলা হইতে নামাইয়া কিছুক্ষণ কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা নাড়িলে, উহা ক্রমেই ঠাণ্ডা হইয়া যায় ও ঘন হইয়া উঠে। তখন উহা কলসীতে ভরিয়া কিংবা 'ধিমা করিয়া' (মাটিতে গর্ত্ত খনন করিয়া, প্রথমতঃ তদুপরি বস্ত্রখণ্ড বিস্তৃত করিতে, এবং তৎপর কাপড়ের উপর গুড় ঢালিয়া দিতে হইবে। ইহাকেই ধিমা করা কহে; এবং ইহাতে যে গুড় প্রস্তুত হয়, তাহা ধিমা-গুড় নামে অভিহিত হয়।) রাখিয়া দিলেই বিক্রয়োপযোগী গুড় প্রস্তুত হইল। ইক্ষু কাটিবার পর যত শীঘ্র সম্ভব আখ মাড়িয়া রস জ্বাল দিতে হয়। ইহাতে অধিক বিলম্ব ঘটিলে, রসে লালীর ভাগ অধিক হইয়া পড়ে; সুতরাং তাহাতে গুড় শুষ্ক অথবা ভাল হয় না। ঐরূপ রসে চিনি তৈয়ারি করিলেও, চিনি কম ও রাবের লালী অধিক হয়। এক্ষণ আমি হাদি সাহেবের 'Boiling plant'এ গুড় করি। হাদির প্রক্রিয়ায় চিনি তৈয়ারি করিবার নিমিত্ত যেপ্রকারে রস পাক করিতে হয়, গুড়ের জন্যও ঠিক সেই প্রকারেই রস জ্বাল দেওয়া আবশ্যক। তবে পার্থক্য এই যে,—চিনির রাব প্রস্তুত করিতে হইলে যেমন ঢ্যাঁড়স্ (রামঝিঙ্গা) বা শিমুলগাছের ছালের রস ও সোডা মিশ্রিত জল দিয়া গাঁদ কাটা আবশ্যক, গুড়ের জন্য গাঁদ কাটিতে সে সকল অনাবশ্যক। এমন কি, জল দেওয়ারও বড় আবশ্যক হয় না। কেবল রস জ্বাল দিয়া গাঁদ কাটিলেই ভাল গুড় হইয়া থাকে। পাক করা রস কিছুক্ষণ নাড়িয়া লইলেই গুড় প্রস্তুত হয়।

আমার চাষের জমি—আমি প্রথমাবস্থায় কি পরিমাণ জমি লইয়া ও কিরূপে কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলাম, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এক্ষণ আমার প্রায় দুই হাজার পাঁচশত বিঘা জমি হইয়াছে। এতন্মধ্যে, ৯০০ বিঘা ধানচাষের উপযোগী নিম্নভূমি (low land); সুতরাং উহাতে ইক্ষুচাষ করিতে পারা যায় না। প্রায় ৪০০ বিঘা অসমতল ভূমি; বহুব্যয় করিয়া সমতল করিয়া লইতে পারিলে, তাহাতে ধান্যচাষ চলিতে পারে।

'special cultivation' বা কোনও বিশেষশস্যের চাষের জন্য ৩০ বৎসর ম্যাদে ৩০০ বিঘা জমি গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ম্যাদী বন্দোবস্ত লইয়াছি। উহাতে সাধারণ-কৃষি করিতে গভর্ণমেণ্ট দেন না। আমি 'special cultivation' করিবার জন্য আয়োজন করিতেছি। বাকী প্রায় ৯০০ বিঘা ভূমি ইক্ষুচাষের উপযোগী। এক্ষণ আমি প্রত্যেকবৎসর প্রায় ২৫০ বিঘা জমিতে ইক্ষুচাষ করিয়া থাকি। সুবিধারকমে আখের চাষ করিতে হইলে, যে পরিমাণ জমিতে ইক্ষুচাষ করা হয়, উহার চতুর্গুণ জমির আবশ্যক; অর্থাৎ বৎসর বৎসর একবিঘা জমিতে ইক্ষুচাষ করিতে হইলে মোট চারি বিঘা জমি থাকা চাই। তবে একবৎসর মুড়ার আখ (ratoon cane) রাখিয়া এবং পর্য্যায়ক্রমে জমির উন্নতির জন্য কাঁচাসার ও অন্যান্য সার ব্যবহার করিয়া, জমির উৎপাদিকা-শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিলে জমির পরিমাণ কম হইলেও চলে। কুলী-মজুরের ও জমির অভাববশতঃ, আমি আর ইক্ষুচাষ বাড়াইতে পারিতেছি না। নচেৎ, ভগবৎ কৃপায় আমার এক্ষণ আর মূলধনের অভাব নাই। যে প্রকার দিনকাল পড়িয়াছে, তাহাতে আসামে জমি সংগ্রহ করা আমার পক্ষে একপ্রকার অসাধ্য হইয়াছে। সুতরাং আমি আমার কৃষিক্ষেত্রের জমির পরিমাণ আর বৃদ্ধি করিতে বড় চেষ্টাও করি না।

আয়-ব্যয়—আমি একমাত্র ইক্ষু ভিন্ন অন্য কোনও শস্যেরই চাষ করি না। আমার কৃষিক্ষেত্রে ধানচাষের উপযুক্ত জমি যাহা আছে, তাহাতে আমার কুলী-মজুরেরা ধানের চাষ করিয়া থাকে। ইক্ষুর অনেক শত্রু আছে। এতন্মধ্যে, কতকগুলি উহার রোগ এবং কতকগুলি বহিঃশত্রু। বন্যশূকর, শজারু, বাঁদর, শৃগাল, টিয়া-পাখী এবং অন্যান্য ২৷৩ রকম পক্ষী প্রভৃতি ইক্ষুর বহিঃশত্রুগুলির সকলই, অল্পাধিকপরিমাণে, আমার এখানে রহিয়াছে। তদ্ভিন্ন, চোরের উপদ্রব ত সকলসময়েই এবং সকল অবস্থাতেই অর্থাৎ চিনি 'গুদামজাত'না হওয়া পর্য্যন্ত আছে। বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করা এবং ইক্ষুক্ষেত্রে চৌকি দেওয়ার বন্দোবস্ত করা ভিন্ন, উক্ত সকলপ্রকার বহিঃশত্রুর উপদ্রব হইতে ইক্ষু রক্ষা করিবার অন্য কোনও উপায় নাই। কোনও বৎসর হয়ত আখের ডগা রোপণের পর ক্রমাগত ২৷১ মাস পর্য্যন্ত বৃষ্টির অভাবে অনেক গাছ মরিয়া যায়। আবার কোনও বৎসর হয়ত জলের অভাবে কিংবা সময়মত পাইটের ও 'কোরের' (কোদালি দ্বারা কোবাইবার নাম কোর) অভাবে, ক্ষেত্রে অত্যধিকপরিমাণে আগাছা জন্মে; এবং উহারা ইক্ষুর সতেজবৃদ্ধি স্থগিত রাখে। কোনও বৎসর হয়ত ধসাধরা (Red rot) প্রভৃতি রোগের উপদ্রবে ইক্ষুগুলি যথোচিত বর্দ্ধিত ও সুপুষ্ট হয় না। এই সব নানা কারণে, উৎপন্নের পরিমাণ সকল বৎসর একপ্রকার হইতে পারে না। সুতরাং লাভ-লোকশানও সকল বৎসর সমান হয় না;—কোনও বৎসর বেশী ও কোনও বৎসর কম হইয়া থাকে। ইক্ষু ভালরূপে জন্মিলে কোনও কোনও বৎসর বিঘাপ্রতি ২৫/০ হইতে ৩০/০ মণ গুড় পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু তথাপি, গড়পরতা হিসাবে প্রতিবৎসরে ২০/০ মণের অধিক ধরা যায় না। আমার ইক্ষুক্ষেত্রে, বিঘাপ্রতি ব্যয়বাদে, যাহা লাভ হয়, তাহার একবৎসরের মোটামুটি হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল:—

বিঘাপ্রতি ৫০/০ মণ পচা গোবর-সার দিয়া—

উৎপন্ন			টাকা
রাব (গুড়) — ২২/৷৷২৶০			
এই রাব হইতে	৯/১৸৶০	১নং চিনি	৯২৸৶৬
	১/১২৷৷০	২নং চিনি	৬৷৷/০
	৮/৫৸৶০	লালী	২৪৷৵৯
		মোট আয় —	১২৩৸৶৩ পাই
		মোট ব্যয় —	৬৯৸৶৬ "
		নেট লাভ =	৫৪—০—৯ পাই

গোময়সার (৫০/০) সংগ্রহের ব্যয় ৭৷৯ পাই খরচের মধ্যে ধরা হইয়াছে।

একবিঘা জমিতে ১২/॥০ সরিষার খৈল দিয়া—

উৎপন্ন			টাকা
রাব (গুড়) —২৪/।•			
এই রাব হইতে	৯/দ১।৵•	১নং চিনি	৯৭৸৶৬ পাই
	১/।৭।•	২নং চিনি	৭৶৬ „
	৮/দ৬	লালী	২৬॥৵৯ „
		মোট আয়	১৩১॥৵৯ পাই
		মোট খরচ	৯৩৸৯ „
		নেট লাভ	=৩৭৸৶• আনা।

সরিষার খৈলের মূল্য ২৮৸৶৩ পাই খরচের মধ্যে ধরা হইয়াছে। খৈল ব্যবহার করাতে উৎপন্নের পরিমাণ প্রায় ১॥৮ সের বাড়িয়াছিল সত্য; কিন্তু খৈলের মূল্য অধিক বলিয়া, ব্যয়ের পরিমাণ অত্যধিক হওয়াতে, লাভের পরিমাণ বড় কম হইয়াছে।

ডোরাদার মরিশাস্ ও বগাপুরা জাতীয় ইক্ষু হইতেই আমি উক্তরূপ লাভ পাইয়াছিলাম। কলের ভাড়া ও ম্যানেজারের বেতন ব্যতীত, অন্যান্য সকলপ্রকার ব্যয়ই ধরা হইয়াছে। ইক্ষুক্ষেত্রে গোময়সার ব্যবহার করিতে পারিলেই অধিক লাভ হয়; কিন্তু অধিক পরিমাণে গোবর পাওয়া যায় না। এই জন্যই গোবরের সহিত মিশ্রিতভাবে সরিষার খৈল ব্যবহার না করিলে চলে না। সেজন্য ইক্ষুচাষে. খরচ বাদে, প্রতিবিঘায় গড়ে ৪০৲ টাকা হিসাবেই লাভ ধরা উচিত মনে করি। বলা বাহুল্য, লাভের পরিমাণ কিছু কম করিয়াই ধরা হইল। ইক্ষুচাষে জমি যেরূপ নিঃস্ব (অনেকাংশে সারশূন্য) হইয়া পড়ে, অন্য কোনও শস্যের চাষেই সেরূপ নিঃস্ব হয় না। বস্তুতঃ, আখের গাছ দ্বারা অত্যধিক পরিমাণেই মৃত্তিকান্থিত সারপদার্থ গৃহীত হইয়া থাকে। এজন্য একই জমিতে ক্রমাগত ইক্ষুচাষ করিতে হইলে, ক্রমশঃ—বৎসরের পর বৎসর, কিছু কিছু অধিক পরিমাণ সার ব্যবহার করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। এই অতিরিক্ত সার ব্যবহার করাতে. লাভের পরিমাণ কিছু কম হইতে পারে সত্য, কিন্তু তথাপি, বাষ্প-পরিচালিত ইক্ষু-নিষ্পেশন-যন্ত্র(Steam power cane mill) দ্বারা আখ মাড়াইলে, লাভের পরিমাণ, গড়ে বিঘাপ্রতি ৪০৲ টাকার কম হইবে না।

আমার কৃষিক্ষেত্রে প্রায় ২০০ জন চুক্তিবদ্ধ (act XIII agreement) কুলী আছে। কিন্তু এ সব কুলী দ্বারা ভালরূপে কাজ চলে না। সুতরাং, কাজের সময় ঠিকা কুলীরও বন্দোবস্ত করিতে হয়। যে বৎসর ঠিকা (বাহিরের) কুলী পাই না, সে বৎসর আমার কাজ ভাল হয় না। সময়ের কাজ সময়ে সমাধা করিতে না পারিলে লোকশান অনিবার্য্য। যাহা হউক, আবশ্যকমত জমি সংগ্রহ করিয়া, তাহাতে একমাত্র আখের চাষ করিতে পারিলেও বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দে জীবিকানির্ব্বাহ করা যায়। আখের চাষ বেশ লাভজনক।

নানা কথা—বিস্তৃতভাবে ইক্ষুচাষ করিতে হইলে, আবশ্যকানুযায়ী কল-কারখানা স্থাপন করা আবশ্যক। প্রথমতঃ জমিসংগ্রহ করিয়া লইতে হইবে। স্মরণ রাখিতে হইবে, যে পরিমাণ জমিতে ইক্ষুচাষ করিতে হইবে, তাহার চতুর্গুণ জমি থাকা চাই। আবশ্যকমত জমি সংগ্রহ না করিয়াই, বহুঅর্থব্যয় করিয়া কল ক্রয় করিলে, লাভ হওয়া দূরে থাকুক, বরং বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্তই হইতে হয়। অধিকন্তু, উহাতে নানাপ্রকার অসুবিধাও রহিয়াছে। আজকাল ভারতবর্ষের মধ্যে বিহার, মান্দ্রাজ ও বোম্বে প্রভৃতি স্থানে বিস্তৃতভাবে ইক্ষুচাষ চলিতেছে; এবং উক্ত স্থানসমূহে চিনির অনেক কল-কারখানাও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যুক্ত প্রদেশের (United Province) গভর্ণমেণ্ট জনৈক শর্করাতত্ত্ববিদ্ ইঞ্জিনিয়ার আনয়ন করিয়া. তাঁহার সাহায্যে চিনির কলের ও চিনির উন্নতিসাধনের নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। ফলে, তথায় অনেকবিষয়েই উন্নতি ঘটিয়াছে। বিস্তৃতভাবে ইক্ষুচাষ এবং কল-কারখানা স্থাপন করিবার পূর্ব্বে, বিহার, মান্দ্রাজ প্রভৃতি স্থানে গিয়া ইক্ষুক্ষেত্র ও কল-কারখানা সন্দর্শন করিয়া আসিয়া একটা কিছু করা ভাল।

আখ মাড়িবার জন্য বাষ্পচালিত যন্ত্র (Steam cane mill) আবশ্যক। উহা এগার 'রলারের' (roller) খুব

ভাল হয়। ছয়টি রলারের কল মধ্যম; এবং তিনটি রলারের কল নিকৃষ্ট। সাধারণ আখমাড়া-কলেই তিনটী পেষণ-দণ্ড (roller) রহে। পেষণ-দণ্ডের সংখ্যা যত অধিক হয়, ততই উহা দ্বারা উত্তমরূপে ইক্ষু নিষ্পেষিত হইয়া থাকে। ফলে, রসের পরিমাণও অধিক হয়। ১০০/ মণ ইক্ষুতে ৯০/০ মণ রস, আর ১০/০ মাত্র ছোব্ড়া (refuse) রহে। এগারটি পেষণদণ্ডযুক্ত কল দ্বারা ইক্ষু হইতে ৮২/০ মণ রসই বাহির করিয়া লওয়া যায়। কিন্তু ছয়টি পেষণদণ্ড দ্বারা ৭৫/০ মণের এবং তিনটির দ্বারা ৬৫/০ মণের অধিক রস বাহির করিতে পারা যায় না। ইহা বিশেষ অভিজ্ঞদিগেরই অভিমত। সুতরাং উপেক্ষণীয় নহে। ইক্ষু-বিশেষে (খড়ি-আখের ন্যায় কঠিন ত্বক হইলে) আরও কম রস বাহির হয়। অর্থব্যয় করিয়া কল করিতে হইলে, যে কলে অত্যধিকপরিমাণে রস নির্গত হয়, তদ্রূপ কল ক্রয় করাই কর্ত্তব্য। ছোব্ড়ার সহিত যে রস রহে, উহা ছোব্ড়ার সঙ্গেই ফেলিয়া দিতে হয়। সুতরাং ছোব্ড়া হইতে যত অধিক পরিমাণ রস বাহির করিয়া লইতে পারা যায়, ততই লাভ। পেষণদণ্ড বড় হইলেও, উহার চাপে বেশী রস বাহির হয়। বিহারের 'অথর ফেক্টরি'তে আমি যে ছয়টি পেষণদণ্ডযুক্ত আখমাড়া-কল দেখিয়াছিলাম, উহার প্রত্যেকটীর ব্যাস কিঞ্চিদধিক পাঁচ ফুট। এরূপ ব্যাস-বিশিষ্ট পেষণদণ্ড দ্বারাও উত্তমরূপে ইক্ষু-নিষ্পেষণ-কার্য্য চলে। আজকাল চৌদ্দ রলারের কল পাওয়া যায়।

বাষ্পোত্তাপে (Steam heat) রস পাক করাই সুবিধা-জনক। তদ্ভিন্ন, রস উঠাইবার জন্য পাম্পের (pump) আবশ্যক। ইহাতে খরচও কম হয়, অথচ রস পড়িয়া গিয়া লোকশানও হয় না। এতদ্ব্যতীত, আরও কতকগুলি আনুষঙ্গিক কল আনয়ন করিয়া লইতে পারিলেও বিশেষ সুবিধাই হয়। চিনি প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত 'Centrifugal machine and pug mill' না হইলেই চলে না। 'Open air steam-pan'এর পরিবর্ত্তে 'Triple effect Vacuum pan'এ রস পাক করাই বিশেষ সুবিধাজনক। কোনও কল ক্রয় করিবার পূর্ব্বে, চিনির কারখানায় গিয়া, উহার কার্য্যশক্তি সন্দর্শন করা এবং বিলাতের কোনও চিনির কলনির্ম্মাতার (Sugar machinery maker) নিকট পত্র লিখিয়া, তাঁহার অভিমত ও মূল্যাদির বিষয় অবগত হওয়া কর্ত্তব্য। এক্ষণ চিনি দুর্ম্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়াতে, অনেক শিক্ষিত ভদ্রসন্তানেরই বিস্তৃতভাবে ইক্ষুচাষ এবং কল-কারখানা স্থাপন করিয়া চিনি প্রস্তুত করিতে ইচ্ছা জন্মিয়াছে। এইজন্যই আমি কল-কারখানা-সম্বন্ধে যতটুকু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহাই সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণন করিলাম। বলা বাহুল্য, যাঁহারা অত্যল্পপরিমাণ স্থানে ইক্ষুচাষ করিবেন, তাঁহাদের অধিক মূল্যের কলের কোনও প্রয়োজন হয় না। অত্যল্পপরিমাণ জমিতে ইক্ষুচাষ করিলে, টমশন্ মিলনী অথবা বরণ কোম্পানীর আখমাড়া-কল ক্রয় করিলেই হইবে। এই সকল বলদপরিচালিত অল্পমূল্যের আখমাড়া-কলেও পেষণকার্য্য বেশ চলে। টমশন্ মিলনী অথবা বরণ কোম্পানীর কল দেশীয় আখমাড়া-কলেরই রূপান্তরমাত্র। দেশী কল কাষ্ঠনির্ম্মিত, আর ঐ সকল কল লৌহে প্রস্তুত হয়;—এই যা প্রভেদ। উক্ত কলের কোনও একটীতে আখ মাড়িয়া, সেই রসে দেশীয় প্রণালীতে গুড়-প্রস্তুত করিয়া লওয়াই সুবিধাজনক। অত্যধিকপরিমাণে গুড় প্রস্তুত করিতে না পারিলে, চিনির কারখানা করা বিড়ম্বনা মাত্র। সুতরাং, বিস্তৃতভাবে ইক্ষুচাষ করিতে না পারিলে, চিনির কারখানায় লাভ হইতে পারে না। যাঁহারা সহর-বন্দরের নিকট অত্যল্পপরিমাণ জমিতে ইক্ষুচাষ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা চিবাইয়া খাইবার উপযোগী ভাল জাতীয় ইক্ষুরই চাষ করিবেন। কারণ, ঐ সকল ইক্ষু শতকরা হিসাবে বিক্রয় করিতে পারিলে, ব্যয় বাদেও, প্রতি বিঘায় যথেষ্ট (অন্যূন শতাধিক টাকা) লাভ হইতে পারে। গুড় প্রস্তুত করিলে, ইহার অর্দ্ধেক টাকাও লাভ করা যায় না।

আমাদের দেশে যেপ্রকার বৃষ্টি হয়, তাহাতে সকল সময় ইক্ষুক্ষেত্রে জলসেচন করা অনাবশ্যক। তবে ডগা রোপণ করিবার পর, আবশ্যকমত অন্ততঃ ২।৩ বার জলসেচন করিতেই হয়। অল্প বৃষ্টি হইয়াছে দেখিয়া ('যো' বুঝিয়া), ডগা রোপণ করা হইল; কিন্তু তৎপর

ক্রমাগত হয়ত ২০।২৫ দিন পর্য্যন্ত একবারও বৃষ্টি হইল না। এইরূপ অবস্থা ঘটিলে রোপিত ডগাগুলি শুকাইয়া যায়; —চারা জন্মিতে পারে না। সুতরাং, তদবস্থায় আবশ্যকানুযায়ী জলসেচন করিতেই হইবে। কখনও কখনও রোপণকালে কিছুদিন পর্য্যন্ত অনাবৃষ্টি হইয়া থাকে। তৎকালে, বৃষ্টির জলের আশায় আকাশের দিকে চাহিয়া দিন কাটাইতে হয়। এই আশায় থাকিয়া, কোন কোন সময়, রোপণের প্রকৃষ্টকাল (বৈশাখমাস) অতিবাহিত হইয়া যায়। তৎপর বিলম্বে রোপণ করাতে হয়ত ইক্ষুগুলি যথোচিতরূপে বর্দ্ধিত হইতে পারে না। ইহাতে, ফলনও কম হয়। এইরূপ অবস্থা ঘটিলে জলসেচন করিতে হয়। বৈশাখ মাসে অনাবৃষ্টি হইলেও, তৎকালেই ডগা রোপণ করিতে হইবে। জলসেচনের বন্দোবস্ত রহিলে, এবং আবশ্যক মত জলসেচন করিতে পারিলে, ইচ্ছামত সকলসময়েই ইক্ষু রোপণ করিতে পারা যায়। চারার নীচে শিকড় বাহির হইয়া, উহা মাটিতে বসিয়া গেলে, এবং উহার উপরে 'গাজানী' (অঙ্কুর) বাহির হইলে, সে আখ আর সহজে মরে না। সুতরাং, তৎপূর্ব্বসময় পর্য্যন্ত আবশ্যক-অনুরূপ জলসেচন করা চাই। তৎপর বৃষ্টির জলই ইক্ষুর সংবর্দ্ধন ও পরিপোষণের পক্ষে যথেষ্ট হইয়া থাকে। জল দেওয়ার সুবিধা রহিলে, মাঘ-ফাল্গুন মাস হইতে আরম্ভ করিয়া, জ্যৈষ্ঠের শেষ পর্য্যন্ত, পুরাতন জমিতে, ইক্ষু রোপণ করিতে পারা যায়। বৃষ্টির জলের আশায় আকাশের দিকে তাকাইয়া রহিলে, রোপণের উপযুক্ত সময় অতিবাহিত হইয়া যায়। বিশেষতঃ, উহাতে নানাপ্রকার পাইটেরও নিতান্ত অসুবিধা হয়। কলসী ভরিয়া জল নিয়া, উহা প্রত্যেক গাছের গোড়ায় দেওয়া নিতান্ত ব্যয়সাধ্য ও অসুবিধাজনক। সেজন্য ঝরণা, নদী, বিল, খাল, পুষ্করিণী অথবা কূপ প্রভৃতি জলাশয় হইতে পাম্প দিয়া ক্ষেত্রে জল দেওয়ার সুবিধা করিয়া লইতে পারিলেই ভাল হয়; এবং বিস্তৃতভাবে ইক্ষুচাষ করিতে হইলে, জলসেচনের ঐরূপ বন্দোবস্তই করিতে হইবে। সার ও জল—এই দুইটীর উপরই ইক্ষুচাষে সাফল্যলাভ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। সার ও জলকে ইক্ষুর জীবন বলা যায়।

অনেক বৎসরের অনাবাদী দো-আঁশ জঙ্গল জমিতে বিনা সারেও ক্রমাগত ৩।৪ বৎসর পর্য্যন্ত ভালরূপে ইক্ষু জন্মে। সুবিধা থাকিলে, এপ্রকার জমির বন্দোবস্ত লইয়াই ইক্ষুচাষ আরম্ভ করা ভাল। কারণ, উক্তরূপ জমিতে প্রথমতঃ ৩।৪ বৎসর পর্য্যন্ত সার লাগে না, আর চাষের ব্যয়ও কম হইয়া থাকে। যে পতিত জমিতে বৃক্ষাদির পরিবর্ত্তে উলুখড়, ঘাস প্রভৃতি জন্মে, তদ্রূপ নিস্তেজ ভূমিতে ইক্ষুচাষ করিতে হইলে, প্রথমাবধিই সার দিতে এবং উহাতে পুরাতন জমির ন্যায় সকল কার্য্য করিতে হয়।

ইক্ষুদণ্ড স্থূল করিবার ইচ্ছা হইলে, আখের সারি, তিন ফুট ব্যবধানে না করিয়া, চারি কিংবা পাঁচ ফুট ব্যবধানেই করা আবশ্যক। তদ্ভিন্ন, দুই ফুট কি আড়াই ফুট ব্যবধানে ডগা রোপণ করিতে হয়; এবং প্রত্যেক ঝাড়ে ৫।৬টী তেজাল চারা রাখিয়া, বাকী নিস্তেজ ও ছোট চারাগুলি কাটিয়া ফেলিতে হইবে। আখগাছগুলি পাতাসমেত ২৩ ফুট উচ্চ হইয়া উঠিলেই, উক্ত সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়। ইহাতে ফলনের পরিমাণ কম হয় না। কারণ, সংখ্যার অভাব স্থূলত্বের দ্বারাই পূরণ হইয়া থাকে।

আখ পাতলা হইলে ও পড়িয়া না গেলে, তন্মধ্যে অবাধে রৌদ্র ও বাতাস প্রবেশ করিতে পারে। ইহাতে ইক্ষুরস কিছু গাঢ় হয়; অর্থাৎ উহাতে জলের ভাগ কম রহে। পক্ষান্তরে, ঝাড়ের আখ ঘন হইলে ও উহা পড়িয়া গেলে, তন্মধ্যে রৌদ্র ও বাতাস সহজে প্রবেশ করিতে পারে না। সে জন্য রসে জলের ভাগ অধিক হয়। রসে জলের ভাগ অধিক হইলে, উহা থাইতেও তত মিষ্ট হয় না, আর উহা পাক করিতে অধিক সময় লাগে ও খরচ বেশী হয়। গাঢ় রস শীঘ্র পাক হয় বলিয়া, ঐ রসে গুড়ও ভাল হইয়া থাকে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঘন ও পাতলা উভয় প্রকার ইক্ষুর ফলনই প্রায় একরূপ হয়। সুতরাং, ইক্ষু ঘন করিলে, উহাতে লাভ না হইয়া, ক্ষতিই হইয়া থাকে। বিশেষতঃ, ভাল গুড় প্রস্তুত করিতে হইলে, ঝাড়ের ইক্ষু যাহাতে ঘনসন্নিবিষ্ট না হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

আখ মাটিতে পড়িয়া গেলে, উহার গাঁইট হইতে শিকড় বাহির হয়। তদবস্থায় সেই ইক্ষু দ্বারা ভাল গুড় বা

চিনি প্রস্তুত করা একপ্রকার অসাধ্য হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ, উক্তরূপ শিকড়সংযুক্ত ইক্ষু পরিষ্কার করিয়া লইয়া কলে মাড়াইতে খরচও বেশী হয়। এই সব নানা কারণে, যাহাতে ঝাড়ের আখ খুব লম্বা হইয়া পড়িয়া না যায়, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

যে ক্ষেত্রে প্রথমবৎসর ইক্ষু (plant cane) খুব উচ্চ ও ভাল হয়, সে ক্ষেত্রে দ্বিতীয়বৎসর মুড়ার আখ (ratoon cane) তত ভাল হয় না। কারণ, মৃত্তিকার অধঃকাংশ সারই প্রথমবৎসর ব্যয়িত হইয়া যায়। প্রথম বৎসরে অধিক পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ করিতে পারাতেই ইক্ষু খুব উচ্চ ও ভাল হইয়া থাকে। সুতরাং, দ্বিতীয় বৎসরে খাদ্যাভাব অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। তবে প্রথম বৎসর ইক্ষু কর্ত্তন করিবার পর, ক্ষেত্র-পোড়াইয়া ও কোদাল দ্বারা কোবাইয়া দিলে, এবং ঝাড়ের প্রত্যেক গাছের গোড়ায় অধিক পরিমাণ সার (গোবর কিম্বা খৈল) দিতে পারিলে ও যে সকল স্থানে গাছের অভাব রহিয়াছে, সেই সকল খালি স্থানে ডগা রোপণ করিলে, দ্বিতীয় বৎসরের ফলনও প্রথমবৎসরেরই ন্যায় হইতে পারে। আমি মুড়ার আখের সকল জমিতেই সার দিতে পারি না বা দেই না; যে সকল জমি নিস্তেজ বলিয়া বুঝিতে পারি, কেবল সেই সকল জমিতেই সার ব্যবহার করি। প্রথম এবং দ্বিতীয় বৎসরের ইক্ষুর অগ্রভাগ একহাত পরিমাণ কাটিয়া নিয়া, তাহাই রোপণ করিতে হয়। প্রত্যেকটি আগা খণ্ড খণ্ড (প্রত্যেক খণ্ডে তিনটী করিয়া গাঁইট রহিবে।) করিয়া কাটিয়া, তাহার এক এক খণ্ডই ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হইবে। তৃতীয় বৎসরের (যদি তৃতীয় বৎসরেরও মুড়ার আখ হয়) ইক্ষুর অগ্রভাগ রোপণের নিমিত্ত ব্যবহার করা ভাল নহে। কারণ, উহাতে যে আখ হয়, তাহাতে ফুল ধরে ও ডগা হয় না। বিশেষতঃ, সেই সকল ইক্ষুও তত উচ্চ হয় না।

যথোচিত পাইট করিতে পারিলে এবং গাছের গোড়ায় সার দিলে, ডোরাদার মরিশাস্, বি ৩৭৬ ও কলাপুরা—এই তিনজাতীয় ভাল আখের গোড়া হইতে ক্রমাগত তিনবৎসর পর্য্যন্ত ইক্ষু জন্মিয়া থাকে। এই সকল ইক্ষুর ফলন প্রথম ও দ্বিতীয় বৎসর প্রায় সমান থাকে; তবে তৃতীয়বৎসরে কিছু কম হয়। খড়ি ও তেলী—এই দুই জাতীয় আখের গোড়া হইতে ক্রমান্বয়ে পাঁচ ও চারি বৎসর পর্য্যন্ত ইক্ষু জন্মে। আমি কোনও আখের গোড়া বা মুড়া দুইবৎসরের বেশী রাখি না। কারণ, এতদপেক্ষাও অধিক সময় রাখিলে, মৃত্তিকার উৎপাদিকা-শক্তি অত্যধিকরূপে কমিয়া যায়। বিশেষতঃ, ঐরূপ নিস্তেজ জমির ইক্ষুতে ধসাধরা-রোগের প্রাদুর্ভাব কিছু অধিক হইয়া থাকে।

একই ক্ষেত্রে বৎসর বৎসর ইক্ষুচাষ না করিয়া, ইক্ষুর সহিত পর্য্যায়ক্রমে মুগ, মাটকলাই, অড়হর, সরিষা এবং কাঁচাসারের নিমিত্ত ধইঞ্চা চাষ করিতে পারিলে জমির বিশেষ উপকার সাধিত হয়। ফলে, ইক্ষুচাষে অনেক কম সার দিলেও চলে।

আসামের জমি অত্যন্ত উর্ব্বরা বলিয়া সর্ব্ববিধ কৃষির পক্ষেই বিশেষ উপযোগী। কিন্তু নানাকারণে, আসামের জমির বন্দোবস্ত লওয়া বড়ই দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। আসামে অনাবাদী জমির প্রচুরতা দেখিয়া, বিদেশীয় লোকেরা বলিয়া থাকেন,—"আসামীরা কাণিখোর ও অলস।" কিন্তু বস্তুতঃ, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। উৎসাহ ও সুবিধা পাইলে, আসামীরা সকল কাজেই করিতে পারে। আসামে জমি সংগ্রহ করা পূর্ব্বে কষ্টকর ছিল না; সুতরাং তৎকালে, যাঁহারা অল্প জমি বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াও, তাহাতে চা-বাগান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলেই সাহেবদের ন্যায় লাভবান হইতে পারিয়াছেন। কিন্তু এক্ষণ জমির বন্দোবস্ত লওয়া কষ্টকর ও বহুব্যয়সাধ্য হইয়া পড়িয়াছে বলিয়াই, বলবতী বাসনাসত্ত্বেও, অনেকে বিস্তৃতভাবে চাষ-বাস করিতে পারিতেছেন না। শিক্ষিত ভদ্রসন্তানের চাষ-বাসে প্রবৃত্ত হওয়া বিড়ম্বনা মাত্র বলিয়া যাঁহারা মনে করেন, তাঁহারা একবার আমার কৃষি-জীবনের কথা স্মরণ করিবেন। চাষার নেশা লইয়া চাষ-বাসে প্রবৃত্ত হইলে, আমার মত সকলেই যে সুখ-স্বচ্ছন্দে জীবিকানির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইবেন, তাহা আমি নিঃসন্দেহেই বলিতে পারি।

শ্রীদেবেশ্বর গোস্বামী।

খেজুরের চাষ।

[কালিফর্ণিয়া ইউনিভার্সিটীর বার্কলী-কৃষি-কলেজের
শ্রীযুক্ত নিরুপমচন্দ্র গুহ মহাশয়ের লিখিত।]

আরবী-গ্রন্থে খেজুর 'জীবন' আখ্যায় অভিহিত হইয়াছে; এবং মনুষ্যের ন্যায়, খেজুরের উপকারিতা, পুং ও স্ত্রী জাতির প্রভেদ প্রভৃতি উল্লেখ করিয়া, উহাকে মনুষ্যের সঙ্গেই তুলনা করা হইয়াছে। খেজুর আরবদেশের একটি প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য; এবং উহাই তদ্দেশবাসীর জীবিকানির্ব্বাহের প্রধান অবলম্বন। আরবদেশের অনেক লোক একমাত্র খেজুর ভক্ষণ করিয়াই জীবনধারণ করে। সুতরাং খেজুরকে জীবন বলা অসঙ্গত হয় নাই। কোনও বৎসর আয়র্লণ্ডে প্রচুর পরিমাণে আলুর ফলন না হইলে, তথায় যেমন দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, ভারতে যেমন ধান্য ও গম না জন্মিলে দুর্ভিক্ষের প্রসার ঘটে, তদ্রূপ আরবদেশে প্রচুর পরিমাণে খেজুর উৎপন্ন না হইলেও, তথায় দুর্ভিক্ষের প্রকোপ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। আমরা যেমন আম্র, কদলী প্রভৃতি উৎকৃষ্ট ফল দুগ্ধের সহিত ভক্ষণ করিয়া বিশেষ তৃপ্তি-বোধ করি, আরববাসীরাও সেইরূপ দুগ্ধের সহিত খেজুর ভক্ষণ করিতে পারিলে বিশেষ প্রীত হয়।

খর্জ্জুর একটি সুখাদ্য ও উপাদেয় ফল। রূপে, গুণে, গন্ধে, স্বাদে এবং মধুরতায়—সর্ব্ববিষয়েই খেজুরকে অতি উৎকৃষ্ট ফল বলা যায়। পৃথিবীতে খুব কম জাতীয় লোকেই খেজুর অপছন্দ করে। পাশ্চাত্য-দেশে খেজুরের ব্যবহার দিন দিনই বাড়িতেছে; উহারা ক্রমেই অত্যন্ত-খর্জ্জুর-প্রিয় হইয়া উঠিতেছে। খেজুরের চাষের প্রতিও তদ্দেশবাসীর মনোযোগ আকর্ষিত হইয়াছে। যাহাতে অপর দেশ হইতে আমদানী না করিয়াও, অর্থাৎ পরমুখাপেক্ষী না হইয়াও, আবশ্যকানুযায়ী খেজুর পাইতে পারে, তদুদ্দেশ্যে পাশ্চাত্য-দেশের নানাস্থানেই খেজুরের চাষ-পরীক্ষা চলিতেছে। অত্যল্পকালমধ্যেই আমেরিকার কোনও কোনও স্থানবাসীরা খেজুরের চাষে যৎকিঞ্চিৎ সফলতালাভেও সমর্থ হইয়াছে। আমাদের দেশের লোকের ন্যায়, পাশ্চাত্য-দেশবাসীরা উদ্যোগবিহীন ও 'দো-মনা' হইয়া কোনও কার্য্য আরম্ভ করে না; এবং যাহাতে একবার হস্তক্ষেপ করিবে, তাহারও শেষ না দেখিয়া ছাড়ে না। এইরূপ অধ্যবসায়ের ফলেই, দুঃসাধ্য কার্য্যেও তাহারা সাফল্যলাভ করিতে পারে। সকল কার্য্যই প্রারম্ভের সময় বিশেষ কষ্টকর হইয়া থাকে; এবং কোনও কার্য্য—বিশেষতঃ কৃষি-কার্য্য, আরম্ভ করা মাত্রই লাভজনক হইতে পারে না। (১) বহুদর্শিতার অভাব এবং (২) এ দেশের মৃত্তিকা ও আবহাওয়া আরবদেশের মৃত্তিকা ও আবহাওয়া হইতে সম্পূর্ণ পৃথক—প্রধনতঃ, এই দুইটি কারণেই, আমেরিকায় যাহারা খেজুরের চাষে প্রবৃত্ত রহিয়াছে, তাহাদের প্রথমাবস্থায় অনেক লোকশান হইয়াছিল। কিন্তু কএকবৎসর চাষ-পরীক্ষা করিবার পরই, উহাদের খেজুরের চাষে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা জন্মিল; পক্ষান্তরে, আরবদেশীয় খেজুরের বীজোৎপন্ন চারাগুলিও নূতন স্থানের আবহাওয়া সহ্য করিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িল। ফলে, আরবদেশীয় খেজুরের গাছ আমেরিকার মৃত্তিকা ও আবহাওয়ায় সতেজে বর্দ্ধিত হইয়াও ফলপ্রসূ হইতেছে। এমন কি, সম্পূর্ণ নূতন স্থানে আসিয়াও, চাষার ও চাষের গুণে, উহারা স্বাভাবিক বা আদি জন্মস্থান হইতেও অধিকসংখ্যক ফলধারণ করিতেছে। এক্ষণ আমেরিকার অনেকস্থানেই খেজুরের চাষ বিশেষ লাভজনক হইয়া উঠিয়াছে। কালিফর্ণিয়া ও আরিজেনশার কৃষকেরা প্রতি একার ভূমিতে বার্ষিক প্রায় এক হাজার ডলার অর্থাৎ তিন হাজার টাকার খেজুর উৎপন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছে।

ভারতের কোনও কোনও স্থানে আরবদেশীয় খেজুরের চাষ বিশেষ লাভজনক হইবার সম্ভবনা রহিয়াছে। সাহারাণপুর-বাগানের রিপোর্টে প্রকাশ, তথায় বহুপ্রকারের খেজুরগাছের ফলনই বিশেষ সন্তোষজনক হইয়াছে। উক্ত সরকারী বাগানের কর্ত্তৃপক্ষগণ সিন্ধুদেশ ও পাঞ্জাবের মরু-প্রদেশ খেজুরচাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী বলিয়া মত-প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত স্থানসমূহে বহুপ্রকার খেজুর-গাছই যে যথোচিতরূপে বর্দ্ধিত হইয়া উৎকৃষ্ট ফল প্রদান করিতেছে, রিপোর্টে তাহারও উল্লেখ দৃষ্ট হয়। সুতরাং, পাঞ্জাবের মরু-প্রদেশ ও সিন্ধুদেশে বোধ হয় আয়াসেই উৎকৃষ্ট জাতীয় খেজুরের চাষ চলিতে পারে।

পরীক্ষার ফলে প্রমাণিত হইয়াছে যে, খর্জ্জুরবৃক্ষ অতি সহজেই বিভিন্ন দেশের মৃত্তিকা ও জল-বায়ুর উপযোগী হইয়া উঠে। ফলে, অতিশয় ঠাণ্ডা বায়ুতে কিম্বা অত্যন্ত উষ্ণ উত্তাপেও খর্জ্জুরবৃক্ষ জীবনধারণ করিতে পারে। সুতরাং, যত্ন করিতে পারিলে, এ দেশের অনেক স্থানেই খেজুরের চাষ লাভজনক হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। খেজুরের চাষ-প্রণালী তত কঠিন নহে সত্য, কিন্তু তথাপি, কাহারও আরবদেশীয় খেজুরের চাষ করিতে ইচ্ছা হইলে, প্রথমতঃ তৎসম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা লাভ করা আবশ্যক। কারণ, তাহা না হইলে, প্রথমাবস্থায় নানা প্রকারের বিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারে। সাহারাণপুর-বাগানের কর্ত্তৃপক্ষদিগের নিকট পত্র লিখিলে, তাঁহারা খেজুরের চাষসম্বন্ধে তাঁহাদের অভিজ্ঞতার বিষয় জানিতে দিবেন। প্রথমশিক্ষার্থীর পক্ষে, উহাই অনেক কাজে লাগিবে।

বঙ্গদেশে খেজুরগাছ বাঙ্গালীর অপরিচিত নহে। খেজুরগাছের রস হইতে যে অতি উপাদেয় গুড় ও চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহাও সকলেই অবগত আছেন। এই সকল খেজুরগাছেও ফল জন্মে। কিন্তু উহা অতি নিকৃষ্ট। আমি উৎকৃষ্ট জাতীয় খেজুরের কথাই লিখিতেছি। আমাদের দেশী খেজুরগাছে জলসেচন করিবার বড় আবশ্যক হয় না। কিন্তু উৎকৃষ্ট জাতীয় খেজুরের চাষে জলসেচন অত্যাবশ্যক। খেজুর জল-প্রিয়-বৃক্ষ; সুতরাং কোনও শুষ্কভূমিতে খেজুরের চাষ-পরীক্ষা করিতে হইলে, প্রথমেই তাহাতে জলসেচনের বন্দোবস্ত করিতে হইবে। পারস্যদেশীয় অনেক বড় বড় খেজুরের বাগিচায় পারস্যোপসাগরের স্রোতজল সেচন করা হয়। সুপ্রসিদ্ধ নাদিম পাশার খেজুর-বাগানের মৃত্তিকা সরস বলিয়া, সেখানে কোনরূপ জলসেচনের বন্দোবস্ত নাই। ঐ বাগিচায় কুড়ি হাজারেরও অধিকসংখ্যক খর্জ্জুরবৃক্ষ বর্ত্তমান রহিয়াছে।

ব্যবসায়ের হিসাবে, ফলবান বৃক্ষের চাষ করিতে হইলে, অত্যুৎকৃষ্ট ও সর্ব্বসাধারণের আদৃত জাতিরই চারা রোপণ করা কর্ত্তব্য। তদ্ভিন্ন, যাহাতে রোপিত বৃক্ষের ফল নিকৃষ্ট হইয়া পড়িতে না পারে, তৎপ্রতিও বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন করিতে না পারিলে, কোনও ফলের ব্যবসায়ই বিশেষ লাভজনক হইতে পারে না। আমাদের এখন বিদেশে রপ্তানি করিবার উদ্দেশ্যে অর্থাৎ ব্যবসায়ের হিসাবে, বিস্তৃতভাবে খেজুরের চাষ করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। কারণ, আমাদের নিজের দেশেই ইহার বিশেষ অভাব রহিয়াছে। আমাদের দেশের ধনী-নির্ধন সকলেই সকলসময় খেজুর ব্যবহার করিতে পারে না। প্রতিবৎসর হাজার হাজার মণ খেজুর, বিভিন্ন দেশ হইতে, আমাদের দেশে আমদানী করা হইতেছে সত্য, কিন্তু মূল্য অধিক বলিয়া, গরিবের কথা দূরে থাকুক, এ দেশের ধনীসন্তানেরাও সকলসময়ে ও প্রচুর পরিমাণে খেজুর ভক্ষণ করিতে সমর্থ হ'ন না। এমতাবস্থায় আমরা যাহাতে আমাদের দেশের খেজুরের অভাব দূর করিতে পারি, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াই আমাদিগকে প্রথমতঃ সামান্যভাবেই খেজুরের চাষ-পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। বিদেশে রপ্তানি করিবার উদ্দেশ্য লইয়া, কোনও নূতন শস্য কিংবা বিদেশীয় ফলবান্‌বৃক্ষের চাষ করিতে যাওয়া অর্ব্বাচীনের কার্য্য। সুতরাং, প্রথমতঃ সাধারণ-ভাবেই খেজুরচাষের ফলাফল পরীক্ষা করিতে হইবে; এবং তৎপর, পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক হইলে পর, উহার চাষ বিস্তৃতভাবে করিলেও ক্ষতি হইবে না।

জনসমাজে অধিকপরিমাণে খেজুরের ব্যবহার-প্রথা প্রচলিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ, ইহাতে পুষ্টিকর ও শরীরবর্দ্ধক প্রায় সকল পদার্থই বর্ত্তমান রহিয়াছে। আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান-দেশে অধিকপরিমাণে মাংসাদি পুষ্টিকর খাদ্য ব্যবহার করিলে, তাহাতে অহিত ঘটিবারই বিলক্ষণ সম্ভাবনা। এমতাবস্থায় বিশেষ পুষ্টিকর খেজুরফলের প্রচলন যতই অধিক হইবে, ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল। রাসায়নিকপরীক্ষার ফলে জানা গিয়াছে যে, খেজুরে নিম্নলিখিত সারপদার্থগুলি বর্ত্তমান রহিয়াছে :—

কার্ব্বো হাইড্রেট্ (Carbo hydrates)	৭০.৬
প্রোটিন (Protein)	১.৯
তৈলাক্ত পদার্থ (Fat)	২.৫
জল (Water)	১৩.৮
জনিজপদার্থ (Mineral matter)	১.২
অনাবশ্যকীয় পদার্থ (Refuse)	১০.০
মোট =	১০০

কার্ব্বোহাইড্রেট্ অথবা শর্করাজাতীয় পদার্থ শরীরের পুষ্টিবর্দ্ধনের পক্ষে বিশেষ আবশ্যক। ইহাতে চর্ব্বি ও মাংস বৃদ্ধি, শরীরের উত্তাপরক্ষা এবং স্ফূর্ত্তি ও বল সঞ্চার করিয়া, মানুষের কর্ম্মশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখে। এই পদার্থের অভাবে শরীর কৃশ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, কর্ম্মশক্তির হ্রাস ঘটে এবং শরীরের উত্তাপ কমিয়া যায়। ফলে, জীবমাত্রেই মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। যাহারা কার্ব্বোহাইড্রেট্-প্রধান খাদ্য অধিক পরিমাণে ব্যবহার করে, তাহারাই কষ্টসহিষ্ণু, ধৈর্য্যশীল ও পরিশ্রমী হইয়া থাকে। 'প্রোটিন্'ও, শরীরের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয়। শরীরের পরিবর্দ্ধন ও পুষ্টিসাধনের পক্ষে যে সকল পদার্থ আবশ্যক, তন্মধ্যে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান। কিন্তু কোনও প্রকার খাদ্যদ্রব্যের মধ্যেই অধিকপরিমাণে প্রোটিন্ রহে না। যে সকল খাদ্যদ্রব্যে ইহার পরিমাণ কিঞ্চিৎ অধিক, উহাই বিশেষ পুষ্টিকর খাদ্য। সুতরাং, উহার মূল্যও অধিক। এই পদার্থটির অভাবে, কোন ব্যক্তিই সবল হইয়া জীবিত রহিতে পারে না। ইহাতে শক্তি বৃদ্ধি করে; এবং ধারণা-শক্তির উত্তেজনা, করিয়া, মস্তিষ্কচালনা করিবার শক্তি বাড়াইয়া দেয়। যাঁহারা মস্তিষ্কচালনার কার্য্যে সংলিপ্ত রহিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে এই পদার্থের অধিক প্রয়োজন। ইহাতে হাড়ের মজ্জা বৃদ্ধি করিয়া, শরীরে শক্তিসঞ্চার করে।

তৈলাক্ত-পদার্থ (Fat) হইতে শরীরের চর্ব্বি বর্দ্ধিত হয়। জীবনরক্ষার জন্য উহা বিশেষ প্রয়োজনীয়। অধিক দিন উপবাস করিলে মনুষ্যমাত্রেরই দেহ কৃশ হইয়া যায়। ইহার কারণ এই যে, কোনও প্রকার খাদ্য হইতে শরীর-রক্ষণোপযোগী পদার্থ সংগৃহীত না হওয়াতে, শরীরাভ্যন্তরস্থ চর্ব্বি হইতেই শরীর-রক্ষার কার্য্য চলিতে থাকে। ইহাতে শরীরের চর্ব্বির হ্রাস ঘটে ; ফলে, ক্রমশঃই শরীর শুষ্ক হইতে থাকে। চর্ব্বি দ্বারা শরীরের উত্তাপও রক্ষিত হয়। অধিক দিবস উপবাস রহিলে, শরীরের অধিকাংশ চর্ব্বিই ব্যয়িত হইয়া যায় ; ফলে, শরীরের উত্তাপেরও ক্রমশঃই হ্রাস ঘটে। ইহার অনিবার্য্য ফল—মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। শরীর-রক্ষার পক্ষে, জলের প্রয়োজনীয়তা কি, তাহা কাহারও অজ্ঞাত নহে। জলের অভাবে কোনও উদ্ভিদ কিংবা জীব-জন্তু যে জীবন ধারণ করিতে পারে না, তাহাও সকলেই অবগত আছেন। পৃথিবীতে এমন কোনও পদার্থ নাই, যাহাতে জলের অভাব রহিয়াছে। তবে কোনও পদার্থে জলের ভাগ অধিক, আর কোনও পদার্থে উহা নামমাত্র। অসাধারণ শক্তিশালীব্যক্তির—যে আপনার অসাধারণ শক্তির নিমিত্ত জনসমাজে বিশেষ আদৃত হইয়া, অহঙ্কারে বক্ষস্ফীত করিয়া চলিতেছে—শরীরটা বিশ্লেষণ করিলে, তাহার অধিকাংশই জল দেখিতে পাইব। প্রাণীমাত্রেরই দেহ জলে ভরা। সুতরাং শরীর-রক্ষার পক্ষে, খাদ্যের ন্যায়, জলেরও প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। খনিজপদার্থ হইতে জীবদেহের অস্থি বর্দ্ধিত হয়। ইহা পৃথিবীস্থ প্রায় সকল পদার্থেই অল্পাধিক পরিমাণে বর্ত্তমান। খনিজ-পদার্থের অভাবে কোনও উদ্ভিদ বাঁচিতে পারে না। উদ্ভিদেরা মৃত্তিকা হইতেই উহা গ্রহণ করিয়া থাকে। উদ্ভিদ. হইতেই জীবদেহে খনিজপদার্থ গৃহীত হয়। আবার, ইহা জীবশরীর কিংবা উদ্ভিদ হইতেই মৃত্তিকায় সঞ্চিত হইয়া থাকে। অনাবশ্যকীয় পদার্থও (refuse) শরীর-রক্ষার জন্য আবশ্যক। ইহার অভাবেও জীবনধারণ করা অসম্ভব। পাকস্থালী পূর্ণ করিবার নিমিত্ত অনেক পদার্থেরই দরকার হয়। অনাবশ্যক পদার্থ দ্বারা এই প্রয়োজন সাধিত হইয়া থাকে। শরীরের পুষ্টিসাধন ও পরিবর্দ্ধনের উপযোগী আবশ্যকীয় পদার্থ দ্বারা পাকস্থালা পূর্ণ করা যাইতে পারে না। কারণ, ঐ সকল পদার্থ আবশ্যকাতিরিক্ত পাকস্থালাতে প্রবেশ করিলে বিষরূপে পরিণত হইয়া, জীবনরক্ষার পরিবর্ত্তে. জীবননাশেরই কারণ হইয়া থাকে। এইজন্য অনাবশ্যকীয় পদার্থ দ্বারাই পাকস্থালা পূরণ করা হয়। উহা মলরূপে বাহির হইয়া যায়। শরীরের পরিবর্দ্ধন ও পুষ্টিসাধনের উপযোগী প্রায় সকল পদার্থই খেজুরে বর্ত্তমান রহিয়াছে ; এবং পরিমাণেও ঐ সকল পদার্থ কম নহে। তবে প্রোটিনের অংশ কিছু কম রহিলেও, উহা যে অবস্থায় বর্ত্তমান, তাহাতে অতি সহজেই গৃহীত হইতে পারে। খেজুর-চাষ লিখিতে বসিয়া, উহার গুণসম্বন্ধে, অপ্রাসঙ্গিক হইলেও, এত কথা লিখিবার তাৎপর্য্য এই যে, এ দেশের

শিক্ষিত ভদ্রসন্তানের মধ্যে যাঁহারা চাষ-বাসে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের খেজুর-চাষের প্রতি বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করা। কারণ, এ দেশে খেজুরের চাষ হওয়া সর্ব্বথাই বাঞ্ছনীয়।

সাধারণতঃ, প্রায় সকল উদ্ভিদই বীজ দ্বারা বংশবৃদ্ধি করিয়া থাকে। বীজোৎপন্ন বৃক্ষে অনেকসময়েই উৎকৃষ্ট ফল জন্মে না। খেজুরসম্বন্ধেও এ কথা খাটে। আরবের অনেক স্থানে এবং মেক্সিকো প্রভৃতি দেশে খেজুরের বীজ হইতেই চারা উৎপন্ন করা হয়। কিন্তু বীজোৎপন্ন বৃক্ষে, মাতৃবৃক্ষের অনুরূপ, উৎকৃষ্ট বা একপ্রকার ফল জন্মে না। তদ্ভিন্ন, বীজোৎপন্ন খেজুরচারার মধ্যে পুং ও স্ত্রী জাতীয় অর্থাৎ উভয়প্রকার বৃক্ষই জন্মে। বৃক্ষে ফুল না ধরিলে, উহার কোনটী পুং-জাতীয় এবং কোনটী স্ত্রী-জাতীয়, তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব। সুতরাং, বীজোৎপন্ন চারা রোপণ করিলে, যদি পুং-জাতীয় বৃক্ষই অধিকসংখ্যক হইয়া পড়ে, তবে উহার ২।৪টি রাখিতে এবং অবশিষ্টগুলি, অনাবশ্যক বলিয়া, কাটিয়া ফেলিতে হয়। ইহাতে খেজুরের চাষ লাভজনক হয় না। সাহারাণপুর-বাগানের রিপোর্টে প্রকাশ, আমাদের দেশে বীজোৎপন্ন বৃক্ষে উৎকৃষ্ট ফল জন্মে না। উৎকৃষ্ট জাতীয় খেজুরের বীজোৎপন্ন বৃক্ষে, অনেকসময়, আমাদের দেশের জঙ্গলা-খেজুরের (এই সকল গাছের রসেই গুড় প্রস্তুত করা হয়।) ন্যায় নিকৃষ্ট ফল জন্মিয়া থাকে। খেজুর, নারিকেল, তাল প্রভৃতি তালজাতীয় কোনও বৃক্ষেরই যে কলম হয় না, তাহা বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন। খেজুরগাছের কলম না হইলেও, গাছের গোড়ার পুঁথী বা ফেকরী (off shoot) দ্বারা বংশবৃদ্ধি করা যায়। সাধারণতঃ, যে বৃক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল ফল ধরে, সেই বৃক্ষের গোড়া হইতেই, সংখ্যাবৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত, পুঁথী সংগ্রহ করা হয়। এক একটী খেজুরগাছে অনেক পুঁথী জন্মে। সাধারণতঃ, বসন্তকালেই খেজুরের পুঁথী রোপণ করা হয় ; এবং উহাই রোপণের পক্ষে প্রশস্তকাল। মৃত্তিকায় যথোচিত উষ্ণতা রহিলে, চারাগাছগুলি শীঘ্র শীঘ্র ও তেজের সহিত বর্দ্ধিত হয়। পুঁথীর চারাগাছ ২।৩ বৎসরের বড় হইলেই ফলপ্রদ হইয়া থাকে। স্বাভাবিক জন্মস্থান ব্যতীত, অন্যত্র রোপিত পুঁথীর ২।৩ বৎসরের গাছে ফল ধরিবে কিনা সন্দেহ। তাহা না হইলেও, পুঁথীর-গাছ রোপণ করাই কর্ত্তব্য।

আরবদেশের স্ত্রী-জাতীয় খেজুরগাছের ফুলের গর্ভাধান (Pollenation) সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক। কারণ, ইহার উপরই ফলোৎপত্তি সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকে। জল, বায়ু ও কীট-পতঙ্গ প্রভৃতির সাহায্যেই অনেক বৃক্ষের ফুলের গর্ভাধান-কার্য্য সাধিত হয় ; অর্থাৎ গর্ভাধানকার্য্যে মনুষ্যের সাহায্য আবশ্যক হয় না। কিন্তু মনুষ্যের সাহায্য ব্যতীত খেজুর-ফুলের গর্ভাধান কার্য্য সহজে ও শীঘ্র সম্পন্ন হয় না। মনুষ্যের সাহায্য ব্যতীত খেজুরের চারাগাছ ফলপ্রদ হইতে পারে না। তবে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইলে, অর্থাৎ গাছগুলি খুব বড় হইয়া উঠিলে, মনুষ্যের সাহায্য ভিন্নও, তাহাতে ফল জন্মিতে পারে। কিন্তু উহা দীর্ঘকালসাপেক্ষ ; বিশেষতঃ, খেজুরগাছে ফল জন্মিবে কিনা, তাহাও অনিশ্চিত। এই সব নানা কারণে, মনুষ্যের সাহায্যেই স্ত্রী-জাতীয় খেজুরগাছের ফুলের গর্ভাধান-কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। আরবে একটি কিংবদন্তী প্রচলিত রহিয়াছে যে, একবৎসর তথাকার মোল্লাগণ প্রচার করিয়াছিলেন ;—"ভগবানের কার্য্যে মনুষ্যের হস্তক্ষেপ করা অন্যায় ; সুতরাং যাহারা খেজুর-ফুলের গর্ভাধান-কার্য্যে নিযুক্ত রহিবে, তাহাদিগকে শাস্তিভোগ করিতে হইবে।" এইরূপ মতপ্রচারের ফলে, কেহই খেজুর-ফুলের গর্ভসঞ্চার করিতে মনোযোগী হয় নাই। ইহাতে আরবে বিষম দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। এই কিংবদন্তী সত্য কিনা বলা যায় না ; তবে আরবদেশে যে মনুষ্যের সাহায্যেই খেজুর-ফুলের গর্ভাধান-কার্য্য সাধিত হয়, তাহা সত্য। বস্তুতঃ, কীট-পতঙ্গ, বায়ু প্রভৃতির উপর নির্ভর করিয়া রহিলে, খাদ্যাভাবে (খেজুরের অভাবে) যে আরবদেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইতে পারে, তাহাও সুনিশ্চিত।

খাজুরের ফুল পূর্ণাবস্থাপ্রাপ্ত হওয়ার পর, পুং-ফুলগুলিকে ছড়াসমেত কাটিয়া আনিয়া, অতি সাবধানে ফুলের খোসা

ছাড়াইয়া রাখা হয়। তৎপর, পুং-ফুলের রেণুগুলি পূর্ণাবস্থা-প্রাপ্ত হইলে পর, ঐ ফুলটী স্ত্রী-ফুলের উপরিভাগে পত্রের সহিত বান্ধিয়া রাখিতে হইবে। ইহাতে পুং ও স্ত্রী ফুলের সঙ্গমক্রিয়া সহজেই সুসাধিত হইয়া থাকে; ফলে, ফুলগুলিও ফলে পরিণত হইয়া থাকে। একশত গাছের স্ত্রী-ফুলের গর্ভধারণের নিমিত্ত মাত্র তিনটি কি চারিটি পুং-ফুলের বৃক্ষের প্রয়োজন হয়। ফুলের গর্ভধারণই খেজুরচাষের সর্ব্বাপেক্ষা মুস্কিলের বিষয়; এবং ইহার উপরই ভাবী ফলন সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া থাকে। পুং-ফুলের পুষ্পরেণুর পূর্ণতা বুঝিতে হইলেও যৎকিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা থাকা চাই। তবে উহাও তত কঠিন কার্য্য নহে; অভিজ্ঞব্যক্তির কার্য্যে একটুকু বিশেষ দৃষ্টি রাখিলেই, তাহা শিক্ষা করা যাইতে পারে। পরীক্ষা করিবার একটী কৌশল আরবদেশবাসীরা অবগত আছে। উহারা পুং-ফুলের খোসার গোড়ায় অঙ্গুলির দ্বারা আস্তে আস্তে টিপিলে যদি কর্ কর্ আওয়াজ হয়, তাহা হইলেই উহা পূর্ণাবস্থাপ্রাপ্ত বলিয়া গৃহীত হয়। ঐ সকল পুং-ফুলের রেণু একবৎসর পর্য্যন্ত সজীব রহে বলিয়া, প্রত্যেক আরববাসীই উহা পরবর্ত্তীবৎসরের জন্যও সাবধানতার সহিত রক্ষা করে। কোনরূপ দৈবদুর্ব্বিপাকে পুং-ফুল সংগ্রহ করিতে না পারিলে, অথবা আবশ্যকানুযায়ী পুং-ফুল না জন্মিলে, উহারা স্ত্রী-ফুলের গর্ভধারণের জন্য একবৎসরের রক্ষিত ফুলরেণু অন্যবৎসরেও ব্যবহার করে।

অনেকেরই বিশ্বাস, একমাত্র স্ত্রী-ফুলের দোষগুণেই খেজুরের ভাল অথবা মন্দ ফলন হয়। ইহা সর্ব্বাংশেই সত্য বলা যায় না। অনেক সময় দেখা গিয়াছে, অনেক পুং-ফুলের দ্বারা ভালরূপে গর্ভাধান কার্য্য না হওয়াতেই অত্যন্ত নিকৃষ্ট ফল জন্মে। আবার অনেক পুং-ফুলরেণু এমন সুপুষ্ট ও শক্তিসম্পন্ন যে, তদ্দারা সুন্দররূপে গর্ভাধান-কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে; ইহাতে ফলগুলি সুপুষ্ট ও অত্যুৎকৃষ্ট হয়। ঐরূপ পুং-বৃক্ষের দ্বারা এক হাজার স্ত্রী-ফুলধারী বৃক্ষোৎপন্ন ফুলের গর্ভাধান-কার্য্য চলিতে পারে। অনেক সময় পুং ও স্ত্রী—এই উভয়বিধ ফুলই একবৃক্ষে জন্মিতে দেখা যায়। কিন্তু উহা অতি বিরল। পুং-ফুল ও স্ত্রী ফুল একবৃক্ষে জন্মিলে, উহার স্বতঃই গর্ভাধান-কার্য্য সাধিত হয়। সুতরাং, তদবস্থায় মনুষ্যের সাহায্য অনাবশ্যক।

খেজুরের চারা-রোপণ-প্রণালী ও পাইট প্রভৃতি আমাদের দেশের জঙ্গলা-খেজুর চাষের ন্যায়। আবশ্যকমত সময় সময় জলসেচন করা ভিন্ন, খেজুরের চাষে অন্য কোনরূপ পাইটের বড় আবশ্যক হয় না। আমাদের দেশের জঙ্গলা-খেজুরের চাষ যে প্রণালীতে করিতে হয়; আরবদেশের উৎকৃষ্ট জাতীয় খেজুরের চাষ-প্রণালীও তদনুরূপ। সুতরাং, তদ্বিষয়ে বিস্তৃতভাবে লিখিয়া, প্রবন্ধের কলেবর বৰ্দ্ধিত করা অনাবশ্যক মনে করি।

আমার এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া, কেহ মনে করিবেন না যে, উৎকৃষ্ট জাতীয় খেজুরের চাষ করিতে পারিলেই বহু অর্থলাভ করিতে পারিবেন। ইহাতে হঠাৎ বড়লোক হইবার কিছুই নাই। দীর্ঘকাল ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া রহিতে পারিলে, খেজুরের চাষ-পরীক্ষায় সুফললাভের সম্ভাবনা। আরবদেশীয় খেজুরকে এ দেশের নিজস্ব অর্থাৎ জলবায়ুসহ করিয়া লইতে পারিলে, এ দেশের অত্যুৎকৃষ্ট ফলের তালিকায় আরও একটি নূতন ফলের সংখ্যা বৰ্দ্ধিত হইতে পারে মনে করিয়াই, খেজুরের চাষ-সম্বন্ধে, সংক্ষিপ্তভাবে, কএকটী কথা লিখিলাম। এ সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আরও অনেক কথা লিখিবার রহিল।

শ্রীনিরুপমচন্দ্র গুহ।

1st Form Printed at the Sontosh Press, 2nd Form Printed at the Kashi Printing Works and the rest Printed by Jatindra Mohan Das at the Wari Printing Works, Dacca and published by Nishi Kanta Ghosh at the Krishi-Sampada office, 66, Narinda Dacca.

গভর্ণমেণ্ট বোর্ড পাঠশালার শিক্ষক মহোদয়দিগের প্রতি—

ঢাকা সিটি লাইব্রেরীর নিম্নলিখিত বহি কয়েকখানি নিম্ন প্রাইমারী ও উচ্চ প্রাইমারী পাঠশালার গভর্ণমেণ্ট পাঠ্য ও অনুমোদিত। গণিত সোপানের পরিবর্ত্তে এইবার ক্লাশ থ্রি এবং ফোর এ যে কয়েকখানি অঙ্কের বহি গভর্ণমেণ্ট বোর্ড পাঠশালার জন্য পাঠ্য করিয়াছেন, তন্মধ্যে ক্লাশ থ্রিতে বাবু পরেশনাথ বসু এম, এস-সি কৃত গণিত-কুসুম—মূল্য ।৶০ এবং ক্লাশ থ্রি এবং ফোরএ **গণিতবিকাশ** প্রথমভাগ—মূল্য ।৶০ আছে পাঠ্য আছে। এই দুইখানা অঙ্কের বহি সম্পূর্ণ নূতন প্রণালীতে লিখিত। আজ পর্য্যন্ত এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও বহু অঙ্কপরিপূর্ণ গণিত পুস্তক কেহ বাহির করিতে পারেন নাই। গুরুমহাশয়দিগের নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁহারা **এই দুইখানি পুস্তক না দেখিয়া অন্য বহি পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট না করেন।**

অন্যান্য বহির বিস্তৃত বিবরণ এই সংখ্যার বিজ্ঞাপনমধ্যে দ্রষ্টব্য। পুস্তকের অর্ডার দেওয়ার সময় কৃষি-সম্পদের নামোল্লেখ করিবেন।

বিনীত নিবেদক—
শ্রীরমনীকান্ত ঘোষ।
ম্যানেজার কৃষি-সম্পদ, ঢাকা।

বেঙ্গল লাইব্রেরী।

(স্বত্বাধিকারী—শ্রীচারুচন্দ্র গুহ)

...হইতে ৫ম সংখ্যা—শ্রীচারুচন্দ্র
...ঐ ষষ্ঠ সংখ্যা—ঐ ।১০
...পুস্তক ১ম হইতে ৬ষ্ঠ সংখ্যা
...চন্দ্র গুহ প্রণীত, প্রতিখণ্ড ⁄১০
...যুক্ত ও অসংযুক্ত বর্ণ) (Ap-
...রুচন্দ্র গুহ প্রণীত, ⁄১০
...াগ—শ্রীহরকান্ত বসু, বি, এ,
... (Approved) ।⁄০
...ঙ্গালা ব্যাকরণ—(৪র্থ হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণীর
...শ্রীসুধাংশুমোহন মিত্র, বি, এ, বি, টি,
...ীত, (Approved) ... ।৶০
...শিক্ষা-প্রণালী— ঐ ।৶০
...-সোপান (নিম্নশ্রেণীর উপযোগী)—
শ্রীপ্যারীলালচক্রবর্ত্তি প্রণীত, (Approved) ৶০
... English Grammar—(৪র্থ হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণীর জন্য)—By Purnachandra Chakerbartty B. A. ... ।৶০
New English Composition & Translation (৪র্থ হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণীর জন্য)—By Anathbandhu Chakerbartty B. A. ।৶০
সাহিত্য-প্রসঙ্গ—শ্রীচারুচন্দ্র গুহ প্রণীত ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণীর জন্য (Approved) ।৶০

Students' Word-Book—শ্রীপ্যারীমোহন দে ।০
New Englih Spelling-Book—A. Ghosh, B. A ৵১০
সচিত্র-শিশুগণিত (অমিশ্র চারি নিয়ম) শ্রীপ্যারীলাল চক্রবর্ত্তি প্রণীত, ৵১০
শুভঙ্করী ও মানসাঙ্ক—শ্রীপ্যারীলাল চক্রবর্ত্তী ৶০
ধারাপাত ঐ ৵১০
সরল ভারত-ইতিহাস (সচিত্র)—শ্রীবীরেন্দ্র-কিশোর গুহ ।৶০
মৌখিক ভারত-ইতিহাস (সচিত্র)—শ্রীবীরেন্দ্র-কিশোর গুহ ৶০
সরল ভূগোল-পরিচয়—শ্রীনীরদচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ।০
সরল মৌখিক ভূগোল ঐ ৶০
আদর্শ ইংরেজী বাঙ্গালা ভূগোল—শ্রীসুধাংশু-মোহন মিত্র, বি, এ, বি, টি, ।০
ঢাকা-দর্পণ (ঢাকা জেলার বিবরণ) (সচিত্র) শ্রীঅতুলচন্দ্র বসু ৵১০
বস্ত্রশিক্ষা (সচিত্র)—শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর গুহ ।⁄০
স্বাস্থ্যশিক্ষা (Approved) ঐ ⁄০
কণ্ঠ-সঙ্গীত—শ্রীঅতুলচন্দ্র বসু ৶০
জ্ঞানোদয়—শ্রীঅতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত ৩য় শ্রেণীর জন্য (Approved) ।৶০

Approved by the Director of Public Instruction.

শ্রীচারুচন্দ্র গুহ প্রণীত

The Concise Anglo-Bengali Dictionary

(সংক্ষিপ্ত ইংরেজী-বাঙ্গালা অভিধান)

বহুসংখ্যক সুবিজ্ঞ লেখকের সহায়তায় এবং বহু অর্থব্যয়ে সম্পাদিত।

প্রায় এক সহস্র চিত্রে সুশোভিত। এরূপ সুন্দর অভিধান এই প্রথম প্রকাশিত হইল।

ইহাতে যাবতীয় ইংরেজী শব্দের যথাযথ উচ্চারণ এবং ইংরেজী ও বাঙ্গালা অর্থ, তৎসঙ্গে সমাসবদ্ধ শব্দ ও বাক্যাংশের (Compound words & Phrases) বাঙ্গালা অর্থ এবং অনুবাদ ও রচনার সহায়তার জন্য প্রত্যেক শব্দের যথেষ্ট উপযুক্ত প্রতিশব্দ দেওয়া হইয়াছে। আকার ক্রাউন ৮পেজী প্রায় ১১০০ (এগার শত) পৃষ্ঠা। সর্ব্বত্র উক্ত প্রশংসিত। নমুনার পৃষ্ঠা ও বিস্তারিত ...র জন্য পত্র লিখুন। মূল্য কাপড়ে বাঁধাই ২১ দুই টাকা মাত্র।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—আমরা বহুঅর্থব্যয়ে সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য এই সুবৃহৎ লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র গুহ ...ের যাবতীয় পুস্তক আমার নিকট উক্ত কমিশনে পাইবেন এবং ইহা ব্যতীত অন্যান্য পাঠ্যপুস্তক, নাটক ... ...বেন। একবার অর্ডার প্রার্থনীয়। মূল্যতালিকার জন্য পত্র লিখুন।

...েন্দ্রনাথ ঘোষ, ম্যানেজার, বেঙ্গল লাইব্রেরী, পাটুয়াটুলী—ঢাকা।

Approved by the Director of Public Instruction, Bengal, for use in Schools

Krishi-Sampada
Vol. VII. No. VII.

একমাত্র কৃষিবিষয়ক মাসিক পত্র।

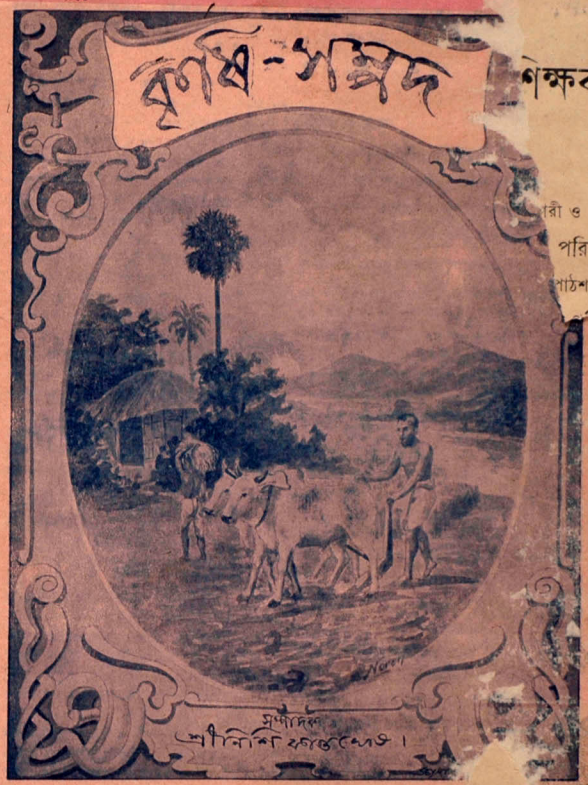

...শিক্ষক

...রী ও উচ্চ
...পরিবর্ত্তে
...পাঠশালার
...তি-

কৃষি-সম্পদ

কৃষি, কৃষি-শিল্প এবং যৌথ ঋণ-দান-সমিতি-
সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নূতন ধরণের সচিত্র মাসিক পত্র।
ইহাতে প্রতি মাসেই ডবল ক্রাউন আট পেজি
৪ ফর্ম্মা অর্থাৎ ৩২ পৃষ্ঠা থাকিবে।
অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩৲ মাত্র।
প্রবন্ধ-সম্পদে অতুলনীয়, চিত্র-সৌন্দর্য্যে
অপূর্ব্ব ও সর্ব্বত্র উচ্চ-প্রশংসিত
বাঙ্গালার কৃষি-বিষয়ক
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও বৃহত্তম পত্র।

লেখক—"কৃষি-সম্পদে" রহিয়াছেন—

আমেরিকা-প্রত্যাগত শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, বি, এ, এম, এস, এ।
" " শ্রীযুক্ত দ্বিজদাস দত্ত এম্, আর, এ, সি,
" " " অনাথবন্ধু সরকার এম্, এ, সি, এস,
" " মিঃ জি, এন, মুখার্জ্জি এম্, এস, সি।
জাপান-প্রত্যাগত শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম্, এ, এস।
" " " রসিকরঞ্জন ঘোষ এম্, এস, এ।
" " " মন্মথনাথ দে " " "
" " " যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, " " "
" " মিঃ এস, এন, বসু এম্, এ, এস।
" " " এ, সি, ঘোষ " " "
" " " এন্, এল, দত্ত " " "
" " " পি, কে, বিশ্বাস পি, এইচ, ডি।
বিলাত-প্রত্যাগত শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস এস, ই
" প্রবোধচন্দ্র দে এফ, আর, এইচ, এস
" ঈশ্বরচন্দ্র গুহ " " " "
" রাজেশ্বর দাসগুপ্ত এম্, আর, এ, এস
" গিরিজানাথ মজুমদার জি,বি,ভি,সি
" অনুকূলচন্দ্র রায়
" হেমচন্দ্র দেব (মেডিকো বোটানিষ্ট)
সহকারী কিসারী আফিসার শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বাগচী বি, এ প্রভৃতি

"কৃষি-সম্পদের" নিয়মাবলী।

১। "কৃষি-সম্পদের" প্রত্যেক সংখ্যা সাধারণতঃ চারি ফর্ম্মা অর্থাৎ ৩২ পৃষ্ঠা পরিমিত হইবে।

২। প্রতি মাসে চারি ফর্ম্মা হিসাবে, বৎসর ৪৮ ফর্ম্মা প্রদত্ত হইবে।

৩। প্রত্যেক সংখ্যাতেই ছবি থাকিবে, কিন্তু প্রবন্ধের প্রকৃতি অনুসারে ছবির সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি হইবে

৪। ইহার বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত সর্ব্বত্র ৩৲ তিন টাকা মাত্র। মূল্য অগ্রিম দেয়।

৫। প্রতি সংখ্যা।৵০ আনা। নমুনারও মূল্য লাগে।

৬। "কৃষি-সম্পদ" প্রত্যেক পূর্ণিমায় বাহির হয়। সুতরাং কোন গ্রাহক "কৃষি-সম্পদ" না পাইলে, কার্য্যাধ্যক্ষকে তাহা জানাইবেন। নচেৎ অপ্রাপ্ত সংখ্যার জন্য, পরে মূল্য ও ডাকমাশুল দিতে হইবে।

৭। বৈশাখী পূর্ণিমায় "কৃষি-সম্পদের" বৎসর আরম্ভ এবং চৈত্র-পূর্ণিমায় বৎসর শেষ। বৎসরের যে কোন সময়ে, "কৃষি-সম্পদের" গ্রাহক হইতে পারা যায়; কিন্তু প্রত্যেক গ্রাহকই ১ম সংখ্যা হইতে "কৃষি-সম্পদ" প্রাপ্ত হইবেন।

৮। অমনোনীত প্রবন্ধাদি ফেরত দেওয়া হয় না।

৯। উত্তরপ্রার্থীগণ রিপ্লাই কার্ড বা ডাক টিকেট পাঠাইয়া দিবেন। বেয়ারিং বা ইন্সাফিসেণ্ট পত্র লওয়া হয় না।

১০। "কৃষি-সম্পদ" সম্বন্ধীয় সমস্ত চিঠি-পত্র, প্রবন্ধ বিনিময়ের সংবাদ-পত্র, টাকা-কড়ি, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি "কৃষি-সম্পদ" পত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত ঘোষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

"কৃষি-সম্পদ" আফিস। } কার্য্যাধ্যক্ষ।
ঢাকা।

বিজ্ঞাপনের হার।

১। "কৃষি-সম্পদে" বিজ্ঞাপন দিতে হইলে, মাসের প্রথমভাগে বিজ্ঞাপন পাঠাইতে হইবে।

২। বিজ্ঞাপনের হার সুলভ। মাসিক প্রতি পৃষ্ঠা ৬৲ টাকা; প্রতি কলম ৪৲ টাকা। অনেক দিনের জন্য চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

৩। চুক্তির হিসাবে অর্দ্ধ এবং সিকি কলম বিজ্ঞাপন লওয়া যায়।

৪। কাভারিংএর তৃতীয় এবং চতুর্থ পৃষ্ঠায়ও বিজ্ঞাপন গৃহীত হইবে। তৃতীয় পৃষ্ঠায় মাসিক ১০৲ এবং চতুর্থ পৃষ্ঠায় ১২৲ টাকা দেয়। বাৎসরিক চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

অন্নং বহু কুর্ব্বীত ॥ তদ্‌ব্রতম্ ॥
তৈত্তিরীয়োপনিষদি ভৃগুবল্লী।

সূচী।

[লেখকদিগের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।]

বিষয়	পত্রাঙ্ক
কৃষি প্রসঙ্গ	১৬৯
হরিদ্রা ... ... —শ্রীহলধর বাবু	১৭১
গোলাপের চাষ ... ... —শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র গুহ এফ্, আর, এইচ্, এস্	১৭৭
কৃষি-শিক্ষা ও গোরক্ষা ... ... —শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র সরকার বি, এল্	১৮০

দ্রষ্টব্য।

কাগজের অভাবে, বলবত বাসনাসত্বেও, আমরা হাফ্‌টোন ছবি ছাপাইতে পারিতেছি না। অগ্রহায়ণের সংখ্যা যন্ত্রস্থ; শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। এই সংখ্যা হইতে আমরা প্রতিমাসে অন্ততঃ একখানি করিয়াও ছবি দিতে বিশেষ চেষ্টা করিব।

কৃষি-প্রসঙ্গ।

কৃষকের উন্নতি—পুষা "এগ্রিকাল্‌চারেল্ রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের" বার্ষিক কার্য্য-বিবরণীতে প্রকাশ, ঐ ইনিষ্টিটিউটে একপ্রকার নূতন যবের চাষ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, সাধারণতঃ দেশীয় যবের চাষে প্রত্যেক একর জমিতে যে পরিমাণ শস্য জন্মে, এই নূতন প্রকারের যবের চাষে তদপেক্ষা ১৫৲ টাকার বেশী জন্মিবে। এই হিসাবে, যুক্তপ্রদেশের (এলাহাবাদ অঞ্চলে) যে পরিমাণ ভূমিতে যবের চাষ হয়, তাহার সকল ভূমিতে ঐ নূতন যবের চাষ করিতে পারিলে, একমাত্র সেই প্রদেশেই যবের ফসল হইতে সাড়ে দশ কোটী টাকা অধিক পাওয়া যাইবে। উক্ত কার্য্য-বিবরণীতে ইহাও বলা হইয়াছে যে, ভারতের উর্ব্বরা-ক্ষেত্রে এক্ষণ যে পরিমাণ শস্যাদি উৎপন্ন হইতেছে, যৎকিঞ্চিৎ উন্নতিসাধন করিতে পারিলেই, তাহার দ্বিগুণ জন্মাইতে পারা যাইবে।

দুগ্ধের ব্যবসায়—আমাদের পুষ্টিকর প্রধান খাদ্য গো-দুগ্ধ। গো-দুগ্ধের বিশুদ্ধিতায় আর আমাদের জীবনী-শক্তিতে একটা অনুপাত আছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সুতরাং, যাহাতে বঙ্গের সর্ব্বত্রই বিশুদ্ধ দুগ্ধ পাওয়া যাইতে পারে, তদুপায় নির্দ্ধারণ করা, আমাদের দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই অবশ্যকর্ত্তব্য। বেশী দিনের কথা নহে,—৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বেও, গো-সেবা গৃহস্থের ব্রত ছিল,—ঘরে ঘরেই বিশেষ যত্নের সহিত গো-পালন করা হইত। তৎকালেও, হিন্দুগণ গো-পালন ধর্ম্ম-জনক কার্য্য মনে করিতেন। ফলে, গো-সেবা গৃহস্থালীর প্রধান অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইত; এবং গোচর্য্যা হিন্দু গৃহস্থের নিত্যকর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত ছিল। অধিকন্তু, গো-গৃহ দেবালয়স্বরূপ ছিল; এবং গোশালা না থাকিলে হিন্দুর ঘর অসম্পূর্ণ বলিয়া কথিত হইত। হিন্দুর সুখ, স্বাস্থ্য ও সম্পত্তি—সকলই যে গরুর উপর নির্ভর করে, এ কথা তৎকালিক হিন্দুমাত্রেই বেশ বুঝিতে পারিতেন। সুতরাং, গোগ্রাস না দিয়া গৃহস্থ কখনও জল-গ্রহণ করিতেন না। ঘরে ঘরে দুগ্ধবতী গাভী বিশেষ যত্নের সহিত প্রতিপালিত হইত বলিয়া, বিশুদ্ধ দুগ্ধের অভাব তখন ছিল না। কোনও উৎসবাদি উপলক্ষ ব্যতীত কাহারও দুগ্ধ ক্রয়ের বড় আবশ্যক হইত না। সে সময়ে দুগ্ধ বিক্রয় করিবার প্রথাও অনেকস্থলেই প্রচলিত ছিল না। কাহারও দশ পাঁচ সের দুগ্ধের আবশ্যক হইলে, গ্রামের দশের নিকট চাহিলেই, তাহা পাওয়া যাইত। ইহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণ দুগ্ধের আবশ্যক হইলে, গোয়ালাদিগকে তাহা জানাইতে হইত। তৎকালে, গৃহস্থ-মাত্রেরই এক একজন নির্দ্দিষ্ট গোয়ালা ছিল; এবং উহারাই, বিবাহাদি উৎসব উপলক্ষে, গৃহস্থের বাড়ী আসিয়া, 'দধি পাতিয়া' দেওয়ার জন্য শত শত মণ দুগ্ধের বায়না লইতেও ইতস্ততঃ করিত না। পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বত্রই এই প্রথা আজিও প্রচলিত রহিয়াছে।

প্রাচীনকালে—৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে, এ দেশে একমাত্র গোয়ালারাই দুগ্ধের ব্যবসায় করিত। তৎকালে, গোয়ালারা গরিব গৃহস্থকে গাভী ক্রয় করিবার জন্য অথবা তাহাদের প্রয়োজনমত একবারে ২০।২৫ হইতে ২।৩ শত পর্য্যন্ত টাকা দাদন করিত; এবং গৃহস্থের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া নিজ-হাতে গাভীর দুগ্ধ দোহন করিয়া আনিত। প্রাতঃকাল হইতে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত গোয়ালারা গৃহস্থের গোশালায় দুগ্ধ-দোহন-কার্য্যে ব্যাপৃত রহিত। একবেলার দুধের মূল্য হইতেই দাদনের বাবদ দেয় টাকা পরিশোধ হইয়া যাইত। বলা বাহুল্য, বৈকালের দুগ্ধ গৃহস্থেরাই দোহন করিয়া লইত; এবং উহা তাহাদেরই প্রাপ্য ছিল। অগ্রিম টাকা দিত বলিয়া, গোয়ালারা বাজার দর অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বেশী (যাহাতে সুদ পোষায়) পরিমাণ দুগ্ধ প্রাপ্ত হইত। ইহাতে গৃহস্থের বা গোয়ালার কাহারও কোনরূপ ক্ষতি হইত না। অথচ, গরিব গৃহস্থ, অর্থব্যয় না করিয়াও, গোপালন করিতে পারিত। গো-খাদ্য সংগ্রহ করিতে গৃহস্থের যৎকিঞ্চিৎ (তৎকালেও গোচারণ মাঠ ছিল; বিশেষতঃ, হিন্দুর হিন্দুত্বেরও ব্যতিক্রম ঘটে নাই। সুতরাং গোপালন করিতে অধিক অর্থব্যয় হইবে কেন?) অর্থব্যয় হইত সত্য, কিন্তু প্রাপ্ত (বৈকালের) দুগ্ধের মূল্যের হিসাব ধরিলে, ব্যয় অপেক্ষা আয়ের পরিমাণেই অধিক ছিল। তদ্ভিন্ন, গোয়ালার দাদনের টাকা পরিশোধ হইয়া গেলে পর, গাভী ও বাছুরটি তাহার ফাও লাভ হইত। প্রাচীনকালে, পাশ্চাত্য-দেশের অনুকরণে, এ দেশে গোপালন ও গব্য সামগ্রীর ব্যবসায় (Dairy Farm) বা ডায়েরী ফার্ম ছিল না সত্য, কিন্তু উক্তরূপেই তৎকালে দুগ্ধের ব্যবসায় চলিত। পূর্ব্ববঙ্গে—বিশেষতঃ ঢাকা জেলায়, অদ্যাপি উল্লিখিত প্রথাটি বর্ত্তমান রহিয়াছে। ঢাকা—নবাবপুরের ৭।৮ জন গোয়ালা মফস্বলের বহুসংখ্যক গোয়ালাকে টাকা দাদন দিয়া, প্রত্যহ শত শত মণ দুগ্ধ প্রাপ্ত হয়; এবং তদ্দ্বারাই ঢাকাবাসীর দুগ্ধের অভাব আংশিক পূরণ হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, মফস্বলের গোয়ালারা গৃহস্থদিগের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া দুগ্ধ ক্রয় করে না;—পূর্ব্ববর্ণিত প্রাচীন প্রথাতেই উহারা দুগ্ধ সংগ্রহ করিয়া থাকে।

অধুনা, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত ঘৃত, মাখম প্রভৃতি ক্রমশঃই দুর্ম্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিতেছে বলিয়া, কেহ কেহ ডায়েরি ফার্ম্ম প্রতিষ্ঠা করিয়া দুগ্ধাদির ব্যবসায় করিতে

ইচ্ছুক হইয়াছেন। এমন কি, কোনও কোনও স্থানে, অতি ক্ষুদ্রায়তনে, উহা প্রতিষ্ঠিতও হইয়াছে। কিন্তু উহার ফল সন্তোষজনক হওয়া দূরে থাকুক, অধিকাংশস্থলেই বিশেষ ক্ষতিকরই হইয়াছে। এমতাবস্থায়, প্রাচীন রীতির অনুসরণ করিলে, অর্থাৎ দেশী উৎকৃষ্ট দুগ্ধবতী গাভী ক্রয় করিয়া, তাহা গরিব গৃহস্থদিগকে পালন করিতে দিলে, উহারাও যৎকিঞ্চিৎ অর্থলাভ করিতে পারিবে; পক্ষান্তরে, যিনি বা যাঁহারা (কোম্পানী হইলে) গাভী ক্রয় করিয়া দিবেন, তাহাদেরও বেশ লাভ দাঁড়াইবে। এইভাবে কার্য্য করিতে পারিলে, গাভী পালনের জন্য কোনরূপ অর্থের প্রয়োজন হইবে না বলিয়া, মূলধনের অধিকাংশ টাকাই গাভী ক্রয় করিতে ব্যয়িত হইতে পারিবে। অথচ, ইহার লাভও সুনিশ্চিত। যাঁহারা বৈদেশিক ডায়েরী ফার্ম্মের অনুকরণে, ডায়েরী ফার্ম্ম করিতে বাসনা করিয়াছেন; তাঁহাদের মূলধনের পরিমাণ যদি অন্ততঃ ৫০।৬০ হাজার টাকাও না হয়, তাহা হইলে আমরা তাঁহাদিগকে ডায়েরী ফার্ম্ম প্রতিষ্ঠা না করিয়া, দেশীয় প্রাচীন পদ্ধতিতেই কার্য্য করিতে পরামর্শ দিতে পারি। কারণ, অল্প মূলধনে, বিলাতী আদর্শে, ডায়েরী প্রতিষ্ঠা করিলে যে, অধিকাংশস্থলেই লাভজনক হইবে না, তাহা সুনিশ্চিত। সুতরাং, বঙ্গের সর্ব্বত্রই উক্ত প্রাচীন পদ্ধতি-অবলম্বনে দুগ্ধের ব্যবসায়-প্রথা প্রচলিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

শিক্ষার সুফল—বরোদা-রাজ্যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা-আইন প্রচলিত হইয়াছে। সুতরাং রাজ্যের সমুদায় বালক-বালিকাকেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিখিতে হয়। আমাদের দেশের কৃষক-সন্তানেরা সামান্য লেখাপড়া শিখিলেই বাবু হইয়া উঠে;—হালের মুঠি ধরা অপমানজনক মনে করে। বরোদা-রাজ্যে কিন্তু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করিয়া, কৃষক-সন্তানের প্রায় সকলেই কৃষি-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছে। ইহাতে তাহারা আপনাদিগকে কিঞ্চিৎমাত্রও হীন মনে করে না। তাহাদিগের শিক্ষায় সুফল ফলিয়াছে।

হরিদ্রা।

সংস্কৃত-পর্য্যায়—হরিদ্রা, কাঞ্চনী, পীতা, বর-বর্ণিনী, ক্রিমিঘ্নী, যোষিৎপ্রিয়া, বর্ণবিধায়িনী, হরবিলাসিনী—এই কএকটি এবং নিশা ও রাত্রিবাচক সমস্ত শব্দ হরিদ্রার সংস্কৃত-পর্য্যায়। এতন্মধ্যে, প্রথমোক্ত চারিটি শব্দ উহার রূপের এবং শেষোক্ত চারিটি গুণের সম্যক পরিচায়ক।

প্রকারভেদ—হরিদ্রা চারি প্রকার; যথা—(১) হরিদ্রা (Curcuma Longa), (২) কর্পূর-হরিদ্রা (Curcuma Aromatica), (৩) আম্রগন্ধি-হরিদ্রা (Curcuma Amada) এবং (৪) বন-হরিদ্রা। এতন্মধ্যে, প্রথমোক্ত জাতীয় হরিদ্রাই আমাদের নিত্যব্যবহার্য্য। আম্র-গন্ধি-হরিদ্রার গাছ ও মূল হরিদ্রার গাছ ও মূলের অনুরূপ। ইহার পাতাও হলুদগাছের পাতার সদৃশ। কিন্তু কন্দমূলের গন্ধ কতকটা কাঁচা আমের গন্ধের ন্যায়। মূলের মাংসের বর্ণ ঈষৎ হরিদ্রাভ; বিশেষতঃ, হলুদের মত জিনিষে কাঁচা আমের গন্ধ রহিয়াছে বলিয়াই, ইহাকে 'আম্রগন্ধি-হরিদ্রা' নামে অভি-হিত করা হইয়াছে। আম্রগন্ধি-হরিদ্রার অপভ্রংশে আম-হলুদ হইলেও, বঙ্গদেশে উহা আমাদা নামেই পরিচিত। মিঠাই সুগন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে এবং অম্বলে আমাদা-মূলের রস ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কর্পূর-হরিদ্রা ও বন-হরিদ্রা একরূপ অব্যবহার্য্য।

'প্রকৃতিবাদ অভিধানে' দারুহরিদ্রাকেও (Berberis Asiatica, B. Aristata) হরিদ্রার একপ্রকার বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। বস্তুতঃ, ইহা সম্পূর্ণ ভুল। দারুহরিদ্রা পর্ব্বতজাত গুল্মবিশেষ। ইহা হরিদ্রার ন্যায় ওষধি-শ্রেণীর অন্তর্গত শাখিত কন্দবিশিষ্ট মূলজ উদ্ভিদ নহে। দারুহরিদ্রার মূলত্বক্ ও কাষ্ঠ ঔষধরূপে এবং রঞ্জন-কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দারুহরিদ্রার পুরাণ ত্বকের উপরিভাগ পাঁশুটে বর্ণের, কিন্তু অভ্যন্তরে পীত; এবং ইহার কাষ্ঠও পীতবর্ণের হয়। দারু (কাষ্ঠ) হরিদ্রার ন্যায় পীতবর্ণের হয় বলিয়াই, উহার দারুহরিদ্রা—এই নামকরণ হইয়াছে। একমাত্র বর্ণের সাদৃশ্য ব্যতীত, হরিদ্রার সহিত দারুহরিদ্রার অন্য কোনও বিষয়েই সম্বন্ধ নাই।

হরিদ্রা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ হরিদ্রার জন্মস্থান ভারতবর্ষ। ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই, অতি পাচীন-কাল হইতে, হরিদ্রার চাষ হইতেছে। হরিদ্রা আদা বা কদলী পরিবার-ভুক্ত প্রণত বা শায়িত-কন্দ (Rhizomous) বিশিষ্ট মূলজ উদ্ভিদ। ইহার নিরেট কন্দই হরিদ্রা। এই কন্দমূলকেই কাণ্ড (stem) বলা যায়। ইহা হইতেই বৃক্ষাঙ্গ নির্গত হইয়া থাকে। দেখিতে কতকটা কাণ্ডসদৃশ হইলেও, উহা আসল-কাণ্ড নহে। মূল রোপণের পর, মূলের গাত্রস্থ চক্ষু হইতেই বৃক্ষাঙ্গ বহির্গত হয়; এবং মূল পরিপক্ক হইলেই উহারা মরিয়া যায়। সুতরাং, ইহা প্রকৃত কাণ্ড নামে অভিহিত হইবার যোগ্য নহে। ইহার মূলই কাণ্ড। উহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। মূলের পার্শ্বদেশ হইতে নূতন কাণ্ড বা কন্দমূলের উৎপত্তি হয়। হলুদগাছে ফুল ধরে; কিন্তু পুষ্প-পরাগ প্রাকৃতিক উপায়ে উর্ব্বরতা (fertilisation) প্রাপ্ত না হওয়ায় বীজ হয় না। সুতরাং মূল হইতেই হরিদ্রার বংশবৃদ্ধি ঘটে হরিদ্রার মূলই ব্যবহারযোগ্য। সুতরাং, যে উপায়ে মূলের উৎকর্ষসাধিত হইতে পারে, কৃষকের সেই-দিকেই বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। আদা, হলুদ, কদলী প্রভৃতি একই পরিবারের অন্তর্গত বলিয়া, উহাদের চাষ-প্রণালী ও পরিচর্য্যায় বড় পার্থক্য নাই।

হরিদ্রার ভাষানাম—বাঙ্গালাভাষায় হরিদ্রাকে হলুদ্ বলে। ইহা হরিদ্রা-শব্দেরই অপভ্রংশ। ইহা হিন্দীতে হর্দ্দী ও হল্দী; মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় হল্দ; গুজরাটীভাষায় হলদর ও হলদ্; তৈলঙ্গীভাষায় পসুপু; কর্ণাটীভাষায় অরসিনা; ফরাসীতে জসদচোব্; আরবিতে উরুকুস্মুফর এবং ইংরেজিতে টর্‌মারিক্ (Turmeric) কহে।

গুণ ও ব্যবহার—হরিদ্রা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, বলবর্দ্ধক, রুক্ষ, রক্তপরিষ্কারক, পিত্তনাশক, দাহনিবারক্ এবং কফজ ও বাতজ রোগ, রক্তদুষ্টি, কুষ্ঠ, কণ্ডু, ত্বগ্‌দোষ, শোথ, পাণ্ডু, ক্রিমি, প্রমেহ, পীনস, অপচী, অরুচি ও বিষদোষে বিশেষ উপকারক। বৈদ্যকে নানারোগে হরিদ্রার ব্যবহার-প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে। চরকের মতে, হরিদ্রা পেষণ পূর্ব্বক মধু বা আম-কারসের সহিত সেবন করিলে প্রমেহরোগ ভাল হয়। সুশ্রুতের মতে, একমাস উপযুক্ত মাত্রায় গোমূত্রের সহিত হরিদ্রা পান করিলে কুষ্ঠরোগ আরোগ্য হয়। হরিদ্রার ক্বাথ চিনি ও মধুর সহিত পান করিলে কফজ-তৃষ্ণা প্রশমিত হয়; ইহাই বাগ্‌ভটের অভিমত। চক্রদত্তের মতে, গুড়সংযুক্ত হরিদ্রা গোমূত্রের সহিত পান করিবে। ইহা শ্লীপদের পক্ষে হিতকর। হরিদ্রা বল্য ও সুগন্ধি। ইহা কামলা ও পুরাণ কফরোগে প্রয়োজ্য।

ভারতবর্ষ গ্রীষ্ম-প্রধান দেশ; অতএব, এ দেশের প্রায় সকলেরই পিত্ত-প্রধান ধাতু। এই পিত্তপ্রধান দেশবাসীর আহারে-বিহারে কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটিলেই, পিত্তের প্রকোপে যকৃতের কাজ খারাপ হইয়া পড়িবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা রহিয়াছে। যকৃতের কার্য্য অবিকৃত রাখিবার উদ্দেশ্যেই, ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই, মসলারূপে হরিদ্রার ব্যবহার অতি প্রাচীনকাল হইতেই প্রচলিত রহিয়াছে। হরিদ্রা পিত্তনাশক বলিয়া, গ্রীষ্ম প্রধান-দেশের পক্ষে অনুপযোগী বা অনুচিত খাদ্য গ্রহণ করিয়াও, অনেকসময় স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে পারা যায়। বিশেষতঃ, বিষদোষনাশক, কৃমিঘ্ন, বলকারক এবং পচননিবারক বলিয়া, ভারতের সর্ব্বত্রই হরিদ্রার ব্যবহার ও চাষ প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে।

পাকক্রিয়ায়, শুভ-উৎসবে,—বিশেষতঃ বিবাহোপলক্ষে, রংপ্রস্তুতকরণে, মৎস্য-মাংসাদি সংরক্ষণে এবং অন্যান্য বহুবিধ প্রয়োজনে হরিদ্রা ব্যবহৃত হয়। ভারতের ঘরে ঘরে নানারূপে হলুদ নিত্য-ব্যবহার্য্য পদার্থমধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। সুতরাং, ইহা যে অতীব প্রয়োজনীয় পদার্থ, তাহা আর বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। ইউরোপ ও আমেরিকা প্রভৃতি মহাদেশেও ইহার যথেষ্ট আবশ্যকতা রহিয়াছে। হরিদ্রা হইতে নানাপ্রকার রং প্রস্তুত হয়। রং প্রস্তুতের জন্য প্রতিবৎসর প্রচুর পরিমাণে হলুদ বিলাতে রপ্তানি হইয়া থাকে।

পিষ্ট-হরিদ্রা তিলতৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সমস্ত শরীরে মর্দ্দন করিলে কণ্ডু, চুলকাণি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ জন্মিতে পারে না। বঙ্গের, বিহারের এবং উড়িষ্যার অনেক স্থানের স্ত্রীলোকেরাই, গাত্রে হরিদ্রা মাখিয়া থাকেন। তেল হলুদ মাখিলে চর্ম্মদোষ নিবারিত এবং ত্বকের উৎকর্ষ সাধিত হয়। প্রাচীন সময়ে, আমাদের দেশে মুখের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির জন্য 'পাউডার', 'মিল্ক অব্ রোজ' অথবা 'ব্লুম অব্ বিউটী' প্রভৃতি মুখে মাখিবার কোনও প্রকার দ্রব্যই ছিল না। তৎকালে, বড়ঘরের বিলাসিনী রমণীগণ সূক্ষ্ম অভ্রচূর্ণ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া মুখে ব্যবহার করিতেন। পক্ষান্তরে, দরিদ্র রমণীরা তৈলমিশ্রিত হলুদ ব্যবহার করিত। কেহ কেহ বা তৈলমিশ্রিত হলুদেও অভ্রচূর্ণ মিশাইয়া লইত। জল বা তৈলটুকু শুকাইয়া উঠিলে, অভ্রচূর্ণগুলি নদীসৈকতস্থিত বালরবিকরোদ্ভাসিত বালুকণার ন্যায় চিক্ চিক্ করিয়া মুখের মাধুরী বৃদ্ধি করিত। অঙ্গরাগের নিমিত্ত হরিদ্রার ব্যবহার-প্রথা এ দেশে আবহমান কাল হইতেই প্রচলিত রহিয়াছে। পিষ্ট, ঘৃষ্ট বা আহত অঙ্গে চূর্ণমিশ্রিত হরিদ্রার প্রলেপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। হরিদ্রারঞ্জিত বস্ত্র চক্ষুরোগীর নেত্রাচ্ছাদকরূপে ব্যবহৃত হয়। 'ব্লাক্ আই' নামক চক্ষুরোগে সাবধানতার সহিত চক্ষুর বহির্ভাগে ইহার প্রলেপ দিলে যন্ত্রণার লাঘব হইয়া থাকে।

অত্যধিক পরিমাণে হরিদ্রাচূর্ণ এবং লবণ মাখিয়াই লোণা ইলিশ মাছ প্রস্তুত করা হয়। ইহা বহুদিবস পর্য্যন্ত অবিকৃত রহে। কাঁচা আমের ফালী হলুদ মাখিয়া শুষ্ক করিলে, যে আমসী প্রস্তুত হয়, তাহাতে সহজে কোনরূপ পোকা ধরিতে পারে না। কৃষিক্ষেত্রে অনেকসময় উইপোকা, পিপীলিকা ও অন্যান্য কীট কর্ত্তৃক শস্য আক্রান্ত হইয়া থাকে। ক্ষেত্রে এই সকল কীটের উপদ্রব ঘটিলে, কীটযুক্ত স্থানে হরিদ্রা-চূর্ণ অথবা হলুদ-গোলা জল ব্যবহার করিলে বেশ উপকার পাওয়া যায়। ইহাতে কীট মরিয়া যায়, অথবা পলায়ন করে।

হলুদ-চাষের জমি—হাল্‌কা দো-আঁশ উচ্চ-ভূমি হরিদ্রাচাষে প্রশস্ত। বেলে অথবা এঁটেল মৃত্তিকায় হলুদ ভাল হয় না। পলি-মৃত্তিকায় হলুদের চাষ করিতে পারিলে সুফল লাভ করা যায়। দুই এক বৎসরের পতিত জমিতেই অধিক পরিমাণে হলুদ জন্মে। বহুদিনের পতিত ঘাসযুক্ত অথবা জঙ্গলকাটা জমিতেও হলুদচাষ মন্দ হয় না। সরস-ভূমি হলুদ-চাষের পক্ষে উপযোগী হইলেও, অত্যধিক রসযুক্ত স্থান নিকৃষ্ট। যে ভূমিতে বর্ষায় জল উঠিবার আশঙ্কা থাকে বা যেখানে বৃষ্টির জল দাঁড়ায় কিম্বা স্যাঁৎসেঁতে, সে জমিতে হরিদ্রার চাষ করা বিধেয় নহে। কারণ, কোনও প্রকারে গাছের গোড়ায় জল বসিলে হলুদ পচিয়া যায়। এঁটেল মৃত্তিকায় হলুদের চাষ করিতে হইলে, তাহার সহিত ছাই বা উদ্ভিজ্জসার মিশ্রিত করিয়া দিতে হয়। ইহাতে এঁটেল মৃত্তিকাও হাল্‌কা হইয়া পড়ে সত্য; কিন্তু ইহা বিশেষ ব্যয়সাধ্য।

সার—হলুদের জন্য বিশেষ কোন সারের আবশ্যক হয় না। একমাত্র পলিপড়া-মৃত্তিকাই হলুদের পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সার। হলুদের জমিতে গোবর, খৈল, ছাগলের নাদি, অস্থিচূর্ণ এবং ছাই প্রভৃতি সাররূপে ব্যবহার করিলে হলুদের ফলন অধিক হয়। গোময় হরিদ্রার পক্ষে উত্তম সার। ইহা অধিক পরিমাণে ক্ষেত্রে ব্যবহার করিলে, হলুদ-গাছ সতেজে বর্দ্ধিত হয় সত্য; কিন্তু ফলন বড় কম হয়। বর্ষার প্রথমভাগে হলুদগাছের গোড়ায় অত্যল্পপরিমাণ খৈল-সার প্রয়োগ করিলে সুফল লাভ করা যায়।

হল-কর্ষণ ও জমি-প্রস্তুত—হরিদ্রা-ক্ষেত্রের জমি গভীররূপে কর্ষিত এবং উত্তমরূপে (ধূলীবৎ) চূর্ণীকৃত হওয়া আবশ্যক। জমি যত 'মিহিন' (সূক্ষ্ম) হইবে, হলুদও তত ভালরূপে জন্মিবে। অগ্রহায়ণ কি পৌষ মাসের প্রথমভাগে কোদালি দ্বারা মৃত্তিকা উত্তমরূপে কোবাইয়া দিতে হয়। তৎপর, মাঘ কি ফাল্গুন মাসে একবার বৃষ্টিপাত হইয়া গেলেই, লাঙ্গল-চাষ আরম্ভ করা, এবং অন্ততঃ ৪।৫ বার চাষ দেওয়া আবশ্যক। প্রত্যেকবার হল-কর্ষণের পরেই মই দিতে এবং মুগুরের (মুদ্গরে) দ্বারা ক্ষেতের ঢেলা ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। ক্ষেত্রের মৃত্তিকা সমতল, জঙ্গল পরিষ্কার এবং মৃত্তিকার ঢেলাগুলি চূর্ণকরাই, মই দেওয়ার মুখ্য-উদ্দেশ্য। বৈশাখমাসের প্রথমভাগেই শেষবার ভূমি-কর্ষণ ও মদিকা-দান-কার্য্য শেষ করিতে হইবে। মোট কথা, এই সময়েই ক্ষেত্র প্রস্তুত করা আবশ্যক।

মাঘ ফাল্গুন মাসে অর্দ্ধ কি তিন পোয়া হস্ত উচ্চ নূতন মাটী (গড়, খাল অথবা পুকুরের জল শুষ্ক হইলেই, তাহার তলদেশে যে পলি-পড়া মাটী দেখা যায়, তাহাকেই নূতন মাটী বলে) তুলিয়া হরিদ্রা-ক্ষেত্রে ফেলিতে পারিলে সুফললাভে কখনও বঞ্চিত হইতে হয় না। ক্ষেত্রে নূতন

মাটী তুলিবার পূর্ব্বেও একবার লাঙ্গল দেওয়া আবশ্যক। তাহা না হইলে, ক্ষেত্রের মৃত্তিকা শক্তই থাকিয়া যায়। হলুদের জমি সমতল ও মিহিন হইলেই চলিবে না; উহাতে যাহাতে ইট, কাঁকর, আগাছা, দুর্ব্বাঘাস প্রভৃতি না থাকে, তাহারও উপায়বিধান করিতে হইবে।

রোপণ-কাল—খনারমতে—

"বৈশাখ জ্যৈষ্ঠে হলুদ রোও।
দাবা-পাশা খশুর ফেলে থোও॥
আষাঢ়ে শ্রাবণে নিড়ায়ে মাটী।
তাঁদরে নিড়ায়ে করিবে খাঁটি॥
অন্যথা নিয়মে পুতিলে হলুদি।
পৃথিবী বলেন, তাতেও ফল দি॥"

এ দেশে খনার বচনানুসারেই হলুদের চাষ অদ্যাপি চলিয়া আসিতেছে। বৈশাখ হইতে জ্যৈষ্ঠমাসের মধ্যেই বীজ-হলুদ রোপণ করা প্রশস্ত। বঙ্গদেশের নানাস্থানে সাধারণতঃ বৈশাখমাসেই হলুদ রোপিত হয়। কেহ কেহ, ফলবিশেষে, আষাঢ়মাসেও হলুদ লাগাইয়া থাকে।

জাতি—হলুদ নানা জাতীয়। তন্মধ্যে, পাঁকাল, আদাগাঁট, বাগা বা বাঘনখা, সাঁচি, দুর্গামেড়, কচুমুখী প্রভৃতির নামই উল্লেখযোগ্য। এই সকল হলুদ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে পরিচিত হইলেও, উক্ত নাম হইতে সহজে উহাদিগকে চিনিয়া লওয়া কষ্টকর হইবে না। পাঁকাল ও আদাগাঁট জাতীয় হলুদের ফলন বেশী হয়; সুতরাং ইহাদের চাষই লাভজনক। এই দুই জাতীয় হলুদ সরু হইলেও, শুষ্ক হইলে প্রায় যেমন তেমনই থাকে; অর্থাৎ ইহাতে সারভাগ অধিক। সাঁচি, বাঘনখা, কচুমুখী প্রভৃতি খুব মোটা হয় সত্য; কিন্তু অপেক্ষাকৃত অসার। সুতরাং, উহাদিগকে শুষ্ক করিলে 'চিম্‌টা' (সরু) হইয়া যায়; বিশেষতঃ, উহাতে জলীয়াংশ অধিক বলিয়া শুকাইতেও অধিক সময়ের আবশ্যক হয়। যে জাতীয় হলুদের ফলন অধিক এবং যাহা শুকাইলেও 'চিম্‌টা' মারিয়া যায় না অর্থাৎ যেমন তেমনই থাকে, সেইরূপ হলুদই বীজের জন্য মনোনীত করা উচিত।

রোপণ-প্রণালী—কর্ষিত মৃত্তিকার উপরিভাগ শুষ্ক হইলে পর, লাঙ্গলের ফাল দ্বারা ক্ষেত্রের একহাত অন্তর অন্তর, এক একটী দাগ টানিয়া, সারি করিয়া যাইতে হইবে। এই দাগগুলি যেন সোজা হয়। সমুদয় ক্ষেত্রে যতগুলি সারি হইবে, প্রথমতঃ তাহার একটী অন্তর একটাতে তিন-পোয়া হাত ব্যবধানে হলুদের বীজ (অথও বা কর্ত্তিত হলুদ) বসাইয়া যাইতে হইবে। বীজরোপণকালে অন্ততঃ দুইজন লোকের আবশ্যক হয়। একজন পূর্ব্বোক্তরূপে বীজ বসাইয়া যাইবে এবং অন্যজন তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ, যে সারিতে হলুদ বসান হয় নাই, তাহা হইতে কোদালি দ্বারা মাটী তুলিয়া, তাহার দুইপার্শ্বস্থ হলুদগুলির উপর ৬—৮ অঙ্গুলি উচ্চ করিয়া মাটী চাপা দিয়া যাইবে। মাটী চাপা দেওয়ার কাজ পরে করিলেও চলে। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মাটী চাপা দিতে বিলম্ব হইলে রৌদ্রে যদি বীজ-হলুদগুলি শুষ্ক হইয়া যায়, তাহা হইলে উহা অঙ্কুরিত হইতেও বিলম্ব ঘটিতে পারে। এই প্রণালীতে দুইহাত অন্তর অন্তর বীজ-হলুদ বসান হইয়া থাকে বলিয়া, ইহাকে 'দোঁহাতী-রোপণ' বলে। অধিকাংশ স্থানের কৃষকেরাই দোঁহাতী-রোপণ-প্রণালীতে বীজ বসায় না। ক্ষেত্রমধ্যে একহাত অন্তর অন্তর ৪।৫ অঙ্গুলী গভীর 'জুলি' টানিয়া, উহার প্রত্যেক জুলির মধ্যে তিনপোয়া হাত বা তদপেক্ষাও অল্প ব্যবধানে, এক একটী বীজ বসাইবার প্রথাই বহুস্থানে প্রচলিত রহিয়াছে। এত ঘনভাবে বীজ রোপণ করিলে যে ফলন অধিক হইবে, তাহার কোনও কারণ নাই। ঘনভাবে বীজ রোপণ করিলে, স্থানাভাবে চারাগাছগুলি ঝাড় বাঁধিয়া উঠিতে পারে না—ঊর্দ্ধে লম্বা হইয়া পড়ে। ফলে, ফলনও কম হয়। সুতরাং, একহাতী রোপণ-প্রণালী প্রশস্ত নহে।

আস্ত হলুদ রোপণ না করিয়া, খণ্ড খণ্ড হলুদ রোপণ করাই সঙ্গত। আস্ত এবং খণ্ড খণ্ড হলুদ পৃথকভাবে রোপণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, উহাতে ফলনের পরিমাণ প্রায় একরূপই হইয়াছে। সুতরাং অর্থাভাব বীজ-হলুদ বসাইয়া, ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করা অনাবশ্যক। খণ্ডিত বীজ-হলুদ হইলে, বিঘাপ্রতি অর্দ্ধমণ বীজ হইলেই যথেষ্ট হয়।

আস্ত (অখণ্ডিত) হলুদকে খণ্ড খণ্ড করিয়া লইলে, উহার প্রত্যেকটী খণ্ডই এক একটী বীজ হইবে। এই বীজ রোপণ করিবার পূর্ব্বে ভিজা খড়ের মধ্যে ৫।৬ দিন রাখিয়া দিলেই, উহা অঙ্কুরিত হইয়া উঠিবে। তদবস্থায় অর্থাৎ প্রত্যেকটী বীজে অন্ততঃ দুইটী করিয়া অঙ্কুর জন্মিলেই, তাহা ক্ষেত্রে বসান কর্ত্তব্য। বীজ অঙ্কুরিত না হইলেও, তাহা ক্ষেত্রে বসান যায়; কিন্তু তাহাতে বীজ অঙ্কুরিত হইতে অধিক সময় লাগে। রোপণের সময় অঙ্কুর বা চোখগুলি উপরের দিকে রাখিয়া রোপণ করিবে।

রোপণের পরবর্ত্তী ব্যবস্থা—বীজ-হলুদ রোপণের পর তদুপরি মাটী চাপা দিয়া, তাহা কলাগাছের পাতা বা খড় দ্বারা ঢাকিয়া দিতে হয়। ইহাতে মৃত্তিকা সরস থাকে; বিশেষতঃ, কোমল অঙ্কুরগুলি সূর্য্য-কিরণে শুকাইয়া যাইতে পারে না। এইরূপে রক্ষিত অঙ্কুর ১০।১৫ দিনের মধ্যে পাতার আবরণ ভেদ করিয়া সহজে ও সতেজে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। বীজ-হলুদ-রোপণের পর, ক্ষেত্রের চতুষ্পার্শ্বে বেড়া দিতে পারিলে ভাল হয়। তাহা না হইলে, গো-মেষাদি গৃহপালিত পশু ক্ষেতে যাইয়া, রোপিত হলুদ-বীজগুলি পা দিয়া চট্‌কাইয়া দিয়া আসিতে পারে। বলা বাহুল্য, অবস্থা বুঝিয়াই বেড়া দিবার ব্যবস্থা করিতে হয়। বীজ-রোপণের পর যদি অধিক দিবস পর্য্যন্ত একবারও বৃষ্টি না হয়, তাহা হইলে আবশ্যকমত দু'একবার জলসেচন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু বর্ষা আরম্ভ হইলে, আর জলসেচনের আবশ্যক হয় না।

বীজ-রোপণের একমাস কি দেড়মাস পরে, হলুদগাছগুলি যখন 'আলির' উপর ৮।১০ অঙ্গুলী বা ততোধিক উচ্চ হইয়া উঠিবে, তখন ক্ষেতের সমস্ত ঘাস ও আগাছা ইত্যাদি নিড়াইয়া দিতে হয়। ক্ষেত নিড়াইবার পর, তন্মধ্যস্থ জুলি হইতে দুইপার্শ্বে মাটী উঠাইয়া, গাছের গোড়ার উভয়দিকে ত্রিকোণ-বেদীর আকারে মাটী দিতে হইবে। গাছের গোড়ায় মাটী দিতে বিশেষ সতর্কতা লইবে;—গাছের চতুর্থাংশও যেন মাটীর নীচে না পড়ে। গাছের অধিকাংশ স্থান মাটীচাপা পড়িলে, বায়ু ও আলোকের অভাবে, গাছ মরিয়া যাইবার সম্ভাবনা। জুলি হইতে এরূপ ভাবে মাটি তুলিতে হইবে যে, তন্মধ্যে বৃষ্টির জল পড়িবা মাত্রই যেন জুলি-পথে বাহির হইয়া যায়। জুলির কোনও স্থানে সামান্য গর্ত্ত রহিলেও, তাহাতে বৃষ্টির জল সঞ্চিত হয়; ফলে, হলুদগাছের মূল পচিয়া যাইতে পারে। সুতরাং মাটী-তোলা-কাজে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। হলুদবাড়ী (হলুদ-ক্ষেত্রকে হলুদবাড়ী কহে।) হইতে জল-নির্গমন-পথ পরিষ্কার রাখিতে হইবে। বর্ষাকালে যাহাতে হলুদবাড়ীতে জল না দাঁড়ায়, তদুপায় অবলম্বন করিতে হয়। বৃষ্টির পরই ক্ষেতে যাইয়া দেখিতে হইবে, ক্ষেতে জল বাঁধিয়াছে কিনা। যদি কোনও স্থানে জল থাকে, তবে অবিলম্বে জল বাহির করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। বর্ষার প্রথম বারিপাতে যদি ক্ষেতে জল না দাঁড়ায়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে আর জল দাঁড়াইবার সম্ভাবনা থাকে না।

হলুদবাড়ী ৩।৪ বার নিড়াইয়া দেওয়া আবশ্যক। প্রত্যেকবার নিড়াইবার সঙ্গে সঙ্গেই, কোদালি দ্বারা কোবাইয়া, মাটী আল্‌গা করিয়া দিতে পারিলে ভাল হয়। হলুদবাড়ীর মৃত্তিকা পরিষ্কার রাখা কর্ত্তব্য। গাছ সতেজ হইয়া উঠিলে, উহার গোড়ায় মাটী দেওয়া এবং নিড়ান ব্যতীত অন্য কোন পাইট করিতে হয় না।

হলুদ-সংগ্রহ—পৌষ মাঘ মাসে হলুদগাছ শুষ্ক হইতে থাকে। যখন সমুদয় গাছের পাতা শুকাইয়া আলির উপর চলিয়া পড়িবে, তখনই হলুদ-সংগ্রহের উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। বীজ-হলুদ রোপণের পর দশমাসমধ্যেই ক্ষেত্র হইতে হলুদ সংগ্রহ করা যায়। সমুদয় গাছ কাস্তে দ্বারা কাটিয়া একস্থানে সঞ্চিত করিয়া রাখিতে পারিলে, সহজেই হলুদ উঠাইতে পারা যায়। কোদালির দ্বারা আলির দুই পাশে কোপ দিলেই, হলুদসহ মাটির চাকা উল্টাভাবে উঠিয়া পড়িবে। চাকাটী আস্তে আস্তে ভাঙ্গিয়া, তাহা হইতে হলুদের 'কানা' (সমগ্র মূল) মাটী-ঝাড়া করিয়া বাছিয়া লইলেই হইল। এমনভাবে হলুদ তুলিবে, যেন উহা কোনরূপে ভাঙ্গিয়া না যায় বা কোদালির আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া না পড়ে।

কাহারও কাহারও মতে, হলুদগাছের পাতাগুলি সুন্দররূপে শুষ্ক হইয়া গেলে, তাহাতে আগুন লাগাইয়া দেওয়া

উচিত। তাহারা বলেন, পাতাগুলি অগ্নিতে দগ্ধ ও ভস্মাকারে পরিণত হইলে, ঐ দগ্ধ ছাই উৎকৃষ্ট সারের কার্য্য করে। আমরা এরূপভাবে মৃত্তিকা পোড়াইয়া দেওয়ার পক্ষপাতী নহি। তবে পূর্ব্বোক্তরূপে ক্ষেত্রের একস্থানে সঞ্চিত পাতার স্তূপ অগ্নি-সংযোগে ভস্ম করিয়া এবং সেই ছাই ক্ষেত্রময় ছড়াইয়া দিয়া, বেশ ফল পাইয়াছি।

হলুদ শুষ্ককরণ—সংগৃহীত হলুদ প্রথমতঃ দুই চারিদিবস রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইতে হয়। তৎপর, সেইগুলি জলে সিদ্ধ করিয়া, পুনর্ব্বার উত্তমরূপে রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইলেই হইল। প্রথমতঃ, একটা মাটীর হাড়িতে আধ-হাড়ি পরিমাণ গোবরমিশ্রিত জল দিয়া, তাহা রৌদ্রে কিঞ্চিৎ শুষ্ক হলুদ দ্বারা প্রায় পূর্ণ করিতে হয়। তৎপর, মৃদু অগ্নির জ্বালে হলুদগুলি সিদ্ধ করিতে হইবে। জলের সহিত কিয়ৎপরিমাণ গোবর মিশ্রিত করিয়া লইলে, হলুদগুলি সহজেই সিদ্ধ হইয়া থাকে; তদ্ভিন্ন, ইহাতে ভবিষ্যতে পোকা ধরিবারও সম্ভাবনা রহে না। হলুদ-সংগ্রহ করিবার পূর্ব্বে, গাছের শুষ্কপাতাগুলি একস্থানে সংগ্রহ করিয়া রাখিতে বলা হইয়াছে। এই পাতার সহিত মধ্যে মধ্যে দুই একখানি কাঠ দ্বারা জ্বাল দিলেই, হলুদ সিদ্ধ করা যায়। সিদ্ধ করিবার সময় হাড়িটী ঢাকিয়া দিবে। গোবরমিশ্রিত গরম জল উতলাইয়া পড়িতে দেখিলেই, হলুদ সিদ্ধ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। তদবস্থায় হলুদগুলি ঢালিয়া লইতে হয়। ঢালিবার সময় একটা ঝাঁজরার নীচে একটা পাত্র রাখিয়া, ঝাঁজরাতে হাঁড়ির জল ও হলুদ ঢালিয়া দিলে, তন্নিম্নস্থ পাত্রে গোবরমিশ্রিত জল পড়িবে। এই জল-দ্বারাই পুনর্ব্বার হলুদ সিদ্ধ করিয়া লইতে পারা যায়।

সিদ্ধ হলুদ উত্তমরূপে রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইলেই, তাহা বিক্রয়োপযোগী হয় বা মজুত করা যায়। হলুদগুলি রৌদ্রে কিঞ্চিৎ শুষ্ক হইয়া 'চিমটা' (সরু) হইয়া উঠিলে, বৈকাল-বেলা রৌদ্রে বসিয়া, চাটাইর উপর আস্তে আস্তে তাহা 'চট্‌কাইয়া' দিতে হইবে। ইহাতে হলুদের উপরের খোসা উঠিয়া যায়; এবং উহা বেশ পরিষ্কার ও দানাদার হইয়া থাকে। হলুদ শুকাইয়া খাঁটী হইলে পর, উহা ভাঙ্গিলে 'মট্ মট্' শব্দ হইবে। যদি মট্ মট্ শব্দ না করিয়া হলুদ ভাঙ্গিয়া যায়, তাহা হইলে ইহা নরম আছে বুঝিতে হইবে। নরম হলুদ মজুদ করা অনুচিত। কারণ, তদবস্থায় উহাতে শীঘ্রই পোকা ধরে।

উত্তমরূপে হলুদ শুষ্ক হইলে, তাহা বিক্রয়ের জন্য, মাচা বাঁধিয়া তদুপরি রাখিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। অধিক সময় মাচায় রাখিতে হইলেও, হলুদগুলি মধ্যে মধ্যে বাহির করিয়া রৌদ্রে দিতে হয়। তাহা না হইলে পোকা ধরিয়া হলুদের সর্ব্বনাশ করিতে পারে। হলুদের গুড়া জলে গুলিয়া, সেই জল হলুদ-স্তূপের উপর ছিটাইয়া দিলে, উহার রং বড়ই সুন্দর হয়। ব্যবসায়ীগণ এই উপায়েই হলুদের রং ফলাইয়া থাকে। হরিদ্রা সিদ্ধ ও শুষ্ক করিলে, সাধারণতঃ মণপ্রতি পনর সেরের অধিক হয় না।

ফলন—জমি ভাল হইলে এবং রোপণের ৭।৮ দিন পরে একটু বৃষ্টি হইলে (যদি বৃষ্টি না হয়, তবে একটু কষ্ট-স্বীকার করিয়া জলসেচন করিলেও, বৃষ্টির কাজ হইতে পারে), প্রতি বিঘায় ২৫।৩০ মণ হলুদ জন্মে। ফলন বেশী না হইলেও, ১৫।১৬ মণের কম ইহা প্রায়ই হয় না। হরিদ্রার চাষ লাভজনক হইলেও, ইহার চাষে কৃষকগণ বড় যত্ন করে না। এ দেশের কৃষকেরা যথেচ্ছভাবে নিকৃষ্ট স্থানেই হলুদের চাষ করিয়া থাকে। অনেকস্থলে, যে সকল স্থানে রৌদ্রের অভাব, তদ্রূপ বৃক্ষের ছায়াযুক্ত আর্দ্রভূমিতেই হলুদের চাষ করা হয়। এই জন্যই, একমাত্র হলুদের চাষ করিয়া কৃষকের বড় লাভ হয় না। কারণ, নিকৃষ্ট স্থানের হলুদ মোটা হইতে পারে না এবং উহার ফলনও খুব কম হয়।

আয়-ব্যয়—প্রতিবিঘায় ভালরূপে হলুদ জন্মিলে, ব্যয় বাদেও কৃষকের ৪০।৫০৲ টাকা লাভ হইতে পারে। বাজে-শস্যরূপে হলুদের চাষ না করিয়া, হলুদবাড়ীতে হলুদের সঙ্গে সঙ্গে, বেগুণ, মরিচ, ঝিঙ্গা, শশা ও ডাঁটা প্রভৃতি কএকটী তরকারী বাজে-শস্যরূপে চাষ করিতে পারিলে, তাহাতেও কৃষকের যৎকিঞ্চিৎ উপরি লাভ হইতে পারে।

শ্রীযুক্ত হলধর বাবু।

গোলাপের চাষ--Rose Cultivation.

(SPECIAL FOR "KRISHI-SAMPADA".)

গোলাপ—ROSE.

N. O. Rosaceæ.

[শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র গুহ এফ্, আর, এইচ্, এস্, মহাশয়ের লিখিত। প্রকৃত উদ্যানতত্ত্ববিদ্, ঈশ্বরবাবু তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ নার্শারী উদ্যানে 'হাতে-হেতেড়ে' সুদীর্ঘকাল—অন্যূন চত্বারিংশৎবর্ষকাল, শত শত প্রকার গোলাপের চাষ-পরীক্ষা করিয়া, তৎসম্বন্ধে যে বহুদর্শিতা ও যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহারই ফলস্বরূপ 'গোলাপের চাষ' নামক একখানি প্রকাণ্ড গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু আজিও উহা প্রকাশিত হয় নাই। ঐ অপ্রকাশিত গ্রন্থখানি, অনুগ্রহপ্রকাশ পূর্ব্বক, ঈশ্বরবাবু আমাদিগকে ধারাবাহিক প্রবন্ধের আকারে প্রকাশ করিতে দিয়াছেন। "কৃষি-সম্পদে" গ্রন্থখানির সমগ্র অংশ প্রকাশিত হইলে পর, উহা স্বতন্ত্রভাবে—গ্রন্থাকারেও প্রকাশিত হইবে।

গোলাপের চাষসম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য-তথ্যপূর্ণ গ্রন্থখানির সকল অংশ, "কৃষি-সম্পদে" ধারাবাহিক প্রবন্ধের আকারে, ১০।১২ সংখ্যায় প্রকাশিত হইলেও সমাপ্ত হইবে কিনা সন্দেহ। আশা করি, এই সুদীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠে পাঠকগণ গোলাপের চাষসম্বন্ধে সকল বিষয়ই শিক্ষালাভ করিতে এবং সর্ব্বপ্রকারেই তৃপ্ত হইতে পারিবেন। কৃঃ সঃ সঃ]

ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ—গোলাপ গুল্ম-জাতীয় উদ্ভিদ। ইহার আদিম অধিবাস তুরস্ক, পারস্য ও ভারতবর্ষ। এ সম্বন্ধে বিস্তর মতভেদ রহিলেও, যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা ইহাই সিদ্ধান্ত হয় যে, অতি প্রাচীনকালে, উক্ত তিনটি দেশেই গোলাপের গাছ পরিলক্ষিত হইত। আয়ুর্ব্বেদে শ্বেত-গোলাপের উল্লেখ রহিয়াছে। ইহাতেই বৈদিককালেও যে এ দেশে গোলাপের অস্তিত্ব ছিল, তাহাই প্রমাণিত হয়। সেমন্তী ও সেবন্তী শব্দে শ্বেত-গোলাপ বুঝায়। উহারই অপভ্রংশ নাম সেঁওতি। শতপত্র ও শতপত্রী ইহার অন্য নাম। পূর্ব্বকালে শ্বেত-গোলাপ বা সেঁওতি এ দেশের বন-জঙ্গলে স্বতঃই উৎপন্ন হইত। কিন্তু কেহই আদরের সহিত উদ্যানে ইহার চাষ করিত না। অদ্যাপি এ দেশে ঐরূপ আরণ্য-গোলাপ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। আমি পূর্ব্ববঙ্গের নানাস্থানে নানা জাতীয় বন্য-গোলাপ দেখিয়াছি। ইহাদের অধিকাংশ জাতিই শ্বেতবর্ণের হয়। তন্মধ্যে, দুইটি জাতির নাম উল্লেখযোগ্য। এক-জাতির কাণ্ড সরু ও কণ্টকময়; এবং উহা মৃত্তিকাতে লতাইয়া যায়। পত্র ক্ষুদ্র, বল্লমাকার, ঈষৎ দীর্ঘ অর্থাৎ পত্রের দৈর্ঘ্য এক হইতে দেড় ইঞ্চি ও প্রস্থ অর্দ্ধ ইঞ্চি; এবং পত্রপার্শ্ব করাত-দন্তের অনুরূপ। পত্রবৃন্ত হ্রস্ব ও কণ্টক-যুক্ত; এবং ফুল ক্ষুদ্র, শ্বেতবর্ণ, বহুদল ও সুগন্ধি। ইহা এ দেশে কাঁটা-গোলাপ বা কাঠ-গোলাপ (Rosa Indica) নামে প্রসিদ্ধ। ইহা আরণ্য-জাতি। তবে কেহ কেহ, সখের হিসাবে, উদ্যানেও কাঠগোলাপগাছ রোপণ করিয়া থাকে। পাত্রেও ইহা রোপণ করা যায়। অপর জাতীয় গাছ ৪।৫ ফুট উচ্চ হয়। ইহার পত্র অতি ক্ষুদ্র; কাণ্ডত্বক সবুজাভ কৃষ্ণবর্ণ; ফুল ২।৩ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট, দুগ্ধবৎ শ্বেতবর্ণ ও সামান্য সুগন্ধযুক্ত; এবং গাছ কণ্টকময় হয়। পূর্ব্ববঙ্গের কোনও কোনও জঙ্গলে ও অরণ্যে ইহার গাছ স্বতঃই জন্মে। ইহা গুজাকাটা বা গুজাগোলাপ (Rosa Indica Var) নামে প্রসিদ্ধ। ইহার গাছে সুন্দররূপে বেড়া দেওয়ার কার্য্য চলে বলিয়া, ইহাকে বেড়ার উপযোগী গোলাপ (Hedge rose) বলা যায়। গুজাগোলাপের তিন হইতে পাঁচটির অধিক পাপ্‌ড়ি হয় না। পক্ষান্তরে, প্রথমোক্ত জাতির ফুলে বহুসংখ্যক পাপ্‌ড়ি দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ, এই জাতিই আয়ুর্ব্বেদোক্ত শতপত্রী বা সেঁওতির একটি জাতি-বিশেষ। ইহার পুষ্প-কেশর উজ্জ্বল পীতবর্ণ ও সুন্দর। ইহারও অন্য একটি জাতি আছে; উহা গুল্ম-স্বভাবাপন্ন। এই শেষোক্ত জাতির গাছ ৪।৫ ফুট উচ্চ হয়; ফুল—কাঠগোলাপের ফুল অপেক্ষাও বৃহৎ এবং বহুদলযুক্ত, ডবল, শ্বেতবর্ণ ও অতিশয় সুগন্ধি। ইহাই সেবতী (শতপত্রী) বা সেঁওতি (Rosa grandulifera. syn. Rosa Antifolia alba.) নামে প্রসিদ্ধ। সেঁওতিগাছ বারমাসই ফুলধারণ করিয়া থাকে। তবে শীতকালেই ফুলের সংখ্যা অধিক হয়। ডাঃ রকস্‌বার্গ অনুমান করেন যে, ইহার আদি জন্মস্থান চীনদেশ। বস্তুতঃ, এই অনুমান অলীক।

কেননা, অতি প্রাচীনকাল হইতেই, এ দেশে ইহা স্বতঃই জন্মিতেছে; বিশেষতঃ, আয়ুর্ব্বেদেও ইহার উল্লেখ রহিয়াছে। শতপত্রী-গাছ উদ্যানেই দৃষ্ট হয়;—বন্যাবস্থায় ইহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ইহার পুষ্পকেশর উজ্জ্বল পীতবর্ণ; সম্ভবতঃ, সেই জন্যই ইহার অন্য পর্য্যায় 'চারু-কেশরা'। আমাদের দেশের সেঁওতিই আয়ুর্ব্বেদোক্ত আসল শতপত্রী। ইহার অপর জাতির নাম 'Rosa Involucrata'. ইহারও জন্মস্থান নেপাল ও বঙ্গদেশ। ইহার ফুল নির্ম্মল শ্বেতবর্ণ। ইহাকে 'শাদা সেঁওতি' নামে অভিহিত করা যায়। 'Rosa Recurva' ইহার অন্য জাতি। ইহার জন্মস্থান নেপাল।

উক্ত কএকজাতীয় শ্বেত-গোলাপ ব্যতীত, আরও নানা জাতীয় আরণ্য শ্বেত-গোলাপ বঙ্গের নানাস্থানে দৃষ্ট হয়। উহাদের ফুল ক্ষুদ্র; এবং সুদৃশ্যও নহে। অধিকন্তু, ঐ সকল জাতির ফুল গন্ধহীন বলিয়া, উহারা সর্ব্বত্রই অনাদৃত। গন্ধহীন শ্বেত-গোলাপের মধ্যে 'Rosa Pubescens' নামক জাতিই উৎকৃষ্ট। ইহার জন্মস্থান রোহিলখণ্ডের জঙ্গল।

উল্লিখিত কএকজাতীয় গোলাপের কোনও জাতিই উৎকৃষ্ট নহে। বস্তুতঃ, অতি প্রাচীনকালে, এ দেশে উৎকৃষ্ট গোলাপ অতিশয় দুর্ল্লভ ছিল। তৎকালে, চীনা, বসোরা ও মাস্ক (Musk) জাতীয় নিকৃষ্ট গোলাপ ব্যতীত, অন্য কোনও জাতীয় গোলাপ পৃথিবীর কুত্রাপি আদৌ ছিল না। অধুনা, বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় শত শত নূতন জাতির উৎপত্তি হইয়াছে; এবং ক্রমশঃই উহার সংখ্যাবৃদ্ধিও ঘটিতেছে। আমাদের দেশে আজকাল যে নানা জাতীয় উৎকৃষ্ট গোলাপ পাওয়া যায়, উহার সকল জাতিই বিভিন্ন দেশ হইতে এ দেশে আনীত হইয়াছে।

অতি প্রাচীনকালে, তুরস্ক এবং পারস্যেও বহুজাতীয় গোলাপ বন্যাবস্থায় স্বতঃই জন্মিত। বসোরা ও ডামাস্কস্ গোলাপের নামই তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য। তৎকালে, উক্ত দেশ-সমূহে প্রধানতঃ পাটল ও শ্বেত বর্ণের গোলাপই দৃষ্টিগোচর হইত। ঐ সকল দেশের নানাপ্রকার শ্বেত-গোলাপের সহিত তাৎকালিক ভারতবর্ষীয় শ্বেত-গোলাপের সাদৃশ্যের প্রমাণ সুলভ। অধুনা, এ দেশের সর্ব্বত্র পাটলবর্ণের যে গোলাপ দৃষ্ট হয়, এবং যে জাতির ২।১টি গাছ এ দেশের প্রায় সকল বাগানেই সুলভ, উহার আদিম অধিবাস ককেসাস্‌পর্ব্বত-সন্নিহিত প্রদেশসমূহ, সিরিয়া, ডমাস্কাস্ ও বসোরা। ইহা 'Rosa centrifolia' নামে পরিচিত। ইহার বর্ণ পাটল। ইহা সাধারণ গোলাপ (Common rose) হইলেও, সর্ব্বপ্রকার পাটলবর্ণের গোলাপমধ্যে, ইহাই এ দেশের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন অধিবাসী। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদে ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। সুতরাং, এই জাতি যে বসোরা বা ডামাস্কাস্ প্রভৃতি দেশ হইতেই এ দেশে আনীত হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহেই বলা যায়। পাটলবর্ণের প্রকৃত শতপত্রী-গোলাপের সহিত ইহার অনেকাংশেই সাদৃশ্য রহিয়াছে। 'Rosa Centrifolia' ও খাস্ বসোরা জাতীয় গোলাপ হইতেই, প্রাচীনকালে, আতর ও গোলাপ জল প্রস্তুত করা হইত। আতরাদি প্রস্তুত করিতে বহুলপরিমাণে গোলাপের আবশ্যক হয় বলিয়া, পারস্যদেশে, উক্ত উভয় প্রকার গোলাপেরই, বিস্তৃতভাবে চাষ-প্রথা প্রচলিত ছিল। ইহারা ইউরোপে নীত হইলে পর, ক্যাবেজ্ সেণ্টি-ফলিয়া (Cabbage centifolia) ও প্রভেন্স (Provence) নামে অভিহিত হইতেছে। অন্য জাতির পরাগ-সঙ্গম দ্বারা, এই উভয়জাতি হইতেই এলিজাবেথ ভিনিবেয়ন্ (Elizabeth Vinebeon), সিল্‌ভার কুইন্ (Silver queen) প্রভৃতি কতকগুলি জাতির উৎপত্তি হইয়াছে।

মুসলমানরাজত্বকালে, তুরস্ক (বসোরা ও ডামাস্কস্) এবং পারস্যদেশ হইতে যে, কএকজাতীয় গোলাপ এ দেশে আনীত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ অদ্যাপি প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভারতের উত্তর-পশ্চিমপ্রান্তস্থ দেশসমূহেই, ঐ সকল জাতীয় গোলাপ সর্ব্বাদৌ আনীত হইয়াছিল। তন্মধ্যে, একমাত্র গুজরাটেই অধিকাংশ জাতি স্থানলাভ করিয়াছে। গুজরাটের সমৃদ্ধিশালীব্যক্তিরাও, সখের নিমিত্ত, তুরস্ক ও পারস্য দেশ হইতে, বহু অর্থব্যয় করিয়া, নানা জাতীয় গোলাপ আনয়ন করিয়াছিলেন। পুরাতত্ত্ববিদ্ রসিউদ্দিনের মতে, চতুর্দ্দশ শতাব্দীতেই তুরস্ক ও পারস্য দেশের গোলাপ প্রথমতঃ গুজরাটে আনীত হইয়াছিল। ঐ সময়ে সর্ব্বসমেত প্রায় ৭০ জাতীয় গোলাপ ভারতবর্ষে আনীত হয়।

প্রাচীন ইউরোপীয় তুরস্কস্থিত পূর্ব্ব-রুমেলিয়া-প্রদেশে বিস্তৃতপরিমাণ ভূমিতেই গোলাপের চাষ হইত। তৎকালে, এড্রিয়ানোপল্ গোলাপ-চাষের প্রধান কেন্দ্র স্থান ছিল। এসিয়িক তুরস্কের ব্রাউসা ও উছলাক্ প্রদেশেও বিস্তৃতভাবে গোলাপের চাষ হইত। এসিয়িক তুরস্ক হইতেই, ক্রমান্বয়ে ইউরোপীয় তুরস্কে ও ইউরোপের অন্যান্য স্থানে এবং ভারতবর্ষে গোলাপের চাষ বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে। ভারতবর্ষের মধ্যে গাজীপুরেই সর্ব্বপ্রথম বিস্তৃতভাবে গোলাপের চাষ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল; এবং এক্ষণও তথায় বিস্তৃতভাবেই গোলাপের চাষ হইতেছে।

দিল্লীশ্বর বাবর, ১৫১৯ খৃঃ অব্দে, তাঁহার শাসন-বিবরণীতে গোলাপচাষের স্থূলতত্ত্ব সন্নিবেশ করিয়া গিয়াছেন। ১৬০৫ খৃঃ অব্দে, সম্রাট জাহাঙ্গীরও তাঁহার শাসন-বিবরণীতে লিখিয়াছেন যে, তৎকালে হিন্দুস্থানে মাস্ক ও ডামাস্ক গোলাপ নামে নানাজাতীয় গোলাপের চাষ হইত। ১৬৭৫ খৃঃ অব্দে, ফ্রায়ার (Fryer) তাঁহার 'পারস্য ও ইষ্ট ইণ্ডিয়ার ইতিবৃত্ত' নামক গ্রন্থে, তৎকালে সুরাটে বহু জাতীয় গোলাপের চাষ হইতে পারে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। উল্লিখিত দৃষ্টান্ত কএকটি হইতে স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পূর্ব্বে, এ দেশে কএকজাতীয় শ্বেতবর্ণের গোলাপ ভিন্ন অন্য কোনও বর্ণের বা জাতীয় গোলাপ ছিল না। আয়ুর্ব্বেদেও একমাত্র শ্বেত গোলাপেরই নাম পাওয়া যায়। সুতরাং, তৎকালে যে ভারতবর্ষে উৎকৃষ্ট জাতীয় কোনরূপ গোলাপ ছিল না, তাহা সুনিশ্চিত। প্রাচীনকালে বঙ্গদেশের উত্তরভাগের কোনও কোনও জঙ্গলে, নেপালে এবং রোহিলাখণ্ডের কোন কোন স্থানেই অধিক পরিমাণে শ্বেত-গোলাপ স্বতঃই জন্মিত। তদ্ভিন্ন, ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে আরণ্য শ্বেত-গোলাপও বড় সুলভ ছিল না।

গ্রীক ও রোমান গ্রন্থকারদিগের মতে,—"সিরিয়াই গোলাপের আদি জন্মস্থান। সিরিয়া নামটি সিউরী নামক একজাতীয় গোলাপের নাম হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে।" এই মত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে, এসিয়িক তুরস্কেই গোলাপের আদিম অধিবাস বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু অনেকেই, এই মতের সমর্থন করেন না। যাহা হউক, অতি প্রাচীনকালে, তুরস্কে ও পারস্যে মাত্র ২৫।৩০ জাতীয় গোলাপই দৃষ্টিগোচর হইত। তৎপর, ঐ সকল জাতির পরাগ-সঙ্গম দ্বারা ক্রমে নানাবর্ণের সঙ্করজাতির উৎপত্তি হইতেছে। অতি প্রাচীনসময়ে, (১) শ্বেত, (২) পাটল, (৩) লোহিত ও (৪) পীত—এই চারিপ্রকার বর্ণেরই গোলাপ ছিল। কিন্তু অধুনা, ঐ চারিপ্রকার বর্ণ হইতেই শ্বেত-লোহিত, শ্বেত-পাটল, পাটল-লোহিত, পাতলা লাল, উজ্জ্বল পাটল, নীলাভ গাঢ়লাল, কৃষ্ণাভ লাল, শ্বেত-পীত ও গাঢ় লোহিত ইত্যাদি নানা বর্ণের গোলাপের উৎপত্তি হইয়াছে। বিভিন্ন জাতির সংযোগে এক্ষণ নানা বর্ণের ন্যূনাধিক ১২০০ জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মেনী এবং আমেরিকাই সঙ্করজাতির উৎপাদক। ঐ সকল দেশ ও মহাদেশে প্রতিবৎসরই নানা বর্ণের সঙ্কর-জাতির উৎপত্তি হইতেছে। সুতরাং, গোলাপের জাতির সংখ্যা নির্দ্দেশ করা সম্ভবপর নহে। অধুনা, এ দেশের উদ্যানেও ন্যূনাধিক ৬০০ জাতীয় গোলাপ স্থানলাভ করিয়াছে। ঐ সকল গোলাপই উৎকৃষ্ট জাতীয় বলিয়া বিশেষ সমাদৃত। উক্ত ছয়শত জাতির মধ্যে মাত্র ২।৪টি জাতি এ দেশের নিজস্ব; এবং অবশিষ্ট সকল জাতীয় গোলাপই বিভিন্ন দেশ হইতে বিভিন্নসময়ে এ দেশে আনীত হইয়াছে। সৌখীনব্যক্তির পক্ষে ন্যূনাধিক তিনশত জাতিই আবশ্যক।

প্রাচীনকালে চীনদেশেও নানাজাতীয় গোলাপ ছিল। উহার প্রায় সকল জাতিই এ দেশে আনীত হইয়াছে। চীন হইতে আনীত হইয়াছিল বলিয়া, প্রাচীনসময়ে, উহাদের সকল জাতিরই সাধারণ নাম ছিল—চীনা গোলাপ। অদ্যাপি উহারা ঐ নামেই এ দেশে পরিচিত। তন্মধ্যে, 'রোসা চাইনেন্‌সিস্' (Rosa Chinensis), 'রোসা ডিফিউজা' (Rosa Diffusa), 'রোসা মাইক্রোফাইলা' (Rosa Microphylla) 'রোসা ট্রাইফাইলা (Rosa Triphylla) এবং 'রোসা ইনার্মিস্ (Rosa Inermis) প্রভৃতি কএকটি জাতির নামই উল্লেখযোগ্য। রোসা চাইনেন্‌সিস্ জাতির ফুল শ্বেতবর্ণ। ইহাকে কাঁটা বা কাঠগোলাপবিশেষ বলা যায়। ইহা 'রোসা ইণ্ডিকা' (Rosa Indica) জাতিরই সমকক্ষ জাতি। রোসা

ডিফিউজা, রোসা টাইফাইলা এবং রোসা মাইক্রোফাইলা জাতির ফুলও শ্বেতবর্ণ। রোসা ইনার্ম্মার শ্বেত ও পীত ভেদে দুইটী জাতি আছে। ভারতবর্ষ, নেপাল ও চীনদেশীয় পীতগোলাপমধ্যে, ইহাই আদি জাতি।

মুসলমান-রাজত্বকালে তুরস্ক, পারস্য প্রভৃতি দেশ হইতে কএকজাতীয় তদ্দেশীয় গোলাপ এদেশে আনীত হইয়াছিল। ঐ সকল গোলাপই সর্ব্বপ্রথম এ দেশের উদ্যানে স্থানলাভ করিয়াছে। কিন্তু তৎকালে একমাত্র ধনবানদিগের উদ্যানেই গোলাপগাছ পরিলক্ষিত হইত। কথিত আছে যে, ভারতের মোগল-সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের প্রিয়তমা মহিষী নুরজহাঁ (নুরজাহান), সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে, গোলাপী আতরের সৃষ্টি করেন। বস্তুতঃ, ইহা সত্য নহে। তবে তাঁহার সময়েই যে এ দেশে আতরের ব্যবহার-প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল, তাহা নিঃসন্দেহেই বলা যায়। ইংরেজ-রাজত্বকালেই বিভিন্ন দেশ হইতে শত শত জাতীয় উৎকৃষ্ট গোলাপ এ দেশে আনীত হইয়াছে; এবং এ দেশের সর্ব্বত্রই গোলাপ জন্মিতেছে।

জাতি-বিভাগ—সাধারণতঃ, গোলাপজাতিকে (১) গুল্ম, (২) লতা, এবং (৩) উর্দ্ধগ-লতা—এই তিনটি প্রধানভাগে বিভক্ত করা যায়। গুল্মজাতীয় গোলাপগাছ ৮।১০ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ হয়। কিন্তু এই জাতীয় গাছ ছাঁটিয়া প্রমাণমত (standard) আকারে রক্ষা করিতে হয়। জাফ্‌রি, ট্রেলি বা মাচা বান্ধিয়া লতা-জাতির গাছ রোপণ করা আবশ্যক। কেননা, উহাদের গাছও লতার ন্যায় ডালপালা বিস্তার করিয়া থাকে। উর্দ্ধগ-লতাজাতীয় গোলাপের চাষ অপেক্ষাকৃত কঠিন। ইহাদের কোনও কোনও জাতি অতিশয় উর্দ্ধে গমন করিয়া থাকে। এমন কি, কখন কখন উর্দ্ধগলতার গাছ (জাতিবিশেষ) ৩০।৪০ ফুট বা ততোধিক উচ্চেও বর্দ্ধিত হয়। উচ্চ বৃক্ষ, খুঁটী বা স্তম্ভের পার্শ্বেই উর্দ্ধগলতাজাতীয় গোলাপগাছ রোপণ করিতে হয়। এই জাতীয় গাছ স্তম্ভাদি সাজাইবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী বলিয়া, ইহারা স্তম্ভ-গোলাপ (Pillar rose) মধ্যে পরিগণিত। ইহাদের চাষ-প্রণালী স্বতন্ত্রভাবে লিখিত হইবে।

গোলাপের কতকগুলি আরণ্য-জাতিও আছে। উহাদের ফুল অকর্ম্মণ্য। তবে, বন্য-গোলাপগাছ দ্বারা বেড়ার কার্য্য সাধিত হয়। অনেক স্থলে, শুধু বেড়ার জন্যই উহাদের গাছরোপণ-প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে। তদ্ভিন্ন, জোড়-কলম বান্ধিতেও বন্য-গোলাপগাছের প্রয়োজন হয়। 'রোসা জাইগেন্টিয়া' (Rosa Gigantea) ও 'অষ্ট্রীয়ান্ ব্রায়ার' (Austrian Briar) প্রভৃতি এই জাতির অন্তর্গত। ইহার কতকগুলি অতিক্ষুদ্র পুষ্পপ্রসূ-জাতিও আছে। উহারা 'মিনিএচার' (Miniature rose) গোলাপ নামে পরিচিত। ঐ সকল গোলাপ টবে বা পাত্রে চাষের উপযোগী। ইহাদের অধিকাংশ জাতির ফুলই গন্ধহীন হইলেও, ফুলের সৌন্দর্য্য ও বর্ণের চাক্‌চিক্যের নিমিত্তই উহারা আদৃত হইয়া থাকে। যে সকল জাতির গোলাপ আকারে বৃহৎ, সুগঠিত, বর্ণচাক্‌চিক্যযুক্ত, সুগন্ধি; যাহার পাপ্‌ড়ি পুরু ও মাংসল এবং যাহা প্রচুর পরিমাণে ও বারমাসই ফুলধারণ করে, সেই সকল জাতীয় গোলাপই উৎকৃষ্ট। স্থূলতঃ, যে সকল গোলাপ নয়নের ও নাসিকার তৃপ্তিসাধক ও মাংসল, উহাই উৎকৃষ্ট জাতীয় গোলাপমধ্যে সর্ব্বোচ্চস্থানলাভের অধিকারী।

নাম—পারস্য-ভাষায় গোলাপকে গুল্ ও গুলেমুস্কী কহে। গুল্ নাম হইতেই গুলাব্ ও গোলাপ নামের উৎপত্তি হইয়াছে। আরব ও তুরস্কে ইহা গুলকন্দ্ ও জরংজবীন নামে পরিচিত। ইহা হিন্দুস্থানে সেবতী, গুলাব ও কুজা; মহারাষ্ট্রে গুলাবাচেং-ফুল, সেবন্তী ও কাঠে-সেবন্তী (কাঠ সেঁওতি বা কাঠ গোলাপ); কর্ণাটে সেংবতিগে ও চেবড়ে; তৈলঙ্গে চেমন্তিচেট্টু; গুজরাটে সেবতী, গুলাব্ ও মোশমী গুলাব্ এবং আসামে বগা-গোলাপ নামে পরিচিত।

লাটীন-ভাষায় গোলাপকে রোসা (Rosa); ফরাসী ভাষায় রোজ্ (Rose); স্পেন, পর্টুগিজ ও ইটালী ভাষায় রোসা (Rosa) এবং এঙ্গলোসেক্‌সন্ (ইংরেজি), ডেনিস্ ও জর্ম্মাণ ভাষায় রোজ্ (Rose) কহে। পাশ্চাত্য-দেশে 'রোজ্' গোলাপজাতির সাধারণ নাম। পক্ষান্তরে, প্রাচ্য-দেশে বর্ণভেদে ইহার নামেরও স্বাতন্ত্র্য লক্ষিত হয়।

সংস্কৃতভাষায় শতপত্রীর (শাদা গোলাপ) নাম-পর্য্যায়—শতপত্রী, তরুণী, কর্ণিকা, চারুকেশরা, মহাকুমারী, গন্ধাঢ্যা, লাক্ষা, কৃষ্ণা ও পরিচারক। ইহার কৃষ্ণা নামটীর সার্থকতা প্রতিপাদন করিতে হইলে, এ দেশে বৈদিকযুগে যে কৃষ্ণবর্ণ একজাতীয় গোলাপ ছিল, উহাই অনুমিত হয়। কিন্তু অধুনা, উহা দুর্লভ। লেণ্ডেলিকাস্ (Landlicus), রেনল্ডস্ হোল (Reynolds Hole) শার্লি হিবার্ড (Shirley Hibbard) প্রভৃতি প্রবীণ গোলাপতত্ত্ববিদ্-গণের মতে, এ পর্য্যন্ত নীল ও কৃষ্ণ গোলাপ আবিষ্কৃত হয় নাই। লেণ্ডেলিকাস্ বলিয়াছেন;—"You will then be wafted away in a dream to the paradise of Roses, the blue rose and the black rose, that are said to be, but alas! are not." ব্লাক প্রিন্স (Black Prince) নামক একপ্রকার গোলাপ আছে। উহাও কৃষ্ণবর্ণের নহে;—উহার বর্ণ কৃষ্ণাভ লোহিত। ৮।১০ বৎসর গত হইল, নীল-গোলাপ (Blue rose) নামে একজাতীয় গোলাপের আবিষ্কার হইয়াছে। কিন্তু উহাও খাঁটী নীল-গোলাপ নহে। উহার বর্ণ নীলাভ-লোহিত। কৃষ্ণ ও নীল গোলাপ ব্যতীত সবুজ-বর্ণের গোলাপও (Green rose) দুর্লভ। 'রোসা ভার্ডিফ্লোরা' (Rosa Verdiflora) নামে একজাতীয় গোলাপ 'সবুজ-গোলাপ' নামে বাজারে বিক্রীত হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে, উহা পুষ্পমধ্যে পরিগণিত হইবার যোগ্য নহে। কারণ, উহা গোলাপের পুষ্পাবরক-পত্রের (Calyx leaves) সমষ্টি মাত্র।

গোলাপসম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ—অধুনা, পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই গোলাপ জন্মিতেছে। গোলাপ এ দেশেরও সর্ব্বজনপরিচিত। সুতরাং, ইহার রূপবর্ণনা তত প্রয়োজনীয় নহে। ইউরোপে ইহা পুষ্পরাণী (queen of flowers) নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ, বর্ণ-বৈচিত্র্য, সৌরভের মাধুর্য্য এবং গঠন-পারিপাট্য—একাধারে রূপ ও গুণের সমাক্ উৎকর্ষহেতু, উহার উক্তরূপ নামকরণ সমীচীন বলিয়াই মনে লয়। গোলাপের রূপ ও গুণ সন্দর্শন করিয়া, একদা হোমার (Homer), হোরেস্ (Horace) প্রভৃতি প্রাচীন এবং তৎপরবর্ত্তী নব্য ইউরোপীয় কবিগণও মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের রচিত কবিতাই ইহার জীবন্ত প্রমাণ। প্রকৃতিরাজ্যে অতুল সৌন্দর্য্যের দৃষ্টান্ত একমাত্র গোলাপফুলেই সর্ব্বথা প্রযোজ্য। সেই জন্যই গোলাপতত্ত্ববিদ্ রেনল্ডস্ হোল তাঁহার গোলাপের চাষসম্বন্ধীয় গ্রন্থের ভূমিকাতে লিখিয়াছেন,—"যে ব্যক্তির উদ্যান রমণীয় গোলাপ-পুষ্পে সুশোভিত, তাঁহার হৃদয়-উদ্যানেও অবশ্যই গোলাপের অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য প্রতিফলিত হইবে। পুষ্প-রাণীর প্রণয়-পিপাসু ব্যক্তি তাঁহার জীবনে ইহার রূপরাশি কখনও ভুলিতে পারিবেন না। সৌন্দর্য্যই মানবহৃদয়ে সম্মোহন-বাণ বিদ্ধ করিয়া থাকে। রূপের ছটায় মানব সহজেই মুগ্ধ হইয়া পড়ে। পুষ্পরাণীর সৌন্দর্য্যে মানব কোন ছার, দেবতাগণও বিমুগ্ধ হইয়া থাকেন। অলিকুল পুষ্পরাণীর অতুলনীয় সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ ও আত্মহারা হইয়া, সতত তাহার মুখচুম্বন করিতেছে। কিন্তু তথাপি, উহারা পরিতৃপ্ত নহে। গোলাপ দেবারাধ্য পুষ্প। নানা-বর্ণসমন্বিত এবং মধুর সৌরভপূর্ণ সুদর্শন গোলাপ-পুষ্প প্রকৃতই মনোমোহকর। ইহাদের সুরভি মকরন্দ যখন বায়ুহিল্লোলে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া নাসিকারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হয়, তখন মানবহৃদয়ে যে কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উদ্রেক হয়, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা কষ্টকর। যে উদ্যানে গোলাপ-ফুলের অভাব, উহা উদ্যানমধ্যে পরিগণিত হইবার যোগ্য নহে।" বস্তুতঃ, এই উক্তিকে অতিরঞ্জিত বলা যায় না। সমগ্র পৃথিবীবাসী আবালবৃদ্ধবনিতারই গোলাপ বড় আদরের সামগ্রী; বিশেষতঃ, পাশ্চাত্যদেশবাসীরা ত গোলাপের রূপে-গুণে পাগল হইয়াই রহিয়াছে।

অতি প্রাচীনসময়ে, এ দেশে অতি সুন্দর ও উৎকৃষ্ট গোলাপ পাওয়া যাইত না। শুধু এ দেশ কেন, ইহার অন্য জন্মভূমি পারস্য এবং তুরস্কেও সুন্দর গোলাপের অভাব ছিল। ভারত, তুরস্ক ও পারস্য প্রভৃতি স্থান (আদি জন্মভূমি) হইতে ইউরোপে নীত হইবার পর হইতেই, তথায় ইহার উৎকর্ষসাধন-কার্য্য আরব্ধ হইয়াছে। পুরাকালে ইউরোপে গোলাপ ছিল না। উপরোক্ত দেশসমূহ হইতেই, উহা সর্ব্বপ্রথম ইউরোপে নীত হইয়াছিল। ন্যূনাধিক দুই শতাব্দী

যাবং ইউরোপে গোলাপের চাষ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ইউরোপে নীত হইবার পর, তথায় সর্ব্বাগ্রে গ্রীষ্ম-গোলাপ (Summer rose) নামে একজাতীয় সঙ্কর-গোলাপ উৎপাদিত হয়। উহা এ দেশের নিম্নভূমির জল-বায়ুর পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী ছিল। এ দেশের পার্ব্বত্য-প্রদেশ ভিন্ন, অন্যত্র উহা পুষ্পপ্রসূ হওয়া দূরে থাকুক, জীবিতও রহিত না। প্রায় অশীতিবর্ষ অতিবাহিত হইল, সর্ব্বপ্রথম ইউরোপে এড্ওয়ার্ড (Edward) নামক অতি সুন্দর সঙ্করজাতি উৎপাদিত হয়। তৎপূর্ব্বে, সাধারণ বসোরা, মাস্ক, চীনা ও ডামস্কস্ জাতীয় গোলাপ ভিন্ন, অন্য জাতীয় গোলাপ তথায় হইত না। এই অশীতিবৎসরমধ্যেই ন্যূনাধিক ১২০০ নূতন জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। এতন্মধ্যে, অন্যূন ২।৩ শত জাতিই সঙ্কর। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে, বিশেষতঃ, ফ্রান্স, লণ্ডন ও জার্ম্মাণীতে এবং অধুনা, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিলাণ্ডে অসংখ্যক গোলাপ-ব্যবসায়ী রহিয়াছেন। এই সকল গোলাপ-ব্যবসায়ীরাই প্রতিবৎসর বহুসংখ্যক নূতন গোলাপ উৎপন্ন করিয়া থাকেন। নূতন একটি জাতি উৎপাদন করিতে পারিলেই, উৎপন্নকারী সংবাদপত্রে উহার রূপ, আকৃতি ও গুণ সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রশংসাবাদযুক্ত বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া থাকেন। প্রত্যেকটি নূতনজাতীয় গাছের মূল্য প্রথমাবস্থায় এক হইতে ২।৩ গিনি বা ততোধিক অর্থাৎ কিঞ্চিদধিক ১৫৲ টাকা হইতে প্রায় ৬৯৲ টাকা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, রূপ ও গুণের আধিক্যানুযায়ীই মূল্যেরও তারতম্য ঘটিয়া থাকে। ইউরোপ এবং আমেরিকা মহাদেশে সমৃদ্ধিশালী সৌখীনব্যক্তির অভাব নাই। তাঁহারা সখের জন্য অজস্র অর্থব্যয় করিতে কখনও কুণ্ঠিত হ'ন না। বিশেষতঃ, পাশ্চাত্য-দেশবাসীরা নূতনত্বেরই বিশেষ পক্ষপাতী। দেশে নূতন কিছু উৎপন্ন হইয়াছে জানিতে পারিলেই, তাঁহারা উহা সর্ব্বাগ্রে লাভ করিবার নিমিত্ত মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিয়া থাকেন। সুতরাং বহু অর্থব্যয়ে করিয়া বিজ্ঞাপন দিলেও, গোলাপ-উৎপাদকের লাভ ভিন্ন ক্ষতি হয় না। বিজ্ঞাপনের সাহায্যেই ঐ সকল মহাদেশের কৃষিজাত ও শিল্প দ্রব্যাদির প্রচুর কাটতি হইয়া থাকে। দেশে নূতন কোন দ্রব্য উৎপন্ন হইয়াছে জানিতে পারিলেই, পঙ্গপালের ন্যায়, সহস্র সহস্র ব্যক্তি উহা ক্রয় করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়ে। ইহাতে অনেকসময় নূতন উৎপন্নকারীর 'রাতারাতি বড়মানুষ' হওয়ায় সুবিধা ঘটিয়া উঠে। ক্রেতার অভাব হয় না বলিয়া নূতন, জাতি অচিরে দেশময় পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। তখন অন্যান্য ব্যবসায়ীরাও, উহা হইতে গাছ উৎপন্ন করিয়া, অর্থাৎ নূতন জাতির বংশবৃদ্ধি করিয়া, ঐ সকল গাছ অল্প মূল্যে বিক্রয় করিতে আরম্ভ করেন। উৎপাদক যখন দেখিলেন যে, তাঁহার উৎপাদিত নূতনজাতীয় গাছের মূল্য কমিয়া গিয়াছে, তখন তিনি আর একটী নূতন জাতি উৎপন্ন করিতে যত্নবান হ'ন। এইরূপেই ক্রমশঃ বহু নূতন জাতির সৃষ্টি হইতেছে। শুধু গোলাপ কেন, সকল প্রকার শস্যাদি সম্বন্ধেও একথা খাটে।

'উৎপাদিত সকল নূতন জাতীয় গোলাপই উৎকৃষ্ট হয় না। কখনও কখনও বিজ্ঞাপনের জোরে নিকৃষ্ট জাতীও উৎকৃষ্ট বলিয়া গৃহীত হয়। ঐরূপ বিজ্ঞাপনের প্রলোভনে ভুলিয়া, আমি অনেকবার ইংলণ্ড ও আমেরিকা হইতে নানা জাতীয় গোলাপগাছ আনয়ন করিয়া প্রতারিত হইয়াছি। আজ প্রায় ৩০ বৎসর অতিবাহিত হইল, আমি 'সেফো' (Sapho) ও 'সেম্পিয়ন্ অব্ দি ওয়ারল্ড' (Champion of the world) নামক দুই জাতীয় গোলাপের বিজ্ঞাপন, ইংলণ্ডের কোনও কোনও ঔদ্যানিক-পত্রিকায় (Garden-Magazine) পাঠ করিয়া, ঐ দুই জাতীয় গোলাপগাছই আনয়ন করিয়াছিলাম। গাছ দুইটী আমার নার্শারী-উদ্যানে রোপণ করিয়া, উহাদের যথোচিত পরিচর্য্যাও করিয়াছিলাম। যথাকালে গাছে ফুল ধরিল। কিন্তু উহাদের ফুল একেবারেই অকর্ম্মণ্য দেখিয়া বিশেষ পরিতাপ ভোগ করিতে হইয়াছিল। নামের আড়ম্বর দেখিয়া ও বিজ্ঞাপনের সকল অংশ পাঠ করিয়া, উক্ত উভয়প্রকার গোলাপই উৎকৃষ্ট হইবে বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। ফল হইল—'পশ্চাৎ ঋন্-ঋনায়তে' অর্থাৎ বিষম মনস্তাপ। কএকবৎসর অতীত হইল, একবার আমেরিকার একখানি সাময়িক-পত্রে (Magazine) নীল-গোলাপের (Blue rose) বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া, আমার মনে বিশেষ আনন্দের উদ্রেক হইয়াছিল। ভাবিলাম, যাহা

কখনও দেখি নাই, তাহা আনয়ন করিতেই হইবে। এবারও বিজ্ঞাপনের প্রলোভনে পড়িলাম, এবং বহু অর্থব্যয় করিয়া, আমেরিকা হইতে ছয়টি গাছ আনয়ন করিলাম। ঐ সকল গাছে যখন ফুলধারণ করিল, তখন দেখিলাম, উহার কোনটিই নীল-গোলাপ নহে;—ফুলের পাপ্ড়ির বর্ণ লোহিত; তবে উহার পার্শ্বদেশে নীলাভ লোহিতবর্ণের সামান্য একটি রেখা বিদ্যমান। এইরূপ গোলাপকে প্রকৃতপক্ষে নীল-গোলাপ বলা যায় না। বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া বিদেশ হইতে গাছ আনয়ন করিলে যে, কোনও কোনও সময়, প্রতারিত হইতে হয়, উল্লিখিত উদাহরণ দুইটি তাহারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

আবার কোনও কোনও সময়, যে জাতি যেরূপ জল-বায়ুর পক্ষে উপযোগী, বিজ্ঞাপনে তাহার উল্লেখ রহে না। সুতরাং, বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া গাছ আনয়ন করিলে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। যে সকল জাতি কেবল শীত-প্রধান স্থানেরই উপযোগী, উহা গ্রীষ্মপ্রধান-স্থানে পুষ্পপ্রসূ হয় না। অনুপযোগী স্থানে, কদাচিৎ পুষ্পধারণ করিলেও, ফুল অতি নিকৃষ্ট ও গন্ধহীন হইবে। পক্ষান্তরে, যে সকল জাতি কেবল গ্রীষ্মপ্রধান স্থানেরই উপযোগী, শীতপ্রধান-দেশে উহার চাষে কিছুই ফললাভ হইবে না। 'টার্ণারস্ ক্রিমশন্ রেম্ব্লার' (Turner's Crimson Rambler) নামক গোলাপগাছ একমাত্র শীতপ্রধান-দেশেরই উপযোগী। নিম্ন-প্রদেশে উহা কখনই পুষ্পধারণ করিবে না। বিলাতি নার্শারীর ক্যাটেলগ্ ও বিজ্ঞাপন পাঠ করিলে, উহার ন্যায় সুন্দর গোলাপ যে অতি অল্পই আছে, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু উহা কিপ্রকার জল-বায়ুর উপযোগী, বিজ্ঞাপন পাঠে তাহা অবগত হওয়া যায় না। এইরূপ শত শত জাতীয় গোলাপ আছে; ঐ সকল নিম্ন-প্রদেশের উপযোগী নহে। উহাদিগকে বহুমূল্যে ক্রয় করিয়া উদ্যানে রোপণ করিলে, তাহাতে কেবল অর্থ ও শ্রম ব্যয়ই লাভ হয়। তদ্ভিন্ন, বিষম মনস্তাপ ত আছেই। সুতরাং নার্শারীর বিজ্ঞাপন-পুস্তিকা (Catalogue) অথবা বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া গোলাপগাছ ক্রয় করিলে, অধিকাংশসময়েই ঠকিতে হয়। সেই জন্য গোলাপের চাষবিষয়ক উৎকৃষ্ট গ্রন্থপাঠ করিয়াই গোলাপের চাষ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাঙ্গালাভাষায় গোলাপসম্বন্ধীয় অবশ্যজ্ঞাতব্য তথ্যপূর্ণ কোনও গ্রন্থ অদ্যাপি প্রকাশিত হয় নাই। এই অভাব কথঞ্চিৎ দূরীকরণমানসে, আমি গোলাপসম্বন্ধীয় সকল তত্ত্বই সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করিব। গোলাপ সম্বন্ধে লিখিবার বিষয় এত আছে যে, সেই সকল বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিতে হইলে, "কৃষি-সম্পদের" আকার চতুর্গুণ বর্দ্ধিত করিলেও কুলাইবে না। আমার লিখিত বিষয় সংক্ষিপ্ত হইলেও, উহা আমার নিজের অভিজ্ঞতার কথা;—কোনও ইংরেজি গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ নহে। সুতরাং, তৎপাঠেই পাঠকগণ যৎকিঞ্চিৎ উপকৃত হইতে ও শিক্ষালাভ করিতে পারিবেন। প্রায় চত্বারিংশৎ-বর্ষ-হাতে হেতেড়ে গোলাপের চাষ করিয়াছি; সুতরাং তৎসম্বন্ধে যে আমার যৎকিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে, আমি ধারাবাহিক প্রবন্ধে, তাহাই "কৃষি-সম্পদের" পাঠকদিগকে শুনাইব।

পৃথিবীর সর্ব্বত্রই গোলাপের আদর অত্যধিকরূপে বাড়িয়া গিয়াছে। ফলে, প্রতিবৎসরই অন্ততঃ ২।৪ প্রকার নূতন গোলাপ উৎপাদিত হইতেছে সত্য, কিন্তু প্রথমাবস্থায় যে সকল গোলাপ উৎপন্ন করা হইয়াছিল, ২।৪টি জাতি ভিন্ন, তদ্রূপ উৎকৃষ্ট গোলাপ আর উৎপাদিত হয় নাই। প্রাচীনকালের রোসা সেন্টিফলিয়া, পলনিরণ (Paul Neron), মেরি বৌম্যান্ (Marie Bauman), সিনেটিয়ার ভেইসি (Senatiar Vaisse), জেভেয়ার ওলিবো (Xavier Olibo) এবং মণ্টীক্রীষ্টো (Monte Christo) প্রভৃতি গোলাপের ন্যায় উৎকৃষ্ট গোলাপ আর আবিষ্কৃত হয় নাই। বিগত ১৮৭০ খৃঃ অব্দের পরে, এ, কে, উইলিয়ামস্ (A. K.. Williams), হার ম্যাজেষ্টি (Her Majesty), কুইন অব্ কুইনস্ (queen of queesn), মারডেলি-ডি-লাইওনস্, গ্লোরি অব্ ওয়ালথাম্ (glory of Waltham), মিসেস্ হার্কনেস্ (Mrs. Harkness), অরোরা (Aurora), দি ব্রাইড্ (The Bride), দি কুইন (The queen), কেইসারিন্ আগষ্টা ভিক্টোরিয়া (Kaiserin Augusta Victoria) প্রভৃতি ২৫।৩০ জাতীয় গোলাপই, প্রাচীন-কালের গোলাপের ন্যায়, অত্যুৎকৃষ্ট হইয়াছে। কাহারও

কাহারও মতে, শেযোক্ত গোলাপগুলি প্রাচীনজাতীয় অত্যুৎকৃষ্ট গোলাপ অপেক্ষাও, কোনও কোনও গুণে, শ্রেষ্ঠ হইয়াছে। যাহা হউক, অধুনা যে সকল গোলাপ উৎপাদিত হইতেছে, উহার অধিকাংশ জাতিই নিকৃষ্ট। কোনও কোনও নূতন জাতির ফুল সুন্দর ও সুগন্ধযুক্ত হইলেও, উহারা পূর্ণরূপে বিকাশপ্রাপ্ত হয় না; অর্থাৎ অধিকাংশ সময়ই অর্দ্ধস্ফুট বা কোরকাবস্থাতে রহিয়াই শুষ্ক হইয়া যায়। কেবল সুগন্ধি প্রস্তুত করিবার নিমিত্তই, ঐ সকল অর্দ্ধস্ফুট গোলাপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোরক বা অর্দ্ধস্ফুট অবস্থায় ফুলের পাপ্ড়ি শুষ্ক হইয়া ঝরিয়া পড়ে বলিয়াই, সৌন্দর্য্যের হিসাবে, ঐ সকল নূতন জাতীয় গোলাপ অনাদৃত।

গোলাপের বিভিন্নরূপ নামকরণসম্বন্ধে কএকটী কথা এ স্থলে বক্তব্য। সাধারণতঃ, উৎপাদকের এবং যে দেশে উৎপন্ন হয়, সেই দেশের বা অন্য দেশের খ্যাতনামা ব্যক্তিগণের নামানুসারেই, গোলাপের নামকরণ হইয়া থাকে। কখনও কখনও গোলাপের বর্ণ বা গুণানুসারেও, উহাদের নাম রাখা হয়। প্রত্যেক উদ্ভিদের নামকরণসম্বন্ধেই এই রীতি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে সত্য, কিন্তু গোলাপ-জাতির নামকরণেই, উহার ভূয়ঃ ব্যবহার দৃষ্ট হয়। ল্যাক্সটন্ (Laxton) সাহেব যে গোলাপ উৎপাদন করিয়াছেন, তাঁহার নামানুসারেই, সেই গোলাপের নাম রিচার্ড লেক্সটন্ (Richard Laxton) রাখা হইয়াছে। পক্ষান্তরে, উইলিয়ম্ পল্ এণ্ড সনস্ (William Paul & sons) তাঁহাদের উৎপাদিত একজাতীয় গোলাপের নাম রাখিয়াছেন,—রেনল্ডস্ হোল (Reynold's Hole)। রেনল্ডস হোল্ একজন প্রধান গোলাপতত্ত্ববিদ্। তিনি গোলাপের চাষ-প্রণালীসম্বন্ধে একখানি বহুল তথ্যপূর্ণ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিবার উদ্দেশ্যেই, উক্ত কোম্পানী তাঁহাদের আবিষ্কৃত গোলাপের নাম 'রেনল্ডস্ হোল্' রাখিয়াছেন। আবার 'ব্লাক প্রিন্স' (Black Prince) নামক গোলাপের কৃষ্ণাভ-লোহিত বর্ণানুসারেই, উহার নামকরণ হইয়াছে। উষাকালীন মলিন সূর্য্যকিরণবৎ রক্তিমবর্ণের গোলাপের নামকরণ হইয়াছে,—উষাদেবী (Aurora)। পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্ত সকল হইতেই গোলাপের নামকরণ-পদ্ধতি সহজে উপলব্ধি হইবে, সন্দেহ নাই।

অনেকসময়ে 'কাণার নাম পদ্মলোচন' রাখা হয়; অর্থাৎ নামের সার্থকতা কিছুই রহে না। এই জন্যই অনভিজ্ঞব্যক্তিরা নামের আড়ম্বরেই ভুলিয়া যা'ন; এবং নাম ও বর্ণনার কুহকে ভুলিয়া বৃথা অর্থব্যয় করিয়া থাকেন। ঐরূপ সৌখীনকে অধিকাংশস্থলেই ঠকিতে হয়। আমিও অনেক ঠকিয়া শিখিয়াছি। সুতরাং, "কৃষি-সম্পদের" পাঠকদিগের মধ্যে কেহই যাহাতে প্রতারিত না হ'ন, তদুদ্দেশ্যে আমি প্রত্যেক জাতির বিবরণে, উহা এ দেশের নিম্ন-প্রদেশের উপযোগী হইবে কিনা, তাহার উল্লেখ করিব। আমার নির্দ্দেশানুযায়ী গোলাপগাছ ক্রয় করিয়া বাগানে রোপণ করিলে, অর্থ ও শ্রম বিফল হইবার আশঙ্কা রহিবে না।

মৃত্তিকা, আবহাওয়া এবং যথোচিত পরিচর্য্যার উপরেও গোলাপচাষের সফলতা অনেকাংশেই নির্ভর করিয়া থাকে। কোনও স্থলে, মৃত্তিকার দোষেও আশানুরূপ ফললাভ করা যায় না। উপযোগী ভূমি ও অনুকূল জলবায়ুবিশিষ্ট স্থানে গোলাপের চাষ করিলে নিস্ফল হওয়ার কারণ রহিবে না। এই সকল কথারই বিস্তৃত আলোচনা করিবার বাসনা রহিল।

ক্রমশঃ

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুহ।

কৃষি-শিক্ষা ও গোরক্ষা। *

[উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনীর রঙ্গপুর-নবম-অধিবেশনে, কৃষি-সাহিত্য সভার বৈঠকে, শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র সরকার বি, এল মহাশয় কর্ত্তৃক পঠিত।]

ভারতবর্ষ কৃষি-প্রধান বা কৃষি-প্রাণ দেশ। আবহমান কাল হই'তই ভারতবাসী কৃষিজীবী। বিগত আদম সুমারিতে (Census) প্রকাশ, এ দেশের অধিবাসীদের শতকরা ৮০ জন কৃষি ও তদানুষঙ্গিক কার্য্য করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করে। অবশিষ্ট কুড়ি জনেরও অর্দ্ধাংশ বা ততোধিক, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে, অল্পাধিক পরিমাণে, কৃষির সহিত সম্পৃক্ত রহিয়াছে। সুতরাং, এক কথায় বলিতে গেলে, ভারতবাসীর শতকরা নব্বইজনেরই একমাত্র জীবনোপায় কৃষি। এই কৃষির নানা কারণে অবনতি ঘটিয়াছে। ফলে, দেশে অন্ন-সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। বর্ত্তমান অন্ন-সমস্যা-সমাধান কিসে হইতে পারে, আজ সেই সম্বন্ধেই কএকটী কথা বলিতেছি।

বর্ত্তমানকালে, এ দেশের ভূমির উর্ব্বরতার হ্রাস ঘটিয়াছে। সুতরাং, এক্ষণ আর পূর্ব্বের ন্যায় প্রচুর পরিমাণে শস্য জন্মে না। পক্ষান্তরে, লোকসংখ্যা অত্যন্ত বাড়িয়াছে; বিশেষতঃ, দেশে যে শস্যাদি জন্মে, তাহার কতকাংশ, অবাধ বাণিজ্যের কল্যাণে, বিদেশে রপ্তানি হইয়া যায়। ফলে, চাষা-জমির পরিমাণ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হওয়া সত্ত্বেও, এ দেশজাত শস্যে, এ দেশবাসীর অন্নাভাব দূর হইতেছে না; এবং ক্রমশঃই উহা বর্দ্ধিতাকার ধারণ করিতেছে। যথোচিত পরিমাণে ও পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে, এ দেশের লোক ক্রমশঃ নানা রোগগ্রস্ত হইয়া হীনবল হইতেছে। ইহাতে অকাল-মৃত্যুর হার ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। এমতাবস্থায়, দেশবাসীকে রক্ষা করিতে হইলে, সর্ব্বাদৌ এ দেশের কৃষির উন্নতিসাধন করিতে হইবে। প্রধানতঃ কৃষি-শিক্ষা ও গোরক্ষার উপরই এ দেশের কৃষির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি নির্ভর করিয়া থাকে। এ জন্যই, তৎসম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা অত্যাবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।

শিক্ষার অভাবে ও কুশিক্ষার ফলে, দেশের আবালবৃদ্ধ-বনিতা ক্রমেই বিলাসী হইয়া পড়িতেছে। এই বিলাসিতাই এ দেশের সর্ব্বনাশের মূলকারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিলাসিতা যতই বাড়িতেছে, ততই চাষার ছেলেরও চাষের নেশা কমিয়া যাইতেছে, চাষ-বাসের প্রতি দেশবাসীর অযথা ঘৃণা এবং গোপালনে উপেক্ষা জন্মিতেছে। ইহাতে আমাদের স্বাস্থ্যকর ও পুষ্টিপ্রদ প্রধান খাদ্য—দুগ্ধ, ঘৃত, মাখন, দধি, ছানা এবং মৎস্য ও তরি-তরকারী প্রভৃতি ক্রমেই দুর্ম্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে। বিশুদ্ধ দুগ্ধের অভাবে, এ দেশের বহুসংখ্যক (শতকরা ৪৫ হইতে ৪৮) বালক-বালিকা নানাপ্রকার রোগগ্রস্ত হইয়া অকালে মানবলীলা-সম্বরণ করিতেছে। তদ্ভিন্ন, শিশু-মৃত্যুর হার অত্যধিকরূপে বাড়িয়া গিয়াছে। শিশু-মৃত্যুর হার আমাদের দেশে শতকরা ৪৫ বা ততোধিক; কিন্তু বিলাতে শতকরা পাঁচ হইতে আটটি মাত্র। বিশুদ্ধ ও পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্যের অভাবই ইহার প্রধান কারণ।

আমাদের প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ যেমন বেদ-বেদাঙ্গ ও দর্শনাদি শাস্ত্রের অনুশীলন করিয়াছিলেন, সেইরূপ বার্ত্তাশাস্ত্র বা কৃষি-গোপালন ইত্যাদি বিদ্যাসমূহের উৎকর্ষসাধন করিতেও বিমুখ ছিলেন না। তাঁহারা বহুসহস্র বৎসর পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলেন যে, কূর্ম্মপৃষ্ঠবৎ ভারতের বিশাল ভূভাগের অধিবাসীগণের পক্ষে জীবিকার্জ্জনের প্রকৃষ্ট পন্থা কৃষিবৃত্তি। সেই জন্যই তাঁহারা যেমন বলিয়া গিয়াছেন,—"তৎত্বমসি" "রসো বৈ সঃ" ইত্যাদি, তেমনি অপরদিকেও, তাঁহারাই "কৃষির্ধন্যা কৃষির্মেধ্যা জন্তূনাং জীবনং কৃষিঃ" বাক্যের সার্থকতা প্রতিপাদন করিয়াছিলেন। সেই প্রাচীন কৃষিই বা কিরূপ ছিল এবং আজই বা কি অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে, তাহা কি এক্ষণ চিন্তা করিবার সময় আইসে নাই? কৃষি ভুলিয়াই আমাদের যে এত দুর্দ্দশা হইয়াছে, দেশের আধুনিক চিন্তাশীল ব্যক্তিরা ইহা মনে করেন কি? যদি তাঁহারা তাহাই মনে করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের দৃষ্টিও এদিকে

* কৃষি-সাহিত্য সম্মিলনের কর্ত্তৃপক্ষগণ কর্ত্তৃক প্রবন্ধটির যে সকল অংশ প্রকাশযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় নাই, সেই সকল অংশ বাদে অবশিষ্টাংশই প্রকাশ করা গেল। কৃঃ সঃ সঃ।

বহুকাল পূর্ব্বেই আকৃষ্ট হইত। এ সকল বিষয় এক এক করিয়া আমি উল্লেখ করিব; এবং তাহার প্রতিকারার্থ কি উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, তাহাও বুঝাইতে প্রয়াস পাইব। দেশের দশেই যে দিন দেশ চিনিবে, দেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিসাধনে বদ্ধপরিকর হইবে, সেই শুভদিনে কৃষি আমাদের কৃষ্ণকথা বা জপমালা হইয়া পড়িবে। ফলে, আমাদের উদরপূর্ত্তির ব্যবস্থাও হইবে, এবং আমরা প্রকৃত মনুষ্যত্বও লাভ করিতে পারিব।

ভারতের কৃষি একদিন জগতের শীর্ষস্থানে অবস্থিত ছিল; এবং ভারতের শস্যসম্ভার সামুদ্রিক বাণিজ্যপথে দেশ-বিদেশে প্রেরিত হইত। ভারতের মণি-মুক্তা, মস্‌লিন, হীরক প্রভৃতি যেমন এককালে পাশ্চাত্য-দেশবাসীর অতি আদরের ধন ছিল, তেমন ভারতের শস্য-সম্পদও তাঁহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতে পারিয়াছিল। যে ভারত একদিন সভ্যজগতে 'সোণার ভারত' নামে বিখ্যাত ছিল, সেই ভারত আজ অন্নক্লিষ্ট, খাদ্যের কাঙ্গাল; ইহা অপেক্ষা আর দুরদৃষ্ট কি হইতে পারে? আমাদের দুরবস্থা ঘটিবার প্রকৃত কারণ কি, তাহা আমাদের বর্ত্তমান অন্ন-সমস্যার দিনে একবার আলোচনা করা উচিত। ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে এবং আমেরিকায় বৈজ্ঞানিক কৃষির সম্যক্ আলোচনা হওয়াতেই, তত্তৎস্থানে কৃষির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হইয়াছে। কৃষির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই, ঐ সকল দেশ ও মহাদেশে শিল্প-বাণিজ্যেরও বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়াছে। ফলে, ঐ সকল স্থানই আজ সভ্যজগতের শীর্ষস্থানাধিকার করিতে পারিয়াছে। পক্ষান্তরে, এ দেশ কৃষি-প্রধান বলিয়া পরিগণিত হইয়াও, এক্ষণ একমাত্র কৃষির অবনতির ফলেই, ক্রমশঃ নির্ধন ও নিরন্ন হইয়া পড়িতেছে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, আমাদের কৃষির অবনতি কেন; এবং কিরূপেই বা ইহার অবনতি ঘটিল? ইহার আলোচনাও ক্রমশঃই করিব।

সুসভ্য ইউরোপে এবং আমেরিকায় কৃষির সহিত কতকগুলি আনুষঙ্গিক কলাবিদ্যারও অনুশীলন করা হয়। আমাদের দেশে কিন্তু তাহা হয় না। পাশ্চাত্যদেশের কৃষি-পদ্ধতিও সর্ব্বাংশেই আমাদের দেশের উপযোগী নহে;—হইতেও পারে না। দেশ-কাল-পাত্রভেদে এবং সামাজিক কর্ম্মজীবনের গঠনানুযায়ী, পাশ্চাত্যদেশের কৃষি-প্রণালী ও এ দেশের কৃষি-পদ্ধতি স্বতন্ত্র। এই স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়াই, আমাদের দেশের কৃষির উন্নতিসাধন করিতে হইবে। তবে পাশ্চাত্যদেশের বৈজ্ঞানিক চাষ-প্রণালীও শিক্ষা করিতে এবং উহা আমাদের দেশের উপযোগী করিয়া লইতে হইবে। মোটকথা, আমাদের দেশের কৃষি-পদ্ধতির সংস্কার করিতে গিয়া, উহার বিলোপসাধন করিলে চলিবে না। সংস্কার বা উন্নতি ধ্বংসসাপেক্ষ হইতে পারে না। সুতরাং, যাহা চিরপ্রচলিত রীতি তাহা বিজ্ঞানসম্মত কিনা, তাহা বুঝিতে হইলেই কৃষি-শিক্ষার প্রয়োজন হইবে। দুঃখের বিষয়, এ দেশের প্রাচীন কৃষি-পদ্ধতি কৃষকসন্তানেরাও নানাকারণে অনেকটা ভুলিয়া গিয়াছে। সর্ব্বাদৌ তাহাই শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

আমাদের কৃষির প্রধান সহায় গো-বল। কিন্তু নানা কারণে, এ দেশে গোজাতিরও অবনতি ঘটিয়াছে। এ দেশের কৃষির সহিত গোজাতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্ত্তমান; সুতরাং একের উন্নতিতে অপরের উন্নতি বা একের অবনতিতে অপরের অবনতি অবশ্যম্ভাবী। আমাদের দেশে প্রাচীন-সময়ে দ্রোণক্ষীরা (এক দ্রোণ=৩২ সের) গাভী ছিল; কিন্তু কৃষির অবনতির সঙ্গে সঙ্গে, সেই সকল দুগ্ধবতী গাভীরও অভাব ঘটিয়াছে। যথোচিত খাদ্য, যত্ন এবং উৎকৃষ্ট ষণ্ডের অভাবে, এ দেশে আর, পূর্ব্বের ন্যায়, দুগ্ধবতী গাভী নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমাদের দেশের গীর, গুজরাটী, হাঁসি, মণ্টগোমেরী, কৃষ্ণা প্রভৃতি অত্যুৎকৃষ্ট দুগ্ধবতী গোজাতির বাস্তবিকই শোচনীয় অবনতি ঘটিয়াছে। পক্ষান্তরে, পাশ্চাত্য-দেশের গোজাতি উন্নতির চরমসীমায় উপনীত হইয়াছে। কেরী, ডিভন্, ডেক্‌সিটার, শর্টহর্ণ, এবার্ডিন, জার্সি, আরশায়ার প্রভৃতি পাশ্চাত্য-দেশীয় গাভী অত্যুৎকৃষ্ট দুগ্ধবতী গাভীর শীর্ষস্থানাধিকার করিয়াছে। আমাদের দেশে ঐ সকল অত্যুৎকৃষ্ট গাভীর ন্যায় দুগ্ধবতী গাভী এক্ষণ আর দৃষ্ট হয় না। এ দেশে, গাভীর ন্যায়, ষণ্ডেরও বিশেষ অবনতি ঘটিয়াছে। গোজাতির শোচনীয় অবনতি ঘটিবার মুখ্যকারণ কি এবং উহাদের কিরূপে যথোচিত উন্নতি ঘটিতে পারে, তদ্বিষয়ে ৩২ কোটী ভারতবাসীর কয়জন

চিন্তা করিয়া থাকেন? যে গোজাতির উন্নতির সহিত ভারতের কৃষির ও ভারতবাসীর স্বাস্থ্যোন্নতির বা জীবন-রক্ষার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বর্ত্তমান, সেই গোজাতির উন্নতি-বিষয়ক চিন্তা করিবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে। এই সময়ে সেই চিন্তা করিতে উদাসীন রহিলে, ধ্বংসোন্মুখ গোজাতিকে রক্ষাকরা সম্ভবপর হইবে কিনা সন্দেহ। যথোচিত খাদ্য, পুষ্টিকর খাদ্য এবং যথোচিত যত্ন—প্রধানতঃ এই কএকটীর অভাবে যে, এ দেশের গোজাতির অবনতি ঘটিয়াছে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। তদ্ভিন্ন, গোজনন-কার্য্যেও বিশেষ ত্রুটী ঘটিতেছে। পশুজননসম্বন্ধে আমাদের ঋষি-প্রণোদিত কতকগুলি জনন-নীতি আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেই নীতিগুলির প্রতি অনাস্থা-প্রদর্শন করিয়াই, আমরা গোজাতির অবনতি ঘটিবার পথ প্রশস্ত করিয়া তুলিয়াছি। আর্য্য ঋষি-প্রণোদিত জনন-নীতি আমরা সম্যক্ অবগত ছিলাম; কিন্তু এক্ষণ বিলাসপরায়ণ ও অনুকরণ-প্রিয় হইয়া পড়াতেই, ঐ সকল নীতি একরূপ ভুলিয়াই গিয়াছি। পাশ্চাত্য-চালুনীর ভিতর দিয়া কোনও অভিনব বিষয় আমাদের নিকট না আসিলে, এক্ষণ আমরা তাহা গ্রহণ করিতে পারি না বা গ্রহণ করি না। কাজেই পাশ্চাত্য-নীতির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়াই আমাদিগকে নিশ্চিন্ত রহিতে হয়। ফলে, ঐ সকল নীতির কতগুলি হিতকর এবং আমাদের দেশের জল-বায়ুর উপযোগী, তাহার বিচার আমরা করি না বা করিতে চেষ্টাও করি না। নকুল, ভেড়, মৎস্য, হনুমান, পরাশর প্রভৃতি আর্য্য ঋষিগণের যে সকল পশুজনন ও পশুপালন সম্বন্ধীয় পুস্তক ছিল, তাহা এ দেশে একরূপ লুপ্ত হইয়াই গিয়াছে। এক্ষণ কেহ আর আর্য্য-ঋষিদিগের গোপালনসম্বন্ধীয় বিধিনিষেধ সকল সম্যকরূপে অবগতও নহেন। আবার, ঐ সকল যাঁহারা যৎকিঞ্চিৎ অবগত আছেন, তাঁহারাও ঋষিবাক্যে আস্থাস্থাপন করিতে ও তাঁহাদের বিধি-নিষেধ মানিয়া চলিতে পারেন না বা চলেন না। পক্ষান্তরে, বৈদেশিক গোপালন ও গোরক্ষণ প্রথাও এ দেশবাসীর একরূপ অজ্ঞাত। সুতরাং, আমাদের দেশের গোজাতির উন্নতির প্রকৃষ্ট পন্থা কি, তাহা আমরা সহজে সুস্থির করিতে পারিতেছি না।

কৃষি বলিলে, পাশ্চাত্য-দেশের অধিবাসীগণ কৃষি, গোরক্ষা, পক্ষীপালন, মক্ষিকাপালন, গব্যজাত খাদ্যসামগ্রীর ব্যবসায় প্রভৃতি বুঝেন; আর আমরা কৃষি বলিলে বুঝি, কেবল মাঠজ-শস্যোৎপাদন। কিন্তু তদ্দ্বারা গার্হস্থ্য-কৃষি অর্থাৎ শাক-সব্জী উৎপাদন, উদ্যান-রচনা, বনচর্য্যা প্রভৃতি বুঝি না। কৃষি বলিতে আমরা যাহা বুঝি না, তাহারও প্রয়োজনীয়তা আমাদের দেশে আছে; কিন্তু ঐ সকলের চাষ-বাস আমরা সম্যক্ জানি না, শিখিও না। নূতন কিছু শিখাইবার লোকও বড় নাই। সেই জন্য পাশ্চাত্য-দেশের ও আমাদের কৃষি-শিক্ষাবিষয়ে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন।

ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ড দেশে কতকগুলি উচ্চাঙ্গের কৃষি-কলেজ আছে। ঐ সকল কৃষি-কলেজ-সংশ্লিষ্ট সাধারণ কৃষি-বিদ্যালয়েরও অভাব নাই। কৃষি-কলেজ বা কৃষি-বিদ্যালয়ে স্বল্পকালব্যাপী ও দীর্ঘকালব্যাপী পাঠের ব্যবস্থা রহিয়াছে। বিদ্যালয়গুলিতে কৃষিশিক্ষা, রসায়ন, ভূমি-পরীক্ষা, সারপ্রদান, সার প্রস্তুত, মুর্গীপালন, মক্ষিকা-চাষ, ডিমের ব্যবসায় প্রভৃতি যথারীতি শিক্ষা দেওয়া হয়। কলেজগুলি হইতে উপাধিপত্র প্রদানেরও ব্যবস্থা রহিয়াছে। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকযুগে, পাশ্চাত্য-কৃষি ও কৃষি-শিক্ষার শীর্ষস্থান মার্কিণ—যুক্তপ্রদেশ অধিকার করিয়াছে। ঐ দেশের প্রত্যেক ষ্টেটে এক একটি করিয়া কৃষি-কলেজ ও তৎসংশ্রবে কৃষিপরীক্ষাগার আছে। সকল ষ্টেটের বা সমগ্র দেশের কৃষিকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত একটি কৃষি-বিভাগও রহিয়াছে। তদ্ভিন্ন, দেশের নানাস্থানে গ্রীষ্ম-বিদ্যালয়ও (Summer Schools) আছে। ঐ সকল বিদ্যালয়েও স্বল্প ও দীর্ঘকাল ব্যাপী পাঠাভ্যাসের সুনিয়ম ব্যবস্থিত রহিয়াছে। পাশ্চাত্য-দেশে কৃষিশিক্ষার সুব্যবস্থা রহিয়াছে বলিয়াই, অত্যল্পসময়েই কৃষির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে, আমাদের দেশে কৃষিশিক্ষার কোনও সুব্যবস্থাই নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সদাশয় গভর্ণমেণ্ট আমাদের সর্ব্বপ্রকার অভাব মোচন করিতে যত্নশীল এবং মুক্তহস্ত। কিন্তু তথাপি, আমাদের অভাব ঘোচে না—দৈন্য ও দুঃখ দূর হয় না কেন? তাহার প্রধান

কারণ, আমাদের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য সমবায়-ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। আমাদের পরস্পরের উপর পরস্পরের বিশ্বাস নাই, সহানুভূতি নাই এবং আমাদের হৃদয়ে উদারতা নাই। তাই আমরা অন্নাভাবক্লিষ্ট ও দরিদ্র। আমাদের আত্মসম্মানবোধ নাই, সুতরাং আত্মশক্তির উপরও বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিয়াছি। আমাদের যাহা ছিল বা আছে. তাহা ভাল কি মন্দ, সে বিচার করিবার শক্তিও এক্ষণ আমাদের নাই। আমাদের কি ছিল বা কিসের অভাব হইয়াছে. তাহা বুঝাইয়া দেওয়ার লোকও নাই। ফলে, আমরা দিগ্বিদিকশূন্য অনুকরণপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছি। আমাদের যাহা ভাল তাহাও আমরা গ্রহণ করিতে পারি না, তাই আমাদের এত দুঃখ। আমাদের কৃষি-প্রধান দেশে কোনও কালেই কৃষি-কলেজ বা কৃষি-বিদ্যালয় ছিল না সত্য, কিন্তু কৃষিশিক্ষার সর্ব্বপ্রকার সুব্যবস্থাই ছিল। সেই সকল প্রাচীন রীতি এক্ষণ আর এ দেশের কুত্রাপি বড় প্রচলিত নাই। আধুনিক রীতিতে কৃষিশিক্ষার উপযোগী কৃষি-কলেজ বা কৃষি-বিদ্যালয়েরও বিশেষ অভাব রহিয়াছে। ফলে, এ দেশের কৃষক-সন্তানের কৃষিশিক্ষার কোনই উপায় নাই।

আমাদের দেশের সামান্য শিক্ষিত কৃষক-সন্তানেরাও আত্মসম্মান-জ্ঞান বর্জ্জিত হইয়া পড়িয়াছে। তাহারাও আজকাল কৃষিকে অসম্মানের কার্য্য বলিয়া মনে করে; এবং হালের মুঠি ধরা অপেক্ষা চাকুরিই শতগুণে শ্রেয়ঃ বলিয়া বুঝিয়াছে। যাহার অদৃষ্টে অন্নবিস্তার পরের দাসত্বও যোটে না, তাহারাও বেতনভোগী কৃষাণের দ্বারাই কৃষিকার্য্য-নির্ব্বাহ করাইয়া থাকে। এমতাবস্থায়, উহাদিগকে পাশ্চাত্য-দেশের সুশিক্ষিত কৃষকদিগের আদর্শ বুঝাইয়া দিতে না পারিলে, উহাদের মতি-গতি ফিরিবে না ;—চাষেও নেশা জন্মিবে না। কৃষিকার্য্য যে হেয় নহে, তাহা এক্ষণ আর মুখে বলিলে চলিবে না। শিক্ষিত ভদ্রসন্তানেরা হাতে-হেতেড়ে চাষ-বাসে প্রবৃত্ত হইলেই, এ দেশের কৃষকসন্তান-দিগের ভুল বিশ্বাস সম্যকরূপে বিদূরীত হইবে; এবং ইহাতে তাহাদের কৃষিপ্রীতি জন্মিবে। তদ্ভিন্ন, কৃষক-সন্তানেরা শিক্ষিতলোকের বিজ্ঞানসম্মত-প্রণালীতে চাষ-বাস সন্দর্শন করিয়া, অনেক নূতন বিষয়ই সহজে শিক্ষালাভ করিতে পারিবে। পুস্তক পড়িয়া কৃষিশিক্ষা করিবার শক্তি এ দেশের অধিকাংশ কৃষক-সন্তানেরই নাই। কারণ, তাহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই অশিক্ষিত। আদর্শ কৃষি-ক্ষেত্র স্থাপন করিয়াই, কৃষকসন্তানদিগকে প্রত্যক্ষভাবে চাষ-বাস শিক্ষা দিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যসাধন করিতে হইলে, এ দেশের শিক্ষিতব্যক্তিদিগের ও জমিদার-সম্প্রদায়ের আদর্শ কৃষি-ক্ষেত্র সংস্থাপনে মনোযোগী হইতেই হইবে। এ দেশের নিরক্ষর ও নির্ধন কৃষক-সমাজে কৃষিশিক্ষা দিতে হইলে, উহাই সর্ব্বাপেক্ষা সহজ উপায়।

আমাদের দেশের কৃষকগণ শ্রমের মর্য্যাদা (dignity of labour) বুঝিয়া কাজ করে না ;—করিতেও জানে না। সেই জন্যই এ দেশে কৃষির এত অবনতি এবং অধোগতি হইয়াছে ও হইতেছে। শিক্ষিত চাষীর সংশ্রবে না আসিতে পারিলে, তাহারা সহজে শ্রমের মর্য্যাদা শিক্ষা করিতে সমর্থ হইবে না। শিক্ষিতব্যক্তি চাকুরির মায়া ছাড়িয়া চাষ-বাসে প্রবৃত্ত হইলে এবং হাতে-হেতেড়ে চাষ-বাস করিতে আরম্ভ করিলে, তাঁহাদিগকে আয়কর কৃষিতেই মনোনিবেশ করিতে হইবে। ফলে, তাঁহারা নানাস্থান হইতেই নানাজাতীয় উৎকৃষ্ট শস্যবীজাদি সংগ্রহ করিয়া লইতে পারিবেন। এ ক্ষমতা কৃষকদিগের নাই। তবে শিক্ষিতব্যক্তির চাষে সুফল ফলিতে দেখিলে, উহারা তাঁহার নিকট হইতে নূতন শস্য-বীজ অথবা বৈদেশিক উৎকৃষ্ট বীজাদি বিশেষ আগ্রহের সহিতই গ্রহণ করিবে। এইভাবেই এ দেশে ক্রমশঃ নূতন নূতন শস্যের চাষ প্রচলিত হইয়া পড়িবে। লাভের পরিমাণ অধিক না দেখিলে, এ দেশের কৃষকেরা যে তাহাদের অন্ধবিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, কোনও নূতন-আয়-কর শস্যাদির চাষেও প্রবৃত্ত হইবে না, ইহা সুনিশ্চিত। এ দেশের অশিক্ষিত কৃষকদিগকে চাক্ষুষ ফল দেখাইয়াই শিক্ষা দিতে হইবে। পক্ষান্তরে, তাহাদের শিক্ষাদাতাগণকে পাশ্চাত্য-প্রণালীতে অর্থাৎ গ্রন্থাদি পাঠ করিয়াই শিক্ষালাভ করিতে হইবে।

চিন্তার বহিঃপ্রকাশ হয় সাহিত্যে। কোনও জাতির সাহিত্য পাঠ করিলেই, সেই জাতির চিন্তাশক্তি কিরূপ

সমুন্নত, তাহা স্পষ্টই উপলব্ধি হইয়া থাকে। অধুনা, বঙ্গ-সাহিত্যে কত বিভিন্ন প্রকারের পুস্তক প্রকাশিত ও প্রচারিত হইতেছে; কিন্তু গভীর দুঃখের বিষয়, বাঙ্গালা-কৃষি-সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য পুস্তকের সংখ্যা আজিও অত্যল্পই রহিয়াছে। কৃষি-প্রাণ বঙ্গের কৃষি-সাহিত্যিকগণ কেন যে এদিকে দৃষ্টিপাত করেন না, তাহা বলিতে পারি না। বঙ্গের বরণীয় যে সকল কৃষি-সাহিত্যিক এই শুভ সম্মিলনক্ষেত্রে সমবেত হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই, কৃষি-সাহিত্যের পুষ্টিবৃদ্ধিকল্পে, গ্রন্থরচনায় মনোযোগী হওয়া বাঞ্ছনীয়। এক্ষণ কৃষিগ্রন্থপাঠকের সংখ্যা ক্রমে ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছে। সুতরাং গ্রন্থপ্রচারের পক্ষেও সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। কৃষি-কথা শুনিবার সৌভাগ্য আমাদের সকলসময় হয় না। কারণ, এ দেশে কৃষি-কথা শুনাইবার লোক নাই। শুনিবার লোকও পূর্ব্বে বড় বেশী ছিল না; কিন্তু বর্ত্তমান অন্ন-সমস্যার দিনে, উদরপূর্ত্তির ব্যবস্থা করিতে গিয়া, এক্ষণ অনেকেই কৃষিকথা শুনিবার জন্য লালায়িত। রাজনীতিক অধিকারের কথা, স্বায়ত্বশাসনের কথা, ব্যবস্থাপক-সভায় প্রতিনিধি-নির্ব্বাচনের কথা, মিউনিসিপালিটীর কথা—এ সব ত মেঘগর্জ্জনে শুনিতে পাই। কিন্তু দেশের মধ্যে সামান্য কৃষিকথাও শুনিতে পাই না! এ দেশের মুষ্টিমেয় শিক্ষিতলোকের সুখ-সুবিধা, অভাব-অভিযোগ, আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং উন্নতি ও অবনতির কথা সকলসময়েই শুনিতে পাই। কিন্তু বিশাল কৃষক-সম্প্রদায়ের কথা বা কৃষিকথাই শুনিতে পাই না! এমতাবস্থায়, "কৃষি-সম্পদ" ও "কৃষকের" ক্ষীণকণ্ঠে কৃষি-সাহিত্যিকগণ স্বীয় স্বীয় কণ্ঠ মিশাইয়া, তারস্বরে কৃষি-কথা শুনাইতে চেষ্টা করিবেন নাকি?

সমগ্র বঙ্গদেশে একটিও কৃষি-কলেজ বা কৃষি-বিদ্যালয় নাই। আমাদের দেশের কৃষক-সম্প্রদায়েরও কৃষিশিক্ষার প্রতি আদৌ লক্ষ্য নাই। ইহার একমাত্র কারণ, তাহাদের শিক্ষার অভাব এবং 'সব জান্তা' অভিমান ও অন্ধবিশ্বাস। এ দেশের কৃষক বড়ই রক্ষণশীল; সুতরাং উহারা নূতন কিছু করিতে রাজি হয় না। পুরুষ-পুরুষানুক্রমে যাহা করা হইতেছে, তদতিরিক্ত যে, নূতন আর কিছু করিবার আছে, এবং কৃষি-শিক্ষারও বিশেষ প্রয়োজন, তাহা তাহাদের ধারণার অতীত। বিশেষতঃ, তাহাদের দৃঢ়বিশ্বাস যে, চাষ-বাসসম্বন্ধে তাহাদের যৎকিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতাই যথেষ্ট। নূতন কোনও শস্যের চাষ করিলে, তাহাতে মহা অনিষ্ট ও নানাপ্রকার বিপদ ঘটিবে, ইহাই তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস। এই অন্ধবিশ্বাসের বা ভ্রান্তধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই, উহারা নূতনের পক্ষপাতী নহে। এ দেশের কৃষক-সম্প্রদায়ের ও কৃষির উন্নতিসাধন করিতে হইলে, যেভাবেই হউক, উহাদিগের মধ্যে কৃষিকথা প্রচার করিতেই হইবে; এবং তজ্জন্যই কৃষিগ্রন্থের ও কৃষি-পত্রিকার বিশেষ প্রয়োজন। পাশ্চাত্য-দেশের কৃষি-শিক্ষার একটু আভাষ দিয়াছি মাত্র। স্থানান্তরে, উহাই একটুকু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব। মার্কিণ-রাজ্যের কৃষিশিক্ষার বিষয় সম্যক্‌ভাবে জানিতে হইলে, আমি কৃষিতত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র গুহ এম্, আর, এইচ্, এস্ এবং কালিফর্ণিয়া-বার্কলী-কৃষি-কলেজের শ্রীযুক্ত স্বর্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের লিখিত প্রবন্ধ—যাহা বিগত ১৩২১ ও ১৩২২ সালের "কৃষি-সম্পদে" প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিতে অনুরোধ করি। এ দেশের ধ্বংসোন্মুখ গোজাতি এবং অনুন্নত কৃষিকে পুনর্জ্জীবিত করিতে হইলে, আমাদিগের কিভাবে এবং কি কি কার্য্য করা আবশ্যক, আমি বিগত পঞ্চমবর্ষের মাঘের সংখ্যা "কৃষি-সম্পদে" তৎসম্বন্ধে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করিয়াছি। অনুসন্ধিৎসু পাঠক, তাহা পাঠ করিলে অনেক কথাই অবগত হইতে পারিবেন। সভ্য পাশ্চাত্য-দেশসমূহে বৈজ্ঞানিক কৃষি ও কৃষি-তথ্য কিরূপ প্রণালীতে কৃষক-সমাজে প্রচারিত হয়, তৎসম্বন্ধে আমি "নব্য-ভারত" ও "আলোচনা" প্রভৃতি মাসিকপত্রে বিস্তৃতভাবেই আলোচনা করিয়াছি। এ দেশের কৃষক-সমাজে কৃষি-কথা-প্রচারের সহজ উপায় কি, তৎসম্বন্ধে আপনাদিগকেও বিশেষ আলোচনা করিতেই হইবে। শুধু কৃষিতত্ত্ববিদ্ আপনারা কেন, দেশের শিক্ষিত-সম্প্রদায় এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই এ বিষয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা কর্ত্তব্য। আলোচনা ব্যতীত উপায়-নির্দ্ধারণ সম্ভবপর হইবে না। ফলে এ দেশের কৃষক 'যে তিমিরে সে তিমিরে'ই রহিবে।

সমগ্র বঙ্গে বাঙ্গালাভাষায় "কৃষি-সম্পদ" ও "কৃষক" নামক দুইখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত, "কৃষি-সম্পদে" একমাত্র কৃষিবিষয় এবং "কৃষকে" কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য বিষয় আলোচিত হইয়া থাকে। আমার মত অজ্ঞলোকে এই উভয় পত্রিকাই সাদরে গ্রহণ করিয়া থাকেন। আমার মতে, ঢাকার "কৃষি-সম্পদ" পত্রিকাখানাই সর্ব্বতোভাবে কৃষকের ও কৃষিশিক্ষার্থীর উপযোগী পত্রিকা। এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অর্থাৎ প্রবন্ধ-সম্পদে অতুলনীয় ও চিত্র-সৌন্দর্য্যে অপূর্ব্ব কৃষিবিষয়ক পত্রিকা ইতঃপূর্ব্বে বাঙ্গালাভাষায় আর কখনও প্রকাশিত হয় নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের উপন্যাস ও গল্পপ্রিয় শিক্ষিত-সমাজে, এরূপ সর্ব্বজনহিতকর পত্রিকারও আদর নাই! এরূপ মাসিক-পত্রিকা কয়জনে পড়ে? যে দিন আমরা স্বদেশ চিনির, স্বদেশের প্রকৃত উন্নতির কথা ভাবিতে শিখিব, সেই শুভদিনে বোধ হয় কৃষি-পত্রিকার আদরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইবে। পৃথিবীর সভ্যদেশমাত্রেই কৃষি-পত্রের সাহায্যে কৃষক-সমাজে কৃষি-কথা প্রচারিত হইয়া থাকে। এ দেশেও তাহার অন্যথা হইবে বলিয়া মনে লয় না।

আমাদের কৃষির উন্নতির জন্য কৃষি-শিক্ষা, চাষযোগ্য ভূমি, ভ্রমজীবি এবং মূলধন—এই কএকটিই অত্যাবশ্যক। আমাদের এই সবগুলিরই অভাব হইয়াছে। কিন্তু মূলধনের অভাবটাই আমরা বড় বেশী অনুভব করিতেছি। আমি নিজে চাষা; কৃষক বলিয়া পরিচয় দিতে আমাকে এবং আমার জাতিকে গৌরবান্বিত মনে করি। আমার কৃষি-শিক্ষা স্বদেশে ও বিদেশে। গোবরের ঝুড়ি মাথায় করিয়া বহু দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করিয়াছি; এবং এ দেশে ও পাশ্চাত্য-দেশে গোপালন, গোরক্ষা ও কৃষি বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষালাভ করিয়াছি। আমি নিজে চাষা বলিয়াই, চাষার অভাবটুকি তাহা বেশ সহজেই বুঝিতে পারি। এই জন্যই এ দেশের কৃষকের মূলধনের অভাবের কথাই সর্ব্বাদৌ নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারিলাম। বস্তুতঃ, এ দেশের কৃষির অনুন্নতির বা ক্রমাবনতির মুখ্যকারণই মূলধনের অভাব। কৃষকের ধন ও গোধন—উভয়েরই বিশেষ অভাব ঘটিয়াছে। একসময়ে ভারতে 'গো' ধন বলিয়া পরিগণিত হইত। সেই প্রাচীনকালে গোজাতিই বাঙ্গালীর প্রকৃত ধন ছিল; কিন্তু কালচক্রের পরিবর্ত্তনে, এক্ষণ আমরা গোধনকে প্রকৃত ধন বলিয়া মনে করি না। আমরা চাই অর্থ; কিন্তু কৃষি ব্যতীত যে এ কৃষি-প্রাণ-দেশে প্রচুর অর্থাগম হইতে পারে না, এবং কৃষিতে অর্থলাভ করিতে হইলেই যে গোধনের প্রয়োজন, তাহা আমরা বুঝিয়াও বুঝি না। তাই মূলধনের অভাব বলিতে গোধনের অভাবের কথা অনেকেরই মনে পড়ে না। কিন্তু তথাপি, মূলধনের অভাব বলিতে গোধনের অভাবই প্রথমতঃ বুঝিতে হইবে। মূলধন ব্যতীত কোনও কার্য্যেই সাফল্যলাভ সম্ভবপর হইতে পারে না। সুতরাং এ দেশের কৃষির উন্নতিসাধন করিতে হইলে, প্রথমতঃ মূলধনের সংস্থান করিয়া দিতে, এবং তৎপর কৃষিশিক্ষা দিতে চেষ্টা করিতে হইবে। কারণ, এ দেশের কৃষকেরা কৃষিবিষয়ে অনভিজ্ঞ নহে। তবে মূলধনের অভাবেই তাহারা ইচ্ছা-অনুযায়ী চাষ-বাস করিতে পারে না। এ দেশের কৃষির ক্রমাবনতি ঘটিবার ইহাই মুখ্যকারণ।

প্রাচীন আর্য্য ঋষিরা এ দেশের কৃষির পক্ষে গো-বলের আবশ্যকতা সম্যকরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই, তাঁহারা গো-পালন, গো-জনন, গো-রক্ষা ও গো-চিকিৎসা সম্বন্ধে নানাপ্রকার গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মতঙ্গ, ভেড়, পরাশর প্রভৃতি ঋষিগণের প্রণীত গ্রন্থসমূহ এক্ষণ একরূপ লুপ্ত হইয়াই গিয়াছে। ঐ সকল ঋষিপ্রণীত গ্রন্থগুলির উদ্ধারের কোনরূপ চেষ্টা করা হইয়াছে বলিয়া মনে লয় না। কৃষি-সাহিত্যিকগণ যে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন রহিয়াছেন, ইহাই দুঃখের বিষয়। গোপালন সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রকার তথ্যপূর্ণ কোনও পুস্তক আজিও বাঙ্গালাভাষায় প্রকাশিত হয় নাই। পক্ষান্তরে, পশ্চিমাত্য-দেশে গোপালনসম্বন্ধে শত শত গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ সকল পুস্তক পাঠেই তদ্দেশীয় কৃষকেরা গোপালন শিক্ষা করিতে পারে। এদেশেও গোপালনসম্বন্ধে বহুসংখ্যক গ্রন্থ প্রকাশিত ও প্রচারিত হওয়া আবশ্যক।

বাঙ্গালা-কৃষি-সাহিত্যে কৃষিবিষয়ক সকল প্রকার গ্রন্থেরই বিশেষ অভাব রহিয়াছে। বিগত ১৩২২ সালের ভাদ্র ও আশ্বিনের যুগ্ম-সংখ্যা "কৃষি-সম্পদে" বাঙ্গালাভাষায় কৃষি গ্রন্থের যে তালিকা (গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম) প্রকাশিত হইয়াছে, তৎপাঠেই অবগত হওয়া যায় যে, উচ্চাঙ্গের কৃষিসম্বন্ধীয় পুস্তক ২।৩ খানার অধিক আজিও প্রকাশিত হয় নাই। ধান্য ও পাট সম্বন্ধে বাঙ্গালাভাষায় যে কোনও উল্লেখযোগ্য পুস্তক প্রকাশিত হয় নাই, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। কৃষিই যখন অধিকাংশের জীবিকার্জ্জনের একমাত্র অবলম্বন, তখন কিসে ইহার উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে, তাহাই দেশের দশের প্রথম ও প্রধান আলোচ্যবিষয় হওয়া কর্ত্তব্য; এবং তাহা হইলেই কৃষি-গ্রন্থের অভাবও দূর হইতে পারে।

কৃষির সহিত কৃষি-রসায়নের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। ফলে, বৈজ্ঞানিক উন্নত-প্রণালীর কৃষি-শিক্ষা করিতে হইলেই, কৃষি-রসায়নসম্বন্ধে মোটামুটিভাবে জ্ঞানলাভ করা আবশ্যক। কিন্তু তদ্বিষয়েও উল্লেখযোগ্য কোন গ্রন্থ বাঙ্গালাভাষায় প্রকাশিত হয় নাই। এককথায় বলিতে গেলে, বাঙ্গালা-ভাষায় কৃষিশিক্ষার উপযোগী ব্যবহারিক কৃষি-গ্রন্থের বিশেষ অভাবই রহিয়াছে। পক্ষান্তরে, কৃষিশিক্ষা করিতে ইচ্ছুক, এরূপ লোকের সংখ্যাও এ দেশে বড় বেশী নাই। কাজেই, আমাদের দেশে কৃষির ক্রমাবনতিই ঘটিতেছে।

আমাদের দেশের কৃষকগণের মধ্যে সামান্য শিক্ষিতের সংখ্যাও অত্যল্প বা নামমাত্র। এই জন্যই তাহাদের মধ্যে কৃষি-কথা-প্রচারের অনেক অন্তরায় রহিয়াছে। তন্মধ্যে, (১) শিক্ষার অভাব এবং (২) নির্ধনতা—প্রধানতঃ, এই দুইটি অন্তরায়ই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আমাদের দেশের পাঠ্য-পুস্তক-নির্ব্বাচন-সমিতি কখনও কৃষিশিক্ষা-প্রদায়ক পুস্তক পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচন করে না বলিয়াই, বাঙ্গালা-সাহিত্যমধ্যে প্রাথমিক কৃষি-শিক্ষার উপযোগী পুস্তকের সম্পূর্ণ অভাব রহিয়াছে। উচ্চ ও নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধানতঃ কৃষক-সন্তানেরাই শিক্ষালাভ করিয়া থাকে। সুতরাং, তাহাদিগকে অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষা না দিয়াও, একমাত্র কৃষি-শিক্ষা দিতে পারিলেই দেশের প্রভূত উপকার সাধিত হইতে পারে। এ দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে যৎকিঞ্চিৎ কৃষি-শিক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষা এবং গণিত শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হওয়াই সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয়। প্রাথমিক শিক্ষালাভ করিয়াই অধিকাংশ কৃষকসন্তান বিদ্যালয়ের সম্পর্ক ত্যাগ করে। এমতাবস্থায়, তাহারা যাহা শিক্ষালাভ করে, তাহাতে তাহাদের কর্ম্মক্ষেত্রে বিন্দুমাত্রও উপকার হয় কিনা সন্দেহ। কিন্তু তথাপি, আমরা আমাদের সদাশয় গভর্ণমেণ্টকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কৃষি-শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত যে বিশেষভাবে কোনও কথা বলিতেছি না, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়, মার্কিণ-যুক্তরাজ্যের নিম্ন ও উচ্চ বিদ্যালয়মাত্রেই কৃষি-শিক্ষার সুন্দর ব্যবস্থা রহিয়াছে। মার্কিণের অনুকরণে, এ দেশের বিদ্যালয়েও কৃষি-শিক্ষার যথোচিত ব্যবস্থা হওয়া সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। কৃষক-সন্তানদিগকে শুধু কৃষি-শিক্ষা দিলেই চলিবে না; তাহাদের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার করাও আবশ্যক। পাশ্চাত্য-দেশের ন্যায়, এ দেশের কৃষকেরাও শিক্ষিত হইতে না পারিলে, এ দেশের কৃষির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সম্ভবপর হইবে না। কৃষকসন্তানেরা সামান্য শিক্ষিত হইলেও, তাহাদের মধ্যে কৃষি-কথা-প্রচার অনেকটা সহজসাধ্য হইয়া পড়িবে। কৃষকসন্তানদিগকে যথোচিত সুশিক্ষা দিতে পারিলে, তাহাদের আত্মসম্মানবোধ জাগ্রত হইবে। ফলে, তাহারা স্বাবলম্বী হইয়া, আপন আপন অভাব ক্রমে ক্রমে দূর করিতে সমর্থ হইবে। কৃষক-দিগকে কৃষি-শিক্ষা দিতে পারেন, এরূপ বহুসংখ্যক লোক গড়িয়া তুলিতে হইবে। এই জন্যও কৃষি-গ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজন। যখন এ দেশে কৃষি-গ্রন্থ একেবারেই ছিল না, তখন উহার পাঠকেরও অভাব ছিল। তৎপর, ক্রমে ২।৩ খানি করিয়া, যতই গ্রন্থের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল, ততই উহার পাঠকসংখ্যাও বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতে লাগিল। যে দেশের অধিকাংশ (শতকরা ৯০ জন) লোকেরই একমাত্র কৃষি ভিন্ন গত্যন্তর নাই, সে দেশে কখনও কৃষি-গ্রন্থের অনাদর হইতে পারে না। এই কৃষি-বৈঠকে যে সকল কৃষিতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত ব্যক্তি সমবেত হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেই সুলেখক। ইঁহাদের প্রায় সকলেরই লিখিত প্রবন্ধ "কৃষি-সম্পদে" প্রকাশিত হইতেছে। সুতরাং, ইঁহাদের দ্বারাই বাঙ্গালা-ভাষার কৃষি-গ্রন্থের অভাব অনেকাংশেই বিদূরীত হইতে পারে মনে করিয়াই, কৃষি-গ্রন্থসম্বন্ধে আমি এত কথা লিখিলাম।

আমাদের দেশের অশিক্ষিত কৃষক-সমাজে কিরূপে বৈজ্ঞানিক কৃষি প্রচারিত ও বিস্তৃত হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে আমি একখানি সংবাদ-পত্রের আলোচনা পাঠ করিয়াছি। এরূপ আলোচনা যত অধিক হয়, ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল। পাশ্চাত্য-দেশের কৃষক-সমাজে বৈজ্ঞানিক কৃষি-কথা সম্যক্ প্রচারের অনেকগুলি অনুকূল অবস্থা বিদ্যমান রহিয়াছে; কিন্তু আমাদের দেশে তাহা নাই। পাশ্চাত্য-দেশের কৃষককুল অবস্থাপন্ন, শিক্ষিত, স্বাবলম্বী এবং পরিশ্রমী; আর আমাদের কৃষকগণ অশিক্ষিত, নির্ধন, পরমুখাপেক্ষী ও অলস। পাশ্চাত্য-দেশে 'চাষা' বলিতে অনেক রাজা, জমিদার বা লাগুলর্ড বুঝায়; আর আমাদের দেশে চাষা-নাম ঘৃণাজনক; এবং চাষা বলিলে, সাধারণতঃ হিন্দুজাতির মধ্যে মাহিষ্য, নমঃশূদ্র, উগ্রক্ষত্রিয় প্রভৃতি কএকটি জাতি ও নিম্নশ্রেণীর মুসলমান প্রভৃতি পর্ণকুটীরবাসী দীন-দরিদ্র বহুসংখ্যক লোক বুঝায়। পাশ্চাত্য-দেশের কৃষকগণ একসঙ্গে হাজার হাজার বিঘা জমি কলের সাহায্যে কর্ষণ করিয়া, তাহাতে শস্যাদির চাষ করেন; আর আমাদের দেশের চাষাগণ ১০।২০ বা ২৫ বিঘা জমি ভালরূপে কর্ষণ করিয়াও, তাহাতে শস্যচাষ করিতে, অনেকসময়ই, সমর্থ হয় না। দেশ-কাল ও পাত্র ভেদে, বিলাতি চাষা ও আমাদের দেশের চাষার আকাশ-পাতাল প্রভেদ। এ দেশের যাহারা কৃষিকার্য্য করিয়াই জীবিকানির্ব্বাহ করিবে, সেই সকল কৃষকসন্তানের প্রাথমিক কৃষি-শিক্ষার কোনও ব্যবস্থাই নাই। পক্ষান্তরে, যাঁহাদের অধিকাংশই কস্মিনকালেও কৃষিকার্য্যে লিপ্ত রহিবে না, সেই সকল ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চজাতীয় অত্যল্পসংখ্যক শিক্ষিত ছাত্রের নিমিত্ত কৃষি-কলেজে উচ্চ কৃষি-শিক্ষার ব্যবস্থা রহিয়াছে। এই ব্যবস্থার ফলে, কৃষি-কলেজেও ছাত্র যোটে না, অথচ কৃষক-সন্তানেরাও যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষালাভ করিতে পারে না। আমাদের দেশের ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীস্থ ভদ্রসন্তানেরা নিজের হাতে কৃষি করেন নাই বা করিবেনও না। কিন্তু তাঁহাদেরই কএকজন আমেরিকা, ফ্রান্স, জাপান প্রভৃতি স্থান হইতে কৃষিবিদ্যা-অনুশীলন করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন; এবং সরকারী ও বেসরকারী কৃষিক্ষেত্রে কার্য্য করিতেছেন। অথচ, এখনও কোন কৃষকপুত্র আমেরিকা, ফ্রান্স অথবা অপর কোনও পাশ্চাত্যদেশে কৃষিশিক্ষার্থ গমন করে নাই। সুতরাং, এককথায় বলিতে গেলে, এ দেশেও কৃষক-সন্তানের কৃষি-শিক্ষার কোনরূপ পন্থা নাই; বিদেশ হইতেও উহারা কৃষিশিক্ষা করিয়া আসিতে পারিতেছে না। ফলে, বৈজ্ঞানিক উন্নত-প্রণালীর কৃষির সহিত উহাদের আজিও সম্পর্ক ঘটে নাই। ইহা এ দেশের পক্ষে শুভজনক নহে। এই জন্যই এ দেশের কৃষক-সমাজে বৈজ্ঞানিক কৃষি-কথা-প্রচারের আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। কৃষি-কথা-প্রচার করিবার সহজ উপায় আপনারা নির্দ্ধারণ করুন। এই উপায়েও, পরোক্ষভাবে, কৃষক-সন্তানের কৃষি-শিক্ষারই ব্যবস্থা হইবে।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের দেশের কৃষির প্রধান সহায় গো-বল; এবং কৃষির সঙ্গে সঙ্গে, এ দেশের গোজাতিরও বিশেষ অবনতি ঘটিয়াছে। ফলে, আমাদের দেশে অন্ন-সমস্যা দিন দিনই বাড়িয়া উঠিতেছে। এই অন্নসমস্যা-সমাধানের উপায়নির্দ্ধারণ করিতে হইলেই, কিসে এ দেশে কৃষির উন্নতি হইতে পারে, তাহাই বিশেষভাবে চিন্তা করিতে হইবে, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে গোজাতির উন্নতিসাধনেরও উপায় নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। গোজাতির উন্নতি ব্যতীত এ দেশের কৃষির উন্নতি সম্ভবপর হইতে পারে না। এ দেশের নির্ধন ও অশিক্ষিত কৃষকেরা (১) অর্থের অভাব এবং (২) জমির পরিমাণের অল্পতা—প্রধানতঃ, এই দ্বিবিধ কারণেই কলের লাঙ্গল ব্যবহার করিতে পারিবে না। সুতরাং, হলকর্ষণের জন্য উহাদের সকলসময়েই বলদের আবশ্যক হইবে। বর্ত্তমানসময়ে, কার্য্যোপযোগী বলদের অভাবে, কৃষকেরা ভালরূপ কর্ষণ করিতে পারে না। এ দেশের কৃষির ক্রমাবনতি ঘটিবার ইহাও একটি প্রধান কারণ বলা যায়। তারপর, স্বাস্থ্যের হিসাবেও, এ দেশবাসীর গোপালন ও গোজাতির উন্নতিবিধান করা অবশ্যকর্ত্তব্য। এ দেশের কৃষক-সমাজেও, নানা কারণে, ক্রমেই গোপালন-প্রথা লুপ্ত হইয়া পড়িতেছে। ইহাতে যে শুধু সারের অভাব ঘটিয়াছে, তাহা নহে; কৃষক-সন্তানেরাও ক্রমশঃ রুগ্ন

ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। এ দেশের কৃষির ক্রমাবনতি ঘটিবার ইহাও একটি প্রধান কারণ। আমাদের কৃষির ক্রমাবনতি ঘটিবার কারণ অনুসন্ধান করিলেই, গোজাতির ক্রমাবনতির কথাই আমাদের সর্ব্বাগ্রে মনে পড়ে। বস্তুতঃ, এ দেশের কৃষির উন্নতি করিতে হইলে সর্ব্বাদৌ ধ্বংসোন্মুখ গোজাতির রক্ষা ও উহাদের উন্নতিবিধান ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

এ দেশের কৃষক চাষ-বাস জানে না, এমন কথা বোধ হয় কেহই বলিতে পারেন না। তবে উহারা, নানা কারণে, প্রাচীনপদ্ধতিগুলি ক্রমেই যে ভুলিয়া যাইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রাচীনকালের কৃষক, দেশীয় রীতিতে চাষ-বাস করিয়াই, এ দেশের মৃত্তিকায় সোনা ফলাইত। আজিও যদি তাঁহারা জীবিত রহিতেন, তাহা হইলে, বোধ হয়, এ দেশে সোনাই ফলিত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহাদের বংশধরেরা বিলাসী ও অলস হইয়া, এবং কৃষিকে নীচ কাজ মনে করিয়া, ক্রমেই চাষের কাজ ভুলিয়া যাইতেছে। বাল্যকাল হইতেই বয়োবৃদ্ধদিগের সহিত মাঠে গিয়া হাতে-হেতেড়ে কৃষি-শিক্ষা না করাতে, উহাদের এক্ষণ আর পূর্ব্বের ন্যায় চাষ-বাসেও নেশা জন্মে না; বিশেষতঃ, নানা কারণে, ক্রমেই উহারা নির্ধন হইয়া পরিতেছে। এই সব কারণেই, দেশীয় কৃষি-পদ্ধতি উহারা ভুলিয়া যাইতেছে। এক্ষণ কৃষক-সন্তানেরা ভালরূপ চাষ-বাস জানে না। যাহা জানে, তাহাও অর্থাভাবে করিতে পারে না। বিশেষতঃ, মৃত্তিকার উর্ব্বরতা-শক্তিরও হ্রাস ঘটিয়াছে। এই জন্যই আজকাল সোনা ফলান উহাদের সাধ্যাতীত হইয়া পড়িয়াছে। শস্যের ফলনের হ্রাস ঘটিতেছে দেখিয়াই আমরা মনে করি, এ দেশের কৃষিজীবী কৃষক চাষ-বাসে বড়ই অনভিজ্ঞ। আমেরিকার বৈজ্ঞানিক কৃষিশিক্ষাপ্রাপ্ত কৃষক রিক্তহস্তে এ দেশে আসিয়া এবং এ দেশের কৃষকের কুঁড়েঘরে বাস করিয়া ও তাহারই লাঙ্গল, বলদ প্রভৃতি লইয়া যদি চাষ-বাসে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে এ দেশের শস্যের ফলন যৎকিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত হইবে বলিয়াও মনে করি না। কারণ, নানারূপ প্রতিকূল অবস্থার সহিত নিয়ত সংগ্রাম করিয়া, এ দেশের কৃষকের ন্যায়, মার্কিণের শিক্ষিত কৃষক, শস্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করা দূরে থাকুক, ভালরূপ শস্য জন্মাইতেও পারিবে কিনা সন্দেহ। পক্ষান্তরে, এ দেশের অশিক্ষিত কৃষক যদি মার্কিণ-কৃষকের অর্থ ও অনুকূল অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে, সে যে মার্কিণ-মুল্লুকে সোনা ফলাইতে পারিবে, তাহা নিঃসন্দেহেই বলা যায়। যে দেশের কৃষক অর্থের অভাবে ইচ্ছানুযায়ী একখানি ভাল লাঙ্গল প্রস্তুত করাইতে পারে না; বলদের অভাবে দুগ্ধবতী বৃদ্ধা গাভীর দ্বারা হালচাষ করে; খাদ্যাভাবে সঞ্চিত বাছাইকরা বীজের দ্বারা উদরপূর্ত্তি করিয়া থাকে, এবং বাজারের নিকৃষ্ট বীজ অগ্নিমূল্যে ক্রয় করিয়া, তাহাই ক্ষেত্রে বপন করে; অথবা বীজের অভাবে চাষীজমি পতিত রাখে; জ্বালানী কাঠের অভাবে, গোময় সাররূপে রক্ষা করিয়া ব্যবহার করিতে পারে না,—ঘুটেরূপে শুষ্ক করিয়া জ্বালাইতে বাধ্য হয়; যে দেশের কৃষক অর্থের অভাবে জলসেচনের বন্দোবস্ত করিতে পারিবে না ভাবিয়া, লাভজনক শস্যচাষেও বিরত হয়; এবং যথোচিতভাবে শস্যক্ষেত্র নিড়াইতে বা পাইট দিতে অসমর্থ হয়; সে দেশের কৃষকেরা যে, বর্ত্তমান লোকসংখ্যার ক্রম-বৃদ্ধি ও অবাধ রপ্তানি সত্ত্বেও, দেশবাসীকে উপবাসী রাখিতেছে না, ইহা তাহাদের কৃষিবিষয়ে অভিজ্ঞতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বলা বাহুল্য, এ দেশের সকল কৃষকেরই অবস্থা পূর্ব্বোক্তরূপ শোচনীয় নহে। তবে অধিকাংশ কৃষকের অবস্থাই যে ক্রমশঃ উক্তরূপ শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে, তাহা আপনারা সকলেই অবগত আছেন।

আমাদের দেশের কৃষক-সন্তানকে দেশীয় সহজসাধ্য পদ্ধতিতেই কৃষিশিক্ষা দিতে হইবে। এতদুদ্দেশ্যে, দেশীয় চাষ-বাস-প্রণালী (Indian system of Agriculture) সংগ্রহ করা অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িবে। মনে করুন, এক স্থানের কৃষক কলার চাষে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে। বহুকাল যাবৎ তাহারা কলার চাষ করিতেছে; সুতরাং কলার চাষে তাহারা বিস্ময়কর কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারে। কিন্তু তাহারা বেগুণের চাষ জানে না। পক্ষান্তরে, অন্য স্থানের কৃষকেরা হয় ত বেগুনচাষে বিশেষ অভিজ্ঞ; অথচ তাহারা কলার চাষ ভালরূপে অবগত নহে। এই উভয়স্থানের চাষ-প্রণালী সংগ্রহ করিয়া, তাহা যদি কৃষক-সমাজে প্রচার করা যায়, তাহা হইলে যাহারা উৎকৃষ্ট

প্রণালীতে কলার চাষ করিতেছে, তাহারা উৎকৃষ্ট প্রণালীতে বেগুনচাষ এবং যাহারা বেগুনচাষ করিতেছে, তাহারা কলাচাষের উৎকৃষ্ট প্রণালী সহজেই শিক্ষা করিতে পারিবে। আবার যাহারা কলা বা বেগুণ চাষের পদ্ধতি সম্যকরূপে অবগত নহে, তাহারাও ঐ সকলের চাষশিক্ষা করিতে পারিবে। এই ভাবের শিক্ষাই এ দেশের বিশেষ উপযোগী হইবে। পাশ্চাত্য-দেশের সর্ব্ববিধ উন্নত-প্রণালীই এ দেশের উপযোগী হইবে না—হইতে পারে না। তবে উহার যতটুকু গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, তাহা দেশীয় প্রণালীর সঙ্গে বা পরে শিক্ষা দিলেও চলিবে। এ দেশের কৃষক চাষ-বাস জানে না, এই ভ্রান্তধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই, শিক্ষিতবাবুরা পাশ্চাত্য-কৃষি-পদ্ধতিতে এ দেশের কৃষককে শিক্ষিত করিবার জন্য পাগল হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহারা বিশেষভাবে স্মরণ রাখিবেন, এ দেশের কৃষক কৃষিকার্য্যে অনভিজ্ঞ নহে। তাহাদের অর্থাভাব দূর করিয়া দিতে পারিলে, তাহাদিগকে দেশীয় উৎকৃষ্ট কৃষি-পদ্ধতি শিক্ষা দিলে, চাষের কাজে তাহাদের পূর্ব্বের ন্যায় নেশা জন্মাইয়া দিতে পারিলে, এবং সর্ব্বোপরি গোধন-ধনে তাহাদিগকে সম্পদশালী করিয়া তুলিলে, আজিও যে তাহারা কৃষিতে জগতের বিস্ময় উৎপাদন করিতে সমর্থ হইবে, তাহা নিঃসন্দেহেই বলা যায়।

পাশ্চাত্য-দেশের কৃষির বিশেষ উন্নতি সমবায়-কৃষি-সমিতি-সংস্থাপনেই ঘটিয়াছে। তথায় সমবায় কৃষি-সমিতির বহুল বিস্তার দেখা যায়। আমাদের দেশের কোনও কোনও স্থানে, আজকাল সহৃদয় গভর্ণমেণ্টের কৃপায় যৌথ ঋণদান সমবায়-সমিতির প্রতিষ্ঠা হইতেছে। দেশের পক্ষে ইহা খুব আশাপ্রদ; এবং দেশের সর্ব্বত্রই ঐরূপ সমিতির প্রসার-বৃদ্ধির আবশ্যকতা রহিয়াছে। কারণ, উহাতে কৃষককুলের ঋণ-মোচনেরও যেমন সুবিধা হইবে, তেমনই দশে মিলিয়া-মিশিয়া কার্য্য করিবার শক্তিও জন্মিবে;—এই উভয়বিধ উপকারই সাধিত হইবে।

আমাদের দেশের অজ্ঞ কৃষক-সমাজে কৃষিবার্ত্তা প্রচারের সহজ উপায় কি, তাহা নির্দ্ধারণ করা, দেশের হিতকামী ও চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। ইহা একটি গুরুতর ও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়; সুতরাং, সর্ব্বাগ্রে ও সর্ব্বতোভাবে, এ বিষয়ের আলোচনা হওয়া কর্ত্তব্য। আমার মতে, রঙ্গপুর-কৃষি-সমিতির মত শত শত কৃষি-সমিতি সমগ্র বঙ্গের প্রত্যেক জেলায়, প্রত্যেক মহকুমায়, এবং প্রত্যেক পরগণায় গঠিত ও পরিচালিত হইলে, সেই সকল কৃষি-সমিতির সাহায্যেই, কৃষক-সমাজে কৃষি-কথা প্রচারিত হইতে পারিবে। তদ্ভিন্ন, পাশ্চাত্য-দেশের অনুকরণে, গ্রাম্য কৃষকদিগের বৈঠকে, গ্রামের পঞ্চায়েৎ বা মোড়লের সাহায্যে, কৃষি-বিভাগ হইতে কৃষি, গোপালন, গো-চিকিৎসা, মৎস্য ও পক্ষী পালন প্রভৃতি আবশ্যকীয় নানাবিধ বিষয়ের কৃষি-পুস্তিকা প্রচারের বন্দোবস্ত করিতে পারিলে, এবং আমেরিকার অনুকরণে, ভ্রাম্যমাণ বক্তার দ্বারা গ্রাম্য কৃষকদিগের বৈঠকে বাঙ্গালাভাষায় বক্তৃতা দেওয়ার বন্দোবস্ত করিতে পারিলে, কৃষক-সমাজে সহজেই কৃষি-কথা প্রচার করা যাইতে পারে। বলা বাহুল্য, এ দেশের জমিদার-সম্প্রদায় এবং বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগের সাহায্য ব্যতীত, এই সকল কার্য্য প্রথমাবস্থায় সম্পন্ন হওয়া সম্ভবপর নহে। বক্তৃতা শুনিয়া এবং তদনুযায়ী কার্য্য করিয়া, যদি কৃষকেরা উপকৃত হইতে পারে, অর্থাৎ তাহাদের যদি শস্যের ফলন অধিক হয়, তাহা হইলে তাহারা চাঁদার টাকায়ও বক্তার যাবতীয় ব্যয় বহন করিতে রাজি হইবে। সুতরাং, তদবস্থায় আর কাহারও সাহায্যেরই আবশ্যক হইবে না। বিলাতী-ধরণে বক্তৃতা না করিয়া, যদি কথক-ঠাকুরের ন্যায়, কৃষি-বৈঠকে বসিয়া, কৃষকের বোধগম্য সরল ভাষায় কৃষিবিষয়ে কথকতার বন্দোবস্ত করা যায়, তাহা হইলে সাফল্যলাভ সুনিশ্চিত। যাঁহারা এ সকল বিষয় বিশেষভাবে জানিতে চাহেন, আমি তাঁহাদিগকে ঈশ্বরবাবু, স্বর্ণকুমারবাবু প্রভৃতি দেশের সর্ব্বোচ্চ রত্নের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পরামর্শ দিতে পারি; এবং তাঁহাদের লিখিত "কৃষি-সম্পদে" প্রকাশিত অমূল্য প্রবন্ধগুলি যত্নের সহিত পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

আমাদের বিশাল বাঙ্গালাদেশের হিন্দু কৃষকদিগের মধ্যে নমঃশূদ্রজাতির সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তৎপর, কৃষি-মাহিষ্যের সংখ্যাও ২২।২৩ লক্ষের কম হইবে না। উগ্রক্ষত্রিয় এবং সদ্‌গোপ কৃষকের সংখ্যাও বড় কম নহে। বাগদী, ভুঁইমালী প্রভৃতি নীচশ্রেণীর আরও নানাজাতীয় লোকের

অধিকাংশই কৃষিজীবী। উচ্চশ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কৃষিজীবী লোকের সংখ্যা অত্যল্প বা নামমাত্র। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর পরই, অন্যান্য জাতীয় কৃষকের মধ্যে, সর্ব্বোচ্চ আসন মাহিষ্য-কৃষককে দেওয়া যায়। কারণ, তাহাদের মধ্যেই শিক্ষিত কৃষকের সংখ্যা অধিক। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায়, আমি উক্ত সকল শ্রেণীর কৃষকদেরই উচ্চশিক্ষার পক্ষপাতী নহি। কেননা, যৎসামান্য বা নামমাত্র উচ্চশিক্ষা উহাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই জাতিগত-ধর্ম্মের বিপর্য্যয় ঘটাইয়াছে এবং ক্রমিক দৈন্য আনয়ন করিয়াছে। কৃষিকে নীচ বা ঘৃণাজনক কার্য্য মনে করিয়াই, এ দেশের কৃষক-সন্তানেরা চাকুরির জন্য লালায়িত; এবং চাকুরিলাভের প্রত্যাশায়ই, তাহাদের মধ্যে ২।৪ জন উচ্চশিক্ষাও লাভ করিতেছে। কিন্তু ইহাদের উচ্চশিক্ষালাভে কৃষক-সমাজ বিন্দুমাত্রও উপকৃত হইতে পারিতেছে না। মার্কিণ-কৃষক-সন্তানদিগের ন্যায়, এ দেশের কৃষক-সন্তানেরাও যে দিন উচ্চশিক্ষালাভ করিয়াও হাতে-হেতেড়ে একমাত্র কৃষি-কার্য্যেই সংলিপ্ত রহিতে পারিবে, সেই শুভদিনেই কৃষক-সন্তানের উচ্চশিক্ষালাভ সার্থক হইবে; এবং তৎকালেই কৃষক-সন্তানের উচ্চশিক্ষালাভের আবশ্যকতা ঘটিবে। অত্যল্পসংখ্যক উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত কৃষক-সন্তানের অনুকরণে, এ দেশের কৃষক-সমাজে যে কিরূপভাবে বিলাসিতা প্রবেশ করিয়াছে ও করিতেছে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। এই জন্যই, দেশের বর্ত্তমান অবস্থায়, কৃষক-সন্তানের উচ্চশিক্ষার পক্ষপাতী হইতে পারি না। তবে উহাদের প্রত্যেকেই শিক্ষালাভ করুক, ইহা সর্ব্বথাই বাঞ্ছনীয়। কারণ, উহারা শিক্ষিত হইয়া না উঠিলে, এ দেশের কৃষির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হইতে পারে না।

পাশ্চাত্য-দেশের এবং জাপানের কৃষক-সন্তান উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়াও কৃষিকার্য্যে বীতস্পৃহ হয়েন না। কৃষির উন্নতিসাধনোদ্দেশ্যেই তাঁহারা উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া থাকেন; এবং একমাত্র কৃষিকার্য্যে সংলিপ্ত রহিয়াই তাঁহারা সম্পদশালী হইয়া উঠেন। উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত কৃষক-সন্তানদিগের মধ্যে কেহ কেহ কৃষিকার্য্যোপযোগী মূলধন-সংগ্রহের নিমিত্ত চাকরি গ্রহণ করিয়া থাকেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদের কেহই দীর্ঘকাল চাকরি করিতে রাজি হয়েন না বা একমাত্র পরসেবা বা চাকরিকেই জীবিকা-অর্জ্জনের প্রকৃষ্ট পন্থা বলিয়া মনে করেন না। পাশ্চাত্য-দেশের কৃষক-সন্তান বৈজ্ঞানিক চাষ-বাস-প্রণালী উত্তমরূপে বুঝিবার অথবা কৃষির উন্নতিসাধন করিবার অভিপ্রায়েই উচ্চশিক্ষালাভ করিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে, আমাদের দেশের আমেরিকা, ফ্রান্স ও জাপান প্রভৃতি স্থানের কৃষিবিষয়ে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকেরা স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া চাকুরির নিমিত্তই লালায়িত হইয়া উঠেন। আমেরিকা কৃষিশিক্ষার পক্ষে জগতে শীর্ষস্থানাধিকার করিয়াছে। তথাকার বার্কলী, আওয়া, উইলকনসিন্, কর্ণেল, নিউইয়র্ক, ওহিও, মণ্টোকা, মিসিসিপি প্রভৃতি স্থানের কৃষি-কলেজগুলি বিখ্যাত। এই সকল কলেজ হইতে এ দেশের যাঁহারা কৃষিবিদ্যা শিক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা আমাদের গৌরবের স্থল সন্দেহ নাই। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, তাঁহাদের প্রায় সকলেই চাকরি গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের দ্বারা এ দেশের কৃষকেরা প্রত্যক্ষভাবে কিঞ্চিন্মাত্রও উপকৃত হইতে পারিতেছে বলিয়া মনে লয় না। পূর্ত্তবিদ্যা, খনিবিদ্যা, এবং শিল্পাদি কলাবিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত এ দেশের শিক্ষিত যুবকদিগের সময়ে সময়ে বিদেশ গমন অত্যাবশ্যক হইলেও, একমাত্র চাকরির উদ্দেশ্যে, কৃষিশিক্ষার নিমিত্ত বিদেশযাত্রা তত প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হয় না। কারণ বৈদেশিক কৃষি-শিক্ষায় এ দেশের কৃষির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিসাধন সম্ভবপর হইবে কিনা সন্দেহ। তবে বিদেশ হইতে বৈজ্ঞানিক উন্নত প্রাণলীতে চাষ-বাস শিক্ষা করিয়া আসিয়া, হাতে-হেতেড়ে চাষ-বাসে সংক্ষিপ্ত রহিতে পারিলে, আদর্শস্থলবর্ত্তী হইয়া, প্রত্যক্ষভাবেই, কৃষকদিগের যথেষ্ট উপকার সাধন করা যাইতে পারে। কিন্তু শিক্ষিত ভদ্রসন্তানেরা একমাত্র চাকরির সুবিধা হইবে মনে করিয়াই, কৃষিশিক্ষার্থে বিদেশে গমন করিয়া থাকেন; সুতরাং দেশের কৃষি-পদ্ধতির উন্নতি সাধনের প্রতি তাঁহাদের বড় লক্ষ্য রহে না বা রহিতেও পারে না। কৃষি-বিজ্ঞানের কতকগুলি উপশাখা আছে। যথা—ভূতত্ত্ব, ভূমি-পরীক্ষা, ভূ-বিশ্লেষণ, সারপরীক্ষা, সার-প্রদান প্রভৃতি। এই বিষয়গুলি শিখিবার ব্যবস্থা আমাদের

দেশে নাই, সুতরাং ঐ সকল বিদেশ হইতে শিখিয়া আসিতে পারিলে ভাল হয়। ঘরের কড়ি দিয়া বিদেশে গিয়াও, "হাতে-হেতেড়ে কাজ" না শিখিয়া,—পুথি পড়া বিদ্বান হইয়া দেশে ফিরিবার পক্ষপাতী নহি। কারণ, তাহাতে চাকরি জুটিলেও দেশের প্রকৃত উপকার সাধিত হয় না।

হাঁস, মুর্গী, ছাগল, ভেড়া, পেরু প্রভৃতি পশু-পক্ষী-ব্যবসায়ের হিসাবে, পালন ও উৎপাদন অল্পলাভপ্রদ নহে। কিন্তু তথাপি, এ সম্বন্ধে আমাদের দেশের হিন্দু বা মুসলমান অধিবাসীগণের ততটা আস্থা দেখি না। কৃষি-শিক্ষা সম্বন্ধে এ দেশবাসীগণ যেরূপ বীতস্পৃহ, এদিকেও সেইরূপ। একে ত কেহ পশু-পক্ষী-পালন শিখে না, আবার এই সকল কলাবিদ্যা শিক্ষা করিবার উপযোগী কোনও ব্যবহারিক পুস্তকও এ দেশে নাই। পক্ষীচাষসম্বন্ধে বিগত দুই বৎসর যাবৎ "ব্যবসায়-বাণিজ্য" সম্পাদক কএকটী সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশ করিতেছেন। আমাদের মুসলমান ভ্রাতৃবর্গ যত্নসহকারে তাহা পাঠ করুন। ব্যবসায়ের হিসাবে, ঐ সকল কলাবিদ্যা শিক্ষা করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করা তাহাদের আশু কর্ত্তব্য। পাশ্চত্য-হিসাবে, পক্ষীর চাষও কৃষির অন্তর্গত। পাশ্চত্য-দেশে কৃষি-শিক্ষার যেমন শত সহস্র পুস্তক প্রচলিত আছে, সেইরূপ পক্ষীচাষসম্বন্ধেও ছোট বড় সকল প্রকার পুস্তকই প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ সকল পুস্তক পাঠে পশু-পক্ষী-পালনসম্বন্ধে অবশ্যজ্ঞাতব্য সকল তথ্যই অবগত হওয়া যায়। সুতরাং, একমাত্র পুস্তক সাহায্যেই, তদ্দেশ-বাসীরা অনায়াসে পশু-পক্ষী-পালন ও উৎপাদন করিয়া প্রচুর অর্থলাভ করিতে পারেন। আমাদের বঙ্গদেশের পূর্ব্বাঞ্চলের অধিবাসীগণের মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান। তাহারা পক্ষী-উৎপাদন বিদ্যাশিক্ষায় কেন যে উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছেন, তাহা বলিতে পারি না। আমাদের দেশের কৃষি-সাহিত্যিকগণের সাধারণ কৃষি-পুস্তক প্রণয়নে যেমন কার্পণ্য দৃষ্ট হয়, পশু-পক্ষী-পালনসম্বন্ধীয় পুস্তক প্রণয়নেও সেইরূপ উপেক্ষাই দৃষ্ট হইয়া থাকে। পূর্ব্ব-বঙ্গের মুসলমান অধিবাসীগণের অনেকেই পশু-পক্ষী-পালন করিয়া থাকেন সত্য, কিন্তু ব্যবসায়ের হিসাবে, বিস্তৃত ভাবে কেহই পশু-পক্ষী পালন করে না; বিশেষতঃ, বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে উহাদের বংশবৃদ্ধির প্রকৃষ্ট উপায় কি, তাহাও তাহারা অবগত নহে। এমতাবস্থায়, পশু-পক্ষী উৎপাদন ও পালন সম্বন্ধীয় পুস্তক প্রণয়নেরও যে যথেষ্ট আবশ্যকতা রহিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমি সমবেত কৃষি-সাহিত্যিকগণের দৃষ্টিও এদিকে আকর্ষণ করিতেছি।

নিউইয়র্ক, রোড আইল্যাণ্ড, নিউজার্সি, চিকাগো, ওয়াশিংটন, টেক্সাস্ প্রভৃতি অঞ্চলে আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে, অনেক পক্ষী-পালক ও ডিম্ব-ব্যবসায়ী কলের সাহায্যে পক্ষী উৎপাদন করিয়া প্রভূত লাভবান হইয়াছেন। সমগ্র ভারতে মুসলমান এবং পক্ষীভোজীর সংখ্যা ৮।১০ কোটির কম নহে। কিন্তু তথাপি, রীতিমত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে এ দেশে পক্ষী উৎপাদন অথবা পশুজনন হয় না! এ সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করা যাইতে পারে, তেমন কোন পুস্তকও নাই। আমেরিকায় এ বিষয়টি সকল কৃষি-কলেজেই পঠিত ও আলোচিত হইয়া থাকে। আমার কলিকাতার একজন সাহেব বন্ধু কএকটী মাত্র শাদা লেগহর্ণ-পক্ষী হইতে দুই মাসের মধ্যে ২৫০৲ টাকা আয় করিয়াছেন। যাঁহারা গোপালন, পশু-পক্ষীপালন প্রভৃতি করিতে চাহেন, তাঁহারা আমাকে পত্র লিখিলে, আমি তাঁহাদের জিজ্ঞাস্যপ্রশ্নের যথাসাধ্য সদুত্তর প্রদান করিয়া এবং তৎসম্বন্ধে তাঁহাদিগকে অবশ্যজ্ঞাতব্য বহু তথ্য জানিতে দিয়া, যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য করিতে রাজি আছি।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমাদের দেশের কৃষক-কুলের অবস্থা বড়ই শোচনীয়; এবং তাহাদের দুঃখের কথা শুনিবার কেহই নাই। এ দেশের রাজা, মহারাজা, জমিদার-সম্প্রদায়, উকীল, মোক্তার, এডভোকেট প্রভৃতি সকলেই রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিয়া, ব্যবস্থাপক সভার প্রতিনিধিত্ব লইয়াই, দেশমধ্যে তুমুল আন্দোলন-আলোচনা করিতেছেন; এবং বিলাতী সাঁচে সমাজ-সংস্কার করিবার নিমিত্তই লালায়িত রহিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ৩২ কোটী ভারতবাসীকে যাহারা অন্ন যোগায়, বিলাসিতার উপকরণ ও খাদ্যসম্ভার যাহাদের পরিশ্রমে

উৎপন্ন হয়, এবং যাহারা খাজনাখানার তহবিল যোগায়, তাহাদের দুঃখ-দুর্গতির কথা কয়জন চিন্তা করেন? এদেশে কৃষককুলের প্রতিনিধি কে? ব্যবস্থাপক সভায় তাহাদের ক্ষীণকণ্ঠ পৌছায় কি? অধিকাংশ স্থানের গ্রাম্য কৃষি-বৈঠকেও তাহাদের স্থান নাই কেন, এ বিষয়ে কেহ স্থিরচিত্তে একবার ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? কৃষক-কুলের মধ্যে অনন্ত শক্তি নিহিত রহিয়াছে; কিন্তু তাহাদের প্রচ্ছন্ন-শক্তি জাগ্রত করিবার লোক এ দেশে বড় কম বলিয়াই, আজ তাহারা এত দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। এ দেশের কৃষককুলের দুঃখের কথা, ও অভাব-অভিযোগের কথা চিন্তনীয় নহে কি? এ দেশে যে সকল গ্রাম্য কৃষি-বৈঠক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেই সকল কৃষি-বৈঠকের সাহায্যে কৃষক-সমাজে কৃষি-জ্ঞান ও বিদ্যা বিকীর্ণ করিলে মন্দ হয় না। সুতরাং ইহাদের জাতীয় সমিতি গুলিকেই সর্ব্বাগ্রে সঞ্জীবিত ও পরিপুষ্ট করা কর্ত্তব্য।

পাশ্চাত্য-দেশের কৃষিশিক্ষার কথা আমি মোটামুটিভাবে পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এস্থলে ইংলণ্ডের কৃষি-কলেজ সম্বন্ধে আরও কএকটী কথা বলিতেছি। বিলাতের কেম্ব্রিজ, অক্স্ফোর্ড, লীডস্, নিউকাসেল্, মাঞ্চেষ্টার প্রভৃতি স্থানের কৃষি-কলেজ তদ্দেশমধ্যে প্রখ্যাত। রেডিংএর ইউনিভার্সিটী কলেজ সমগ্র ইংলণ্ড-দেশমধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট গো ও দুগ্ধ-ব্যবসায়ের পাঠাগার। এইখানে উচ্চ ও নিম্ন অঙ্গের কৃষি, ডেয়ারিং এবং ঔদ্যানিক কৃষি-শিক্ষা নিয়মিতভাবে প্রদত্ত হইয়া থাকে। উপাধি-পরীক্ষার জন্য তিন বৎসর এবং ডিপ্লোমা কোর্সের জন্য দুই বৎসর পাঠ করিতে হয়। ছয়মাস পড়িলে সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিন টার্ম-ব্যাপী সমগ্র সেশানের জন্য ২৪ পাউণ্ড এবং সার্টিফিকেট কোর্সের জন্য দুই টার্মে ১ পাউণ্ড ফি দিতে হয়। অক্টোবর হইতে জুলাই মাস পর্য্যন্ত পাঠ করিলে ডেয়ারিংএ সার্টিফিকেট এবং দুইবৎসরকাল অধ্যয়নে দুগ্ধ-ব্যবসায়ের ডিপ্লোমা প্রাপ্ত হওয়া যায়। ছয়মাসব্যাপী ডেয়ারিংএ স্বল্পকালব্যাপী টার্মের ব্যবস্থা আছে। ব্যবহারিক (Practical) জ্ঞানলাভের জন্য ছাত্রকে বৃটিশ ডেয়ারি ইন্ষ্টিটিউটে শিক্ষালাভ করিতে হয়। উদ্যানসম্বন্ধীয় বিদ্যা-শিক্ষায়ও কলেজ-ফারমে (সিন্ফিল্ডে) বিশেষ সুব্যবস্থা রহিয়াছে। তাহা ছাড়া, 'পুল্ট্রী ফার্ম্মিং' সম্বন্ধেও এখানে শিক্ষার বেশ ব্যবস্থা আছে। আইলস্বেরী মুর্গী-চাষের কেন্দ্রস্থল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ডেয়ারিংএর সম্পূর্ণ কোর্সে (ব্যবহারিক শিক্ষার ব্যয়সহ) সমগ্র সেশানে ৩০ পাউণ্ড খরচ লাগে। ছয় ও তিন মাসের ডেয়ারিং কোর্সে যথাক্রমে ১৬ ও ১০ পাউণ্ড ফি লাগে।

সিরেন্সিষ্টার (সিষ্টার) স্থিত 'রয়েল এগ্রিকালচারাল কলেজ' ইংলণ্ড দেশের মধ্যে প্রধান কৃষি-কলেজ। এখানে বৈজ্ঞানিক উচ্চ কৃষি-শিক্ষার (ব্যবহারিক ও বাচনিক) সুব্যবস্থা আছে। কলেজ-ডিপ্লোমার জন্য তিন বৎসর, উপনিবেশিক ও পরিণত বয়স্কের জন্য একবৎসর ব্যাপী কোর্সের, শীতকালে ৮ সপ্তাহব্যাপী কোর্সের এবং বি, এস্-সির জন্য পৃথক কোর্সের ব্যবস্থা আছে। মেধাবী ছাত্রগণ কলেজ হইতে বৃত্তি পাইয়া থাকেন। এখানে লর্ড ব্যাথ্রাষ্টের ৫০০ বিঘা জমিতে উদ্যান ও বন পরিচর্য্যা-সম্বন্ধে ব্যবহারিক শিক্ষা প্রদত্ত হইয়া থাকে। এই কলেজ ব্রিষ্টল বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সহিত সংযোজিত।

চেশায়ার কাউন্টির অন্তর্গত হম্স্চ্যাপেলস্ স্থিত কৃষি-কলেজ কৃষি ও উদ্যান বিদ্যানুশীলনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহা ম্যান্চেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংযোজিত। ডিপ্লোমা কোর্স তিনবৎসরে শেষ হয়। কাউন্টির অধিবাসীগণকে ৬০ পাউণ্ড এবং তদ্বহিস্থ অধিবাসিদিগকে ৭৫ পাউণ্ড ফি সমগ্র টার্মের ও সেশানের জন্য দিতে হয়। এইখানে পশু-পক্ষীপালন ও গাভীর শৃঙ্গোত্তোলন প্রভৃতি বিষয়েও শিক্ষালাভ করা যায়। কলেজের ফারমের একশত একার ভূমিতে কৃষিসম্বন্ধীয় নানাবিষয়—কৃষি, গোরক্ষা, মক্ষিকাচাষ, পুল্ট্রী, উদ্যান-বিদ্যা, মেষ-চাষ প্রভৃতি শিক্ষারও সুবন্দোবস্ত রহিয়াছে। কৃষির বি, এস্-সি উপাধি-লাভেচ্ছুগণাক এখানে এবং ম্যান্চেষ্টারে ব্যবহারিক এবং বাচনিক শিক্ষালাভ করিতে এবং মৌলিক অনুসন্ধানে (Original research) পারদর্শিতার পরিচয় দিতে হয়।

জাবশায়ারের অন্তর্গত কিংসটন্ নগরস্থিত এগ্রি-

কালচারল এবং ডেয়ারী কলেজের নামও উল্লেখযোগ্য। কৃষি-সার্টিফিকেট্ কোর্স অক্টোবর মাসে আরম্ভ হয়; এবং দশ সপ্তাহের এক এক টার্মে বিভক্ত হইয়া তিন টার্মে শেষ হয়। কাউন্টির বা সাহায্যকারী অধিবাসিগণের পক্ষে প্রত্যেক টার্মে ৫ পাউণ্ড এবং বাহিঃসীমার জন্য সাড়ে সাত পাউণ্ড হিসাবে শিক্ষার ব্যয় দিতে হয়। 'পুল্ট্রী ফার্ম্মিং' শিক্ষার জন্য ১২ সপ্তাহের কোর্সের বিশেষ ব্যবস্থা আছে। কলেজ-ফারমের ১৭৭ একার ভূমি লইয়াই এই কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই কলেজে অক্টোবর হইতে ৯ মাসের মধ্যেই ডেয়ারী সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করা যায়। কাউন্টির অধিবাসীর পক্ষে তিনমাসের ফি ৬ পাউণ্ড, ছয়মাসের ফি সাড়ে দশ পাউণ্ড এবং নয়মাসের ফি ১৩ পাউণ্ড দিতে হয়। কিন্তু তদ্বহিস্থের জন্য দ্বিগুণ ফি ব্যবস্থিত আছে। তাহা ছাড়া ছয়সপ্তাহের স্বল্প কোর্সও ডেয়ারির জন্য নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। প্রতিসপ্তাহে এক পাউণ্ড বা তাহার অর্দ্ধেক ফি লাগিয়া থাকে। কাউন্টিস্থিত অধিবাসী-গণের বিশেষ সুবিধার জন্য দুইটি ভ্রাম্যমাণ ডেয়ারিং স্কুলেরও ব্যবস্থা রহিয়াছে। কৃষক-বালক ও বালিকাগণের নিকট সরল ভাষায় বর্ক্তৃতা করিয়া, তাহাদিগকে 'ডেয়ারিং' অর্থাৎ গোপালন ও গব্যসামিগ্রীর ব্যবসায় প্রভৃতি বিষয়ে মোটা-মোটিভাবে শিক্ষা দেওয়াই, উক্ত স্কুল দুইটির প্রতিষ্ঠার মুখ্য উদ্দেশ্য।

এক্ষণ গোরক্ষাদি সম্বন্ধে ২।৪টি কথা বলিয়াই, এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। এ সম্বন্ধে বলিবার কথা এত আছে যে, তাহা এই অত্যাল্পসময়ের মধ্যে শেষ করা যায় না। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমাদের দেশের কৃষির সহিত গোজাতির অচ্ছেদ্য ও অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। পাশ্চাত্য-দেশসমূহে অশ্ব-শক্তিতে বা কলের সাহায্যে যাবতীয় কৃষিকার্য্য পরিচালিত হইয়া থাকে! কিন্তু আমাদের দেশের কৃষকগণ সাধারণতঃ বিস্তৃতজমির চাষী (big holders) নহে;—উহারা আইলবদ্ধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমির চাষী (small allotment holders); সুতরাং তাহাদের টুক্‌রা টুক্‌রা জমির চাষে কলের বড় প্রয়োজন হয় না; বিশেষতঃ, ঐরূপ জমি কলে চাষ করিলে খরচ বেশী পড়ে ও চাষকরাও সুবিধাজনক নহে। কাজেই তাহা পরিহার্য্য বলিয়া, আমাদের দেশের হলকর্ষণাদি কৃষিকার্য্যে গোশক্তিরই অত্যধিক আদর। অতি প্রাচীনকাল হইতেই আমাদের ধর্ম্মগ্রন্থাদিতে গোজাতির অতি উচ্চ আসন প্রদত্ত হইয়াছে। মল্লিখিত 'গোপাল-বান্ধব' নামক পুস্তকে গোজাতির প্রয়োজনীয়তা ও শ্রেষ্ঠতার বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি। অনুসন্ধিৎসু পাঠক তাহা একবার পাঠ করিয়া দেখিতে পারেন। সভ্য পাশ্চাত্য-দেশসমূহে কৃষি ও গোপালনাদি সম্বন্ধে সহস্র সহস্র পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু বৈজ্ঞানিক কৃষিসম্বন্ধে আমাদের বাঙ্গালাভাষায় কয়খানা পুস্তক রহিয়াছে? গোপালনসম্বন্ধেও ৪।৫ খানির অধিক পুস্তক বাঙ্গালাভাষায় প্রকাশিত হয় নাই! যাহা হউক, গোজাতির শ্রেষ্ঠতার বিষয়ই বলিতেছি। প্রাচীন মিশরের ধর্ম্মগ্রন্থেও গোজাতির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। মিশরের সভ্যতা আর্য্য ভারতীয় সভ্যতার পর উদ্ভূত হয়। সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন মিশরবাসীরাও যে গোজাতির সম্মান ও সমাদর করিতে শিখিয়াছিল, মিশরের পিরামিডের অনেক স্থানে অঙ্কিত বৃষমূর্ত্তিই তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তামসযুগে ইউরোপীয় ধর্ম্মযাজকগণ বৃষচিহ্ন-অঙ্কিত পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতেন। সুতরাং, তৎকালেও যে ইউরোপে গোজাতির আদর ছিল, তাহা নিঃসন্দেহেই বলা যায়। আমাদিগের সকল ধর্ম্মগ্রন্থে—বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া পদ্মপুরাণ পর্য্যন্ত—এমন কি, মুকুন্দরাম, কবিকঙ্কণ, চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতির গ্রন্থাবলীতেও গোমাতার অতি উচ্চাসন প্রদত্ত হইয়াছে। মাহিষ্য, গোপাদি বৈশ্যপর্য্যায়ভুক্ত জাতিমাত্রেরই গোপালন, গো-সেবা, গো-চিকিৎসা, গোজনন প্রভৃতি প্রধান অনুসরণীয় ব্যবসায় বলিয়া আমাদের শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। আমাদের দেশের মাহিষ্য ও গোপাদি বৈশ্যগণ আবহমানকাল হইতেই গোপালন ও দুগ্ধ, দধি, মাখন, ক্ষীর, ঘৃত প্রভৃতি গব্যজাত সামগ্রীর ব্যবসায় এবং কৃষিকার্য্য দ্বারাই জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছে। বৈশ্যজাতির মধ্যে শিক্ষিতব্যক্তির সংখ্যা বড় কম নহে! কিন্তু তথাপি, গোপালন ও গোরক্ষা সম্বন্ধীয় একখানি পত্রিকাও এদেশে প্রকাশিত হয় নাই। এরূপ পত্রিকার প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট রহিয়াছে। পাশ্চাত্য-দেশে

প্রত্যেক ব্যবসায়ী-সম্প্রদায়েরই অন্ততঃ ২।৪ খানা জাতীয় ব্যবসায়ের পক্ষে হিতকারী পত্রিকা প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইউরোপ ও আমেরিকায় ঐরূপ ১২।১৩ শত পত্রিকা প্রতিবৎসর প্রকাশিত হয়। তদ্ভিন্ন, কৃষি-কলেজ কর্ত্তৃপক্ষীয়েরাও প্রতিবৎসরই বহু পুস্তিকা, কার্য্য-বিবরণী এবং অনুসন্ধান ও গবেষণাত্মক রিটার্ণ ও রিপোর্ট প্রভৃতি প্রকাশ করিয়া থাকেন। বিলাতের প্রত্যেক কাউন্টি কাউন্সিলের, বৃটিশ ডেয়ারী ফার্ম্ম, রয়াল এগ্রিকাল্‌চুরাল সোসাইটি, বোর্ড অব্ এগ্রিকাল্‌চার, ফিসারী ডিপার্টমেণ্ট এবং মেট্রপলিট্যান্ ডেয়ারী প্রভৃতির পক্ষ হইতে কত শত শত দুগ্ধ-ব্যবসায় সম্বন্ধীয় পত্রিকা, পুস্তিকা ও কৃষি-বিবরণী প্রভৃতি, দেশীয় কৃষক ও দুগ্ধ-ব্যবসায়ীগণের জ্ঞানলাভ ও শিক্ষার নিমিত্ত প্রকাশিত হইয়া থাকে। কিন্তু কৃষি-প্রধান বঙ্গের গোপভায়াদের শিক্ষাপ্রদায়িনী একটিও বিদ্যালয় বা পত্রিকা এ দেশে কখনও হয় নাই। এ দেশের সর্ব্বত্রই দুগ্ধ ও ঘৃতের অভাব খুবই বেশী হইয়াছে। গোজাতির ক্রমিক অবনতি ও গোপজাতির শিক্ষার অভাবই ইহার মুখ্য কারণ। এ দেশে গোজাতির যে কেবল অবনতিই ঘটিয়াছে, তাহা নহে। অবাধ গোহত্যা, বিষ-প্রয়োগে গোহত্যা, সংক্রামক-রোগ, সুচিকিৎসকের অভাব, চারণভূমির অভাব, খাদ্যের দুর্ম্মূল্যতা প্রভৃতি নানা কারণে, গোজাতি ধ্বংসের পথেও পতিত হইয়াছে। এই সকলের নিরাকরণে যত্নবান হওয়া আশু কর্ত্তব্য। তজ্জন্য নানারূপ চেষ্টা করা হইতেছে সত্য, কিন্তু কাজের ফল সন্তোষজনক হইতেছে না। যাহা হউক, রাজকীয় বিধির বলে এবং দেশবাসীর সমবেত চেষ্টায়, যতদিন না গোরক্ষার প্রকৃষ্ট উপায় অবলম্বিত হইবে, ততদিন দুগ্ধ, ঘৃত প্রভৃতি বিশেষ উপাদেয় ও পুষ্টিকর খাদ্যসামগ্রী কদাচ সুলভ হইতে পারে না—হইবেও না। গোরক্ষা করিতে না পারিলে, এবং আবার পূর্ব্বের ন্যায় গৃহে গৃহে গো-সেবার প্রথা প্রচলিত না হইলে, কিছুতেই এ দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইবে না; তদ্ভিন্ন, কৃষিরও উন্নতির আশা সুদুরপরাহত বলিয়াই মনে হয়।

ইংরেজ-রাজত্বের প্রথামবস্থায় এ দেশে অবাধ গোহত্যা প্রচলিত ছিল না। বিগত ২৫।৩০ বা ৪০ বৎসর যাবতই এ দেশের সর্ব্বত্র অবাধে গোহত্যা চলিতেছে। ইহার ফলে, বহু বক্‌না অকালে কালসদনে প্রেরিত হইয়া থাকে। গো-খাদক পাশ্চাত্য-দেশে দুগ্ধবতী গাভী কদাচ হত্যা করা হয় না। সে দেশে যে সকল গরু গর্ভিণী হয় না, ভ্রূণ ত্যাগ করে অথবা কোনও দুরারোগ্য রোগগ্রস্ত হইয়া পড়ে, সেই সকল গাভীই এগ্রিকিবোর্ডের পিরব্রাইটস্থিত পরীক্ষাগারে প্রথমতঃ পরীক্ষা করা হয়; এবং তৎপর 'বুচার ব্যাঙ্কারের' হত্যাগারে প্রেরিত হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য-দেশসমূহে দুগ্ধ এবং মাংসের জন্যই গোজনন করা হয়; কিন্তু আমাদের দেশে গো-উৎপাদনে "নির্ব্বাচন-বিধি" কদাচ অবলম্বিত না হইলেও, কৃষি এবং গব্য সামগ্রীর জন্যই গোজনন অত্যাবশ্যক। ইহারই মধ্য হইতে মাংসের জন্য গোহত্যা হইয়া থাকে। কাজেই বহুসংখ্যক বক্‌না (Prime) গাভী অকালে হত্যাগারে নীত হয়। ফলে, এক একটী বক্‌না গাভীর হত্যায়, উহার ভাবীবংশও সমূলে নির্ম্মূল হইয়া যায়। দুগ্ধবতী গাভী এবং ধর্ম্মের ষাড় বা খোদাই ষাড়ের অবাধ হত্যার ফলেই, এ দেশের গোজাতির সংখ্যা ক্রমেই অত্যধিক পরিমাণে হ্রাস ঘটিতেছে। একদিকে দ্রুত গতিতে ধ্বংস চলিতেছে, অপরদিকে গোপালনের বা গোরক্ষার প্রথাও ক্রমেই লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। প্রধানতঃ, এই দ্বিবিধ কারণেই এ দেশের কৃষকগণ পূর্ব্বের ন্যায় সস্তা দরে চাষের বলদ ক্রয় করিতে পারে না, এবং গোয়ালারা জলমিশ্রিত দুগ্ধেও অভাবের পূরণ করিতে সমর্থ হয় না। আবার, 'শুষ্ক' গাভী পালন করিতে অর্থব্যয় হয়; কিন্তু উহার দুগ্ধ পাওয়া যায় না বলিয়া অর্থলাভ হয় না। এই জন্যই এ দেশের নিঃস্ব গোপালকেরা সামান্য মূল্যেই কসাইয় নিকট শুষ্ক-গাভী বিক্রয় করিয়া থাকে। গাভী যতদিন পর্য্যন্ত শুষ্ক রহে, অর্থাৎ গর্ভবতী না হয়, ততদিন উহা যথোচিত মূল্য দিয়া কেহই ক্রয় করিতে চাহে না। ঐরূপ গাভীর মূল্য কসাইরাই বেশী দিতে রাজি হয় বলিয়া, যৎকিঞ্চিৎ অধিক অর্থের লোভে অনেকেই কসাইর নিকট শুষ্ক-গাভী বিক্রয় করে। ইহাতেও এক একটী গাভীর সহিত উহার ভাবী-সন্তানের আশাও নির্ম্মূল হইয়া যায়। এক একটী শুষ্ক-গাভী যত্নের সহিত পালন করিতে পারিলে,

তাহা হইতেও ৮। ১০টি বৎস জন্মিতে পারে। সুতরাং বক্না ও শুষ্ক গাভী হত্যায় দেশের যে কিরূপ মহা অনিষ্ট সাধিত হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়। খাদ্যের জন্য এ দেশের কুত্রাপি গোজনন হয় না। চুক্ত বা কৃষি জন্য উৎপাদিত পশু অত্যধিক পরিমাণে খাদ্যের জন্য নিহত হইতেছে বলিয়াই দেশের দুগ্ধধা ক্রমেই বর্দ্ধিত হইয়া পড়িতেছে। দেশের চিন্তাশীলব্যক্তিমাত্রেরই এই সকল বিষয় বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া, ধ্বংসোন্মুখ গোজাতির রক্ষার উপায় বিধানে মনোযোগী হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য।

এ দেশে অবাধ গোহত্যা রাজবিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইলে, পাশ্চাত্য-দেশের অনুকরণে, গো, মহিষ, ছাগল, হাঁস, মুর্গী প্রভৃতি গৃহপালিত পশু-পক্ষী রেল বা ষ্টিমারে আনয়ন করিবার ভাড়া খুব সামান্য করিতে পারিলে, এবং জনন কার্য্যোপযোগী বৃষাদির শুল্ক রহিত হইলে যে, এ দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সকল কার্য্য গভর্ণমেণ্টের বিশেষ সাহায্য ব্যতীত সম্পন্ন হওয়া সম্ভবপর নহে। আমাদেরও এ বিষয়ে যথেষ্ট কর্ত্তব্য রহিয়াছে। আমাদের দেশের গোজাতির উন্নতিসাধন করিতে হইলে, প্রাচীনকালের ন্যায়, বিধি দ্বারা গোচরণ-ভূমি রক্ষিত এবং গৃহে গৃহে গো-পরিচর্য্যা বা গো পালন-প্রথা হওয়া যেমন অত্যাবশ্যক, তদ্রূপ যাহাতে পশু-নয়ন-শুল্কের হ্রাস ঘটে, তদুপায়বিধান করাও আশু কর্ত্তব্য। বিলাতের "কাসেল্ ষ্টিম্ পীপ্ কোম্পানী" জনন-পশু বিনা শুল্কেই বিলাত হইতে কেপ্‌কলনীতে আনয়ন করিয়া থাকেন। এ দেশেও উক্ত কোম্পানীর ন্যায় কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। তদ্ভিন্ন, গো-বাসা কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত ও সুপরিচালিত হইলেও দেশের কল্যাণ হইবে। এই সকল বিষয়ে, অর্থাৎ গোরক্ষার উপায়-নির্দ্ধারণোদ্দেশ্যে, দেশের হিতকামী ব্যক্তিরই বিশেষ আন্দোলন ও আলোচনা করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।

বলিষ্ঠ বলদ আমাদের নাই বলিলেই হয়। সোনপুরের হরিহরছত্রের মেলা, গয়ার চৈত্রসংক্রান্তির মেলা, বহরম-পুরের মেলা এবং তিৎপুরের হাটই বলদপ্রাপ্তির প্রধান স্থান। কিন্তু ঐ সকল স্থান বঙ্গদেশ হইতে বহুদূরে অবস্থিত বলিয়া, বঙ্গের কৃষকেরা বহু অর্থ ব্যয় না করিলে বলদ আনয়ন করিতে পারে না। আমাদের সদাশয় গভর্ণমেণ্ট জনন-পশু-নয়ন শুল্ক রহিত করিয়া দিলে, বঙ্গে চাষী-বলদের সংখ্যা ক্রমেই অত্যধিকরূপে বর্দ্ধিত হইত, এবং তাহাতে কৃষিরও যথেষ্ট উন্নতি ঘটিত, সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে দেশব্যাপী তুমুল আন্দোলন হওয়া কর্ত্তব্য।

এ দেশের শ্রাদ্ধের উৎসর্গীকৃত ষাড় বা ধর্ম্মের ষাড় এবং খোদাই ষাড় (খোদার নামে যাহা ছাড়িয়া দেওয়া হয়) যাহাতে অবাধে নিহত হইতে না পারে, তজ্জন্য রাজবিধি-প্রণয়নও অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বের ন্যায়, ধর্ম্মের ষাড় বা খোদাই ষাড়ের সংখ্যা যতই বর্দ্ধিত হইবে, ততই গো-জনন-কার্য্যে উৎকৃষ্ট ষাড়ের অভাব বিদূরীত হইবে।

প্রবন্ধটী সুদীর্ঘ হইয়া পড়িল। সুতরাং, এ স্থলেই আমি প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। এ দেশের কৃষির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিসাধন করিতে হইলে, গো-জাতির উন্নতিবিধানের প্রতিই প্রথমতঃ বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কারণ, গোজাতির উন্নতির সহিত, এ দেশের কৃষির উন্নতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্ত্তমান। বর্ত্তমানসময়ে, এ দেশের কৃষকদিগের দেশী প্রাচীন চাষ-বাস-পদ্ধতি শিক্ষা করা আবশ্যক; এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে গোজাতির উন্নতির প্রতিও তাহাদের বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কৃষি-শিক্ষা ও গো-রক্ষা— এই দুইটি নিশ্চয়ই কৃষকের মূলমন্ত্র হওয়া কর্ত্তব্য।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার।

Printed by Jatindra Mohan Das at the Wari Printing Works, Dacca and published by Nishi Kanta Ghosh at the Krishi-Sampada office, 66, Narinda Dacca.

সিটি লাইব্রেরী।

ম্যানেজিং প্রোপ্রাইটার শ্রীনগেন্দ্রকুমার রায়
(ঢাকা—ফিরিঙ্গীবাজার স্কুলের ভূতপূর্ব্ব হেড্ মাষ্টার)।
প্রধান কার্য্যালয়—২৬নং বাঙ্গালাবাজার, ঢাকা।
শাখা-কার্য্যালয়—৬৪।১নং কলেজষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নিবেদন।

কি ঐহিক কি পারত্রিক, এই উভয়বিধ কল্যাণ সাধন করিতে হইলে ধর্ম্মকেই আশ্রয় করিতে হয়। ধর্ম্মপথ আশ্রয় ভিন্ন কেহ কোন বিভাগে উন্নতি লাভ করিতে পারে না। চরিত্রবান্ লোক ভিন্ন কেহ সাহসপূর্ব্বক ধর্ম্মকে আশ্রয় করিতেও পারে না। সৎসঙ্গ ও সদ্‌গ্রন্থই বালক ও যুবকদিগের চরিত্রগঠনের প্রধান উপায়। সৎসঙ্গ আজকাল দুর্লভ হইলেও সদ্‌গ্রন্থ হয়ত যত্ন করিলে পাওয়া যায়। লাইব্রেরী বা পুস্তকালয়ের দায়িত্ব এইখানে। দেশের পুস্তকালয় সকল হইতে সদ্‌গ্রন্থ প্রচারের যথেষ্ট সাহায্য হইতে পারে। অবশ্য গ্রন্থকারদিগের দায়িত্বও এই সঙ্গে রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন প্রকাশকগণের বিচারের উপর এই বিষয় যথেষ্ট নির্ভর করে। যাহা হউক কোনকালে মনে হইল, একটী বইএর দোকান দিয়া ভাল ভাল বহি চালাইব। সেই অঙ্কুর হইতেই সিটি লাইব্রেরীর উৎপত্তি। আজ ৪ বৎসর হইল সিটি লাইব্রেরী স্থাপিত হইয়াছে। এই অতি অল্পকালের মধ্যেই ইহা দশজনের আশীর্ব্বাদে বঙ্গের সর্ব্বত্রই প্রচারিত হইয়াছে। এই অল্পকালের মধ্যে যতদূর সাধ্য সমগ্র সদ্‌গ্রন্থের সংগ্রহ করা হইয়াছে। বৈষ্ণব গ্রন্থের জন্য এই লাইব্রেরী সমগ্র বঙ্গদেশে সুপ্রসিদ্ধ এবং এই লাইব্রেরী হইতে পূর্ব্ববঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বঙ্গানুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন স্কুলপাঠ্য বহি, নীতিপূর্ণ গল্পের বহি, নভেল, জীবনচরিত, ধর্ম্মগ্রন্থ প্রভৃতি অতীব প্রয়োজনীয় প্রায় ১৭০ খানা বহি এই অল্পসময়ের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। এই লাইব্রেরীর যাবতীয় পুস্তকগুলিই আধুনিক আবিষ্কৃত তথ্যাদিতে পরিপূর্ণ। মহামান্য ডিরেক্টার বাহাদুর কর্ত্তৃক পাঠ্য ও অনুমোদিত প্রায় ৭০ খানা বহির আমরা প্রকাশক বা সোল এজেণ্ট। আগামী ১৯১৭ সনের জন্য আমাদের ১৩ খানা বহি পাঠ্য হইয়াছে। এবং৬০ খানা বহি অনুমোদিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন রায় সাহেব শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ প্রণীত যাবতীয় বহি এবং বোম্বে অকস্‌ফোর্ড ইউনিভারসিটী প্রেস হইতে প্রকাশিত যাবতীয় বাঙ্গালা বহি ও অন্যান্য অনেক গ্রন্থকারদিগের বহির একমাত্র এজেণ্ট সিটী লাইব্রেরী। গ্রাহক ও ভদ্রমহোদয়গণের আশীর্ব্বাদে ৬৪।১নং কলেজষ্ট্রীটে দোকানের ব্রাঞ্চ খুলিতে হইল। কলিকাতার দোকানদার ও ভদ্র মহোদয়গণ যাহাতে সিটী লাইব্রেরীর প্রকাশিত বহিগুলি অনায়াসে পাইতে পারেন, তজ্জন্যই এই আয়োজন। গ্রাহক ও ভদ্র মহোদয়গণের আশীর্ব্বাদই আমাদের মূল সম্বল এবং আমাদের ব্যবহারে ধর্ম্মের মর্য্যাদা অন্ততঃ কিছুটাও রক্ষিত হইলে কৃতার্থ হইব। ইতি

সন্দর্ভমালা	।৵০	মনোমোহন রায়	৪
প্রবন্ধপাঠ (১ম ভাগ)	।/০	ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী এম, এ	"
সাহিত্য প্রসূন	।৵০	প্রসন্নকুমার গুহ	,,
সুখপাঠ	।০	যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	,,
সাহিত্য কৌমুদী	।৶০	ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী	৫
প্রবন্ধপাঠ (১ম ভাগ)	।/০	,,	,,
সাহিত্য-প্রসূন	।৵০	প্রসন্নকুমার গুহ	,,
সন্দর্ভ-মালা	।৵০	মনোমোহন রায়	,,
জ্ঞানবিকাশ	॥০	মহম্মদ তৈমুর	,,
প্রবন্ধপাঠ (২য় ভাগ)	॥০	ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী এম, এ	৬
জ্ঞানসোপান	।৶০	জগদানন্দ রায়	,,
জ্ঞানবিকাশ	।৶০	অতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	,,
উপদেশমঞ্জরী	।৵০	অনাথবন্ধু মল্লিক	,,
সন্দর্ভচন্দ্রিকা	॥৶০	অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত এম, এ	৭
বিবিধ প্রবন্ধ	॥/০	রজনীকান্ত গুপ্ত	,,
পদ্যসন্দর্ভ	।/০	রায়সাহেব দীনেশচন্দ্র সেন, বি, এ	,,
সদ্ভাবশতক	॥০	অসিতাকুমার গুহ প্রকাশিত	,,
*প্রবন্ধমঞ্জু	৸০, ৸৵০	শিবরতন মিত্র	৮

* এই পুস্তকখানা প্রেসিডেন্সী এবং বর্দ্ধমান বিভাগেও ক্লাস ৭—১০ এর জন্য অনুমোদিত হইয়াছে।

সীতার বনবাস	৸০	শিবরতন মিত্র	,,
পদ্য সন্দর্ভ	।/০	দীনেশচন্দ্র সেন বি, এ	,,

সংস্কৃত সাহিত্য

বহির নাম	মূল্য	গ্রন্থকার	ক্লাস
সুনীতি-সোপানম্	।/১০	বরদাকুমার কাব্যতীর্থ	৭
সুপ-পাঠম্	।১০	দেবেন্দ্রকুমার বিস্তারত্ন এম, এ	৮
সংস্কৃত সন্দর্ভ	।৵০	বিধুশেখর শাস্ত্রী	৭, ৮

সংস্কৃত ব্যাকরণ

*পাণিনি-পরিশিষ্ট ৸০ দেবেন্দ্রকুমার বিস্তারত্ন এম,এ ৩—১০

এই বহিখানা কলেজের I. A. class এর পাঠ্য হইয়াছে। যাহারা ম্যাট্রিকুলেসন ক্লাসে অপসনেল সংস্কৃত নিয়াছে তাহাদের পক্ষে পাণিনি—পরিশিষ্ট বিশেষ উপযোগী। ইহাতে শব্দখণ্ড ও ধাতুখণ্ড বিস্তাররূপে দেওয়া হইয়াছে। দেবেন্দ্রবাবু সম্প্রতি "পাণিনি প্রাইমার" নামে একখানা গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন; তৎসঙ্গে বড় বড় অক্ষরে অষ্টাধ্যায়ী সূত্রপাঠ প্রদত্ত হইয়াছে। ক্লাস এইটের সংস্কৃতশিক্ষার্থী প্রত্যেক ছাত্রেরই একখণ্ড ক্রয় করা কর্ত্তব্য। মোট কথা 'পাণিনি প্রাইমার' ও "পাণিনি পরিশিষ্ট" কমাপ্লিট (complete) বহি।

অঙ্ক।

গণিত-বিকাশ (১ম ভাগ)	।৶০	আশুতোষ বসু এম্ এস,সি এবং পুলিনচন্দ্র বসু এম, এ	২, ৩
গণিতকুসুম,	।৵০	পরেশনাথ বসু এম.এস,সি	"
পাটীগণিত (১ম ভাগ)	।/০	হরকান্ত বসু বি, এ	"
খোকার আঁক	।৵১০	অতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও ভীমচন্দ্র দত্ত	
রয়েল এরিথ্মেটীক	৸০	পরেশনাথ বসু এম,এস,সি	৪,৫,৬

ব্যাকরণ

সরল বাঙ্গালা ব্যাকরণ	।০	নগেন্দ্রকুমার চন্দ	৪,৫,৬
ভাষাশিক্ষা ব্যাকরণ	।৵০	প্রসন্নকুমার গুহ	"
*ভাষা-বিজ্ঞান	৸০	রজনীকান্ত বেদান্তবাগীশ	৭.৮
সাহিত্যবোধব্যাকরণ	৸০	মতিলাল চক্রবর্ত্তী	৭, ৮, ৯, ১০

* প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমে পণ্ডিত মহাশয় এই ব্যাকরণ প্রকাশ করিলেন। সম্প্রতি ২য় ও ৩য় খণ্ড বাহির হইয়াছে। এই ব্যাকরণ বাঙ্গালা ভাষার গৌরব স্তম্ভ। প্রতিখণ্ড ৸০ আনা। অন্ততঃ এক সেট প্রত্যেক স্কুল-লাইব্রেরীতে রাখিবার উপযোগী।

মধ্য বাঙ্গালা, উচ্চ প্রাইমেরী ও নিম্নপ্রাইমেরী স্কুলের জন্য।

সাহিত্য

সাহিত্য পাঠ	৵১০	ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী এম,এ,	২
কোমল পাঠ	৵০	"	"
শিশুরঞ্জন	৶০	পদ্মলোচন ঘোষ	"
সুনীতিপাঠ	।/০	সুরেশচন্দ্র ঘোষ বি, এ	৩
সরল নিয়পাঠ	।৵১০	দীনেশচন্দ্র সেন বি, এ ও নবীনচন্দ্র বসু বি, এ	"

নীতিকবিতা	।০	"	৪
নীতিকবিতা	৵০	"	৫
প্রবন্ধ পাঠ (২য় ভাগ)	॥০	ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী, এম, এ	৭
বিবিধ-প্রবন্ধ (৩য় ভাগ)	॥/০	রজনীকান্ত গুপ্ত	"
প্রবন্ধ-পাঠ (২য় ভাগ)	॥০	ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী	৬
বিবিধ প্রবন্ধ (৩য় ভাগ)	॥/০	রজনীকান্ত গুপ্ত	"
সন্দর্ভচন্দ্রিকা	॥৶০	অক্ষয়কুমার দত্ত গুপ্ত কবিরত্ন এম, এ	"

অঙ্ক

গণিত বিকাশ (১ম ভাগ)	।৶০	আশুতোষ বসু এম, এস, সি ও পুলিনচন্দ্র বসু এম, এ	৩, ৪
গণিত কুসুম	।৵০	পরেশনাথ বসু এম,এস সি	"
পাটীগণিত (১ম ভাগ)	।/০	হরকান্ত বসু বি, এ	"
খোকার আঁক	।৵১০	ভীমচন্দ্র দত্ত ও অতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	"

উচ্চ ও মধ্যইংরেজী, মধ্যবাঙ্গালা, উচ্চ-প্রাইমেরী ও নিম্নপ্রাইমারী স্কুলের জন্য অনুমোদিত।

পত্রদলিল

আদর্শ নূতন পত্রদলিল ৵০ মৌলবী আবদুল জব্বর

কর্ম্ম সঙ্গীত।

নব কিণ্ডার গার্টেন কর্ম্মসঙ্গীত ৵০ মৌলভী ছালামতুল্লা

রাজার কথা ।৵০ কালিভূষণ মুখোপাধ্যায়

স্বজাতি বৎসলা ললনা ৶০ অম্বিকাচরণ চক্রবর্ত্তী

* পৌরাণিকী কথা ও ইসলাম কাহিনী } গুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য ২৲ { আবাধা তিনখানি ১৸০ আনা

নারীর ভাগ্যচিত্র ২৲ জনৈক মহিলা প্রণীত

বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার } জগদানন্দ রায় ১।০

প্রকৃতি পরিচয় ১।০ "

সুকথা ৸০ দীনেশচন্দ্র সেন বি, এ

‡ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত (বঙ্গানুবাদ) ৫৲ টাকা, বাঁধা ৬৲ নগেন্দ্রকুমার রায়

আদর্শ জননী ৸০ শরচ্চন্দ্র ধর

* রামায়ণের কথা ॥৵০ আনা, মহাভারতের কথা ৸০ আনা ও ইসলাম কাহিনী ।৵ আনা পৃথক পৃথক পাওয়া যায়।

‡ প্রেসিডেন্সী, বর্দ্ধমান ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজসাহী বিভাগসমূহের যাবতীয় স্কুল, কলেজ, গুরুট্রেনিং ও নর্ম্মাল স্কুলের জন্য অনুমোদিত হইয়াছে। "অদ্যাবধি এরূপ সংস্করণ প্রকাশিত হয় নাই" ইহা অনেকেই বলেন।

ঢাকা সিটি লাইব্রেরীর নিম্নলিখিত বইগুলি এবার ডিরেক্টার বাহাদুর কর্ত্তৃক নূতন পাশ হইয়াছে।

শিশুর সাথী	৶০	ইন্দিরা দেবী	২
করুণাসোপান	।৵০	হিরণবালা গুপ্তা	"
নীতিমাল্য	।৶০	রাসবিহারী বসু এম, এ	"
নীতিচয়ন	৸০	রাসবিহারী বসু এম, এ	"
সংস্কৃত প্রাইমার	।০	যোগেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়	"
সুনীতি সারম্	।০	"	"
লঘুপাণিনির (২য় ভাগ)	৸০	"	৭, ৮
লঘু পাণিনির (৩য় ভাগ)	॥০	"	"

আদর্শ ভূ-পরিচয় আসাম প্রদেশে ইংরেজী ও বাঙ্গালা যাবতীয় স্কুলের ১০টী ক্লাসে পাঠ্য হইয়াছে। (আসাম গেজেট দেখুন। স্কুল ঘর হইতে আরম্ভ করিয়া মহাদেশ পর্য্যন্ত নানাবিধ ছবি দ্বারায় বর্ণিত হইয়াছে। আজ পর্য্যন্ত এমন ভূগোল বাহির হয় নাই।

চাইল্ডস ইজি গ্রামার	।/০	কে, সি সেন এম, এ	৪,৫,৬
শিশুপাটীগণিত	।৵০	রজনীকান্ত দে	"
সিম্পল এরিথ্মেটিক	৸০	জ্ঞানদাকিশোর চৌধুরী ও যোগেশচন্দ্র চাটার্জ্জি বি, এ	"
সরল শিশুপ্রবেশ	৶০	নগেন্দ্রকুমার রায়	"
শিশুতোষ ব্যাকরণ	/১০	অতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	"

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা বঙ্গানুবাদ সহ	॥৵০	ঐ
হাটপত্তন ও নামসংকীর্ত্তন বঙ্গানুবাদ সহ	।০	"
রূপাভিসার ব্রজলীলা নাটক	৶১০	চৈতন্যকৃষ্ণ দাস
দুর্গা পুরাণ	১॥০	পীতাম্বর নাথ
ঠাকুরমার চিঠি বা সমাজে নারী	১।০	ফণিভূষণ রায়

রেজেষ্টরী করা শঙ্খমার্কা আসল।

লালমোহন সাহ শঙ্খনিধির

জগদ্বিখ্যাত

সর্ব্বজ্বরগজসিংহ

৪৮ ঘণ্টায় সর্ব্ববিধ জ্বর, ১ সপ্তাহে প্লীহা-যকৃৎ আরোগ্য হয়।

পৃথিবীব্যাপিত

সর্ব্বদদ্রুহুতাশন

২৪ ঘণ্টায় দাউদাদি চর্ম্মরোগ বিনাক্লেশে আরোগ্য হয়।

সুপ্রসিদ্ধ

কণ্ডুদাবানল

খোশ পাচড়াদি ক্ষতরোগ শীঘ্র বিনাক্লেশে আরোগ্য হয়।

শ্রীগৌরনিতাই সাহ শঙ্খনিধি।

ঢাকা—বাবুবাজার, শঙ্খনিধি পোঃ বা ভজহরিসাহার ষ্ট্রীট, ঢাকা

তামাকের চাষ

রংপুর গবর্ণমেণ্ট কৃষি-পরীক্ষাক্ষেত্রের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযামিনীকুমার বিশ্বাস বি, এ প্রণীত

নানাপ্রকার দেশী ও বৈদেশিক তামাকের চাষসম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্যতথ্যপূর্ণ অভিনব পুস্তক। বাঙ্গালা ভাষায় তামাকের চাষসম্বন্ধে এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সুবৃহৎ পুস্তক ইতঃপূর্ব্বে আর প্রকাশিত হয় নাই। গ্রন্থকার বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া ব্রহ্মদেশ, বেহার ও মান্দ্রাজের অনেক স্থানের তামাকের চাষ-প্রণালী সন্দর্শন করিয়াছেন এবং বিগত ১৯০৫ সাল হইতে এ যাবৎ রংপুর সরকারী কৃষিপরীক্ষা-ক্ষেত্রে নানা জাতীয় তামাকের উন্নতিকল্পে বহু পরিশ্রমে দেশী এবং সিগারেটের উপযোগী মার্কিন ও তুরস্ক দেশীয় ও চুরটের উপযোগী মান্দ্রাজ ও বর্ম্মা দেশীয় তামাকের বিজ্ঞানসম্মত-প্রণালীতে চাষ-বাস করিয়া, যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন; এ পুস্তকে তাহাই বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তামাকের চাষ করিয়া যাহারা বিশেষ লাভবান হইতে বাসনা করেন, তাহাদের সকলেরই একখানি ক্রয় করা উচিৎ।

পুস্তকের ছবি, ছাপা ও কাগজ উত্তম--মোট ১৮ খানি ছবির পুস্তকের মূল্য ১॥০ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—কৃষি-সম্পদ আফিস—ঢাকা।

কৃষিতত্ত্বাবদ।

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দে F. R. H. S. প্রণীত।

১। কৃষিক্ষেত্র (১ম ও ২য়খণ্ড একত্রে ৪র্থ সংস্করণ)—১৲

২। সবজীবাগ (৫ম সংস্করণ) ॥০ ৩। ফলকর (৩য় সংস্করণ) ॥০

৪। মালঞ্চ (২য় সংস্করণ)—১৲ ৫। মৃত্তিকতত্ত্ব—১৲

৬। গোলাপবাড়ী—৸০, ৭। কার্পাস-কথা—॥০

৮। উদ্ভিদ-জীবন ॥০, ৯। পশুখাদ্য ।০, ১০। আয়ুর্ব্বেদচা ।০

১১। Treatise on Mango (2nd Edition) Re. 1

১২। Potato Culture (3rd Edition.) As 6

প্রাপ্তিস্থান-কৃষি-সম্পদ পুস্তক-বিভাগ।
কৃষি-সম্পদ আফিস—ঢাকা।

কৃষি-সম্পদের পাঠকগণ আদ্যন্ত পাঠ করুন।

কৃষি-সম্পদ পুস্তক-বিভাগ।

পুস্তক-বিভাগ স্থাপনের উদ্দেশ্য—

আমাদের কৃষি-কর্ম্মানুরাগী ও কৃষি-কর্ম্মাধ্যায়ী বহুসংখ্যক গ্রাহকই নানা প্রকার কৃষি-গ্রন্থ পাঠাইয়া দিবার জন্য আমাদিগের নিকট পত্র লিখিয়া থাকেন। আমরা তাঁহাদের পত্র পাওয়া মাত্রই, পুস্তক পাইবার ঠিকানা জানাইয়া থাকি। কিন্তু অনেকেই ইহাতে বড় অসন্তুষ্ট হন এবং নানারূপ অনুযোগ করিয়া, আমাদিগকেই তাঁহাদের অভীপ্সিত পুস্তক পাঠাইয়া দিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়া থাকেন। এমন কি, অনেকেই লিখিয়া থাকেন, "আমরা আপনাদের লিখিত ঠিকানায় পত্র দিয়াও পুস্তক পাইতেছি না। ঢাকা ও কলিকাতার দুই চারিটী পুস্তকালয়েও পুস্তক পাঠাইয়া দিতে অর্ডার দেওয়া হইয়াছিল; কিন্তু কেহই পুস্তক পাঠাইয়া দিতে পারেন নাই" ইত্যাদি। বস্তুতঃ, অধিকাংশ পুস্তক-বিক্রেতাই যে বাঙ্গলা ও ইংরেজি কৃষি-গ্রন্থ বিক্রয় করেন না, তাহা আমরা বিশেষভাবেই অবগত আছি। কৃষি-গ্রন্থ ক্রয় করিবার ইচ্ছা খুব কম লোকেরই হয়। এমতাবস্থায় বলবতী বাসনাসত্ত্বেও যে অনেকেই পুস্তক ক্রয় করিতে পারেন না, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। আমাদের গ্রাহকদিগের যাহাতে বাসনা অপূর্ণ না থাকে, তদুপায়বিধান করাই, আমাদের পুস্তক-বিভাগ-স্থাপনের প্রধানকারণ।

কৃষি-গ্রন্থ প্রচারের সহায়তা করাই, পুস্তক-বিভাগ স্থাপনের মুখ্য-উদ্দেশ্য।

ইহাতে থাকিবে কি—প্রায় সর্ব্বপ্রকার ইংরেজি ও বাঙ্গালা কৃষি-গ্রন্থ বিক্রয়ার্থ প্রচুর পরিমাণে মজুত থাকিবে। তদ্ভিন্ন, স্কুল ও পাঠশালার পাঠ্য পুস্তক, উপহার দিবার উপযোগী এবং স্ত্রী-পাঠ্য সর্ব্ববিধ পুস্তকই, পুস্তক-বিভাগে রক্ষিত হইবে। ডাক্তারি ও কবিরাজি চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধীয় পুস্তক, ধর্ম্মগ্রন্থ, ইতিহাস এবং নভেল, উপন্যাস ও কাব্য গ্রন্থাদিও পুস্তক-বিভাগে রাখা হইবে।

কৃষি-সম্পদ পুস্তক-বিভাগে প্রায় সর্ব্বপ্রকারের পুস্তকই রহিবে।

পুস্তকের অর্ডার দিবার সঙ্গে সঙ্গেই আনুমানিক এক চতুর্থাংশ মূল্য পাঠাইয়া দিতে হইবে।

কার্য্যাধ্যক্ষ—কৃষি-সম্পদ পুস্তক-বিভাগ।
"কৃষি-সম্পদ" আফিস—ঢাকা।

NEW START! NEW START!!

HALF-TONE AT DACCA

Engraving Process & Co.

Process Engraving & Co.

All up-to-date Machineries.
Works—Up-to-date and satisfactory.

Expert trained in AMERICA and JAPAN.

Our blocks print clean and beautiful.

PROCESS ENGRAVING & Co.,
25, GANDARIA—DACCA.

Cover printed at the Sreenath Press, Dacca.

Approved by the Director of Public Instruction, Bengal, for use in Schools & Colleges (Vide Calcutta Gazette 2nd Oct. 12).

Krishi Sampada
Vol. VII, No. VIII.

একমাত্র কৃষিবিষয়ক মাসিক পত্র।

অগ্রহায়ণ, ১৩২৩।
৭ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা।

কৃষি-সম্পদ

কৃষি, কৃষি-শিল্প এবং যৌথ ঋণ-দান-সমিতি-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নূতন ধরণের সচিত্র মাসিক পত্র।

ইহাতে প্রতি মাসেই ডবল ক্রাউন আট পেজি ৪ ফর্ম্মা অর্থাৎ ৩২ পৃষ্ঠা থাকিবে।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩৲ মাত্র।

প্রবন্ধ-সম্পদে অতুলনীয়, চিত্র-সৌন্দর্য্যে অপূর্ব্ব ও সর্ব্বত্র উচ্চ-প্রশংসিত বাঙ্গালার কৃষি-বিষয়ক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও বৃহত্তম পত্র।

লেখক—"কৃষি-সম্পদে" রহিয়াছেন—

আমেরিকা-প্রত্যাগত শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, বি, এ, এম, এস, এ।
" " শ্রীযুক্ত দ্বিজদাস দত্ত এম্, আর, এ, সি,
" " " অনাথবন্ধু সরকার এম্, এ, সি, এস,
" " মিঃ জি, এন, মুখার্জ্জি এম্, এস, সি।
জাপান-প্রত্যাগত শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম্, এ, এস।
" " " রসিকরঞ্জন ঘোষ এম্, এস, এ।
" " " মন্মথনাথ দে " " "
" " " যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, " " "
" " মিঃ এস, এন, বসু এম্, এ, এস।
" " " এ, সি, ঘোষ " " "
" " " এন্, এল, দত্ত " " "
" " " পি, কে, বিশ্বাস পি, এইচ, ডি।
ফ্রান্স-প্রত্যাগত শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস এস, ই
" প্রবোধচন্দ্র দে এফ, আর, এইচ, এস
" ঈশ্বরচন্দ্র গুহ " " " "
" রাজেশ্বর দাসগুপ্ত এম্, আর, এ, এস
" গিরিজানাথ মজুমদার জি,বি,ভি,সি
" অনুকূলচন্দ্র রায়
" হেমচন্দ্র দেব (মেডিকো বোটানিষ্ট)

সহকারী কিসারী আফিসার শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বাগচী বি, এ প্রভৃতি

"কৃষি-সম্পদের" নিয়মাবলী।

১। "কৃষি-সম্পদের" প্রত্যেক সংখ্যা সাধারণতঃ চারি ফর্ম্মা অর্থাৎ ৩২ পৃষ্ঠা পরিমিত হইবে।

২। প্রতি মাসে চারি ফর্ম্মা হিসাবে, বৎসর ৪৮ ফর্ম্মা প্রদত্ত হইবে।

৩। প্রত্যেক সংখ্যাতেই ছবি থাকিবে, কিন্তু প্রবন্ধের প্রকৃতি অনুসারে ছবির সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি হইবে

৪। ইহার বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত সর্ব্বত্র ৩৲ তিন টাকা মাত্র। মূল্য অগ্রিম দেয়।

৫। প্রতি সংখ্যা।/০ আনা। নমুনারও মূল্য লাগে।

৬। "কৃষি সম্পদ" প্রত্যেক পূর্ণিমায় বাহির হয়। সুতরাং কোন গ্রাহক "কৃষি-সম্পদ" না পাইলে, কার্য্যাধ্যক্ষকে তাহা জানাইবেন। নচেৎ অপ্রাপ্ত সংখ্যার জন্য, পরে মূল্য ও ডাকমাশুল দিতে হইবে।

৭। বৈশাখী পূর্ণিমায় "কৃষি-সম্পদের" বৎসর আরম্ভ এবং চৈত্র-পূর্ণিমায় বৎসর শেষ। বৎসরের যে কোন সময়ে, "কৃষি-সম্পদের" গ্রাহক হইতে পারা যায়; কিন্তু প্রত্যেক গ্রাহকই ১ম সংখ্যা হইতে "কৃষি-সম্পদ" প্রাপ্ত হইবেন।

৮। অমনোনীত প্রবন্ধাদি ফেরত দেওয়া হয় না।

৯। উত্তরপ্রার্থীগণ রিপ্লাই কার্ড বা ডাক টিকেট পাঠাইয়া দিবেন। বেয়ারিং বা ইন্সাফিষেণ্ট পত্র লওয়া হয় না।

১০। "কৃষি-সম্পদ" সম্বন্ধীয় সমস্ত চিঠি-পত্র, প্রবন্ধ বিনিময়ের সংবাদ-পত্র, টাকা-কড়ি, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি "কৃষি-সম্পদ" পত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত ঘোষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

"কৃষি-সম্পদ" আফিস। ঢাকা। } কার্য্যাধ্যক্ষ।

বিজ্ঞাপনের হার।

১। "কৃষি-সম্পদে" বিজ্ঞাপন দিতে হইলে, মাসের প্রথমভাগে বিজ্ঞাপন পাঠাইতে হইবে।

২। বিজ্ঞাপনের হার সুলভ। মাসিক প্রতি পৃষ্ঠা ৬৲ টাকা; প্রতি কলম ৪৲ টাকা। অনেক দিনের জন্য চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

৩। চুক্তির হিসাবে অর্দ্ধ এবং সিকি কলম বিজ্ঞাপন লওয়া যায়।

৪। কাভারিংএর তৃতীয় এবং চতুর্থ পৃষ্ঠায়ও বিজ্ঞাপন গৃহীত হইবে। তৃতীয় পৃষ্ঠায় মাসিক ১০৲ এবং চতুর্থ পৃষ্ঠায় ১২৲ টাকা দেয়। বাৎসরিক চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

অন্নং বহু কুর্বীত ॥ তদ্‌ব্রতম্ ॥
তৈত্তীরীয়োপনিষদি ভৃগুবল্লী।

সূচী।

[লেখকদিগের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।]

বিষয়	পত্রাঙ্ক
কৃষি-প্রসঙ্গ	২০১
রক্ত-আমাশয় (গোজাতির)	২০৪
—শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ('গোধন'-প্রণেতা)	
ফলবান্ বৃক্ষের উৎপত্তি	২০৬
—শ্রীযুক্ত স্বর্ণকুমার মিত্র (বার্কলী-কৃষি-কলেজ)	
গোলাপের চাষ	২০৯
—শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র গুহ এফ্, আর, এইচ্, এস	
আর্য্যশাস্ত্রে কৃষিতত্ত্ব	২১৮
—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ	
নারিকেলগাছের পোকা	২২১
—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার মজুমদার বিদ্যাভূষণ	
বঙ্গের গো-ধন (সঙ্কলিত)	২২৩

কৃষি-প্রসঙ্গ।

জার্ম্মাণীর 'টাইফা'—"চিকাগো ডেইলি নিয়ুজে" প্রকাশ,—জার্ম্মাণী 'টাইফা' নামক একপ্রকার গাছ হইতে একরূপ তন্তুর আবিষ্কার করিয়াছে। টাইফা-গাছ আমাদের দেশের ভাঁটাগাছের মত; এবং ইহা জলাভূমিতে জন্মে। টাইফা-তন্তু হইতে যে নানারূপ ব্যবহারোপযোগী উৎকৃষ্ট সূতা প্রস্তুত হইতে পারে, পরীক্ষায় তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। এমন কি, একমাত্র টাইফার তন্তুতেই পাট, কার্পাস ও পশমের কাজ চলে। নানাপ্রকারের টাইফা-গাছ জন্মে; এবং উহাদের আঁশও একরূপ হয় না। টাইফা-গাছের আঁশে পাটের মত মজবুত এবং কাপাসের মত কোমল—এই উভয়প্রকার সূত্রই প্রস্তুত হয়। সুতরাং তদ্দ্বারা মোটা চট হইতে চিকণ বস্ত্র পর্য্যন্ত নানাবিধ ব্যবহারোপযোগী বস্তুই প্রস্তুত হইতে পারে। এই বৎসর

জার্ম্মাণীতে ১ কোটি ৩৫ লক্ষ মণ টাইফা জন্মিয়াছে। আড়াই মণ টাইফা হইতে দশসের সূতা প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

জার্ম্মাণীতে জলাভূমির অভাব নাই। ঐ সকল সুবিস্তৃত জলাভূমিতে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে টাইফার চাষ করিতে পারিলে, জার্ম্মাণী অল্পব্যয়ে ইচ্ছানুযায়ী অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে তন্তু সংগ্রহ করিতে পারিবে। সুতরাং ভবিষ্যতে হয়ত পাট, কার্পাস প্রভৃতির জন্ম জার্ম্মাণীকে বিদেশের মুখাপেক্ষা করিতে হইবে না। টাইফা খুব শীঘ্র শীঘ্র বর্দ্ধিত হয়। এক বৎসরে অনেকবার টাইফার চাষ হইতে পারে। জুন মাসে টাইফা কাটিয়া আঁশ বাহির করা হয়। টাইফা-গাছের আঁশ বাহির করিয়া দেখা গিয়াছে, ইহার উৎপাদন ব্যয়, আমদানী মালের তুলনায়, অতি অল্প। বার্লিনের এক জগদ্বিখ্যাত বণিক বলিয়াছেন ;—"আমেরিকা ও মিশর হইতে জার্ম্মাণী প্রতিবৎসর যে পরিমাণ কার্পাস ক্রয় করিত, আগামী বৎসর যে সেই পরিমাণ টাইফা উৎপন্ন হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভবিষ্যতে জার্ম্মাণী আর আমদানীর মুখাপেক্ষী হইয়া রহিবে না ; বরং রপ্তানিই করিতে পারিবে। জার্ম্মাণী প্রথমে মোটা আঁশের উপযোগী টাইফার চাষ করিবে ; এবং তৎপর সূক্ষ্মতন্তুর উপযোগী টাইফার চাষেও মন দিবে।" এই বিবরণ সত্য হইলে আশঙ্কার কথা বটে ! জার্ম্মেণী কৃত্রিম নীল বাহির করিয়া, নীলের চাষ একেবারেই মাটি করিয়া দিয়াছে। এক্ষণ আবার টাইফার চাষ করিয়া, এ দেশের পাটের ব্যবসায় মাটি করিতে পারিবে কিনা, তাহা কে বলিতে পারে ?

আমের কচি ডালের মাজ্‌রা—বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগ হইতে প্রচারিত ১৯১৬ সালের ২নং পত্রিকায় আমের কচি ডালের মাজরা-পোকা সম্বন্ধে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাই নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

"একপ্রকার সাদা কীড়া আমগাছের, বিশেষতঃ কলমের গাছের কচিডালের ভিতর ছিদ্র করিয়া খায় ; এবং এইরূপে ডালগুলি মারিয়া ফেলে। এই পোকা ফাল্গুন হইতে পৌষমাস পর্য্যন্ত ঢাকা-কৃষিক্ষেত্রের ফলের বাগানের আমগাছের বিশেষ ক্ষতি করিয়াছে। অন্যত্রও মাজ্‌রা-পোকার উপদ্রব ঘটিতে দেখা যায়।

স্ত্রী-পতঙ্গ শুঁড় দ্বারা কচিডালের মধ্যে ছিদ্র করিয়া, তাহাতে একটী ডিম পাড়ে। একটি ডালে প্রায়ই একাধিক ডিম দেখিতে পাওয়া যায় না। ডিমগুলি ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণের হয়। ডিম ফুটিলে ছোট ছোট পদশূন্য সাদা কীড়া বাহির হইয়া থাকে। কীড়াগুলি ডালের মধ্যে ছিদ্র করিয়া, ক্রমেই নীচের দিকে প্রবিষ্ট হইতে থাকে বলিয়াই ডালটী মরিয়া যায়। পূর্ণবয়স্ক হইলে, প্রথমতঃ পোকাগুলি ডালের ছিদ্রমধ্যেই 'পুত্তলি'-আকার ধারণ করে ; এবং তৎপর পতঙ্গের আকারে বাহির হইয়া পড়ে। এই পোকাগুলি দেখিতে অনেকটা চাউলের কেরী-পোকার ন্যায় ; কিন্তু তদপেক্ষা বড় অর্থাৎ প্রায় অর্দ্ধ ইঞ্চি লম্বা হয়। পতঙ্গগুলিকে প্রায়ই আমগাছের কচিডালে ডিম পাড়িতে দেখা যায় ; এবং অনুসন্ধান করিলে আক্রান্ত ডালের ভিতর হইতে ডিম ও কীড়া বাহির করা যাইতে পারে।

আক্রান্ত ডালের উপর ঔষধ ছিটাইয়া দিয়া মাজ্‌রা-পোকা ধ্বংস করিতে পারা যায় না। তবে নিম্নলিখিত উপায়ে, এই পোকার উপদ্রব অনেকটা দমন করা যায়।—

নূতন ডাল বাহির হইলেই, তাহাতে পোকা লাগিয়াছে কিনা, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। কোনও ডালে মাজ্‌রা-পতঙ্গ পাওয়া গেলে, তাহা ধরিয়া মারিতে ; এবং ডিম ও কীড়ার সহিত আক্রান্ত ডালগুলিও পোড়াইয়া ফেলিতে হইবে। যদি প্রথমাবধিই সতর্কতা অবলম্বন করা যায়, তাহা হইলে আর পোকার বংশবৃদ্ধি ঘটিতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত উপায়ে পোকা বিনাশ করিয়া ক্ষতির পরিমাণ অনেকটা কমান যাইতে পারে।"

ফলের উপকারিতা—রসনার তৃপ্তিসাধনই ফলভক্ষণ করিবার একমাত্র উদ্দেশ্য নহে ; স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যও ফল ভক্ষণ করা আবশ্যক। রুগ্নব্যক্তিকে ঔষধের পরিবর্ত্তে প্রচুর পরিমাণে ফলভক্ষণ করিয়াও সবল ও সুস্থ হইতে দেখা

যায়। খাদ্যরূপে নানাবিধ ফল নিত্য ব্যবহৃত হইলে, প্রায় সর্ব্ববিধ রোগেই বিশেষ সুফল লাভ করা যায়। ম্যালেরিয়ায় আঙ্গুর, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে নানা জাতীয় বাদাম, রক্তাল্পতায় বেদানা, কোষ্ঠকাঠিন্যে মনক্কা, ক্ষতরোগে কমলা, হৃৎপিণ্ডের ব্যারামে জলজ-ফল, দূষিতরক্তের পক্ষে টোমেটো বিশেষ উপকারী। ব্রেজিল-দেশীয় বাদাম ভক্ষণে টনিকের কার্য্য হয়। আম্র, কদলী প্রভৃতি ফলও বিশেষ পুষ্টিকর। আতা, নোনা প্রভৃতি ফলে ফস্ফোরাসের ভাগ অধিক থাকায় মস্তিষ্কের শক্তি বৃদ্ধি করে এবং দৌর্ব্বল্য নাশ করে। আনারস যকৃতের কার্য্য অবিকৃত রাখে এবং পরিপাক-শক্তি বৃদ্ধি করে। যাহাদের যকৃতের দোষ আছে, তাহাদের পক্ষে কমলালেবু ও লিচু বিশেষ উপকারী। এককথায় বলিতে গেলে, ফলমাত্রেই মানুষের তুষ্টি ও পুষ্টি সাধন করিয়া থাকে। বর্ত্তমানসময়ে, এ দেশে যে পরিমাণে ফলবান্ বৃক্ষ কর্ত্তিত হইতেছে, তাহার সিকি পরিমাণ বৃক্ষও রোপিত হইতেছে না। এ দেশে সর্ব্ববিধ ফলেরই অভাব ঘটিবার ইহাই একমাত্র কারণ। দেশের দশেই এক্ষণ স্বাস্থ্যরক্ষায় মনোযোগী হইয়াছেন ; এমতাবস্থায়, যাহাতে এ দেশের সর্ব্বত্রই অত্যধিক পরিমাণে ফলবান্ বৃক্ষ রোপিত হয়, তৎপ্রতি দেশবাসীমাত্রেরই মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য।

চাষার নেশা।—কৃষি-কার্য্যে সুফললাভ করিতে হইলে, চাষ-বাসে অনুরাগ আবশ্যক। যেমন তেমন অনুরাগ হইলেই চলিবে না। চাই একান্ত আসক্তি—চাই চাষার নেশা। চাষার নেশা লইয়া চাষ-বাস করিতে পারিলে দুই চারি বিঘা জমি লইয়াও সুখে জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পারা যায়।

এক্ষণ ঢাকা-সহরের পূর্ব্ব, উত্তর ও পশ্চিম—এই তিন পার্শ্বে যে সকল স্থানে ইক্ষুক্ষেত্র এবং কপি, বেগুণ প্রভৃতি সব্জীক্ষেত্র দেখা যায়, ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বেও, ঐ সকল স্থানে জঙ্গল ছিল। পশ্চিমদেশীয় অত্যল্পসংখ্যক লোকের বিশেষ চেষ্টাতেই জঙ্গল আবাদ হইয়া কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। আমরা পাঠ্যাবস্থায় (২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বে) ২।১টী ফুলকপি বা বাঁধাকপি খাইতে পাইলে, সে দিনটাকে একটা উৎসবের দিন মনে করিতাম। বস্তুতঃ, তৎকালে ঢাকাতে কপি একরূপ দুষ্প্রাপ্যই ছিল। সমস্ত শীত-ঋতুতে ২।৪টির অধিক কপি আমাদের উদরস্থ হইত কিনা সন্দেহ। কোনও ছুটী উপলক্ষে বাড়ী (বিক্রমপুর) যাইবার সময়, কখনও সঙ্গে দু' একটি কপি লইয়া গেলে, সমস্ত পথেই তাহার মূল্যের কথা বলিতে বলিতে অস্থির হইয়া পড়িতাম। কারণ, তৎকালে পথিকমাত্রেই কপি দেখিলে তাহার মূল্যসম্বন্ধে প্রশ্নজিজ্ঞাসু হইত। এমন কি, অনেকে উহার নাম কি তাহাও জানিতে চাহিত। সে সময়ে মফস্বলের অনেকেই কপির নাম শুনিয়া থাকিলেও, জিনিষটা যে কিরূপ তাহা চক্ষে দেখে নাই। বাড়ীতে ২।১টি কপির উপলক্ষে আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু, বান্ধবদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া না খাওয়াইতে পারিলে, কপি নেওয়া সার্থক হইল না বলিয়াই মনে হইত। ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বেও ঢাকাতে কপি এমন 'সাত রাজার ধন এক মাণিকে'র মত বড় আদরের দুর্লভ পদার্থ ছিল। দুর্লভ দ্রব্যের মূল্য অধিক। সে সময়ে কপি ছিল দুর্লভ, তাই মহার্ঘ ; এক একটি মধ্যমাকারের ফুলকপিও ।৵০—॥০ আনার কমে পাওয়া যাইত না। কিন্তু এক্ষণ ঢাকাতে ঐরূপ ফুলকপি ৴১০ পয়সাতেও বিক্রয় হইয়া থাকে। এখন কপি সুলভ, তাই স্বল্পার্ঘ হইয়া পড়িয়াছে। ১৫।২০ বৎসর-মধ্যেই ঢাকা-সহরের তিনপার্শ্বে কপির চাষে যথেষ্ট বিস্তৃতি ঘটিয়াছে। ফলে, মূল্যও এত সুলভ হইয়া পড়িয়াছে। তৎপূর্ব্বে কলিকাতা হইতে বড়লোকেরাই কপি আনিয়া খাইতে পারিতেন ; গরিবের ভাগ্যে খাওয়া দূরে থাকুক কপির দর্শন লাভও ঘটিত না। কিন্তু এখন গরিব লোকের নিকটও কপি 'ছা ছা'—বড় অনাদরের হইয়া উঠিবার উপক্রম হইয়াছে।

ঢাকার সহরতলীতে পশ্চিমদেশীয় নিঃস্ব কৃষকেরাই ১৫।২০ বৎসর যাবৎ কপির চাষ করিতেছে। ইহাদের প্রায় সকলেই এ দেশে চাকরি করিতে আসিয়াছিল। কিন্তু চাকরি না যোটাতে, কৃষিকার্য্যেই সংলিপ্ত রহিয়াছে।

পশ্চিমদেশীয় কৃষকদিগের অধিকাংশেরই জমির পরিমাণ দুই চারি বিঘা মাত্র। এই সামান্য জমিতে চাষ-বাস করিয়াও, ইহারা পরিবারের ৪।৫টি বা ততোধিক লোকের উদরান্নের সংস্থান করিতে পারিতেছে। তদ্ভিন্ন, বৃদ্ধ মাতা-পিতা প্রভৃতির জন্যও তাহাদের প্রায় সকলকেই দেশেও টাকা পাঠাইতে হয়। অতি সামান্য পরিমাণ জমির উপর নির্ভর করিয়াই চাষ-বাস করিতে হয় বলিয়া, ইহাদিগকে বারমাসই মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া খাটিতে হয়। পশ্চিম-দেশীয় লোকেরা শ্রমবিমুখ নহে; বিশেষতঃ, তাহারা চাষার নেশা লইয়া কার্য্য করে বলিয়াই, সকল সময়েই সুফল লাভ করিয়া থাকে। ইহাদের মত চাষার নেশা লইয়া চাষ-বাস করিতে পারিলে কৃষি-কার্য্য কখনও নিষ্ফল হইতে পারে না। নানা কারণে, এ দেশীয় কৃষকের চাষের নেশা ক্রমশঃই কমিয়া যাইতেছে। এই জন্যই বহুপরিমাণ জমি চাষ করিয়াও, তাহাদের অন্নাভাব ঘুচিতেছে না। এ দেশীয় কৃষি ও কৃষকের উন্নতিসাধন করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে কৃষক-দিগের হৃদয়ে চাষ-বাসের প্রতি সম্যক অনুরাগ বা চাষের নেশা জাগাইয়া তুলিতে হইবে। চাষার নেশা লইয়া চাষ করিলে, বৈজ্ঞানিক উন্নত চাষ-বাস-প্রণালী না শিখিয়াও, এ দেশের কৃষকেরা যে সোণা ফলাইতে পারিবে, তাহা নিঃসন্দেহেই বলা যায়।

ভুল সংশোধন—বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত "গোলাপের চাষ" নামক প্রবন্ধে তিনটি ভুল রহিয় গিয়াছে। নিম্নে ভুল সংশোধন করিয়া দেওয়া গেল।

১। খ্রীষ্টীয় শতাব্দী আরম্ভ হইবার বহু পূর্ব্বে "আরব্য উপন্যাস" লিখিত হইয়াছে (২১৫ পৃষ্ঠা)। কথাটা সত্য নহে। খ্রীষ্টীয় শতাব্দী আরম্ভ হইবার কএক শতাব্দী পরেই যে আরব্য-উপন্যাস লিখিত হইয়াছে, তাহার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। গুণাঢ্যকৃত "বৃহৎ কথা" নামক গ্রন্থের ছায়াবলম্বনেই 'আরব্য উপন্যাস' লিখিত হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতেই 'বৃহৎ কথা' লিখিত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। সুতরাং তৎপূর্ব্বে যে আরব্য উপন্যাস রচিত হইতে পারে না, তাহা সহজেই অনুমেয়।

২। জগদ্বিখ্যাত সুন্দরী ট্রয়-রাজকুমারী হেলেনা (২১১ পৃষ্ঠা) স্থলে গ্রীক সুন্দরী হেলেনা হইবে।

৩। ক্লিওপাট্রার সম্বন্ধে ২১২ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে। ক্লিওপাট্রা মিশর দেশের রাণী। সুতরাং তাঁহার গোলাপ-ব্যবহারের সহিত ইউরোপের কোনও সম্পর্ক নাই।

রক্ত আমাশয়—Dysentery.

[শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের লিখিত।]

গাভীর রক্ত-আমাশয় রোগ সংক্রামক ও মারাত্মক না হইলেও, এই রোগে উহারা অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। এই রোগ অন্ত্রের ঝিল্লির প্রদাহ হইতে উৎপন্ন হয়। কখনও কখনও উহাতে ঘা হইয়া যায়। সাধারণতঃ, পেটের অসুখের পরিণতিতে আমাশয় দেখা দেয়। অস্বাস্থ্যকর খাদ্য গ্রহণ, অপরিষ্কৃত জলপান এবং অত্যধিক ঠাণ্ডা লাগিয়াও আমাশয়-রোগ জন্মিতে পারে। কঠিন আমাশয়ে অন্ত্রের কোন কোন অংশও বাহের সঙ্গে নির্গত হইয়া থাকে। ঐরূপ আমাশয় ভয়ানক মারাত্মক।

রোগের লক্ষণ—পুনঃ পুনঃ পাতলা বাহ্য হয়, এবং ঐ বাহের সঙ্গে রক্ত ও আম মিশ্রিত রহে। কখনও কখনও বাহের সঙ্গে পচা ডিমের অভ্যন্তরস্থ পদার্থের ন্যায় জিনিষ অথবা পুঁজও নির্গত হয়। আবার বাহের একাংশ গুট্‌লে এবং অপরাংশ কতকটা জলের ন্যায় পাতলা ও আম-রক্তমিশ্রিত হইতেও দেখা যায়। প্রায় সকল সময়েই, অল্লাধিক পরিমাণে, রোগাক্রান্ত গাভীর উদরে বেদনা থাকে; এবং কোন কোন সময় কম্প দিয়া জ্বর আইসে। পুনঃ পুনঃ কোঁথ দেওয়া প্রভৃতি লক্ষণও ক্রমশঃ উপস্থিত হয়। রোগগ্রস্ত গাভীর মুখের ছাল, চক্ষুর পাতা ও চর্ম্ম হরিদ্রাবর্ণ ও রক্তশূন্য দৃষ্ট হয়।

চিকিৎসা—মসিনার তৈল ⁄।০ এক পোয়া, আফিম ১৵০ আনা মিশাইয়া ভাতের মাড়ের সহিত দিবসে দুইবার খাইতে দিলে আমাশয় আরোগ্য হয়। ধুতুরার বীচির গুঁড়া ।৵০ আনা ও কর্পূর ৵০ আনা ৵০ পোয়া

দেশীমদে মিশ্রিত করিয়া, উহা ভাতের মাড়ের সহিত খাইতে দিলেও আমাশয়-রোগ সহজে আরোগ্য হয়।

সফেদা ৵০ আনা, চাখড়ির গুঁড়া ⁄১০ আধ ছটাক ও আফিম ৵০ আনা ভাতের মাঁড়ের সহিত দিনে দুইবার খাওয়াইলে আমাশয় বন্ধ হয়।

ভাতের মাড় ⁄১ সের ও আফিম ৵০ আনা ভালরূপে মিশাইয়া, তদ্দ্বারা রোগাক্রান্ত গাভীর মলদ্বারে পিচকারী দিলেও বিশেষ উপকার হয়। তদ্ভিন্ন, গ্লিসারিণ ও বোরাসিক এসিড্ চূর্ণ গরম জলের সহিত মিশাইয়া মলদ্বারে পিচকারী দিলে অন্ত্রের দূষিত মল বাহির হইয়া পড়ে এবং অন্ত্রের ঘা শুকাইয়া যায়।

১।	সুগার অব্ লেড্	এক দুয়ানি পরিমাণ,
২।	চাখড়িচূর্ণ	আধ ছটাক,
৩।	টিংচার ওপিয়ম	" "
৪।	জল	আধ সের।

এই চারিটি পদার্থ একত্র মিশাইয়া ভাতের মাড়ের সহিত খাওয়াইলে আমাশয়-রোগে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। বাছুরকে ইহার ছয়ভাগের একভাগ দেওয়া আবশ্যক।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা—প্রত্যেক বারে মার্কুরিয়াস্ কর পাঁচ ফোঁটা, দুই ঘণ্টা পর পর প্রয়োজ্য। যদি অধিক পরিমাণে বাহ্য হয়, তবে আর্সেনিকাম এল্‌ব IX আট ফোঁটা দুই ঘণ্টা পর পর মার্কুরিয়াস্ করের সঙ্গে পর্য্যায়ক্রমে দেওয়া উচিত।

মুষ্টিযোগ-চিকিৎসা—আমড়া, আম, জাম, ও আমলকীর কচিপাতা ছেচিয়া, তাহার রস গুড় বা ছাগ দুগ্ধের সহিত খাওয়াইলে প্রবল রক্তামাশয় নিবারিত হয়।

কাঁটানটের মূল ৮ তোলা গুড়ের সহিত বাটিয়া খাওয়াইলে আমরক্ত নিবারিত হয়।

কৃষ্ণতিল ৵০ ছটাক, এক ছটাক গুড়ের সহিত বাটিয়া খাওয়াইলে রক্ত-আমাশয় আরোগ্য হয়।

বেলশুঁঠ, মুথা, ধাইফুল, শুঁঠ—এই সমুদয় দ্রব্য প্রত্যেকটি ৪ তোলা গুড় ও মাঠার সহিত মিশাইয়া খাওয়াইলে রক্ত-আমাশয় আরোগ্য হয়।

এড়ণ্ডের কষ ৩২ ফোটা কিছু গুড়ের সহিত মিশাইয়া খাওয়াইলে গোজাতির রক্ত-আমাশয় নিবারিত হয়।

ডালিমপাতা ও ডালিমছাল ⁄০ ছটাক ও কুড়চি ⁄০ এক ছটাক একত্র কুটিয়া ⁄২৷০ সের জলে সিদ্ধ করিতে এবং ৷৵০ ছটাক শেষ থাকিতে জ্বাল হইতে নামাইতে হইবে। এই ক্বাথ ⁄০ এক ছটাক গুড়সহ পান করাইলে গোজাতির দুর্জ্জয় রক্ত-আমাশয় নিবারিত হয়।

শতমূলীর ক্বাথ, মসিনার ক্বাথ, শুলঞ্চের ক্বাথ অথবা মেঁদিপাতার ক্বাথ অল্পপরিমাণে সেবন করাইলেও রোগ আরোগ্য হয়।

কাবাবচিনিচূর্ণ ১ তোলা, সোরাচূর্ণ ১ তোলা, চন্দন-তৈল আধতোলা ঠাণ্ডা অন্নমণ্ডের সহিত দিনে দুইবার প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করাইলেও রোগ আরাম হয়।

সহকারী উপায়—গরমজলে কম্বল ভিজাইয়া, তদ্দ্বারা রোগাক্রান্ত গাভীর পেটে সেক দিলে আমাশয়ের বিশেষ উপকার হয়। পেটে লোহা পোড়াইয়া দাগ দিলেও উপকার হয় বলিয়া অনেকে মতপ্রকাশ করেন। কিন্তু আমরা গাভীকে অনর্থক যন্ত্রণা দেওয়ার পক্ষপাতী নহি। কোঁথ দেওয়া অধিক হইলে একগাছি দড়ি দিয়া গোরুর মাজা কসিয়া বাঁধিয়া দেওয়া যাইতে পারে। রোগাক্রান্ত গাভীর পেটটি বিশেষ সতর্কতার সহিত শীত হইতে রক্ষা করা উচিত। এতদুদ্দেশ্যে রাত্রিতে কম্বল কি ছালার চট্ দিয়া গাভীর গা ঢাকিয়া দিতে হয়।

পথ্য—মল না হওয়া পর্য্যন্ত পীড়িত গাভীকে লবণ-সংযোগে ভাতের মাড় ও চিড়াভিজান জল খাইতে দেওয়া উচিত। ভাতের মাড়ের সহিত তদর্দ্ধপরিমাণ তিসি বা কলাই সিদ্ধও খাইতে দেওয়া যায়। উক্ত সকলপ্রকার পথ্যের সহিতই বেলসিদ্ধ বা বেল-পোড়া মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। রক্ত-আমাশয়-রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত সহজপাচ্য নূতন কাঁচা ঘাস খাইতে দেওয়া কর্ত্তব্য।

শ্রীগিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

ফলবান্‌বৃক্ষের উৎপত্তি।

[বাকুলী-কৃষি-কলেজের শ্রীযুক্ত বর্ণকুমার মিত্র লিখিত।]

ফলবান্ বৃক্ষমাত্রেরই (১) স্বাভাবিক এবং (২) কৃত্রিম—এই দ্বিবিধ উপায়ে বংশবৃদ্ধি ঘটে। বীজ হইতে যে চারা জন্মে, তাহাই স্বাভাবিক। পক্ষান্তরে, কৃত্রিম উপায়ে যে চারা উৎপন্ন করা যায়, তাহা কমল নামে অভিহিত হয়। আমাদের দেশে সাধারণতঃ বীজ দ্বারা ফলবান্‌বৃক্ষের চারা উৎপন্ন করিবার প্রথাই সর্ব্বত্র প্রচলিত রহিয়াছে। যদিও বৃক্ষ, গুল্ম, লতা প্রভৃতির কলম করার প্রথা এ দেশে নূতন নহে সত্য, কিন্তু তথাপি, উপযুক্ত শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতার অভাবে, সাধারণ লোকে আজ পর্য্যন্তও ইহার তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় নাই। আমাদের দেশের প্রায় সকল নার্শারীতেই জোড়-কলম এবং চোখ-কলম দ্বারা চারা উৎপন্ন করা হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, নার্শারী ব্যতীত, অন্যত্র কলম দ্বারা বৃক্ষাদির বংশবৃদ্ধির প্রথা আজিও প্রচলিত হয় নাই। পক্ষান্তরে, পাশ্চাত্য-দেশসমূহে এক্ষণ কলম দ্বারা চারা উৎপন্ন করিবার প্রথাই অত্যধিকরূপে প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে। সেই সকল দেশে আপেল, নাসপাতি, পিচ্, কুল, কমলা প্রভৃতি নানাবিধ ফলের গাছের চারাই জোড়-কলম বা চোখ-কলম দ্বারা উৎপন্ন করা হইতেছে। ইহাতে তদ্দেশসমূহে প্রায় সর্ব্ববিধ ফলেরই বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। আমাদের দেশেরও সর্ব্বত্র কলম দ্বারা চারা উৎপন্ন করিবার প্রথা প্রচলিত হওয়া অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। এই জন্যই, বর্ত্তমান প্রবন্ধে, আমি কলম করার কতিপয় সহজ প্রণালীর বিষয় সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছি।

কলম করার উদ্দেশ্য—কলমের দ্বারা উত্তম বৃক্ষের বংশ স্থায়ী ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু বীজের চারা সকলসময়ে ও সকল স্থানে স্বধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারে না বলিয়াই প্রকারান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কলমের চারা ও বীজের চারা—এই উভয় চারাতেই দোষ-গুণ রহিয়াছে। প্রথমতঃ গুণের কথাই বলিতেছি :—

(১) কলমের গাছে সহজে ও অল্পসময়ে অর্থাৎ ৪।৫ বৎসরমধ্যেই ফল ধরে। পক্ষান্তরে, বীজোৎপন্ন গাছে সাধারণতঃ ৮।১০ বৎসরের পূর্ব্বে ফল জন্মে না।

(২) বীজোৎপন্ন চারাগাছে যে ফল ধরে, তাহা অধিকাংশস্থলেই মাতৃবৃক্ষের ফল অপেক্ষা যে নিকৃষ্ট হইয়া থাকে, ইহা বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন। একটি উৎকৃষ্ট ফলবান্ বৃক্ষের বীজ হইতে কতকগুলি চারা-গাছ উৎপন্ন করিলে দেখিবেন, উহার প্রত্যেকটি গাছেই বিভিন্নপ্রকার ফল জন্মিয়াছে। হয়ত কোনটির ফল টুক, কোনটির ফলে আঁঠি বৃহৎ, কোনটির ফলে মাতৃ-ফলের সুগন্ধ নাই, কোনটির ফলে অত্যধিক আঁশ জন্মিয়াছে—এইরূপ কোন-না-কোন দোষ পরিলক্ষিত হইবে। কদাচিৎ দু'একটি গাছে মাতৃ-বৃক্ষের অনুরূপ বা তদপেক্ষা উত্তম ফলও জন্মিতে পারে। কিন্তু কলমের গাছের ফল প্রায়ই মাতৃ-বৃক্ষের অনুরূপ গুণযুক্ত হয়,—তদপেক্ষা নিকৃষ্ট হয় না। বরং কখনও কখনও কলমের গাছে ফলের উৎকর্ষই সাধিত হইয়া থাকে। আঁঠির চারাগাছে উৎপন্ন ফল অধিকাংশ সময়েই ক্ষুদ্রাকৃতির হইয়া থাকে। কিন্তু কলমের চারায় এ দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা বড় কম।

(৩) কলমের গাছ, বীজের গাছের ন্যায়, তত বড় হয় না। এইজন্য সহজেই উহার তত্ত্বাবধান ও যত্ন করা যাইতে পারে। তদ্ভিন্ন, ঝড়-তুফানেও কলমের গাছের বিশেষ কোনরূপ ক্ষতি করিতে পারে না। কারণ, আঁঠির চারার বড়গাছ অপেক্ষা কলমের চারার ছোটগাছে ঝড় অনেক কম লাগে।

(৪) বাগানের প্রত্যেক সারিতে রোপিত কলমের গাছ এবং প্রত্যেক গাছের ফল প্রায় একরূপ আকার ও গুণ বিশিষ্ট হইয়া থাকে। সকল গাছের ফল একপ্রকার হয় বলিয়া, ঐ সকল ফল একদরে বিক্রয় করা যাইতে পারে। ইহাতে ক্রেতারও বিশেষ সুবিধা হয়। কারণ, তাহাকে সকল গাছের ফলেরই গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়া লইতে এবং প্রতিবৎসরই ফলের রসাস্বাদন করিতে হয় না।

(৫) কলমের গাছ হইতেই সময় সময় নূতন প্রকার (Variety) উৎকৃষ্ট ফল উৎপাদিত হইয়া থাকে।

পাশ্চাত্য-দেশসমূহে কলম দ্বারা আপেল, পিচ্, কমলা প্রভৃতি ফলের বিভিন্নপ্রকার উৎপাদিত এবং যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। নূতন প্রকার (জাতি নহে) উৎপাদন করিতে পারিলেই প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করিতে পারা যায়। নূতনের আদর অল্পাধিক পরিমাণে সকল দেশেই হইয়া থাকে।

(৬) কলম করিতে পারিলে অল্পসময়ে, অল্পায়াসে, অল্পব্যয়ে এবং কতিপয় প্রশাখার (Scion) সাহায্যেই বহুসংখ্যক চারাগাছ উৎপন্ন করিতে পারা যায়।

প্রধানতঃ, এই ছয়টি কারণেই পাশ্চাত্য-দেশবাসীরা কলমের চারারই বিশেষ পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছে। এ দেশে কলমের চারা রোপণের অনেক দোষও ঘটে। তন্মধ্যে, (১) কলমের গাছ আঠির গাছের মত সুদীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না, (২) আঠির গাছে যেরূপ প্রচুর ফলন হইয়া থাকে, এবং ক্রমশঃই ফলের সংখ্যা বর্দ্ধিত হয়, কলমের গাছে তাহা প্রত্যাশা করা যায় না, (৩) আঠির গাছ বিনা যত্নেও নির্ব্বিঘ্নে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়; কিন্তু কলমের চারার জন্য যত্নের আবশ্যক এবং (৪) আঠির গাছের কাণ্ড অত্যন্ত বড় হয় বলিয়া, উহার মূল্যও অধিক হয়—এই পাঁচটিই উল্লেখ-যোগ্য। গুণের তুলনায়, এই সকল দোষ যে অকিঞ্চিৎকর, তাহাতে সন্দেহ নাই। কলম করিবার প্রথা সর্ব্বত্র প্রচলিত না হইলে, ফলের উৎকর্ষসাধন সম্ভবপর হইতে পারে না। মালদহ, মজঃফরপুর প্রভৃতি স্থলে কলমের গাছে ফল উৎপাদন করা হয় বলিয়াই, আমরা নানাপ্রকার সুমিষ্ট, সুগন্ধি, আঁশবিহীন ও ক্ষুদ্র আঠিযুক্ত উপাদেয় আম্র এবং তদনুরূপ গুণযুক্ত অত্যুৎকৃষ্ট লিচু প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হইয়া থাকি। বহুসংখ্যক নিকৃষ্ট ফলের মূল্য যাহা হয়, অত্যল্পসংখ্যক উৎকৃষ্ট ফলের মূল্য তদপেক্ষাও অধিক হইয়া থাকে। বিশেষতঃ, উৎকৃষ্ট ফলে যেরূপ তৃপ্তি ও পুষ্টি সাধিত হয়, নিকৃষ্ট ফলে তাহা হয় না। এমতাবস্থায়, কলমের দ্বারা ফলবান্‌বৃক্ষের বংশবৃদ্ধি করিবার প্রথা এ দেশেরও সর্ব্বত্রই প্রচলিত হওয়া কর্ত্তব্য।

কলম বাঁধিবার উপযোগী প্রশাখা ও গুঁড়ি।

প্রশাখা—কলম করিতে হইলে প্রথমতঃ প্রশাখা বা ডাল নির্ব্বাচন করিয়া লওয়া আবশ্যক। যাহাতে নির্ব্বাচিত প্রশাখা স্বতন্ত্র বৃক্ষকাণ্ডে জোড়া লাগিয়া পুষ্ট হইতে পারে, এবং ভবিষ্যতে চারাগাছে পরিণত ও ফল প্রসূ হয়, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াই প্রশাখা-নির্ব্বাচন করিতে হইবে। সুস্থ, সতেজ, ও অর্দ্ধপরিপক্ক প্রশাখা দ্বারাই কলম বাঁধা কর্ত্তব্য। কারণ, ঐরূপ ডালেই কলম ভাল হয়। শাখা নিস্তেজ ও রুগ্ন হইলে, তদুৎপন্ন কলমে শীঘ্র ফল ধরে না; এবং ঐ কলমও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না।

বসন্তের প্রারম্ভে, যখন বৃক্ষাদি সজীব হইয়া উঠে, এবং বৃক্ষের কতকটা ক্রিয়াহীন (dormant) অবস্থা দূর হইয়া যাওয়াতে, তন্মধ্যে সবেগে রসসঞ্চার হইতে থাকে, তৎকালই কলম বাঁধিবার উপযুক্ত সময়। এই সময়ে প্রশাখা কর্ত্তন করিয়াই (আংশিক বা সম্পূর্ণ অংশ) কলম বাঁধিতে হয়। যদি নির্ব্বাচিত বৃক্ষ (যে বৃক্ষের প্রশাখা গৃহীত হইবে) নিকটবর্ত্তী স্থানে রহে, তবে উল্লিখিত উপায় অবলম্বন করাই প্রশস্ত।

পাছের গুঁড়ি (stock)—যে গাছের গুঁড়িতে কলম বাঁধিতে হইবে, উহা সতেজ ও সুপুষ্ট হওয়া আবশ্যক। নতুবা কলম ভাল হয় না। চারার কাণ্ড ও প্রশাখার স্থূলতা সমান হইলেই কলম ভাল হয়। তবে নির্ব্বাচিত প্রশাখা হইতে চারার স্থূলতা কিঞ্চিৎ অধিক হইলেও, তাহাতে বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। চারাগাছের গুঁড়ি অর্দ্ধপরিপক্ক হওয়া চাই। অন্ততঃ দুই বৎসরের চারা না হইলে, উহার কাণ্ড কোমল রহে। সুতরাং, উহার সহিত ডালের জোড় বাঁধিলে কলম অতিশয় দৃঢ় ও সতেজ হইতে পারে না। বসন্তের প্রারম্ভে, যখন গাছ বেশ সতেজ হইয়া উঠে, এবং উহাতে রীতিমত রসসঞ্চার হইতে থাকে, তৎকালেই গুঁড়ির সহিত কলম বাঁধিতে হইবে। সাধারণতঃ একজাতীয় গাছের গুঁড়ি ও ডালেই কলম প্রস্তুত করা হয়। পরীক্ষায় ফলে জানা গিয়াছে, খাট্টা বা জঙ্গলী (Khatta or Seville)— কমলার গুঁড়ির সহিত মিষ্ট কমলার প্রশাখার জোড় বাঁধিলেও, সেই কলমের গাছের ফল উৎকৃষ্ট হইতে পারে। পক্ষান্তরে, আমের কলম আম-গাছের গুঁড়িতেই ভাল হয়। নিকৃষ্ট জাতীয় আমচারার সহিত উৎকৃষ্ট জাতির কলম বাঁধিলে, উহা অধিকাংশসময়েই

উৎকৃষ্ট জাতিতেই পরিণত হয়। যে জাতির কলম করিতে হইবে, সেই জাতির চারার সহিতই কলম করা কর্ত্তব্য। ইহাতে কলমের গাছের ফলের রূপ, গুণ, গন্ধ, স্বাদ ও আকার প্রভৃতি বিষয়ে বৈলক্ষণ্য ঘটিবার সম্ভাবনা রহে না।

চারাগাছ উৎপাদন—কলম বাঁধিবার উপযোগী চারা উৎপন্ন করিতে হইলে, প্রথমতঃ একটী বীজ-তলা (seed-plot) প্রস্তুত করিয়া লওয়া আবশ্যক। ঈষৎ ছায়াযুক্ত স্থানই বীজতলার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। বাখারির ঘর (Lath house) হইলে বড়ই ভাল হয়। বীজতলার মৃত্তিকা বালি বা বালি দোঁ-আঁশ হওয়া চাই। বীজতলার মৃত্তিকা প্রথমতঃ কোদালি দ্বারা কোবাইয়া এবং ধূলিবৎ চূর্ণ করিয়া, উহা হইতে আগাছা, ঘাস প্রভৃতি বাছিয়া ফেলিতে হয়। তৎপর, তাহাতে শ্রেণীবদ্ধভাবে বীজ রোপণ করিতে হইবে। রোপণের পর, আবশ্যকমত সময় সময় জলসেচন করা ভিন্ন, অন্য কোনরূপ পাইটের বড় আবশ্যক হয় না। বীজোৎপন্ন চারাগুলি এক বিঘত (অর্দ্ধহস্ত) উচ্চ হইলে, তাহা বীজতলা হইতে উঠাইয়া চারাচৌকায় (হাপোরে) অথবা বাগানের যে কোনও স্থানে অর্দ্ধহস্ত ব্যবধানে সারিতে রোপণ করিতে হইবে। বলা বাহুল্য, বীজতলা হইতে চারা তুলিবার পূর্ব্বেই, বাগানের বা হাপোরের নির্দ্দিষ্ট স্থানের মৃত্তিকা পূর্ব্বোক্তরূপে প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। হাপোরের মৃত্তিকাও জলসিঞ্চন দ্বারা সরস রাখিতে হইবে। তদ্ভিন্ন, উহাতে যাহাতে আগাছাদি বর্দ্ধিত হইতে না পারে, তদুদ্দেশ্যে আগাছা জন্মিলেই নিড়াইয়া জমি পরিষ্কার রাখা আবশ্যক। হাপোরের চারাগাছ দুই বৎসরের বড় হইলেই কলম করিবার উপযুক্ত হইয়া থাকে।

কলম বাঁধিবার আবশ্যকীয় দ্রব্য—কলম প্রস্তুত করিতে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি ব্যবহৃত হইয়া থাকে:—

১। ধারাল কলম-বাঁধা ছুরি—বিভিন্ন প্রকার কলম প্রস্তুত করিতে বিভিন্ন প্রকার সুতীক্ষ্ণ ছুরির প্রয়োজন। মুকুল (bud) এবং মূলগাছের গুঁড়ির (stock) বাকল কাটিতে কলম কাটা ছুরির অনুরূপ সুতীক্ষ্ণ একপ্রকার ছুরির প্রয়োজন হয়। এই ছুরির চেপ্টা ও লম্বা হাতা (handle) দ্বারা মুকুল বসাইবার জন্য কর্ত্তিত বল্কল সহজেই আল্‌গা করা যাইতে পারে। গাছের গুঁড়ি কাটিবার জন্য একরূপ বৃহদাকার ছুরি আবশ্যক। তদ্ভিন্ন, আরও নানা আকারের ছোট-বড় ছুরি চাই।

২। অন্যান্য দ্রব্য—করাত, হাতকুঠার, দড়ি বা সুতা, নারিকেলের ছোব্‌ড়া বা মস্ (moss) এবং মৃত্তিকা প্রভৃতি আবশ্যক। তদ্ভিন্ন, মাটির টব বা গামলারও প্রয়োজন হয়। কলম বাঁধিবার জন্য কোমল রজ্জু বা নরম সুতা আবশ্যক। পাটের আঁশ অথবা কলাগাছের ছোটা ব্যবহার করা ভাল। কারণ, এইগুলি শক্ত, অথচ কোমল; সুতরাং ইহা দ্বারা বাঁধিলে গাছের বাকলেও আঘাত লাগে না, পক্ষান্তরে ইহা সহজে ছিঁড়িয়া বা পচিয়াও যায় না।

৩। কলম-বাঁধিবার মোম (Grafting wax) কলম বাঁধিবার জন্য নিম্নলিখিত প্রণালীতে মোম প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়।

রজন (Resin)	৪ ভাগ।
মোম (Bee's wax)	২ „
চর্ব্বি (Lallow) বা	
তিসির তৈল (Linseed oil)	১ „

প্রথমতঃ রজন উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া লইতে হয়। তৎপর চর্ব্বি বা তিসির তৈল, মোম এবং রজন-চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া, এই সকল দ্রব্য মৃদু উত্তাপে গলাইতে হইবে। জ্বালে চড়াইবার পূর্ব্বে মোমের খণ্ড টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ভাঙ্গিয়া লইলে, উহা সহজেই গলিয়া যায়, এবং তিসির তৈল বা চর্ব্বির সহিত সংমিশ্রিত হইয়া পড়ে। উক্ত পদার্থগুলি অগ্নির জ্বালে ভালরূপে গলিয়া গিয়া সংমিশ্রিত হইয়া পড়িলে, জ্বাল হইতে পাত্রটি নামাইয়া ফেলিতে হইবে। ইহা কিছু ঠাণ্ডা হইলেই, কলমে ব্যবহার করিবার উপযোগী মোম প্রস্তুত হয়। এই মোম কিছু গরম থাকিতে থাকিতেই, অর্থাৎ জমাট বাঁধিবার পূর্ব্বেই, একটা ছোট ব্রুশ দ্বারা বৃক্ষের গাত্রে প্রলেপ দিতে হয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীস্বর্ণকুমার মিত্র।

গোলাপের চাষ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র গুহ এফ্, আর, এইচ্, এস্, লিখিত।]

সাফল্যলাভের উপায়—গোলাপের চাষ নিষ্ফল হওয়ার যেমন কতকগুলি কারণ আছে, তদ্রূপ ইহার চাষে সাফল্যলাভেরও যথেষ্ট উপায় রহিয়াছে। গোলাপ এ দেশেরই আদিম অধিবাসী; সুতরাং জন্মস্থান যে ইহার চাষের পক্ষে অনুকূল হইবে, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। ভিন্ন দেশে গোলাপের চাষে যেরূপ যত্ন ও পরিশ্রমের আবশ্যক হয়, এ দেশে তদ্রূপ যত্ন ও শ্রমের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু তথাপি, (১) উৎকর্ষসাধনেচ্ছু উদ্যানতত্ত্ববিদ্ ও সৌখীন ব্যক্তির অপ্রতুলতা, (২) উপযুক্ত যত্নের অভাব, এবং (৩) চাষ-বাসসম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা—প্রধানতঃ, এই তিনটি কারণেই এ দেশে গোলাপের কোনরূপ উৎকর্ষ সাধিত হয় নাই। পক্ষান্তরে, ইহা এ দেশ হইতে ইউরোপে নীত হওয়ার পর, ক্রমেই উহার বিশেষ উৎকর্ষলাভ ঘটিয়াছে; এবং উহা সর্ব্বজনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। অধুনা, শুধু ইউরোপ কেন, গোলাপ সমগ্র সভ্য-জগতবাসীরই চিত্তরঞ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে। ইউরোপ ও আমেরিকার অধিবাসীরা গোলাপ ব্যবহার করিয়া বিমল আনন্দ ও স্বর্গীয় সুখ অনুভব করিয়া থাকে। কিন্তু ভারতবাসী সে সুখে বঞ্চিত! নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া, যথোচিত যত্নের সহিত, গোলাপের চাষ করিতে পারিলে, সুফল বা অপার্থিব সুখ লাভে কখনও বঞ্চিত হইতে হয় না।

১। স্থান-নির্ব্বাচন,
২। মৃত্তিকা-বিচার,
৩। উদ্যানের নক্‌সা-প্রস্তুত,
৪। মৃত্তিকা-প্রস্তুত-প্রণালী,
৫। রোপণের কাল-নির্ণয়,
৬। সার ও উহার ব্যবহার-প্রণালী,
৭। জাতি-নির্ব্বাচন,
৮। গাছ রোপণের পদ্ধতি,
৯। জলসিঞ্চন-প্রণালী,
১০। রোপণের পরবর্ত্তী ব্যবস্থা (wintering);

উপরোক্ত দশটী বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া গোলাপের চাষ করিতে পারিলে সাফল্যলাভ সুনিশ্চিত। আজকাল এ দেশের নানা স্থানে, বিশেষতঃ সংযুক্ত-প্রদেশে বহুসংখ্যক উৎকৃষ্ট জাতীয় মনোমোহকর গোলাপের চাষ হইতেছে। বঙ্গদেশেও বহুসংখ্যক উৎকৃষ্ট জাতীয় গোলাপ জন্মিতেছে। সুতরাং, এক্ষণ আর ইউরোপ হইতে উৎকৃষ্ট জাতীয় গোলাপের গাছ আনয়ন করিবার বড় আবশ্যক হয় না। তথাপি, সখের জন্য কেহ নূতন কোনও জাতির গাছ আনিতে ইচ্ছা করিলে, তাহা অনায়াসেই আনয়ন করিতে পারেন। কি উপায়ে বিদেশ হইতে গাছ আমদানী করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে ইতঃপর লিখিত হইবে। বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া বিদেশ হইতে গোলাপগাছ আনয়ন করিলে, উহার চাষ যে অনেকসময়ই নিষ্ফল হয়, তাহা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অধিকন্তু, না জানিয়া শুনিয়া বিদেশ হইতে গাছ আনয়ন করিলে, কখনও কখনও বিশেষরূপে প্রতারিতও হইতে হয়।

সংযুক্ত-প্রদেশে, পঞ্জাবে এবং হিমালয়ের পাদদেশস্থ প্রায় সকল স্থানেই, অদ্য পর্য্যন্ত উৎপাদিত প্রায় সকল জাতীয় গোলাপেরই চাষ হইতে পারে। তদ্ভিন্ন, দাক্ষিণাত্যের নীলগিরি-পর্ব্বতের সন্নিহিত স্থানসমূহও অধিকাংশ জাতীয় গোলাপ-চাষের পক্ষে অনুপযোগী নহে। এ দেশের পার্ব্বত্য-প্রদেশ ও পাহাড়-অঞ্চলে ইউরোপজাত অধিকাংশ জাতিরই চাষ করা যায়। বঙ্গদেশে বা তদ্রূপ অন্যস্থানেও বহুজাতির চাষ হইতে পারে সত্য, কিন্তু পার্ব্বত্য-প্রদেশের উপযোগী অনেক জাতিই বাঙ্গালার নিম্নভূমির পক্ষে অনুপযোগী হইয়া থাকে। সুতরাং, বাঙ্গালার বিভিন্নরূপ মৃত্তিকা ও জল-বায়ুর উপযোগী জাতি নির্ব্বাচন না করিয়া গোলাপের চাষে হস্তক্ষেপ করিলে সাফল্যলাভ ঘটে না। অধুনা, পৃথিবীর নানাস্থানে অসংখ্যজাতীয় গোলাপ উৎপন্ন হইয়াছে ও হইতেছে। ইহার কোন কোন জাতির চাষ এ দেশে হইতে পারে, তাহা সহজে নির্ণয় করা সম্ভবপর নহে বলিয়া, সাধারণের

বোধসৌকর্য্যার্থ, নিম্নে গোলাপের দুইটি শ্রেণীবিভাগ করা হইল। এই শ্রেণীবিভাগানুযায়ী গোলাপের চাষ করিলে, অনায়াসেই ইহার চাষে সফলতালাভ হইবে।

১। ইউরোপ ও পশ্চিম এসিয়া জাত গোলাপ—ক্যাবেজ-গোলাপ (Cabbage rose), ফ্রেন্স-গোলাপ (French rose), 'রোজা সেন্টিফলিয়া' (Rosa Centifolia) ও ডামাস্ক-গোলাপ (Damask rose) প্রভৃতি। ইহারা বর্ষাকালে ফুলধারণ করিয়া থাকে।

২। পূর্ব্ব এসিয়াজাত গোলাপ; যথাঃ—চীনা গোলাপ (China rose), বঙ্গজ গোলাপ (Bengal rose) ও বৌরবোঁ গোলাপ (Bourbou rose) প্রভৃতি। ইহারা বারমাসই ফুলধারণ করিয়া থাকে। ভারতবর্ষের—বিশেষতঃ বঙ্গদেশের পক্ষে, ঐ সকল গোলাপ বিশেষ উপযোগী।

প্রথমশ্রেণীর গোলাপ কদাচিৎ এ দেশে চাষের উপযোগী হয়। পক্ষান্তরে, দ্বিতীয়শ্রেণীর গোলাপই এ দেশের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ইহারা ইউরোপ—বিশেষতঃ ইংলণ্ড, অপেক্ষাও এ দেশে সুন্দর ফুলধারণ করিয়া থাকে। কিন্তু উক্ত উভয় শ্রেণীর গোলাপের পরস্পর পরাগ-সঙ্গম দ্বারা যে সকল সঙ্করজাতির উৎপত্তি হইয়াছে, উহাদের স্বভাব ভিন্নরূপ। যে জাতিতে দ্বিতীয়শ্রেণীর গোলাপের রস বা রক্তসংশ্রব (Blood relation) অধিক, সেই জাতিই এ দেশের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইবে। পক্ষান্তরে, যে জাতিতে প্রথম শ্রেণীর রক্তসংশ্রব অধিক, উহা এ দেশের পক্ষে উপযোগী হইবে না। চীনা-সঙ্কর (Hybird China) ও বৌরবোঁ-সঙ্কর (Hybrid Bourbou) জাতীয় গোলাপ উহাদের পৈতৃক স্বভাব অর্থাৎ প্রথমশ্রেণীর গোলাপের স্বভাব প্রাপ্ত হয়। উহারা কেবল গ্রীষ্মকালেই ফুলধারণ করিয়া থাকে; এবং এ দেশের জলবায়ুর পক্ষে উপযোগী নহে। এই সকল সঙ্করজাতির পরস্পর পরাগ-সঙ্গম দ্বারা আবার যে জাতির উৎপত্তি হয়, উহারা দ্বিতীয়শ্রেণীর গোলাপের স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই সকল নবজাত সঙ্করের সহিত দ্বিতীয়শ্রেণীর গোলাপের নিতান্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বা জ্ঞাতিত্ব জন্মে। তজ্জন্য উহাদের স্বভাবেরও বৈলক্ষণ্য ঘটিয়া থাকে। উহারা বর্ষাকালে পুষ্পিত হইবার পরে, উহাদের গোড়া হইতে নূতন অঙ্কুর সকল বহির্গত হয়। ঐ সকল অঙ্কুরকে গৌণ (Secondary) কাণ্ড কহে। উহারা ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া শরৎকালে ফুলধারণ করে। ইহাদিগকে ফরাসী-ভাষায় হাইব্রিড্ রিমন্‌টেণ্টস্ (Hybrid Remontants) এবং ইংরাজি-ভাষায় হাইব্রিড্ পার্পিচুয়াল (Hybird Perpetual) অর্থাৎ স্থায়ী-সঙ্কর কহে। যে সকল জাতি স্থায়ী-সঙ্করের স্বভাববিশিষ্ট হয়, সেই সকল জাতিই এ দেশের পক্ষে উপযোগী। ইংলণ্ডের গোলাপতত্ত্ববিদেরা গোলাপকে প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন। ফুলধারণের কালানুসারেই, এই বিভাগ স্থিরীকৃত হয়। তন্মধ্যে, প্রথমভাগের গোলাপকে গ্রীষ্ম-গোলাপ (Summer rose) কহে। ইহারা কেবল গ্রীষ্মকালেই ফুলধারণ করে। দ্বিতীয় বিভাগের গাছ গ্রীষ্ম ও শরৎ কালেই ফুলধারণ করিয়া থাকে। উহারা শারদীয়-গোলাপ (Autumn rose) নামে পরিচিত। এ দেশে ইহারা বর্ষাকালে নিকৃষ্ট ক্ষুদ্র ফুলধারণ করে। কিন্তু পৌষ মাঘ মাসে উহাদের ফুল অতি সুন্দর ও বৃহদাকারের হয়। ফাল্গুন চৈত্র মাসেও ইহাদের ফুল হয়; কিন্তু ঐ সকল ফুল নিকৃষ্ট। গ্রীষ্ম-গোলাপ এ দেশে মাঘ ফাল্গুন মাসে ফুলধারণ করিয়া থাকে। পুষ্পিত হওয়ার কালানুসারে, গোলাপের জাতি-পরিচয় করা কঠিন নহে; জাতিবিভাগ দ্বারা উহা সহজেই স্থির করিয়া লইতে পারা যায়। জাতি পরিচয় অবগত হইয়া গোলাপের চাষ করিতে পারিলে, উহার চাষে সাফল্য-লাভ অবশ্যম্ভাবী।

গোলাপের ব্যবহার—কেবল সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিবার উদ্দেশ্যে ও সখের নিমিত্তই যে গোলাপের চাষ হইয়া থাকে, তাহা নহে। ইহা মানবজাতির আরও নানাবিধ প্রয়োজন সাধন করিয়া থাকে। ইউরোপে, আমেরিকায়, জাপানে এবং পলিনেসিয়ায় অর্থাৎ প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপসমূহে; সাধারণতঃ সৌন্দর্য্যের হিসাবেই, অত্যধিক পরিমাণে গোলাপ ব্যবহৃত হইতেছে। অতি প্রাচীন-কালে ভারতবর্ষ, তুরস্ক ও পারস্য দেশে সুগন্ধি-দ্রব্য প্রস্তুত করিবার নিমিত্তই গোলাপফুলের ব্যবহার-প্রথা প্রচলিত ছিল। তৎকালে, বর্ত্তমানসময়ের ন্যায়, নানাবিধ নয়নানন্দ-দায়ক ও সুখস্পর্শ গোলাপ ছিল না। সুতরাং সখের

হিসাবে, ঐ সকল দেশের অতি অল্প লোকেই গোলাপ ব্যবহার করিত। কিন্তু অধুনা, শুধু ভারতবর্ষাদি দেশ কেন, পৃথিবীর সর্ব্বত্র এবং সকল সভ্য-সমাজেই, সখের সামগ্রীরূপে গোলাপ ব্যবহৃত হইতেছে। পাশ্চাত্য-দেশ-সমূহের প্রায় সর্ব্বত্রই টেবল-সজ্জার কার্য্যে পুষ্পরাণী বিশেষ আদৃতা। ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপানে এরূপ লোকের সংখ্যা বড় কম, যাহার পকেটে গোলাপের একটি 'বাটন্ হোল্' (Button hole) নামক পকেট-তোড়া প্রতিদিন বিরাজ না করে; এরূপ মহিলা নাই, যাঁহার গাত্রবস্ত্রে, কবরীতে বা কুন্তলে পুষ্পরাণী অনুক্ষণ বিজড়িত না রহে; এবং এমন গৃহী নাই, যাহার গৃহ-বাটিকায় অন্ততঃ ১০।১৫টী গোলাপগাছ রোপিত না হয়। ঐ সকল মহাদেশ ও দেশের ধনী-নির্ধননির্ব্বিশেষে সকলেই পুষ্পরাণীর দর্শন ও স্পর্শন জনিত সুখ-সম্ভোগের জন্য লালায়িত। গোলাপ পাশ্চাত্য-দেশের অরূপা বা রূপসী সকলেরই রূপমাধুরী বিকাশ করে, শান্তিহারা নরনারীর হৃদয় শান্তি ও তৃপ্তিতে পরিপূর্ণ করিয়া দেয়, এবং অপ্রেমিক বা অপ্রেমিকাকে প্রেমিক করিয়া তোলে। এত শক্তি যাহার, তাহার আদর অব্যাহত না রহিবে কেন? বস্তুতঃ, পাশ্চাত্য-দেশবাসীরা যেমন মহা আদরের সহিত গোলাপ ব্যবহার করে, প্রাচ্য-দেশবাসীরা সেরূপ আদরের সহিত কখনও গোলাপ ব্যবহার করে না;—করিতেও জানে না। পুষ্পরাণী পাশ্চাত্য-দেশের সকলেরই নিকট সমভাবে অত্যধিক আদরের পাত্রী; এবং হাটে, বাটে, গৃহে, মাঠে, পথে, ঘাটে—সর্ব্বত্রই সর্ব্বদা বিরাজমানা রহিয়াছেন। তিনি সম্রাট, মহারাজা, রাজা, ধনী ও নির্ধনী আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই শিরোমণি; আবার সকলেরই কক্ষে ও বক্ষে সতত বিরাজ করেন। সুতরাং পুষ্পরাজ্যে তাঁহার ন্যায় ভাগ্যবতী আর কে আছে? পাশ্চাত্য-দেশ তাঁহাকে চিনিয়াছে, এবং তিনিও পাশ্চাত্য-দেশকে চিনিয়াছেন। গোলাপের প্রথমাবস্থা বা শৈশব-কালে, আদি জন্মভূমি ভারতে, তাঁহার যৎকিঞ্চিৎও আদর ছিল না। সকলেই তাঁহাকে অতি অনাদরের—অতি তুচ্ছ মনে করিতেন। সেই জন্যই, তিনি মনের দুঃখে, যতদিন ভারতে ছিলেন, ততদিন বনবাসিনী হইয়াই ছিলেন। কিন্তু পাশ্চাত্য-দেশে নীত হইবার পর হইতেই—যৌবনে তাঁহার অতুলনীয় সৌন্দর্য্য-সম্পদ বিকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। তিনি চিরযৌবন লাভ করিয়া, রূপের ছটায় সমগ্র পাশ্চাত্য-দেশবাসী নরনারীকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন; এবং পুষ্পরাণী নামে অভিহিত হইয়া, পুষ্পরাজ্যের শীর্ষস্থানে সমাসীনা রহিয়াছেন। রূপবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, পুষ্পরাণীর নানা গুণেরও বিকাশ হইয়াছে। এই রূপ ও গুণ লইয়া, তিনি বহুদিন পরে জন্মভূমি ভারতে আসিয়া, ভারতবাসীর সম্যক আদর ও প্রীতি লাভ করিতে সমর্থা হইয়াছেন। অধুনা, ভারতেরও সর্ব্বত্রই গোলাপের যথেষ্ট আদর হইয়াছে;—ভারতবাসীরা আদর করিয়া, আরাধ্য দেবতার চরণতলেও তাঁহার স্থান দিয়াছেন।

পাশ্চাত্য-দেশে বিবাহ ও খ্রীষ্টমাস প্রভৃতি উৎসব গোলাপের অভাবে পণ্ড হইয়া যায়। বিবাহাদি কেন, সকল প্রকার উৎসবেই বহুলপরিমাণে গোলাপের প্রয়োজন হইয়া থাকে। এই জন্যই উৎসবসময়ে তিনি তাঁহার জন্মদাতা-গণকে লক্ষ লক্ষ টাকা প্রদান করিয়া থাকেন। একমাত্র বড়দিনের সময় কেবল ইংলণ্ডেই লক্ষ লক্ষ টাকার ফুল বিক্রীত হইয়া থাকে। বারমাসের বিক্রয়ের তো সীমাই নাই!

প্রাচীনসময়েও ইউরোপে গোলাপের বিশেষ আদর ছিল। প্রাচীনকালে রোমবাসীরা যে ভিনাস্ (Venus) নামক দেব-পূজায় গোলাপফুল ব্যবহার করিতেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ইউরোপের প্রত্যেক গির্জ্জায় প্রতিদিন বহু টাকা মূল্যের গোলাপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই প্রথাটাও প্রাচীনসময় হইতেই প্রচলিত রহিয়াছে। রূপ-লাবণ্যসম্পন্না জগদ্বিখ্যাত সুন্দরী ট্রয়-রাজকুমারী হেলেনার জীবনকালেও যে ইউরোপে উৎকৃষ্ট গোলাপ ছিল, তাহা তাঁহার রূপবর্ণনা পাঠেই অবগত হওয়া যায়। জনৈক প্রাচীন কবি (Theacritus) লিখিয়াছেন;—"হেলেনার কপোলদ্বয়ের বর্ণ গোলাপের বর্ণসদৃশ বা তদপেক্ষাও উজ্জ্বল।" জনৈক রোমান কবি গোলাপকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া গিয়াছেন,—

"Token flower that tells,
What words can never speak so well."

গোলাপ গ্রীস ও রোমের অধিবাসী না হইলেও, অতি প্রাচীনকাল হইতেই, উহা গ্রীক ও রোমান জাতির পরিচিত। তুর্কীজাতি কর্তৃক ইহা ইউরোপীয় তুরস্কে নীত হইবার পর, উহা ক্রমে গ্রীস্, রোম এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। ঐ সকল এসিয়িক তুরস্কজাত গোলাপই, ইউরোপে স্থানলাভ করিবার পর, কালে ইউরোপীয় গোলাপমধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল।

এথেনিয়াস্ (Athenæus) বলেন,—ক্লিওপাট্রা (Cleopatra) প্রতিদিন গোলাপফুল দ্বারা তাঁহার বাস-গৃহের মেঝে এক ফুট পুরু করিয়া আবৃত করিতেন। ইহাও কথিত হয় যে, নিরো (Nero) একটি পর্কোপলক্ষে এক ভোজেই ৩০০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ ৪৫০০০০৲ টাকা মূল্যের গোলাপ ব্যয় করিয়াছিলেন। তৎকালেও ইউরোপে যে প্রচুর পরিমাণে গোলাপ জন্মিত, উক্ত উদাহরণ দুইটি তাহারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ইউরোপীয় গ্রন্থ পাঠ করিলে, ইউরোপের প্রায় সর্ব্বত্রই, গোলাপের উক্তরূপ বিস্ময়কর ব্যবহারসম্বন্ধে ভূরি ভূরি দৃষ্টান্তের কথা অবগত হওয়া যায়। ইউরোপ ও আমেরিকা প্রভৃতি মহাদেশে, নানাবিধ উৎসবে বিশেষতঃ বিবাহাদিতে, বহু টাকা মূল্যের গোলাপ বিক্রীত হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য-দেশসমূহে প্রিয়জনকে প্রীতি-উপহারস্বরূপ গোলাপের মালা প্রদত্ত হয়। গোলাপফুলে প্রস্তুত রিথ্ (Wreath), ক্রস্ (Cross), এঙ্কর (Anchor—নঙ্গর) প্রভৃতি মৃতব্যক্তির গোরে প্রদত্ত হইয়া থাকে। সুতরাং, গোলাপের সহিত ইউরোপবাসীর জীবনকাল হইতে মৃত্যুর পর পর্য্যন্তও অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে। মৃতব্যক্তির সৎকারার্থ ও গোর সাজাইবার জন্য, অতি প্রাচীনকাল হইতেই, ইউরোপে গোলাপের ব্যবহার-প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে। গোলাপ ইউরোপবাসীর সুখ-দুঃখের সহচর।

বিবাহকার্য্যে, আমাদের দেশের ন্যায়, ইউরোপেও মুকুট-ব্যবহার-প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে। ঐ সকল মুকুট গোলাপ দ্বারা প্রস্তুত করা হয়। বন্ধুজনের বিদায়কালে, মালা, তোড়া প্রভৃতি নানা আকারে গোলাপ বিতরিত হইয়া থাকে। গোলাপফুলের মালা প্রীতি-চিহ্নরূপে সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয়। আমেরিকা, ইউরোপ এবং জাপানে প্রিয়জনের বিচ্ছেদে পুষ্পোপহার প্রদান হৃদয়ের গভীর ভালবাসা সূচনা করে। পীড়িতব্যক্তিকে দর্শন করিতে গমন করিলেও, পুষ্পোপহার প্রদানে হৃদয়ের ঐকান্তিক ভালবাসা ও গভীর স্নেহ-প্রীতি জ্ঞাপন করিবার প্রাচীন প্রথা আজিও ঐ সকল দেশে প্রচলিত রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন, গোলাপের আরও বহুবিধ ব্যবহার-প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে। সুরা সুগন্ধি করিবার নিমিত্ত দীর্ঘকাল হইতেই ইউরোপে গোলাপ ব্যবহৃত হইতেছে। গোলাপ-গন্ধি সুরা বহু মূল্যবান; উহা কেবল ধনবান্‌দিগেরই ভোগ্য। স্যার ওয়াল্টার স্কট্ (Sir Walter Scott) তাঁহারই প্রিয় সুহৃদ্ গাইমেনারিং (Guy Mannering) এর নিকট যে সকল পত্র লিখিতেন, তাহারই একখানিতে তিনি লিখিয়াছিলেন,—মনোবিজ্ঞান (Metaphysical) ও দর্শন (Philosophical) শাস্ত্রজ্ঞ উচ্চশ্রেণীর প্রাচীন সাহিত্যিক স্কচ (Scotch) জজ লর্ড মনবড্ডো (Lord Monboddo) সেণ্টজন্ ষ্ট্রিটের কেনন্‌গেট্ নামক স্থানে প্রতিবৎসর একটী ভোজ দিতেন। ঐ ভোজে গোলাপ-গন্ধি সুরার রাশি রাশি ভাণ্ড ব্যয়িত হইত। ঐ সকল সুরা-ভাণ্ডের গলদেশ পর্য্যন্ত গোলাপের মালা দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া, ভাণ্ডগুলিকে টেবিলের উপর শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে স্থাপন করার রীতিই প্রচলিত ছিল। কথিত হয় যে, গোলাপমিশ্রিত সুরা অতিশয় পাচক। বিখ্যাত হেলিও গেবেলাস্ (Helio-gabalus) কেবল এই সুরা পান করিয়াই তৃপ্ত রহিতেন না; তিনি ইহাতে স্নানও করিতেন। তিনি গোলাপ-সুরা এবং এবসিন্থি-সুরা দ্বারা পাকা চৌবাচ্চা পূর্ণ করিয়া রাখিতেন। উহাতে সর্ব্বসাধারণেরই স্নান করিবার অধিকার ছিল। আর্টিমেসিয়া (Artimesia) নামক সুগন্ধ-গুল্মজাত সুরাকে 'এবসিন্থি' কহে। তাঁহার বসনে, ভূষণে এবং বিছানায়ও উক্ত সুগন্ধি সুরা ব্যবহৃত হইত।

গোলাপসংযোগে প্রস্তুত করা (Rose Conserve) মোরব্বাও অতি মূল্যবান দ্রব্য। ইউরোপে গোলাপ-গন্ধী মোরব্বা, চাটনী ও আচার প্রভৃতি উচ্চমূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। এই উপায়ে গোলাপ ব্যবহার করিয়াও ইউরোপবাসীরা বহু অর্থোপার্জ্জন করিতে সমর্থ হয়েন।

ঔষধার্থ গোলাপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গ্রীকগণ জলাতঙ্ক (Hydrophobia) অর্থাৎ ক্ষিপ্ত শৃগাল ও কুকুর দংশনজনিত রোগে ইহার ব্যবহার করিতেন। তাঁহাদের মতে, ইহা জলাতঙ্ক-রোগের মহৌষধ। কেনাইনা (Rosa Canaina) নামক গোলাপই এই রোগে ব্যবহৃত হইত। 'কেনাইনা' (Canaina) শব্দে কুকুর-সংক্রান্ত রোগকে বুঝায়। কুকুরাদি দংশনজনিত রোগে ব্যবহৃত হইত বলিয়াই, উক্ত জাতীয় গোলাপকে 'রোসা কেনাইনা' নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

আয়ুর্ব্বেদেও গোলাপের ব্যবহার উল্লিখিত হইয়াছে।

"শতপত্রী হিমাহৃদ্যা গ্রাহিণী শুক্রলা লঘুঃ।
দোষত্রয়াস্রজিদ বর্ণ্যা তিক্তাকট্বীচ পাচনী।"

বচনান্তর যথা :—

"শতপত্রী হিমাতিক্তা কষায়া
কুষ্ঠনাশিনী।
মুখস্ফোটহরারুচ্যা
সুরভিঃ পিত্তদাহনুৎ॥"
(রাজনিঘণ্ট)

শতপত্রী শব্দে শ্বেত-গোলাপকেই বুঝায়। ইহা শীতবীর্য্য, হৃদয়গ্রাহী, শুক্রবর্দ্ধক, লঘু, ত্রিদোষনাশক, রক্তদোষঘ্ন, বর্ণপ্রসাদক, তিক্ত-কটু-রস এবং পাচক। অধুনা, শ্বেত-গোলাপের পরিবর্ত্তে 'রোসা সেন্টিফলিয়া' (Rosa Centifolia) নামক গোলাপই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা পাটলবর্ণের শতপত্রী-গোলাপবিশেষ। এই গোলাপ বৈদিককালে এ দেশে সুলভ ছিল না সত্য, কিন্তু তৎকালেও তুরস্ক ও পারস্যে প্রচুর পরিমাণে জন্মিত; এবং এই সকল স্থান হইতেই ভারতবর্ষে আনীত হইয়াছিল।

নব্যমতে ঔষধার্থ গোলাপের ব্যবহার—অধুনা ঔষধরূপে নিম্নলিখিত ত্রিবিধ গোলাপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

১। রোসা কেনাইনা (Rosa Canaina—Dog rose)—বাঙ্গালাভাষায় ইহা বিলাতী গোলাপ নামে অভিহিত হয়। ইহার জন্মস্থান ইউরোপীয় তুরস্ক। কাহারও কাহারও মতে, ইংলণ্ডই ইহার আদি জন্মস্থান। ইংলণ্ডে গোলাপ পরিচিত হইবার বহু পূর্ব্বেই, রোমান ও গ্রীক জাতি ইহার ব্যবহার করিয়াছে। সুতরাং, ইংলণ্ডকে ইহার জন্মভূমি বলা যায় না। ঔষধার্থ ইহার ফুল ব্যবহৃত হয়। ইহাতে সাইট্রিক এসিড্ (Citric acid) ও গ্যালিক্ এসিডের (Gallic acid) অস্তিত্ব লক্ষিত হয়। তদ্ভিন্ন, ইহাতে লবণ, শর্করা ও টেনিনের ভাগও আছে। ইহা শীতবীর্য্য ও সঙ্কোচক। এই গোলাপের খণ্ডও ঔষধার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রাচীনসময়ে জলাতঙ্ক-রোগে সম্ভবতঃ উহাই ব্যবহৃত হইত।

২। রোসা গ্যালিকা (Rosa Gallica)—এ দেশে ইহা রক্ত-গোলাপ নামে পরিচিত। ইহার জন্মস্থান ইউরোপ। ঔষধার্থ ইহার পুষ্পদল ব্যবহৃত হয়। ইহা সুগন্ধযুক্ত, কষায় ও ঈষৎ অম্লাস্বাদ। ইহাতে ট্যানিক এসিড্, গ্যালিক এসিড্, রঞ্জকপদার্থ (Colouring matter) ও কিঞ্চিৎ বায়বীয় তৈলের (Volatile oil) অস্তিত্ব দৃষ্টিগোচর হয়। ইহার ক্কাথে লৌহ-লবণ (Iron salt) সংযোগ করিলে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। আর গন্ধকদ্রাবক (Sulphuric acid) সংযোগে উহা লোহিতবর্ণে পরিবর্ত্তিত হয়। ইহা মৃদু সঙ্কোচক ও বলকারক। ঔষধের সুগন্ধ ও সুবর্ণ সম্পাদনের নিমিত্তও ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

৩। রোসা সেন্টিফলিয়া (Rosa Centifolia)—ইহাই পাটলবর্ণের শতদল-গোলাপ। ইহার জন্মস্থান এসিয়িক তুরস্ক। ঔষধার্থ ইহার সরস পাপড়ি ব্যবহৃত হয়। উহা ঈষৎ মিষ্ট, কষায়, তিক্তাস্বাদ ও সুগন্ধযুক্ত। ইহাতে বায়বীয় তৈল অর্থাৎ আতর, শর্করা ও সামান্য পরিমাণ কষায় দ্রব্য পাওয়া যায়। ইহার আতর সুরাতে দ্রবণীয়। ইহা সঙ্কোচক। ঔষধ সুগন্ধি করিবার নিমিত্ত ইহার আতর ও গোলাপজল ব্যবহৃত হয়।

গোলাপ হইতে নানাপ্রকার উৎকৃষ্ট সুগন্ধিদ্রব্য প্রস্তুত হয়। আতর ও গোলাপজলই গোলাপজাত প্রধান সুগন্ধি। অধুনা, পৃথিবীর সকল স্থানেই গোলাপী আতর ও গোলাপজল বিশেষ আদরের সহিত ব্যবহৃত হইতেছে। গোলাপজাত সুগন্ধির প্রশংসা জগতের সমস্ত লোকের

মুখেই এক্ষণ শ্রবণ করা যায়। প্রাচীনসময়েও যে ইহা বিশেষ আদৃত ছিল, নিম্নলিখিত কবিতাটি হইতেই তাহা উপলব্ধি হয়।

"Go, crop the gay rose's vermeil bloom.
And waft its spoils, a sweet perfume,
In incense to the skies.

(Ogilby)

জলে গোলাপের পাপ্‌ড়ি চুয়াইয়া আতর ও গোলাপ জল প্রস্তুত হয়। যে আতর বাণিজ্য-দ্রব্যমধ্যে পরিগণিত, উহা সাধারণতঃ রোসা সেন্টিফলিয়া প্রভিন্‌সিয়ালিস্ (Rosa Centifolia Provincialis) অর্থাৎ সেন্টিফলিয়া জাতি হইতেই উৎপন্ন হয়। ইউরোপীয় তুরস্কস্থিত এড্রিয়ানোপলে, এসিয়িক তুরস্কস্থিত ব্রাউসা ও উছলক নামক স্থানে এবং ভারতবর্ষস্থ গাজীপুরে আতর ও গোলাপজল প্রস্তুত করিবার যে বিপুল কারখানা আছে, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তদ্ভিন্ন, রোমেনিয়া ও বুলগেরিয়াতেও আতরাদি প্রস্তুত করিবার অনেক বড় বড় কারখানা আছে। ইউরোপে নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ আতরের প্রতি আউন্স ২০৲ হইতে ৩০৲ মূল্যে বিক্রয় হয়। একমাত্র রোমেলিয়া হইতেই প্রতিবৎসর ২০৪০০০০৲ টাকার আতর বিদেশে প্রেরিত হয়। ঐ স্থানে প্রতিবর্ষে ন্যূনাধিক ৪২০০০ বিঘা জমিতে গোলাপের চাষ হইয়া থাকে। গোলাপের চাষই রোমেলিয়ার সমৃদ্ধির প্রধান হেতু। তথায় এপ্রিল হইতে জুন মাস পর্য্যন্ত গোলাপসংগ্রহের কার্য্য চলে। তৎকালে, ঐ স্থানের মাঠসমূহ গন্ধে আমোদিত হইয়া থাকে; এবং বায়ুমণ্ডল সর্ব্বক্ষণই সুবাসে পরিপূর্ণ রহে। পুষ্পচয়ন-কার্য্যে নিযুক্ত সহস্র সহস্র বুলগেরিয়ার বালক-বালিকা, অপ্সরার মত বাদ্যযন্ত্র বাজাইয়া, মহানন্দে নৃত্য করিতে করিতে, নানারূপ শ্রুতিমধুর সঙ্গীত করিয়া থাকে। সে দৃশ্য বস্তুতঃই দর্শনযোগ্য। পুষ্পচয়ন হইতে আতরাদি প্রস্তুত করা পর্য্যন্ত সকল কার্য্যই বিশেষ আনন্দের সহিত সম্পাদিত হয়। যে বৎসর বসন্তকালে বায়ুমণ্ডল স্নিগ্ধ থাকে এবং বহুল পরিমাণে শিশিরপাত ও মাঝে মাঝে বারিপাত হয়, সে বৎসর বহুলপরিমাণে পুষ্প জন্মে; এবং ঐ সকল পুষ্পে আতরের পরিমাণও অপেক্ষাকৃত অধিক হয়। একলক্ষ পাপ্‌ড়ি হইতে ১৮০ গ্রেণ অর্থাৎ একভরি আতর প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১০ পাউণ্ড পাপড়ি ৫ গ্যালন জলে বক-যন্ত্রে চুয়াইলে এক গ্যালন (প্রায় তিন সের) উৎকৃষ্ট গোলাপজল প্রস্তুত হয়। রোমেলিয়াতে গোলাপের চাষে অধিক ব্যয় বা শ্রমের প্রয়োজন হয় না। তথায় একবার পদবিক্ষেপে যে স্থান প্রাপ্ত হওয়া যায়, উহার ৪০ গুণ বর্গস্থানে ১০০০ ওক (এক ওক = ২¾ পাউণ্ড) পরিমাণ পাপড়ি উৎপন্ন হয়। ব্যয় বাদে, ঐ পরিমিত স্থানের আয় বার্ষিক ১২০৲ টাকা বা ততোধিক হইয়া থাকে। গোলাপের চাষ যে কিরূপ লাভজনক, ইহা তাহারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

আতর ও গোলাপজল প্রস্তুতের প্রক্রিয়া অতি সহজ। বক-যন্ত্রের সাহায্যে গোলাপের পাপড়ি চুয়ান হইয়া থাকে। অধুনা, এই যন্ত্র ফ্রেন্স ও ইংলণ্ডে অতি অল্পমূল্যে অর্থাৎ ২২৷৷০ টাকা হইতে ১৫০৲ টাকায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। বুলগেরিয়ায় তাম্রনির্ম্মিত বক যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। চুয়াইবার যন্ত্র, চুয়ান জলসংগ্রহের যন্ত্র, গোলাপজল ও আতর পৃথক করিয়া লওয়ার যন্ত্র এবং আতর সংগ্রহ করিবার যন্ত্র—এই সকল যন্ত্রই পৃথক। যন্ত্রের সাহায্যে যে আতর ও গোলাপজল প্রাপ্ত হওয়া যায়, উহাই বাণিজ্য দ্রব্য।

সকলস্থানের আতর ও গোলাপজল একরূপ গুণবিশিষ্ট হয় না। মৃত্তিকা, জল-বায়ু এবং ফুলের গুণের তারতম্যানুসারে আতরের ও গোলাপজলেরও তারতম্য ঘটিয়া থাকে। বিগত ১৮৫২ খৃঃ অব্দে, লণ্ডনের ক্রিষ্টাল প্যালেস্ (Crystal palace) নামক রাজভবনে বিভিন্ন স্থানের আতর ও গোলাপজলের যে প্রদর্শনী হইয়াছিল, তাহাতে গাজীপুরী আতরের প্রদর্শকই প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ, গাজীপুরের আতর ও গোলাপজল যে উৎকৃষ্ট তাহাতে সন্দেহ নাই।

রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে, গোলাপের আতর বা অটোতে (Otto) দুইটী পদার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে। (১) পীতবর্ণ তরল হাইড্রোকার্ব্বণ (Hydro-carbon)—ইহাই উহার সুগন্ধোৎপাদক অংশ; এবং (২) ষ্টিরোপটীন্ (Stearoptene—তৈলবৎ পদার্থবিশেষ) —ইহা শ্বেতবর্ণ স্ফটিকবৎ গন্ধহীন পদার্থ। এই তৈলবৎ

পদার্থ প্রথমোক্ত তরল অংশে সহজেই দ্রবণীয়। আবার স্নিগ্ধতা দ্বারা উহা সহজে পৃথক হইয়া যায়। দক্ষিণ ফ্রান্সে ও নাইসে প্রভিন্স বা সেন্টিফলিয়া গোলাপ হইতেই আতর প্রস্তুত করা হয়। *এই আতরের একটি বিশেষ সুগন্ধ আছে। উহা আংশিক কমলাফুলের গন্ধযুক্ত। উক্ত উভয় স্থানেই বহুসংখ্যক কমলাবাগান আছে। সম্ভবতঃ, পরাগবাহী মধুমক্ষিকাগণ কমলা-পরাগ বহন করিয়া আনিয়া, উহা গোলাপ-পরাগের সহিত সংযোগ করিয়া থাকে; এবং ঐ সংযোগই উহার গন্ধের বিশেষত্বের কারণ। তুরস্কের আতর অপেক্ষা ফ্রান্সের আতরে ষ্টিরোপ্‌টাইনের ভাগ অধিক। সুতরাং, উহা গন্ধেও তুরস্কের আতর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। কাশ্মীরজাত গোলাপ গন্ধে ও সৌন্দর্য্যে অতুলনীয়। সম্ভবতঃ, সেইজন্যই কাশ্মীরের আতরও অত্যুৎকৃষ্ট হইয়া থাকে। কাশ্মীরে গোলাপজলকে দুইবার চুয়াইয়া, উহা রাত্রিতে একটি অনাবৃত পাত্রে রাখা হয়। প্রাতঃকালে তদুপরি সরের মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদার্থ ভাসিতে দেখা যায়। এই ক্ষুদ্রাংশগুলি পুষ্পবিশেষের কোরকের অগ্রভাগের সাহায্যে সংগ্রহ করা হয়। স্নিগ্ধ অবস্থায় উহা গাঢ় সবুজবর্ণ ধারণ করে; এবং রজনের মত কঠিন রহে। কিন্তু উত্তাপে উহা তরলতা প্রাপ্ত হয়। ৫০০ অথবা ৬০০ পাউণ্ড পাপ্‌ড়ি দ্বারা এক আউন্স আতর প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই আতর অতি মূল্যবান পদার্থ। বৎসরের সকল সময়েই আতর প্রস্তুত করা হয় না—সকল সময় আতর প্রস্তুত করা সহজসাধ্যও নহে। আতর প্রস্তুতোপযোগী গোলাপের মরসুম ব্যতীত অন্য সময়ে অত্যল্পপরিমাণ আতর প্রস্তুত করিতে হইলেও জলের মত অর্থব্যয় করিতে হয়। রোম সহরের লিউকিউ-লাস্ (Lucullus) বারমাস সদ্য আতরপ্রাপ্তির নিমিত্ত অজস্র অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। বারমাস টাট্‌কা আতর ব্যবহারের জন্য এত অধিকসংখ্যক অর্থব্যয় বোধ হয় আর কেহই করেন নাই।

সাবান সুগন্ধি করিবার জন্যও আতর ব্যবহৃত হয়। আতর-সংযুক্ত সাবান গোলাপী সাবান (Rose Soap) নামে পরিচিত। দন্তমার্জ্জনেও ইহা ব্যবহৃত হয়। আতর সংযুক্ত মাজন গোলাপী দন্তমার্জ্জন নামে খ্যাত। ফ্রান্সের গ্রাসি ও কেনেস্ প্রভৃতি স্থানে আতর ও অন্যান্য পদার্থ সংযোগে একরূপ পোমেড্ (Pomade) প্রস্তুত করা হয়। ফরাসী রমণীগণ উহা চুলে ব্যবহার করেন। ফ্রান্সের কোনও কোনও স্থানে গোলাপ হইতে আতর প্রস্তুত না করিয়া, উহার পুষ্পদলকে বসা ও তৈলে ভিজাইয়া রাখা হয়। ঐরূপে কিয়ৎকাল ভিজাইয়া রাখিয়া, সুগন্ধি বসা বা তৈল দ্বারাই পোমেড্ প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। এই প্রক্রিয়া দ্বারা যে পোমেড্ তৈয়ারী হয়, উহা আল্‌কোহল্ (Alcohol) সুরাতে দ্রব করিলে উৎকৃষ্ট গোলাপের সার প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার গন্ধ সুরাসারে (Spirit) দ্রবীভূত আতরের গন্ধ অপেক্ষা ভিন্নরূপ। ইহা দ্বারা ঔষধও সুগন্ধ করা হয়। ইংলণ্ডে সুগন্ধি প্রস্তুতের জন্য এক্ষণ আর গোলাপের চাষ হয় না। কোনও বৎসর আবশ্যকাতিরিক্ত গোলাপ জন্মিলে, উহা অন্যস্থানের সুগন্ধি-ব্যবসায়ীদিগের নিকট বিক্রয় করা হয়। যাঁহারা উহা খরিদ করেন, তাঁহারা বস্তা খুলিবামাত্রই তন্মধ্যস্থ গোলাপগুলি মেঝেতে বিছাইয়া দেন। বস্তার গোলাপ স্তূপাকারে রাখিয়া দিলে, ২৷৩ ঘণ্টার মধ্যেই উত্তাপে উহা নষ্ট হইয়া যায়। গোলাপের ন্যায়, অন্য কোনও জৈবিকপদার্থই, এত অল্পসময়ে নষ্ট হয় না। সেই জন্য লণ্ডনের সুগন্ধি-ব্যবসায়ীগণ ভিন্ন স্থান হইতে রপ্তানিকৃত গোলাপ পৌঁছিবামাত্রই, উহাদের পুষ্পকোষ হইতে পাপ্‌ড়িগুলিকে পৃথক করিয়া ফেলে, এবং ছয় পাউণ্ড পাপ্‌ড়ির সহিত এক পাউণ্ড লবণ ঘষিয়া দেয়। লবণ দ্বারা পাপ্‌ড়িস্থিত জলীয়ভাগ শোষিত হইয়া থাকে। তদবস্থায়, উহা মণ্ডাকার ধারণ করে। এইরূপে উহা দীর্ঘকাল রক্ষা করা যায়; এবং উহার সুগন্ধেরও বৈলক্ষণ্য ঘটে না। রক্ষিত বার পাউণ্ড গোলাপ দ্বারা আড়াই গ্যালন গোলাপজল প্রস্তুত হয়। উহা উৎকৃষ্ট গোলাপজল নহে।

গোলাপজলের ব্যবহার-প্রথা এ দেশে বহু প্রাচীনকাল হইতেই প্রচলিত রহিয়াছে। খ্রীষ্টিয় শতাব্দী আরম্ভ হইবার বহু পূর্ব্বে 'আরব্য উপন্যাস' লিখিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে গোলাপজলের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। আবুল হোসেনের

আখ্যায়িকা পাঠে জানা যায়, যখন পারস্য রাজকুমার রাণীকে দর্শন করেন, তখন ভৃত্যগণ তাঁহাকে স্নানার্থ স্বর্ণপাত্রে সুগন্ধিজল আনিয়া দিয়াছিল। ঐ জলই যে গোলাপজল ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। 'Taming of the Shrew' নামক পুস্তকেও গোলাপজলের উল্লেখ রহিয়াছে। যথা :—

"Let one attend him with a silver basin,
Full of rose-water."

(Taming of the Shrew)

সাধারণতঃ ছয় প্রকার গোলাপের আতর প্রস্তুত হইয়া থাকে।

১। এস্‌প্রিট্‌ ডি রোজ ট্রিপল্‌—Esprit de rose triple.

২। এসেন্স অব্‌ হোয়াইট্‌ রোজ—Essence of white-rose.

৩। „ „ টি রোজ—Essence of Tea-rose.

৪। „ „ মস্‌ রোজ— „ „ Moss rose.

৫। „ „ টুইন্‌ রোজ— „ „ Twin rose.

৬। „ „ চাইনিজ রোজ— „ „ Chinese rose.

এই সকল আতর প্রস্তুতের নানাবিধ প্রক্রিয়া রহিয়াছে। অপ্রাসঙ্গিক মনে করিয়া, উহা এ স্থলে লিখিত হইল না। রোসা সেন্টিফলিয়া (Rosa Centifolia), রোসা ডামাসেনা (Rosa Damascena) ও বসোরা বা পারস্য গোলাপ (Persian Rose) হইতেই সাধারণতঃ আতর প্রস্তুত হইয়া থাকে। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে, নূরজহাঁর (নূরজাহান) সময় হইতেই, এ দেশে আতর-ব্যবহার-প্রথা প্রচলিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহার বহু পূর্ব্বেই আতরের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু ইংলণ্ডে কেবল গত শতাব্দী হইতেই আতর প্রস্তুতের প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। অধুনা ইংলণ্ডে, বুল্‌গেরিয়ায় ও জার্ম্মেণীতে প্রস্তুত আতরই বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, ভারতে প্রস্তুত আতর ভারতবর্ষেই বিক্রীত হয় বলিয়া, উহা কদাচিৎ অন্যত্র রপ্তানি হয়।

ভারতবর্ষে আতর-প্রস্তুতের প্রধান কেন্দ্র গাজীপুর। গত দুই শতাব্দী যাবৎ তথায় আতর-প্রস্তুতের কারখানা খোলা হইয়াছে। গাজীপুরে মার্চ্চ ও এপ্রিল—এই দুই মাসই প্রচুরপরিমাণে গোলাপ জন্মে। ঐ মরসুমের সময়ই তথায় গোলাপ সংগৃহীত হয়। প্রাতঃকালই গোলাপ-সংগ্রহের পক্ষে প্রশস্ত; এবং গাজীপুরে তৎকালেই গোলাপ সংগৃহীত হইয়া থাকে। এক বিঘা জমিতে ১০০০ গোলাপের ছোব বা ঝোপ উৎপন্ন হয়; এবং ঐ সকল ঝোপ হইতে একলক্ষ ফুল প্রাপ্ত হওয়া যায়। তথায় প্রতিলক্ষ গোলাপ গুণানুসারে ৪০৲ হইতে ৭০৲ টাকাতে বিক্রীত হয়। প্রত্যেক বিঘায় মোট চাষের ব্যয় ৮॥০ টাকা ও ভূমির রাজস্ব ৫৲—সর্ব্বসমেত ১৩॥০ টাকার অধিক ব্যয় হয় না। গোলাপের চাষ লাভজনক বলিয়াই গাজীপুর ও জৌনপুরে প্রচুর পরিমাণে গোলাপের চাষ হয়; এবং একমাত্র গোলাপের চাষ করিয়াই ঐ দুই স্থানের বহুলোক জীবিকা-নির্ব্বাহ করে। গাজীপুরে সাধারণতঃ বস্‌রাই (Damask) গোলাপের চাষই অত্যধিক পরিমাণে করা হয়, এবং উহা হইতেই আতর ও গোলাপজল প্রস্তুত হইয়া থাকে। ফাল্গুনমাস হইতে জ্যৈষ্ঠমাস পর্য্যন্ত বসরাই গোলাপের ফুল হয়; সুতরাং এই কএকমাসই ঐ দেশের গোলাপফুলের মরসুম। এই মরসুমের সময় গোলাপ-চাষীগণ প্রতিদিন গাজীপুরের আতর ও গোলাপজল প্রস্তুতের কারখানাসমূহে টাট্‌কা গোলাপ সরবরাহ করিয়া থাকে। যে প্রণালী অবলম্বনে দেশী মদ চুয়ান হয়, ঠিক সেই প্রণালীতেই গাজীপুরের কারখানাসমূহে তামার বড় বড় ডেকচিতে গোলাপফুল চোলাই করা হয়। দুইবার চুয়াইয়া লইলে পর গোলাপজল প্রস্তুত হইয়া থাকে। চুয়ান জল একটা ধাতুপাত্রে রাখিয়া, পাত্রের উপরিভাগ মস্‌লিন্‌ বা তদ্রূপ সূক্ষ্মবস্ত্রে ঢাকিয়া দেওয়া হয়। ইহাতে পাত্রের মধ্যে ধূলা, মাটী অথবা কীট-পতঙ্গাদি পড়িতে পারে না। রাত্রিতে চুয়ান জলের মুখবাঁধা পাত্রটী বাহিরে রাখা হয়। ঐ পাত্রের জলের উপরে যে সর পড়ে, উহাই আতর। প্রাতঃকালে চুয়ান জল হইতে আতর পৃথক করিয়া লওয়া হয়। আতর তুলিয়া লইলে পাত্রে যাহা অবশিষ্ট রহে, তাহাই গোলাপজল।

প্রথম দুইবারের চুয়ান জল হইতে উৎকৃষ্ট আতর প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তৃতীয় বা শেষবারের চুয়ান জল হইতেই উৎকৃষ্ট আতর সংগৃহীত হইয়া থাকে।

এ দেশে অধিকাংশসময়েই জল মিশাইয়া গোলাপজল ভেজাল করা হয়। পক্ষান্তরে, খাটী আতরের সহিতও চন্দনের তৈলাদি মিশাইয়া লইবার রীতি সর্ব্বত্রই প্রচলিত রহিয়াছে। এক ভরি খাটী গোলাপী আতরের মূল্য ৮০৲ হইতে ১০০৲ টাকা বা ততোধিক হইয়া থাকে। কিন্তু সাধারণতঃ এ দেশে যে ভেজাল গোলাপী আতর বিক্রীত হয়, উহার মূল্য ২৲ হইতে ১০৲ টাকার অধিক হয় না। সুতরাং, ঐ সকল আতরে খাটী আতরের অংশ কতটুকু রহিয়াছে, তাহা সহজেই অনুমেয়। বলা বাহুল্য, ভেজাল আতরেও গোলাপের গন্ধ বর্ত্তমান রহে; এবং মূল্যের তারতম্যানুসারে গন্ধেরও তারতম্য ঘটিয়া থাকে। এ দেশে নানাবিধ উৎসব-কার্য্যে আতর ও গোলাপজল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন, উৎকৃষ্ট নস্যাদি প্রস্তুত করিতেও গোলাপী আতর মিশ্রিত করা হয়।

গোলাপচাষের উপযোগী মৃত্তিকা ও জলবায়ু—নাতিশীতোষ্ণ-প্রদেশসমূহই গোলাপের জন্মভূমি। সুতরাং, ঐরূপ স্থানেই গোলাপের চাষে সাফল্যলাভ সুনিশ্চিত। অন্যত্র ইহার চাষে বিশেষ যত্ন ও অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হয়। কিন্তু আজকাল যে সকল সঙ্করজাতি উৎপাদিত হইয়াছে, উহারা জাতিভেদে বিভিন্ন জলবায়ুবিশিষ্ট স্থানেও চাষের উপযোগী হইয়া থাকে। সঙ্করত্বহেতু, উহাদের ভিন্ন ভিন্ন জাতির স্বভাব বিভিন্ন ধরণের হয়। সুতরাং, যে স্থানের পক্ষে যে সকল জাতি উপযোগী, সেইরূপ স্থানেই সে সকল জাতির চাষ করিলে, গোলাপের চাষ কখনও নিষ্ফল হইতে পারে না। নাতিশীতোষ্ণ-প্রদেশে প্রায় সকল জাতিই জন্মিয়া থাকে। মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে, বিষুবরেখার উভয়পার্শ্বস্থ ২০ ও ৪০ অক্ষরেখার মধ্যবর্ত্তী স্থানসমূহই গোলাপচাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এতন্মধ্যস্থ কোনও কোনও স্থানই ইহার আদিম অধিবাস।

যে স্থানের চারিদিক খোলা অর্থাৎ যে স্থানে সহজেই বায়ু, আলো ও উত্তাপ প্রবেশলাভ করিতে পারে, তদ্রূপ স্থানই গোলাপচাষের পক্ষে উপযোগী। ধূমাচ্ছাদিত সহর গোলাপ-চাষের পক্ষে তত উপযোগী হয় না। ছায়াযুক্ত বা স্যাৎসেতে স্থান গোলাপচাষের পক্ষে অনুপযুক্ত। তথাপি, কোনও কোনও জাতি ছায়াতেও স্ফূর্ত্তিলাভ করে। কিন্তু উহাদের সংখ্যা অতি অল্প। বৃহৎ বৃক্ষের ছায়াকে গোলাপ-গাছের রিপু বলা যায়। ঐরূপ ছায়াযুক্ত স্থানে গোলাপগাছ রোপণ করিলে, উহা নানাবিধ রোগ ও কীটাদি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া থাকে। অধিকন্তু, উহা সুস্থাবস্থায় ও সতেজে বৃদ্ধিপ্রাপ্তও হয় না। বৃহৎ বৃক্ষের মূল দ্বারা মৃত্তিকার সার ও রস গৃহীত হইয়া থাকে বলিয়া, তন্নিম্নস্থ গোলাপগাছগুলি উহাদের পরিবর্দ্ধন ও স্বাস্থ্যরক্ষণ উপযোগী যথোচিত রস গ্রহণ করিতে পারে না। তদ্ভিন্ন, বৃহৎ বৃক্ষের শাখার তলদেশে অবস্থিত রহে বলিয়া, উহারা বায়ুমণ্ডল হইতে স্বাভাবিক সার গ্রহণ করিতেও সমর্থ হয় না। সুতরাং রুগ্ন ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। ঐ সকল নানা কারণে গোলাপবাগানের মধ্যে কোনও বড় গাছ রাখা অনুচিত। কাহারও কাহারও মতে, গোলাপ-গাছকে প্রখর রৌদ্রাদি হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে, তদুপরি সাময়িকরূপে—সূর্য্যোদয়ের পর হইতে মধ্যাহ্নসময় পর্য্যন্ত, চিক্‌ বা পর্দ্দা প্রভৃতি দ্বারা ছায়ার বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া আবশ্যক। কিন্তু অনেকেই এ মতের পক্ষপাতী নহেন। স্থানবিশেষে ও কোন কোন সময়, সাময়িক ছায়ার বন্দোবস্ত করিয়া দিতে পারিলে গোলাপগাছ বিশেষ স্ফূর্ত্তিলাভ করে সত্য, কিন্তু বাঙ্গালাদেশে ঐরূপ ছায়া উপকারী হয় না। বরং, সাময়িক ছায়াতেও গাছের অনিষ্টসাধন করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে, শীতপ্রধান-দেশে ঝড় ও তুষার হইতে গোলাপ-গাছকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে ও অন্যান্য নানা কারণে, কোনও কোনও সময়, গোলাপ-বাগানে ছায়ার প্রয়োজন হয়। কিন্তু ঐ সকল স্থানেও, চিরস্থায়ী বা বহুদিবসস্থায়ী ছায়াতে গোলাপগাছের বিশেষ অপকার সাধিত হয়। সমস্ত দিন রৌদ্র পায়, এরূপ উন্মুক্ত স্থানেই গোলাপগাছ রোপণ করা আবশ্যক।

যে স্থানের মৃত্তিকা শুষ্ক এবং বায়ু শুষ্ক অথচ স্নিগ্ধ ও আর্দ্র, তদ্রূপ স্থানেই গোলাপ বিশেষ স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়া থাকে। কি নিম্নপ্রদেশ, কি পার্ব্বত্য-প্রদেশ, কি সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থান—

সর্ব্বত্রই গোলাপের চাষ হইতে পারে। তুষারাবৃত গিরিশৃঙ্গ হইতে বারিহীন মরুভূমির প্রান্তর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই গোলাপ জন্মিয়া থাকে। কিন্তু সকল স্থানে সকল প্রকারের গাছের চাষ করা যায় না। স্থান ও জাতিভেদ নির্ণয় করিয়া, ইহার চাষ করিতে হয়; অর্থাৎ যে স্থানের পক্ষে যে জাতি উপযোগী, সেই স্থানেই সে জাতির চাষ করা আবশ্যক। গ্রীষ্মপ্রধান স্থানে বারমাসই গোলাপগাছ পুষ্পধারণ করে। কিন্তু সকল জাতিই ঐরূপ স্থানের পক্ষে উপযোগী নহে। পার্ব্বত্য-প্রদেশে যে সকল জাতির চাষ হয়, উহারাও নাতিশীতোষ্ণ-প্রদেশের চাষের উপযোগী জাতির ন্যায় গুণযুক্ত পুষ্পধারণ করিয়া থাকে। বিষুবরেখার সন্নিহিত নিম্নপ্রদেশসমূহে যে গোলাপ উৎপন্ন হয়, উহাদের গন্ধ নাতিশীতোষ্ণ-প্রদেশজাত গোলাপের গন্ধ অপেক্ষা নিকৃষ্ট হয়। বলা বাহুল্য, জলবায়ুর দোষ-গুণেই গন্ধের তারতম্য ঘটিয়া থাকে।

গোলাপের পক্ষে, সাধারণ ভূমি অপেক্ষা ঈষদুষ্ণ ও কিঞ্চিৎ উচ্চ ভূমির আবশ্যক। বর্ষাকালে যে স্থানে জল সঞ্চিত হয়, অথবা যে স্থানে বৃষ্টির জল দাঁড়ায়, তদ্রূপ নিম্ন ভূমি গোলাপচাষে অনুপযোগী। তবে ঐ সকল স্থান, নূতন মাটী তুলিয়া, উচ্চ করিয়া লইতে পারিলে, তাহাতে গোলাপের চাষ করা যায়। গোলাপবাগানের চারিপার্শ্ব—বিশেষতঃ পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিক্ খোলা রাখা আবশ্যক। গোলাপচাষে সফলতালাভ করিতে ইচ্ছা করিলে, ছায়াযুক্ত স্থান সর্ব্বদা পরিবর্জ্জনীয়। প্রবল ঝড়ের আক্রমণ হইতে গোলাপগাছ রক্ষার বন্দোবস্ত প্রথমেই করিতে হইবে। বাগানের দৈর্ঘ্য উত্তর ও দক্ষিণে হওয়া চাই। এবং ক্ষেত্রের আকৃতি আয়তক্ষেত্রের অনুরূপ বা অণ্ডাকার হইলেই ভাল হয়। গোলাপবাগানের পশ্চিমদিকস্থ বেড়া ৮।১০ ফুট উচ্চ হওয়া প্রয়োজন। উত্তরের বেড়া তত উচ্চ করা অনাবশ্যক; কিন্তু উহা মজবুত হওয়া চাই। পূর্ব্বদিকের বেড়া ৫ ফুটের অধিক উচ্চ হইলে ক্ষেত্রে সূর্য্যকিরণ-প্রবেশের ব্যাঘাত ঘটে। উদ্যানের দক্ষিণ দিক্ খোলা থাকা প্রয়োজন। তবে গবাদি পশু যাহাতে উদ্যানে প্রবেশ করিতে না পারে, তদুদ্দেশ্যে খুব নীচু করিয়া বেড়া দিলে কোনও ক্ষতি হয় না। কিন্তু যাহাতে অবাধে বায়ু সঞ্চালিত হইতে পারে, তজ্জন্য বেড়ার মধ্যে ফাঁক রাখিতে হয়। দক্ষিণদিকের প্রবল বায়ু প্রবাহিত হইবার সময়, ঐ দিক্ পর্দ্দা দ্বারা আবৃত করিয়া রাখিলে ভাল হয়। উদ্ভিদ-লতাজাতীয় গোলাপের বেড়াই উৎকৃষ্ট। চিরহরিৎ ওষধাদির বেড়াও মন্দ নহে। লতাজাতীয় গোলাপের বেড়া দ্বারা (১) সবুজপত্রসমন্বিত গাছগুলি অতি সুন্দর দেখায়, এবং (২) ঐ সকল গাছ ফুলধারণ করিলে নয়নের প্রীতি জন্মে—এই দুইটি অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়। লোহার জালের বা তারের বেড়া দিয়া, উহাতে লতা-গোলাপের গাছ উঠাইয়া দিলেও সুন্দর দেখায়। লতা-গোলাপের বেড়া দিলে, লোহ, কাষ্ঠ অথবা বাঁশের খুটীর সহিত উহাদিগকে বাঁধিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

ক্রমশঃ

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুহ।

আর্য্যশাস্ত্রে কৃষিতত্ত্ব।

[শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের লিখিত।]

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের ত্রিকালদর্শী পণ্ডিতগণ যে অর্থনীতিজ্ঞ ছিলেন, এবং অর্থনীতির অভ্রান্ত সত্যে উপনীত হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীস্তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি।
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ॥"

এই একটি মাত্র ক্ষুদ্র শ্লোকের মধ্যেই অর্থনীতিশাস্ত্রের সমস্ত সার নিহিত রহিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান কালধর্ম্মে আমাদের বুদ্ধি ও রুচি নিতান্ত বিকৃত হইয়াছে; ফলে, উক্ত মহাজন-বাক্যে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া—'বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস, তাহার অর্দ্ধেক চাষ' এই মহাসত্য ভুলিয়া, আমরা এক্ষণ পরসেবা ও ভিক্ষাকেই শ্লাঘনীয় মনে করিতেছি। বিশেষতঃ, বর্ত্তমানে আমরা বিজ্ঞানের যে শিক্ষালাভ করি, তাহা কেবল পরসেবা ও ভিক্ষার পক্ষেই বিশেষ উপযোগী; কিন্তু স্বাধীনভাবে জীবিকানির্ব্বাহের পক্ষে নিতান্ত প্রতিকূল। যে বাণিজ্য ও কৃষি বিষয়ক শিক্ষা এ কৃষি-প্রাণ বা কৃষি-প্রধান দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থানলাভ করিতে পারে নাই, সেই বাণিজ্য ও কৃষির উপরই আধুনিক সুসভ্য জাতি সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ; এমন সমতল উর্ব্বর বিস্তৃত দেশ আর নাই। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশেই প্রায় সর্ব্ববিধ শস্যের উপযোগী ভূমি সুলভ। এ দেশে ধান্যমুষ্টি ছড়াইয়া দিলে সুবর্ণ-মুষ্টি ঘরে আইসে। 'সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা' ভারতবর্ষে কৃষিই যে জীবিকানির্ব্বাহের সর্ব্বপ্রধান এবং সহজ উপায়, তাহা নিঃসন্দেহেই বলা যায়। বাণিজ্য কৃষির উপর নির্ভর করে। এ দেশে কৃষির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত না হইলে বাণিজ্যোপযোগী অর্থের সংস্থান হওয়াও সম্ভবপর নহে। সুতরাং, সুখ-স্বচ্ছন্দে জীবিকানির্ব্বাহ এবং বাণিজ্যোপযোগী অর্থলাভের নিমিত্ত, এ দেশের পক্ষে, বর্ত্তমান অবস্থায়, বাণিজ্য অপেক্ষা কৃষিরই প্রাধান্য স্বীকার করিতে হয়। যাহাতে এ দেশের কৃষির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ঘটে, তদুপায় অবলম্বন করাই আমাদের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য।

ত্রিকালজ্ঞ ঋষিরা কৃষির উপকারিতা সমাকরূপে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই, তাঁহারা কৃষিনীতিসম্বন্ধেও বহু তথ্য প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এ দেশে সেই সকল কৃষিনীতিই পরমোপযোগী। এই জন্য আমি ধারাবাহিক প্রবন্ধের আকারে, ক্রমে ক্রমে, ঋষি-গবেষণার ফল অর্থাৎ আর্য্যশাস্ত্রে লিখিত কৃষিতত্ত্বের বিষয় "কৃষি-সম্পদে" প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। বর্ত্তমান বর্ষের জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়ের যুগ্মসংখ্যা "কৃষি-সম্পদে" আমার লিখিত 'আর্য্যশাস্ত্রে কৃষিতত্ত্ব' নামক যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, বর্ত্তমান প্রবন্ধটিকে তাহারই অবশিষ্টাংশ বলা যায়।

ঋষি-পরাশর 'কৃষি-পরাশর' নামক প্রাচীন কৃষি-বিজ্ঞান-শাস্ত্রে লিখিয়াছেন :—

"একয়ৈব পুনঃ কৃষ্যা প্রার্থকো নৈব জায়তে।
কৃত্যবিত্তো হি লোকেঽস্মিন্ ভূয়াদেকশ্চ ভূপতিঃ॥"

কেবল কৃষি দ্বারা লোক ধনিক হয় না; এবং এক এক কৃষি দ্বারাই লোকে ভূপতি বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া থাকে। কথাটা খাঁটী সত্য; কিন্তু ইহার তাৎপর্য্য কি, তাহা উপলব্ধি করিবার শক্তি আমাদের নাই। একমাত্র চাকরির মোহে ভুলিয়া—চাকরিকেই অর্থোপার্জ্জনের প্রকৃষ্ট পন্থা মনে করিয়া, চাকরির জন্যই আমরা লালায়িত রহিয়াছি। আমাদের কৃষি-কথা ভাবিবার অবসর কোথায়?

বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ কৃষি-কার্য্যে সংলিপ্ত রহিয়া—হাতে-হেতেড়ে চাষ-বাস করিয়া, যে কৃষিজ্ঞানার্জ্জন করিয়াছিলেন, আমরা তাহার উত্তরাধিকারী হইয়াছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমরা যে অমূল্য রত্ন লাভ করিয়াছি, তৎপ্রতি আমাদের দৃষ্টি আজিও আকৃষ্ট হয় নাই! এ দেশের অশিক্ষিত কৃষিবল জানে না শাস্ত্রের উপদেশ, আর কৃশিক্ষিত Agriculturists মানে না ঋষির আদেশ। ফল—'যথা বায়ার তথা তিপ্পার'—অন্নাভাব আর ঘুচিতেছে না। এ দেশের শিক্ষিত কৃষিকর্ম্মাধ্যায়ীগণ পাশ্চাত্য-দেশে যে সকল বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা জানিতে ও শিখিতে চাহিলেও, উত্তরাধিকারী-সূত্রে যাহা প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই সকলের অর্থাৎ আর্য্য-ঋষির প্রচারিত কৃষিতত্ত্বসমূহের কথা একবার মনেও করেন না! ইহাতে আমাদের যাহা ছিল, তাহা ক্রমেই বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। ফলে, এ দেশের কৃষিরও ক্রমাবনতি ঘটিতেছে। আর্য্য ঋষিগণ কৃষি এবং তদানুষঙ্গিক গো-পালন প্রভৃতি সম্বন্ধে যথেষ্ট উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন; আমি ক্রমশঃ তাঁহাদের কথারই আলোচনা করিব। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক-যুগে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ভিন্ন শাস্ত্রীয় কথারও যে আদর হইবে না, তাহা বেশ জানি। কিন্তু আমি কৃষিতত্ত্ববিদ্ নহি; সুতরাং কৃষিতত্ত্বের কোনরূপ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিবার ক্ষমতাও আমার নাই। "কৃষি-সম্পদে"র লেখকদের মধ্যে বহুসংখ্যক কৃষিতত্ত্ববিদ্ সুপণ্ডিত ব্যক্তি রহিয়াছেন। তাঁহারা যদি শাস্ত্রীয় কথার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রকাশ করিতে পারেন, তাহা হইলে দেশের মহদুপকার সাধিত হইবে।

নীতিবিশারদ পরাশর বলিয়াছেন,—"গোষু চাত্মসমং দত্ত্বাৎ স্বয়মেব কৃষিং ব্রজেৎ।"—গো-সেবায় আত্মনিয়োগ করিবে; অসমর্থ পক্ষে, যাহাকে আপনার মত মনে করিতে পার, তাহাকে নিয়োগ করিবে, এবং কৃষিকর্ম্ম (কখনও পরের উপর নির্ভর না করিয়া) আপনিই পরিচালনা করিবে। কৃষি-পর্য্যবেক্ষণ সম্বন্ধে মহর্ষি পরাশর বলিয়াছেন—

"ফলতাবেক্ষিতা স্বর্ণং দৈন্যং সৈবানবেক্ষিতা।
কৃষিঃ কৃষিপুরাণজ্ঞ ইত্যুবাচ পরাশর॥"

কৃষিকার্য্যের উত্তমরূপ তত্ত্বাবধান করিতে পারিলে, উহা হইতে স্বর্ণ ফলে। আর উপেক্ষিত হইলে, উহা দৈন্য আনয়ন করে।

অথাচীস্তে মুনয়ঃ—

"পিতুরন্তঃপুরং দদ্যান্মাতুর্দদ্যান্মহানসম্।
গোষু চাত্মসমং দদ্যাৎ স্বয়মেব কৃষিং ব্রজেৎ॥
কৃষির্গাবো বাণবিদ্যাঃ স্ত্রিয়ো রাজকুলানি চ।
ক্ষণেনৈবাবসীদন্তি মুহূর্ত্তমনবেক্ষণাৎ॥
সমর্থৈশ্চ কৃষিঃ কার্য্যা লোকানাং হিতকাম্যয়া।
অসমর্থো হি কৃষকো ভিক্ষামটতি নীচবৎ॥
গোহিতঃ ক্ষেত্রগামী চ কালজ্ঞো বীজতৎপরঃ।
বিতন্দ্রঃ সর্ব্বশস্যাঢ্যঃ কৃষকো নাবসীদতি॥"

অন্য মুনিগণ বলেন—পিতাকে (বা তত্তুল্য ব্যক্তিকে) অন্তঃপুরের এবং মাতাকে (বা মাতৃস্থানীয়া স্ত্রীলোককে) মহানসের অর্থাৎ পাকশালার ভার দিবে। গোগণের জন্য আত্মতুল্য লোক নিয়োগ করিবে। আর স্বয়ং কৃষিকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবে। যেহেতু কৃষি, গো, ধনুর্ব্বিদ্যা, স্ত্রী ও রাজকুল মুহূর্ত্তের মধ্যে অনবেক্ষণে অবসন্ন অর্থাৎ নষ্টপ্রায় হইয়া থাকে। সমর্থ লোক লোকের হিতার্থ কৃষিকার্য্য করিবে। অসমর্থ লোকেই নীচের ন্যায় ভিক্ষা করিয়া থাকে। যে কৃষক গোরক্ষণে তৎপর, স্বয়ং ক্ষেত্রে গমন করে, কালজ্ঞ অর্থাৎ 'যো' বুঝিয়া কার্য্য করিতে পারে, এবং উৎকৃষ্ট বীজসম্পন্ন ও আলস্যরহিত, সে সর্ব্বশস্যসম্পন্ন হয় ও কখনও অবসাদ প্রাপ্ত হয় না।

এই শাস্ত্রীয় বচনের প্রকৃত অর্থ কৃষিতত্ত্বাভিজ্ঞা বিদুষী খনার বচনেও উপলব্ধি করিতে পারা যায়। খনা বলিয়াছেন;—

"খাটে খাটায় লাভের গাঁতি।
তার অর্দ্ধেক কাঁধে ছাতি॥
ঘরে বসে' পুছে বাত।
তার ঘরে হা ভাত॥"

এ কথাটী আমাদের হাড়ে হাড়ে লাগিয়াছে। খনা আরও বলিয়াছেন;—

"বাপ-বেটায় চাষ চাই।
তা অভাবে সোদর ভাই॥"

সমর্থ লোক লোকের হিতার্থ কৃষি করিবে; ইহাই ছিল শাস্ত্রের আদেশ। প্রাচীনকালে কেবল ব্যবসায়ের হিসাবে, স্বোদর পূরণের হিসাবে, এ দেশের লোক কৃষি করিত না। তাঁহারা "অন্নং ব্রহ্ম" মনে করিয়া, পরমা শ্রদ্ধার সহিত অন্নোৎপাদন ও অন্নবৃদ্ধির জন্য কৃষিকর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিত। ইহাই ছিল তৎকালে পরম পুরুষার্থ, পরম ব্রত, পরম মঙ্গলের নিদান এবং কৃষি-ধর্ম্ম। কিন্তু এক্ষণ এ দেশের নির্ধন ও নিরক্ষর কৃষকের হস্তে কৃষিকার্য্যের গুরুভার ন্যস্ত করিয়া, শিক্ষিতবাবুরা নীচের ন্যায় ভিক্ষা করিতেই গৌরব বোধ করেন। এ দেশের কৃষির ক্রমাবনতি ঘটিবার ইহা একটি প্রধান কারণ।

গোশালা-প্রস্তুত সম্বন্ধে মহর্ষি পরাশর বলিয়াছেন;—

"গোশালা সুদৃঢ়া যস্য শুচির্গোময় বর্জ্জিতা।
তস্য বাহা বিবর্দ্ধন্তে পোষণৈরপি বর্জ্জিতাঃ॥
শকৃন্মূত্রবিলিপ্তাঙ্গা বাহা যত্র দিনে দিনে।
নিঃসরন্তি গবাং স্থানাৎ তত্র কিং পোষণাদিভিঃ॥
পঞ্চপঞ্চায়তা শালা গবাং বৃদ্ধিকরী মতা।
সিংহস্থানে কৃতা সৈব গোনাশং কুরুতে ধ্রুবম্॥
সিংহগেহহর্গতৌ চৈব গোশালাং কুরুতে যদি।
প্রমাদান্মন্দবুদ্ধিত্বাৎ গবাং নাশো ভবেৎ তদা॥
তণ্ডুলানাং জলঞ্চৈব তপ্তমণ্ডং ঝষোদকম্।
কার্পাসাস্থি তুষঞ্চৈব গোস্থানে গোবিনাশকৃৎ॥
সম্মার্জ্জনীঞ্চ মুষলমুচ্ছিষ্টং গোনিকেতনে।
কৃত্বা গোনাশমাপ্নোতি তথা তত্রাজবন্ধনে॥
গোমূত্রজালকেনৈব যত্রাবস্করমোচনম্।
কুর্ব্বন্তি গৃহমেধিনস্তত্র কা বাহবাসনা॥"

গোশালা (গোহাইল) প্রস্তুতাদি বিধি—যাহার গোশালা দৃঢ়, পরিষ্কৃত এবং গোময় রহিত, তাহার বাহন সকল পোষণ-দ্রব্য ব্যতিরেকেও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। যে গৃহে বাহন পশুসকল বিষ্ঠা ও মূত্রে লিপ্তাঙ্গ হইয়া গোশালা হইতে বহির্গত হয়, তথায় পোষণ দ্রব্য বৃথা অর্থাৎ উৎকৃষ্ট খাদ্য দ্রব্যেও তথায় পশুসকলের বল-পুষ্টি হয় না। পঞ্চায় হস্ত

বিস্তৃত গোশালা গোসমূহের বর্দ্ধক। সিংহস্থানে গোশালা প্রস্তুত করিলে, তাহা নিশ্চিতই গোসমূহ নাশ করে। সূর্য্য সিংহরাশিতে গমন করিলে অর্থাৎ ভাদ্রমাসে যদি কেহ অনবধানতা বা দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ গোশালা প্রস্তুত করে, তবে তাহার গোসমূহ বিনষ্ট হয়। গোশালায় তণ্ডুলোদক (চাউল ধোয়া জল), তপ্ত মণ্ড (ভাতের মাড়) মৎস্যের জল, কার্পাস বীজ বা তুষ রাখিলে গোসমূহ নষ্ট হয়। গোশালায় ছাগ বন্ধন করিলে, কিংবা মুষল ও উচ্ছিষ্ট দ্রব্য রাখিলে, তত্রস্থ পশুসকলের বিনাশ ঘটে। গৃহস্থ গোমূত্র দ্বারা পুরীষ পরিষ্কার করিবে না, তাহাতে গোসমূহের অনিষ্ট হইয়া থাকে। ক্রমশঃ

শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

নারিকেলগাছের পোকা।

[শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার মজুমদার বিদ্যাভূষণ লিখিত।]

পূর্ব্ববঙ্গের নানাস্থানের নারিকেলগাছে, গাছের বিশেষ অনিষ্টকর, প্রধানতঃ দুই জাতীয় পোকার উপদ্রব ঘটিয়াছে। এই উভয়প্রকার পোকা দ্বারা আক্রান্ত নারিকেলগাছ নিস্তেজ অবস্থায় বাঁচিয়া রহে সত্য, কিন্তু তাহাতে বেশী ফল ধরে না। পক্ষান্তরে, অধিকসংখ্যক কীটাক্রান্ত গাছ মরিয়াও যায়। মৃত্যুর হার ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতেছে বলিয়া, অনেকেই প্রতিকারোপায় অবগত হইতে চাহেন। যে সকল উপায় অবলম্বনে কীটাক্রান্ত নারিকেলগাছ রক্ষা করিতে পারা যায়, তৎসম্বন্ধেই আজ কএকটি কথা বলিতেছি। এ বিষয়ে বিশেষভাবে আলোচনা অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

স্থানভেদে নারিকেলগাছে নানাপ্রকার পোকার উপদ্রব ঘটিতে দেখা যায়। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে প্রধানতঃ দুই প্রকার পোকার উপদ্রবেই নারিকেলগাছের বিশেষ অনিষ্টসাধিত হইয়াছে ও হইতেছে। এতন্মধ্যে, একপ্রকার পোকা পক্ষহীন, শ্বেতবর্ণ ও বিছার মত বড় হয়; এবং অন্যপ্রকার সপক্ষ বা পক্ষহীন কৃষ্ণবর্ণের হইয়া থাকে। সাদা পক্ষহীন এবং কাল পক্ষযুক্ত—এই উভয়প্রকার পোকাগুলিই বৃহদাকারের অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ, বলিষ্ঠ ও দৈর্ঘ্যে প্রায় তিন ইঞ্চি হয়। ইহারাই গাছের বেশী অনিষ্ট করে।

সাদা পোকার কীড়াগুলি নারিকেলগাছের পাতার নীচের সবুজ অংশ ভক্ষণ করিয়া জীবনধারণ করে বলিয়াই, ইহাদিগকে পাতা-পোকা নামে অভিহিত করা হয়। পাতা-পোকা দ্বারা আক্রান্ত গাছের পাতাগুলি বিবর্ণ হইয়া যায়। সুতরাং গাছ দেখিলেই, উহারা যেন মরিয়া যাইতেছে বলিয়া মনে হয়। গাছের পাতা ভক্ষিত হওয়াতে, কীটাক্রান্ত গাছগুলি ক্রমশঃই নিস্তেজ হইয়া পড়ে; এবং অত্যধিক পরিমাণে কীটের উপদ্রব ঘটিলে, সময় সময় কীটাক্রান্ত গাছ মরিয়াও যায়।

পক্ষযুক্ত কাল পোকাগুলি গোবরে-পোকা নামে খ্যাত। ইহারা নারিকেলগাছের মাথার কচিপাতার (মাঝপত্র) ও পত্রবৃন্তের মধ্যে অথবা যেখান হইতে 'মুচি' ধরিয়া থাকে, তাহার গোড়ায় ছিদ্র করিয়া খাইতে আরম্ভ করে এবং উহা ক্রমে অন্তঃসার শূন্য করিয়া ফেলে। ইহাতে গাছের বিশেষ অনিষ্টসাধিত হয়।

নারিকেলগাছগুলি বৎসরে একবার করিয়া পরিষ্কার করিয়া দিলে, সেই সকল গাছে সহজে পোকার উপদ্রব ঘটিতে পারে না। অধিকন্তু, উহাতে ফলনও বেশী হয়। গাছে পোকা লাগিলে, সর্ব্বাগ্রে গাছের মাথা পরিষ্কার করিয়া দিতে এবং পোকাগুলিকে বাহির করিয়া বিনষ্ট করিতে হইবে। পাতা-পোকা কর্ত্তৃক আক্রান্তভাগগুলি কাটিয়া আনিয়া, উহা পোকার সহিত পোড়াইয়া ফেলা সঙ্গত। বিজ্ঞান-সম্মত-প্রণালীতে ঔষধ ছিটাইয়া নারিকেলগাছের পোকা ধ্বংস করা অত্যন্ত কষ্টকর ও ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। সুতরাং হাতে বাছিয়াই পোকা বিনাশ করিতে হইবে। ইহাই অতি সহজ উপায়; এবং এই উপায় অবলম্বন করিতে পারিলে, উহাদের বংশবৃদ্ধি হইতে পারে না। কাজেই আর বেশী ক্ষতিও হয় না।

কীটাক্রান্ত নারিকেলগাছের আগায় এমনভাবে লালী গুড় ঢালিতে হইবে, যাহাতে পত্র হইতে পত্রবৃন্তে এবং পত্রবৃন্ত হইতে গাছের কাণ্ড বাহিয়া মাটি পর্য্যন্ত স্রোতাকারে গুড় পতিত হয়। এইরূপ করিতে পারিলে, গুড়ের

লোভে গাছে পিপীড়া উঠিয়া পোকা বিনাশ করিয়া ফেলে। ইহাতেও যদি পোকা বিনষ্ট না হয়, তবে গাছের গোড়ায় প্রচুর পরিমাণে গোবর দিতে হইবে। গোবরগুলি পচিয়া গেলেই দেখা যাইবে, গাছ হইতে পোকা স্বানাস্তরিত হইয়াছে। তার পরই গাছ সতেজ হইয়া উঠিবে। ইহাতেও যদি পোকার উপদ্রব কমিয়া না যায়, তাহা হইলে গাছের আগায় (কীটাক্রান্ত স্থানে) পীচকারীর সাহায্যে অথবা ছিটাইয়া কেরোসিন দিতে হইবে। বৎসরে একবার করিয়া কেরোসিন দিলে গাছে আর সহজে পোকার উপদ্রব ঘটিতে পারে না। কেরোসিনে গাছের বিশেষ কোনও ক্ষতি হয় কিনা, তাহা জানি না। কিন্তু উহাতে পোকা যে মরিয়া যাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। নারিকেলগাছে অধিক পরিমাণে কেরোসিন দিলে, তাহাতে গাছের বিশেষ অনিষ্ট সাধিত হইতে পারে। এই জন্যই গাছের মাথায় কেরোসিন দিতে হইলে, বিশেষ সতর্ক হইয়া, অল্প পরিমাণ দিতে হয়। একবারে বেশী না দিয়া, অত্যল্প পরিমাণে আবশ্যক মত ২।৩ বার দিলেও চলে।

ভোঁমরাপোকাগুলি আলোর নিকটে আসে বলিয়া, 'আলোর ফাঁদ' পাতিয়াও, উহাদিগকে ধ্বংস করা যাইতে পারে। একটা মাটির গামলার মধ্যে কেরোসিনতৈলমিশ্রিত জল রাখিয়া, তদুপরি রাত্রিতে একটি সাধারণ হারিকেন লণ্ঠন আনাইয়া ঝুলাইয়া রাখিতে পারিলেই, 'আলোর ফাঁদ' পাতা হইল। আলোকপ্রীতিবশতঃ, ভোঁমরা-পোকাগুলি লণ্ঠনের কাছে আপনা হইতেই উপস্থিত হয়, এবং লণ্ঠনের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া জলে পড়িয়া মরিয়া যায়। ভোঁমরা-পোকা দ্বারা আক্রান্ত নারিকেলগাছের নীচে আগুন আলিয়াও, পোকা বিনাশ করিতে পারা যায়।

কতকগুলি ক্ষুদ্র চিংড়িমাছ আনাইয়া পচাইতে হইবে। ঐ পচা মাছগুলি গাছের ঠিক নিম্নভাগে, গাছের গোড়ায়, একটা মাটির পাত্রে রাখিয়া দিলে দেখা যাইবে, তাহাতে পোকাগুলি পড়িয়া গিয়াছে। সুতরাং, তদবস্থায় অতি সহজেই পোকা বিনাশ করা যাইতে পারে। পচা মাছগুলি কাপড়ের পুটুলীতে বাঁধিয়া, উহা কীটাক্রান্ত স্থানে ঝুলাইয়া রাখিতে পারিলেও পোকার উপদ্রব কমিয়া যায়। ইহা আমাদের বিশেষ পরীক্ষিত। ইহা ছাড়া, কতকগুলি অর্দ্ধ কুটিত ভেরণ্ডা-গোটা (এড়ণ্ড নহে) মাটীর পাত্রে পচাইয়া লইয়া, উহাও গাছের নীচে রাখিয়া দিলে পোকাগুলি নীচে নামিয়া আসিবে। স্থূলকথা, কোনও তীব্র দুর্গন্ধযুক্ত পচা জিনিষ গাছের গোড়ায় অথবা পত্রবৃন্তের সহিত ঝুলাইয়া রাখিতে পারিলেই, পোকাগুলি গাছের গোড়ায় নামিয়া আসিবে অথবা স্থানান্তরে চলিয়া যাইবে। নারিকেল-গাছের পক্ষে লবণও বিশেষ উপকারী। গাছের আগায় লবণ জল দিয়া, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে, গাছের গোড়ায় লবণ দিতে পারিলেও পোকার উপদ্রব কমিয়া যায়। ইহাতে গাছেরও উপকার হয়। আমি আমার নারিকেল-বাগানে উক্ত সরল প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়া ফললাভ করিয়াছি।

আমাদের দেশে নারিকেল উপাদেয় খাদ্য। নারিকেল ও চিনি সংযোগে নানাবিধ সুখাদ্য মিষ্টদ্রব্য প্রস্তুত হয়। ডাব নারিকেলজল ও নারিকেল স্নিগ্ধকর, পুষ্টিকর ও বিশেষ উপকারী। ব্যঞ্জনাদি নারিকেলসংযোগে সুখাদ্য ও সুস্বাদু হয়। নারিকেলতৈলে চুল বৃদ্ধি করিবার ও ঘা শুকাইবার ক্ষমতা আছে। প্রদীপে জ্বালাইবার পক্ষেও নারিকেলতৈল উত্তম। ইহা মৃদু ও স্নিগ্ধ আলো প্রদান করে; সে আলো চক্ষের উপকারী। নারিকেল পিত্তপ্রধান-রোগীর পক্ষে উপাদেয় সুখাদ্য। লবণ ও নারিকেল একত্র মিশ্রিত করিয়া খাইলে পিত্ত বা অম্লপিত্তরোগী ভাল হয়। কবিরাজী মতে, 'নারিকেল খণ্ড' একটি প্রসিদ্ধ ঔষধ। মঙ্গল-ঘটের সঙ্গে নারিকেল সজ্জিত রহিবে। দেব-দেবীর পূজায় নারিকেল প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। নারিকেলের ছোবড়ায় দড়ি প্রস্তুত হয়। তদ্ভিন্ন, আরও নানাকার্য্যে নারিকেল অত্যাবশ্যক। এমন একটা উপকারী ও অত্যাবশ্যকীয় জিনিষ ক্রমেই দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িতেছে, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। পূর্ব্ববঙ্গের মধ্যে বরিশাল, ত্রিপুরা এবং নোয়াখালী জেলাতে প্রচুর পরিমাণে নারিকেল জন্মে। এই সকল স্থান নারিকেলের পক্ষেও বিশেষ উপযোগী। তদ্ভিন্ন, অন্যান্য জেলাতেও অল্পাধিক পরিমাণে নারিকেল জন্মিত। কিন্তু কীটের উপদ্রবে ও যথোচিত যত্নের অভাবে, নারিকেল-

গাছের সংখ্যা ক্রমশঃই হ্রাস হইয়া পড়িতেছে। এ দিকে সকলেরই লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য।

নারিকেলগাছে পোকা লাগিয়াছে জানিতে পারিলেই, বিশেষ সতর্ক হইতে এবং প্রতিকারোপায় অবলম্বন করিতে হইবে। নারিকেলচারা রোপণ করিবার প্রত্যেকটী গর্ত্তের মধ্যে লবণমিশ্রিত মৃত্তিকা দিতে পারিলে ভাল হয়। প্রত্যেক গর্ত্তে দুইসের লবণ দিলেই চলিবে। চারা রোপণের পর, ক্রমাগত তিন চারি বৎসর পর্য্যন্ত অথবা যে পর্য্যন্ত গাছে ফল না ধরে, তৎকাল পর্য্যন্ত প্রত্যেক বৎসর ভাদ্রমাসে নারিকেলগাছের গোড়ায় একসের করিয়া লবণ দিতে পারিলে গাছ পুষ্ট ও সতেজ হইবে; এবং উহাতে শীঘ্র ফল ধরিবে। নারিকেলগাছের তাজা ডাল বা ডাগুরা কাটিয়া ফেলা অনুচিত। কারণ, ডাগুরা কাটিয়া ফেলিলে গাছ নিস্তেজ হইয়া পড়ে; এবং ঐ সকল গাছে ফলনও কম হয়।

নারিকেলগাছগুলি রক্ষার পক্ষে, গাছের নীচ ও গাছের আগা পরিষ্কার করিয়া দেওয়াই প্রকৃষ্ট উপায়। গাছে যাহাতে সর্ব্বদা পিপীড়া বিচরণ করিতে পারে, তজ্জন্য গাছের আগায় সময় সময় কিছু কিছু করিয়া লালীগুড় ঢালিয়া দিতে হইবে। এমনভাবে গুড় ঢালিতে হইবে, যাহাতে উহা স্রোতাকারে গাছের কাণ্ড দিয়া মাটিতে পতিত হয়। গুড় ঢালিয়া দিলে গুড়ের লোভে পিপীলিকা আসিয়া গাছের আগা দখল করিয়া বসিবে। গাছে পিপীড়া আসিলে আর পোকার ভয় থাকিবে না। গাছের গোড়ায় বা গোড়ার গর্ত্তে উই-পোকার উপদ্রব ঘটিলেও পিপীড়াই তাহার উত্তম ঔষধ। উই ধরিলে গাছ নিস্তেজ হইয়া পড়ে।

শ্রীরাজেন্দ্রকুমার মজুমদার।

বঙ্গের গো-ধন।

বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ মিঃ জে, আর ব্ল্যাকউড্ (J. R. Blackwood L. L. B. I. C. S) সাহেব বিগত ১৯০৬ খৃঃ অব্দে, বঙ্গের বিভিন্ন জেলার গো-ধন-সমূহের একটি বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বিগত ১৯১৫ খৃঃ অব্দে, তিনি তাঁহার বহু গবেষণাপূর্ণ তথ্যনির্ণয় সমাধা করিয়া, 'A Survey and Census of the Cattle of Bengal' নামক বিপুল গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। এই গ্রন্থে তিনি গোজাতির সম্বন্ধে যে সকল তথ্যসংগ্রহ ও মতপ্রকাশ করিয়াছেন, আমরা 'বঙ্গের গো-ধন' নামে তাহাই ক্রমশঃ প্রকাশ করিতে বাসনা করিয়াছি। নিম্নে কিয়দংশ প্রদত্ত হইল :—

"অধুনা অনেকেই, গো-বংশের উন্নতিসাধন করিবার জন্য দেশান্তর হইতে হৃষ্ট-পুষ্ট ও উৎকৃষ্ট জাতীয় বৃষ আমদানী করাইবার পক্ষপাতী। কিন্তু মিঃ ব্ল্যাকউড্ ইহার সম্পূর্ণ সমর্থন করেন নাই। তিনি বলেন যে, বিদেশ হইতে উৎকৃষ্ট জাতীয় বৃষ আমদানী করিলেও, উহা দ্বারা আশানুরূপ ফল লাভের সম্ভাবনা নাই। কারণ, বঙ্গদেশের জল-বায়ুর প্রভাবে বিদেশী বৃষ এ দেশে আসিয়া কিছুদিন বাস করিলেই অকর্ম্মণ্য ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। অনেকস্থলে বিলাতী বৃষ, অষ্ট্রেলিয়ান বৃষ প্রভৃতি বৃহদাকার বৃষ আনাইয়া গো-বংশের উন্নতিসাধনের চেষ্টা করা হইয়াছিল; কিন্তু তাহাতে নানা প্রকার অসুবিধা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, বৃহদাকার বৃষের দ্বারা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রকায় বঙ্গীয় গাভীর গর্ভাধান সম্ভবপর হয় নাই। কোন কোন স্থলে গর্ভাধান সম্ভবপর হইলেও, প্রসবকালে গাভী অত্যন্ত কষ্ট পায়; এমন কি, মৃত্যুমুখেও পতিত হয়। সেইজন্য মিঃ ব্ল্যাকউড্ বিদেশ হইতে আনীত বৃষের দ্বারা প্রজননের সমর্থন করেন নাই।

তিনি বলেন যে, বঙ্গের গো-জাতির উন্নতিসাধন করিতে হইলে বঙ্গীয় বৃষের অনুরূপ খর্ব্বাকৃতি অথচ উৎকৃষ্ট জাতীয় বৃষ আনাইতে পারিলেই ভাল হয়। পূর্ব্ববঙ্গের গারোহিল

নামক শৈলমালায় যে সকল বৃষ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের দ্বারা এ দেশের গো-বংশের উন্নতিসাধন করাইতে পারিলেই ভাল হয়; ইহাই মিঃ ব্লাকউডের অভিমত। ঐ সকল বৃষ বিক্রয়ের জন্য গারোবাধা নামক স্থানে প্রতিসপ্তাহে একবার করিয়া হাট হয়। প্রতি হাটে গড়ে ৫০টি করিয়া বৃষ বিক্রয় হইয়া থাকে। উহাদের মধ্যে অধিকাংশই ময়মনসিংহ জিলাতে প্রেরিত হয়; এবং উহাদের মুষ্কচ্ছেদন করিয়া কৃষকগণের নিকটে বিক্রয় করা হয়। গারোহিলের যে সকল বৃষ ক্লীবরূপে ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলাতে কৃষকের গৃহে বিরাজ করে, যদি প্রথমাধি যত্ন করা হয়, অর্থাৎ উহাদের ভাল ভালগুলিকে বাছিয়া লইয়া প্রজননের জন্য পালন করা হয়, তাহা হইলে সেই সকল বৃষের দ্বারাই বঙ্গ ও আসামের গোজাতির যথেষ্ট উন্নতি সংসাধিত হইতে পারে।

মিঃ ব্লাকউড বলেন যে, এ দেশেরও যে সকল বৃষের মুষ্কচ্ছেদন করিয়া ক্লীব করা হয়, তাহাদের মধ্যেও অনেক-গুলিকে প্রজননকার্য্যের জন্য রক্ষা করা যাইতে পারে। কৃতক্লীব বৃষের দ্বারা কৃষিকার্য্য ও ভারবহন প্রভৃতি কার্য্য ভালরূপ হইয়া থাকে। সেই জন্য ঐ সকল ক্লীব বৃষ অপেক্ষাকৃত উচ্চমূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। কিন্তু মিঃ ব্লাকউডের মতে, সুস্থকায় ও তেজস্বী বৃষকে ক্লীব না করিয়া, অকর্ম্মণ্য ও বয়োবৃদ্ধ বৃষকে ক্লীব করা উচিত।

গো-বংশের উন্নতিসাধন করিতে হইলে, বৃষের জন্মের সময় হইতেই তাহার স্বাস্থ্য ও খাদ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। শাবক ভূমিষ্ঠ হইবার পর অন্ততঃ ছয়মাসকাল যাহাতে সে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে মাতৃস্তন্য পান করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রথম ছয়মাসের খাদ্যের উপরেই গো-জাতির ভবিষ্যৎ জীবনের স্বাস্থ্য ও উপযোগিতা নির্ভর করে। সুতরাং যে বৃষ প্রজনন কার্য্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইবে, প্রথমাবধিই তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে বঙ্গদেশ ও আসামের গোজাতিই সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবই ইহার প্রধান কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ঘাসই গোজাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুষ্টিকর খাদ্য। বঙ্গদেশে কৃষির বিস্তারের সহিত গোচারণের ভূমির পরিমাণ ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে। গোচর-ভূমির অল্পতাবশতঃ বৃষ ও গাভী ইচ্ছামত মাঠে চরিয়া বেড়াইতে পায় না; সেই জন্য তাহাদের স্বাস্থ্য নষ্ট হইতেছে। এরূপ অবস্থায় বিদেশ হইতে বৃহদাকার উৎকৃষ্ট জাতীয় বৃষের আমদানী করিলেই যে বঙ্গের গোজাতির উন্নতি হইবে, তাহা বোধ হয় না। বৃহদাকার বৃষ এ দেশীয় ক্ষুদ্রকায় বৃষ অপেক্ষা অনেক অধিক আহার করে; সুতরাং কোন একটি জেলাতে যদি অধিকসংখ্যায় বৃহদাকার বৃষ বা গাভী আমদানী করা হয়, তবে উহাদের খাদ্যদ্রব্যের অভাব অধিক হইবে। সুতরাং, গোজাতির উন্নতি না হইয়া, বরং অবনতি হইবারই আশঙ্কা আছে।

সিংহলদ্বীপের "রয়েল বোটানিকেল গার্ডেনের" ডাইরেক্টর মিঃ উইলিস বলেন যে, অগ্রে গোজাতির পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহার্য্যের ব্যবস্থা না করিয়া, উহাদের সংখ্যা বৃদ্ধিকরা অথবা বিদেশ হইতে বৃষ আনাইয়া, উহাদের দ্বারা গোজাতির উন্নতিসাধনের চেষ্টা করা সঙ্গত নহে। ইউরোপ হইতে সমাগত যে কোন ব্যক্তি এ দেশের খর্ব্বাকৃত বৃষ ও গাভী দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিতে পারেন; কিন্তু এ দেশে গবাদি পশুর খাদ্যদ্রব্যের যেরূপ অভাব, তাহাতে ঐ খর্ব্বাকৃতি পশুই এদেশের উৎকৃষ্ট জাতীয় বলিয়া মনে করা উচিত। সিংহলে গোচারণের মাঠ অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে। এখন যদি প্রতি গ্রামেই ৫।৭টী বৃহদাকার বৃষ আনাইয়া অপেক্ষাকৃত বৃহৎ কলেবর বৎস উৎপাদন করা হয়, তাহা হইলে, গো-পালকগণ সেই সকল বৎসের খাদ্য যোগাইতে গিয়া অন্ধকার দেখিবে।

মিঃ ব্লাকউড বলেন যে, সিংহলের গোজাতিসম্বন্ধে মিঃ উইলিস যাহা বলিয়াছেন, বঙ্গদেশের গো-জাতিসম্বন্ধে আমরাও সেই কথা বলিতেছি। এখন এ দেশের যেরূপ অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে বিদেশ হইতে বৃষ আমদানী না করিয়া দেশীয় বৃষের দ্বারাই সন্তান উৎপাদনের ব্যবস্থা করা উচিত। যদি একান্তপক্ষে বিদেশীয় বৃষের সাহায্যে সঙ্কর জাতীয় গাভী উৎপাদন করিবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে যে সকল বৈদেশিক বৃষ এ দেশের বৃষেরই অনুরূপ সেই সকল বৃষের দ্বারা গোবংশ রক্ষার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। (ক্রমশঃ)

Printed by Jatindra Mohan Das at the Wari Printing Works, Dacca and published by Nishi Kanta Ghosh at the Krishi-Sampada office, 66, Narinda Dacca.

সিটি লাইব্রেরী।

ম্যানেজিং প্রোপ্রাইটার শ্রীনগেন্দ্রকুমার রায়

(ঢাকা—ফিরিঙ্গীবাজার স্কুলেরভূতপূর্ব্ব হেড্ মাষ্টার)।

প্রধান কার্য্যালয়—২৬নং বাঙ্গালাবাজার, ঢাকা।

শাখা-কার্য্যালয়—৬৪।১নং কলেজষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নিবেদন।

কি ঐহিক কি পারত্রিক, এই উভয়বিধ কল্যাণ সাধন করিতে হইলে ধর্ম্মকেই আশ্রয় করিতে হয়। ধর্ম্মপথ আশ্রয় ভিন্ন কেহ কোন বিভাগে উন্নতি লাভ করিতে পারে না। চরিত্রবান্ লোক ভিন্ন কেহ সাহসপূর্ব্বক ধর্ম্মকে আশ্রয় করিতেও পারে না। সৎসঙ্গ ও সদ্‌গ্রন্থই বালক ও যুবকদিগের চরিত্রগঠনের প্রধান উপায়। সৎসঙ্গ আজকাল দুর্ল্লভ হইলেও সদ্‌গ্রন্থ হয়ত যত্ন করিলে পাওয়া যায়। লাইব্রেরী বা পুস্তকালয়ের দায়িত্ব এইখানে। দেশের পুস্তকালয় সকল হইতে সদ্‌গ্রন্থ প্রচারের যথেষ্ট সাহায্য হইতে পারে। অবশ্য গ্রন্থকারদিগের দায়িত্বও এই সঙ্গে রহিয়াছে। এতদ্‌ভিন্ন প্রকাশকগণের বিচারের উপর এই বিষয় যথেষ্ট নির্ভর করে। যাহা হউক কোনকালে মনে হইল, একটা বইএর দোকান দিয়া ভাল ভাল বহি চালাইব। সেই অঙ্কুর হইতেই সিটি লাইব্রেরীর উৎপত্তি। আজ ৪ বৎসর হইল সিটি লাইব্রেরী স্থাপিত হইয়াছে। এই অতি অল্পকালের মধ্যেই ইহা দশজনের আশীর্ব্বাদে বঙ্গের সর্বত্রই প্রচারিত হইয়াছে। এই অল্পকালের মধ্যে যতদূর সাধ্য সমগ্র সদ্‌গ্রন্থের সংগ্রহ করা হইয়াছে। বৈষ্ণব গ্রন্থের জন্য এই লাইব্রেরী সমগ্র বঙ্গদেশে সুপ্রসিদ্ধ এবং এই লাইব্রেরী হইতে পূর্ব্ববঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বঙ্গানুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্‌-ভিন্ন স্কুলপাঠ্য বহি, নীতিপূর্ণ গল্পের বহি, নভেল, জীবনচরিত, ধর্ম্মগ্রন্থ প্রভৃতি অতীব প্রয়োজনীয় প্রায় ১৭০ খানা বহি এই অল্পসময়ের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। এই লাইব্রেরীর যাবতীয় পুস্তকগুলিই আধুনিক আবিষ্কৃত তথ্যাদিতে পরিপূর্ণ। মহামান্য ডিরেক্টার বাহাদুর কর্ত্তৃক পাঠ্য ও অনুমোদিত প্রায় ৭০ খানা বহির আমরা প্রকাশক বা সোল এজেন্ট। আগামী ১৯১৭ সনের জন্য আমাদের ১৩ খানা বহি পাঠ্য হইয়াছে। এবং ৬০ খানা বহি অনুমোদিত হইয়াছে। এতদ্‌ভিন্ন রায় সাহেব শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ প্রণীত যাবতীয় বহি এবং বোম্বে অকস্‌ফোর্ড ইউনিভারসিটী প্রেস হইতে প্রকাশিত যাবতীয় বাঙ্গালা বহি ও অন্যান্য অনেক গ্রন্থকারদিগের বহির একমাত্র এজেন্ট সিটী লাইব্রেরী। গ্রাহক ও ভদ্রমহোদয়গণের আশীর্ব্বাদে ৬৪।১নং কলেজষ্ট্রীটে দোকানের ব্রাঞ্চ খুলিতে হইল। কলিকাতার দোকানদার ও ভদ্র মহোদয়গণ যাহাতে সিটী লাইব্রেরীর প্রকাশিত বহিগুলি অনায়াসে পাইতে পারেন, তজ্জন্যই এই আয়োজন। গ্রাহক ও ভদ্র মহোদয়গণের আশীর্ব্বাদই আমাদের মূল সম্বল এবং আমাদের ব্যবহারে ধর্ম্মের মর্য্যাদা অন্ততঃ কিছুটাও রক্ষিত হইলে কৃতার্থ হইব। ইতি

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—আমাদের এই পুস্তকের তালিকায় যে কোন বহি প্রধান শিক্ষক মহোদয় পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট করেন, তাহা পত্র লিখিলে লাইব্রেরীর জন্য উপহার পাঠাইব। পত্রে প্রধান শিক্ষক মহোদয়ের স্বাক্ষর থাকা বাঞ্ছনীয়। ইউরোপীয় ভীষণ সমরানলে সমগ্র পৃথিবীই নানা প্রকারে বিপন্ন। সর্ব্বোপরি কাগজের অত্যধিক মূল্য বৃদ্ধি হওয়াতে এবার আমরা পুস্তকের তালিকাটীও ভালরূপ বিতরণ করিতে পারিলাম না। প্রেজেণ্টেসন দেওয়া অসাধ্য। কাজেই উপযুক্ত নিবেদন জানাইলাম।

বিনীত—স্বত্বাধিকারী।

ঢাকা সিটিলাইব্রেরী

ঢাকা সিটিলাইব্রেরীর নিম্নলিখিত বহিসকল এবার বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট এবং আসাম এডমিনিষ্ট্রেসন প্রেসক্রাইবড্ (Prescribed) লিষ্টে স্থান পাইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট পাঠ্য—১৯১৭

কলিকাতা গেজেট ২৬শে জুলাই, ১৯১৬।

আসাম গেজেট, ১৫ই নবেম্বর, ১৯১৬।

১। **জ্ঞানসোপান**—শ্রীজগদানন্দ রায় প্রণীত। আগামী ১৯১৭ সনের জন্য ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজসাহী বিভাগের যাবতীয় উচ্চ ও মধ্যইংরেজী স্কুলের ক্লাস সিক্‌স (class VI) অর্থাৎ মাইনর ক্লাসের একমাত্র পাঠ্য পুস্তক। মূল্য ।√০ আনা।

২। **বিবিধ প্রবন্ধ**—রজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত। আগামী ১৯১৭ সনের জন্য ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজসাহী বিভাগের যাবতীয় উচ্চ ইংরেজী স্কুলের ক্লাস সেবেন (class VII) এর এবং ছাত্রবৃত্তি (M. V. School) প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর একমাত্র পাঠ্য পুস্তক। মূল্য—॥√০ আনা।

৩। **সন্দর্ভমালা**—মনোমোহন রায় প্রণীত। আগামী ১৯১৭ সনের জন্য ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজসাহী বিভাগের যাবতীয় উচ্চ ও মধ্য ইংরেজী স্কুলের ক্লাস ফোর (Class IV) অর্থাৎ উচ্চ প্রাইমেরী শ্রেণীর একমাত্র পাঠ্য পুস্তক। মূল্য ।√০ আনা।

৪। **সন্দর্ভ-চন্দ্রিকা**—শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত গুপ্ত কবিরত্ন এম, এ প্রণীত। আগামী ১৯১৭ সনের জন্য ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজসাহী বিভাগের যাবতীয় মধ্য বাঙ্গলা অর্থাৎ ছাত্রবৃত্তি ক্লাসের একমাত্র পাঠ্য পুস্তক। মূল্য ॥√০ আনা। আসাম প্রদেশেও মধ্য বাঙ্গালা এবং হাইস্কুলের ক্লাস সেবেনে পাঠ্য হইয়াছে (আসাম গেজেট ১৫ই নবেম্বর, ১৯১৬ দেখুন)

৫। **সুনীতিসোপানম্**—শ্রীবরদাকুমার কাব্যতীর্থ প্রণীত। আগামী ১৯১৭ সনের জন্য ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজসাহী বিভাগের যাবতীয় উচ্চ ইংরেজী স্কুলের ক্লাস সেবেন (Class VII) এর একমাত্র সংস্কৃত সাহিত্যপুস্তক। মূল্য ।/১০ আনা।

৬। **সুখপাঠম্**—শ্রীদেবেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম, এ, এম, আর, এ-এস প্রণীত। আগামী ১৯১৭ সনের জন্য ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজসাহী বিভাগের যাবতীয় উচ্চ ইংরেজী স্কুলের ক্লাস এইট (Class VIII) এর একমাত্র সংস্কৃত সাহিত্য পুস্তক; মূল্য ১।০ আনা।

৭। **গণিত কুসুম**—শ্রীপরেশনাথ বসু এম, এস সি প্রণীত। আগামী ১৯১৭ সনের জন্য ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজসাহী বিভাগের যাবতীয় বাঙ্গালা স্কুলের ক্লাস থ্রি (Class III) অর্থাৎ নিম্ন প্রাইমারী শ্রেণীর গণিত পাঠ্য পুস্তক। মূল্য ।√০ আনা।

৮। **গণিতবিকাশ**—শ্রীপুলিনচন্দ্র বসু এম, এ ও শ্রীআশুতোষ বসু এম, এস সি প্রণীত। আগামী ১৯১৭ সনের জন্য ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজসাহী বিভাগের যাবতীয় বাঙ্গালা স্কুলের ক্লাস থ্রি ও ফোর (Class 3 and 4) অর্থাৎ নিম্ন প্রাইমারী শ্রেণীর গণিত পাঠ্য পুস্তক। মূল্য ।√০ আনা।

৯। **সরল নিম্নপাঠ**—রায় সাহেব দীনেশচন্দ্র সেন ও নবীনচন্দ্র বসু বি, এ প্রণীত। আগামী ১৯১৭ সনের জন্য ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজসাহী বিভাগের যাবতীয় বালিকা বিদ্যালয়ের (Class IV) ক্লাস ফোরের পাঠ্য পুস্তক। মূল্য ।√১০ আনা। কলিকাতা গেজেট ২১ সেপ্টেম্বর ১৯১৬।

১০। **সুখপাঠ**—যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত। আগামী ১৯১৭ সনের জন্য আসাম প্রদেশের উচ্চ ও মধ্য ইংরেজী স্কুলের একমাত্র পাঠ্য পুস্তক। মূল্য ।০ আনা (আসাম গেজেট ১৫ নবেম্বর ১৯১৬ দেখুন)

১১। **পদ্যসন্দর্ভ**—রায় সাহেব দীনেশচন্দ্র সেন বি, এ, প্রণীত। আগামী ১৯১৭ সনের জন্য আসাম প্রদেশের হাইস্কুলের ক্লাস এইটে একমাত্র পাঠ্য পুস্তক হইয়াছে। (আসাম গেজেট ১৫ই নবেম্বর, ১৯১৬ দেখুন) মূল্য ।√০ আনা

১২। **নীতিকবিতা**—প্রাণকুমার গুহ। আগামী ১৯১৭ সনের জন্য আসাম প্রদেশের জন্য বাঙ্গালা উচ্চ প্রাইমারী স্কুলের ক্লাস ফাইভের পাঠ্য পুস্তক হইয়াছে। মূল্য √০ আনা (আসাম গেজেট ১৫ নবেম্বর ১৯১৬ দেখুন)

১৩। ***আদর্শ ভূ-পরিচয়**—শ্রীজ্ঞানরঞ্জন মিত্র। ১৯১৭ সনের জন্য আসাম প্রদেশের যাবতীয় বাঙ্গালা স্কুলের ক্লাশ টু হইতে ক্লাশ সেবেন, ইংরেজী বয়েজ এবং গার্লস্ হাই স্কুলের ক্লাস থ্রি এবং ক্লাশ ফোর এবং বালিকা বিদ্যালয়ের ক্লাস ফোর এবং ফাইভের জন্য পাঠ্য হইয়াছে। (আসাম গেজেট ১৫ই নবেম্বর, ১৯১৬ দেখুন) মূল্য আসাম সংস্করণ ৬০ আনা। পূর্ব্ববঙ্গের সংস্করণ ॥০ আনা।

* আসাম উপত্যকা বিভাগে আসামী ভাষায় ভূগোল না থাকায় এই পুস্তক শিক্ষক মহোদয়গণ নিজ নিজ বিদ্যালয়ে পাঠ্য করিতে পারেন; ইহা ডিরেক্টার বাহাদুর আদেশ করিয়াছেন।

ঢাকা সিটিলাইব্রেরীর নিম্নলিখিত বহি বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক (Approved) হইয়াছে।

ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজসাহী বিভাগের যাবতীয় স্কুলের অন্যতম পাঠ্য বহি। বাঙ্গালা সাহিত্য।

বহির নাম	মূল্য	গ্রন্থকারের নাম	ক্লাস
সাহিত্যপাঠ (১ম ভাগ)	/০	ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী এম, এ,	১
সাহিত্যপাঠ	√১০	”	”
কোমলপাঠ	√০	”	”
শিশুসখা	/১০	প্রাণকুমার গুহ	”
শিশুবোধ	/১০	চারুচন্দ্র গুহ	”
* শিশুরঞ্জন (প্রথম ভাগ)	√০	পদ্মলোচন ঘোষ	২

* এই পুস্তকের সম্পূর্ণ লভ্য গ্রন্থকার দরিদ্ররোগীদের সেবার জন্য ঢাকা ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডকে দান করিয়া সাধারণের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। এই গ্রন্থের উপস্বত্বের দ্বারা তৎপ্রতিষ্ঠিত ঢাকা—হাসাড়া অন্নপূর্ণা দাতব্য চিকিৎসালয় যাহাতে সুচারুরূপে চলিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। বোধহয় সকলেই জানেন স্বয়ং গবর্ণর বাহাদুর এই চিকিৎসালয় খুলিয়া দিয়াছেন।

বহির নাম	মূল্য	গ্রন্থকারের নাম	ক্লাস
সুনীতিপাঠ	।√০	সুরেশচন্দ্র ঘোষ বি, এ,	৩
সাহিত্যসার	।০	প্রাণকুমার গুহ	”
সরল নিম্নপাঠ	।√১০	রায় সাহেব দীনেশচন্দ্র সেন বি, এ, ও নবীনচন্দ্র বসু বি, এ	”

সন্দর্ভমালা	।৶৹	মনোমোহন রায়	৪
প্রবন্ধপাঠ (১ম ভাগ)	।৴৹	ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী এম, এ	,,
সাহিত্য প্রসূন	।৶৹	প্রসন্নকুমার গুহ	,,
সুখপাঠ	।৹	যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	,,
সাহিত্য কৌমুদী	।৶৹	ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী	৫
প্রবন্ধপাঠ (১ম ভাগ)	।৴৹	,,	,,
সাহিত্য-প্রসূন	।৶৹	প্রসন্নকুমার গুহ	,,
সন্দর্ভ-মালা	।৶৹	মনোমোহন রায়	,,
জ্ঞানবিকাশ	॥৹	মহম্মদ তৈমুর	,,
প্রবন্ধপাঠ (২য় ভাগ)	॥৹	ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী এম, এ	৬
জ্ঞানসোপান	।৶৹	জগদানন্দ রায়	,,
জ্ঞানবিকাশ	।৶৹	অতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	,,
উপদেশমঞ্জরী	।৶৹	অনাথবন্ধু মল্লিক	,,
সন্দর্ভচন্দ্রিকা	॥৶৹	অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত এম, এ	৭
বিবিধ প্রবন্ধ	॥৴৹	রজনীকান্ত গুপ্ত	,,
পদ্যসন্দর্ভ	।৴৹	রায়সাহেব দীনেশচন্দ্র সেন, বি, এ	,,
সদ্ভাবশতক	॥৹	অসিতাকুমার গুহ প্রকাশিত	,,
*প্রবন্ধরত্ন	৸৹, ৸৶৹	শিবরতন মিত্র	৮

* এই পুস্তকখানা প্রেসিডেন্সী এবং বর্দ্ধমান বিভাগেও ক্লাস ৭—১০ এর জন্য অনুমোদিত হইয়াছে।

সীতার বনবাস	৸৹	শিবরতন মিত্র	,,
পদ্য সন্দর্ভ	।৴৹	দীনেশচন্দ্র সেন বি, এ	,,

সংস্কৃত সাহিত্য

বহির নাম	মূল্য	গ্রন্থকার	ক্লাস
সুনীতি-সোপানম্	।৴১০	বরদাকুমার কাব্যতীর্থ	৭
সুখ-পাঠম্	।৯০	দেবেন্দ্রকুমার বিদ্যারত্ন এম, এ	৮
সংস্কৃত সন্দর্ভ	।৶৹	বিধুশেখর শাস্ত্রী	৭, ৮

সংস্কৃত ব্যাকরণ

*পাণিনি–পরিশিষ্ট ৸৹ দেবেন্দ্রকুমার বিদ্যারত্ন এম,এ ৭—১০

এই বহিখানা কলেজের I. A class এর পাঠ্য হইয়াছে। যাহারা ম্যাট্রিকুলেসন ক্লাসে অপ্‌সনেল সংস্কৃত লিয়াছে তাহাদের পক্ষে পাণিনি–পরিশিষ্ট বিশেষ উপযোগী। ইহাতে শব্দখণ্ড ও ধাতুখণ্ড বিস্তাররূপে দেওয়া হইয়াছে। দেবেন্দ্রবাবু সম্প্রতি "পাণিনি প্রাইমার" নামে একখানা গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন; তৎসঙ্গে বড় বড় অক্ষরে অষ্টাধ্যায়ী সূত্রপাঠ প্রদত্ত হইয়াছে। ক্লাস এইটের সংস্কৃতশিক্ষার্থী প্রত্যেক ছাত্রেরই একখণ্ড ক্রয় করা কর্ত্তব্য। মোট কথা 'পাণিনি প্রাইমার' ও "পাণিনি পরিশিষ্ট" কমপ্লিট (complete) বহি।

অঙ্ক।

গণিত-বিকাশ (১ম ভাগ)	।৶৹	আশুতোষ বসু এম্ এস,সি এবং পুলিনচন্দ্র বসু এম, এ	২, ৩
গণিতকুসুম,	।৶৹	পরেশনাথ বসু এম,এস,সি	,,
পাটীগণিত (১ম ভাগ)	।৴৹	হরকান্ত বসু বি, এ	,,
খোকার আঁক	।৶১০	অতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও ভীমচন্দ্র দত্ত	
রয়েল এরিথ্‌মেটীক	৸৹	পরেশনাথ বসু এম্,এস,সি	৪,৫,৬

ব্যাকরণ

সরল বাঙ্গালা ব্যাকরণ	।৹	নগেন্দ্রকুমার চন্দ	৪,৫,৬
ভাষাশিক্ষা ব্যাকরণ	।৶৹	প্রসন্নকুমার গুহ	,,
*ভাষা-বিজ্ঞান	৸৹	রজনীকান্ত বেদান্তবাগীশ	৭,৮
সাহিত্যবোধব্যাকরণ	৸৹	মতিলাল চক্রবর্ত্তী	৭, ৮, ৯, ১০

* প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমে পণ্ডিত মহাশয় এই ব্যাকরণ প্রকাশ করিলেন। সম্প্রতি ২য় ও ৩য় খণ্ড বাহির হইয়াছে। এই ব্যাকরণ বাঙ্গালা ভাষার গৌরব স্তম্ভ। প্রতিখণ্ড ৸৹ আনা। অন্ততঃ এক সেট প্রত্যেক স্কুল-লাইব্রেরীতে রাখিবার উপযোগী।

মধ্য বাঙ্গালা, উচ্চ প্রাইমেরী ও নিম্নপ্রাইমেরী স্কুলের জন্য।

সাহিত্য

সাহিত্য পাঠ	৶১০	ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী এম,এ,	২
কোমল পাঠ	৶৹	,,	,,
শিশুরঞ্জন	৶৹	পদ্মলোচন ঘোষ	,,
সুনীতিপাঠ	।৴৹	সুরেশচন্দ্র ঘোষ বি, এ	৩
সরল নিম্নপাঠ	।৶১০	দীনেশচন্দ্র সেন বি, এ ও নবীনচন্দ্র বসু বি, এ	,,
নীতিকবিতা	।৹	,,	৪
নীতিকবিতা	৶৹	,,	৫
প্রবন্ধ পাঠ (২য় ভাগ)	॥৹	ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী, এম, এ	৭
বিবিধ-প্রবন্ধ (৩য় ভাগ)	॥৴৹	রজনীকান্ত গুপ্ত	,,
প্রবন্ধ-পাঠ (২য় ভাগ)	॥৹	ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী	৬
বিবিধ প্রবন্ধ (৩য় ভাগ)	॥৴৹	রজনীকান্ত গুপ্ত	,,
সন্দর্ভচন্দ্রিকা	॥৶৹	অক্ষয়কুমার দত্ত গুপ্ত কবিরত্ন এম, এ	,,

অঙ্ক

গণিত বিকাশ (১ম ভাগ)	।৶৹	আশুতোষ বসু এম, এস, সি ও পুলিনচন্দ্র বসু এম, এ	৩, ৪
গণিত কুসুম	।৶৹	পরেশনাথ বসু এম,এস সি	,,
পাটীগণিত (১ম ভাগ)	।৴৹	হরকান্ত বসু বি, এ	,,
খোকার আঁক	।৶১০	ভীমচন্দ্র দত্ত ও অতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	,,

উচ্চ ও মধ্যইংরেজী, মধ্যবাঙ্গালা, উচ্চ-প্রাইমেরী ও নিম্নপ্রাইমারী স্কুলের জন্য অনুমোদিত।

পত্রদলিল

আদর্শ নূতন পত্রদলিল ৶৹ মৌলবী আবদুল জব্বর

কর্ম্ম সঙ্গীত।

নব কিণ্ডার গার্টেন কর্ম্মসঙ্গীত ৶৹ মৌলভী ছালামতুল্লা

রাজার কথা ।৶৹ কালিভূষণ মুখোপাধ্যায়

স্বজাতি বৎসলা ললনা ৸৹ অম্বিকাচরণ চক্রবর্ত্তী

* পৌরাণিকী কথা ও ইসলাম কাহিনী } গুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য ২৲ { আবাধা তিনখানি ১৸৹ আনা

নারীর ভাগ্যচিত্র ১৲ জনৈক মহিলা প্রণীত

বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার } জগদানন্দ রায় ১।৹

প্রকৃতি পরিচয় ১।৹ ,,

সুকথা ৸৹ দীনেশচন্দ্র সেন বি, এ

‡ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত (বঙ্গানুবাদ) ৪৲ টাকা, বাঁধা ৬৲ নগেন্দ্রকুমার রায়

আদর্শ জননী ৸৹ শরচ্চন্দ্র ধর

* রামায়ণের কথা ॥৶৹ আনা, মহাভারতের কথা ৸৹ আনা ও ইসলাম কাহিনী ।৶ আনা পৃথক পৃথক পাওয়া যায়।

‡ প্রেসিডেন্সী, বর্দ্ধমান ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজসাহী বিভাগসমূহের যাবতীয় স্কুল, কলেজ, গুরুট্রেণিং ও নর্ম্মাল স্কুলের জন্য অনুমোদিত হইয়াছে। "অদ্যাবধি এরূপ সংস্করণ প্রকাশিত হয় নাই" ইহা অনেকেই বলেন।

ঢাকা সিটি লাইব্রেরীর নিম্নলিখিত বইগুলি এবার ডিরেক্টার বাহাদুর কর্ত্তৃক নূতন পাশ হইয়াছে।

শিশুর সাথী	৶৹	ইন্দিরা দেবী	২
করুণাসোপান	।৶৹	হিরণবালা গুপ্তা	,,
নীতিমাল্য	।৶৹	রাসবিহারী বসু এম, এ	,,
নীতিচয়ন	৸৹	রাসবিহারী বসু এম, এ	,,
সংস্কৃত প্রাইমার	।৹	যোগেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়	,,
সুনীতি সারম্	।৹	,,	,,
লঘুপাণিনিয় (২য় ভাগ)	৸৹	,,	৭, ৮
লঘু পাণিনিয় (৩য় ভাগ)	॥৹	,,	,,

আদর্শ ভূ-পরিচয় আসাম প্রদেশে ইংরেজী ও বাঙ্গালা যাবতীয় স্কুলের ১০টী ক্লাসে পাঠ্য হইয়াছে। (আসাম গেজেট দেখুন। স্কুল ঘর হইতে আরম্ভ করিয়া মহাদেশ পর্য্যন্ত নানাবিধ ছবি দ্বারায় বর্ণিত হইয়াছে। আজ পর্য্যন্ত এমন ভূগোল বাহির হয় নাই।

চাইল্ডস ইজি গ্রামার	।৴০	কে, সি সেন এম, এ	৪,৫,৬
শিশুপাটীগণিত	।৶০	রজনীকান্ত দে	,,
সিম্পল এরিথ্‌মেটিক	৸০	জ্ঞানদাকিশোর চৌধুরী ও যোগেশচন্দ্র চাটার্জ্জি বি, এ	,,
সরল শিশুপ্রবেশ	৶০	নগেন্দ্রকুমার রায়	৪
শিশুতোষ ব্যাকরণ	৴১০	অতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	,,

কবিতা কৌমুদী (১ম ভাগ) ৵০ হরিশ্চন্দ্র মিত্র ৪

নির্ব্বাসিতা সীতা ৵০ হরিশ্চন্দ্র মিত্র ৭

কবিবর ৺হরিশ্চন্দ্র মিত্রের রচিত নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহ উদ্ধার হইয়াছে। সাহিত্যিক মাত্রেই কবিবরের রচিত গ্রন্থের এক এক সেট ক্রয় করেন ইহাই বাসনা নির্ব্বাসিতা সীতা ।৵০ আনা ; রামায়ণ মহাকাব্য ১৲ টাকা ; কবিতা-কৌমুদী ১ম ভাগ ৵০ আনা ; ও দ্বিতীয় ভাগ ।/০ আনা ; ঐ তৃতীয় ভাগ ।৵০ আনা । সরল পাঠ ৵০ আনা ; ছাত্রসখা ৵০ আনা, কবিতাবলী ৵০ সমস্তই স্কুল পাঠ্য পুস্তক। কবিবর রচিত গ্রন্থাবলীর একমাত্র স্বত্বাধিকারী সিটী লাইব্রেরী।

প্রাথমিক ভারত ইতিহাস চট্টগ্রাম নর্ম্মাল স্কুলের সুযোগ্য সুপারিনটেন্‌ডেন্ট গুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য বি, এ. ।০

আদর্শ ভূ-পরিচয় ॥০ জ্ঞানরঞ্জন মিত্র

সরল আদর্শ পত্রলিখন ও পত্র দলিল ।৵০ রাজেন্দ্রকুমার রায়

* আদর্শলিপি (তিনখণ্ড) উপেন্দ্রকুমার রায় (প্রতিখণ্ড) ৴১০

* এইরূপ সুন্দর লেখা অদ্যাবধি বাহির হয় নাই। ইহাতে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে।

ঢাকা সিটী লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত হেল্প বুকস্ Help-books অর্থাৎ নানাবিধ সাহায্যকারী পুস্তকসমূহ।

শিশুপাঠ ৴১০ ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী এম এ, প্রণীত ১

সরল বাল্যপাঠ ৴০ হরবন্ধু চক্রবর্ত্তী "

শিশুশিক্ষা পাটীগণিত ।০ প্রফুল্লকুমার গুহ ১, ২

সরল শিশু ধারাপাত ৴০ রাজেন্দ্রকুমার রায় "

কিণ্ডারগার্টেন বৃহৎ ধারাপাত ও শিশু অঙ্ক পুস্তক ৵৫ নগেন্দ্রকুমার রায় "

দি নিউ ইংলিশস্পেলিং বুক ।০ { নগেন্দ্রকুমার চন্দ ও বিরাজমোহন চন্দ ৩-৮

বাঙ্গালা পদপরিচয় বা পার্সিং এর বহি ।০ { নগেন্দ্রকুমার চন্দ ৪-৮

চাইলড্‌স সিম্পল গ্রামার ।৵১০ নগেন্দ্রকুমার চন্দ ৪-৬

রুডিমেণ্টস্ অব ইংলিশগ্রামার ।০ ফণীন্দ্রনাথ লাহিড়ি এম, এ ৪-৬

আদর্শ মৌখিক ভূগোল ৶০ জনৈক অভিজ্ঞ পণ্ডিত ৩, ৪

আদর্শ মৌখিক ইতিহাস ।০ " ৩-৪

সরল ভূগোল পাঠ ।/০ প্রফুল্লকুমার গুহ ৩-৪

ভূগোল দর্পণ ।৵০ পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ৪-৫

সরল শিশুভূগোল ।০ কালিকা প্রসাদ চক্রবর্ত্তী ৩-৪

সংস্কৃত ব্যাকরণ আদর্শ ॥০ রাধাবল্লভ গোস্বামী ৭-৮

প্রবন্ধ মঞ্জরী ।/০ প্রমথনাথ বিদ্যাভূষণ "

শিশুপাঠ্য ভারতবর্ষের ইতিহাস ॥০ প্রাণকুমার গুহ ৪-৬

ষ্টেণ্ডার্ড ওয়ার্ড বুক ।০ জ্ঞানদাপ্রসাদ দাস বি, এ ৩-৪

সুখপাঠ ভারত ইতিহাস ।৵০ যোগেশচন্দ্র রায় বি এ, ৩-৫

এন এলিমেণ্টারী কোর্স অব ট্রানশ্লেসন ।৶০ } জীতেন্দ্রমোহন চন্দ ৪-৫

আদর্শ রচনাপদ্ধতি ।৶০ জনৈক অভিজ্ঞ পণ্ডিত ৫,৮

চাইল্ডস্ ইজি ট্রানশ্লেসন এণ্ড রিট্রেনশ্লেসন ॥৵০ } পি, সি ঘোষ এম, এ "

নব শিক্ষা সহায় (শিক্ষকদিগের জন্য) ০ } কামিনীকুমার বিদ্যাবিনোদ ৩-৭

বর্ণবিকাশ ও বর্ণবিকাশ-শিক্ষা (শিক্ষকদিগের জন্য) } গিরিজাকান্ত ঘোষ "

নীরব কবিতা ।/০ নগেন্দ্রকুমার রায় ৪-৬

চট্টগ্রাম দর্পণ বা চট্টগ্রামের ভূগোল ৵০ } সুরেশ্বর বানার্জি ৪-৫

খোকার বই (১ম ভাগ) ৴১০ মোহিনীমোহন বসু ১

" (২য় ভাগ) ৶০ " ২

খোকার কবিতা ৵০ " ৪

নব কর্ম্ম-গীত ।০ " "

মডেল স্পেলিং রিডার ।০ " "

অবধারিত গণিতাঙ্ক (শিক্ষকদিগের জন্য) ॥০ } তারিণীচরণ বসু

কবিতা-সোপান ৵০ মহেন্দ্রচন্দ্র সোম ৪

জুবিনাইল লেটারস্ এণ্ড এসেজ ॥/০ " ৬-৭

কৃষক-বালা (বালিকাদিগের জন্য) ।৵০ " ৪-৬

হেণ্ড বুক অব কম্পোজিসন ।৶০ } মহেন্দ্রচন্দ্র সোম জ্ঞানদাপ্রসাদ দাস বি, এ, ৬-৮

মারেজ স্পেলিং ৴০ রাজেন্দ্রকুমার রায় ৩-৪

পগ্রেসিব ইংলিস ট্রানশ্লেসন এণ্ড কম্পজিসন } চন্দ্রকুমার ঘোষ বি, এ, ৫-৮

বিগনার্স ষ্টাডিজ ইন ইংলিশ ।০ নগেন্দ্রকুমার রায় ৫-৬

বিগনার্স নিউমেথড্ অব লারণিং, ইংলিশ গ্রামার ট্রানশ্লেসন এণ্ড কম্পোজিসন বাই ডিরেক্ট মেথড্ ৴০ } অম্বিকাচরণ চক্রবর্ত্তী বি, এ ৫-৬

এ ম্যানুয়েল অব লার্ণিং সেনস্কৃট বাই ডিরেক্ট মেথড্ ॥০ " ৭-৮

ডিকটেসন একথার সাইজেস্ কম্প্রাইজিং স্পেলিং প্রোগাল-সে এণ্ড ওয়ার্ডবুক ।/০ } এস, এম, দত্ত বি, এ

মডেল এরিথ মেটিক ৸০ বিএ, বিটি দত্ত এণ্ড সরকার ৪-৫

এন এপিটম অব ইণ্ডিয়ান হিষ্টরী ৸০ { কালীপ্রসন্ন দত্ত বি, এ হেড মাষ্টার বরিশাল জিলা স্কুল ৭-৮

সরল পাঠ ।০ বসন্তকুমার দাস বি, এ বি, টি ২

সচিত্র শিশুরঞ্জন (১ম ভাগ) ।০ নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম, এ, ৩

" (২য় ভাগ) ।/০ " ৩-৬

প্রবন্ধপাঠ (৩য় ভাগ) ৸৵০ ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী এম এ, ৭-৮

ভাব-বল্লী ।৵০ প্রসন্নকুমার গুহ ৭-১০

বস্তু শিক্ষা ।০ মৌলভী আবদুল্লাজব্বর ৪-৬

থরেজ এলিমেণ্টারী জিওগ্রাফি ৶০ জ্ঞানদা প্রসাদ দাস বি, এ "

নিউ মেথড ইন এলজাবরা ॥৵০ এম, গুপ্ত ৭-১০

টিউটরিয়েল এরিথ মেটিক ৸১ রাসবিহারী বসু এম, এ ৪-৬

রামায়ণী সুধা ৸১ কুমুদিনীকান্ত গাঙ্গুলী বি, এ ৫-১০

দীপক ॥১ " ৭-৮

সেলফ কণ্ট্রোল এণ্ড সেলফ রিএলাইজেশন ১৲ " ৯-১০

সংস্কৃত শিক্ষা সরণি ॥০ বরদাকুমার কাব্যতীর্থ ৭-১০

হিতোপদেশ সার ।/০ " ৭

জিওমেট্রির সলিউসন ১ম ও ২য় ভাগ। তৃতীয় চতুর্থখণ্ড ও যন্ত্রস্থ ॥৵০ } বসু এণ্ড বক্সী ৭-১০

বালকবোধ ব্যাকরণ ।/০ মতিলাল চক্রবর্ত্তী ৪-৬

ভাব-লহরী ।০ প্রসন্নকুমার গুহ "

পদ্য শিক্ষা ।০ " "

ম্যাট্রিকুলেসন ট্রানশ্লেসন ॥/০ রামব্রহ্ম লাহিড়ি বি, এ ৬-৮

হিসাব দর্পণ ॥০ গুরুপ্রসন্ন দাসগুপ্ত (শিক্ষকদিগের জন্য)

রাণী দুর্গাবতী ৸০ কালীভূষণ মুখোপাধ্যায় ৮-৯

সংস্কৃত ব্যাকরণ সোপান ৯০ রমণীমোহন কাব্যতীর্থ ৭-১০

সিটি লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত আউট বুকস্।

সতী রাধাকিশোরী শরচ্চন্দ্র ধর ॥/০

ঝটিকা (টেম্পেষ্টের বঙ্গানুবাদ) } ইন্দ্রমোহন দাস বি এ, ॥/০

রমা এস এম দত্ত বি, এ ॥৵০

দাক্ষায়ণী মোহিনীমোহন বসু ।৵০

পুষ্পমঞ্জরী রবীন্দ্রকুমার সেন ১৲ বাঁধা ৸০

বিদ্যালয়ে উদ্ভিদ-পরিচর্য্যা স্বর্ণকুমার মিত্র ৵০

আকাশ প্রদীপ সুখরঞ্জন রায় এম, এ ॥/০

হাসি ও অশ্রু নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম, এ ৸০

বীরবিক্রম নাটক " ॥০

রত্নাবলী গুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য বি, এ ॥/০

বিক্রমোর্ব্বশী " ॥০

স্বপ্নবাসবদত্তা " ।/০

বাল চরিত " ।/০

পঞ্চ রাত্র " ।/০

প্রতিজ্ঞা যৌগন্ধরায়ণ " ।/০

মহাত্মা যোষেফ্ অম্বিকাচরণ চক্রবর্ত্তী বি, এ ।৵০

প্রভু যিশুখৃষ্ট ।৵০ "

জয়ন্ত নাটক ।৵০ নগেন্দ্রকুমার রায়

স্বপ্ন ভূমি উপন্যাস ।৵০ "

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা বঙ্গানুবাদ সহ	॥৵০	
হাটপত্তন ও নামসংকীর্ত্তন বঙ্গানুবাদ সহ	।৵	
রূপাভিসার ব্রজলীলা নাটক	৶১০	চৈতন্যকৃষ্ণ দাস
দুর্গা পুরাণ	১॥০	পীতাম্বর নাথ
ঠাকুরমার চিঠি বা সমাজে নারী	১।০	ফণিভূষণ রায়

রেজেষ্টরী করা   শঙ্খমার্কা আসল।

লালমোহন সাহ শঙ্খনিধির

জগদ্বিখ্যাত

সর্ব্বজ্বরগজসিংহ

২৪ ঘণ্টায় সর্ব্ববিধ জ্বর, ১ সপ্তাহে প্লীহা-যকৃৎ আরোগ্য হয়।

পৃথিবীব্যাপিত

সর্ব্বদদ্রুহুতাশন

২৪ ঘণ্টায় দাউদাদি চর্ম্মরোগ বিনাক্লেশে আরোগ্য হয়।

সুপ্রসিদ্ধ

কণ্ডুদাবানল

খোস পাচড়াদি ক্ষতরোগ শীঘ্র বিনাক্লেশে আরোগ্য হয়।

শ্রীগৌরনিতাই সাহ শঙ্খনিধি।

ঢাকা বাবুবাজার, শঙ্খনিধি পোঃ বা ভজহরিসাহার ষ্ট্রীট, ঢাকা

তামাকের চাষ

রংপুর গবর্ণমেণ্ট কৃষি-পরীক্ষাক্ষেত্রের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযামিনীকুমার বিশ্বাস বি, এ প্রণীত

নানাপ্রকার দেশী ও বৈদেশিক তামাকের চাষসম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্যতথ্যপূর্ণ অভিনব পুস্তক। বাঙ্গালা ভাষায় তামাকের চাষসম্বন্ধে এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সুবৃহৎ পুস্তক ইতঃপূর্ব্বে আর প্রকাশিত হয় নাই। গ্রন্থকার বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া ব্রহ্মদেশ, বেহার ও মাদ্রাজের অনেক স্থানের তামাকের চাষ-প্রণালী সন্দর্শন করিয়াছেন এবং বিগত ১৯০৫ সাল হইতে এ যাবৎ রংপুর সরকারী কৃষিপরীক্ষা-ক্ষেত্রে নানা জাতীয় তামাকের উন্নতিকল্পে বহু পরিশ্রমে দেশী এবং সিগারেটের উপযোগী মার্কিন ও তুরস্ক দেশীয় ও চুরুটের উপযোগী মাদ্রাজ ও বর্ম্মা দেশীয় তামাকের বিজ্ঞানসম্মত-প্রণালীতে চাষ-বাস করিয়া, যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন; এ পুস্তকে তাহাই বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তামাকের চাষ করিয়া যাঁহারা বিশেষ লাভবান হইতে বাসনা করেন, তাহাদের সকলেরই একখানি ক্রয় করা উচিৎ।

পুস্তকের ছবি, ছাপা ও কাগজ উত্তম—মোট ১৮ খানি ছবির পুস্তকের মূল্য ১॥০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—কৃষি-সম্পদ আফিস—ঢাকা।

কৃষিতত্ত্বাবদ

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দে F. R. H. S. প্রণীত।

১। কৃষিক্ষেত্র (১ম ও ২য়খণ্ড একত্রে ৪র্থ সংস্করণ)—১৲

২। সবজীবাগ (৫ম সংস্করণ) ॥০ ৩। ফলকর (৩য় সংস্করণ)॥০

৪। মালঞ্চ (২য় সংস্করণ)—১৲   ৫। মৃত্তিকাতত্ত্ব—১৲

৬। গোলাপবাড়ী—৸০,   ৭। কার্পাস-কথা—॥০

৮। উদ্ভিদ-জীবন ॥০, ৯। পশুখাদ্য ।০, ১০। আয়ুর্ব্বেদচা॥০

১১। Treatise on Mango (2nd Edition) Re. 1

১২। Potato Culture (3rd Edition) As 6

প্রাপ্তিস্থান-কৃষি-সম্পদ পুস্তক-বিভাগ

কৃষি-সম্পদ আফিস—ঢাকা।

কৃষি-সম্পদের পাঠকগণ আদ্যন্ত পাঠ করুন।

কৃষি-সম্পদ পুস্তক-বিভাগ।

পুস্তক-বিভাগ স্থাপনের উদ্দেশ্য—

আমাদের কৃষি-কর্ম্মানুরাগী ও কৃষি-কর্ম্মাধ্যায়ী বহুসংখ্যক গ্রাহকই নানা প্রকার কৃষি-গ্রন্থ পাঠাইয়া দিবার জন্য আমাদিগের নিকট পত্র লিখিয়া থাকেন। আমরা তাঁহাদের পত্র পাওয়া মাত্রই, পুস্তক পাইবার ঠিকানা জানাইয়া থাকি। কিন্তু অনেকেই ইহাতে বড় অসন্তুষ্ট হন এবং নানারূপ অনুযোগ করিয়া, আমাদিগকেই তাঁহাদের অভীপ্সিত পুস্তক পাঠাইয়া দিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়া থাকেন। এমন কি, অনেকেই লিখিয়া থাকেন, "আমরা আপনাদের লিখিত ঠিকানায় পত্র দিয়াও পুস্তক পাইতেছি না। ঢাকা ও কলিকাতার দুই চারিটী পুস্তকালয়েও পুস্তক পাঠাইয়া দিতে অর্ডার দেওয়া হইয়াছিল; কিন্তু কেহই পুস্তক পাঠাইয়া দিতে পারেন নাই" ইত্যাদি। বস্তুতঃ, অধিকাংশ পুস্তক-বিক্রেতাই যে বাঙ্গলা ও ইংরেজি কৃষি-গ্রন্থ বিক্রয় করেন না, তাহা আমরা বিশেষভাবেই অবগত আছি। কৃষি-গ্রন্থ ক্রয় করিবার ইচ্ছা খুব কম লোকেরই হয়। এমতাবস্থায় বলবতী বাসনাসত্ত্বেও যে অনেকেই পুস্তক ক্রয় করিতে পারেন না, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। আমাদের গ্রাহকদিগের যাহাতে বাসনা অপূর্ণ না থাকে, তদুপায়বিধান করাই, আমাদের পুস্তক-বিভাগ-স্থাপনের প্রধানকারণ।

কৃষি-গ্রন্থ প্রচারের সহায়তা করাই, পুস্তক-বিভাগ স্থাপনের মুখ্য-উদ্দেশ্য।

ইহাতে থাকিবে কি—প্রায় সর্ব্বপ্রকার ইংরেজি ও বাঙ্গালা কৃষি-গ্রন্থ বিক্রয়ার্থ প্রচুর পরিমাণে মজুত থাকিবে। তদ্ভিন্ন, স্কুল ও পাঠশালার পাঠ্য পুস্তক, উপহার দিবার উপযোগী এবং স্ত্রী-পাঠ্য সর্ব্ববিধ পুস্তকই, পুস্তক-বিভাগে রক্ষিত হইবে। ডাক্তারি ও কবিরাজি চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধীয় পুস্তক, ধর্ম্মগ্রন্থ, ইতিহাস এবং নভেল, উপন্যাস ও কাব্য গ্রন্থাদিও পুস্তক-বিভাগে রাখা হইবে।

কৃষি-সম্পদ পুস্তক-বিভাগে প্রায় সর্ব্বপ্রকারের পুস্তকই রহিবে।

পুস্তকের অর্ডার দিবার সঙ্গে সঙ্গেই আনুমানিক এক চতুর্থাংশ মূল্য পাঠাইয়া দিতে হইবে।

কার্য্যাধ্যক্ষ—কৃষি-সম্পদ পুস্তক-বিভাগ।

"কৃষি-সম্পদ" আফিস—ঢাকা।

NEW START! NEW START!!

HALF-TONE AT DACCA

Engraving Process & Co.

Process Engraving & Co.

All up-to-date Machineries.
Works—Up-to-date and satisfactory.

Expert trained in AMERICA and JAPAN.

Our blocks print clean and beautiful.

PROCESS ENGRAVING & Co.,
25, GANDARIA—DACCA.

Cover printed at the Sreenath Press, Dacca.

Approved by the Director of Public Instruction, Bengal, for use in Schools & Colleges (Vide, Calcutta Gazette, 2nd Oct. 12.)

Krishi-Sampada.
Vol. VII. No. IX.

একমাত্র কৃষিবিষয়ক মাসিক পত্র।

পৌষ, ১৩২৩,
৭ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা।

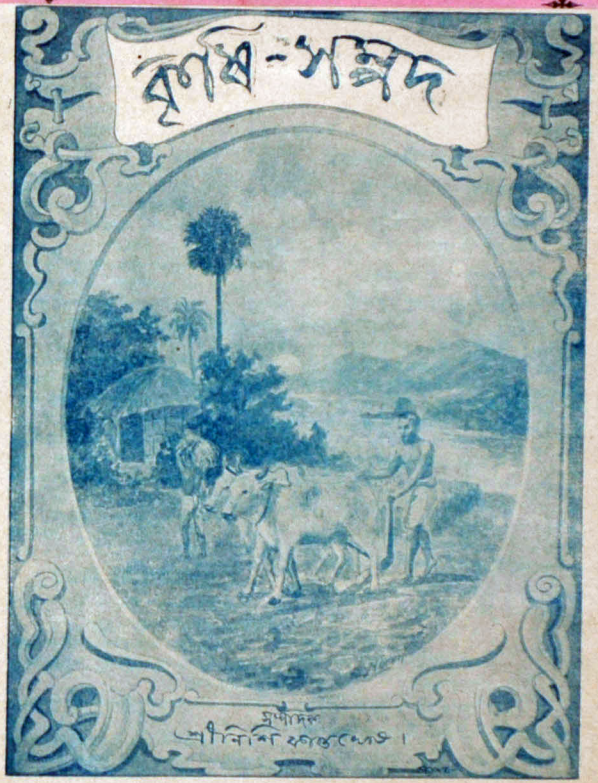

কৃষি-সম্পদ

কৃষি, কৃষি-শিল্প এবং যৌথ ঋণ-দান-সমিতি-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নূতন ধরণের সচিত্র মাসিক পত্র।

ইহাতে প্রতি মাসেই ডবল ক্রাউন আট পেজি ৪ ফর্ম্মা অর্থাৎ ৩২ পৃষ্ঠা থাকিবে।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩৲ মাত্র।

প্রবন্ধ-সম্পদে অতুলনীয়, চিত্র-সৌন্দর্য্যে

অপূর্ব্ব ও সর্ব্বত্র উচ্চ-প্রশংসিত

বাঙ্গালার কৃষি-বিষয়ক

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও বৃহত্তম পত্র।

লেখক—"কৃষি-সম্পদে" রহিয়াছেন—

আমেরিকা-প্রত্যাগত শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, বি, এ, এম, এস, এ।
" " শ্রীযুক্ত দ্বিজদাস দত্ত এম্, আর, এ, সি,
" " " অনাথবন্ধু সরকার এম্, এ, সি, এস,
" " মিঃ জি, এন, মুখার্জ্জি এম্, এস, সি।
জাপান-প্রত্যাগত শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম্, এ, এস।
" " " রসিকরঞ্জন ঘোষ এম্, এস, এ।
" " " মন্মথনাথ দে " " "
" " " যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, " " "
" " মিঃ এস, এন, বসু এম্, এ, এস।
" " " এ, সি, ঘোষ " " "
" " " এন্, এল, দত্ত " " "
" " " পি, কে, বিশ্বাস পি, এইচ, ডি।
ফ্রান্স-প্রত্যাগত শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস এস, ই
" প্রবোধচন্দ্র দে এফ, আর, এইচ, এস
" ঈশ্বরচন্দ্র গুহ " " " "
" রাজেশ্বর দাসগুপ্ত এম্, আর, এ, এস
" গিরিজানাথ মজুমদার জি,বি,ভি,সি
" অনুকূলচন্দ্র রায়
" হেমচন্দ্র দেব (মেডিকো বোটানিষ্ট)
সহকারী কিসারী আফিসার শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বাগচী বি, এ প্রভৃতি

"কৃষি-সম্পদের" নিয়মাবলী।

১। "কৃষি-সম্পদের" প্রত্যেক সংখ্যা সাধারণতঃ চারি ফর্ম্মা অর্থাৎ ৩২ পৃষ্ঠা পরিমিত হইবে।

২। প্রতি মাসে চারি ফর্ম্মা হিসাবে, বৎসর ৪৮ ফর্ম্মা প্রদত্ত হইবে।

৩। প্রত্যেক সংখ্যাতেই ছবি থাকিবে, কিন্তু প্রবন্ধের প্রকৃতি অনুসারে ছবির সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি হইবে

৪। ইহার বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত সর্ব্বত্র ৩৲ তিন টাকা মাত্র। মূল্য অগ্রিম দেয়।

৫। প্রতি সংখ্যা ।/০ আনা। নমুনারও মূল্য লাগে।

৬। "কৃষি-সম্পদ" প্রত্যেক পূর্ণিমায় বাহির হয়। সুতরাং কোন গ্রাহক "কৃষি-সম্পদ" না পাইলে, কার্য্যাধ্যক্ষকে তাহা জানাইবেন। নচেৎ অপ্রাপ্ত সংখ্যার জন্য, পরে মূল্য ও ডাকমাশুল দিতে হইবে।

৭। বৈশাখী পূর্ণিমায় "কৃষি-সম্পদের" বৎসর আরম্ভ এবং চৈত্র-পূর্ণিমায় বৎসর শেষ। বৎসরের যে কোন সময়ে, "কৃষি-সম্পদের" গ্রাহক হইতে পারা যায়; কিন্তু প্রত্যেক গ্রাহকই ১ম সংখ্যা হইতে "কৃষি-সম্পদ" প্রাপ্ত হইবেন।

৮। অমনোনীত প্রবন্ধাদি ফেরত দেওয়া হয় না।

৯। উত্তরপ্রার্থীগণ রিপ্লাই কার্ড বা ডাক টিকেট পাঠাইয়া দিবেন। বেয়ারিং বা ইন্সাফিসেন্ট পত্র লওয়া হয় না।

১০। "কৃষি-সম্পদ" সম্বন্ধীয় সমস্ত চিঠি-পত্র, প্রবন্ধ বিনিময়ের সংবাদ-পত্র, টাকা-কড়ি, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি "কৃষি-সম্পদ" পত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত ঘোষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

"কৃষি-সম্পদ" আফিস। } কার্য্যাধ্যক্ষ।
ঢাকা।

বিজ্ঞাপনের হার।

১। "কৃষি-সম্পদে" বিজ্ঞাপন দিতে হইলে, মাসের প্রথমভাগে বিজ্ঞাপন পাঠাইতে হইবে।

২। বিজ্ঞাপনের হার সুলভ। মাসিক প্রতি পৃষ্ঠা ৬৲ টাকা; প্রতি কলম ৪৲ টাকা। অনেক দিনের জন্ত চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

৩। চুক্তির হিসাবে অর্দ্ধ এবং সিকি কলম বিজ্ঞাপন লওয়া যায়।

৪। কাভারিংএর তৃতীয় এবং চতুর্থ পৃষ্ঠায়ও বিজ্ঞাপন গৃহীত হইবে। তৃতীয় পৃষ্ঠায় মাসিক ১০৲ এবং চতুর্থ পৃষ্ঠায় ১২৲ টাকা দেয়। বাৎসরিক চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

অন্নং বহু কুর্বীত ॥ তদ্‌ব্রতম্‌ ॥

তৈত্তিরীয়োপনিষদি ভৃগুবল্লী।

সূচী।

[লেখকদিগের মতামতের জন্ত সম্পাদক দায়ী নহেন।]

বিষয়	পত্রাঙ্ক
কৃষি-প্রসঙ্গ … … … … …	২২৫
কচুর চাষ … … … … …	২৩৩
—শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র গুহ এফ্, আর, এইচ্, এস্	
দমবায় পদ্ধতিতে ইক্ষু-চাষ … …	২৩৩
—কুমার জগদিন্দ্র দেব রায়কত	
বঙ্গের গোধন (পূর্ব্বানুবৃত্তি) … …	২৩৬

আত্ম-নিবেদন—মাঘ ও ফাল্গুনের যুগ্মসংখ্যা যন্ত্রস্থ; শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। চট্টগ্রাম জিলার যে সকল পাইমারী স্কুলের হেড্ পণ্ডিত মহাশয়দিগের নিকট "কৃষি-সম্পদ" প্রেরিত হয়, তাঁহাদিগের নিকট প্রাপ্তিস্বীকার পত্র (ছাপান কার্ড) পাঠাইয়া দিয়াও আমরা সকলের নিকট হইতে উত্তর পাইতেছি না। এই জন্ত মাঘ ও ফাল্গুনের সংখ্যায়ও তাঁহাদের সকলেরই নিকট পুনর্ব্বার ছাপান কার্ড প্রেরিত হইবে। আশা করি, এবার কার্ডখানি হস্তগত হইবা মাত্রই, তাঁহারা কার্ডের চিহ্নিত স্থানগুলি পূরণ করিয়া আমাদের নিকট ফেরত পাঠাইয়া দিবেন।

কৃষি-প্রসঙ্গ।

ধান্য ও পাটের সার পরীক্ষা—বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগের কর্ম্মচারীগণের তত্ত্বাবধানে, বিগত ১৯১৫ খৃঃ অব্দে, প্রেসিডেন্সী-বিভাগের কতিপয় স্থলে, ধান্ত ও পাটের জমিতে খৈল, ধৈঞ্চা এবং হাড়ের গুঁড়া সাররূপে ব্যবহার করিয়া, ধান্ত ও পাটের ফলনবৃদ্ধি পরীক্ষা করা হইয়াছিল। পরীক্ষার ফল নিম্নে প্রদত্ত হইল।

নদীয়া ও চব্বিশ-পরগণা জিলার দ্বাদশস্থলে, আশুধান্তের জমিতে খৈলসার ব্যবহারে ধান্তের ফলন বৃদ্ধি হইয়াছে। প্রত্যেক বিঘায় ১/০ মণ হিসাবে খৈলসার ব্যবহার করিয়া, ১/০ মণ হইতে ৫।০ মণ পর্য্যন্ত অধিক ধান্ত পাওয়া গিয়াছে। একমণ খৈলের মূল্য ২৷৷০ টাকা মাত্র। আমন-ধান্তের জমিতে ধৈঞ্চাসার ব্যবহার করাতে ধান্তের ফলন ১/০ মণ হইতে ৩/০ মণ পর্য্যন্ত অধিক হইয়াছে। আটটি স্থলে ধৈঞ্চাসার-পরীক্ষা করা হইয়াছিল। ঐ সকল স্থলেই ফলন বাড়িয়াছে। তদ্ভিন্ন, কুড়ি কিত্তা জমিতে হাড়ের গুঁড়া সাররূপে ব্যবহার করিয়াও সুফল পাওয়া গিয়াছিল।

উহাতে ধান্যের ফলন বিঘাপ্রতি ১৴৹ মণ হইতে ৪৴৹ মণ পর্য্যন্ত অধিক হইয়াছে। হাড়ের গুঁড়ার সার দিতে প্রতি বিঘায় ২৷৹ টাকা খরচ পড়ে।

প্রেসিডেন্সি-বিভাগে যাহারা পাটের চাষ করে, তাহাদের অনেকেই জমিতে কোনরূপ সার ব্যবহার করে না। কেহ কেহ বিঘাপ্রতি ২০৴৹ হইতে ৩০৴৹ মণ গোময়-সার দিয়া থাকে। এই বিভাগের এগারস্থলে, বিঘাপ্রতি ২৴৹ মণ হিসাবে খৈলসার ব্যবহার করাতে, উৎপন্নের পরিমাণ ১৴৹ মণ হইতে ৩৸৹ মণ পর্য্যন্ত অধিক হইয়াছে।

জাপানের রেসম—জাপানের ১২৫টি বিদ্যালয়ে রেসম-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়। তদ্ভিন্ন, কএকটি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে রেসমকীটসম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান ও পরীক্ষা করা হয়। বহুসংখ্যক রেসম-বিজ্ঞানাভিজ্ঞব্যক্তি গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া রেসমকীটসম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়া থাকেন; এবং পরীক্ষাগারের ফল সাধারণের নিকট প্রচার করেন। জাপানের প্রত্যেক জেলার কৃষি-প্রদর্শনীতে রেসমকীট-পালনকারীদিগকে পারিতোষিক দিয়া, রেসম-চাষে তাহাদিগকে উৎসাহিত করা হয়। জাপ-গভর্ণমেণ্ট রেসমকীট-পালনকারীদিগকে অগ্রিম টাকা দাদন দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন, রেসমকীটের ডিম্বোৎপাদন সম্বন্ধে কএকটী আইন বিধিবদ্ধ করাতে, অধুনা জাপানে যথেষ্ট পরিমাণে নীরোগ ডিম পাওয়া যায়। জাপানের ১৭৩টি পরীক্ষাগারে নীরোগ ডিম পরীক্ষিত হইয়া থাকে। ইয়োকোহামাতে একটি 'Silk conditioning house' প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে, জাপানের নিকৃষ্ট রেসমের বিদেশে রপ্তানী বন্ধ হইয়াছে। ফলে, রেসমের উৎকর্ষ সাধনে সকলেরই বিশেষ দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। রেসমসম্বন্ধে ১৭৩টি পল্লী-সমিতি, ৪টি রেসম-সম্মিলনী এবং ২৪৪২টি সমবায়-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে, জাপানে রেসমসম্বন্ধে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। ক্রমোন্নতি সাধনের ফলে, জাপানের রেসম জগদ্বিখ্যাত হইয়া পড়িয়াছে।

আম ও কাঠাল গাছ রোপণের দূরত্ব—আম ও কাঠাল গাছ কত হাত ব্যবধানে রোপণ করা কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে বিস্তর মতভেদ রহিয়াছে। কৃষিতত্ত্বে পারদর্শিনী বিদুষী খনার মতে,—

"হাত বিশ করি ফাঁক।
আম কাঠাল পুতে রাখ॥
গাছ গাছালি ঘন সবে না।
গাছ হবে তার ফল হবে না॥"

আম ও কাঠাল গাছ কুড়ি হাত ব্যবধানে রোপণ করিতে হয়। তদপেক্ষা ঘন হইলে, গাছে অত্যল্পসংখ্যক ফল জন্মে। বলা বাহুল্য, আঁঠির চারাগাছ রোপণের দূরত্ব সম্বন্ধেই খনা স্বকীয় অভিমত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীনকালে খনার মতানুযায়ী আম ও কাঠাল গাছ রোপিত হইত; কিন্তু বর্ত্তমানসময়ে, এ দেশের সর্ব্বত্রই খনার মত উপেক্ষিত হইতেছে। কুড়িহাত দূরে থাকুক, এ দেশের অনেকস্থলে ১০।১৫ হাত ব্যবধানেও আম ও কাঠালের বীজোৎপন্ন চারাগাছ রোপিত হয় না। ফলে, এক্ষণ আর পূর্ব্বের ন্যায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আম-কাঠাল গাছও দৃষ্ট হয় না, এবং কোনও গাছেই অপর্য্যাপ্ত পরিমাণ ফলও জন্মে না।

একশত বা ততোধিক বৎসরের একটি প্রাচীন আমগাছ যে পরিমাণ স্থান ব্যাপিয়া রহে, সেই পরিমিত স্থান ব্যবধানেই আমগাছ রোপণ করা কর্ত্তব্য। তবে কাঠালগাছ তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ অল্প ব্যবধানে রোপণ করিলেও ক্ষতি হয় না। আমাদের বাড়ীর পূর্ব্বদিকে, ক্ষুদ্র মাঠের একপার্শ্বে, আমাদের একটী আমগাছ ছিল। দশ বৎসর পূর্ব্বে, ভীষণ ঝড়ে গাছটি ভূমিশায়ী হওয়াতে, উহা আমরা প্রায় একশত টাকায় বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছি। ঐ গাছটি উন্মুক্ত স্থানে ছিল বলিয়া, উহার শাখা-প্রশাখা স্বাধীনভাবে চতুর্দ্দিকে প্রায় ৬০ হাত স্থান ব্যাপিয়া বিস্তৃত হইয়াছিল। আমগাছটি দূর হইতে দেখিলে, একটি প্রকাণ্ড বটগাছ বলিয়াই ভ্রান্তি জন্মিত। উক্ত গাছটির বয়ঃক্রম প্রায় দেড়শত বৎসর হইয়াছিল; এবং উহাতে প্রতিবৎসরই অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে আম্র জন্মিত। আমি এত বড় প্রকাণ্ড আমগাছ আর কোনও স্থানেই দর্শন করি নাই; এবং তত অধিকসংখ্যক

আমের ফলনও কোন গাছে দেখি নাই। উক্ত গাছটিতে যে বৎসর ফলন কম হইত, সে বৎসরও ঐ গাছ হইতে আমরা আমাদের আমের বাগানের ২৫।৩০টি সুফলা গাছের আম্র অপেক্ষা অধিকসংখ্যক আম্র প্রাপ্ত হইতাম। উন্মুক্তস্থানের রোপিতগাছে যে কিরূপ অত্যধিকপরিমাণে সুফললাভ করা যায়, তাহা উক্ত গাছটির ফলন সন্দর্শন করিয়াই আমি শিক্ষা লাভ করিয়াছি। আম ও কাঠাল গাছ অন্ততঃ ত্রিশহাত ব্যবধানে রোপণ করা কর্ত্তব্য;—ইহাই আমার ব্যক্তিগত অভিমত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ দেশের কোনও কৃষিতত্ত্ববিদ্‌ই আমার মতের সমর্থন করেন না; এবং যাঁহারা বৈজ্ঞানিক চাষ-বাসপ্রণালী শিক্ষালাভ করিয়াছেন, তাঁহারাও এত অধিক ব্যবধানে গাছ রোপণ করিবার পক্ষপাতী নহেন।

আফ্রিকার টাঙ্গা হইতে জনৈক আফ্রিকা-প্রবাসী সুবিখ্যাত "নব্যভারত" পত্রিকাতে 'লড়া'য়ের মুখে' নামক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন; তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—

"ভগবৎ কৃপায় এখন প্রকৃতই আমরা টাঙ্গায় অসিয়া বসিয়াছি। • মোম্বাসা ও দারেস-সালেমের মধ্যবর্ত্তী ভারত-মহাসাগরের এক খাড়ির (Creek এর) কূলে এই ক্ষুদ্র সহর অবস্থিত। • টাঙ্গা এতদিন জার্ম্মাণ-উপনিবেশভুক্ত একটি বন্দর ছিল, এখন উহা ব্রিটিশ-করতলগত। এখানকার জলবায়ু আমাদের দেশের বোম্বাই বা মান্দ্রাজের ন্যায় বোধ হয়। • • টাঙ্গায়—শুধু টাঙ্গায় কেন, 'German East Africa'র সমুদ্রতীরস্থ ভূভাগ মাত্রেই—বৎসরে দুইবার, ও প্রতিবারে দুইমাস ব্যাপী, বর্ষা হয়; বাকী আটমাস গ্রীষ্ম,—শীত আদৌ নাই। • • বাঙ্গালাদেশের যাবতীয় ফল এ দেশে জন্মে। আম, কাঠাল, লিচু, জামরুল, কলা, পেঁপে, লেবু, পিয়ারা, আনারস, নারিকেল প্রভৃতি সকল ফলই পাওয়া যায়। অধিকন্তু, দুইবার বর্ষার ফলে, যত্ন করিলে, অধিকাংশ ফলই বৎসরে দুইবার জন্মে। আম সাধারণতঃ দুইবার ফলিয়া থাকে; যত্ন করিলে, তিনবারও ফলে। একই বৃক্ষের কোনও শাখায় মুকুল, কোনটায় অপক্ক আম, আবার কোনটায় সুন্দর সুপক্ক ফল ঝুলিতেছে। আমাদের দেশে ক্বচিৎ কোন বাগানের দুই একটা গাছে এ দৃশ্য দেখা যায় বটে,—এখানে এই দৃশ্যই সাধারণ; ফলতঃ, এখানে জ্যৈষ্ঠ, অগ্রহায়ণ ও ফাল্গুন—বৎসরে এই তিনবার সুপক্ক আম্রের রসাস্বাদ পাওয়া যায়। জর্ম্মানেরাই অবশ্য এই সমস্ত আম্রকাননের স্রষ্টা। ইহাদিগের বৃক্ষ-রোপণ-পদ্ধতিতে একটু বিশেষত্ব আছে; এখানকার গাছ আমাদিগের দেশের গাছের মত ঘনভাবে বসান নহে;—এক একটী গাছের পরস্পর ব্যবধান ৬০ফুট বা ৪০ হস্ত। সে কারণ, একটি বৃহৎ বাগানের বৃক্ষসংখ্যা, হয়ত, দশটী মাত্র; কিন্তু সেই দশটী বৃক্ষে এত অধিক আম ফলে, আমাদের দেশের দশটা বাগানেও তাহা ফলে না। ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষের নিবিড়তা নিবন্ধন আমাদের দেশে ম্যালেরিয়ার সৃষ্টি হয়; গাছগুলিও সেই ম্যালেরিয়ার বিষাক্ত বাষ্প আকর্ষণ করিয়া জীর্ণ হইয়া পড়ায় আশানুরূপ ফলপ্রদান করিতে পারে না। আশা করি, অতঃপর আমাদিগের দেশস্থ বন্ধুগণ নূতন বাগান রচনাকালে এই ইঙ্গিত অগ্রাহ্য করিবেন না।"

প্রবন্ধের কিয়দংশ মাত্র উদ্ধৃত করা হইল। এতৎ পাঠেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, বৈজ্ঞানিক-প্রণালী অবলম্বনে আমের বাগান প্রস্তুত করিতে হইলে, ৪০ হস্ত ব্যবধানেই আমগাছ রোপণ করিতে হয়। ইহাতে প্রতিবিঘায় নয়টির অধিক গাছ বসান যায় না সত্য, কিন্তু নয়টি গাছে যে পরিমাণে ফলন হয়, ঘনসন্নিবিষ্ট ১৫।২০টি বা ততোধিক গাছে তাহার অর্দ্ধেক ফলও যে লাভ করা যায় না, তাহা সুনিশ্চিত। ঘনসন্নিবিষ্ট গাছগুলি সুপুষ্ট, তেজাল ও বিস্তৃতাকারে বর্দ্ধিত হয় না। স্বাধীনভাবে শাখা-প্রশাখার বিস্তার করিতে পারে না বলিয়াই, ঘনরোপিত গাছগুলি লম্বা, শীর্ণ ও অল্পশাখ হইয়া থাকে। সুতরাং, ঐ সকল গাছে যে ফলের সংখ্যা অধিক হইতে পারে না, তাহা সহজেই অনুমেয়। ঘনরোপিত গাছের গোড়ার চতুষ্পার্শ্বে অবাধে আলো, বায়ু ও রৌদ্র প্রবেশ করিতে পারে না বলিয়া, গাছ যে কেবল নিস্তেজ হইয়া পড়ে, তাহা নহে; ঐ সকল গাছে নানাপ্রকার কীটেরও উপদ্রব ঘটিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন, অধিকসংখ্যক গাছ হইলে, উহাদের যথোচিত যত্ন ও তদ্বির করিতেও পারা যায়

না। এই সকল কারণেই ঘনসন্নিবিষ্ট অধিকসংখ্যক গাছ হইতেও সুফললাভ করা সম্ভবপর নহে।

নাইট্রোজেন ও কৃষি- নানাবিধ কারণের উপর জীব ও উদ্ভিদের নিরবচ্ছিন্ন বৃদ্ধি নির্ভর করে। কিন্তু তাহাদের পুষ্টির প্রধান উপাদান নাইট্রোজেন। এই নাইট্রোজেন বিশুদ্ধ অবস্থায় গৃহীত হয় না। ইহার রাসায়নিক পরিবর্তন সাধিত হইয়া জীব বা উদ্ভিদের উপযোগী হইলে, তবে তাহা গৃহীত হইয়া থাকে। নাইট্রোজেন কৃষিকার্য্যের জন্য কিরূপ প্রয়োজনীয়, তাহা কোনও দেশের কৃষকেই ভাল করিয়া অনুধাবন করে না।

প্রায় শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন যে, সমগ্র বায়ুমণ্ডলের ৪ ভাগের প্রায় ৩ ভাগ নাইট্রোজেন। কিন্তু নাইট্রোজেন অতি অদ্ভুত প্রকৃতির বায়বীয় পদার্থ। ইহার যেন সজীবতা নাই। জাড্যতা-দোষের জন্য ইহা কাহারও সহিত সহসা মিলিতে চাহে না। আবার যদিও কোনরূপে মিলিত হয়, তাহা হইলে সামান্য কারণেই তৎক্ষণাৎ বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়।

বৃক্ষের পুষ্টির জন্য বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেন রহিয়াছে; তথাপি নাইট্রোজেন অভাবে বৃক্ষ সেরূপ ফলপ্রসূ হয় না। ইহার কারণ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, সাধারণ নাইট্রোজেন প্রাণ-বিশিষ্ট পদার্থের দ্বারা গৃহীত হয় না; ইহার রাসায়নিক পরিবর্ত্তন আবশ্যক। কৃষকগণ নানারূপে বৃক্ষের খাদ্য-উপযোগী নাইট্রোজেন-ঘটিত পদার্থ পাইয়া থাকে; কিন্তু অনবধানতাবশতঃ, তাহারা প্রায়ই ঐ সমস্ত পদার্থ অকারণে নষ্ট করিয়া ফেলে।

অনেক উদ্ভিজ্জ-খাদ্যে নাইট্রোজেন থাকে। এই খাদ্য জীবজন্তু গ্রহণ করিলে, তাহাদের পাকস্থলীতে গৃহীত সমস্ত খাদ্যের নানাবিধ পরিবর্ত্তন সাধিত হয়; এবং উদ্ভিজ্জ নাইট্রোজেন-ঘটিত পদার্থ জান্তব-নাট্রোজেন-ঘটিত পদার্থে পরিণত হয়। জন্তুর শরীর প্রতিনিয়তই ক্ষয়িত ও পুনর্গঠিত হইতেছে। এই ক্ষয়িত পদার্থ জন্তুশরীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আইসে। জন্তুর শরীর-গঠনে যদি নাইট্রোজেনের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে সেই পদার্থ ক্ষয়িত হইয়া নিষ্ক্রান্ত হইবার সময় অবশ্যই জান্তব-নাইট্রোজেন-সহ বাহির হইয়া আইসে। এই নিষ্ক্রান্ত পরিত্যক্ত জান্তব নাইট্রোজেন-ঘটিত পদার্থের নাম ইউরিয়া; অর্থাৎ জীব-জন্তুর শরীর হইতে নাইট্রোজেন ইউরিয়া আকারে বহির্গত হইয়া আইসে।

এই ইউরিয়া বৈজ্ঞানিকগণের পক্ষে বিশেষ বিস্ময়কর বস্তু। কিন্তু সে বিষয়ে আমাদের আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। এই ইউরিয়া কৃষকগণের নিকট মহামূল্য পদার্থ। কেননা, ইহাতে নাইট্রোজেন রহিয়াছে। এক জাতীয় ব্যাক্‌টিরিয়া বা উদ্ভিদবীজাণু ইউরিয়াকে অতি শীঘ্র গাজাইয়া তোলে। এইরূপে গাজিয়া উঠিলে, ইহা আমোনিয়ামে পরিণত হয়। এইরূপে গবাদি পশুর মলমূত্রে ক্ষেত্রের প্রয়োজনীয় সারের উৎকৃষ্ট অংশ নষ্ট হইয়া যায়। যে স্থানে গোবর, গোমূত্র বা অশ্ববিষ্ঠা, অথবা মানবের মল-মূত্রাদি পচিয়া উঠে, সেই স্থান হইতেই আমোনিয়ার তীব্র গন্ধ উত্থিত হয়। ইহার কারণ এই যে, জীবদেহনিষ্ক্রান্ত ইউরিয়া গাজিয়া আমোনিয়া-রূপে পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। আমোনিয়া অতিশয় উদ্বায়ীপদার্থ। কাজেই, যেমনই ইউরিয়া আমোনিয়ায় পরিণত হয়, আমোনিয়া তৎক্ষণাৎ বায়ুমণ্ডলে উড়িয়া যায়। কোন কোন নাইট্রিফাইং ব্যাকটিরিয়া, বায়ু চলাচল পথ মুক্ত থাকিলে, আলোক একবারে না থাকিলে এবং কিয়ৎপরিমাণে ক্ষারধর্ম্মবিশিষ্ট পদার্থ বর্ত্তমান থাকিলে, আমোনিয়াকে নাইট্রাস্-দ্রাবকে পরিবর্ত্তিত করিতে পারে; এবং চূণ ইত্যাদি বর্ত্তমান থাকলে নাইট্রাইট-লবণ উৎপাদন করে।

অতএব যদি কৃষকগণ সময়মত গোবরাদি সারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, যাহাতে সারের নাইট্রোজেন নষ্ট হইয়া না যায় তাহার ব্যবস্থা করিয়া, অবশেষে উহাকে ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে, তাহা হইলে সারের নাইট্রোজেন আমোনিয়া-আকারে নষ্ট না হইয়া, উক্ত আমোনিয়া নাইট্রাইট-লবণে পরিণত হইতে পারে। এই নাইট্রাইট উদ্ভিদের পুষ্টিসাধক নহে। ইহা অন্য একজাতীয় ব্যাকটিরিয়া দ্বারা ক্ষেত্রেই নাইট্রেট-লবণে পরিবর্ত্তিত হয়। এই নাইট্রেট-লবণ উদ্ভিদাদি পুষ্টি সাধনের জন্য গ্রহণ করিয়া থাকে। অবশ্য নাইট্রাইট

নাইট্রেটে পরিবর্ত্তিত হইবার সময় ক্ষেত্রের অবস্থা ঐরূপ পরিবর্ত্তনের উপযোগী হওয়া আবশ্যক। যদি ভূমি জল-পূর্ণ থাকে বা পচা কর্দ্দমপূর্ণ থাকে বা অকর্ষিত অবস্থায় পতিত থাকে, তাহা হইলে নাইট্রাইট নাইট্রেটে পরিবর্ত্তিত হয় না। অধিকন্তু, অন্য একজাতীয় ব্যাকটিরিয়া তৎক্ষণাৎ নাইট্রাইট নষ্ট করিয়া ফেলে।

উদ্ভিজ্জ নাইট্রোজেন নাইট্রাইট, এবং অতঃপর নাইট্রেটে পরিবর্ত্তিত হইবার জন্য জান্তব সহায়তার অপেক্ষা করে না। যে সকল উদ্ভিদে নাইট্রোজেন রহিয়াছে, তাহা যখন গলিত হইতে থাকে, সেই সময়ের পারিপার্শ্বিক অবস্থা উপযুক্ত হইলে, নাইট্রিফাইং ব্যাকটিরিয়া উদ্ভিজ্জ-নাইট্রোজেনকেই প্রথমে নাইট্রাইট এবং পরে নাইট্রেটে পরিবর্ত্তিত করিতে পারে। আবার যে সমস্ত উদ্ভিদে নাইট্রোজেন থাকে, সেই সমস্ত উদ্ভিদ দগ্ধ হইবার সময় বায়ুমণ্ডলে যে নাইট্রোজেন প্রস্থান করে, সেই নাইট্রোজেন কয়েকজাতীয় উদ্ভিদ গ্রহণ করিয়া নাইট্রিফাইং ব্যাকটিরিয়া সহিত একযোগে কার্য্য করিয়া নিজের পুষ্টিসাধনের উপযোগী করিয়া লইতে পারে। এই সমস্ত উদ্ভিদের মধ্যে যে সমস্ত উদ্ভিদের শুঁটীফল ধরে, সেই সমস্ত উদ্ভিদই প্রধান। মটর, অড়হর, ইত্যাদি এই শ্রেণীর গাছ।

উদ্ভিজ্জপদার্থ দগ্ধ করিলে, উদ্ভিদের নাইট্রোজেন বায়ু-মণ্ডলে প্রস্থান করে। এইরূপ জন্তুর মলমূত্রাদি দগ্ধ করিলেও নাইট্রোজেন বায়ুমণ্ডলে চলিয়া যায়। আমাদের দেশে পিষ্টক-আকারে গোবর, অশ্ব, মহিষও ছাগাদির মল-মূত্রাদি ইন্ধনস্বরূপ ব্যবহৃত হয়। ইহাতে কৃষির যথেষ্ট ক্ষতি হইয়া থাকে। ইন্ধনের জন্য অন্য নানাবিধ পদার্থ অনায়াসে ব্যবহার করা যাইতে পারে; কিন্তু গোশালার আবর্জ্জনা এই কার্য্যের জন্য ব্যবহার করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। ইহার ন্যায় উৎকৃষ্ট সার অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত, আমরা যে উপায়ে গোবরাদি সঞ্চিত করি, তাহাতে ইহার সারের উপযোগী উৎকৃষ্ট অংশ অর্থাৎ নাইট্রোজেন আমোনিয়া-আকারে বৃথা নষ্ট হইয়া যায়। উন্মুক্ত বাতাসে গোবরাদি পচাইয়া তুলিলে, তাহার নাইট্রোজেন অতি অল্পসময়ের মধ্যেই নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু চূণ ইত্যাদি চাপা দিলে, অপেক্ষাকৃত অন্ধকার স্থানে স্তূপীকৃত করিলে, অথচ বায়ু চলাচলপথ সম্পূর্ণ উন্মুক্ত রাখিলে, জান্তব-নাইট্রোজেন অনায়াসে নাইট্রাইটে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, কয়েকজাতীয় উদ্ভিদ বায়ু-মণ্ডলের নাইট্রোজেনকে গ্রহণ করিয়া নিজের পুষ্টিসাধনের উপযোগী করিতে পারে। এই সমস্ত বৃক্ষ নাইট্রোজেনকে নিজ দেহে, উদ্ভিদের পুষ্টির উপযোগী করিয়া, রক্ষা করে। অতএব যদি কোন কৃষক তাহার কোন পতিত জমি উর্ব্বর করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে যাহাতে ক্ষেত্রে প্রথমে শুঁটিফলধারী বৃক্ষ উৎপাদিত হয়, কৃষকের তাহা করিবার চেষ্টা করা উচিত। আমাদেরই দেশের একজন ব্রাহ্মণ-কৃষক ক্ষেত্রের চতুষ্পার্শ্বে অড়হর বৃক্ষ উৎপাদন করিয়া, সময় মত অড়হর-কলাই সংগ্রহ করেন; অবশেষে ঐ বৃক্ষগুলিকে জমিতে পচাইয়া ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা-শক্তি এত বৃদ্ধি করিয়া তোলেন যে, অন্য কোনও মূল্যবান শস্যের জন্য সেই ক্ষেত্রে তাঁহাকে আদৌ সার প্রয়োগ করিতে হয় না। প্রাকৃতিক উপায়েও বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেনের পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। যে সময় ঝঞ্ঝাবাত ও বিদ্যুৎ চকিত হইতে থাকে, সেই সময়ে তড়িৎ-শক্তিতে বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন নাইট্রিক-দ্রাবকে পরিণত হয়। এই নাইট্রিক দ্রাবক ধৌত হইয়া আসিয়া পৃথিবীতে পতিত হয়। নাইট্রিক-দ্রাবক ধাতব-পদার্থের সহিত মিলিত হইয়াই নাইট্রেট উৎপাদন করে। এই নাইট্রেট উদ্ভিদের পুষ্টির উপযোগী হইয়া থাকে। অতএব স্বভাবতঃ দুইটি উপায়ে বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন উদ্ভিদের পুষ্টির উপযোগী হয়;—বিদ্যুৎশক্তির প্রভাবে এবং শুঁটিধারী বৃক্ষের কর্ম্ম-কারিতায়। কিন্তু বৃক্ষাদি হইতে নানাবিধ কারণে যে পরিমাণ নাইট্রোজেন বায়ুমণ্ডলে প্রস্থান করে, তাহার সমস্তই উক্ত দুই উপায়ে পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করে কিনা, তাহা বিষম সন্দেহের স্থল। যাহাই হউক, বর্ত্তমানকালে সমগ্র মানব চিলি-প্রদেশের খনিজ নাইট্রেট লইয়াই কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু সময়ে চিলির নাইট্রেট নিঃশেষ হইবে; তখন যে কি অবস্থা ঘটিবে, তাহা বৈজ্ঞানিকগণের নিতান্তই চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। অধিকন্তু, যাকবাদি

রণসম্ভার উৎপাদনে এত অধিক নাইট্রেট প্রয়োজন হয় যে, নাইট্রেটের মূল্য তজ্জন্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। এত অধিক মূল্য দিয়া কৃষকগণ কখনই নাইট্রেট ক্রয় করিতে সক্ষম হইতে পারে না। তবে যে সমস্ত স্থলে সামান্য পরিমাণ জমিতে প্রচুর শস্যোৎপাদন আবশ্যক, সেই সকল স্থলে, বহুমূল্য দিয়াও কৃষকগণ সারের জন্য নাইট্রেট ক্রয় করিয়া থাকেন।

রাসায়নিক পণ্ডিতগণ বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেনকে সারে পরিণত করিবার জন্য নানা উপায়ে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু প্রথমেই উক্ত হইয়াছে যে, নাইট্রোজেনের মিলিত হইবার শক্তি অতি অল্প। কাজেই, নাইট্রোজেনকে সারে পরিণত করিবার কোনও সহজ উপায় আজ পর্যন্তও আবিষ্কৃত হইতেছে না। তবে বৈজ্ঞানিকগণ যেরূপ শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতেছেন, তাহাতে এরূপ বিশ্বাস হয় যে, অতি অল্প কালের মধ্যেই স্বাভাবিক নাইট্রোজেনকে নাইট্রেটে পরিণত করিবার কোনও সহজ উপায় আবিষ্কৃত হইবে; এবং ভবিষ্যতে পৃথিবীতে যে নাইট্রেটের বিশেষ অভাব ঘটিবার সম্ভাবনা আছে, তাহা কখনই সম্ভাবিত হইবে না। ইতিমধ্যেই, তড়িৎ-প্রয়োগে, বৈজ্ঞানিকগণ বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন লইয়া ক্যাল্সিয়াম নাইট্রেট এবং সায়ানামাইড উৎপাদন করিয়াছেন; এবং ফলও বিশেষ আশাপ্রদ হইয়াছে।

গোবরাদি অতরল (solid) জান্তবপদার্থ অপেক্ষা, মূত্রাদি তরল জান্তবপদার্থ উৎকৃষ্টতর সার। কেননা ইহাতেই অধিক নাইট্রোজেন-ঘটিত পদার্থ থাকে। অতএব যাহাতে গবাদির মূত্র নষ্ট হইয়া না যায়, তৎপ্রতি লক্ষ রাখা প্রত্যেক কৃষকেরই কর্ত্তব্য। যদি তৎক্ষণাৎ ঐ সমস্ত তরল সারের ক্ষেত্রে প্রয়োগ সুবিধাজনক না হয়, তাহা হইলে মূত্রাদি কোন একটা আধারে সঞ্চিত করিয়া রাখা আবশ্যক। যদি মূত্রাদি পতিত হইবার পরই ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে উহাতে সমপরিমাণ জল এবং অল্পপরিমাণ সুপারফস্ফেট্ (অস্থিসার) মিশ্রিত করিয়াই ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা উচিত। উদ্ভিদভোজী জীবের মূত্রে অতি অল্পপরিমাণ ফস্ফেট্ থাকে বলিয়া, ইহাতে অল্প ফস্ফেট্ মিশাইয়া দেওয়ায় উপকার হইয়া থাকে। গোবরাদি যে স্থানে পচিতে থাকে, সেই স্থানে মূত্রাদি নিক্ষেপ করিলে বিশেষ ফল হয়। যাহা হউক, কৃষক ইচ্ছা করিলে, গবাদির মলমূত্রকে বৃথা নষ্ট না করিয়া অতি উৎকৃষ্ট সারে পরিণত করিতে পারে। গোবরাদির উপর গোশালার তৃণাদি আবর্জ্জনা ও সামান্য জিপ্সাম বা ঐ জাতীয় চূর্ণ পদার্থ প্রয়োগ করিলে ফল ভালই হইয়া থাকে। এই সমস্ত সার গর্ত্তে সঞ্চিত করা আবশ্যক। কারণ, সমতল যায়গায় রাখিলে তত কার্য্যকর হয় না। যাহা হউক, যদি ক্ষেত্রস্বামী বুঝিতে পারেন যে, তাঁহার ক্ষেত্র অনুর্ব্বর হইয়া উঠিয়াছে, তাহা হইলে সুবিধা থাকিলে ক্ষেত্রে শুঁটিফলধারী গাছ প্রথমে উৎপাদন করিয়া, অবশেষে তাহাই ক্ষেত্রে পচাইয়া এবং সর্ব্বশেষে গোবরাদি সার প্রয়োগ করিয়া মূল্যবান শস্য উৎপাদন করিতে পারেন (বিজ্ঞান)।

রুই, কাত্‌লা প্রভৃতি মাছের খাদ্য—অনেকেরই বিশ্বাস যে, রুই, কাতলা প্রভৃতি মাছ মাটি, পাঁক ও জলজ পচাগাছ বা গাছের পাতা ভক্ষণ করিয়াই জীবনধারণ করে। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণরূপেই মিথ্যা। এই জাতীয় মাছ মাটি, পাঁক, পচাগাছ প্রভৃতি ভক্ষণ করা দূরে থাকুক, যে সকল স্থানে এই সকল পদার্থ অধিক পরিমাণে রহে, সে স্থানের নিকটেও যায় না। তবে উদ্ভিজ্জ-খাদ্য এই সকল মাছে যে একেবারেই খায় না, এ কথা বলা যাইতে পারে না। যদি ভাল খাদ্যের অভাব হয়, তবে কখনও কখনও রুহিতাদি মাছ জলের উপর ভাসমান ঘাসের কচিপাতা খাইয়া থাকে। কিন্তু এ খাদ্য উহার প্রাণধারণের পক্ষে অতি অল্পমাত্রই সাহায্য করে। এই জাতীয় মাছ প্রাণীজ-খাদ্যই অধিক পছন্দ করে; এবং তদ্রূপ খাদ্যেই উহাদের পুষ্টিসাধিত হয়। অনেক সময় রুহিতাদি মৎস্যের নাড়ী-ভূঁড়ির মধ্যে পাঁকমাটি দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়াই, অনেকে মনে করেন, উহারা মাটি খায়। ইহা কিন্তু সত্য নহে। মাছ যখন পুকুরের তল দেশ হইতে নিজের খাদ্য গলার ভিতর টানিয়া লয়, তখন পুকুরের তলদেশে যে নরম পাঁক রহে, তাহারই কিয়দংশ খাদ্যের

সহিত পেটের ভিতর চলিয়া যায়। এইরূপভাবে মাছের পেটে পাঁক প্রবেশ করিলে সে অশান্তি ভোগ করে; এবং ইহা মাছের পক্ষে অস্বাস্থ্যকর। তদ্ভিন্ন, পুকুরের তলদেশে অধিকপরিমাণে পাঁক রহিলে, (১) মাছের প্রধান খাদ্য জলজ-কীটাণুসমূহ দ্রুত পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে না, (২) পুকুরে ধাতুজপদার্থের রাসায়নিক পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে না, এবং (৩) মাছের স্বভাবজ খাদ্যের পরিমাণও বর্দ্ধিত হয় না;—প্রধানতঃ, এই তিনটি কারণেই, মাছের চাষ করিতে হইলে, পুকুরের পাঁক উঠাইয়া ফেলা উচিত।

রুহিতাদি মাছ জলজ-লতা-পাতা ভক্ষণ করে না বলিয়া, যে পুকুরে মাছের চাষ করিতে হইবে, সেই পুকুর একেবারে জলজলতাদি শূন্য করা উচিত নয়। তবে ইহাও দেখিতে হইবে যে, পুকুরের সমুদয় অংশই যেন দল-দামে ঢাকিয়া না যায়। কারণ, তাহা হইলে পুকুরের ভিতর আলো ও বায়ু প্রবেশ করিতে পারিবে না। যে সকল জলজলতাদি অত্যধিক সতেজে বর্দ্ধিত হয়, সেগুলি পুকুর হইতে উঠাইয়া ফেলা ভাল। কারণ, উহারা পচিয়া পাঁকের পরিমাণ বৃদ্ধি করে; এবং তন্মধ্যে পোনামাছ একবার প্রবেশ করিলে বাহির হইতে না পারিয়া মরিয়া যায়। পুকুরের চারিপার্শ্বে কিছু কিছু জলজগাছ রাখা যাইতে পারে। ইচাদলাদির মত যে সকল গাছ জলের ভিতর হইতে উপরে উঠে না, ইহারাই বিশেষ উপকারী। এই সকল স্থানে নানাপ্রকার কীটাদি ডিম্বপ্রসব করে; এবং ঐ সকল ডিম্বই মাছের উৎকৃষ্ট খাদ্য। সূতার মত সরু কীট খাইতেও রোহিতাদি মাছেরা বড় ভালবাসে। জলজ অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটই ইহাদের প্রধান খাদ্য। রোহিতজাতীয় মাছ কোনও কঠিন দ্রব্য চর্ব্বণ করিয়া খাইতে পারে না। নরমদেহবিশিষ্ট ছোট ছোট কীট বা তদ্রূপ পদার্থ মুখের ভিতর লইয়া, উহা কণ্ঠ-নালীর অভ্যন্তরস্থ দাঁত দ্বারা ছেদন করে, এবং তৎক্ষণাৎ গলাধঃকরণ করিয়া ফেলে। যে সকল অতি ক্ষুদ্রজাতীয় কীটের দেহ কঠিন আবরণে আচ্ছাদিত, সেগুলিকে ইহারা সহজে আহার করিতে পারে না। তবে যদি মুখের ভিতর লইয়া, মুখের চাপে উহাদের দেহের কঠিন আবরণ ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারে, তবে তৎক্ষণাৎ তাহা আহার করিয়া ফেলে।

পুকুরে ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন বা পাকঘরের আবর্জ্জনা ফেলিয়া দিলে যে, শিশুমাছের খাদ্যাভাব দূর করা হইল, তাহা নহে। তবে এই জাতীয় দ্রব্য জলে পড়িলে জলজ কীটাণুর পরিবর্দ্ধনে সহায়তা করে মাত্র। তাই বলিয়া মাছ যে ভাত খায় না বা তাহাতে বর্দ্ধিত হয় না, এ কথাও বলা যাইতে পারে না। কিন্তু অধিকমাত্রায় অস্বাস্থ্যকর পদার্থ পুকুরে ফেলিলে, তাহাতে জল যে দূষিত হইতে পারে, এ কথাও বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে। শামুক, গুগ্‌লি ও ঝিনুক হইতে রোহিতাদি মাছেরা যথেষ্ট আহার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জলাশয়মাত্রেই ছোট চিংড়ীমাছের অনুরূপ একপ্রকার অতি ক্ষুদ্র প্রাণী রহে। একমাত্র অনুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যেই উহাদের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এই প্রাণিদিগের অত্যধিক পরিমাণে বংশবৃদ্ধি ঘটে; এবং ইহারা সারা বৎসর ধরিয়াই ডিম পাড়ে। রুই ও তজ্জাতীয় মাছ ঐ ছোট ছোট কীটাণুগুলি ভক্ষণ করিয়া তুষ্টি ও পুষ্টি লাভ করে।

অনেকসময় দেখা যায় যে, পুকুরের রুই, কাতল, প্রভৃতি মাছ যথোচিতরূপে বর্দ্ধিত হয় না। ইহার কারণ যাহাই থাকুক না কেন, সে পুকুরে যদি চূণ ছিটাইয়া দেওয়া যায়, তবে সুফললাভ সুনিশ্চিত। চূণ ছিটাইয়া দিলে মাছ সতেজে বর্দ্ধিত হয়; এবং উহার বর্ণেরও বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটে। কিন্তু অত্যধিক পরিমাণ চূণ দিলে যে পুকুরের মাছ মরিয়া যায়, ইহা স্মরণ রাখিয়াই কার্য্য করিতে হইবে। মাছের পুষ্টিবৃদ্ধির জন্য উহার খাদ্যে যৎকিঞ্চিৎ চূণের অংশ থাকা আবশ্যক। ইউরোপে নর্দ্দমার ময়লা বা আবর্জ্জনা দিয়া পুকুরে সার দেওয়া হয়। আমাদের দেশে ইহা ব্যবহার করা সম্ভবপর নহে। বিষ্ঠাও মাছের উৎকৃষ্ট খাদ্য; কিন্তু এ খাদ্য পানীয় জলে ব্যবহার করা যায় না। ফস্ফেট-মিশ্রিত পাথরের গুঁড়া পুকুরের স্থানে স্থানে ঢালিয়া দিলেও মাছ সতেজে বর্দ্ধিত হইতে পারে। মাছ ধরিবার জন্য যে সকল 'চার' ব্যবহার করা হয়, উহাও মাছের পক্ষে পুষ্টিকর খাদ্য।

কাঁঠাল—আপনারা সকলেই অনেক রকম ফুল দেখিয়াছেন,—যথা বেল, মল্লিকা, যুঁই, কৃষ্ণচূড়, গন্ধরাজ, করবী, দোপাটী, অপরাজিতা, জবা, গোলাপ, গাঁদা, বাবলা, ইত্যাদি। কিন্তু কাঁঠালের ফুল দেখিয়াছেন কি? অদ্য কাঁঠালের কথা আলোচনা করিব।

আপনারা বোধ হয় লক্ষ্য করিয়াছেন যে, যখন কোনও ফুল অস্ফুটন্ত অবস্থায় থাকে, তখন সবুজ রংয়ের একটা 'খাপ' দিয়া যেন ফুলটার আগাগোড়া মোড়া থাকে। ঐ খাপটাকে ইংরাজিতে কেলিক্স (Calyx) বলে; বাঙ্গালার উহার অর্থ বহির্দল। ফুল ফুটিবার সময় ঐ 'খাপটি' ফাটিয়া যায়; আর তাহার মধ্য হইতে নানা বর্ণের চাক্‌চিক্যময় ফুল বাহির হয়। ইহাই ফুল-ফোটার মোটামুটি ইতিহাস।

কাঁঠালের বিশেষ বিবরণ দিবার পূর্ব্বে, সাধারণ ফুলের পরিবারের ইতিহাসটা একবার সংক্ষেপে বলিয়া দেওয়া আবশ্যক। ফুলের দু'রকম জাতি আছে—'স্ত্রীজাতীয় ফুল' আর 'পুরুষজাতীয় ফুল'। স্ত্রীজাতীয় ফুলকে আমরা 'স্ত্রী-পুষ্প' এবং পুরুষ-ফুলকে 'পুং-পুষ্প' বলিব। বাঙ্গালা ভাষায় যাহাকে আমরা পরাগ বা পুষ্পরেণু বলি, তাহা পুং-পুষ্পেই জন্মে। ইংরাজীতে এই পরাগকে পোলেন (Pollen) বলে। স্ত্রী-পুষ্পের বিশেষত্ব এই যে, ইহার বীজাধার (Ovary) আর পরাগগ্রহণ-স্থান (Stigma) আছে; কিন্তু পরাগকোষ (Anther) নাই; সুতরাং পরাগও (Pollen) নাই। Ovary শব্দের প্রকৃত অর্থ বৃদ্ধির জরায়ু নয়, তথাপি উদ্ভিদ-বিদ্যাবিদ্ পণ্ডিতগণ জরায়ু শব্দ ovary অর্থেই ব্যবহার করেন। জরায়ু শব্দের অর্থ আপনারা নিশ্চয়ই জানেন; যাহার মধ্যে সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তাহাই জরায়ু। ফুলের জরায়ুর আকৃতি অধিকাংশ-স্থলেই ঠিক খাবার জল রাখিবার 'কুঁজোর' মত—তবে অত্যন্ত ছোট এই যা প্রভেদ। কুঁজোর অগ্রভাগটা যে রকম লম্বা আর ফাঁপা; ফুলের জরায়ুর অগ্রভাগটাও সেই রকম লম্বা আর প্রায়-ফাঁপা এবং ঐ লম্বা প্রায়-ফাঁপা অগ্রভাগের উৎপ্রান্তকেই Stigma বলে।

ফুলের যৌবনকাল আগত হইলে Stigmaর অগ্রভাগটী সরস হইয়া উঠে। মধুলুব্ধ ও রূপমুগ্ধ মধুমক্ষিকা বা অন্যান্য কীট-পতঙ্গ যখন পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে গমনাগমন করে, তখন তাহাদের অঙ্গলিপ্ত পুং-পুষ্পের পরাগ, পরিপুষ্ট স্ত্রী-পুষ্পের সরস Stigmaর উপর লিপ্ত হইয়া যায়। পরে, ঐ পরাগ নিজ দেহ বৃদ্ধি করিয়া, বর্দ্ধিত দেহভাগ সেখান হইতে Stigmaর ছিদ্রপথে Ovaryর মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেয়; এবং তথায়—(জরায়ুমধ্যে) পুষ্প-পরাগ ও বীজকোষ পরস্পর মিলিত হইয়া সন্তানরূপে পরিবর্ত্তিত হয়। ইহাই ফুলের সাধারণ এবং সংক্ষিপ্ত জীবনীকথা। এ ছাড়া, বায়ু-চালিত পরাগসহবাসে গর্ভধারণ কিম্বা একই ফুলজাত পরাগসহবাসে গর্ভধারণও ফুলের মধ্যে বিরল নয়।

এখন আলোচ্য বিষয় কাঁঠাল। Inflorescence অর্থাৎ পুষ্পগুচ্ছ যে কাহাকে বলে তাহা আপনাদিগকে পূর্ব্ব-প্রবন্ধে বলিয়াছি। 'ডুমুর ফল' যে 'পুষ্প' তা আপনারা জানিয়াছেন। কাঁঠালও প্রথমাবস্থায় একটা Inflorescence অর্থাৎ 'গুচ্ছপুষ্প'।

কেলিক্স (Calyx) কাহাকে বলে তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। Calyx পুষ্পের বহির্বারণ। প্রায় সকল ফুলই সবুজরংয়ের ঐ পুষ্পাবরণটীকে ছিন্ন করিয়া আপনাপন সৌন্দর্য্য-মণ্ডিত দেহ লইয়া বাহির হইয়া পড়ে; কিন্তু কাঁঠালের ভাগ্যে আর এ মুক্তিটুকু ঘটে না। Calyx এখানে কাঁঠালের অস্তিমদশা পর্য্যন্ত ছিন্ন হয় না। কাঁঠালের বহির্ভাগে কণ্টকাবৃত বর্শাসদৃশ যে অংশ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা "কাঁঠাল" নামক গুচ্ছপুষ্পের Calyx। অভ্যন্তরভাগে ভীমের গদার ন্যায় ক্ষুদ্র সংস্করণের ন্যায় যে দণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়, সেটা আমাদের পূর্ব্বপরিচিত 'গুচ্ছপুষ্পের কাণ্ডবৃত্ত' (Rachis)। কাঁঠালের ভিতর পাতার মত যে সব দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ফুলের পাপড়ি আর কাঁঠালের যে সমস্ত কোয়া (কোষ)—যেগুলিকে আমরা পরম পরিতোষসহকারে ভোজন করি—তাহা কাঁঠাল নামক গুচ্ছপুষ্পের জরায়ু। এই জরায়ুমধ্যে আমরা কাঁঠালের ভবিষ্যৎ বংশধরকে বীজরূপে দেখিতে পাই। কাঁঠালের গর্ভাধান মক্ষিকা দ্বারা হয় না—কাঁঠালের সহজাত পরাগ সহবাসে গর্ভাধান হয়।

কচুর চাষ।

[শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র গুহ এফ্, আর, এইচ্, এস্ লিখিত।]

কচু—Arum Colocasia.

N. O. Aroidæ.

কচু কথাটা শুনিতে শ্রুতিমধুর ও প্রীতিকর নহে। সাধারণতঃ, ইহা অবজ্ঞা ও তাচ্ছীল্য জ্ঞাপক। কেহ কোনও কার্য্যে বিফলমনোরথ বা অকৃতকার্য্য হইলে, 'কচুপোড়া খাও' বলিয়াই অন্যে তাহাকে উপহাস করিয়া থাকে। কচু যে কিরূপ নিকৃষ্ট খাদ্য, উহা বিরূপের ভাষাতেই সম্যক্ ব্যক্ত হইয়াছে। প্রায় সকল জাতীয় কচুই গলাধঃকরণ করিবার সময় অল্পাধিকপরিমাণে গলা চুলকায় বলিয়া, ইহা নিকৃষ্ট সব্জীমধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। কিন্তু তথাপি, অতি প্রাচীনকাল হইতেই এ দেশে তরকারীরূপে কচুর ব্যবহার-প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে। গোল আলুর প্রচলন হওয়ার পর হইতেই, যদিও বাবুদের আর কচু ভাল লাগে না—মুখে রোচে না সত্য, কিন্তু আমাদের দেশের গরিব লোকের নিকট আজিও উহার অনাদর হয় নাই। কচুর পাতা, ডাঁটা, মূল ও মূলজ-লতা এ দেশের গরিব লোকের প্রধান খাদ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বঙ্গের সর্ব্বত্রই তরকারীর অভাব ঘটিয়াছে; এবং ক্রমশঃই এই অভাব বাড়িতেছে। ফলে, এ দেশের সর্ব্বত্রই তরকারী দুর্মূল্য হইয়া পড়িয়াছে। এমতাবস্থায়, সুখাদ্য মূল্যবান তরকারী খরিদ করিয়া খাওয়া, এ দেশের গরিব লোকের পক্ষে সকলসময় সম্ভবপর নহে। সুতরাং তাহাদিগকে বাধ্য হইয়াই কচু খাইতে হয়। তাহারা কচুর কচিপাতা কলাপাতায় জড়াইয়া অগ্নিদগ্ধ করে; এবং তৎপর, উহাতে লবণ, তৈল, প্যাঁজ, রসুন ও লঙ্কা মাখিয়া তরকারীরূপে ব্যবহার করে। উহাই তাহাদের উপাদেয় খাদ্য!

কচুর ডাঁটার শাক নারিকেল বা মৎস্যমুণ্ড সংযোগে পাক করিলে, উহা অতি উপাদেয় সব্জী-খাদ্যরূপে পরিণত হয়। ঐ শাকের সহিত ভিজা ছোলা, কাঁচা কড়াইশুঁটী প্রভৃতি সংযোগ করিয়া রন্ধন করিলে, উহা আরও সুখাদ্য হয়। কচুর কাণ্ডভাজা রসনার তৃপ্তিকর সুখাদ্য। কচুর মূলজ মুখী ও 'লতা' অতিশয় সুস্বাদু সব্জী। কচুর মূল হইতে পদ্মের মৃণালসদৃশ একরূপ লতা বহির্গত হইয়া ভূমির উপরে বা কিঞ্চিৎ নিম্নে ছড়াইয়া যায়। উহাকেই কচুর লতা বা লত কহে। কচুরলত গরমজলে সিদ্ধ করিয়া লইয়া, উহা ব্যঞ্জনাদিতে ব্যবহার করা হয়। মোটকথা, কচুর কোনও অংশই অখাদ্য বা অব্যবহার্য্য নহে।

নানা জাতীয় কচু আছে। ইহার অধিকাংশ জাতিই খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে, কোনও কোনও জাতি অতিশয় পুষ্টিকর খাদ্যমধ্যে পরিগণিত। কোনও কোনও জাতীয় কচু ঔষধ ও পথ্যরূপেও ব্যবহৃত হয়। তন্মধ্যে, মাণক বা মানকচুর নামই বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য।

কচুর সংস্কৃত নাম কচ্বী। ইহার বাঙ্গালা নাম কচু; হিন্দিনাম কচ্চু এবং বৈজ্ঞানিক নাম এরাম্ (Arum) ও কলোক্যাসিয়া (Colocasia)। কচুর মূল বা মুখীর নাম বিতণ্ডা। ইহা পিচ্ছিল, গুরুপাক, মলভেদক এবং বায়ু, পিত্ত ও আমরোগের বৃদ্ধিকারক। পাতাজাত কচুশাকের সংস্কৃত নাম পেচুক্কা।

নানাজাতীয় কচুর মধ্যে যে সকল জাতি মনুষ্য ও মনুষ্যেতর প্রাণীর ব্যবহার্য্য, নিম্নে উহাদের পঞ্চদশ জাতির গুণ, চাষ ও ব্যবহার-প্রণালী সম্বন্ধে পৃথকরূপে লিখিত হইল।

ওলকচু—Arum Campanulatum.

এমরফোফেলাস (Amorphophallus) নামে নানা-জাতি মূলজ উদ্ভিদ আছে। ইহাদের অধিকাংশই ওলকচু জাতীয় উদ্ভিদ। উদ্ভিদ্‌বেত্তাগণ ইহাদিগকেও কচুজাতির অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে, ইহাদের অভাব ঠিক কচু (Arum) জাতির তুল্য নহে। কচুজাতীয় উদ্ভিদ-মাত্রই আর্দ্রতা ও উত্তাপ-প্রিয়। ইহারা অতিশয় আর্দ্রতা-প্রিয় নহে; কিন্তু উত্তাপ-যুক্তস্থানে বিশেষ স্ফূর্তিলাভ করে। তদ্ভিন্ন, কচুজাতির সহিত ইহাদের আকৃতিগত সাদৃশ্য নাই।

অধিকাংশ কচুজাতিই বায়ব্যমূলবিশিষ্ট (Aerial roots) হয় ; কিন্তু ইহাদের মূল (শিকড়) তদ্রূপ নহে। বলিতে গেলে, ইহারা গুচ্ছমূলযুক্ত (Fibrous roots) উদ্ভিদ্। ইহাদের কোন কোন জাতি ছায়াতেও স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়া থাকে। ইহারা ভারতবর্ষের, বিশেষতঃ বঙ্গদেশের, সর্ব্বত্র জঙ্গলী (wild) গাছের ন্যায় জন্মিয়া থাকে। ইহাদের চাষে বিশেষ যত্নের আবশ্যক হয় না। অধুনা পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্র, লাভের বা সখের হিসাবে, ইহাদের চাষ হইতেছে। শীতপ্রধান-দেশে ইহাদের চাষে বিশেষ যত্নের আবশ্যক হয়। ফার্ণাইটের তাপমান যন্ত্রের ৫৫ হইতে ৮০ ডিগ্রি উত্তাপ-বিশিষ্ট স্থানই, ইহাদের চাষের পক্ষে বিশেষ অনুকূল। সমুদ্রোপকূল হইতে দুই তিন হাজার ফুট উচ্চেও কোন কোন জাতির চাষ হইতে পারে। ইহাদের জন্মস্থান ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, সিংহল ও সুমাত্রা দ্বীপ। ইহাদের কোনও কোনও জাতির পাতা দেখিতে অতিশয় সুন্দর ও আশ্চর্য্যজনক। সখের অপেক্ষা লাভের জন্যই, এ দেশে ইহাদের কোন কোন জাতির চাষ হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, শীতপ্রধান-দেশে কেবল সখের জন্যই ইহাদের চাষ হয়। কৃত্রিম উপায়ে উত্তাপের সৃষ্টি করিয়া, ঐ সকল দেশে সবুজ-গৃহে (Green-house) ইহাদের চাষ-প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে। কেবল সখের জন্যই ইউরোপ ও আমেরিকা-বাসী ইহার চাষের জন্য অজস্র অর্থব্যয় করিয়া থাকে। এ পোড়া-দেশে লাভের জন্যও কেহ ইহাদের চাষে বিশেষ যত্নপর নহে। অথচ, বলিতে গেলে, এ দেশে একরূপ বিনাব্যয়ে ইহাদের চাষ হইতে পারে। ইহাদের কোন কোন জাতি অধিক আর্দ্রতা সহ্য করিতে পারে না। আবার কোন কোন জাতি আর্দ্রস্থানেও জন্মে। দুইভাগ দো-আঁশ মৃত্তিকার সহিত একভাগ ভাল পাতার সার মিশ্রিত করিয়া যে মৃত্তিকা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতেই ইহাদের চাষ হয়। কেবল সখের হিসাবে চাষের জন্যই এরূপ মৃত্তিকার ব্যবস্থা হইয়া থাকে। লাভের চাষের জন্য ইহাদের চাষের ব্যবস্থা স্বতন্ত্ররূপ। যথাস্থানে উহাদের বিবরণ লিখিত হইবে। গো-বিষ্ঠা ইহাদের চাষের পক্ষে অপকৃষ্ট সার।

ইহাদের যে সকল জাতি ছায়াপ্রিয়, সবুজ-গৃহে উহাদের চাষ হইয়া থাকে। সবুজ-গৃহ অভাবে, অর্দ্ধছায়াযুক্ত স্থানই ইহাদের চাষের পক্ষে উপযোগী। পাত্রে ইহাদের কোন কোন জাতির চাষ হইতে পারে। পাতার, কাণ্ডের ও ফুলের সৌন্দর্য্যের জন্য উদ্যানে বা সবুজ-গৃহে কোন কোন জাতির চাষ হইয়া থাকে। কোন কোন জাতির কাণ্ড নানাবর্ণে চিত্রিত। উহারা দেখিতে অতিশয় সুন্দর। ইহাদের প্রকৃত কাণ্ড নাই ; মূলই ইহাদের প্রকৃত কাণ্ড। এইজন্য ইহারা কন্দমূল বা কাণ্ডমূল উদ্ভিদমধ্যে গণ্য হয়। বৎসরের কোন নির্দ্দিষ্টসময়ে, ইহাদের মূল হইতে কাণ্ডসদৃশ একটী রসাল ও কোমল ডাঁটা বহির্গত হইয়া থাকে। উহার উপরেই পত্রসমূহ অবস্থিত রহে। পত্রগুলি খণ্ডিত ও বহুভাগে বিভক্ত।

সাধারণতঃ, মূলের গাত্রস্থ চক্ষু দ্বারা ইহাদের গাছ উৎপন্ন হয়। কোন কোন জাতির গাছ বীজ দ্বারাও উৎপন্ন হয়। আবার কোন কোন জাতির পত্রফলকের মেরুদণ্ড ও অস্থির উপরিভাগে মূলের আকারবিশিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটী (nodule) জন্মে। ঐ সকল জাতির গাছ এই গুটী দ্বারাই উৎপন্ন হয়। খাস-বীজ (seed proper) হইতে গাছ উৎপন্ন হওয়াই প্রকৃতির সাধারণ নিয়ম। মূল, শাখা, কাণ্ড ও পার্শ্বাঙ্কুর দ্বারাও কোন কোন উদ্ভিদের বংশবৃদ্ধি হইয়া থাকে। ফুল হইতে ফল ও ফল হইতে বীজ উৎপন্ন হয়। বীজ হইতেই উদ্ভিদের বংশবৃদ্ধি ঘটে। এই বীজকেই খাস-বীজ (seed preper) কহে। ওলকচুজাতীয় উদ্ভিদের ফুল হয়। কিন্তু কোন কোন জাতির ফুল হইতে বীজ উৎপন্ন হয় না। ইহাদের পত্রফলকের অস্থি ও মেরুদণ্ডের উপরে গুটীর ন্যায় যে মূল উৎপন্ন হইয়া থাকে, উহারাই বীজের কার্য্য সাধন করে। এই বীজ হইতেই ইহাদের গাছ জন্মে। বিধাতার সৃষ্টিরহস্য ভেদ করা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে। বর্ষাকালেই পূর্ব্বোক্ত গুটী সকল পরিপক্ব হইয়া ভূপতিত হয়। গ্রীষ্ম-কালের আরম্ভমাত্রই, পতিত বীজ অঙ্কুরিত হইয়া, নূতন গাছ উৎপন্ন করে। শীতকালে ইহাদের পাতা মরিয়া যায়। ইহাদের ফুল সৌন্দর্য্যসাধন ভিন্ন অন্য কোন প্রয়োজনসাধন করে না। ইহারা নানা জাতি ; তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কএকটী জাতির নাম উল্লেখযোগ্য।

এমরফোফেলাস্ কোম্পানিউলেটাম্—

Amorphophallus Campanulatum. Syn. Colocasia Campanulata. Telinga Potato—ওলকচু।

ইহাই আসল ওলকচু। ইহা রক্ত ও শ্বেত ভেদে দ্বিবিধ। প্রথমজাতীয় ওলের মাংস রক্তাভ প্রবালবর্ণ ও দ্বিতীয়ের মাংস পীতাভ শ্বেতবর্ণ। এই দুই জাতিরই জন্মস্থান ভারতবর্ষ। ইহা বঙ্গদেশের যথা-তথা অযত্নে উৎপন্ন হয়। শীতকালে ইহাদের গাছ মরিয়া যায়। ওলের ডাঁটা ও পাতা পচিয়া গেলেই, ক্রমে শুষ্ক হইয়া, উহা মরিয়া যায়। গ্রীষ্মকাল আরম্ভ হইবার পর যখন প্রথম বৃষ্টিপাত হয়, তখন হইতেই ওলকচুর মূল হইতে নূতন ডাঁটা ও পাতা বাহির হইতে থাকে। ইহার পাতা খণ্ডিত। প্রত্যেক খণ্ডের পার্শ্বদেশ সূক্ষ্মশিরাবৎ মাংসল সূত্র দ্বারা বেষ্টিত। ইহার কন্দমূল হইতে শিকড় বহির্গত হয় না ; ডাঁটার পাদদেশ হইতে উহা নির্গত হয়। এই সকল শিকড় সূত্রবৎ ; এবং গোছা গোছা হইয়া বহির্গত হইয়া থাকে। এই জন্যই ওলকে গুচ্ছমূল বলা যাইতে পারে। ইহারাই ভূমি হইতে রস ও খাদ্য সংগ্রহ করিয়া কন্দের, ডাঁটার ও পাতার পরিপুষ্টিসাধন করিয়া থাকে। আসল মূলের (কন্দমূলের) রসশোষণ-শক্তি নাই। ইহার কাণ্ডাবরণ বা মূলের বাহ্যদেশ শিয়ালী বা শিয়ালী-মিশ্রিত ধূসরবর্ণ। ইহার ডাঁটা কখন কখন চারি পাঁচ ফুট উচ্চ হয়। ডাঁটার উপরিভাগ বন্ধুর ও কণ্টকবৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থল (অগ্রভাগ সরু ও পাদদেশ স্থূল, এইরূপ কণ্টকবৎ পদার্থকে স্থল বলা যায়।) দ্বারা বেষ্টিত। স্থানে স্থানে সবুজবর্ণের ফোটা থাকে। কাণ্ডের গাত্রাবরণ দেখিতে গিরগিটী নামক জন্তুর পৃষ্ঠদেশের অনুরূপ। পত্র খণ্ডিত ও ছত্রাকার। ইহার কন্দমূলের উপরিভাগ হইতে ডাঁটা বা কৃত্রিম কাণ্ড বহির্গত হয়। ঐ সকল ডাঁটাই পত্রধারণ করিয়া থাকে। ডাঁটা মরিয়া গেলে, উহার পাদদেশে (কন্দের উপরিভাগে) একটী গোলাকার গর্ত্তবৎ চক্ষু দৃষ্টিগোচর হয়। ঐ গর্ত্তই ভাবী গাছের আধার। উহাতেই জীবনীশক্তি নিহিত থাকে। শীতঋতুর শেষভাগ হইতে গ্রীষ্ম-ঋতুর আরম্ভকাল পর্য্যন্ত ইহার মূলের বিশ্রামসময়। উপরে গর্ত্তবৎ যে চক্ষুর কথা বলা হইয়াছে, উহা হইতে নূতন গাছ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐ সকল গাছের পাদদেশ হইতেই সূত্রবৎ শ্বেতবর্ণের গুচ্ছমূল বহির্গত হয়। উহারা কথিত চক্ষুর চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া ভূমিতে প্রবেশলাভ করে। ইহার কন্দমূল স্বভাবতঃ গোলাকার ; উপরিভাগ চেপ্টা (flat)। দৈবকারণে, ইহারা অন্য আকারও ধরিয়া থাকে। ইহার কন্দমূলের গাত্রে বহুসংখ্যক স্ফীত গুটীবৎ মূল উৎপন্ন হয়। ইহাদিগকে চক্ষু (eye or tuber) কহে। এই চক্ষু পাটলাভ ও শ্বেতবর্ণের। উহারাই ভাবী-বংশ উৎপত্তি করে। ইহাদিগকে বীজমূল বলা যায়। বীজমূল হইতেই এই জাতির নূতন গাছ উৎপন্ন হয়। ওলকচুগাছে ফুল হয়। ফুল বৃহৎ, সবুজাভ বেগুণে বর্ণ, দেখিতে সুন্দর।

ওলকচু গ্রাম্য ও বন্য ভেদে দ্বিবিধ। এই উভয় প্রকারের ওলই, পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন স্থানে, 'বাক' নামে পরিচিত। ইহার ইংরেজি নাম 'টেলিঙ্গা পটেটু' (Telinga potato)। ওলের মূল বিলাতি টেলিঙ্গা পটেটু নামক উদ্ভিদের মূলের আকারের অনুরূপ হয় বলিয়াই, ইহার ঐরূপ নামকরণ হইয়াছে। ইহার ল্যাটিন নাম এমরফোফেলাস্ কেম্পানিউলেটাম্ এবং সংস্কৃত নাম তুল্যকন্দ ও শূরণ।

"তুল্যকন্দ শূরণঞ্চ।"

বচনান্তর যথা :—"শূরণঃ কন্দ ওলশ্চ কন্দলোহর্শঘ্ন ইত্যাদি" অর্থাৎ ইহার নাম শূরণ, কন্দ ওল ও অর্শঘ্ন।

দেশভেদে ওল ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। ইহাকে সিংহলে ফিডারণ ; হিন্দুস্থানে শূরণ ; আসামে ওলকচু ; তৈলঙ্গে মঞ্চাকান্দা ; তামিলে শূরণ ও শূর্ণা ; মহারাষ্ট্রে পোড়াশূণ ; গুজরাটে শূরণ ও পারস্যভাষায় ওলকাচু কহে। ইহাই গ্রাম্য ওল।

ওলকচু অগ্নিদীপক, রুক্ষ, কটুকষায়-রস, কণ্ডুকারক, বিষ্টম্ভী, রুচিকারক ও লঘু। ইহা কফ, অর্শ, প্লীহা ও গুল্মরোগ বিনাশক। ইহা অর্শরোগের সুপথ্য। উক্ত

উভয়জাতির মূল বা কন্দ ঔষধে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোন কোন বৈদ্যের মতে, বন্য-শূরণ বিশেষ উপকারী; গ্রাম্য-শূরণ সুখাদ্য। ইহা শ্লীপদ, বল্মীক, গোদ, অর্ব্বুদ, মন্দাগ্নি, শূল ও দন্তশূল রোগেরও মহৌষধ।

নব্যমতে (ডাক্তারী মতে) ইহা পাচক ও বলকারক। ইহা দ্বারা অর্শ, গ্রহণী ও দৌর্ব্বল্য রোগ নাশ হয়।

ওলকচুর মূল সুখাদ্য। মূল রোপণের পরে ৭।৮ মাস-মধ্যেই, ইহা খাইবার উপযুক্ত হয়। দুই তিন বৎসরের বা ততোধিকসময়ের পুরাতন ওল বৃহদাকার হয়। পুরাতন ওলই খাইতে অধিক সুস্বাদু। ওল সিদ্ধ করিয়া লবণ, তৈল ও মরিচ সংযোগে খাওয়া যায়। ইহা তরকারীতেও সুখাদ্য হয়। ওল সিদ্ধ করিয়া, উহাকে হস্ত দ্বারা "চট্‌কাইয়া" লইলে অতিশয় কোমল হইয়া থাকে। ঐ কোমল শস্যের সহিত লবণ ও সামান্য পরিমাণে লঙ্কার (মরিচ) গুঁড়া বা বাটা লঙ্কা মিশাইয়া তৈলে ভাজিয়া উহার বড়া প্রস্তুত করিলে, তাহাও বেশ সুখাদ্য হয়। ইহার ডাঁটা ও কোমল (কচি) পাতা জলে সিদ্ধ করিয়া লইলে, তাহাও ব্যঞ্জনে ব্যবহার করা যায়। কেহ কেহ ওলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুকরা রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া, ইহার শুঁঠ প্রস্তুত করিয়া থাকে। এই শুঁঠও ব্যঞ্জনে খাওয়া যায়। মূলজ সব্জীমধ্যে ওল বিশেষ উপকারী। কার্ত্তিকমাসেই সাধারণতঃ ওলের মূল সংগ্রহ করা হয়। এই সময়েই ইহা খাইতেও সুস্বাদু হয়। এ সম্বন্ধে দেশ-প্রচলিত একটি কথা আছে। উহা এই :—

"ভাদ্রমাসে তালের পিঠা, আশ্বিনে শশা মিঠা।
কার্ত্তিকে ওল, অঘ্রানে (অগ্রহায়ণমাসে) খলিসার ঝোল॥
পৌষে কাঞ্জি, মাঘে তেল (সর্ষপ তৈল)।
ফাল্‌গুনে গুড়, আদা, বেল॥
চৈতে গিমা তিতা, বৈশাখে ঘৃত-নালিতা।
জ্যৈষ্ঠে খই, আষাঢ়ে দই।
শ্রাবণে ঘোল-পান্তা, তবে হয় শরীরের কান্তা॥"

অর্থাৎ ভাদ্রমাসে তালের পিঠা (তালের রস, চাউলের গুড়া ও চিনি সংযোগে তৈলে ভাজিয়া ইহা প্রস্তুত হয়।) সুস্বাদু হয়। আশ্বিনমাসে শশা মিষ্টাস্বাদ হইয়া থাকে। কার্ত্তিকমাসে ওল এবং অগ্রহায়ণমাসে খলিসা (অধিক কণ্টকযুক্ত মৎস্যবিশেষ) মৎস্যের ঝোল বেশ সুস্বাদু হয়। পৌষমাসে কাঞ্জি (পর্য্যুষিতান্নের অম্লজল) সুস্বাদু হয়। ইহা দৈহিক উপকারও সাধন করিয়া থাকে। ইহার সংস্কৃত নাম কাঞ্জিক (কাঞ্জীক) বা কাঞ্জিকা।

"কাঞ্জিকং রোচনং রুচ্যপাচনং বহ্নিদীপনম্।"

অর্থাৎ ইহা রোচক (আহারের রুচিবর্দ্ধক), পাচক ও অগ্নিবর্দ্ধক। পর্য্যুষিত অন্নকে কএকদিন জলে ভিজাইয়া পচাইলে, উহা হইতে যে অম্লাস্বাদযুক্ত জল প্রাপ্ত হওয়া যায়, উহাই কাঞ্জি। কোন কোন দেশের লোক, ইহা অতিশয় প্রিয়বস্তু বোধে ভোজন করে। মদ্রদেশীয় লোকেরা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে সমর্থ হয়; কিন্তু তথাপি, কাঞ্জির ব্যবহার ত্যাগ করিতে পারে না। মাঘমাসে তেল অর্থাৎ সর্ষপতৈল মিষ্ট হয়। ফাল্গুনমাসে গুড় (আকীগুড়), আদা ও বেল সুস্বাদু হয়। চৈত্রমাসে গিমা নামক তিক্তশাক খাইতে সুস্বাদু হয়। বৈশাখমাসে ঘৃত ও নালিতা-শাক (লাল পাট-শাক ;—সাধারণতঃ পাটশাক।) সুখাদ্য ও উপকারী। জ্যৈষ্ঠমাসে খই ও আষাঢ়মাসে দই (দধি) খাইতে সুস্বাদু হয়। শ্রাবণমাসে ঘোল ও পান্তা (পান্তাভাত) সুস্বাদু ও উপকারী। দুগ্ধের সর বাটিয়া উহা মন্থন করিলে, উহা হইতে নবনীতের অর্থাৎ মাখমের ভাগ অনায়াসেই উঠাইয়া লওয়া যায়। তৎপর যাহা অবশিষ্ট রহে, তাহাই ঘোল বা তক্র। দধি মন্থন করিয়াও, এই দ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। পূর্ব্বদিনের পর্য্যুষিত অন্নে জল দিয়া রাখিলে, পরের দিন উহাকে পান্তাভাত বলা যায়। ঘোল ও পান্তাভাত শ্রাবণমাসে ভক্ষণ করিলে শরীরের কান্তা অর্থাৎ কান্তি বৃদ্ধি হয়। ঋতু ও তিথি ভেদে কোন কোন দ্রব্য ভক্ষণ করিলে দেহের উপকার সাধিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বোল্লিখিত দ্রব্য সকল মধ্যেও কোন কোনটী ঐ সকল সময়ে ব্যবহার করিলে দৈহিক উপকার সাধিত হয়।

ওলের চাষ-প্রণালী সহজ; এবং ইহার চাষ স্বল্প ব্যয় ও শ্রমসাধ্য হইলেও, ওলের চাষ বিশেষ লাভজনক। এক বিঘা জমিতে ওলের চাষ করিলে, প্রতিবৎসর ন্যূনকল্পে ১০০৲ শত টাকা লাভ হইতে পারে।

যে স্থানে বর্ষায় জল না দাঁড়ায়, এইরূপ উচ্চ ভিটি-জমিই ওলের চাষের পক্ষে উপযোগী। দো-আঁশ বা বেলে-দো-আঁশ মৃত্তিকাই ওলচাষে প্রশস্ত। যে স্থানে রীতিমত রৌদ্র লাগে, সেইরূপ স্থানেই ওল রোপণ করা কর্ত্তব্য। ছায়াতে ওল জন্মিলে, তাহা এরূপ নিকৃষ্ট হয় যে, খাইবামাত্র (তরকারীতে) মুখ চুল্কাইতে থাকে। ছায়ার ওল গুণে উৎকৃষ্ট না হইলেও, তাহার আকার বড় হয়। এই জন্যই খনার মতে,—

"ছায়ার ওলে চুল্‌কায় মুখ।
কিন্তু তা'তে নাহিক দুখ॥"

অর্থাৎ ছায়ার ওলে মুখ চুল্কাইলেও, তজ্জন্য দুঃখিত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। কারণ, খাইতে একটু কষ্ট হইলেও, উহার আকৃতি বড় হয় বলিয়া, সামান্য ছায়াবিশিষ্ট স্থানে ওলের চাষ করাই লাভজনক।

ওলের চাষের জন্য দ্বিবিধ উপায়ে জমি প্রস্তুত করা যায়। যে ভূমিতে ওলের চাষ করিবে, সেই ভূমি মাঘ ফাল্গুন মাসে কোদালী দ্বারা উত্তমরূপে কোবাইয়া দিবে। তৎপর, উহাতে পাতার সার, অভাবে সামান্য পরিমাণ পুরাতন গো-বিষ্ঠার সার ও গোময় বা কাষ্ঠভস্মের ছাই ছড়াইয়া দিবে। ওলক্ষেত্রের মৃত্তিকা অতিশয় হাল্‌কা হওয়া প্রয়োজন। তাহা হইলেই, ওলের মূল সত্বর বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়। ওলক্ষেত্র কোদাল দ্বারা কোবাইবার পরে যে সকল ঢিলা উৎপন্ন হইবে, উহা শুষ্ক হইলে মুগুর (মুদ্গর) দ্বারা পিটাইয়া চূর্ণ করিয়া ফেলিতে হয়। তৎপর, পুনঃ পুনঃ চাষ ও মই দিয়া, ক্ষেত্রের মৃত্তিকা ধূলিবৎ করা আবশ্যক। বারম্বার মৃত্তিকা উলট্-পালট্ করিবার পরে, যখন উহা কোমল হইবে, তখনই জমি প্রস্তুত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এইটাই হইল ওলের জমি-প্রস্তুত করিবার প্রথম উপায়। দ্বিতীয় উপায়ে, জমি কোবাইবার বা বারম্বার হলকর্ষণ করিবার আবশ্যক হয় না। ক্ষেত্রে একবার মাত্র চাষ দিয়া, যে সকল স্থানে 'মুখী' (মূলের চোখ্) বসাইতে হইবে, প্রথমতঃ সেই সকল স্থানে একহাত দীর্ঘ, একহাত প্রস্থ ও ততোধিক গভীর এক একটী গর্ত্ত করিতে হয়। তৎপর, ঐ সকল গর্ত্তের আন্দাজ তিনভাগ সারমাটীতে পূর্ণ করিয়া দেওয়া আবশ্যক। বলা বাহুল্য, এ স্থলেও সারমিশ্রিত মৃত্তিকা ধূলিবৎ চূর্ণ করিতে হইবে। তাহা হইলেই জমি প্রস্তুত হইল।

এ দেশের কোন কোন স্থলে, প্রথমোক্ত উপায়ে, এবং অধিকাংশস্থলেই, শেষোক্ত উপায়ে ওলের জমি প্রস্তুত করিবার রীতি প্রচলিত রহিয়াছে। প্রথমোক্ত উপায় অবলম্বনে জমি প্রস্তুত করিতে কিঞ্চিৎ অধিক ব্যয়ের প্রয়োজন হইলেও, এই উপায়ে জমি প্রস্তুত করা সঙ্গত। কারণ, ইহাতে ওলের আকার বড় হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। ওল সাধারণতঃ দুই তিন সের হইতে ৫।৬ সের পর্য্যন্ত হইতে দেখা যায়। মৃত্তিকা ভাল হইলে, এবং একটুকু বেশী যত্ন করিতে পারিলে, উহার ওজন ৭।৮ সেরও হয়। অনেক স্থলে, এক একটী ওলকে অর্দ্ধমণ পর্য্যন্তও হইতে দেখা গিয়াছে। বন-জঙ্গলে স্বতঃই প্রচুর পরিমাণে যে ওল জন্মে, সেই সকল বন্য-ওল আদৌ খাদ্যরূপে ব্যবহার করা যায় না। যদিও ওলের চাষে বেশী ব্যয়, যত্ন ও পরিশ্রমের আবশ্যক হয় না সত্য, তথাপি অনেকস্থানেই কৃষিজাত বা গ্রাম্য ভাল ওল পাওয়া যায় না। কৃষকের ওল-চাষের প্রতি অমনোযোগিতাই ইহার একমাত্র কারণ। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ওলের চাষ বিশেষ লাভজনক হইলেও, তৎপ্রতি অনেক স্থানেরই কৃষকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না! বঙ্গের প্রায় সর্ব্বত্রই অল্লাধিক পরিমাণে ওল জন্মিলেও, প্রায় সকল স্থানেই যে ইহার চাষ-প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে, এরূপ বলা যায় না। উত্তরবঙ্গের নানা স্থানের ও হাবড়া—সাঁত্রাগাছির ওল সমধিক প্রসিদ্ধ। এই সকল স্থানে যথারীতি ওলের চাষ হয়। বর্ত্তমানসময়ে তরকারী যেরূপ দুর্ম্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে সর্ব্বত্রই ওলের চাষ করা কর্ত্তব্য।

বৈশাখমাসেই ওলের পার্শ্বাঙ্কুর বা 'মুখী' রোপণ করিতে হয়। কোন কোন স্থলে, জ্যৈষ্ঠমাসের প্রথমভাগেও মুখী বসান হয়। খনার মতে, ফাল্গুনমাসই মূল রোপণের পক্ষে প্রশস্ত।

"ফাল্গুনে না রুলে ওল।
শেষে হয় গণ্ডগোল।" (খনা)

অর্থাৎ ফাল্গুনমাসে ওল (ওলের মুখী) রোপণ না করিলে, শেষে 'যো' হারাইয়া—অসময়ে মূল বসাইয়া, গণ্ড-গোলে বা অসুবিধায় পড়িতে হয়। ফাল্গুনমাসেও মুখী বসান যায় সত্য; কিন্তু খনার মতাবলম্বনে, এ দেশের কেহই ফাল্গুনমাসে মূল রোপণ করে না। মুখী রোপণসম্বন্ধে যেমন খনার বচনানুযায়ী কার্য্য করা হয় না, তদ্রূপ ওলের জমিতে সারব্যবহারবিষয়েও খনার মত অনেকস্থলেই প্রতিপালিত হয় না। খনা বলেন :—

"গোয়ে গোবর, বাঁশে মাটী।
অফলা নারিকেল শিকড় কাটি॥
ওলে কুটী, মানে ছাই।
এইরূপে কৃষি করগে ভাই॥"

অর্থাৎ গো বা গুয়া (সুপারী) চাষে গোবর ও বাঁশের মূলে নূতন মাটী দিলেই, উহারা সতেজে বর্দ্ধিত হয়। যে নারিকেলগাছ অফলা তাহার শিকড় কাটিয়া দিলেই, সার দেওয়ার কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে। শিকড় কাটিয়া দিলে, অফলা-গাছেও নারিকেল ধরিতে দেখা যায়। ওলের চাষে কুটী (সরিষার খোসা) ও মানকচুর চাষের পক্ষে ছাই উৎকৃষ্ট সার। সুতরাং, উত্তমরূপে সার ব্যবহার করিতে পারিলে ফললাভে বঞ্চিত হইতে হয় না। খনার মতানুযায়ী মানকচুগাছের গোড়ায় ছাই দিবার প্রথা, আবহমানকাল হইতে, এ দেশের সর্ব্বত্রই প্রচলিত রহিয়াছে সত্য, কিন্তু ওলের মূলে কুটী ব্যবহার করিবার প্রথা সর্ব্বত্র প্রচলিত নহে। খনা বলেন—

"কচুবনে যদি ছড়াস্ ছাই।
খনা বলে তার সংখ্যা নাই॥"

প্রকৃতপক্ষেই মানকচু, ওলকচু প্রভৃতি নানাজাতীয় কচুর পক্ষে ছাই উৎকৃষ্ট সার।

বৈশাখমাসে একহাত অন্তর অন্তর সারি (শ্রেণী) করিয়া মূল রোপণ করিবে। প্রত্যেক সারিতে একহাত ব্যবধানে এক একটী করিয়া মূল রোপণ করিতে হয়। মূলের আকারানুসারে চারি হইতে ছয় ইঞ্চি মৃত্তিকার নীচে মূল বসাইলেই চলে। ১৫।২০ দিনেই মূল হইতে গাছ বাহির হয়। গাছ বাহির হইবার পরে, উহারা যখন অর্দ্ধহাত পরিমিত উচ্চ হইবে, তখন উহাদের প্রত্যেকের গোড়া চারি পাঁচ ইঞ্চি মৃত্তিকা দ্বারা বাঁধিয়া বেদীর ন্যায় উচ্চ করিবে। পরে, সময় সময়, গাছের গোড়ার মৃত্তিকা 'খুরপী' বা 'পোসন' দ্বারা আল্‌গা করিয়া দিয়া, ঘাস ও আগাছা ইত্যাদি পরিষ্কার করিয়া দিবে। গাছ অতিরিক্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, উহার ডাঁটা সামান্য পরিমাণে মোচরাইয়া দিতে হয়। ইহাতে গাছ একটু নিস্তেজ হইয়া পড়াতে, উহার বৃদ্ধির ব্যাঘাত জন্মে। পাতার ও ডাঁটার বৃদ্ধি হইলে, মূলবৃদ্ধির ব্যাঘাত হয়। আমাদের মূলেরই প্রয়োজন; এই জন্যই, যাহাতে পাতা ও ডাঁটার অতিরিক্ত বৃদ্ধি ঘটিতে না পারে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। ইহা ভিন্ন ওলের চাষে আর অন্য কোনরূপ পাইট নাই। ওলগাছের গোড়ার মৃত্তিকা আল্‌গা রহিলেই, উহার মূল সত্বর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

এক বিঘা জমিতে ৬৫৬১টী মূল রোপণ করা যাইতে পারে। রোপণের ৬।৭ মাস পরেই, ইহার মূল ব্যবহারের উপযুক্ত হয়। উত্তমরূপে জন্মিলে, প্রত্যেকটী মূল /০ আনা হইতে ৵০ আনা মূল্যে বিক্রয় হইতে পারে। গড়ে প্রত্যেকটী দুই পয়সা হিসাবে বিক্রয় করিলেও, একবিঘা জমিতে ২০৫৲১০ পাওয়া যায়। ক্ষেত্রের সকল মূল একই সময়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া বিক্রয়োপযোগী হয় না। ওলের মূলবৃদ্ধির কার্য্যকে এদেশে 'ওলান' কহে। প্রথম বৎসরে অর্দ্ধেকসংখ্যক মূল ওলাইলেও, ক্ষেত্রে রোপিত ৬৫৬১টী গাছের অর্দ্ধাংশ অর্থাৎ ৩২৮০টী বিক্রয়োপযোগী মূল প্রাপ্ত হওয়া যায়। উহার প্রত্যেকটী গড়ে দুই পয়সা হিসাবে বিক্রয় করিলেও ১০২৷৷০ টাকা হয়। ইহার অর্দ্ধাংশও যদি ব্যয় বাবদ বাদ দেওয়া যায় (ওলের চাষে এত অধিক ব্যয় হয় না); তথাপি, প্রথমবৎসরেই অর্দ্ধশত টাকা নিট লাভ হইতে পারে। কিন্তু তৎপরবর্ত্তী বৎসরে প্রায় একশত টাকাই লাভ হইবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে। কারণ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ওলের জমিতে বিশেষ কোনরূপ পাইটের বা যত্নের আবশ্যক হয় না; সুতরাং জমির খাজানা ও অন্যান্য ব্যয়ের পরিমাণ ২০৲ টাকা ধরিলেও, দ্বিতীয় বৎসরে ৮২৲ টাকা নিট লাভ হইতে পারে। খুব কম করিয়া ধরিলেও, একবিঘা জমিতে ওলের চাষ করিতে পারিলে,

সর্ব্বপ্রকার ব্যয় বাদে, দুই বৎসরে, বার্ষিক গড়ে ৫০৲ টাকা হিসাবে, কৃষকের মোট একশত টাকা লাভ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা রহিয়াছে। সুতরাং কচুর চাষও উপেক্ষার নহে। কচুচাষ করিতে পারিলেও, কৃষককে "কচুপোড়া" খাইতে হয় না।

শোলাকচু—Arum Bengalensis.

ডাক্তার রক্সবার্গ তাঁহার 'ফ্লোরা ইণ্ডিকা' (Flora Indica) নামক গ্রন্থে এই জাতির উল্লেখ করেন নাই। শোলাকচু পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসী। ভারতবর্ষের অন্যত্র ইহা কদাচিৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে। নানাপ্রকার শোলাকচুর কোনও বৈজ্ঞানিক নাম আমি অবগত নহি। ইহাদের আদিম অধিবাস বঙ্গদেশ বলিয়া, আমি ইহাদিগকে 'এরাম বেঙ্গালেনসিস্' (Arum Bengalensis) নামে অভিহিত করিলাম। পূর্ব্ববঙ্গের নানাস্থানে অত্যধিক পরিমাণে নানাপ্রকার শোলাকচুর চাষ হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন, পশ্চিম-বঙ্গের যশোহর জেলায় এবং উত্তরবঙ্গের রঙ্গপুর, দিনাজপুর, বগুড়া প্রভৃতি জেলায়ও সামান্য পরিমাণে শোলাকচুর চাষ হয়। বঙ্গের অন্যান্য স্থানে ইহার চাষ-প্রথা আজিও প্রচলিত হয় নাই। শোলাকচুর চাষেও বেশ লাভ হয়। সাধারণতঃ তিন প্রকার শোলাকচুই দৃষ্ট হইয়া থাকে। নিম্নে উহাদের বিবরণ লিখিত হইল।

(ক) **সাদা শোলাকচু**—ইহার পত্র গাঢ় সবুজবর্ণ; পত্রের মধ্যশিরা পীতাভ সবুজবর্ণ; পত্রবৃন্ত বা ডাঁটা পাতলা সবুজবর্ণ ও গোলাকার এবং উহার নিম্নদেশ আংশিক দ্বিখণ্ডিত। পত্রবৃন্তের প্রান্তদেশের মূল হইতে খণ্ডিত অংশের উপরিভাগ পর্য্যন্ত বেগুণীবর্ণের ডোরাবিশিষ্ট। কাণ্ড গোলাকার, ধূসরবর্ণ, প্রায় ৩।৪ ফুট দীর্ঘ এবং নরবাহু সদৃশ স্থূল। পত্রকক্ষ চক্ষুযুক্ত ও গ্রন্থিল। গ্রন্থিস্থানগুলি শ্বেত বা পাতলা সবুজবর্ণের হয়।

উৎকৃষ্ট দো-আঁশ বা বালিপ্রধান-দো-আঁশ এবং উদ্ভিজ্জ-সার-প্রধান মৃত্তিকাই সাদা শোলাকচুর চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। কর্দ্দম ও বালিমৃত্তিকা ইহার চাষের পক্ষে উপযোগী নহে। নিম্নভূমিতে ইহা বিশেষ স্ফূর্ত্তিলাভ করে। যে স্থানে বর্ষাকালে নূনাধিক দেড় ফুট জল দাঁড়ায়, তদ্রূপ স্থানই ইহার চাষের পক্ষে প্রশস্ত। শুষ্ক দেশে শোলাকচুর চাষ করিতে হইলে, কচুক্ষেত্রকে অষ্টহস্ত দীর্ঘ ও অষ্ট হস্ত প্রস্থ—এই আকারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চতুর্ভুজক্ষেত্রে বিভাগ করিয়া লইতে হইবে। ঐ সকল চতুর্ভুজক্ষেত্রের চতুষ্পার্শ্বস্থ আইল অন্ততঃ একহাত উচ্চ হওয়া আবশ্যক। কারণ, তাহা না হইলে ক্ষেত্রমধ্যে দীর্ঘকাল জল সঞ্চিত রহিতে পারে না। শুষ্কদেশে শোলাকচুর চাষ করিলে, উহাতে প্রচুর পরিমাণে জলসিঞ্চনের আবশ্যক। নচেৎ, উহাদের কাণ্ড যথোচিত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে পারে না। জলসিঞ্চনের ব্যয় হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যেই, পূর্ব্বোক্তরূপে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চতুর্ভুজক্ষেত্রের চারিপার্শ্বে আলি বা আইল বাঁধা আবশ্যক। আইল-বাঁধা-ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল জল সঞ্চিত রহে। সুতরাং, একবার প্রচুর পরিমাণে (আইলের সমান উচ্চ করিয়া) জল দিতে পারিলে, বহুদিবস পর্য্যন্ত আর জল দেওয়ার আবশ্যক হয় না। এইরূপভাবে ক্ষেত্রে জল সঞ্চিত রাখিলে, কচুচাষও লাভজনক হয়, অথচ তাহাতে ব্যয়ও অপেক্ষাকৃত অনেক কম লাগে। পক্ষান্তরে, বর্ষাপ্রধান-দেশে, অর্থাৎ যে দেশের ভূমি বর্ষাকালে জলমগ্ন হয়, সেরূপ দেশে জলের অভাব হয় না। সুতরাং, ঐরূপ দেশের সকল ক্ষেত্রেই শোলাকচুর চাষ করা যাইতে পারে। অধিকাংশ জাতীয় শোলাকচুর চাষেই প্রচুর পরিমাণে সার-ব্যবহার ও জল-সিঞ্চনের প্রয়োজন হয়।

উচ্চভূমিতেও ক্ষেত্রে আইল বাঁধিয়া শোলাকচুর চাষ করা যায়। কিন্তু ঐরূপ ক্ষেত্রে জলসেচন করিবার ব্যয় অধিক হয় বলিয়া, উহার চাষ তত লাভজনক হইতে পারে না। পূর্ব্ববঙ্গে সাধারণতঃ চড়ভূমিতেই সফলতার সহিত ইহার চাষ হয়। চড়ের পলিপড়া মৃত্তিকায় শোলাকচুর চাষে কোনও প্রকার সার ব্যবহার করা হয় না; ঐরূপ মৃত্তিকায় সারব্যবহারের আবশ্যকতাও বড় কম। কিন্তু অন্যরূপ মৃত্তিকায় সার-ব্যবহার করিতে পারিলে সুফল লাভ করা যায়। উদ্ভিজ্জসারই শোলাকচুর পক্ষে বিশেষ উপযোগী ও অত্যুৎকৃষ্ট সার। তদভাবে গোময়সারও ইহার পক্ষে অনুপযোগী নহে।

যে জমিতে শোলাকচুর চাষ করিতে হইবে, উহা কার্ত্তিক মাসে একবার কোদাল দ্বারা উত্তমরূপে কোবাইয়া দিতে হয়। কার্ত্তিকমাসেই ইহার ফসল উঠিয়া যায়। ঐ মাস হইতেই জমিপ্রস্তুত-কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে। মৃত্তিকার 'চাকা' বা ঢেলাগুলি শুষ্ক হইলে পর, অর্থাৎ মৃত্তিকার আর্দ্রতা দূর হইলে, অগ্রহায়ণমাসে প্রথমতঃ ঢেলা ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিতে হইবে; এবং তৎপর, বারম্বার চাষ ও মই দিয়া, ক্ষেত্রের মৃত্তিকা ধূলিবৎ চূর্ণ করিয়া লওয়া আবশ্যক। ঢেলা ভাঙ্গিবার পর, অর্থাৎ হলকর্ষণের পূর্ব্বে, ক্ষেত্রে আবশ্যকমত গোময় বা উদ্ভিজ্জ সার ছড়াইয়া দিতে হইবে। এই সময় সার দিলে, চাষ ও মই দ্বারা উহা মৃত্তিকার সহিত মিশাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। জমির আঁশ ভাঙ্গিয়া দেওয়াই সার ব্যবহারের প্রধান উদ্দেশ্য। সুতরাং, মৃত্তিকার অবস্থা বুঝিয়াই সারের পরিমাণ অল্প কি অধিক হওয়া আবশ্যক, তাহা স্থির করিয়া লইতে হইবে। ঢেলা ভাঙ্গিয়া দেওয়ার পর—সার ছড়াইয়া দেওয়ার পূর্ব্বে, ক্ষেত্রের আগাছা, ঘাস, মুথা প্রভৃতি বাছিয়া ফেলিয়া, ক্ষেত্র পরিষ্কার করিয়া লওয়া আবশ্যক। উত্তমরূপে কর্ষিত ও চূর্ণীকৃত মৃত্তিকা সমতল করিয়া লইলেই জমি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

জমি প্রস্তুত হইলে পর, উহাতে সারি করিয়া একহাত ব্যবধানে এক একটি 'খুপি' (খোপ) কাটিতে, এবং প্রত্যেক খুপীতে এক একটি সাদা শোলাকচুর চারা রোপণ করিতে হইবে। অগ্রহায়ণ হইতে চৈত্রমাস পর্য্যন্ত চারা-রোপণকার্য্য চলিয়া থাকে। কিন্তু অগ্রহায়ণ পৌষ মাসই চারা-রোপণের প্রশস্তকাল। মাঘমাসে চারা রোপণ করিলেও মন্দ হয় না। ফাল্গুন চৈত্র মাসে চারা রোপণ করিলে, গাছ বিলম্বে বর্দ্ধিত হয় বলিয়া, উহার ফসল 'নাবি' হইয়া পড়ে; বিশেষতঃ, তাহাতে ফলনও সন্তোষজনক হইতে পারে না। অগ্রহায়ণ হইতে মাঘমাস পর্য্যন্ত যে চারা রোপিত হয়, তাহা হইতেই জল্‌দি ফসল পাওয়া যায়। কার্ত্তিকমাসেও কোন কোন স্থানে চারা রোপণ করা হয়। এই সময়ের রোপিত চারা বা মূল শীতাধিকাহেতু মাঘমাস পর্য্যন্ত কতকটা ক্রিয়াহীন (dorment) অবস্থায় রহে। বসন্তের প্রারম্ভে উহাদের বর্দ্ধনকার্য্য আরব্ধ হয়; এবং গ্রীষ্মারম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই, উহারা স্ফূর্ত্তির সহিত বর্দ্ধিত হইতে থাকে। এমতাবস্থায়, কার্ত্তিকমাস অপেক্ষা মাঘমাসে রোপণই সঙ্গত। আমাদের দেশের কৃষকেরা ইহা বেশ জানে; কিন্তু তথাপি, সংগৃহীত মূল নষ্ট হইয়া যাইতে পারে, এই আশঙ্কা করিয়াই, তাহারা উহা ক্ষেত্রে রোপণ করিয়া থাকে। সংগৃহীত কচুর মূল যত্নের সহিত রাখিয়া দিলেও, উহার কিয়দংশ নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। পক্ষান্তরে, যথোচিত যত্নের অভাবে, উহার অধিকাংশই নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা রহে। কিন্তু ক্ষেত্রে রোপণ করিতে পারিলে আশঙ্কার কোনও কারণ থাকে না। এই জন্যই কৃষকেরা সংগৃহীত মূল ঘরে রাখিবার বড় পক্ষপাতী নহে।

শোলাকচু-ক্ষেত্রের ফসল উঠিয়া গেলে পর, ক্ষেত্রের মৃত্তিকায় পতিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূলাংশ হইতে বহুসংখ্যক চারা নির্গত হইয়া থাকে। এই সকল চারা সংগ্রহ করিয়া রোপণ করিতে পারিলেই ভাল হয়। বিস্তৃতভাবে চাষ করিতে হইলে, ঐরূপ চারা সংগ্রহ করিয়াই রোপণ করা আবশ্যক। ক্ষেত্রের মৃত্তিকায় পতিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূলাংশ অর্থাৎ পার্শ্বাঙ্কুর বা মুথীর চারা ক্ষেত্র হইতে উঠাইয়া আনিয়া, ঐ সকল কোনও ছায়াযুক্তস্থানে স্তূপাকারে মজুত করিয়া রাখিতে হইবে। এইরূপে ১০।১২ দিন রাখিয়া, তৎপর সেগুলিকে ৪।৫ দিন পর্য্যন্ত রৌদ্রে ছড়াইয়া দিবে। রৌদ্রে দেওয়ার পর, প্রত্যেকটি চারাগাছের মূলের পর্ব্ব ও শুষ্কপাতা বাছিয়া ফেলিবে। অগ্রভাগের কচিপাতা রাখিয়া, অবশিষ্ট পাকাপাতাগুলিও কাটিয়া ফেলিতে হয়। তদ্ভিন্ন, চারাগাছের ৩।৪টি পাতাসহ মূলের ৩।৪ ইঞ্চি মাত্র রাখিয়া, তন্নিম্নভাগের অবশিষ্টাংশও কাটিয়া ফেলিতে হইবে। এইরূপভাবে পত্রাদি কর্ত্তন করিয়া লইলেই, উহা রোপণের উপযোগী হয়। তবে চারাগাছের মূল ক্ষুদ্র হইলে, উহা কর্ত্তন করা অনাবশ্যক। চারাগাছের মূল কাটিয়া 'বাসি' করিয়া দিলে, উহা খুব তেজাল হয়। শোলাকচুর কাণ্ডের উপরিভাগের ৩।৪ ইঞ্চি ডাঁটা ও পাতাসহ কাটিয়া রাখিলে, তদ্দ্বারাও চারার কার্য্য সাধিত হয়। পত্র ও পত্রবৃন্তসহ কর্ত্তিত কাণ্ডের

উপরিভাগ কিয়ৎকাল (৫।৭ দিন) রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া, এবং তৎপর উহার পাতা ছিড়িয়া ফেলিয়া রোপণ করা আবশ্যক।

শোলাকচুর মূল রোপণের পর আবশ্যকমত জলসেচন করিতে, এবং কচুক্ষেত্রকে সর্ব্বপের ভূষি অথবা পচা গুড়া গুড় দ্বারা ঢাকিয়া দিতে হইবে। ইহাতে রৌদ্রের তেজে রোপিত মূল সহজে শুকাইয়া যাইতে পারে না। অধিকন্তু, ঐ সকল পদার্থ বৃষ্টির জলে পচিয়া গিয়া সারের কার্য্য সাধন করে। পূর্ব্বোক্তরূপে পচা গুড়াদি দ্বারা ক্ষেত্র ঢাকিয়া দিতে পারিলে, তদ্দ্বারা রোপিত চারার গোড়ার মৃত্তিকার আর্দ্রতা রক্ষিত হয় বলিয়া, বারম্বার ক্ষেত্রে জলসেচনের প্রয়োজন হয় না। রোপিত চারাগাছগুলি বৈশাখমাসের পূর্ব্বেই লাগিয়া যাইবে। তৎপর, বৈশাখের বৃষ্টিপাতের সঙ্গে সঙ্গে, গাছগুলি ক্রমশঃই দ্রুতগতিতে বর্দ্ধিত হইবে। কচুগাছের পাতার অতিবৃদ্ধি নিবারণোদ্দেশ্যে, সময় সময়, উহার নিম্নভাগের ডাঁটাসহ কতকগুলি পাতা ভাঙ্গিয়া দিতে হয়। নচেৎ, কাণ্ডের বৃদ্ধির ব্যাঘাত জন্মে। পাতার বৃদ্ধি অধিক হইলে সমস্ত ক্ষেত্র ঢাকিয়া যায়। তদবস্থায়, কাণ্ডের মূলে আলো, উত্তাপ ও বায়ু সহজে প্রবেশ করিতে পারে না বলিয়াই, কাণ্ডের যথোচিত বৃদ্ধির ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। কাণ্ডের যথোচিত বৃদ্ধির উপরই কচু-চাষের সাফল্য নির্ভর করিয়া থাকে। সুতরাং, পাতা বা ডাঁটার মায়া করিলে চলিবে কেন? চারা রোপণের পর, সময় সময় আগাছাদি নিড়াইয়া দেওয়া ভিন্ন, শোলাকচুর চাষে আর অন্য কোনরূপ পাইটের আবশ্যক হয় না। বৈশাখ-মাসের বৃষ্টির জলে সর্ষপের খোসা প্রভৃতি যখন পচিতে আরম্ভ করে, তখন কচুগাছের গোড়ার মৃত্তিকা খোঁচাইয়া দিয়া, পচাসারমিশ্রিত মৃত্তিকা দ্বারা উহার গোড়া ঢাকিয়া দিতে পারিলে ভাল হয়।

আষাঢ়মাস হইতেই সাদা শোলাকচু খাওয়াযোগী হইয়া থাকে; এবং উহা কার্ত্তিকমাস পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। ইহারও চাষের ব্যয় অতি সামান্য। প্রত্যেক বিঘা জমিতে, সমুদয় খরচ বাদে, ন্যূনাধিক ৫০৲।৬০৲ টাকা বা ততোধিক লাভ হইয়া থাকে। প্রতি বিঘায় ন্যূনপক্ষেও ৬৪০০ মূল বা চারা রোপণ করা যাইতে পারে। প্রত্যেকটি সাদা শোলাকচুর মূল্য এক পয়সা হইতে এক আনা বা ততোধিক হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, কচুর কাণ্ডের দৈর্ঘ্য ও স্থূলতার উপরই উহার মূল্য নির্ভর করে। যাহা হউক, প্রত্যেক বিঘায় উৎপন্ন কচুর সংখ্যা গড়ে ৬০০০ এবং উহাদের মূল্য গড়ে এক পয়সা করিয়া ধরিলেও, একবিঘায় উৎপন্ন কচুর মোট মূল্য ৯৩৲০ আনা হয়। উহা হইতে চাষের মোট ব্যয় আনুমানিক ২৩৲০ বাদ দিলেও, প্রতি বিঘায় ৭০৲ টাকা লাভ থাকে। উহা হইতে আরও কুড়ি টাকা দৈব-ক্ষতি বাবদ বাদ দিলেও, প্রত্যেক বিঘায় ৫০৲ টাকা খাঁটী লাভ পাওয়া যায়। ইহাও সামান্য লাভ নহে। সাদা শোলাকচুক্ষেত্রে বেড়া দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। কেননা, একমাত্র শূকর ভিন্ন অন্য কোনও পশুই এই কচুর গাছ খায় না। তদ্ভিন্ন, কচুগাছের একমাত্র পচা-ধরা-রোগ ব্যতীত, অন্য কোনও রিপু বা পীড়াও নাই। সুতরাং, ইহার চাষ যে বিশেষ লাভজনক, তাহা নিঃসন্দেহেই বলা যায়। বিক্রমপুর—রামপালের কৃষকেরা সাদা শোলা-কচুর চাষ করিয়া, বিঘাপ্রতি শতাধিক টাকাও লাভ করিয়া থাকে।

সাদা শোলাকচুর পাতা, ডাঁটা এবং লতও খাওয়া যায়। ইহাদের মূল হইতে অধিকসংখ্যক লতের বিস্তৃতি ঘটে না। এই কচুর কাণ্ড সুখাদ্য; এবং উহাতে প্রায়ই মুখ ধরে না। কাণ্ডের ত্বক ফেলিয়া দিলেই, উহা ব্যঞ্জনে ও দাইলে খাওয়ার উপযোগী হইয়া থাকে। এই কচু-ভাজা রসনার তৃপ্তিকর। পূর্ব্ববঙ্গে ইহা উৎকৃষ্ট সব্জীমধ্যে পরিগণিত। সাদা শোলাকচু ব্যঞ্জনাদিতে ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে, উহার কর্ত্তিতখণ্ডগুলি উষ্ণজলে অত্যল্পসময় সিদ্ধ করিয়া লইতে পারিলে, ঐগুলি অতিশয় কোমল হয়। তদবস্থায়, উহাতে গলা চুলকাইবার আশঙ্কাও বড় কম রহে। অধিকন্তু, উহার ভাজাও বেশ সুস্বাদু হইয়া থাকে।

(খ) কৃষ্ণ শোলাকচু—একমাত্র বর্ণের পার্থক্য ভিন্ন, ইহা আকার, স্বভাব প্রভৃতি অন্যান্য সকল বিষয়েই সাদা শোলাকচুর অনুরূপ। ইহার চাষ ও ব্যবহার-প্রণালীতেও কোনরূপ পার্থক্য নাই। কৃষ্ণ শোলাকচুগাছের

কাণ্ডত্বক ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ এবং পত্রবৃন্ত বা ডাঁটা ও পত্র কৃষ্ণবর্ণের হয়। এই গাছ দেখিতে বড়ই সুন্দর। কিন্তু ইহার কাণ্ডের 'মাংস' পূর্ব্বোক্ত জাতির মাংসাপেক্ষা কিঞ্চিৎ কঠিন।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রায় সর্ব্বত্রই, উক্ত উভয়প্রকার শোলাকচুর চাষ হইয়া থাকে। এই দ্বিবিধপ্রকার কচুই পূর্ব্ববঙ্গে পাইনা-কচু নামে পরিচিত। পানী বা জলে জন্মে বলিয়াই, উহার উক্তরূপ নামকরণ হইয়াছে। ইহারা উত্তরবঙ্গে বাঁশপোর বা বাঁশপোল কচু নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বৃহদাকারের বাঁশপোর কচুকে রঙ্গপুরে 'ঢেকিয়া বাঁশপোর' কচু কহে। তথায় ইহা অধিক পরিমাণে জন্মে। বর্ষাকালে পূর্ব্ববঙ্গে তরকারী একরূপ দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়ে। তৎকালে একমাত্র শোলাকচুই তরকারীর অভাব অনেকাংশে পূরণ করিয়া থাকে। অধুনা, পশ্চিমবঙ্গের কোনও কোনও স্থানেও ইহার চাষ হইতেছে। শোলাকচুগাছের কাণ্ডের দৈর্ঘ্য সাধারণতঃ দুই হাত কি আড়াই হাতের অধিক হয় না।

(গ) **নারিকেলী কচু**—ইহা প্রায় সর্ব্বাংশেই সাদা শোলাকচুর অনুরূপ। পূর্ব্ববঙ্গের কুমিল্লা, নোয়াখালী, বাকরগঞ্জ ও ময়মনসিংহ জিলা এবং আসামের শ্রীহট্ট জিলায় অত্যধিকপরিমাণে নারিকেলী কচুর চাষ হয়। ঢাকা জিলার কোনও কোনও স্থানেও, অত্যল্পপরিমাণে ইহার চাষ হইয়া থাকে। নারিকেলী-কচুর পাতা পীতাভ-সবুজবর্ণ, হৃৎপিণ্ডাকার ও নাতিদীর্ঘ হয়। ইহার পত্রবৃন্ত পূর্ব্বোক্ত কএক-প্রকার কচুর পত্রবৃন্ত অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক স্থূল, পাতলা সবুজবর্ণ; এবং উহার নিম্নভাগ আংশিক দ্বিখণ্ডিত হইয়া থাকে। নারিকেলী-কচুগাছের কাণ্ড এক হইতে দুই ফুট দীর্ঘ; কাণ্ডের বর্ণ সাদা শোলাকচুর কাণ্ডের বর্ণের ন্যায় এবং কাণ্ডের স্থূলতা শোলাকচুর কাণ্ড অপেক্ষা ন্যূন হয়। ইহার চাষ-প্রণালীও সাদা শোলাকচুর চাষেরই অনুরূপ। নিম্নভূমি ইহার চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। উচ্চ ভূমিতেও ইহার চাষ করা যায়। দো-আঁশ মৃত্তিকাতেই নারিকেলী-কচু বিশেষ স্ফূর্ত্তি লাভ করে। বালিপ্রধান-কর্দ্দম এবং লালমাটীতেও ইহার চাষ হয়। গোবিষ্ঠা ও উদ্ভিজ্জসারই ইহার চাষোপযোগী সার।

নারিকেলী-কচুর ডাঁটা, কাণ্ড, পত্র ও লত—সকল অংশই খাওয়া যায়। তন্মধ্যে, কাণ্ডই উৎকৃষ্ট খাদ্য। ইহাও শোলাকচুর কাণ্ডের ন্যায় ব্যঞ্জনাদিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা অগ্নির জালে সুসিদ্ধ করিলেও, শোলা-কচুর ন্যায় গলিয়া যায় না;—কিঞ্চিৎ শক্ত রহে। তবে অর্দ্ধসিদ্ধ অবস্থায়ও ইহাতে গলা চুলকায় না বলিয়া, বেশ চিবাইয়া খাওয়া যায়। নারিকেল-শস্যের ন্যায় চিবাইয়া খাইতে কচ্ কচ্ করে ও সুস্বাদু বলিয়াই, ইহার উক্তরূপ নামকরণ হইয়াছে। নারিকেলী-কচুগাছও অধিক পরিমাণে লত বিস্তার করে না। তদ্ভিন্ন, শোলাকচুর ন্যায়, ইহারও মূলাংশ হইতে চারা জন্মে। ঐ সকল চারা সংগ্রহ করিয়াই ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হয়। ইহার চাষেও বিশেষ লাভ আছে।

মুখীকচু।

(Arum Ægypticum of Dr. Roxburgh.)

মুখীকচুগাছ দেখিতে সাধারণ কচুগাছের ন্যায়; কিন্তু তদপেক্ষা খর্ব্বাকৃতির হয়। ইহার পত্র ক্ষুদ্র ও হৃৎপিণ্ডাকার; এবং পত্রবৃন্ত হ্রস্ব। ইহার আসল কাণ্ড, পত্র ও পত্রবৃন্ত অখাদ্য। আসল কাণ্ড হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতান বহির্গত হইয়া মৃত্তিকামধ্যে বিস্তৃত হয়। ঐ সকল প্রতানের অগ্রভাগে বা মুখে শকরকন্দ আলুর ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফীতকন্দ উৎপন্ন হইয়া থাকে। কচুর মুখ হইতে স্ফীত-কন্দের উৎপত্তি হয় বলিয়াই, উহাদিগকে মুখীকচু কহে। গোল আলুর ন্যায়, এক একটি গাছের নীচে অনেকগুলি মুখীকচু জন্মে। এই সকল মুখীকচুই খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। উহা উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়াই ব্যঞ্জনাদিতে ব্যবহার করা আবশ্যক। নচেৎ, গলা চুল্কাইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা রহে। ইহার অম্বলও সুস্বাদু হয়। এ দেশের গরিব লোকেরা কখনও কখনও তৈল, লবণ ও মরিচের সহিত মুখীকচু বাটিয়া লইয়া, উহাও উপাদেয় বোধে গলাধঃকরণ করিয়া থাকে। উক্ত স্ফীতকন্দগুলি শ্বেত ও ধূসর বর্ণের হয়; এবং উহার স্থানে স্থানে ধূসরবর্ণের আঁইশবৎ পদার্থ দ্বারা আবৃত রহে। ইহা অল্প উত্তাপেই গলিয়া যায়।

ডাক্তার রক্স্বার্গের মতে, মুখীকচুর জন্মস্থান ইজিপ্ত দেশ। কিন্তু ইহা সত্য নহে। অতি প্রাচীনকাল হইতেই পূর্ব্ববঙ্গে মুখীকচু স্বতঃই জন্মিতেছে; এবং এই স্থানই ইহার আদি জন্মভূমি। উচ্চ ভূমিতে ইহার চাষ হয়। দো-আঁশ বা বালিপ্রধান দোঁ-আশ মৃত্তিকা মুখীকচুচাষের পক্ষে উপযোগী। সসার হাল্কা মৃত্তিকায় ইহার মুখ বা বীজ রোপণ করিতে হয়। মৃত্তিকা উত্তমরূপে কর্ষিত এবং চূর্ণীকৃত হওয়া আবশ্যক। ইহার চাষে প্রচুর পরিমাণে সার ব্যবহার করিতে পারিলে সুফললাভ করা যায়। গোময় বা উদ্ভিজ্জসার মুখীকচুর পক্ষে প্রশস্ত। ছাই-সারও মন্দ নহে।

ফাল্গুন হইতে বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত মুখীকচু রোপণের সময়। সাধারণতঃ বৈশাখমাসেই ইহার চোখ (স্ফীতকন্দ) রোপণ করা হয়। কৃষকেরা মধ্যমাকারের কচু (মুখী) ক্ষেত্রে রাখিয়া, অপর সকল কচু উত্তোলন করে। সেই সকল মুখী বা বীজ হইতে অঙ্কুর উদ্গত হইলে উত্তোলন করিয়া ক্ষেত্রের সারিতে রোপণ করিতে হয়। পক্ষান্তরে, যে কচু উঠাইয়া লওয়া হয়, তাহা হইতে সুপুষ্ট কচু বীজের জন্য বাছিয়া লইয়া, তাহাও ক্ষেত্রের সারিতে রোপণ করা যায়। জমি প্রস্তুত হইলে পর, প্রথমতঃ তাহাতে একহস্ত ব্যবধানে এক একটি সারি করিতে, এবং প্রত্যেক সারিতে লাঙ্গল টানিয়া সাত আট ইঞ্চি পরিমাণ গভীর জুলি করিতে হইবে। তৎপর, প্রত্যেক জুলির অর্দ্ধহস্ত অন্তর অন্তর এক একটি বাছাইকরা বীজ (মুখী) রোপণ করিয়া, তদুপরি মাটি চাপা দিলেই রোপণ-কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। চারা বড় হইয়া উঠিলে, উহার গোড়ার মৃত্তিকা খোচাইয়া আল্গা করিয়া দিতে হয়। তদ্ভিন্ন, চারাগাছের গোড়ায় স্তূপাকারে মাটি দিয়া 'বেদি' বাঁধিয়া দিতে পারিলে ভাল হয়। ক্ষেত্রে যাহাতে জল না দাঁড়ায়, তৎপ্রতিও বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। কারণ, ক্ষেত্রে জলবদ্ধ হইলে মুখীকচুগাছ মরিয়া যায়।

আশ্বিন হইতে পৌষ মাস পর্য্যন্ত কচু উঠান যাইতে পারে। প্রত্যেক গাছের গোড়ায় ২।৩ সের মুখী পাওয়া যায়। প্রতি সের মুখীকচু ৴১০ হইতে ৴০ আনা দরে বিক্রয় হয়। ইহার চাষও লাভজনক। প্রতি বিঘায় অনূন ৪০৲ টাকা লাভ হইয়া থাকে। ইহার চাষের ব্যয়ও খুব কম।

ডাক্তার রক্স্বার্গের গুড়িকচু এবং আসুকচুও মুখী-কচুর অন্তর্ভূত। তবে উহাদের সহিত মুখীকচুর সামান্য পার্থক্য লক্ষিত হয়। প্রথমোক্ত দুইপ্রকার কচুর মূল, শেষোক্ত মুখীর মূল অপেক্ষা বড় হয়। ঐ মূলেরও পার্শ্বদেশে যে স্ফীতকন্দ উৎপন্ন হয়, উহাই খাদ্য; কিন্তু বৃহৎ মূল অখাদ্য। গুড়িকচু ও আসুকচুর চাষ-প্রণালী মুখীকচুর চাষ-প্রণালীরই অনুরূপ;—কোনও পার্থক্য নাই। কিন্তু উহাদের ফসল মাঘ ফাল্গুন মাসে সংগ্রহ করিতে হয়। গুড়িকচু ও আসুকচুর স্ফীতকন্দ কিয়দংশে গোল-আলু বা ক্ষুদ্র শকরকন্দ আলুর অনুরূপ আকৃতিবিশিষ্ট। ইহাদের অধিবাস পশ্চিমবঙ্গ। মুখীকচুর ন্যায়, ইহাদের চাষেও লাভ হয়।

পঞ্চমুখী কচু—Arum Khashianum.

পঞ্চমুখীকচুর জন্মস্থান খাসিয়া, জয়ন্তিয়া, নাগা ও গারো পাহাড়। ইহার অন্য নাম—পেচাকচু, নাগাকচু ও গারো-কচু। ইহার আসল কন্দের পার্শ্ব হইতে সাধারণতঃ পাঁচটি চক্ষুবৎ উপকন্দ বহির্গত হয়। এই জন্যই, বোধ হয়, ইহার নাম পঞ্চমুখীকচু হইয়াছে। এই কচু পঞ্চমুখী নামে বিখ্যাত হইলেও, উহার কোনও কোনও কন্দে তিনটি হইতে সাত আটটি মুখও বহির্গত হইয়া থাকে। পেচক বা পেঁচাপক্ষীর চক্ষুর অনুরূপ আকৃতিবিশিষ্ট হয় বলিয়াই, উহা পেঁচা-কচু নামে অভিহিত হইয়া থাকে। গারোকচু ইহার সাধারণ নাম। গারোপাহাড় ইহার আদি জন্মস্থান বলিয়াই, ইহা সাধারণতঃ গারোকচু নামেই পরিচিত। ইহার কন্দ বৃহৎ মেটে আলুর ন্যায়; কখন কখন ৩ হইতে ৫।৭ সের ওজনের হয়। গারোকচুর কন্দ ধূসরবর্ণ ও পর্দ্দাচ্ছাদিত এবং শ্বেতাভ ধূসরবর্ণের রেখান্বিত হয়। ইহার নিম্নদেশ সরু; এবং মুখ বা চক্ষু আঁইশযুক্ত পর্দ্দাবৃত। উহা শুষ্কাবস্থায় পর্দ্দার ন্যায় দেখায়। পঞ্চমুখীর পত্র হৃৎপিণ্ডাকার; কিন্তু উহার মধ্যদেশ ঈষৎ গোলাকার, পীতাভ-সবুজবর্ণ ও শিরাবৃত; এবং পত্রবৃন্ত দুই হইতে

চারি ফুট দীর্ঘ হইয়া থাকে। পত্রবৃন্তের উর্দ্ধদেশ প্রায় গোলাকার; কিন্তু উহার নিম্নাংশ প্রায় দ্বিখণ্ডিত। পত্র-বৃন্তের উপরিভাগের স্থূলতা অর্দ্ধ ইঞ্চ হইতে এক ইঞ্চি ও নিম্নভাগের স্থূলতা তিন হইতে চারি ইঞ্চি পর্য্যন্ত হয়। পঞ্চমুখীর কন্দের মাংস শ্বেতবর্ণ, এবং কন্দ দেখিতে সুন্দর। ইহার মূলকন্দের পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপকন্দ বা চক্ষু দ্বারা বীজের কার্য্য সাধিত হয়।

বালিপ্রধান লাল কর্দ্দক-মৃত্তিকাই গারোকচুর চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। যে মৃত্তিকায় লৌহের ভাগ আছে, উহাতেই ইহারা বিশেষ স্ফূর্ত্তিলাভ করে। গারোকচুর পক্ষে উদ্ভিজ্জসারই অত্যুৎকৃষ্ট। গারো, খসিয়া, জয়ন্তিয়া এবং নাগা প্রভৃতি পাহাড়ের ঢালুর উপর ইহার চাষ হয়। ৩।৪ সহস্র ফুট উচ্চস্থানেও ইহা জন্মে। আর্দ্রবায়ুবিশিষ্ট শুষ্কস্থানই গারোকচুচাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। যে সকল স্থানে চা'র (Tea) চাষ হইয়া থাকে, সেই সকল স্থানেই ইহার চাষে সাফল্যলাভ করা যায়। নিম্নস্থানে অথবা আর্দ্র বা স্যাঁৎসেতে মৃত্তিকায় ইহা কদাচিৎ জন্মে। সামান্য আর্দ্র মৃত্তিকাই গারোকচুচাষের পক্ষে উপযোগী হইয়া থাকে। লাল কর্দ্দমময় নিম্নস্থানেও ইহার চাষ করা যায়। যে স্থানে বৃষ্টির জল দাঁড়ায়, তদ্রূপ স্থান ইহার চাষের পক্ষে উপযোগী নহে। পাহাড়ে অত্যধিক পরিমাণে বৃষ্টিপাত হইলেও, উহার ঢালুতে জল দাঁড়ায় না; অথচ, উহাতে ভূমির আর্দ্রতা আবশ্যকানুসারেই রক্ষিত হয়। এই জন্যই পাহাড়ের ঢালুতে বা টিলার (অত্যুচ্চ স্থান) উপরে ইহা উত্তমরূপে জন্মে। নিম্ন-প্রদেশের উচ্চস্থানেও গারো-কচুর চাষ করা যায়। তথাকার যে সকল জঙ্গলের মৃত্তিকা লাল কর্দ্দমযুক্ত, সেই সকল জঙ্গলা-ভূমি আবাদ করিয়াও ইহার চাষ করা যাইতে পারে। যে সকল স্থান বহুকাল জঙ্গলা-অবস্থায় পতিত রহে, সেই সকল স্থানই উদ্ভিজ্জসার-প্রধান। ঐ সকল স্থানের জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া (reclaim), উহাতে পঞ্চমুখীকচুর চাষ করিতে পারিলে কখনও সুফললাভে বঞ্চিত হইতে হয় না। গারো-জাতীয় কৃষকেরা সাধারণতঃ ঐরূপ ভূমিতেই ইহার চাষ করিয়া থাকে।

গারোকচুর কন্দ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। স্নিগ্ধস্থানে রাখিলে, উহা সত্বরেই পচিয়া যায়। সেই জন্য ফসল-সংগ্রহের ২।৩ মাস পরেই, ইহার কন্দ রোপণ করিতে হয়। সাধারণতঃ কার্ত্তিক হইতে পৌষ মাস পর্য্যন্ত গারোকচু সংগৃহীত হইয়া থাকে। সুতরাং মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র মাসের মধ্যে জমি প্রস্তুত করিয়া, উহাতে বৈশাখমাসে বীজ (মুখী) রোপণ করা উচিত। নিম্ন প্রদেশে অগ্রহায়ণ পৌষ মাসেও গারোকচুর বীজ-রোপণ-কার্য্য চলিতে পারে। আমি আমার কৃষিক্ষেত্রে, সাধারণতঃ এই সময়েই বহুবার মুখী রোপণ করিয়াছিলাম। কিন্তু মৃত্তিকা ও জল-বায়ুর প্রতিকূলতাহেতু, কোনও বারেই আশানুরূপ ফললাভ করিতে পারি নাই। আমার ক্ষেত্রে এক হইতে দুই সেরের অধিক ওজনের কন্দ কখনও জন্মে নাই। পাহাড় ব্যতীত, অন্যত্র ইহার ফলন বড় ভালও হয় না। নিম্ন-প্রদেশে গারোকচুর চাষ করিতে হইলে, মৃত্তিকার সহিত সামান্য পরিমাণে ছাই ও পোড়ামাটি মিশ্রিত করিয়া লইতে হয়।

গারোকচুর চাষ করিতে হইলে, মৃত্তিকা কোদাল দ্বারা উত্তমরূপে কোবাইয়া লওয়া আবশ্যক। তৎপর, মাটির ঢিলা মুগুর (মুদ্গর) দ্বারা উত্তমরূপে চুর্ণ করিয়া, উহা হইতে আগাছা, খোলা, খাপ্‌ড়া ও মুথাদি বাছিয়া ফেলিতে হইবে। তাহা হইলেই জমি প্রস্তুত হইল। জমি প্রস্তুত হইলে পর, তাহাতে সারি করিয়া একহাত অন্তর অন্তর খুপী কাটিতে, এবং উহার প্রত্যেক খুপীতে (খোপে) এক একটি করিয়া চোখ রোপণ করিতে হয়। গারো-কৃষকেরা কখনও কখনও ইহার চোখ উল্টা করিয়া রোপণ করে; অর্থাৎ চোখ নিম্নদিকে ও মূল উর্দ্ধদিকে রাখিয়া গর্ত্তের মধ্যে মাটিচাপা দেয়। তাহারা বলে, এইরূপভাবে রোপণ করিলে, কন্দের মুখ চেপ্টা হইয়া, উহার বিস্তার বর্দ্ধিত করে; এবং তদবস্থায় বৃহৎ কন্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কথাটা অযৌক্তিক নহে। কিন্তু আমি কখনও উল্টাভাবে রোপণ না করিয়া, সকলসময়েই স্বাভাবিক রীতির অনুবর্ত্তন করিয়াছি; অর্থাৎ মুখ বা চোখ উপরে রাখিয়াই রোপণ করিয়াছি। গারোদের মতে, চোখ নীচে রাখিয়া রোপণ

করিলে, উহার মুখ হইতে পত্রসহ পত্রবৃন্ত সকল পার্শ্বদেশ ভেদ করিয়া নির্গত হয়; এবং মূল হইতে শিকড় বহির্গত হইয়া ভূমিতে প্রবিষ্ট হয় ও গাছের খাদ্য যোগায়।

গারোকচুর কন্দ সুখাদ্য। সর্ব্বপ্রকার কচুর মধ্যে ইহাই অত্যুৎকৃষ্ট ও সুস্বাদু। ইহা ব্যঞ্জনাদিতে ব্যবহৃত হয়। গারোকচুতে গলা ধরে না সত্য, কিন্তু তথাপি, উহা প্রথমতঃ সিদ্ধ করিয়া লইয়াই, পরে ব্যঞ্জনাদিতে ব্যবহার করার রীতি প্রচলিত রহিয়াছে। গারোকচু সিদ্ধ করিলে গলিয়া যায় ও কোমলতা-প্রাপ্ত হয়। ইহার কন্দমূল শ্বেতসার-প্রধান; সুতরাং, উহা অতিশয় পুষ্টিকর খাদ্য। এই কন্দ টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া শুষ্ক করিয়া লইলে, উহা দ্বারা একপ্রকার ময়দা প্রস্তুত করা যাইতে পারে। ঐ ময়দার চাপ্‌টি ও বড়ি ব্যঞ্জনাদিতে ব্যবহৃত হয়।

পঞ্চমুখীকচুর ক্ষেত্র সময় সময় নিড়াইয়া পরিষ্কার রাখিতে হয়। কচুগাছগুলি বড় হইয়া উঠিলে, নিড়াইবার সময় উহাদের গোড়ার মৃত্তিকা আল্‌গা করিয়া দেওয়া আবশ্যক। তদ্ভিন্ন, ইহার চাষে অন্য কোনরূপ পাইটের প্রয়োজন হয় না। রোপণের ৮।১০ মাস পরেই কচু খাইবার যোগ্য হয়। যত অধিক দিবস ক্ষেত্রে রাখা যায়, ততই উহা বড় হইয়া থাকে। কিন্তু বৎসরাধিক অতীত হইয়া গেলে, ক্রমেই উহা শক্ত হইয়া যায়।

প্রত্যেক বিঘায় ন্যূনাধিক ৬০০০ কন্দ পাওয়া যায়। উহার প্রত্যেকটি ৷১০ পয়সা হইতে ৵০ আনা মূল্যে বিক্রয় হয়। ঢাকাতে গারোকচুর সের ৵০ আনার কমে পাওয়া যায় না। গড়ে প্রতিবিঘায় ৪০০০ কন্দ এবং প্রত্যেকটি কন্দের মূল্য ⁄০ আনা হিসাবে ধরিলেও, এক বিঘায় উৎপন্ন পঞ্চমুখীকচুর মূল্য ২৫০৲ টাকা হয়। কিন্তু অধিকাংশ সময়েই, ইহার সকল কন্দ সমভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না। পক্ষান্তরে, কোন কোনটি একেবারেই বর্দ্ধিত হয় না। যথোচিত খাদ্যের অভাবে কচুগাছগুলি সতেজে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে না পারিলেই, উহাদের কন্দ ক্ষুদ্রাকৃতির হইয়া পড়ে। ভূমির উর্ব্বরতা সর্ব্বত্র সমান রহে না; বিশেষতঃ, সার-ব্যবহারের ত্রুটীতেও কন্দের বর্দ্ধনোপযোগী খাদ্যের অভাব ঘটে। অনাবৃষ্টি প্রভৃতি দৈব-কারণেও কন্দের বর্দ্ধন-কার্য্য স্থগিত রহে। অপুষ্ট কন্দগুলি পরবর্ত্তীবৎসরের বীজের কার্য্য সাধন করিয়া থাকে। মোটকথা, নানা কারণেই আশানুরূপ ফললাভে ব্যাঘাত জন্মে। সুতরাং, ৪০০০ কন্দের মূল্য গড়ে ⁄০ আনা হিসাবে ধরিলে যে ২৫০৲ টাকা হয়, তাহার অর্দ্ধাংশ দৈবক্ষতি বাবদ বাদ দিলেও প্রতি বিঘায় ১২৫৲ টাকা লাভ দাঁড়ায়। উহা হইতে চাষের মোট ব্যয় ২৫৲ টাকা বাদ দিলেও, প্রতিবিঘায় অন্যূন ১০০৲ টাকা নিট লাভ হইতে পারে। বলা বাহুল্য, খুব কম করিয়াই হিসাব ধরা হইল। তুচ্ছ কচুর চাষে বিঘাপ্রতি ১০০৲ টাকা লাভ উপেক্ষার বিষয় নহে। যাহারা এরূপ লাভজনক সব্‌জী-চাষেও উপেক্ষা প্রদর্শন করে, তাহাদের অদৃষ্টে কচুপোড়াই ঘটে।

বিন্নিকচু—Arum Khashianum Var.

বিন্নিকচু পঞ্চমুখীকচুরই রূপান্তর মাত্র। পাহাড়-অঞ্চলেই ইহা উত্তমরূপে জন্মে। ২।৩ হাজার ফুট উচ্চ পাহাড়েও বিন্নিকচুর চাষ করা যায়। ইহার চাষেও গারোকচুর চাষের অনুরূপ মৃত্তিকা ও জলবায়ু আবশ্যক। নিম্ন-ভূভাগের উচ্চস্থানে, বালিপ্রধান কর্দ্দম-মৃত্তিকাতেও ইহার চাষ হইতে পারে। ইহার চাষ ও রোপণ প্রণালী পূর্ব্বোক্ত জাতির ন্যায়;—কোনরূপ পার্থক্য নাই। বিন্নি-কচুর কন্দ দীর্ঘাকার অর্থাৎ নয় ইঞ্চি হইতে এক ফুট পর্য্যন্ত দীর্ঘ হয়। কন্দের স্থূলতা ৩ হইতে ৪ ইঞ্চি; কাণ্ড ধূসর-বর্ণ ও ধূসরবর্ণের আঁশযুক্ত পর্দ্দাবৃত এবং পাতা হৃৎপিণ্ডা-কার ও সবুজবর্ণের হয়। ইহার কন্দও খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়; এবং উহাও সুখাদ্য। পঞ্চমুখীকচুর ব্যবহার-প্রণালী অবলম্বনেই, বিন্নিকচুও ব্যঞ্জনাদিতে ব্যবহার করা হয়। ইহা সিদ্ধও খাওয়া যায়।

বিন্নিকচুরও জন্মস্থান গারো-পাহাড়। অধুনা, নিম্ন-প্রদেশেও ইহার চাষ হইতেছে। গারো-পাহাড়ের পাদদেশস্থ নিম্নস্থানসমূহে এবং ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা প্রভৃতি জেলায় ইহা বেশ জন্মিতেছে। ইহার মূল রৌদ্রে কিঞ্চিৎ শুষ্ক করিয়া রাখিলে দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। এমন কি, উহা ৫।৬ মাস ঘরে রাখিয়াও খাওয়া যায়। বিন্নি-কচুর কন্দও শ্বেতসারপ্রধান। ইহার কন্দ-মূলও পুষ্টিকর

খাদ্য ; এবং তদ্দ্বারাও মদ্যও প্রস্তুত করা যায়। বিরিকচু রন্ধন করিলে গলিয়া যায়। এই প্রকার কচুর চাষেও প্রতিবিঘায় অন্যূন ৫০৲ টাকা লাভ হয়।

শরকচু।

(Arum Nymphæfolium of Roxburgh.)

শরকচুর পত্রের আকৃতি অনেকাংশে কুমুদপত্রের অনুরূপ বলিয়া, ইহা সাপলা-কচু নামেও পরিচিত। এই কচু জলে এবং স্থলে—সর্ব্বত্রই জন্মে। জলে ইহার গাছ অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। জলাশয়ের এবং বিল-ঝিলের ধারে স্বতঃই শরকচুগাছ জন্মে। এ দেশে ইহার চাষ হয় না। শরকচুর মূল, ডাঁটা, পাতা ও নত খাওয়া যায়। কিন্তু ইহার গলা-ধরা দোষ আছে। সেই জন্য রন্ধনের পূর্ব্বে, উহা অগ্ন্যুত্তাপে উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া লওয়া আবশ্যক। ইহার অন্তর্ভৌম-কাণ্ড স্থূল ও দীর্ঘ হয়। শরকচুর পত্র ও পত্রবৃন্ত ঈষৎ লালবর্ণ, দীর্ঘ ও সরু হইয়া থাকে। কচু-জাতির মধ্যে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদাকারের হয়। যত্নের সহিত চাষ করিতে পারিলে, ইহার বন্য-স্বভাব ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হইতে পারে। তদবস্থায়, ইহার চাষও যে বিশেষ লাভজনক হইবে, তাহা নিঃসন্দেহেই বলা যায়।

সুগন্ধিকচু।

(Arum or Colocasia Fragrantissimum.)

সুগন্ধি-কচুর জন্মস্থান খসিয়া, নাগা ও গারো পাহাড়। এই কচুর কন্দমূল সুগন্ধযুক্ত বলিয়াই, ইহাকে সুগন্ধিকচু নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ইহার কাণ্ড ধূসরবর্ণ, ২।৩ ফুট দীর্ঘ এবং ২।৩ ইঞ্চি স্থূল হয়। পত্রকক্ষের সন্ধিস্থল গ্রন্থিল ; পত্র হৃৎপিণ্ডাকার ও রোপ্যের ছটাযুক্ত খেতাভ সবুজ ; পত্রবৃন্ত সরু ও খাপ্‌কাটা ; এবং কাণ্ডজাত মাংস রক্তাভ-শ্বেতবর্ণ। সুগন্ধি-কচুর কন্দমূল রান্ধনাদিতে দিলে, উহাও সুগন্ধযুক্ত হইয়া থাকে। ইহা অতিশয় পাচক ও পুষ্টিকর। এই কচু খাইলে, অত্যধিকরূপে ক্ষুধা বাড়িয়া যায়। আমি গারো-পাহাড় হইতে সুগন্ধি-কচুর চারাগাছ আনয়ন করিয়া, উহা নিজ নার্শারী-বাগানে রোপণ করিয়াছি। চাষ-পরীক্ষার ফলাফল "কৃষি-সম্পদের" পাঠকদিগকে পরে জানাইবার বাসনা রহিল।

সুগন্ধি-কচুর গাছ প্রায় সকল প্রকার মৃত্তিকাতেই জন্মে। তবে নিরেট বালি ও নিরেট কর্দ্দম মৃত্তিকা ইহার চাষের পক্ষে অনুপযোগী। বালিপ্রধান লালকর্দ্দম-মৃত্তিকাতে ইহা বিশেষ স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়া থাকে। নিম্ন-প্রদেশে ইহার চাষ করিতে হইলে, উদ্ভিজ্জসার-প্রধান মৃত্তিকার সহিত সুরকি, কঙ্কর ও পোড়ামাটি মিশ্রিত করিয়া লওয়া আবশ্যক। এই মিশ্রপদার্থের দ্বারা গর্ত্তের সর্ব্বাংশ পূর্ণ করিয়া লইয়া, তাহাতেই চারাগাছ রোপণ করিতে হয়। ইহার কন্দ পূর্ণাবয়বপ্রাপ্ত হইতে প্রায় দুইবৎসর লাগে। বর্ষার প্রারম্ভে কন্দের উপরিভাগ ২।৩টী পাতাসহ কাটিয়া, অথবা উহার গাত্র হইতে পার্শ্বাঙ্কুর বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া, তাহাই রোপণ করিতে হয়। একহাত ব্যবধানে সারি করিয়া, উহার প্রত্যেক সারিতে একহাত অন্তর অন্তর চারা রোপণ করিতে হয়। পাত্রেও উহার চাষ করা যায়। নিম্ন-প্রদেশে ইহার চাষ লাভজনক হইবে কিনা, তাহারই পরীক্ষা করিতেছি। পরীক্ষার ফল বারান্তরে লিখিত হইবে।

মাণক বা মানকচু।

(Colocasia or Alocasia Indica)

মানকচু বা মাণকন্দ উত্তম তরকারী। ইহার সংস্কৃত নাম মাণক, স্থলপদ্ম ও মহাপাত্র।

"স্থলপদ্মস্তু মাণকঃ।"

বচনান্তর যথা :—

"মাণকঃস্যান মহাপাত্রঃ।"

এই মাণকই বাঙ্গালাভাষায় মান শব্দে রূপান্তরিত হইয়াছে। ইহা হিন্দিভাষায় মানকন্দ, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় কস্‌আলু এবং কর্ণাটীভাষায় ভোগমানা নামে পরিচিত। উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে কেহ কেহ মাণককে এলোক্যাসিয়া (Alocasia) পরিবারভুক্ত করিয়াছেন। পক্ষান্তরে,

কাহারও কাহারও মতে, ইহা কচু (Arum) পরিবারের অন্তর্ভুক্ত বলিয়াও নির্দ্দেশিত হইয়াছে। আমার মতে, ইহা কলোকাসিয়া (Colocasia) পরিবারেরই অন্তর্গত জাতি-বিশেষ। মাণক বঙ্গদেশে মানকচু, মানকন্দ বা মাণগুড়ি নামেও পরিচিত। ইংরেজী ভাষায় ইহা 'Colocasia Indica', 'Alocasia Indica' এবং 'Arum Indica' নামে অভিহিত হয়।

মাণক মৃদুবিরেচক, মূত্রকারক, শোথহারক, শীতবীর্য্য, লঘু, পিত্ত ও রক্তদোষ নাশক। ইহার কন্দ, পত্রবৃন্ত প্রভৃতি ঔষধার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পরিপুষ্ট মানকন্দ কর্ত্তিতাবস্থায় ভালরূপে রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইলে, অর্থাৎ উহার শুঁঠ প্রস্তুত করিয়া লইলেই ঔষধ ও পথ্য রূপে ব্যবহারোপযোগী হয়। শুষ্ক করিয়া রাখিলে, ইহা দীর্ঘকাল অবিকৃত রহে। মানের শুঁঠ উপাদেয় পথ্য। ইহা লঘু, পুষ্টিকর, কিঞ্চিৎ স্নিগ্ধকর, মৃদুবিরেচক এবং মূত্রকারক। 'চক্রদত্ত' নামক সুপ্রসিদ্ধ বৈদ্যকগ্রন্থে উদররোগ, শোথ এবং জিহ্বারোগে মাণকের ব্যবহার-প্রণালী বিবৃত হইয়াছে। পুরাণ মানচূর্ণ ৮ তোলা, ঈষৎ কুটিত তণ্ডুল ১৬ তোলা এবং একসের দুগ্ধ ও তাহার সমপরিমাণ জল—এই সকল দ্রব্যে পায়স প্রস্তুত করিয়া, পাচক ও অগ্নির বল অনুযায়ী, উদর-রোগীকে ভোজন করাইলে, উদররোগ আরোগ্য হয়। পুরাণ মানচূর্ণ আধতোলা, আধপোয়া ঈষদুষ্ণ দুগ্ধের সহিত পান করিলে, প্লীহাবিবৃদ্ধি বিনাশ পায়। ইহা সর্ব্বাঙ্গ কিম্বা একাঙ্গ শোথের পক্ষেও হিতকর। মাণের কাথ ও কল্কযোগে যথাবিধি ঘৃতপাক করিয়া,—মাণকঘৃত প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে, একজ, দ্বন্দজ এবং ত্রিদোষজ শোথে বিশেষ সুফল লাভ করা যায়। মাণ অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া, সেই ভস্ম সর্ষপতৈল এবং সৈন্ধব-লবণযোগে জিহ্বায় ঘর্ষণ করিলে জিহ্বার জড়তা বিনষ্ট হয়। মাণমণ্ড শোথরোগের অব্যর্থ মহৌষধ। মানের পত্রবৃন্তের কটুরস সঙ্কোচক এবং রক্ত-রোধক রূপে সর্ব্বত্রই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ডাঁটাটি আগুনে সেঁকিয়া রস লইতে হয়। এই রস শিশুর পূতিকর্ণস্রাব বা কাণপাকা-রোগেরও মহৌষধ। কাণে ঘা হইলে, ঐ ক্ষতস্থানেও মানের ডাঁটার রস ব্যবহৃত হয়। মানের পচা ডাঁটার রস ও ঘুটের ছাই একত্র মিশ্রিত করিয়া পদশোথে প্রলেপ দিলে শোথ কমিয়া যায়। মানকে সরু টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া ও কর্ত্তিতখণ্ডগুলি কাপড়ে পুঁটুলী বাঁধিয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া লইলে, তদ্দ্বারা বাতরোগীকে স্বেদ দেওয়া যায়। এই স্বেদ বিশেষ হিতকর। মধুর সহিত মাণভস্ম মুখক্ষতের সর্ব্বজনপ্রিয় ঔষধ। স্থূলতঃ, মানকচুর ন্যায় উপকারী তরকারী অতি অল্পই আছে।

মাণকন্দ অতি পুষ্টিকর ও উপাদেয় খাদ্য। ইহা ব্যঞ্জনে ব্যবহৃত হয়। ইহার শিরড়যুক্ত নিম্নভাগ কঠিন বলিয়া কদাচিৎ অগ্নির উত্তাপে সিদ্ধ হইয়া থাকে। ঐ অংশ ব্যতীত অবশিষ্টাংশ খাওয়া যায়। কন্দের উপরিভাগ সুসিদ্ধ হয়। উহা সিদ্ধ খাইবার পক্ষেও উত্তম। মাণের ডাঁটা কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া ও জলে সিদ্ধ করিয়া, উহার শাক খাওয়া যায়। সিদ্ধ মানকন্দ পাটায় বাটিয়া বড়া (ভাজা-বিশেষ) প্রস্তুত করিলে, উহা সুখাদ্য ও মোথরোচক হয়। মানকচুর কন্দ বা পত্রবৃন্ত অগ্নির উত্তাপে জলে সিদ্ধ না করিয়া লইলে, উহাতে গলা ধরে। সুতরাং, অসিদ্ধ অবস্থায় কখনও উহা ব্যঞ্জনাদিতে ব্যবহার করা সঙ্গত নহে।

মাণের চাষেও বিশেষ লাভ আছে। বারমাসই ইহা রোপণ করা যায়। তন্মধ্যে, গ্রীষ্মকালই মাণ-রোপণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ব্যবসায়ের হিসাবে, বিস্তৃতভাবে মাণের চাষ করিতে হইলে, বৈশাখমাসেই নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে ইহার মূলোৎপন্ন চারা রোপণ করা বিধেয়। এ দেশের সর্ব্বত্রই মাণের চাষ হইতে পারে। ইহার কন্দের মূল হইতেই বহুসংখ্যক চারা বহির্গত হয়। এই সকল চারা উঠাইয়া রোপণ করা যায়। কিন্তু চারাগাছের কন্দ বিলম্বে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ ৭।৮ বৎসরের পূর্ব্বে, উহা পূর্ণাবয়বপ্রাপ্ত হয় না। পক্ষান্তরে, পুরাতন মাণের অগ্রভাগের চারি কি ছয় ইঞ্চি পরিমাণ কন্দ, তদুপরিস্থ কোমল পত্র ও পত্রবৃন্তসহ কর্ত্তন করিয়াও রোপণ করা যায়। যাহারা ক্ষেত্রে রোপণ করে না,—নিজের ব্যবহারের জন্য বাটীতে ২।৪টি গাছ জন্মায়, তাহারা ঐরূপভাবে মুখ কর্ত্তন করিয়াই রোপণ করে। মুখের গাছের কন্দই উৎকৃষ্ট ; এবং ২।৩ বৎসরেই, উহা যথোচিত বর্দ্ধিত হইয়া খাদ্যোপযোগী হয়। মাণকন্দ পূর্ণাবয়বপ্রাপ্ত

হইলে, ১০।১২ হাত দীর্ঘ এবং দুইহস্ত পরিমিত স্থূল হইয়া থাকে। সাধারণতঃ, উহার কন্দ ৩।৪ হাতের অধিক দীর্ঘ হয় না।

মাণের গাছ সাধারণতঃ বাড়ীর আঙ্গিনার পার্শ্বে ছাইয়ের গাদাতেই হয়। ঐরূপ স্থানেই ইহা উত্তম জন্মে। একহস্ত ব্যাস ও তদনুরূপ গভীর গর্ত্ত খনন করিয়া, প্রথমতঃ ছাই ও পোড়ামৃত্তিকাচূর্ণমিশ্রিত মৃত্তিকা দ্বারা গর্ত্ত পূরণ করিতে হয়। তৎপর, তাহাতে একটি চারা রোপণ করিলেই হইল। ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হইলে, ক্ষেত্রের মৃত্তিকা কোদালি দ্বারা কোবাইয়া ও ধূলিবৎ চূর্ণ করিয়া লইতে হয়। জমি প্রস্তুত হইলে পর, দুইহাত অন্তর অন্তর সারি করিয়া, উহার প্রত্যেক সারির দুইহাত ব্যবধানে মূল রোপণ করিতে হয়। প্রতিবিঘায় ন্যূনাধিক ১৬০০ গাছ জন্মে। ইহার চাষে বিশেষ যত্নের আবশ্যক হয় না। একবার মূল রোপণ করিলে, ২।৩ বৎসরমধ্যেই উহা ব্যবহারোপযোগী হইয়া থাকে। গাছ জন্মিবার পর, সময় সময় উহার পুরাতন পাতাগুলি ডাঁটাসহ কাটিয়া দিতে, এবং সময় সময় ক্ষেত্র নিড়াইয়া আগাছাদি পরিষ্কার করিতে হয়। মানকচু-ক্ষেত্র পরিষ্কার করা ও গাছের গোড়ার মৃত্তিকা আল্‌গা রাখা কর্ত্তব্য। তদ্ভিন্ন, সময় সময় মানগাছের গোড়ায় ছাই বা পোড়ামাটি সাররূপে ব্যবহার করিতে হয়। ইহাতে গাছ সত্বরই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। মাণের পক্ষে ছাই-সারই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। পোড়ামাটি এবং গোময়সারও ইহার পক্ষে উপকারী। গোময়সার ব্যবহার করিলে মান বড় হয় সত্য, কিন্তু উহাতে মুখধরা-দোষ জন্মে।

সজারু বা সেজা মানকচুগাছের প্রধান বৈরী। উহারা মানকন্দ খাইতে ভালবাসে; এবং উহা খাইয়া একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলে। সেজার উপদ্রব ঘটিলে, পাহারা দিয়া বা বন্দুকের গুলি করিয়া ২।৩ টি সেজা বধ করিতে হয়। তাহা হইলেই, উহারা ভয়ে স্থানান্তরে চলিয়া যায়। কলাগাছের সাহায্যেও সেজা বধ করিতে পারা যায়। পূর্ব্ববঙ্গের প্রায় সর্ব্বত্রই কলাগাছের দ্বারা সেজা বধ করিবার প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে। কলাগাছ টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া, উহা মানকচুগাছের চারিপার্শ্বে খাড়া (সোজাভাবে) করিয়া রাখিতে হয়। ঐ সকল কলাগাছের কোনও একখানি টুক্‌রার গা ঘেষিয়া দ্রুতবেগে গমন করিবার সময়, সেজার অঙ্গচালনা বা পাদবিক্ষেপ দ্বারা কলাগাছের টুক্‌রাখানি উহার গাত্রে পতিত হইলেই কার্য্যসম্পন্ন হয়। তদবস্থায় সজারুর গাত্রস্থ কণ্টকে কলাগাছের টুকরা এরূপভাবে বদ্ধ হইয়া পড়ে যে, উহার আর চলচ্ছক্তি রহে না। সুতরাং কলাগাছের টুক্‌রাবিদ্ধ সজারুকে সহজেই বধ করিতে পারা যায়। ঐরূপে ২।৪টি বধ করিতে পারিলে, উহারা ভয় পাইয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করে;—আর কখনও ক্ষেত্রে আইসে না।

সজারু দ্বারা মানক্ষেত্রের ক্ষতি না হইলে, একবিঘা জমির উৎপন্ন মানকচুগাছে, তিনবৎসরের পর, ন্যূনাধিক ৩০০৲ টাকা পাওয়া যায়। প্রত্যেকটি মানকন্দ, আকারানুসারে, ৵০ আনা হইতে ॥০ আনা মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে। গড়ে প্রত্যেকটির মূল্য ৵০ আনা ধরিলেও, ১৬০০ মাণকন্দের মূল্য ৩০০৲ টাকা হয়। চাষের ব্যয় অতি সামান্য। তিন বৎসরে একবিঘা জমির চাষের ব্যয় ও জমির খাজানা প্রভৃতি ৭৫৲ টাকার অধিক হইবে না। তাহা হইলেও, মোট ব্যয় বাদে, বিঘাপ্রতি ৭৫৲ টাকা লাভ দাঁড়ায়। ৪।৫ বৎসরের কন্দের মূল্য ৷৵০ আনা হইতে ১৲ টাকা পর্য্যন্ত হয়। মানক্ষেত্রে বেড়া দেওয়ার আবশ্যক হয় না। কেননা, কোনও পশুই ইহার গাছ স্পর্শও করে না।

উপফসলরূপে মানক্ষেত্রে আদা ও হলুদের চাষ করা যাইতে পারে। তদ্ভিন্ন, মাণক্ষেত্রের চারিপার্শ্বে কলাগাছ রোপণ করিলেও মানকচুর কোনরূপ ক্ষতি হয় না। ইহাতেও যৎকিঞ্চিৎ আয় হইতে পারে। যাহা হউক, মাণের চাষে বিঘাপ্রতি প্রতিবৎসর যে গড়ে ৭৫৲ টাকার কম লাভ হইবে না, তাহা নিঃসন্দেহেই বলা যায়। অযত্ন-উদ্ভূত মানকচু-চাষেও যদি কৃষকের দৃষ্টি আকৃষ্ট না হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের অদৃষ্টে কচুপোড়া ভিন্ন আর কি জুটিতে পারে?

মাণগাছকে নানা কারণেই এ দেশের লোক পবিত্র বলিয়া মনে করে। প্রবাদ এই যে, বিজয়া-দশমীর পর আড়াই দিন পর্য্যন্ত জগন্মাতা ভগবতী মাণতলায় বাস করেন। এই প্রবাদ-মূলে, এ দেশে বিজয়া দশমীর পরই, বাড়ীর আঙ্গিনায় মাণগাছ ও হলুদগাছ পুতিয়া রাখা হয়।

এই প্রথাটা বঙ্গের সর্ব্বত্রই প্রচলিত রহিয়াছে কিনা জানি না। তবে পূর্ব্ববঙ্গের অধিকাংশ স্থানেই, উক্ত প্রথানুযায়ী কার্য্য করা হয়। কথিত হয় যে, দেবাদিদেব মহেশ্বর জগন্মাতা ভগবতীকে মর্ত্তভূমে আসিতে সম্মতি প্রদান করেন না। কিন্তু তথাপি, স্বামীর অসম্মতি সত্ত্বেও, তিনি মর্ত্তভূমে আগমন করেন। ইহাতে মহাদেব রাগান্বিত হ'ন, এবং দশমীর পর যখন ভগবতী পুনরায় স্বামীসহ কৈলাশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে উদ্যোগী হ'ন, তখন মহাদেব তাঁহাকে তথায় যাইতে বাধা প্রদান করেন। ইহাতে ভগবতী মান করিয়া, মানকচুগাছের তলদেশে আড়াই দিন পর্য্যন্ত অবস্থান করিলে পর, আশুতোষ সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহাকে লইয়া কৈলাশ-ধামে গমন করেন। ভগবতীর আড়াই দিন অবস্থিতির জন্যই, এ দেশের হিন্দুরা মানের গাছ পবিত্র বলিয়া মনে করে। দুর্গোৎসবের সময় দুর্গামূর্ত্তির পার্শ্বে যে নবপত্রিকা স্থাপন করা হয়, উহা কদলী, দাড়িম্ব, ধান্য, হরিদ্রা, মানকচু, বিল্ব, অশোক, জয়ন্তী ও কচু—এই নয় গাছের পত্র দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। মাণগাছের সহিত মনুষ্যজীবনের বিশেষ কোনও সম্পর্ক না রহিলে, ধর্ম্মকার্য্যে উহার সংশ্রব রহিত কিনা সন্দেহ।

খাদ্য ও ঔষধ রূপে মাণগাছ মনুষ্যের বিশেষ হিতসাধন করে। দুর্ভিক্ষের সময় কেবল মাণকন্দ ভক্ষণ করিয়াও মানুষ বহুদিবস বাঁচিতে পারে। মানকচুর দ্বারা আচার, চাট্‌নী এবং জেলী প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। উহাও উৎকৃষ্ট খাদ্য। সুতরাং, এরূপ উপকারী ও আবশ্যকীয় উদ্ভিদের চাষে যত্নহীন হওয়া অনুচিত।

এ দেশের কুত্রাপি রীতিমত মাণের চাষ হয় না। কেহ কেহ, পারিবারিক ব্যবহারের জন্য, ২।৪টি গাছ বাড়ীর আঙ্গিনার পার্শ্বে রোপণ করিয়া থাকে। উচ্চস্থানে ইহার চাষ করিতে হয়, বিশেষতঃ ছাই-ই ইহার পক্ষে উৎকৃষ্ট সার—এই দ্বিবিধ কারণেই বাড়ীর পাশে মাণগাছ রোপিত হইয়া থাকে। নিম্নভূমির আর্দ্র বা স্যাঁৎসেঁতে মাটিতে মাণগাছ সতেজে বর্দ্ধিত হয় না। মানকচুর গাছে সর্ব্বদা রৌদ্র না লাগিলেই, উহার কন্দে গলা ধরিয়া থাকে। ব্যবসায়ের হিসাবে, বিস্তৃতভাবে মাণের চাষ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ভারতের পশ্চিম-প্রদেশবাসীরা সখের হিসাবে, উদ্যানের শোভার্থ, পুষ্পোদ্যানে মানগাছ রোপণ করে; কিন্তু তাহারা ইহা খাদ্যরূপে ব্যবহার করিতে জানে না। পক্ষান্তরে, বঙ্গের প্রায় সর্ব্বত্রই সব্জীর হিসাবে মানগাছ রোপিত হইয়া থাকে। যশোহরে একপ্রকার মান জন্মে, উহা প্রায়ই একহাতের অধিক দীর্ঘ হয় না। এইপ্রকার মানকচুতে মুখ ধরে না; এবং উহা বড়ই সুস্বাদু। রঙ্গপুর ও ময়মনসিংহ জেলার বহুস্থানেই অধিক পরিমাণে মানকচুগাছ রোপিত হয়। যথোচিত যত্ন করিতে পারিলে মানকচু ছয় সাত হাত দীর্ঘ এবং তদুপযুক্ত স্থূল হইয়া থাকে। এক একটি বৃহদাকার মানকচুর ওজন একমণ বা ততোধিক হয়। সাধারণতঃ ১০।১৫ সের ওজনের বা ততোধিক ওজনের মানকচুই বাজারে বিক্রীত হইয়া থাকে।

সাধারণ কচু—Arum Colocasia.

Syn: Colocasia antiquorum.

কচু, গুড়িকচু, বনকচু ও বুনোকচু প্রভৃতি নামে যে কচুগাছ এ দেশের সর্ব্বত্রই সুপরিচিত, উহাকেই আমরা সাধারণ-কচু নামে অভিহিত করিলাম। ইহা দেশভেদে, টারো, অড্ডা, স্ক্রেস্‌ককো (Scratchco-co), টেনিয়া, ইজিপ্‌সিয়ান্ এরাম, অর্ভি, এডইস্, জু, কিরম্, রব্, আলু, টেরাম, সাথুস্পা, টেলো, টেরো ও টেন্নাস্ প্রভৃতি বিভিন্ন নামে পরিচিত। ইহা এ দেশের—বিশেষতঃ বঙ্গের, সর্ব্বত্রই রাস্তার ধারে, পয়ঃপ্রণালীর পার্শ্বে, আর্দ্র গর্ত্তাদিতে ও জঙ্গলে স্বতঃই বন্যাবস্থায় জন্মিয়া থাকে;—কেহই ইহার চাষ করে না। সাধারণ কচুর পাতার নিম্নভাগ পাতলা সবুজবর্ণ, পত্র দীর্ঘাকার ও তদুপরিভাগ সবুজবর্ণ; পত্রবৃন্ত মলিন সবুজবর্ণ; বৃন্তের নিম্নাংশ আংশিক দ্বিখণ্ডিত; কাণ্ড ক্ষুদ্র ও অন্তর্ভৌম এবং পুষ্প পীতবর্ণের হয়। ইহা শুষ্ক ও আর্দ্র সকলপ্রকার মৃত্তিকাতেই জন্মে। উহার কাণ্ড বা মূল অখাদ্য হইলেও, প্রক্রিয়াবিশেষের সাহায্যে উহা খাদ্যোপযোগী করিয়া লওয়া যায়। ইহা অতিশয় তীব্র (stringent) বলিয়া খাইবামাত্রই জিহ্বা, গলা প্রভৃতি ভয়ানক চুল্কায়

এবং অনেকসময় ফুলিয়া উঠে। বন্যকচুর কচিপাতা স্তরে স্তরে কলাপাতার উপর বিছাইয়া অগ্নিদগ্ধ করিলে, উহা কোমলতা প্রাপ্ত হয়। ঐ সকল অগ্নিদগ্ধ কোমল পাতা তৈল, লবণ, লঙ্কা ও মসলা প্রভৃতি সংযোগে গলাধঃকরণ করিতে পারা যায়। সাধারণ কচুর ডাঁটার ত্বক উঠাইয়া ফেলিয়াও কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া জলে সিদ্ধ করিয়া লইলে, উহার শাক সুখাদ্য হয়। পূর্ব্ববঙ্গবাসীরা উক্ত প্রণালীতে রন্ধন করিয়াই সাধারণ-কচুর ডাঁটার শাক ভক্ষণ করে। ইহার লতও সুখাদ্য; এবং উহা হিন্দু-বিধবাদের প্রিয় খাদ্য।

সাধারণ-কচু পূর্ব্ববঙ্গের অতি দরিদ্র শ্রমজীবী ও কৃষক বা কৃষাণদিগের মহোপকার সাধন করিয়া থাকে। উহারা এক মাত্র কচুর শাক ও তেঁতুলের সাহায্যেও অন্ন উদরস্থ করিতে পারে; এবং দাইল, তরকারী প্রভৃতি ক্রয় করিতে না পারিলে, উহাই তাহাদের অন্নের প্রধান উপকরণের স্থানাধিকার করে। অম্লসংযোগে সাধারণ-কচুপাতার অম্বলও সুখাদ্য। ইহার পাতা কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া ও সেইগুলি আগুনের আলে জলে সিদ্ধ করিয়া লইয়া, তৎপর অম্বল রন্ধন করিতে হয়। ইহাও গরিবের প্রিয় খাদ্য।

বন্যকচুর কচি ডাঁটা হাতে রগড়াইয়া লইয়া, তদ্দ্বারা কাণ চুলকাইলে কর্ণরোগ দূর হয়। সাধারণ কথায় বলে :—

"কাণে কচু নাইয়ে তেল।
সে বাড়ী বৈদ্য না গেল॥"

অর্থাৎ কাণে কচু ও নাভিতে তৈল দেওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ হিতকর। যাহারা কচু দিয়া কাণ চুলকায় ও নাভিতে প্রত্যহ তৈল প্রদান করে, তাহাদের স্বাস্থ্য নষ্ট হইতে গুরে না বলিয়াই কবিরাজ বা চিকিৎসকের কোনও প্রয়োজন হয় না। কথাটা অতিরঞ্জিত হইলেও সত্য। প্রথমতঃ, উভয়পদের বৃদ্ধাঙ্গুলির নখের উপর এবং তৎপর নাভিতে তৈল দিয়াই মস্তকে ও শরীরের অন্যান্য স্থানে তৈল-মর্দ্দন করিতে হইবে;—ইহাই হইল হিন্দুশাস্ত্রকারগণের আদেশ। এ দেশের প্রাচীনগণ কখনও শাস্ত্রের আদেশ লঙ্ঘন করেন নাই; অর্থাৎ চিরদিনই তাঁহারা নাভিতে তৈল ব্যবহার করিতেছেন। কাণে কচু দিতেও তাঁহারা অভ্যস্ত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাবুরা এ সব হিতকর নিয়মপালনে তাচ্ছীল্য প্রকাশ করেন। ফলে, প্রাচীন প্রথাগুলি ক্রমেই লুপ্ত হইয়া যাইতেছে।

সাধারণ কচুগাছ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হইয়া থাকে। আর্দ্র ও শুষ্ক উভয়বিধ ভূমিতেই ইহা জন্মে। গ্রীষ্মপ্রধান স্থানসমূহই ইহার অধিবাস। তথাকার পার্ব্বত্য-প্রদেশের আট হাজার ফুট উচ্চেও ইহাদিগকে জন্মিতে দেখা যায়। ডাক্তার রক্‌স্‌বার্গ, রামফিয়াস, ফরেষ্টার, নিকোল, ডুথি, ফুলার, মলিসন্ এবং ডাক্তার প্রেইন্ প্রভৃতি বৈদেশিক উদ্ভিদবেত্তাগণ সাধারণ-কচুকে এবং যে সকল জাতীয় কচুর চাষ হয় উহাদিগকে, একই জাতির অন্তর্ভূত করিয়াছেন। কিন্তু আমি তাঁহাদের মতের সমর্থন করিতে পারিলাম না। এই জন্য আমি উহাদিগকে বিষয় জাতিতে বিভক্ত করিয়া, উহাদের জাতিগত পার্থক্য পৃথকভাবে বর্ণন করিলাম। কেহ কেহ, সমগ্র ভারতবর্ষে কেবল তিনজাতীয় কচুগাছ রহিয়াছে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ডুথি ও ফুলার কেবল দুইটি বিভিন্ন জাতির বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। আবার কেহ কেহ বা সাতটি জাতিরও উল্লেখ করিয়াছেন। ডুথি ও ফুলার শ্বেত ও কৃষ্ণ ভেদে দুইটি জাতির বিষয় বর্ণন করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন,—'গরি' শব্দে মুখী ও 'দেসু' শব্দে আসল মূল বা কাণ্ডকে বুঝায়। বঙ্গদেশে এই দুইটি নাম পরিচিত নহে। নিকোলস্ সবুজ ও বেগুণে—কেবল এই দুইজাতির কথাই বলিয়াছেন। সুতরাং, কচুসম্বন্ধে তাঁহাদের অনুসন্ধান যে অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহেই বলা যায়।

সাধারণ-কচুর ক্ষুদ্র মূল বা কাণ্ডও শ্বেতসার-প্রধান। সুতরাং, উহা পুষ্টিকর খাদ্য। ইহা নানা আকারে খাদ্যরূপে ব্যবহার করা যায়। সাধারণ কচুর কাণ্ড টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া কিয়ৎকাল অগ্নির আলে জলে সিদ্ধ করিলে, উহা ঘৃতে বা তৈলে ভাজিয়া খাওয়া যায়। নিউগিনিতে (New Guinea) সাধারণ কচুর কাণ্ড শুষ্ক করিয়া, উহার ময়দা প্রস্তুত করা হয়; এবং ঐ ময়দায় বিস্কুট (Biscuit) প্রস্তুত করিয়া, উহা গিনিবাসীরা তৃপ্তির সহিত ভক্ষণ করে। কোনও কোনও স্থানে, ইহার কাণ্ড বা মূলকে সিদ্ধ করিয়া,

উহা সর্ষপগুড়া, তৈল, হলুদ ও লঙ্কা সংযোগে গলাধঃকরণ করা হয়। ইহার পাতা, ডাঁটা, লতা, মূল ও কাণ্ড প্রভৃতি সকল অংশই তীব্র-রসযুক্ত এবং বিষাক্ত। সেই জন্য, উহার কোনও অংশই আঁচা খাওয়া যায় না;—খাইলেই গলা ধরে। চুণের জলে বা অম্লদ্রব্যে কিয়ৎকাল ভিজাইয়া রাখিলেই, উহার গলাধরা-দোষ নষ্ট হয়। সেই জন্য অম্লদ্রব্য (acid) দ্বারা ধৌত করিয়াও সাধারণ কচুর মূল খাদ্যোপযোগী করা যায়। হাইড্রো ক্লোরিক (Hydro Chloric), নাইট্রিক (Nitric) এবং এসিটিক (Acetic) অম্লসংযোগেও, উহার বিষাক্ত অংশ নষ্ট করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহা ব্যয়সাধ্য ব্যাপার।

সাধারণ বা বন্য কচুগাছ ক্ষেত্রে বা বাগানে রোপণ করিয়া, অন্যান্য উৎকৃষ্ট কচুর ন্যায়, ইহারও যথোচিত যত্ন করিতে পারিলে, ক্রমশঃই উহার বন্য-স্বভাব দূর হইয়া যায়। সুতরাং, তদবস্থায় সহজেই উহাকে খাদ্যোপযোগী করা যাইতে পারে। এ দেশের সর্ব্বত্র এবং সকল প্রকার মৃত্তিকায় বিনা যত্নেও যে গাছ সতেজে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, উহার ক্রমোন্নতি-সাধনে মনোযোগী হওয়া, কৃষিতত্ত্ববিদ্‌ব্যক্তিমাত্রেরই অবশ্যকর্ত্তব্য।

কালকচু।

(Arum Ægypticum Ver Nigrum).

কালকচুকে বন্যকচুর একটি জাতিবিশেষ বলা যায়। গর্ত্তের পার্শ্বে বা আর্দ্রস্থানে ইহা বন্যাবস্থায় জন্মিয়া থাকে। ইহার পত্র ও পত্রবৃন্ত মলিন কৃষ্ণবর্ণের হয়। কাণকচুর কাণ্ড স্ফীত হয় না সত্য, কিন্তু তথা হইতে বহুসংখ্যক প্রতান চতুর্দ্দিকে—ভূমির নিম্নে ও উপরি ভাগে বিস্তৃত, হইয়া থাকে। ঐ সকল লত এবং ইহার পাতা ও ডাঁটা খাওয়া যায়। ডাক্তার রক্‌স্‌বার্গ কালকচুর বিবরণে কেবল এই জাতিরই উল্লেখ করিয়াছেন;—তিনি কৃষ্ণ-শোলাকচুর বিষয় কোনও কথা লিপিবদ্ধ করেন নাই।

কালকচুর আরও একটি ভিন্ন জাতি আছে। ডাক্তার রক্‌স্‌বার্গ উহাকে চড়কচু নামে অভিহিত করিয়াছেন। বস্তুতঃ, ইহাও একজাতীয় বন্যকচু। এই কচুর পাতা ও ডাঁটা বেগুণে বা নীলাভ কৃষ্ণবর্ণের হয়। ইহারও চাষ হয় না। ইহা বন্যাবস্থায় রাস্তার ধারে, জঙ্গলে এবং গোবর ও রাবিসের স্তূপের উপর স্বতই জন্মিয়া থাকে। ইহারও ডাঁটা পাতা ও লতা খাওয়া যায়। উক্ত ত্রিবিধ প্রকার কচুর চাষ হয় না।

শ্বেতকচু—Arum Album.

শ্বেতকচুও বন্যাবস্থায় বঙ্গদেশের প্রায় সকলস্থানেই জন্মে। অন্যান্য জাতীয় বন্যকচুর গাছ অপেক্ষা শ্বেতকচু-গাছের আকার অনেকটা বড় হয়। ইহার পত্র ও পত্রবৃন্ত শ্বেতাভ-সবুজবর্ণ; পত্রের প্রান্তদেশ রেখাঙ্কিত এবং পত্র ও পত্রবৃন্তের গাত্র শ্বেতবর্ণের 'গোছড়া' বা প্রলেপযুক্ত হইয়া থাকে। শ্বেতকচুরও চাষ হয় না। ইহার অন্য একটি জাতি আছে। উহার পাতা ও ডাঁটা কৃষ্ণাভ-বেগুণীবর্ণের হয়। এই উভয়জাতির ডাঁটারই শাক পাওয়া যায়। ইহাদের কাণ্ডও কখন কখন খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

দন্তরকচু—Arum Routandifolia.

দন্তর-কচুগাছও বৃহদাকারের হয়। ইহার পত্র প্রায় গোলাকার, এবং পত্রের ব্যাস প্রায় দেড় ফুট বা ততোধিক হইয়া থাকে। পত্রের মধ্যশিরা হইতে পঞ্জরাস্থিসদৃশ রশ্মিগত হইয়া, পত্রের প্রান্তদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহে। ইহার পত্রবৃন্ত প্রায় ২।৩ ইঞ্চি স্থূল; এবং উহার নিম্নভাগ আংশিক দ্বিখণ্ডিত। দন্তরকচুগাছকে কাণ্ডহীন বলা যায়; মূল হইতেই ইহার গাছ উৎপন্ন হয়। ইহার জন্মস্থান পূর্ব্ববঙ্গ। পূর্ব্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে, ইহা 'আড়াই কচু,' 'ডগা কচু' প্রভৃতি বিভিন্ন নামে পরিচিত। ইহারও চাষ হয় না।

পূর্ব্ববঙ্গের কোনও কোনও স্থানে, প্রায় প্রত্যেক বাড়ীর পার্শ্বেই ২।৪টি দন্তরকচুগাছ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা প্রায় সকল প্রকার মৃত্তিকাতেই জন্মে। ইহার একমাত্র ডাঁটাই খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়; ইহার ডাঁটা কাঁচাই খাওয়া যায়। এই ডাঁটার সহিত লবণ, তৈল ও তেঁতুল প্রভৃতি মিশ্রিত করিয়া একরূপ সুস্বাদু চাটনী প্রস্তুত করা হয়। দন্তরকচু-ডাঁটার টুকরার সহিত লবণ ও তেঁতুল মিশাইয়া

হইলেও, একরূপ মুখরোচকপদার্থ প্রস্তুত হয়। বলা বাহুল্য, ঐ সকল পদার্থ বাটিয়া লইতে হইবে। উহা যে শুধু মুখ-রোচক, তাহা নহে;—শরীরের বেদনা ও বাতরোগের পক্ষেও বিশেষ হিতকর। দস্তরকচুডাঁটার টুকরার সহিত তেঁতুল, তৈল, চিনি প্রভৃতি মিশ্রিত করিয়াও নানাপ্রকার সুখাদ্য প্রস্তুত করা হয়।

বিষকচু—Arum Fornicatum.

বিষকচুর জন্মস্থান বঙ্গদেশ। ইহা বঙ্গদেশের প্রায় সর্ব্বত্রই বন-জঙ্গলে দৃষ্ট হইয়া থাকে। বিষকচুর পত্র হৃৎপিণ্ডাকার ও গাঢ় সবুজবর্ণ; পত্রবৃন্ত স্থূল ও গাঢ় সবুজবর্ণ; মূল আঁশযুক্ত; কাণ্ড ঋজু, ৩।৪ ইঞ্চি বা তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক স্থূল, ধূসরবর্ণ ও ২।৩ ফুট দীর্ঘ হয়। ইহার পত্রকক্ষ রেখাযুক্ত। বিষকচুর পাতা, মূল, কাণ্ড ও ডাঁটা যে বিষাক্ত, নামেই তাহার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়। বস্তুতঃ, বিষাক্ত বলিয়াই, ইহার কোনও অংশই খাওয়া যায় না;—খাইলে গলা ভয়ানক চুল্কায় এবং ফুলিয়া উঠে। বিষকচুর কাণ্ড পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে, স্ফোটক ও বাতের পীড়ায় সুফল লাভ করা যায়। ইহার অন্য কোনরূপ ব্যবহার আমরা অবগত নহি। বিষকচুগাছ দেখিতে সুন্দর।

রঞ্জিত-পত্রকচু—Caladium.

রঞ্জিত-পত্রকচুর নানাপ্রকার বিভিন্ন জাতি আছে। ইহাদের সকল গাছের পাতাই নানাবর্ণে রঞ্জিত; দেখিতে বড়ই সুন্দর। একমাত্র সৌন্দর্য্যের হিসাবে, সভ্যদেশমাত্রেই নানা জাতীয় রঞ্জিত-পত্রকচুর মহা আদর। উদ্যানের শোভাবর্দ্ধনার্থ সর্ব্বত্রই ইহারা বিশেষ যত্নের সহিত রক্ষিত হইয়া থাকে। সবুজগৃহ (green-house), আলমারি, টেবুল প্রভৃতি সুসজ্জিত করিবার পক্ষে, ইহাদের ন্যায় রমণীয় উদ্ভিদ আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। জাতিবিশেষে প্রত্যেকটি গাছের মূল্য ৷৵ আনা হইতে ১৫৲ টাকা পর্য্যন্ত হয়। ইহাদের বিবরণ স্বতন্ত্র প্রবন্ধে, বিস্তৃতভাবে, বারান্তরে প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল।

জাপানীকচু—Colocasia Multifolia.

Syn. Arum multifolium.

জাপানী কচুগাছ ও উহার পাতা দেখিতে বড়ই সুন্দর। ইহাও অতি সুন্দর জাতীয় কচু। ইহার আদি জন্মস্থান জাপান বলিয়াই, আমরা উহাকে 'জাপানী কচু' নামে অভিহিত করিলাম। ইহার প্রকৃত নাম জাপানী জলকচু (Japanese water Taro)। টেবিল ও বারান্দা প্রভৃতি সুসজ্জিত করিবার পক্ষে, ইহার ন্যায় সুন্দর উদ্ভিদ অতি অল্পই আছে। জলে ইহার চাষ হয়।

জাপানী কচুর মূল, এ দেশীয় ওলের ন্যায়, কন্দবিশেষ। উহাও তরকারীরূপে ব্যঞ্জনাদিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জাপানে ইহাই প্রধান তরকারীমধ্যে পরিগণিত। ইহার কন্দমূল কখনও কখনও ২।৩ সের ওজনের হয়। মূল ধূসরবর্ণ ও আঁশযুক্ত পর্দ্দাবেষ্টিত। জাপানী কচুর আসল মূল হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্শ্বাঙ্কুর বহির্গত হয়। ঐ সকল মুখী হইতেই চারাগাছ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহার মাংসে অত্যধিকপরিমাণে শ্বেতসার রহিয়াছে। সুতরাং, ইহা পুষ্টিকর খাদ্য। জাপানী কচুর মূল পেষণ করিয়াও একরূপ ময়দা প্রস্তুত করা হয়। চিনি ও অন্যান্য পদার্থ সংযোগে, ঐ ময়দায় প্রস্তুত মোহনভোগ সুখাদ্য।

আমি জাপান হইতে কন্দ আনয়ন করিয়া, আমার নার্শারী-বাগানে জাপানী কচুর চাষ করিয়াছি। জলযুক্ত পচা কর্দ্দম-মৃত্তিকায় মূল রোপণ করিলেই, ইহার গাছ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐ সকল গাছে একবৎসরমধ্যেই খাদ্যোপযোগী কন্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার চাষও বিশেষ লাভজনক।

সখের হিসাবে জাপানী কচুর চাষ করিতে হইলে, একটি অগভীর পাত্র জলপূর্ণ করিয়া, তন্মধ্যে মূলটিকে বসাইতে হইবে। পাত্রে মূল বসাইবার পর, উহার তলদেশ ও চতুর্দ্দিক কঙ্কর দ্বারা আংশিক (প্রায় বার আনা) পূর্ণ করা আবশ্যক। এই অবস্থায়ই মূল হইতে বৃন্তসহ গুচ্ছাকারে পত্র নির্গত হইয়া, পাত্রটিকে রমণীয় শোভায় সুশোভিত করিবে। সময় সময় পাত্রের জল বদলাইয়া দেওয়া ভিন্ন,

ইহার অন্য কোনরূপ পাইটের আবশ্যক হয় না। জাপানী কচুর পত্রবৃন্তও সুন্দর;—গাঢ় বেগুণীবর্ণের হয়। কিন্তু ইহার পত্র সবুজবর্ণ। ইহার ফুল হয় না। ফাল্গুন চৈত্র মাসে মূলটিকে পাত্র হইতে উঠাইয়া, উহার নীচের দিকের এক-তৃতীয়াংশ একখানা ধারাল ছুরি দ্বারা চেপ্টাভাবে কর্ত্তন করিতে হয়। এইরূপ করিলে, উহা আর পাত্রে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না। বলা বাহুল্য, মূল কর্ত্তন করিবার পর, ঐ পাত্রেই গাছ বসাইতে হইবে। জাপানী কচুগাছ মৃত্তিকায় রোপণ করিলে, উহা ৪।৫ ফুট উচ্চ হইয়া থাকে। তদবস্থায়, একটি মূল হইতেই বহুসংখ্যক মুখী উৎপন্ন হয়। ঐ সকল মুখী দ্বারাই ইহাদের বংশবৃদ্ধি করা যায়।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুহ।

সমবায় পদ্ধতিতে ইক্ষুচাষ।

[জলপাইগুড়ীর রাজবংশোদ্ভব কুমার জগদিন্দ্র দেব রায়কত মহাশয়ের লিখিত। শ্রদ্ধেয় জগদিন্দ্রবাবু কৃষি ও উদ্যান তত্ত্ববিদ্ সুপণ্ডিত ব্যক্তি। তাঁহার তত্ত্বাবধানে একটি আদর্শ কৃষিক্ষেত্র ও উদ্যান পরিচালিত হইতেছে। তিনি দীর্ঘকাল যাবৎ বৈজ্ঞানিক-প্রণালীতে কৃষি ও উদ্যানের কার্য্যে সংলিপ্ত রহিয়া, কৃষিতত্ত্বে যে বহুদর্শিতা ও প্রভূত অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিয়াছেন, বর্ত্তমান প্রবন্ধটি তাহারই ফলস্বরূপ; সাধারণ পাঠকও ইহা লক্ষ্য করিতে পারিবেন। প্রবন্ধটি সংক্ষিপ্তভাবে লিখিত হইলেও, ইহাতে একটি চিন্তনীয় বিষয়ের আলোচনা রহিয়াছে। অধুনা, শিক্ষিত ভদ্রসন্তানদিগের যে সকল যুবক হাতে-হেতেড়ে চাষ-বাসে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন, তাঁহারা জগদিন্দ্রবাবুর প্রবন্ধ পাঠে বিশেষ উপকৃত হইতে পারিবেন। কৃঃ সঃ সঃ]

বর্ত্তমান বর্ষের ভাদ্র ও আশ্বিন মাসের যুগ্মসংখ্যা "কৃষি-সম্পদে" প্রকাশিত, শ্রীযুক্ত দেবেশ্বর গোস্বামী মহাশয়ের লিখিত, "আমার ইক্ষুচাষ" নামক প্রবন্ধটির আদ্যোপান্ত সমস্তই জ্ঞাতব্য বৃত্তান্তে পরিপূর্ণ ও বড়ই সুন্দর। যাঁহারা ইক্ষুচাষ করিতেছেন বা করিতে ইচ্ছা করেন, এই প্রবন্ধে তাঁহাদের উপযোগী কথা অনেক আছে। উহা মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া, আমি বড়ই উপকৃত হইয়াছি। আমি চারি পাঁচ বৎসর যাবৎ ইক্ষুচাষ করিতেছি। আমার উদ্দেশ্যও কতকটা শ্রদ্ধেয় দেবেশ্বরবাবুর মতই। সেই জন্যই, এই প্রবন্ধ পাঠে আমার আগ্রহাতিশয় জন্মিয়াছিল। দেবেশ্বরবাবু চা-বাগানের অনুরূপ প্রণালী অবলম্বনে, অর্থাৎ মূলধনী ও শ্রমীর (Capital Vs labour) সমবায় পদ্ধতিতে, ইক্ষুচাষে সুদীর্ঘকাল যাবত সংলিপ্ত রহিয়াছেন। তিনি একলপ্তে বহুপরিমাণ জমি সংগ্রহ করিয়া, ঠিকা বা নিযুক্ত করা লোক দ্বারা, তাহাতে ইক্ষুচাষ করাইতেছেন; এবং ব্যয় বাদে, সমুদায় লভ্যাংশই প্রাপ্ত হইতেছেন। তাঁহার ন্যায় অভিজ্ঞব্যক্তির পরিচালনায়, যৌথ-মূলধনে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ের (Joint-Stock Co) অনুরূপ পদ্ধতিতে, যেরূপভাবে কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহিত হইতেছে, উহা মূলধনী ও শ্রমজীবীর সমবায় ব্যতীত, কৃষকদিগের সমবায়-প্রথা (Co-operation) বলা যাইতে পারে না।

শ্রীযুক্ত দেবেশ্বর গোস্বামী মহাশয় সৌভাগ্যক্রমেই একলপ্তে (Compact holding) বহুপরিমাণ (আড়াই হাজার বিঘা) জমি বন্দোবস্ত করিয়া লইতে পারিয়াছিলেন; এবং তাহারই প্রায় হাজার বিঘা জমিতে অধ্যবসায়ের সহিত ইক্ষুচাষ করিয়া সফলকাম হইয়াছেন। ইহাতে আমরা বিশেষ আনন্দ ও গৌরব বোধ করিতেছি। কারণ, দেবেশ্বরবাবু সমগ্র আসাম ও বঙ্গদেশ বাসীরই আদর্শস্থল হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার পদানুসরণ করিয়া, কিরূপে শিক্ষিত ভদ্রসন্তানেরা অল্প মূলধনেও কৃষকদিগের সহিত সমবায়ে বিক্ষিপ্ত জমিতে (Scattered holding) ইক্ষুচাষ করাইতে এবং গোস্বামী মহাশয়ের ন্যায় কল-কারখানা স্থাপন করিয়া, তাঁহার প্রণালীমত গুড়, চিনি প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে পারে, তদুপায় নির্দ্ধারণ করাই এক্ষণ অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। কারণ, যতদিন পর্য্যন্ত কৃষকদিগের সহিত সমবায়-পদ্ধতিতে ইক্ষুচাষ-প্রথা প্রচলিত না হইবে, ততদিন এ দেশে ইক্ষুচাষে জমির পরিমাণও অত্যধিকরূপে বর্দ্ধিত হইবে না; অধিকন্তু, কল-কারখানা স্থাপনের দ্বারা চিনির ব্যবসায়ের উন্নতিসাধন করাও সম্ভবপর নহে। এই জন্যই তৎসম্বন্ধে কএকটি কথা বলিতেছি।

আমাদের দেশের বিক্ষিপ্ত স্বত্বই (Scattered holding) সাধারণ কৃষির প্রধান অন্তরায়। সাধারণতঃ, একলপ্তে দুই

এক হাজার বিঘা দূরে থাকুক, দুই এক শত বিঘা অনাবাদী জমিও পাওয়া দুষ্কর। বঙ্গদেশের অনেক স্থলেই, একলপ্তে ১০।২০ বিঘা চাষী-জমি সংগ্রহ করাও সহজসাধ্য নহে। এমতাবস্থায়, একলপ্তে অন্ততঃ হাজার বিঘা উচ্চভূমির বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া, গোস্বামী মহাশয়ের ইক্ষুক্ষেত্রের অনুকরণে ও তাঁহার প্রদর্শিত প্রণালীতে, বঙ্গের স্থানে স্থানে ইক্ষুক্ষেত্র সংস্থাপন করা সম্ভবপর নহে। উক্ত বাধা অতিক্রম করিতে হইলে, অর্থাৎ অধিক পরিমাণ জমি সংগ্রহ না করিয়াও, কিরূপভাবে, দেবেশ্বরবাবুর অনুকরণে, গুড়, চিনি প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার উপযোগী কল-কারখানা সংস্থাপন করিতে পারা যায়, তাহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্যবিষয়। আমার মতে, কারখানা ও আদর্শ ইক্ষুক্ষেত্র স্থাপনের জন্য ৫০।৬০ বিঘা জমি সংগ্রহ করিয়া লইতে পারিলে, এবং কারখানার চতুষ্পার্শ্বস্থ কৃষকদিগের সহিত সমবায়-পদ্ধতিতে কার্য্য করিতে পারিলেই, উদ্দেশ্যসাধন সহজসাধ্য হইয়া পড়িতে পারে। কারখানা-সংলগ্ন আদর্শ ইক্ষুক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতীয় ইক্ষুর চাষ-পরীক্ষা করিতে হইবে; অর্থাৎ কোন জাতীয় ইক্ষুর ফলন অধিক, কোন জাতীয় ইক্ষু গুড়প্রস্তুতের পক্ষে বিশেষ উপযোগী প্রভৃতি বিষয় পরীক্ষা দ্বারা সুস্থির করিয়া, তাহা স্থানীয় কৃষকদিগকে জানাইতে হইবে। তদ্ভিন্ন, কৃষকদিগকে উৎকৃষ্ট জাতীয় ইক্ষুর টিক্‌লিও (Cuttings) সরবরাহ করিতে হইবে। এই কার্য্যের জন্য ৩০ বিঘা, এবং কারখানা, বাসস্থান ও রাস্তা প্রভৃতির জন্য ১৫।২০ বিঘা—এই মোট ৫০ বিঘা জমি হইলেই চলিবে। কারখানা স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই, কারখানার চতুষ্পার্শ্বস্থ কৃষকদিগকে ইক্ষু-চাষের আবশ্যকতার বিষয় বুঝাইয়া দিতে হইবে। তাহারা যদি বুঝিতে পারে যে, একবিঘা জমিতে ইক্ষুচাষ করিলে, এবং ক্ষেত্রের ইক্ষু যথাসময়ে কর্ত্তন করিয়া, ঐ সকল কারখানায় পহুঁছাইয়া দিতে পারিলেই ৪০।৫০৲ টাকা পাওয়া যাইবে, তাহা হইলে ইক্ষুচাষের প্রতি তাহাদের বিশেষ ঝোঁক পড়িবে এবং তাহারা সকলেই ইক্ষুচাষ আরম্ভ করিবে। ইক্ষুচাষ করিয়া গুড় প্রস্তুত করিলেও, মফস্বলের কৃষকেরা ব্যয়বাদে সাধারণতঃ ৪০।৫০৲ টাকার অধিক প্রাপ্ত হয় না। এমতাবস্থায়, গুড় প্রস্তুত না করিয়াও যদি তাহারা বিঘা প্রতি ৪০।৫০৲ পায়, বিশেষতঃ মোট প্রাপ্য টাকার আংশিক অগ্রিমও লইতে পারে, তাহা হইলে তাহারা নির্ভাবনায়ই ইক্ষুচাষ করিতে পারিবে ও করিবে। যে সময় ইক্ষুচাষের পক্ষে প্রশস্ত, সেই সময়েই এ দেশের কৃষকদিগকে মহাজনের দ্বারস্থ হইতে এবং অত্যধিক সুদে টাকা কর্জ্জ করিতে হয়। ফাল্গুন হইতে বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত (ইক্ষুরোপণের প্রশস্তকাল) এ দেশের অধিকাংশ কৃষকেরই খাদ্যাভাব উপস্থিত হয় বলিয়া, উহারা মহাজনের নিকট হইতে অত্যধিক হারে সুদের চুক্তিতে টাকা ধার করিতে বাধ্য হয়। কারণ, সে সময়ে টাকা ধার না করিলেও চলে না; পক্ষান্তরে, মহাজনদিগের দ্বারস্থ না হইলেও টাকা মিলে না। সুতরাং, মহাজনদিগের শরণাপন্ন হওয়া ভিন্ন, তৎকালে কৃষকদিগের গত্যন্তর রহে না। এমতাবস্থায়, ইক্ষুচাষ করিতে সম্মত হইলে, এবং ইক্ষু কর্ত্তন করিয়া কারখানায় পহুঁছাইয়া দেওয়ার চুক্তিতে আবদ্ধ হইলেই, যদি তাহারা বিঘাপ্রতি মোটপ্রাপ্য টাকার আংশিকও প্রাপ্ত হইতে পারে, তাহা হইলে তাহারা মহাজনের দ্বারস্থ না হইয়া দলে দলেই কারখানায় উপস্থিত হইবে। কারণ, মহাজনের সুদ যোগাইয়া, এ দেশের কৃষকদিগের বিঘাপ্রতি যত লাভ থাকে, ইক্ষুচাষে লাভের পরিমাণ কমপক্ষেও তাহার দ্বিগুণ রহিবে। কৃষকদিগকে চুক্তিতে আবদ্ধ করিয়া লইতে পারিলে, তাহাদিগের দ্বারা ইক্ষুচাষের কার্য্য এবং তাহাদিগের উৎপন্ন ইক্ষুতে কারখানার কার্য্য উভয়ই চলিতে পারিবে, এবং তদ্দ্বারা উভয়পক্ষই সমভাবে লাভবান হইতে পারিবে। তবে চাই সহযোগিতা (Co-operation)।

গোস্বামী মহাশয়ের প্রণালীতে অনেক মূলধনী বা যৌথ মূলধনিগণ (Share holders) কোম্পানী সংগঠন করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিলেও, যথোচিত লাভবান হইতে পারিবেন কিনা সন্দেহ। তাঁহাদের কার্য্যে ভূস্বামীও সামান্য মাত্র লাভবান হইবেন। কারণ, একলপ্তের বহুপরিমাণ জমি কোনও ব্যক্তি বা কোম্পানীকে বন্দোবস্ত না দিয়া, উহা বহুব্যক্তির নিকট পত্তন করিতে পারিলে যে, নজর ও খাজনা প্রভৃতি বাবদ অধিক পরিমাণ টাকা লাভ হয়, ইহা সহজেই অনুমেয়। শ্রমজীবীগণও কোম্পানী বা

ব্যক্তিবিশেষের পরিচালিত ইক্ষুক্ষেত্রে কার্য্য করিয়া, পরিশ্রমের অনুরূপ পারিশ্রমিক প্রাপ্ত হইতে পারিবে না। তদ্ভিন্ন, গোস্বামী মহাশয়ের ইক্ষুক্ষেত্রের আদর্শে ইক্ষুক্ষেত্র সংস্থাপন করিলে, তদ্দ্বারা এ দেশের কৃষকদিগের কোনও প্রকার লাভ ত হইবেই না, অধিকন্তু, উহাতে কৃষকদিগের জমির পরিমাণ-বৃদ্ধির পক্ষেও ব্যাঘাত ঘটিবে। সুতরাং, এই চারি শ্রেণীর মধ্যে চিরকালই একটা বিবাদ থাকিয়াই যাইবে। একে অপরকে তাহার ন্যায্যপ্রাপ্য দিতে কুণ্ঠিত হইবেই হইবে। ইহাতে সমবায়নীতি একেবারে অন্তর্হিত হইবে। ইহা দেশের পক্ষে শুভকর হইতে পারে না। কৃষি-কার্য্যে যাহাতে, পূর্ব্বের ন্যায়, সমবায়-প্রথা অবলম্বিত হইতে পারে, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়াই কর্ত্তব্য মনে করিতেছি।

অভিজ্ঞব্যক্তির অভাবে, এ দেশে কোনরূপ কৃষি-শিল্পাদির উন্নতি ঘটিতে পারিতেছে না। যে দুই একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি আছেন, তাঁহারাও অবস্থান্তরে পড়িয়া, বৈদেশিক কলকারখানার প্রতিযোগিতায় সাফল্যলাভ করিতে পারিতেছেন না। সৌভাগ্যক্রমে ও অধ্যবসায়ের ফলে, দেবেশ্বরবাবু ইক্ষুচাষে সাফল্যলাভ করিয়া, তদ্বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভের প্রকৃত সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার মত বিশেষ অভিজ্ঞব্যক্তির উপদেশ (direction) গ্রহণ করিয়া, তাঁহার ইক্ষুক্ষেত্রের আদর্শে, আরও কতজনে ইক্ষুক্ষেত্র স্থাপন করিতে পারিতেন। কিন্তু আজিও যে কেহ তাঁহার অনুকরণে প্রবৃত্ত হ'ন নাই, তাহার প্রকৃত কারণ এই যে, উহা এ দেশের পক্ষে উপযোগী নহে। চা-বাগানের কার্য্যের অনুরূপ প্রণালীতে এ দেশের কৃষি চলিতে পারে কিনা, তাহা বিষম সন্দেহের বিষয়। আমার বিশ্বাস, আমার নির্দ্দেশানুযায়ী কৃষকদিগের সহিত সমবায়ে ইক্ষুচাষবিস্তারের চেষ্টা করিলে, তাহাতে সুফলই ফলিবে। অধিকন্তু, উহাতে ভূস্বামী, কৃষক, ধনী এবং ক্রেতা সকলেই সমভাবে উপকৃত হইতে পারিবেন। বলা বাহুল্য, দেবেশ্বর বাবুর মত ইক্ষুতত্ত্ববিদ্ অভিজ্ঞ (expert) ব্যক্তির উপদেশানুযায়ী কার্য্য করিতে পারিলে, কৃষকদিগের সহিত সমবায়েও সাফল্যলাভ সুনিশ্চিত হইয়া পড়িবে।

গোস্বামী মহাশয় ইক্ষুচাষ, তাহা হইতে গুড়, চিনি প্রস্তুত এবং কার্য্যনির্ব্বাহ (management) ইত্যাদির ব্যয় বিঘাপ্রতি ৭০৲ টাকা হইতে ৯৪৲ টাকা ধরিয়া, ৩৮৲ হইতে ৫৪৲ টাকা পর্য্যন্ত লাভ দেখাইয়াছেন। গড়ে বিঘা প্রতি ৭০৲+৯৪৲=১৬৪৲ টাকার অর্দ্ধেক ৮২৲ টাকা খরচ এবং ৩৮৲+৫৪৲=৯২৲ টাকার অর্দ্ধাংশ ৪৬৲ টাকা হইতেও ৬৲ বাদে, নিট লাভ ৪০৲ টাকা ধরাই উচিত মনে করিয়াছেন। তাঁহার মত ইক্ষুচাষসম্বন্ধে বহুদর্শীব্যক্তি বিঘাপ্রতি যে ৪০৲ টাকা লাভ দেখাইয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য।

জলপাইগুড়ীর চাবাগানে বিঘাপ্রতি ২৫৲ টাকা হইতে ৫০৲ টাকা লাভ করিতে হইলে, ৫০৲ টাকা হইতে ১০০৲ টাকা খরচ করিতে হয়। চা-বাগানে চা'র চাষ এবং চা প্রস্তুত (cultivation and manufacturing.) উভয়ই হইয়া থাকে। গোস্বামী মহাশয়ের ইক্ষুক্ষেত্রেও ইক্ষুচাষ এবং গুড় ও চিনি প্রভৃতি প্রস্তুত হইতেছে। দেখিতেছি, চা-বাগানের ন্যায়, তাঁহারও ৪০৲ টাকা লাভ করিতে হইলে বিঘাপ্রতি ৮০।৮২৲ টাকা ব্যয় করিতে হইতেছে। ইহা কেবল চা-বাগানের প্রণালীতে ইক্ষুক্ষেত্র চালাইবারই ফল বলিতে হইবে।

কৃষকদিগের সহিত সমবায়-পদ্ধতি অবলম্বনে ইক্ষুচাষ করাইয়া লইয়া, সেই সকল ইক্ষু দ্বারা গুড়, চিনি প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে পারিলে, চাষের ব্যয় ও কারখানার ব্যয় সম্ভবতঃ অনেক কমই পড়িবে। যাহাতে ব্যয়ের পরিমাণ অধিক হইতে না পারে, অথচ লাভের পরিমাণ অধিক হয়, তদুদ্দেশ্যে কারখানা-সংলগ্ন আদর্শ ইক্ষুক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতীয় ইক্ষুর চাষ-পরীক্ষা করিয়া, তাহার ফলাফল কারখানার চতুষ্পার্শ্বস্থ কৃষকদিগকে জানাইতে হইবে। তদ্ভিন্ন, কোম্পানী একজন অভিজ্ঞব্যক্তি নিযুক্ত করিয়া, তাঁহার দ্বারা কৃষকদিগকে উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ইক্ষুচাষ শিক্ষা দেওয়াইতে পারিলে, কৃষকেরাও ইক্ষুচাষে লাভবান হইতে পারিবে এবং তাহাতে কারখানার মালিকেরাও

উৎকৃষ্ট ইক্ষুগুড় করিয়া লাভবান হইতে পারিবেন। কৃষকেরা গুড় প্রস্তুতের হাঙ্গামায় লিপ্ত রহিতে চাহে না; কিন্তু গুড় প্রস্তুত করিতে না পারিলেও ইক্ষুচাষ লাভজনক হয় না। সেইজন্যই কৃষকেরা ইক্ষুচাষে জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করে না। পক্ষান্তরে, গুড় প্রস্তুত না করিয়াও, যদি কৃষকেরা ইক্ষুচাষে লাভবান হইতে পারে, তাহা হইলে তাহারা ইক্ষুচাষে জমির পরিমাণ ক্রমশঃই বর্দ্ধিত করিবে; এবং এইরূপেই ইক্ষুচাষের প্রসারবৃদ্ধি ঘটিবে ও বিক্ষিপ্ত জমির (Scatter holding) অন্তরায়ও দূর হইবে। সুতরাং প্রত্যেক জিলায় জিলায়, এমন কি প্রত্যেক মহকুমায়ও, উক্ত প্রকারের এক একটি গুড় ও চিনির কারখানা স্থাপিত হইতে পারিবে।

কুমার জগদিন্দ্র দেব রায়কত।

বঙ্গের গো-ধন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মিঃ ব্ল্যাকউডের মতে, বিদেশ হইতে বৃষ আমদানী না করিয়া, দেশীয় বৃষের দ্বারাই জননকার্য্য-সম্পাদনের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। যদি দেশীয় বৃষই তাহার জন্মের পর প্রথম ছয়মাস পর্য্যাপ্তপরিমাণে দুগ্ধ পান করিতে পায় এবং পরে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে কাঁচা ঘাস খাইতে পায় ও যথেচ্ছ বিচরণ করিতে পায়, তবে তাহাদের দ্বারাই এ দেশের গো-জাতির উন্নতি সাধিত হইতে পারে।

১৯২২ খৃষ্টাব্দে, মিঃ ব্ল্যাকউড বঙ্গদেশের গো-জাতির সংখ্যা নির্ণয় করিবার ব্যবস্থা করেন। তাঁহার গণনায় অনেক ত্রুটী ও ভ্রম রহিয়া গিয়াছে, এ কথা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। যাহা হউক, ঐ গণনা দ্বারা তিনি স্থির করিয়াছেন যে, কলিকাতা ব্যতীত সমগ্র বঙ্গদেশে বৃষ ও গাভীর সংখ্যা ২৫৩২৯২৩, আর লোকসংখ্যা ৪৫৩৮৬৯২৫। বঙ্গদেশের মধ্যে জলপাইগুড়ি জেলাতে লোকসংখ্যা অপেক্ষা গোসংখ্যা অধিক; সেই জন্য মিঃ ব্ল্যাকউড ঐ জেলাকে, গো-জাতির পক্ষে, বঙ্গদেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জেলা বলিয়া মনে করেন। ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ গো-জাতির পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অনুপযোগী। কারণ, ঐ দুইটি বিভাগে কৃষিকার্য্যের অতি বিস্তারহেতু গোচারণের মাঠ নাই বলিলেই হয়। তাহার উপরে, বর্ষাকালের বন্যায় ঐ দুইটি বিভাগের অধিকাংশ স্থান জল-প্লাবিত হওয়াতে, গো-জাতির বিচরণের যৎপরোনাস্তি কষ্ট হয়। জলপাইগুড়িতে গোচারণের মাঠও প্রচুর আছে; এবং তথায় বন্যার উৎপাতও নাই।

যে সকল জেলাতে গো-বিক্রয়ের হাট বা মেলা আছে; সেই সকল জেলাতেই অধিক পরিমাণে বৈদেশিক বৃষ আমদানী হইয়া থাকে। যে সকল জেলাতে পাটের আবাদ অধিক, সেই সকল জেলাতেই বৈদেশিক বৃষেরও সংখ্যা অধিক। দিনাজপুর ও রঙ্গপুর জেলাতে গো-বিক্রয়ের মেলা আছে; ঐ দুইটি জেলাতে যত বৃষ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার অর্দ্ধেক বৈদেশিক। বগুড়ায় একতৃতীয়াংশ, মালদহ জেলাতে একচতুর্থাংশ, ময়মনসিংহে এক-অষ্টমাংশ, ঢাকাতে এগার ভাগের একভাগ এবং ফরিদপুর জেলাতে চৌদ্দ ভাগের একভাগ বৈদেশিক বৃষ। যশোহর জেলাতে ষোল ভাগের একভাগ মাত্র বৈদেশিক বৃষ।

হাটে ও মেলাতে যে সকল গো আমদানী হয়, তাহার মধ্যে বৃষের সংখ্যাই অধিক; গাভীর সংখ্যা নামমাত্র। প্রধানতঃ কৃষিকার্য্যের জন্যই, ঐ সকল বৃষের আদর অধিক। দিনাজপুর ও রঙ্গপুরেই গো-বিক্রয়ের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা বড় মেলা হইয়া থাকে। ময়মনসিংহ জেলাতে বৃষ ও গাভী বিক্রয়ের জন্য ৭৬টি হাট আছে; সেই হাট প্রতিসপ্তাহে হইয়া থাকে। চব্বিশ-পরগণাতে গড়ে প্রতিসপ্তাহে ১৬৯৫টি গো বিক্রয় হয়।

যাঁহারা বৈদেশিক গাভীর সাহায্যে বঙ্গদেশীয় গোজাতির উন্নতিসাধন করিতে চাহেন, তাঁহাদের অভিমত যে ভ্রমসঙ্কুল, মিঃ ব্ল্যাকউড তাহা স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন। ভারত গভর্ণমেণ্টের ভেটেরিনারি বিভাগের ভূতপূর্ব্ব ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল কার্ণলও ভারতের এক প্রদেশের বৃষ দ্বারা অন্য প্রদেশের গোবংশের উন্নতিসাধনের বিরোধী। তিনি বলেন যে, ভূয়োদর্শনের ফলে, আমাদের এই ধারণা হইয়াছে যে, ভারতের এক প্রদেশের গো অন্যপ্রদেশে গিয়া স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে না। (ক্রমশঃ)

Printed by Jatindra Mohan Das at the Wari Printing Works, Dacca and published by Nishi Kanta Ghosh at the Krishi-Sampada office, 66, Narindia, Dacca.

সিটি লাইব্রেরী।

ম্যানেজিং প্রোপ্রাইটার শ্রীনগেন্দ্রকুমার রায়
(ঢাকা—ফিরিঙ্গীবাজার স্কুলেরভূতপূর্ব্ব হেড্ মাষ্টার)।
প্রধান কার্য্যালয়—২৬নং বাঙ্গালাবাজার, ঢাকা।
শাখা-কার্য্যালয়—৬৪।১নং কলেজষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নিবেদন।

কি ঐহিক কি পারত্রিক, এই উভয়বিধ কল্যাণ সাধন করিতে হইলে ধর্ম্মকেই আশ্রয় করিতে হয়। ধর্ম্মপথ আশ্রয় ভিন্ন কেহ কোন বিভাগে উন্নতি লাভ করিতে পারে না। চরিত্রবান্ লোক ভিন্ন কেহ সাহসপূর্ব্বক ধর্ম্মকে আশ্রয় করিতেও পারে না। সৎসঙ্গ ও সদ্‌গ্রন্থই বালক ও যুবকদিগের চরিত্রগঠনের প্রধান উপায়। সৎসঙ্গ আজকাল দুর্লভ হইলেও সদ্‌গ্রন্থ হয়ত যত্ন করিলে পাওয়া যায়। লাইব্রেরী বা পুস্তকালয়ের দায়িত্ব এইখানে। দেশের পুস্তকালয় সকল হইতে সদ্‌গ্রন্থ প্রচারের যথেষ্ট সাহায্য হইতে পারে। অবশ্য গ্রন্থকারদিগের দায়িত্বও এই সঙ্গে রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন প্রকাশকগণের বিচারের উপর এই বিষয় যথেষ্ট নির্ভর করে। যাহা হউক কোনকালে মনে হইল, একটী বইএর দোকান দিয়া ভাল ভাল বহি চালাইব। সেই অঙ্কুর হইতেই সিটি লাইব্রেরীর উৎপত্তি। আজ ৪ বৎসর হইল সিটি লাইব্রেরী স্থাপিত হইয়াছে। এই অতি অল্পকালের মধ্যেই ইহা দশজনের আশীর্ব্বাদে বঙ্গের সর্ব্বত্রই প্রচারিত হইয়াছে। এই অল্পকালের মধ্যে যতদূর সাধ্য সমগ্র সদ্‌গ্রন্থের সংগ্রহ করা হইয়াছে। বৈষ্ণব গ্রন্থের জন্য এই লাইব্রেরী সমগ্র বঙ্গদেশে সুপ্রসিদ্ধ এবং এই লাইব্রেরী হইতে পূর্ব্ববঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ শ্রী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বঙ্গানুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্‌ভিন্ন স্কুলপাঠ্য বহি, নীতিপূর্ণ গল্পের বহি, নভেল, জীবনচরিত, ধর্ম্মগ্রন্থ প্রভৃতি অতীব প্রয়োজনীয় প্রায় ১৭০ খানা বহি এই অল্পসময়ের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। এই লাইব্রেরীর যাবতীয় পুস্তকগুলিই আধুনিক আবিষ্কৃত তথ্যাদিতে পরিপূর্ণ। মহামান্য ডিরেক্টার বাহাদুর কর্ত্তৃক পাঠ্য ও অনুমোদিত প্রায় ৭০ খানা বহির আমরা প্রকাশক বা সোল এজেণ্ট। আগামী ১৯১৭ সনের জন্য আমাদের ১৩ খানা বহি পাঠ্য হইয়াছে। এবং৬০ খানা বহি অনুমোদিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন রায় সাহেব শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ প্রণীত যাবতীয় বহি এবং বোম্বে অকস্‌ফোর্ড ইউনিভারসিটী প্রেস হইতে প্রকাশিত যাবতীয় বাঙ্গালা বহি ও অন্যান্য অনেক গ্রন্থকারদিগের বহির একমাত্র এজেণ্ট সিটী লাইব্রেরী। গ্রাহক ও ভদ্রমহোদয়গণের আশীর্ব্বাদে ৬৪।১নং কলেজষ্ট্রীটে দোকানের ব্রাঞ্চ খুলিতে হইল। কলিকাতার দোকানদার ও ভদ্র মহোদয়গণ যাহাতে সিটী লাইব্রেরীর প্রকাশিত বহিগুলি অনায়াসে পাইতে পারেন, তজ্জন্যই এই আয়োজন। গ্রাহক ও ভদ্র মহোদয়গণের আশীর্ব্বাদই আমাদের মূল সম্বল এবং আমাদের ব্যবহারে ধর্ম্মের মর্য্যাদা অন্ততঃ কিছুটাও রক্ষিত হইলে কৃতার্থ হইব। ইতি

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—আমাদের এই পুস্তকের তালিকার যে কোন বহি প্রধান শিক্ষক মহোদয় পাঠ্য-রূপে নির্দ্দিষ্ট করেন, তাহা পত্র লিখিলে লাইব্রেরীর জন্য উপহার পাঠাইব। পত্রে প্রধান শিক্ষক মহোদয়ের স্বাক্ষর থাকা বাঞ্ছনীয়। ইউরোপীয় ভীষণ সমরানলে সমগ্র পৃথিবীই নানা প্রকারে বিপন্ন। সর্ব্বোপরি কাগজের অত্যধিক মূল্য বৃদ্ধি হওয়াতে এবার আমরা পুস্তকের তালিকাটীও ভালরূপ বিতরণ করিতে পারিলাম না। প্রেজেণ্টেসন দেওয়া অসাধ্য। কাজেই উপযুক্ত নিবেদন জানাইলাম।

ঢাকা, সিটীলাইব্রেরী বিনীত—স্বত্বাধিকারী।

ঢাকা সিটিলাইব্রেরীর নিম্নলিখিত বহিসকল এবার বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট এবং আসাম এডমিনিষ্ট্রেসন প্রেসক্রাইবড্ (Prescribed) লিষ্টে স্থান পাইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট পাঠ্য—১৯১৭

কলিকাতা গেজেট ২৬শে জুলাই, ১৯১৬।

আসাম গেজেট ১৫ই নবেম্বর, ১৯১৬।

১। **জ্ঞানসোপান**—শ্রীজগদানন্দ রায় প্রণীত। আগামী ১৯১৭ সনের জন্য ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজসাহী বিভাগের যাবতীয় উচ্চ ও মধ্যইংরেজী স্কুলের ক্লাস সিক্স (class VI) অর্থাৎ মাইনর ক্লাসের একমাত্র পাঠ্য পুস্তক। মূল্য ।৵০ আনা।

২। **বিবিধ প্রবন্ধ**—রজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত। আগামী ১৯১৭ সনের জন্য ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজসাহী বিভাগের যাবতীয় উচ্চ ইংরেজী স্কুলের ক্লাস সেবেন (class VII) এর এবং ছাত্রবৃত্তি (M. V. School) প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর একমাত্র পাঠ্য পুস্তক। মূল্য—॥৵০ আনা।

৩। **সন্দর্ভমালা**—মনোমোহন রায় প্রণীত। আগামী ১৯১৭ সনের জন্য ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজসাহী বিভাগের যাবতীয় উচ্চ ও মধ্য ইংরেজী স্কুলের ক্লাস ফোর (Class IV) অর্থাৎ উচ্চ প্রাইমেরী শ্রেণীর একমাত্র পাঠ্য পুস্তক। মূল্য ।৵০ আনা।

৪। **সন্দর্ভ-চন্দ্রিকা**—শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত গুপ্ত কবিরত্ন এম, এ প্রণীত। আগামী ১৯১৭ সনের জন্য ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজসাহী বিভাগের যাবতীয় মধ্য বাঙ্গলা অর্থাৎ ছাত্রবৃত্তি ক্লাসের একমাত্র পাঠ্য পুস্তক। মূল্য ॥৵০ আনা। আসাম প্রদেশেও মধ্য বাঙ্গালা এবং হাইস্কুলের ক্লাস সেবেনে পাঠ্য হইয়াছে (আসাম গেজেট ১৫ই নবেম্বর, ১৯১৬ দেখুন)

৫। **সুনীতিসোপানম্**—শ্রীবরদাকুমার কাব্যতীর্থ প্রণীত। আগামী ১৯১৭ সনের জন্য ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজসাহী বিভাগের যাবতীয় উচ্চ ইংরেজী স্কুলের ক্লাস সেবেন (Class VII) এর একমাত্র সংস্কৃত সাহিত্যপুস্তক মূল্য ।/১০ আনা।

৬। **সুখপাঠম্**—শ্রীদেবেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম, এ, এম, আর, এ-এস প্রণীত। আগামী ১৯১৭ সনের জন্য ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজসাহী বিভাগের যাবতীয় উচ্চ ইংরেজী স্কুলের ক্লাস এইট (Class VIII) এর একমাত্র সংস্কৃত সাহিত্য পুস্তক; মূল্য ১।০ আনা।

৭। **গণিত কুসুম**—শ্রীপরেশনাথ বসু এম, এস সি প্রণীত। আগামী ১৯১৭ সনের জন্য ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজসাহী বিভাগের যাবতীয় বাঙ্গালা স্কুলের ক্লাস থ্রি (Class III) অর্থাৎ নিম্ন প্রাইমারী শ্রেণীর গণিত পাঠ্য পুস্তক। মূল্য ।৵০ আনা।

৮। **গণিতবিকাশ**—শ্রীপুলিনচন্দ্র বসু এম, এ ও শ্রীআশুতোষ বসু এম, এস সি প্রণীত। আগামী ১৯১৭ সনের জন্য ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজসাহী বিভাগের যাবতীয় বাঙ্গালা স্কুলের ক্লাস থ্রি ও ফোর (Class 3 and 4) অর্থাৎ নিম্ন প্রাইমারী শ্রেণীর গণিত পাঠ্য পুস্তক। মূল্য ।৵০ আনা।

৯। **সরল নিম্নপাঠ**—রায় সাহেব দীনেশচন্দ্র সেন ও নবীনচন্দ্র বসু বি, এ প্রণীত। আগামী ১৯১৭ সনের জন্য ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজসাহী বিভাগের যাবতীয় বালিকা বিদ্যালয়ের (Class IV) ক্লাস ফোরের পাঠ্য পুস্তক। মূল্য ।৵১০ আনা। কলিকাতা গেজেট ২১ সেপ্টেম্বর ১৯১৬।

১০। **সুখপাঠ**—যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত। আগামী ১৯১৭ সনের জন্য আসাম প্রদেশের উচ্চ ও মধ্য ইংরেজী স্কুলের একমাত্র পাঠ্য পুস্তক। মূল্য ।০ আনা (আসাম গেজেট ১৫ নবেম্বর ১৯১৬ দেখুন)

১১। **পদ্য সন্দর্ভ**—রায় সাহেব দীনেশচন্দ্র সেন বি, এ, প্রণীত। আগামী ১৯১৭ সনের জন্য আসাম প্রদেশের হাইস্কুলের ক্লাস এইটে একমাত্র পাঠ্য পুস্তক হইয়াছে। (আসাম গেজেট ১৫ই নবেম্বর,১৯১৬ দেখুন) মূল্য ।/০ আনা

১২। **নীতিকবিতা**—প্রাণকুমার গুহ। আগামী ১৯১৭ সনের জন্য আসাম প্রদেশের জন্য বাঙ্গালা উচ্চ প্রাইমারী স্কুলের ক্লাস ফাইভের পাঠ্য পুস্তক হইয়াছে। মূল্য ৵০ আনা (আসাম গেজেট ১৫ নবেম্বর ১৯১৬ দেখুন)

১৩। * **আদর্শ ভু-পরিচয়**—শ্রীজ্ঞানরঞ্জন মিত্র। ১৯১৭ সনের জন্য আসাম প্রদেশের যাবতীয় বাঙ্গালা স্কুলের ক্লাশ টু হইতে ক্লাস সেবেন, ইংরেজী বয়েজ এবং গার্লস্ হাই স্কুলের ক্লাস থ্রি এবং ক্লাশ ফোর এবং বালিকা বিদ্যালয়ের ক্লাস ফোর এবং ফাইভের জন্য পাঠ্য হইয়াছে। (আসাম গেজেট ১৫ই নবেম্বর, ১৯১৬ দেখুন) মূল্য আসাম সংস্করণ ৸০ আনা। পূর্ববঙ্গের সংস্করণ ॥০ আনা।

* আসাম উপত্যকা বিভাগে আসামী ভাষায় ভূগোল না থাকায় এই পুস্তক শিক্ষক মহোদয়গণ নিজ নিজ বিদ্যালয়ে পাঠ্য করিতে পারেন; ইহা ডিরেক্টার বাহাদুর আদেশ করিয়াছেন।

ঢাকা সিটিলাইব্রেরীর নিম্নলিখিত বহি বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক (Approved) হইয়াছে।

ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজসাহী বিভাগের যাবতীয় স্কুলের অন্যতম পাঠ্য বহি। বাঙ্গালা সাহিত্য।

বহির নাম	মূল্য	গ্রন্থকারের নাম	ক্লাস
সাহিত্যপাঠ (১ম ভাগ)	/০	ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী এম, এ,	১
সাহিত্যপাঠ	৵১০	”	”
কোমলপাঠ	৵০	”	”
শিশুসখা	/১০	প্রাণকুমার গুহ	”
শিশুবোধ	/১০	চারুচন্দ্র গুহ	”
* শিশুরঞ্জন (প্রথম ভাগ)	৶০	পদ্মলোচন ঘোষ	২
সুনীতিপাঠ	।/০	সুরেশচন্দ্র ঘোষ বি, এ,	
সাহিত্যসার	।০	প্রাণকুমার গুহ	
সরল নিম্নপাঠ	।৵১০	রায় সাহেব দীনেশচন্দ্র সেন বি, এ ও নবীনচন্দ্র বসু বি, এ	

* এই পুস্তকের সম্পূর্ণ লভ্য গ্রন্থকার দরিদ্ররোগীদের সেবার জন্য ঢাকা ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডকে দান করিয়া সাধারণের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। এই গ্রন্থের উপস্বত্ব দ্বারা তৎপ্রতিষ্ঠিত ঢাকা—হাসাড়া জয়লক্ষ্মী দাতব্য চিকিৎসালয় যাহাতে সুচারুরূপে চলিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। বোধহয় সকলেই জানেন স্বয়ং গবর্ণর বাহাদুর এই চিকিৎসালয় খুলিয়া দিয়াছেন।

সন্দর্ভমালা	।৵৹	মনোমোহন রায়	৪
প্রবন্ধপাঠ (১ম ভাগ)	।৴৹	ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী এম, এ	„
সাহিত্য প্রসূন	।৵৹	প্রসন্নকুমার গুহ	„
সুখপাঠ	।৹	যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	„
সাহিত্য কৌমুদী	।৶৹	ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী	৫
প্রবন্ধপাঠ (১ম ভাগ)	।৴৹	„	„
সাহিত্য-প্রসূন	।৵৹	প্রসন্নকুমার গুহ	„
সন্দর্ভ-মালা	।৵৹	মনোমোহন রায়	„
জ্ঞানবিকাশ	॥৹	মহম্মদ তৈমুর	„
প্রবন্ধপাঠ (২য় ভাগ)	॥৹	ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী এম, এ	৬
জ্ঞানসোপান	।৶৹	জগদানন্দ রায়	„
জ্ঞানবিকাশ	।৶৹	অতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	„
উপদেশমঞ্জরী	।৶৹	অনাথবন্ধু মল্লিক	„
সন্দর্ভচন্দ্রিকা	॥৶৹	অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত এম, এ	৭
বিবিধ প্রবন্ধ	॥৴৹	রজনীকান্ত গুপ্ত	„
পদ্যসন্দর্ভ	।৴৹	রায়সাহেব দীনেশচন্দ্র সেন, বি, এ	„
সদ্ভাবশতক	॥৹	অসিতকুমার গুহ প্রকাশিত	„
*প্রবন্ধরত্ন	৸৹, ৸৵৹	শিবরতন মিত্র	৮

* এই পুস্তকখানা প্রেসিডেন্সী এবং বর্দ্ধমান বিভাগেও ক্লাস ৭—১০ এর জন্য অনুমোদিত হইয়াছে।

সীতার বনবাস	৸৹	শিবরতন মিত্র	„
পদ্য সন্দর্ভ	।৴৹	দীনেশচন্দ্র সেন বি, এ	„

সংস্কৃত সাহিত্য

বহির নাম	মূল্য	গ্রন্থকার	ক্লাস
সুনীতি-সোপানম্	।৴১৹	বরদাকুমার কাব্যতীর্থ	৭
রূপ-পাঠম্	।১৹	দেবেন্দ্রকুমার বিদ্যারত্ন এম, এ	৮
সংস্কৃত সন্দর্ভ	।৵৹	বিধুশেখর শাস্ত্রী	৭, ৮

সংস্কৃত ব্যাকরণ

*পাণিনি-পরিশিষ্ট ৸৹ দেবেন্দ্রকুমার বিদ্যারত্ন এম, এ ৭—১০

এই বহিখানা কলেজের I. A class এর পাঠ্য হইয়াছে। যাহারা ম্যাট্রিকুলেসন ক্লাসে অপসনেল সংস্কৃত নিয়াছে তাহাদের পক্ষে পাণিনি-পরিশিষ্ট বিশেষ উপযোগী। ইহাতে শব্দখণ্ড ও ধাতুখণ্ড বিস্তারিতরূপে দেওয়া হইয়াছে। দেবেন্দ্রবাবু সম্প্রতি "পাণিনি প্রাইমার" নামে একখানা গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন; তৎসঙ্গে বড় বড় অক্ষরে অষ্টাধ্যায়ী সূত্রপাঠ প্রদত্ত হইয়াছে। ক্লাস এইটের সংস্কৃতশিক্ষার্থী প্রত্যেক ছাত্রেরই একখণ্ড ক্রয় করা কর্ত্তব্য। মোট কথা 'পাণিনি প্রাইমার' ও "পাণিনি পরিশিষ্ট" কমপ্লিট (com-plete) বহি।

অঙ্ক।

গণিত-বিকাশ (১ম ভাগ)	।৶৹	আশুতোষ বসু এম্ এস, সি এবং পুলিনচন্দ্র বসু এম, এ	২, ৩
গণিতকুসুম,	।৵৹	পরেশনাথ বসু এম, এস, সি	„
পাটীগণিত (১ম ভাগ)	।৴৹	হরকান্ত বসু বি, এ	„
খোকার আঁক	।৵১৹	অতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও ভীমচন্দ্র দত্ত	
রয়েল এরিথ্‌মেটিক	৸৹	পরেশনাথ বসু এম, এস, সি	৪, ৫, ৬

ব্যাকরণ

সরল বাঙ্গালা ব্যাকরণ	।৹	নগেন্দ্রকুমার চন্দ	৪, ৫, ৬
ভাষাশিক্ষা ব্যাকরণ	।৵৹	প্রসন্নকুমার গুহ	„
*ভাষা-বিজ্ঞান	৸৹	রজনীকান্ত বেদান্তবাগীশ	৭, ৮
সাহিত্যবোধব্যাকরণ	৸৹	মতিলাল চক্রবর্ত্তী	৭, ৮, ৯, ১০

* প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমে পণ্ডিত মহাশয় এই ব্যাকরণ প্রকাশ করিলেন। সম্প্রতি ২য় ও ৩য় খণ্ড বাহির হইয়াছে। এই ব্যাকরণ বাঙ্গালা ভাষার গৌরব স্তম্ভ। প্রতিখণ্ড ৸৹ আনা। অন্ততঃ এক সেট প্রত্যেক স্কুল-লাইব্রেরীতে রাখিবার উপযোগী।

মধ্য বাঙ্গালা, উচ্চ প্রাইমেরী ও নিম্নপ্রাইমেরী স্কুলের জন্য।

সাহিত্য

সাহিত্য পাঠ	৵১৹	ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী এম, এ,	২
কোমল পাঠ	৶৹	„	„
শিশুরঞ্জন	৶৹	পদ্মলোচন ঘোষ	„
সুনীতিপাঠ	।৴৹	সুরেশচন্দ্র ঘোষ বি, এ	৩
সরল নিম্নপাঠ	।৵১৹	দীনেশচন্দ্র সেন বি, এ ও নবীনচন্দ্র বসু বি, এ	„

নীতিকবিতা	।৹	„	৪
নীতিকবিতা	৵৹	„	৫
প্রবন্ধ পাঠ (২য় ভাগ)	॥৹	ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী, এম, এ	৭
বিবিধ-প্রবন্ধ (৩য় ভাগ)	॥৴৹	রজনীকান্ত গুপ্ত	„
প্রবন্ধ-পাঠ (২য় ভাগ)	॥৹	ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী	৬
বিবিধ প্রবন্ধ (৩য় ভাগ)	॥৴৹	রজনীকান্ত গুপ্ত	„
সন্দর্ভচন্দ্রিকা	॥৶৹	অক্ষয়কুমার দত্ত গুপ্ত কবিরত্ন এম, এ	„

অঙ্ক

গণিত বিকাশ (১ম ভাগ)	।৶৹	আশুতোষ বসু এম, এস, সি ও পুলিনচন্দ্র বসু এম, এ	৩, ৪
গণিত কুসুম	।৵৹	পরেশনাথ বসু এম, এস সি	„
পাটীগণিত (১ম ভাগ)	।৴৹	হরকান্ত বসু বি, এ	„
খোকার আঁক	।৵১৹	ভীমচন্দ্র দত্ত ও অতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	„

উচ্চ ও মধ্যইংরেজী, মধ্যবাঙ্গালা, উচ্চ-প্রাইমেরী ও নিম্নপ্রাইমারী স্কুলের জন্য অনুমোদিত।

পত্রদলিল

আদর্শ নূতন পত্রদলিল ৵৹ মৌলবী আবদুল জব্বার

কর্ম্ম সঙ্গীত।

নব কিণ্ডার গার্টেন কর্ম্মসঙ্গীত ৵৹ মৌলভী ছালামতুল্লা

রাজার কথা ।৵৹ কালিভূষণ মুখোপাধ্যায়

স্বজাতি বৎসলা ললনা ৶৹ অম্বিকাচরণ চক্রবর্ত্তী

* পৌরাণিকী কথা ও ইসলাম কাহিনী } গুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য ২৲ { আবার তিনখানি ১৸৹ আনা

নারীর ভাগ্যচিত্র ১৲ জনৈক মহিলা প্রণীত

বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার } জগদানন্দ রায় ১।৹

প্রকৃতি পরিচয় ১।৹ „

সুকথা ৸৹ দীনেশচন্দ্র সেন বি, এ

‡ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত (বঙ্গানুবাদ) ৬৲ টাকা, বাঁধা ৮৲ নগেন্দ্রকুমার রায়

আদর্শ জননী ৸৹ শরচ্চন্দ্র ধর

* রামায়ণের কথা ॥৵৹ আনা, মহাভারতের কথা ৸৹ আনা ও ইসলাম কাহিনী ।৵ আনা পৃথক পৃথক পাওয়া যায়।

‡ প্রেসিডেন্সী, বর্দ্ধমান ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজসাহী বিভাগসমূহের যাবতীয় স্কুল, কলেজ, গুরুট্রেণিং ও নর্ম্মাল স্কুলের জন্য অনুমোদিত হইয়াছে। "অদ্যাবধি এরূপ সংস্করণ প্রকাশিত হয় নাই" ইহা অনেকেই বলেন।

ঢাকা সিটি লাইব্রেরীর নিম্নলিখিত বইগুলি এবার ডিরেক্টার বাহাদুর কর্ত্তৃক নূতন পাশ হইয়াছে।

শিশুর সাথী	৶৹	ইন্দিরা দেবী	২
করুণাসোপান	।৵৹	হিরণবালা গুপ্তা	„
নীতিমালা	।৶৹	রাসবিহারী বসু এম, এ	„
নীতিচয়ন	৸৹	রাসবিহারী বসু এম, এ	„
সংস্কৃত প্রাইমার	।৹	যোগেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়	„
সুনীতি সারম্	।৹	„	„
লঘুপাণিনির (২য় ভাগ)	৸৹	„	৭, ৮
লঘু পাণিনির (৩য় ভাগ)	॥৹	„	„

আদর্শ ভূ-পরিচয় আসাম প্রদেশে ইংরেজী ও বাঙ্গালা যাবতীয় স্কুলের ১০টী ক্লাসে পাঠ্য হইয়াছে। (আসাম গেজেট দেখুন। স্কুল ঘর হইতে আরম্ভ করিয়া মহাদেশ পর্য্যন্ত নানাবিধ ছবি দ্বারায় বর্ণিত হইয়াছে। আজ পর্য্যন্ত এমন ভূগোল বাহির হয় নাই।

চাইল্ডস ইজি গ্রামার	।৴৹	কে, সি সেন এম, এ	৪, ৫, ৬
শিশুপাটীগণিত	।৵৹	রজনীকান্ত দে	„
সিম্পল এরিথ্‌মেটিক	৸৹	জ্ঞানদাকিশোর চৌধুরী ও যোগেশচন্দ্র চাটার্জ্জি বি, এ	„
সরল শিশুপ্রবেশ	৶৹	নগেন্দ্রকুমার রায়	„
শিশুতোষ ব্যাকরণ	৴১৹	অতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	„

কবিতা কৌমুদী (১ম ভাগ) ৵০ হরিশ্চন্দ্র মিত্র ৪

নির্ব্বাসিতা সীতা ৵০ হরিশ্চন্দ্র মিত্র ৭

কবিবর ৺হরিশ্চন্দ্র মিত্রের রচিত নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহ উদ্ধার হইয়াছে। সাহিত্যিক মাত্রেই কবিবরের রচিত গ্রন্থের এক এক সেট ক্রয় করেন ইহাই বাসনা নির্ব্বাসিতা সীতা ।৵০ আনা; রামায়ণ মহাকাব্য ১৲ টাকা; কবিতা-কৌমুদী ১ম ভাগ ৵০ আনা; ও দ্বিতীয় ভাগ ।/০ আনা; ঐ তৃতীয় ভাগ ।৵০ আনা। সরল পাঠ ৵০ আনা; ছাত্রসখা ৵০ আনা, কবিতাবলী ৵০ সমস্তই স্কুল-পাঠ্য পুস্তক। কবিবর রচিত গ্রন্থাবলীর একমাত্র স্বত্বাধিকারী সিটী লাইব্রেরী।

প্রাথমিক ভারত ইতিহাস চট্টগ্রাম নর্ম্মাল স্কুলের সুযোগ্য সুপারিনটেনডেন্ট গুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য বি, এ ।০

আদর্শ ভূ-পরিচয় ॥০ জ্ঞানরঞ্জন মিত্র

সরল আদর্শ পত্রলিখন ও পত্র দলিল ।৵০ রাজেন্দ্রকুমার রায়

আদর্শলিপি (তিনখণ্ড) উপেন্দ্রকুমার রায় (প্রতিখণ্ড) /১০

এইরূপ সুন্দর লেখা অদ্যাবধি বাহির হয় নাই। ইহাতে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে।

ঢাকা সিটী লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত হেল্প বুকস্ Help-books অর্থাৎ নানাবিধ সাহায্যকারী পুস্তকসমূহ।

শিশুপাঠ /১০ ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী এম এ, প্রণীত ১

সরল বাল্যপাঠ /০ হরবন্ধু চক্রবর্ত্তী „

শিশুশিক্ষা পাটীগণিত ।০ প্রফুল্লকুমার গুহ ১, ২

সরল শিশু ধারাপাত /০ রাজেন্দ্রকুমার রায় „

কিণ্ডারগার্টেন বৃহৎ ধারাপাত ও শিশু অঙ্ক পুস্তক ৵৫ নগেন্দ্রকুমার রায় „

দি নিউ ইংলিশস্পেলিং বুক ।০ { নগেন্দ্রকুমার চন্দ ও বিরাজমোহন চন্দ } ৩-৮

বাঙ্গালা পদপরিচয় বা পার্স্সিং এর বহি ।০ { নগেন্দ্রকুমার চন্দ } ৪-৮

চাইল্ডস্ সিম্পল গ্রামার ।৵১০ নগেন্দ্রকুমার চন্দ ৪-৬

রুডিমেন্টস্ অব ইংলিশগ্রামার ।০ ফণীন্দ্রনাথ লাহিড়ি এম, এ ৪-৬

আদর্শ মৌখিক ভূগোল ।/০ জনৈক অভিজ্ঞ পণ্ডিত ৩, ৪

আদর্শ মৌখিক ইতিহাস ।০ „ ৩-৪

সরল ভূগোল পাঠ ।/০ প্রফুল্লকুমার গুহ ৩-৪

ভূগোল দর্পণ ।৵০ পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ৪-৫

সরল শিশুভূগোল ।০ কালিকা প্রসাদ চক্রবর্ত্তী ৩-৪

সংস্কৃত ব্যাকরণ আদর্শ ॥০ রাধাবল্লভ গোস্বামী ৭-৮

প্রবন্ধ মঞ্জরী ।/০ প্রমথনাথ বিদ্যাভূষণ „

শিশুপাঠ্য ভারতবর্ষের ইতিহাস ॥০ প্রাণকুমার গুহ ৪-৬

হেণ্ডওয়ার্ড ওয়ার্ড বুক ।০ জ্ঞানদাপ্রসাদ দাস বি, এ ৩-৪

সুখপাঠ ভারত ইতিহাস ।৵০ যোগেশচন্দ্র রায় বি এ; ৩-৫

এন এলিমেণ্টারী কোর্স অব ট্রানশ্লেসন ।/০ } জীতেন্দ্রমোহন চন্দ ৪-৫

আদর্শ রচনাপদ্ধতি ।/০ জনৈক অভিজ্ঞ পণ্ডিত ৫,৮

চাইল্ডস্ ইজি ট্রানশ্লেসন এণ্ড রিট্রেনশ্লেসন ॥৵০ } পি, সি ঘোষ এম, এ „

নব শিক্ষা সহায় (শিক্ষকদিগের জন্য) ।০ } কামিনীকুমার বিদ্যাবিনোদ ৩-৭

বর্ণবিকাশ ও বর্ণবিকাশ-শিক্ষা (শিক্ষকদিগের জন্য) } গিরিজাকান্ত ঘোষ „

নীরব কবিতা ।/০ নগেন্দ্রকুমার রায় ৪-৬

চট্টগ্রাম দর্পণ বা চট্টগ্রামের ভূগোল ৵০ } সুরেশ্বর বানার্জি ৪-৫

খোকার বই (১ম ভাগ) /১০ মোহিনীমোহন বসু ১

„ (২য় ভাগ) ।/০ „ ২

খোকার কবিতা ৵০ „ ৪

নব কর্ম্ম-গীত ।০ „

মডেল স্পেলিং রিডার- ।০ „

অবধারিত গণিতাঙ্ক (শিক্ষকদিগের জন্য) ॥০ } তারিণীচরণ বসু

কবিতা-সোপান ৵০ মহেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ৪

ফেমিলিয়ার লেটারস্ এণ্ড এসেজ ॥/০ „ ৬-৭

কুসুম-বালা (বালিকাদিগের জন্য) ।৵০ „ ৪-৬

হেণ্ড বুক অব কম্পোজিসন ।/০ } মহেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ জ্ঞানদাপ্রসাদ দাস বি, এ, ৬-৮

মাইনর স্পেলিং /০ রাজেন্দ্রকুমার রায় ৩-৪

প্রগ্রেসিব ইংলিস ট্রানশ্লেসন এণ্ড কম্পজিসন } চন্দ্রকুমার ঘোষ বি, এ, ৫-৮

বিগিনার্স ষ্টাডিজ ইন ইংলিশ ।০ নগেন্দ্রকুমার রায় ৫-৬

বিগিনার্স নিউমেথড্ অব লার্ণিং, ইংলিশ গ্রামার ট্রানশ্লেসন এণ্ড কম্পোজিসন বাই ডিরেক্ট মেথড্ /০ } অম্বিকাচরণ চক্রবর্ত্তী বি, এ ৫-৬

এ ম্যানুয়েল অব লার্ণিং সেনটেন্স্ বাই ডিরেক্ট মেথড্ ॥০ „ ৭-৮

ডিকটেসন এক্সারসাইজেস্ কম্প্রাইজিং স্পেলিং প্রোগালসেস এণ্ড ওয়ার্ডবুক ।/০ } এস, এম, দত্ত বি, এ

মডেল এরিথ মেটিক ৸০ বিএ, বিটি দত্ত এণ্ড সরকার ৪-৫

এন এপিটম অব ইণ্ডিয়ান হিষ্টরী ৸০ { কালীপ্রসন্ন দত্ত বি, এ হেড হেডমাষ্টার বরিশাল জিলা স্কুল } ৭-৮

সরল পাঠ ।৮ বসন্তকুমার দাস বি, এ বি, টি ২

সচিত্র শিশুরঞ্জন (১ম ভাগ) ।০ নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম, এ, ৩

„ (২য় ভাগ) ।/০ „ ৩-৬

প্রবন্ধপাঠ (৩য় ভাগ) ৸৵০ ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী এম এ, ৭-৮

ভাব-বল্লী ।৵০ প্রসন্নকুমার গুহ ৭-১০

বস্ত্র শিক্ষা ।০ মৌলবী আবদুলজব্বর ৪-৮

মডেল এলিমেণ্টারী জিওগ্রাফি ।/০ জ্ঞানদা প্রসাদ দাস বি, এ „

নিউ মেথড ইন এলজাবরা ॥৵০ এম, গুপ্ত ৭-১০

টিউটরিয়াল এরিথ মেটিক ৸০ রাসবিহারী বসু এম, এ ৪-৬

রামায়ণী সুধা ৸০ কুমুদিনীকান্ত গাঙ্গুলী বি, এ ৫-১০

দীপক ॥০ „ ৭-৮

সেলফ কন্ট্রোল এণ্ড সেলফ রিএলাইজেসন ১৲ „ ৯-১০

সংস্কৃত শিক্ষা সরণি ॥০ বরদাকুমার কাব্যতীর্থ ৭-১০

হিতোপদেশ সারম ।/০ ৭-১০

জিওমেট্রির সলিউসন ১ম ও ২য় ভাগ। তৃতীয় চতুর্থখণ্ড ও যন্ত্রস্থ ॥৵০ } বসু এণ্ড বক্সী ৭-১০

বালকবোধ ব্যাকরণ ।/০ মতিলাল চক্রবর্ত্তী ৪-৬

ভাব-লহরী ।০ প্রসন্নকুমার গুহ „

পদ্য শিক্ষা ।০ „

ম্যাট্রিকুলেসন ট্রানশ্লেসন ॥/০ রামব্রহ্ম লাহিড়ি বি, এ ৬-৮

হিসাব দর্পণ ॥০ গুরুপ্রসন্ন দাসগুপ্ত (শিক্ষকদিগের জন্য)

রাণী দুর্গাবতী ৸০ কালীভূষণ মুখোপাধ্যায় ৮-৯

সংস্কৃত ব্যাকরণ সোপান ৸০ রজনীমোহন কাব্যতীর্থ ৭-১০

সিটি লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত আউট বুকস্।

সতী রাধাকিশোরী শরচ্চন্দ্র ধর ॥/০

ঝটিকা (টেম্পেষ্টের বঙ্গানুবাদ) } ইন্দ্রমোহন দাস বি এ, ॥/০

রুমা এস এম দত্ত বি, এ ॥৵০

দাক্ষায়ণী মোহিনীমোহন বসু ।৵০

পুষ্পমঞ্জরী রবীন্দ্রকুমার সেন ১৲ আবাদ্ধা ৸০

বিদ্যালয়ে উদ্ভিদ-পরিচর্য্যা স্বর্ণকুমার মিত্র ৵০

আকাশ প্রদীপ সুখরঞ্জন রায় এম, এ ॥/০

হাসি ও অশ্রু নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম, এ ৸০

বীরবিক্রম নাটক „ ॥০

রত্নাবলী গুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য বি, এ ॥/০

বিক্রমোর্ব্বশী „ ॥০

স্বপ্নবাসবদত্তা „ ।/০

বাল চরিত „ ।/০

পঞ্চ রাত্র „ ।/০

প্রতিজ্ঞা যৌগন্ধরায়ণ „ ।/০

মহাত্মা যোসেফ্ অম্বিকাচরণ চক্রবর্ত্তী বি, এ ।৵০

প্রভু যিশুখৃষ্ট ।৵০ „

জয়ন্ত নাটক ।৵০ নগেন্দ্রকুমার রায়

স্বপ্ন ভূমি উপন্যাস ।৵০ „

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা বঙ্গানুবাদ সহ	ll৵০	
হাটপত্তন ও নামসংকীর্ত্তন বঙ্গানুবাদ সহ	।০	
রূপান্তসার ব্রজলীলা নাটক	৶১০	চৈতন্যকৃষ্ণ দাস
দুর্গা পুরাণ	১॥০	পীতাম্বর নাথ
ঠাকুরমার চিঠি বা সমাজে নারী	১।০	ফণিভূষণ রায়

রেজেষ্টরী করা শঙ্খমার্কা আসল।

লালমোহন সাহ শঙ্খনিধির

জগদ্বিখ্যাত

সর্ব্বজ্বরগজসিংহ

৪৮ ঘণ্টায় সর্ব্ববিধ জ্বর, ১ সপ্তাহে প্লীহা-যকৃৎ আরোগ্য হয়।

পৃথিবীব্যাপিত

সর্ব্বদদ্রুহুতাশন

২৪ ঘণ্টায় দাউদাদি চর্ম্মরোগ বিনাক্লেশে আরোগ্য হয়।

সুপ্রসিদ্ধ

কণ্ডুদাবানল

খোস পাঁচড়াদি কণ্ডুরোগ শীঘ্র বিনাক্লেশে আরোগ্য হয়।

শ্রীগৌরনিতাই সাহ শঙ্খনিধি।

ঢাকা বাবুবাজার, শঙ্খনিধি পোঃ বা ভজহরিসাহার ষ্ট্রীট, ঢাকা

তামাকের চাষ

রংপুর গবর্ণমেণ্ট কৃষি-পরীক্ষাক্ষেত্রের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযামিনীকুমার বিশ্বাস বি, এ প্রণীত

নানাপ্রকার দেশী ও বৈদেশিক তামাকের চাষসম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্যতথ্যপূর্ণ অভিনব পুস্তক। বাঙ্গালা ভাষায় তামাকের চাষসম্বন্ধে এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সুবৃহৎ পুস্তক ইতঃপূর্ব্বে আর প্রকাশিত হয় নাই। গ্রন্থকার বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া ব্রহ্মদেশ, বেহার ও মান্দ্রাজের অনেক স্থানের তামাকের চাষ-প্রণালী সন্দর্শন করিয়াছেন এবং বিগত ১৯০৫ সাল হইতে এ যাবৎ রংপুর সরকারী কৃষিপরীক্ষা-ক্ষেত্রে নানা জাতীয় তামাকের উন্নতিকল্পে বহু পরিশ্রমে দেশী এবং সিগারেটের উপযোগী মার্কিন ও তুরস্ক দেশীয় ও চুরটের উপযোগী মান্দ্রাজ ও বর্ম্মা দেশীয় তামাকের বিজ্ঞানসম্মত-প্রণালীতে চাষ-বাস করিয়া, যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন; এ পুস্তকে তাহাই বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তামাকের চাষ করিয়া যাহারা বিশেষ লাভবান হইতে বাসনা করেন, তাহাদের সকলেরই একখানি ক্রয় করা উচিৎ।

পুস্তকের ছবি, ছাপা ও কাগজ উত্তম--মোট ১৮ খানি ছবির পুস্তকের মূল্য ১॥০ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—কৃষি-সম্পদ আফিস—ঢাকা।

কৃষিতত্ত্বাবদ

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দে F. R. H. S. প্রণীত।

১। কৃষিক্ষেত্র (১ম ও ২য়খণ্ড একত্রে ৪র্থ সংস্করণ) –১৲
২। সবজীবাগ (৫ম সংস্করণ) ॥০ ৩। ফলকর (৩য় সংস্করণ)॥০
৪। মালঞ্চ (২য় সংস্করণ)—১৲ ৫। মৃত্তিকতত্ত্ব—১৲
৬। গোলাপবাড়ী –৸০, ৭। কার্পাস-কথা—॥০
৮। উদ্ভিদ-জীবন ॥০, ৯। পশুখাদ্য ।০, ১০। আয়ুর্ব্বেদ১॥০
১১। Treatise on Mango (2nd Edition) Re. 1
১২। Potato Culture (3rd Edition) As 6

প্রাপ্তিস্থান-কৃষি-সম্পদ পুস্তক-বিভাগ
কৃষি-সম্পদ আফিস—ঢাকা।

কৃষি-সম্পদের পাঠকগণ আদ্যন্ত পাঠ করুন।

কৃষি-সম্পদ পুস্তক-বিভাগ।

পুস্তক-বিভাগ স্থাপনের উদ্দেশ্য—

আমাদের কৃষি-কর্ম্মানুরাগী ও কৃষি-কর্ম্মাধ্যায়ী বহুসংখ্যক গ্রাহকই নানা প্রকার কৃষি-গ্রন্থ পাঠাইয়া দিবার জন্য আমাদিগের নিকট পত্র লিখিয়া থাকেন। আমরা তাঁহাদের পত্র পাওয়া মাত্রই, পুস্তক পাইবার ঠিকানা জানাইয়া থাকি। কিন্তু অনেকেই ইহাতে বড় অসন্তুষ্ট হন এবং নানারূপ অনুযোগ করিয়া, আমাদিগকেই তাঁহাদের অভীপ্সিত পুস্তক পাঠাইয়া দিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়া থাকেন। এমন কি, অনেকেই লিখিয়া থাকেন, "আমরা আপনাদের লিখিত ঠিকানায় পত্র দিয়াও পুস্তক পাইতেছি না। ঢাকা ও কলিকাতার দুই চারিটী পুস্তকালয়েও পুস্তক পাঠাইয়া দিতে অর্ডার দেওয়া হইয়াছিল; কিন্তু কেহই পুস্তক পাঠাইয়া দিতে পারেন নাই" ইত্যাদি। বস্তুতঃ, অধিকাংশ পুস্তক-বিক্রেতাই যে বাঙ্গলা ও ইংরেজি কৃষি-গ্রন্থ বিক্রয় করেন না, তাহা আমরা বিশেষভাবেই অবগত আছি। কৃষি-গ্রন্থ ক্রয় করিবার ইচ্ছা খুব কম লোকেরই হয়। এমতাবস্থায় বলবতী বাসনাসত্ত্বেও যে অনেকেই পুস্তক ক্রয় করিতে পারেন না, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। আমাদের গ্রাহকদিগের যাহাতে বাসনা অপূর্ণ না থাকে, তদুপায়বিধান করাই, আমাদের পুস্তক-বিভাগ-স্থাপনের প্রধানকারণ।

কৃষি-গ্রন্থ প্রচারের সহায়তা করাই, পুস্তক-বিভাগ স্থাপনের মুখ্য-উদ্দেশ্য।

ইহাতে থাকিবে কি—প্রায় সর্ব্বপ্রকার ইংরেজি ও বাঙ্গালা কৃষি-গ্রন্থ বিক্রয়ার্থ প্রচুর পরিমাণে মজুত থাকিবে। তদ্ভিন্ন, স্কুল ও পাঠশালার পাঠ্য পুস্তক, উপহার দিবার উপযোগী এবং স্ত্রী-পাঠ্য সর্ব্ববিধ পুস্তকই, পুস্তক-বিভাগে রক্ষিত হইবে। ডাক্তারি ও কবিরাজি চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধীয় পুস্তক, ধর্ম্মগ্রন্থ, ইতিহাস এবং নভেল, উপন্যাস ও কাব্য গ্রন্থাদিও পুস্তক-বিভাগে রাখা হইবে।

কৃষি-সম্পদ পুস্তক-বিভাগে প্রায় সর্ব্বপ্রকারের পুস্তকই রহিবে।

পুস্তকের অর্ডার দিবার সঙ্গে সঙ্গেই আনুমানিক এক চতুর্থাংশ মূল্য পাঠাইয়া দিতে হইবে।

কার্য্যাধ্যক্ষ—কৃষি-সম্পদ পুস্তক-বিভাগ।
"কৃষি-সম্পদ" আফিস—ঢাকা।

NEW START! NEW START!!

HALF-TONE AT DACCA

Engraving Process & Co.

Process Engraving & Co.

All up-to-date Machineries.
Works—Up-to-date and satisfactory.

Expert trained in AMERICA and JAPAN.

Our blocks print clean and beautiful.

PROCESS ENGRAVING & Co.,
25, GANDARIA—DACCA.

Cover printed at the Sreenath Press, Dacca.

Approved by the Director of Public Instruction, Bengal, for use in Schools & Colleges (Vide, Calcutta Gazette, 2nd Oct. 12.)

Krishi-Sampada.
Vol. VII. No. X & XI. একমাত্র কৃষিবিষয়ক মাসিক পত্র। মাঘ ও ফাল্গুন, ১৩২৩, ৭ম বর্ষ, ১০ম ও ১১শ সংখ্যা

আমাদের অন্নসমস্যা-সমাধানের প্রধান উপায় কৃষি।

আমাদের শ্রম-শিল্পের প্রধান উপকরণও কৃষি।

অর্দ্ধমূল্য ! অর্দ্ধমূল্য !! অর্দ্ধমূল্য !!!

পাঠশালার শিক্ষকমাত্রেরই নিত্যপ্রয়োজনীয়—

বিদ্যালয়ে উদ্ভিদ-পরিচর্য্যা।

ক্যালিফর্ণিয়া—বার্কলী-কৃষি-কলেজের শ্রীযুক্ত সরণকুমার মিত্র প্রণীত।

মার্কিণের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে (Grammar school) ক্রমাগত ছয় বৎসরকাল কিরূপভাবে প্রাথমিক কৃষিশিক্ষার বন্দোবস্ত রহিয়াছে, এ পুস্তকে তাহাই সরলভাষায় বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির বিস্তৃত আলোচনা রহিয়াছে :—

ভারতবর্ষ ও কৃষি-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা—বিদ্যালয়ে কৃষিশিক্ষা—আমাদের দেশ—পাশ্চাত্য-দেশে কৃষিশিক্ষা—প্রকৃতি-পাঠ—আমেরিকায় নিম্নশিক্ষা—বর্ষভেদে শিক্ষা-পর্য্যায়—নিম্নশিক্ষায় কৃষিচর্চ্চা—প্রাথমিক কৃষিশিক্ষার ভাবীফল—বাগানের উৎপন্ন শাক্-সব্জী—কার্য্যের নির্দ্দিষ্ট কাল—শিক্ষা-প্রণালী—আমাদের দেশে প্রাইমারী স্কুলে কৃষি-শিক্ষা—এ দেশের কৃষকসন্তানের শিক্ষার অন্তরায়—আমাদের কর্ত্তব্য—প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারের উপায়—গভর্ণমেণ্টের সাহায্য-প্রার্থনা।

সুন্দর মোটা আইভরি ফিনিস কাগজে অপূর্ব্ব মুদ্রণ। গ্রন্থকারের একখানি প্রতিকৃতি এবং পাঁচখানি একপৃষ্ঠাব্যাপী হাফ্‌টোন ছবি সংযুক্ত। মূল্য ।০ আনা মাত্র।

অভাবনীয় সুযোগ! অভাবনীয় সুযোগ !!

কৃষি-সম্পদের গ্রাহকগণকে 'বিদ্যালয়ে উদ্ভিদ-পরিচর্য্যা' অর্দ্ধমূল্যে প্রদত্ত হইবে। পাঁচখানি ৵০ মূল্যের ডাকটিকিট বা দশ পয়সার টিকিট পাঠাইয়া দিলেই এক একখানি পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন। স্মরণ রাখিবেন, এ আশাতীত সুযোগ অধিক দিন স্থায়ী হইবে না।

প্রাপ্তিস্থান—কৃষি-সম্পদ-পুস্তকবিভাগ, কৃষি-সম্পদ আফিস, ঢাকা। অথবা ম্যানেজার সিটী লাইব্রেরী, বাঙ্গালাবাজার—ঢাকা।

বঙ্গের বর্ত্তমান গবর্ণর লর্ড রোণাল্ডশে।
THE EARL OF RONALDSHAY.

আশুতোষ প্রেস, ঢাকা।

RABINDRA BHARATI UNIVERSITY
LIBRARY

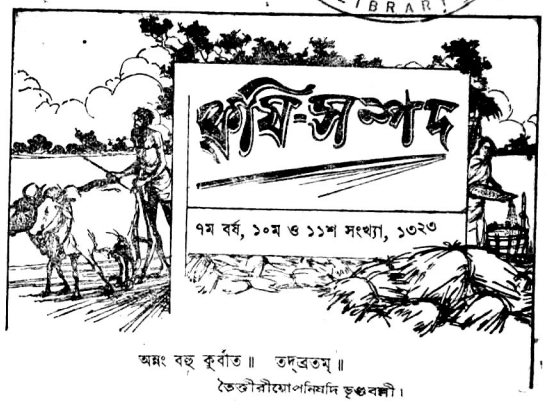

অন্নং বহু কুর্বীত ॥ তদ্‌ব্রতম্ ॥
তৈত্তীরীয়োপনিষদি ভৃগুবল্লী।

সূচী।

[লেখকদিগের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।]

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
কৃষি-প্রদর্শন	২৫৭
টাইফা	২৬২
—শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র গুহ এম্, আর্, এইচ্, এস্	
পোলাপের চাষ	২৬৩
—শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র গুহ এম্, আর্, এইচ্, এস্	
মার্কিণ-যুক্তরাজ্যের উচ্চবিদ্যালয়ে কৃষিশিক্ষা	২৭৩
—শ্রীযুক্ত মন্মথকুমার মিত্র এম্, এস্ (বার্কলী)	
বঙ্গের গোধন	২৯৫
মহুয়া	২৯৯
—শ্রীযুক্ত হলধর বাবু	
ফরি কি?	৩০২

চিত্র সূচী।

১। বঙ্গের বর্ত্তমান গবর্ণর লর্ড রোণাল্ডশে।

নূতন বঙ্গেশ্বর।

বঙ্গের নবীন শাসনকর্ত্তা লর্ড রোনাল্ডশে বাহাদুর ১৩ই চৈত্র (২৬শে মার্চ্চ) বঙ্গের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে, দেশের মেরুদণ্ডস্বরূপ ও সমাজ-শক্তি কৃষকের পক্ষে, আমরা তাঁহাকে আমাদের আন্তরিক ভক্তিশ্রদ্ধা-সম্বলিত সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিতেছি; এবং বিশ্ববিধাতার নিকট সকাতরে প্রার্থনা করিতেছি যে, তিনি বাঙ্গালার উচ্চ ও নিম্ন বিদ্যালয়-সমূহে কৃষি-শিক্ষার সুব্যবস্থা করিয়া, এ কৃষি-প্রাণ-দেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধন করুন।

কৃষি-প্রসঙ্গ।

প্রাচ্য ও তুলা—কথায় বলে,—ভাত-কাপড়; অর্থাৎ শুধু পেটের ভাত হইলেই চলে না, পরণের কাপড়ও চাই। এই ভাতের গোড়া ধান, আর কাপড়ের গোড়া তুলা। সমগ্র ভারতের চাষী-জমির শতকরা প্রায় ৩৫ ভাগে ধানের এবং কিঞ্চিদধিক ৬ ভাগে তুলার চাষ হয়। আসামের শতকরা ৮০, ব্রহ্মদেশের ৭৪ এবং বাঙ্গালার ৭০ ভাগেই ধানের চাষ হইয়া থাকে। সমগ্র পৃথিবীতে যত ধান্য জন্মে, তাহার প্রায় ৪৬ ভাগই ভারতবর্ষে উৎপন্ন হয়; এবং ভারতবর্ষ হইতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ ধান্য বিদেশে রপ্তানি হইয়া যায়। বঙ্গদেশের সর্ব্বশুদ্ধ ২৮টি জেলাতে প্রায় ৭ কোটি বিঘাতে ধানের চাষ হয়। কিন্তু এখন বাঙ্গালায় তুলার চাষ হয় না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ধান্যের আদি জন্মস্থান ভারতবর্ষ। স্মরণাতীত-প্রাচীন কাল হইতেই ভারতে ধান্যচাষ-প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে। ধান্য যে কেবল জন্মস্থানেই নিবদ্ধ রহিয়াছে, তাহা নহে; উহা ক্রমে ক্রমে পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। অধুনা, সমগ্র পৃথিবীতে ভারতবর্ষ, জাপান, মার্কিণ-যুক্তরাজ্য, ইতালী, স্পেন এবং মিসরেই অত্যধিক পরিমাণে ধান্যচাষ হয়। তদ্ভিন্ন, আরও অনেক দেশেই অল্পপরিমাণে ধানের চাষ হয় সত্য, কিন্তু সেই সকল দেশের নাম উল্লেখযোগ্য নহে। ভারতবর্ষ, জাপান প্রভৃতি দেশে কি পরিমাণ জমিতে ধান্যের চাষ হয়, তাহার মোটা-মোটি হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

দেশের নাম।	জমির পরিমাণ।
ভারতবর্ষ	৭৩৫০০০০ একর।
জাপান	৭৩১৩০০০ "
মার্কিন-যুক্তরাজ্য ...	৮২৭০০০ "
ইতালী	৩৮০০০০ "
মিসর	২৫৪০০১ "
স্পেন	৯৬০০০ "

ইউরোপের মধ্যে ইতালী দেশেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে ধান্য জন্মে। তৎপরই স্পেনের নাম উল্লেখ-যোগ্য। উপরে যে কএকটী দেশের নামোল্লেখ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে স্পেন-দেশেই ধান্যচাষের জমির পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা কম সত্য, কিন্তু ফলনের হিসাবে স্পেন-দেশই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

একদিন ভারত পৃথিবীকে কাপড় যোগাইত; কিন্তু এক্ষণ মাঞ্চেষ্টারের তাঁতিরাই ভারতবাসীর বস্ত্রের অভাব দূর করিতেছে। আমাদিগকে অন্নের জন্য না হইলেও, বস্ত্রের জন্য পরমুখাপেক্ষী হইতে হইয়াছে। ভারতে যে পরিমাণ তুলা জন্মে, তাহা যদি বিদেশে রপ্তানি হইয়া না যাইত, তাহা হইলে বোধ হয় আমাদিগের বস্ত্রের অভাব হইত না। ভারতের উৎপন্ন তুলার ৪৪ ভাগ মাত্র ভারতের কলকারখানায় এবং অন্যান্য প্রয়োজনে ব্যয়িত হয়; অবশিষ্ট ৫৬ ভাগই বিদেশে রপ্তানি হইয়া যায়। বিগত ১৯১৩—১৪ এবং ১৯১৫—১৬ খৃঃ অব্দে, ভারতবর্ষ হইতে যে পরিমাণ তুলা বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হইয়াছে, তাহার হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল। বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের ফলে রপ্তানির পরিমাণ যে অনেকটা কম হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র।

দেশের নাম।	১৯১৩—১৪	১৯১৫—১৬ সন।
ইউনাইটেড্ কিংডম	৩৮৪,৯১৪ হন্দর।	৮২৩,৫০২ হন্দর
জার্ম্মেনী ...	১,৬৬৮,০৭০ "	০
বেলজিয়াম ...	১,১৩৩,৮৮৩ "	০
ফ্রান্স ...	৫২৪,২৮৪ "	২০৩,৭০৭ "
স্পেন ...	১৬৬,৯৩৩ "	২৩৭,০১১ "
ইটালী ...	৮৪৮,৫৭৬ "	১,০৯৭,১৩৮ "
অষ্ট্রিয়া হাঙ্গেরী	৭৪৭,০৪১ "	০
চীন ...	১৯৪,২৮৮ "	৩০১,০৭৪ "
জাপান ...	৪,৮১৭,৫৬০ "	৫,৯১৩,৯৮১ "
অন্যান্য দেশ ...	১২১,৮৮৩ "	১৪৯,৮৪৩ "

এক হন্দর (Cwt) একমণ সাড়ে চৌদ্দসেরের সমান। অধুনা জাপানেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ তুলা ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানি হইয়া যায়।

পৃথিবীতে যত তুলা উৎপন্ন হইতেছে, পৃথিবীবাসীর প্রয়োজনের তুলনায়, তাহা প্রচুর নহে। তুলার উৎপন্নের পরিমাণ ক্রমশঃ যে পরিমাণ বাড়িতেছে, উহার ব্যবহার তদপেক্ষাও অধিক হইয়া পড়িতেছে। সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বস্ত্রাদির ব্যবহার-প্রথা অত্যধিকরূপেই বাড়িয়া যাইতেছে; কিন্তু উৎপন্নের পরিমাণ তত অধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় নাই। সুতরাং, সর্ব্বত্রই তুলার চাহিদা (Demand) রহিয়াছে। বিলাতে বহুদিন হইতেই এই তুলা-সমস্যা উঠিয়াছে। পৃথিবীর মধ্যে এক মার্কিণ ব্যতীত ভারতবর্ষেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে তুলা উৎপন্ন হয়। কিন্তু অনুকূল জলবায়ুর প্রভাবে ও ভূমির উর্ব্বরতার হিসাবে, বিঘা প্রতি যে পরিমাণ তুলা উৎপন্ন হওয়া উচিত, তাহা হয় না। তদ্ভিন্ন, তুলা উৎপাদনের উপযোগী যত ভূমি ভারতে পতিত রহিয়াছে, তাহার তুলনায় অল্প জমিতেই তুলার চাষ হয়। প্রথমটার কারণ দেশের কৃষককুলের অজ্ঞতা ও দারিদ্র; এবং দ্বিতীয়টার কারণ আমাদের দেশের ধনী ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কৃষিকার্য্যে অবহেলা। আমাদের সদাশয় গভর্ণমেণ্ট, এ দেশের তুলার উৎকর্ষ সাধনোদ্দেশ্যে, আমেরিকান কার্পাসবীজ সরবরাহ করিয়া কৃষককুলের প্রভূত উপকার করিয়াছেন সত্য, কিন্তু এ বিষয়ে দেশের ধনী ও শিক্ষিত সম্প্রদায়েরও যথেষ্ট কর্ত্তব্য রহিয়াছে।

বোম্বে, মান্দ্রাজ, পঞ্জাব, সংযুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ এবং বেরার তুলা উৎপাদনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী স্থান; এবং সেই সকল স্থানেই অধিক পরিমাণে তুলার চাষ হয়। তদ্ভিন্ন, আরও নানাস্থানে তুলার চাষ হয় সত্য, কিন্তু তন্মধ্যে, একমাত্র আসাম ব্যতীত, অন্য কোনও স্থানের নাম উল্লেখযোগ্য নহে। ভারতের সকল প্রদেশেই তুলার চাষে জমির পরিমাণ বাড়িয়াছে সত্য, কিন্তু জগতের তুলা-সমস্যা দূর করিতে হইলে, যেরূপ হারে বর্দ্ধিত হওয়া আবশ্যক, তাহা হয় নাই। "তুলা-সমস্যা হইতে পৃথিবীকে রক্ষা করিতে একমাত্র ভারতবর্ষই পারে"—ইহাই হইল বিশেষজ্ঞদিগের অভিমত। কথাটা খাঁটী সত্য; সুতরাং ভারতে তুলার গাছে জমির পরিমাণ অত্যধিকরূপেই বাড়ান আবশ্যক; এবং বাড়াইতেও হইবে। গবর্ণমেণ্ট ভারতে অধিকতর পরিমাণে তুলা উৎপাদনকল্পে বহুদিন হইতেই চেষ্টা করিতেছেন; এ দেশবাসীদিগকে আরও বিশেষভাবেই চেষ্টা করিতে হইবে।

আমেরিকা-যুক্তরাজ্য বর্ত্তমানকালে অর্থসম্পদে জগতে অদ্বিতীয় হইলেও, কৃষিকর্ম্মকে খাট করিয়া শিল্প-বাণিজ্যকে প্রাধান্য দেয় নাই। আমেরিকাবাসীরা যে কাপড়ের কল চালাইতে পারে না, তাহা নহে। কিন্তু উৎপাদনের আপেক্ষিক মূল্য (Comparative cost of production) পোষাইতে পারে না বলিয়াই, কাপড় বোনে না, তুলা উৎপাদন করে; এবং সেই তুলা লাঙ্কাশায়ারের তাঁতিদিগকে বিক্রয় করিয়া দেশে প্রভূত ধনাগম করে। মার্কিণের অনুকরণে, ভারতবাসীদিগকেও প্রচুর পরিমাণে তুলা উৎপাদন করিতে, এবং উৎপন্ন তুলা বিদেশে রপ্তানি করিয়া দেশের ধনসম্পদ বৃদ্ধি করিতে হইবে।

এখন কথা এই যে, ভারতে বিস্তৃতভাবে তুলার চাষ করিবে কে? জগতে তুলার চাহিদা যথেষ্ট রহিয়াছে; এমতাবস্থায় আমরা যদি অভাব পূরণের বিশেষ চেষ্টা করিতে না পারি, তাহা হইলে চা, কফি, নীল, রবার প্রভৃতি বিশেষ আয়কর উদ্ভিদ-চাষের ন্যায়, তুলার চাষও যে আমাদের হাত ছাড়া হইয়া পড়িবে না, তাহা কে বলিতে পারে? ভারতে তুলার চাষোপযোগী এত অধিক পরিমাণ জমি পতিত রহিয়াছে যে, একচাপে দশহাজার একর (এক একর=কিঞ্চিদধিক তিন বিঘা) জমি সুদুর্লভ নহে। সুতরাং, সাহেবদিগকে জমির জন্য ভাবিতে হইবে না। তাঁহাদের দেশের লোক চাষের কাজে টাকা দিতে কখনও অসম্মত হয় না; ফলে, তাঁহাদের টাকার অভাবও হইবে না—হইতেও পারে না। আর কুলি—সেত ভারত শুদ্ধই। এখন যাহারা তুলার চাষ করিতেছে, তাহারা যে বাঙ্গালার নীলচাষের ন্যায় পরে সাহেবদেরে জমি ছাড়িয়া দিয়া, তাঁহাদের কুলি হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে?

ভারতের অন্ন-সমস্যা ও অর্থসমস্যা দূর করিতে হইলে, প্রথমতঃ যৌথমূলধনেই দেশের ধনী ও শিক্ষিত সম্প্রদায়কে বিস্তৃতভাবে কৃষিকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে—কয়াও

অবশ্যকর্তব্য। শিক্ষিতব্যক্তিরা চাষ-বাসে প্রবৃত্ত হইলে, শুধু যে দেশের ধন-সম্পদই বাড়িবে, তাহা নহে। তাঁহাদের উন্নতপ্রণালীর চাষ-বাস সন্দর্শন করিয়া, কৃষককুলও বিশেষ উপকৃত হইতে পারিবে। সর্ব্বাগ্রে গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় করিয়া লইতে না পারিলে, কোনও কার্য্যে সাফল্য-লাভ সম্ভবপর নহে। সকলের আগে ভাত-কাপড়; ভাত-কাপড়ের যোগার হইলে পর ব্যবসায়-বাণিজ্য আপনা হইতেই আসিবে। এই ভাত-কাপড় কৃষির উপর নির্ভর করে। সুতরাং, কৃষি ভিন্ন আমাদের গত্যন্তর নাই।

শোভাঞ্জন—চলিত নাম সজিনা। ইহা ভারতের নানাস্থানে ও ব্রহ্মদেশেও জন্মিয়া থাকে। শ্যাম, শ্বেত ও রক্ত বর্ণভেদে সজিনা তিন প্রকার। সজিনার বীজকে শ্বেতমরিচ বলে। দেশভেদে ইহার নামভেদ এইরূপ:—হিন্দুস্থানে—সোহিঞ্জন ও সজন, মহারাষ্ট্রে—কালা সেগুবা ও সোবুগা বলিয়া থাকে; কর্ণাটে—করিয়হুগ্গি; তৈলঙ্গে—মুনুজা, তামিলে—মোরুঙ্গ, এবং বোম্বায়ে—শেগব ও সেগত বলে। ইহার ইংরাজী নাম—"দি হর্স র‍্যাডিশ্ ট্রি" এবং ডাক্তারী বা ল্যাটিন নাম "মোরিঙ্গা টেরিগোস্ পারমা।"

পরিচয়—সজিনার পরিচয় বোধ হয় বিশেষ করিয়া কিছু লিখিতে হইবে না। ইহা যেখানে সেখানে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কৃষিকর্ম্মে কাহাকেও যত্ন করিতে হয় না। একটা ডাল্ পুঁতিয়া দিলেও সজিনা-বৃক্ষ বেশ জন্মিয়া থাকে। ইহার ফল, ফুল ও পত্র আহারীয় দ্রব্যের মধ্যে গণনীয়। কলিকাতার বাজারে সজিনার ফুল ও পত্র বিক্রয় হয়, এবং ইহার ফল বা ডাঁটা দুই আনা কুড়ি দরেও বিক্রীত হইয়া থাকে।

ভৈষজ্য-গুণ:—

"শিগ্রুঃ কটুঃ কটুপাকে তীক্ষ্ণোষ্ণো মধুরো লঘুঃ।
দীপনো রেচনো রুক্ষঃ ক্ষারস্তিক্তো বিদাহকৃৎ॥
সংগ্রাহী শুক্রলোহৃদ্যঃ পিত্তরক্ত প্রকোপণঃ।
চক্ষুষ্য কফবাতঘ্নো বিদ্রধিশ্বযথুক্রিমীন্॥"

অর্থাৎ সজিনা-কটুও মধুর তিক্তরস, কটুবিপাক, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, অগ্নির দীপক, রুচিকারক, রুক্ষ, ক্ষারযুক্ত, বিদাহি, ধারক, শুক্রবর্দ্ধক, হৃদয়গ্রাহী, রক্তপিত্ত প্রকোপক ও চক্ষুর হিতকারক। শ্বেতসজিনাও এই সকল গুণবিশিষ্ট; তবে ইহা দাহজনক এবং প্লীহা, বিদ্রধি, ব্রণ, পিত্ত ও রক্তদোষনাশক। রক্ত-সজিনাও ঐ সকল গুণবিশিষ্ট; বিশেষতঃ, ইহা অগ্নিপ্রদীপক এবং সারক। সজিনা-পুষ্প কটুরস, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, স্নায়ু-শোথকারক; এবং ইহা ক্রিমি, কফ, বায়ু, প্লীহা ও গুল্ম নিবারক। রক্ত-সজিনা-পুষ্প চক্ষুর হিতকর এবং রক্ত-পিত্তের প্রসাদক। সজিনার ডাঁটা, কধুরও কষায়-রসযুক্ত, অগ্নিদীপক এবং পিত্ত, শূল, কুষ্ঠ, ক্ষয়, শ্বাস ও গুল্ম নিবারক। সজিনার ছাল বেদনা প্রশমনের পক্ষে শ্রেষ্ঠ; কিন্তু মূলের ছাল বিষাক্ত বলিয়া, বিষাক্ত প্রাণীর দংশন-জ্বালা ও স্ফীত প্রশমনার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই সকল ভেষজ-গুণের জন্য সজিনার গৌরব নিতান্ত অল্প নহে। আহারীয় দ্রব্য ও ঔষধিরূপে সজিনার কথা লিখিত হইল; এক্ষণে ইহা শিল্প-ব্যবহারের পক্ষে কিরূপ উপযোগী, তাহা দেখুন।

গঁদ বা আঠা:—সজিনাগাছের ক্ষত হইতে যথেষ্ট পরিমাণে গঁদ বা আঠা বাহির হয়। ইহা প্রথমে শ্বেত ও পরে রক্তবর্ণ ধারণ করে। অবশ্য বিলাতী বাজারে এ গঁদের তেমন আদর নাই; কারণ ইহা নিকৃষ্ট। কিন্তু এদেশের বাজারে ঔষধরূপে এই গঁদ বিক্রীত হইয়া থাকে। ইহা শিরঃপীড়া ও দৈহিক বেদনা প্রশমনার্থে প্রয়োগ করা হয়। আঠা তৈয়ার করিবার জন্য বাঙ্গালার গঁদের সহিত ইহা মিশ্রিত করিলেও চলিতে পারে। ব্যবসায়ীরা অন্যান্য গঁদের সহিত ইহা চূর্ণরূপে মিশ্রিত করিয়া থাকেন। এই গঁদ উত্তর-পশ্চিম-অঞ্চলে রঙ্গরেজ বা কাপড় ছোবাই ও রঞ্জনকারিগণের নিকট বিক্রীত হইয়া থাকে। খেরো (খাউয়া), হিন্দুস্থানী রমণীদের ব্যবহার্য্য সাড়ী ও লেপের খোলের কাপড় প্রভৃতি রং করিবার সময়, এই গঁদ রঙ্গের সহিত মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হয়। ইহা উক্ত স্থানে "মোচারস" নামে বিক্রীত হইয়া থাকে।

চর্ম্ম-শোধন:—খৃষ্ট সাহেব তদীয় "নিউ কমা-শিয়াল্ প্ল্যাণ্টস্" নামক গ্রন্থে শোভাঞ্জনকে চর্ম্মশোধন

ও পরিষ্করণের উপাদান মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। কিন্তু সজিনা-ছালের কষ চর্ম্ম-শোধনকল্পে কুত্রাপি ব্যবহৃত হয় কিনা, তাহার আর বিশেষ পরিচয় অন্য কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না।

আঁশ:—সজিনার বল্কল হইতে এক প্রকার মোটা ও অপরিষ্কার আঁশ বাহির করিতে পারা যায়। শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় তদীয় "হ্যাণ্ডবুক অব ইণ্ডিয়ান্ প্রডাক্টস্" গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, এই আঁশ হইতে দড়ির-মাদুর, মোটা দড়ি হইয়া থাকে; এবং এই আঁশ ঘেটে কাগজ তৈয়ার করিবারও একটি উপকরণমধ্যে গণনীয়।

তৈল:—খাঁটি সজিনার তৈল এদেশে বিশেষভাবে প্রচলিত নাই। সজিনার বীজ ঘানিতে প্রচলিত-প্রথায় পেষণ করিলে যে তৈল পাওয়া যায়, তাহা প্রায় বর্ণহীন, স্বচ্ছ ও একটু গাঢ়। ইহা এদেশে কচিৎ ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, এই তৈল বাতের পক্ষে উপকারী। সে যাহা হউক, সজিনা-তৈল দ্বারা যে একটি উত্তম ব্যবসায় চলিতে পারে, তাহা কর্ণাল ওয়াট সাহেব বলিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন যে, ভারতে এই তৈল কেহ করে না, এবং ইহা বিদেশে রপ্তানীও হয় না। যখন এদেশে প্রচুর পরিমাণে সজিনাগাছ পাওয়া যায়, তখন কেন যে এই শিল্পের প্রতি লোকের মন আকৃষ্ট হয় না, ইহাই আশ্চর্য্য। এই তৈল বৈদেশিক "মরিঙ্গা অয়েল" বা "বেন অয়েল" নামক তৈলের অনুরূপ। যদি ভারতবর্ষে এই তৈলের কারবার স্থাপিত হয়, তাহা হইলে ভারতীয় সজিনা-তৈল বৈদেশিক বাজারে যথেষ্ট পরিমাণে বিক্রীত হইবে। এমন কি, সমগ্র জগতে এই তৈল সরবরাহ করিবার উপযোগী উপাদান ভারতে রহিয়াছে। বিশেষতঃ, ভারতীয় তৈলে "অয়লিন্" "মারগারিন্" ও "ষ্টিরিন্" নামক পদার্থত্রয় প্রচুর পরিমাণে থাকায়, ইহার আদর বাড়িবে। অগ্নিতাপে এই তৈলের গাঢ়ত্ব প্রশমন করিয়া তরল করিয়া লইলে, ইহা ঘড়ি মেরামতকারিদিগের কর্ম্মের উপযোগী হয়। এই তৈলে ঘড়ির মত স্প্রীং সহজে অয়েল করা যাইতে পারিবে। আবার সুগন্ধ-ব্যবসায়ী-দিগের নিকট এই তৈলের আদরও বড় অল্প নহে। কারণ, এই তৈল অতি সূক্ষ্ম সৌরভ সহজে ও অল্পকালমধ্যে আকর্ষণ ও সংগ্রহ করিয়া বহুদিন অবধি ধারণ করিয়া রাখিতে পারে। (আনন্দ-বাজার)

চুণ-সার—চুণসারসম্বন্ধে সরকারী কৃষি-বিবরণীতে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার স্থূলমর্ম্ম এইরূপ:—দেশের জল-বায়ুর গুণে, অধিকাংশ জমিতেই চূণের ভাগ খুব কম এবং সাধারণতঃ এসিডের ভাগই অধিক রহে। কিন্তু অতিরিক্ত এসিড-যুক্ত জমিতে কোনও শস্যই ভাল জন্মে না। এই জন্যই তদ্রূপ জমিতে চূণ ব্যবহার করা অত্যাবশ্যক। সাররূপে চূণ ব্যবহার করিতে না পারিলে, এসিডের তেজ কমান যায় না। ঢাকা ও যোড়হাট সরকারী কৃষিপরীক্ষা-ক্ষেত্রের মৃত্তিকা সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের সত্য, কিন্তু উহাদের রাসায়নিক সামঞ্জস্য রহিয়াছে। যোড়হাট-কৃষিক্ষেত্রের মৃত্তিকা বালুকাময়; পক্ষান্তরে, ঢাকার সরকারী কৃষি-পরীক্ষা-ক্ষেত্রের মৃত্তিকা অতিশয় আঁঠাল। এই উভয়স্থলেই চূণ প্রয়োগ করিয়া খুব ভাল ফসল পাওয়া গিয়াছে। ইহাতেই প্রমাণীকৃত হয় যে, অনেকসময় মৃত্তিকার বর্ণগত পার্থক্য রহিলেও, উহাতে যদি এসিডের ভাগ অধিক এবং চূণের ভাগ কম রহে, তাহা হইলে তথায় চূণ প্রয়োগ করিতে হইবে। যদিও চূণ রবি-শস্যের পক্ষেই বিশেষ উপকারী সত্য, কিন্তু তথাপি, খরিপ-শস্যের পক্ষেও ইহা অনুপযোগী নহে। এসিড্-যুক্ত মৃত্তিকায় যথেষ্ট গোবর দিয়াও, তাহাতে চূণ না দিলে কোনও ফল পাওয়া যায় না। যোড়হাট-কৃষিক্ষেত্রের এসিড্-যুক্ত জমিতে চূণ প্রয়োগ না করিয়া, উহাতে পাঁচ প্রকার রবি-শস্যের চাষ-পরীক্ষা করা হইয়াছিল। কিন্তু সামান্য পরিমাণ কালাই (মাষ) ব্যতীত অন্য কোনও শস্য জন্মে নাই। এই জন্যই এসিড্-যুক্ত জমিতে চূণসার ব্যবহারের বিশেষ উপকারিতা ও আবশ্যকতা রহিয়াছে। প্রতি বিঘায় ১০৲ মণ চূণ মৃত্তিকার উপরিভাগে ভালরূপে ছিটাইয়া দিলেই চলে। তদপেক্ষা অধিক পরিমাণ চূণ দেওয়া অনুচিত। মৃত্তিকায় একবার চূণ ব্যবহার করিলে, তাহার ক্রিয়া দশবৎসর পর্য্যন্ত বর্ত্তমান রহে। ঢাকা-কৃষিক্ষেত্রের লাল মৃত্তিকায় অনুরূপ মৃত্তিকার পক্ষে চূণ ও

হাড়েরগুঁড়ার সারই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপযোগী। ধানের পক্ষে এই উভয়প্রকার সারই বিশেষ ফলপ্রদ। তদ্ভিন্ন, চূণ ব্যবহার করিতে পারিলে পাটের ফলনও বৃদ্ধি পায়। মৃত্তিকায় চূণ ব্যবহার করিবার পর, উহাতে কোনও ফস্ফেটিক-সার দিলে আরও বেশী ফল পাওয়া যায়।

ঢাকা ও অন্যান্য স্থানের সরকারী কৃষিপরীক্ষা-ক্ষেত্রে বারম্বার পরীক্ষা করিয়া জানা গিয়াছে,—চূণ ও হাড়ের-গুঁড়ার সহিত গোবর অথবা অন্য কোনও প্রকার নাইট্রোজেন-যুক্ত সার ব্যবহার করিলে পাটের ফলন অধিক হইয়া থাকে। ঢাকা-কৃষি-ক্ষেত্রে গত তিনবৎসর ঐ সকল সার ব্যবহার করিয়া বিঘাপ্রতি গড়ে প্রতিবৎসর ৪।৫ সের পাট এবং ৩।৭ সের সরিষা বেশী পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং, উৎপন্ন অতিরিক্ত শস্যাদির মূল্য হইতে সারের মূল্য বাদ দিলেও অনেক (?) লাভ হইয়া থাকে।

গাছের বয়স—নারিকেল, সুপারী, তাল, খর্জ্জুর প্রভৃতি তালজাতীয় বৃক্ষগুলি দীর্ঘজীবী হইয়া থাকে। ব্রেজিলের নারিকেলগাছ ৬।৭ শত বৎসর এবং খেজুরগাছ ২।৩ শত বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত রহে। অনেকে বলেন, জেরুসালেমের অলিভ-পর্ব্বতস্থিত জলপাইগাছগুলি ১০৯৯ খৃঃ অব্দ হইতেই তথায় বর্ত্তমান রহিয়াছে।

টাইফা।

(Typha-Reed-mace.)

N. O. GRAMINÆ.

[শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র গুহ এফ্, আর, এইচ্, এস্ লিখিত]

মনুষ্য ও মনুষ্যেতর প্রাণীর ব্যবহার্য্য সকল পদার্থ-ই জগন্নিয়ন্তা পৃথিবীর সর্ব্বত্র সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। ইহাদের সর্ব্ববিধ প্রয়োজন সাধনোপযোগী দ্রব্য তিনি সর্ব্বত্রই প্রস্তুত রাখিয়াছেন। এক দ্রব্যের অভাব হইলে, উহার প্রতিনিধি অন্য দ্রব্যও তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন। একদেশে ইহার কোনটী দুর্ল্লভ হইলেও, অন্যত্র উহা সুলভ। ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ বঙ্গদেশে পাট উৎপন্ন হয়। পৃথিবীর অন্যত্র বহু চেষ্টা ও বহু অর্থব্যয়েও ইহার চাষে সফলতা লাভ হয় নাই। স্বর্ণভূমি ভারতবর্ষের বঙ্গদেশে আমাদের আবশ্যকীয় প্রায় সর্ব্ববিধ উদ্ভিদের অস্তিত্বই পরিলক্ষিত হয়। পৃথিবীর সকল দেশের ও বিভিন্ন জলবায়ুর উপযোগী উদ্ভিদসমূহের চাষোপযোগী ভূমি ভারতবর্ষের নানা স্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই জন্যই ভারতকে পৃথিবীর সকল দেশের লোকে 'সমস্ত পৃথিবীর সংক্ষিপ্ত-সার' নামে অভিহিত করিয়া থাকে। ভারতে যাহা নাই, পৃথিবীতে তাহা নাই।

সম্প্রতি ইউরোপে যে ঘোর সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে, ঐ যুদ্ধে আগ্নেয়াস্ত্রাদিতে ব্যবহারের জন্য প্রচুর পরিমাণে পাট, তুলা ও পশমের প্রয়োজন। জর্ম্মাণী পূর্ব্বে এই কার্য্য ও অন্যান্য নানা কার্য্যের জন্য ভারতবর্ষ হইতে প্রতিবৎসর প্রচুর পরিমাণ ঐ সকল দ্রব্য আমদানী করিত। কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধবিগ্রহহেতু জার্ম্মাণীর সে সুবিধা আর এক্ষণ নাই। সুতরাং, বাধ্য হইয়াই, তাহাদিগকে অন্য দ্রব্য দ্বারা উক্ত অভিপ্রায় সাধন করিতে হইতেছে।

"চিকাগো ডেইলী নিউজ" নামক সংবাদপত্র বলেন,—জার্ম্মাণী পাট, তুলা প্রভৃতি দ্রব্যের প্রতিনিধিস্বরূপে 'টাইফা' (Typha) নামক উদ্ভিদের মূল ব্যবহার করিতেছে। ইহার মূলই উক্ত ত্রিবিধ দ্রব্যের কার্য্য সাধন করিতেছে। ইউরোপীয় এবং এ দেশীয় প্রায় অধিকাংশ সংবাদপত্রে এই বিষয়টী প্রকাশিত হইয়াছে। সামান্য উদ্ভিদের মূল হইতে উক্ত ত্রিবিধ অভিপ্রায় সিদ্ধ হইতে পারে জানিয়া, অনেকে উহার বৃত্তান্ত অবগত হইতে উৎসুক হইয়াছেন। সুতরাং, তাঁহাদের এই ঔৎসুক্য নিবারণের জন্য, আমি এই প্রবন্ধে, উক্ত উদ্ভিদের বিস্তৃতবিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেছি।

"চিকাগো ডেইলি নিউজ" বলেন, জার্ম্মাণীতে এই উদ্ভিদ সুলভ। কিন্তু ভারতবর্ষের নানাস্থানেও যে ইহা অতি সুলভ, তাহা সম্ভবতঃ কেহই অবগত নহেন। ইহা এ দেশে হোগলাঘাস নামে পরিচিত। অনেকেই হোগলার টাট্টি ও হোগলার চাটাই (mat) দেখিয়া থাকিবেন। এই হোগলা-

গাছই ইউরোপে টাইফা (Typha) নামে পরিচিত। এই সামান্য উদ্ভিদ যে মনুষ্যের কত প্রয়োজনসাধন করে, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব। ইহার ব্যবহারসম্বন্ধীয় তত্ত্ব লিপিবদ্ধ করিবার পূর্ব্বে, আমি পাঠকগণকে এই উদ্ভিদের পরিচয় জ্ঞাত করাইতেছি।

টাইফা সাধারণ জলজঘাসবিশেষ। ইহার বাঙ্গালা নাম হোগলাঘাস। ইহার প্রাদেশিক নাম—পেটার, বোরা, ডিব, পান, রামাবেনা; এবং বৈজ্ঞানিক নাম—টাইফা। ইউরোপ ও আমেরিকার নানাস্থানে ইহা নানা নামে পরিচিত। সাধারণ নাম 'বুল রাস' (Bull rush)। সাধারণতঃ, ইহার চারিটী জাতিই দৃষ্টিগোচর হয়। ইহাদের নাম (১) টাইফা অগাষ্টটা বা অগাষ্টি ফলিয়া (Typha Augustifolia), (২) টাইফা এলিফেন্টিনা (Typha Elephantina), (৩) টাইফা লেক্সমেনি (Typha Laxmannie) এবং (৪) টাইফা মাইনর (Typha Minor)। এই চতুর্ব্বিধ জাতিই মনুষ্য-জাতির নানা অভিপ্রায় সাধন করিয়া থাকে। আমি পৃথকরূপে এই চতুর্ব্বিধ জাতিরই পরিচয় দিতেছি।

১। টাইফা অগষ্টা (Typha Augusta)—ইহাকে মজ্জা-ঘাস (Pith grass) কহে। ইহার পাতা অর্দ্ধ-গোলাকৃতি, ও পাতার অগ্রভাগ সূক্ষ্ম; মূলোদ্ভূত পুষ্পদণ্ড দেখিতে সুন্দর; স্ত্রী ও পুং পুষ্প দূরে দূরে অবস্থিত রহে; এবং শীষের অগ্রভাগে ফুল হয়। ইহা টাইফা এলিফেন্টিনা জাতি অপেক্ষা ক্ষুদ্র, এবং পূর্ব্ববঙ্গের বিল ও জলা ভূমিতে দৃষ্টিগোচর হয়। শ্রীহট্ট ও ময়মনসিংহ জেলাতে ইহা সর্ব্বত্র সুলভ। ইহার চাষ করিতে হয় না। জলাভূমিতে ইহা স্বভাবতঃই জন্মে। দ্বিতীয় জাতির সহিত ইহার প্রায় সর্ব্বতোভাবে সাদৃশ্য রহিয়াছে। ইহার গাছ উক্ত জাতি অপেক্ষা আকারে ও উচ্চতায় ক্ষুদ্র। বীজ ও মূল-বিভাগ দ্বারা ইহার গাছ উৎপন্ন হয়। ইহাকে 'উত্তর ভারতের লক্ষ্মী' (Luck of north India) কহে। ইহা অতিশয় লাভজনক উদ্ভিদ বলিয়াই, এই নামকরণ হইয়াছে।

২। টাইফা এলিফেন্টিনা (Typha Elephantina)—ইহাকে বঙ্গদেশে হোগলা বা হাতীঘাস (Elephant grass) বা বিড়াল লেজ (Cat's tail) ও বুল রাস (Bull rush) কহে। ইহা দেখিতে প্রায় খাগড়ঘাস (Reed grass) জাতির ন্যায়। ইহার ফুল পিঙ্গলী বর্ণের হয়; এবং শীষের অগ্রভাগে ফুল জন্মে। ইহার কাণ্ড সরল, গোলাকার, মসৃণ, চকচকে এবং পত্রকক্ষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ও উহার সহিত সংযুক্ত। ইহার কাণ্ডাভ্যন্তর স্পঞ্জ (Sponge) সদৃশ জল-শোষক কোমলপদার্থাবৃত রহে। ইহার কাণ্ড বা পুষ্পদণ্ড ১০।১২ ফুট উচ্চ হয়। ইহার উপরিভাগেই পত্রগুচ্ছ অবস্থিত থাকে। ইহার পাতা লম্বা ও বিস্তৃত তরবারীর আকারবিশিষ্ট (ensi-formed); পাতার ভিতর খাঁজ কাটা; পাতা ৪।৫ ফুট দীর্ঘ; এবং কাণ্ডের নিম্নভাগ একটী পরদা দ্বারা আবৃত। ইহা বিল, ঝিল ও স্রোতহীন খাল প্রভৃতিতে স্বভাবতঃই জন্মে। বর্ষা ও শীত কালে ইহার ফুল হয়। হাতী ইহা খাইতে ভালবাসে বলিয়া, ইহাকে হাতীঘাস কহে। বীজ ও মূল-বিভাগ দ্বারা গাছ উৎপন্ন হয়। সকল প্রকার জলাভূমিতেই ইহা জন্মে। বঙ্গের সর্ব্বত্র, বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গের ময়মনসিংহ ও ঢাকা জেলায়, ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। শ্রীহট্ট জেলায়ও ইহা সর্ব্বত্র সুলভ। ইহা পশ্চিমবঙ্গেরও সর্ব্বত্র দৃষ্টিগোচর হয়।

৩। টাইফা লেক্সমেনি (Typha Laxmanie—The pitz of Kashmir)—ইহাকে কাশ্মীর পিটজ্ কহে। পঞ্জাবের ও কাশ্মীরের জলাভূমিসমূহে ইহার অধিবাস। ইহা সর্ব্বাংশে প্রায় পূর্ব্বোক্ত জাতির ন্যায়। কিন্তু উহাপেক্ষা ক্ষুদ্রতর হয়। বীজ ও মূল-বিভাগ দ্বারা ইহার গাছ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহারও চাষ হয় না; জলাভূমিতে ইহা স্বভাবতঃই জন্মিয়া থাকে।

৪। টাইফা মাইনর (Typha minor)—বঙ্গদেশে ইহা কাস-হোগলা নামে পরিচিত। ইহা প্রায় সর্ব্বাংশে পূর্ব্বোক্ত কএকজাতির ন্যায়। কিন্তু উহাদের অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর। ইহা সর্ব্বত্র সুলভ নহে। মূলবিভাগ ও বীজ দ্বারা ইহারও গাছ উৎপন্ন হয়। উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশের কোন কোন স্থানের জলাভূমিতে ইহা দৃষ্টিগোচর হয়।

ইহারা আরণ্য জলজ-তৃণবিশেষ। সেই জন্য কুত্রাপি ইহাদের চাষ হয় না। পচা পলি, কর্দ্দম ও দো-আঁশ-মৃত্তিকা ইহাদের চাষপক্ষে উপযোগী। যে সকল জলাশয়ের মৃত্তিকাতে

উদ্ভিদাদি পদার্থ পচিয়া উহাকে উদ্ভিজ্জসার-প্রধান-মৃত্তিকায় পরিণত করিয়াছে, উহাতেই ইহাদের চাষ হয়।

ইহাদের পুষ্পদণ্ড দ্বারা ডালা, কুলা, বাক্স ও পেটারা প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহাদের পুষ্পদণ্ড ও পত্র দ্বারা চালনীও প্রস্তুত হয়। ইহা দ্বারা ঘরের ছাউনীর কার্য্যও চলে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুল্‌-তরী প্রস্তুত-কার্য্যে ইহা ব্যবহৃত হয়। ইহা দ্বারা মাদুর, রজ্জু ও ঝাঁকা প্রস্তুত হয়। সিন্ধুদেশে ইহার দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকা প্রস্তুত হইয়া থাকে। ভেলা, ভ্রোণী, জলে ভাসিবার ফ্লোট (float to swim) ও জালের কাঠী ইত্যাদিও ইহা দ্বারা প্রস্তুত হয়। ইহাদের মূল অতিশয় দীর্ঘ। ইহা বালি ও আল্‌গা মৃত্তিকার আঁশকে জোড়া লাগায়; এবং ঐরূপ মৃত্তিকার কর্ষণকে পরস্পরের সহিত দৃঢ়রূপে সংবদ্ধ করিয়া, উহার উৎকর্ষসাধন করিয়া থাকে।

টাইফার পুষ্পপরাগ উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য-মধ্যে পরিগণিত। সিন্ধুবাসীরা উহা খাইয়া থাকে। উহা সংগ্রহ করিয়া পিষ্টকাকারে খাওয়া যায়। টাইফার পুষ্প-পরাগ অতিশয় পুষ্টিকর খাদ্য। ইহাতে ৪৪·৫০ ভাগ কার্ব্বো-হাইড্রেট্ (Carbo-hydrate), ১৯·৭৫ ভাগ এলবুমিনইড্ (Albominoid—ডিম্বাভাস্তরস্থ শ্বেত-দ্রব্যবিশেষ), ১৭·৮০ ভাগ সেলিউলোজ (Cellulose—ছিদ্রপূরক পদার্থ), ৭·৭০ ভাগ তৈলাক্তপদার্থ এবং ভস্ম ও জলের ভাগ আছে। ইহাদের কোমলাঙ্কুর এবং মূলও খাওয়া যায়। ইহার কোমল কাণ্ড-মূল দ্বারা তৈলসংযোগে মশাল প্রস্তুত হয়। ইহার পক্কফলের পশমবৎ পদার্থ মশলাবিশেষসংযোগে রন্ধন-কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। টাইফার বিশুষ্কিকৃতকাণ্ড চিড়িয়া ও উহা শুষ্ক করিয়া, তদ্দ্বারা মোটা মাদুর প্রস্তুত হয়। উহা দ্বারা নৌকার তলা ও উহার অন্যান্য অংশ আবৃত করা যায়। টাইফার কাণ্ড দ্বারা ঘরের চাটাই প্রস্তুত হয়। ইহার পাতা দ্বারাও মাদুর প্রস্তুত হয়। অতি প্রাচীনকাল হইতেই, ইহা পূর্ব্বোক্তরূপে পঞ্জাবে, সিন্ধুদেশে, কাশ্মীরে ও উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশে ব্যবহৃত হইতেছে। আইন-ই-আকবরীতেও ইহার উল্লেখ রহিয়াছে।

টাইফার মূল ও কাণ্ড হইতে একরূপ অতিশয় সূক্ষ্ম ও চক্‌চকে তন্তু বা সূত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়। উহা পাটের আঁশ সদৃশ ও রেসমের ন্যায় চক্‌চকে। ইহা দ্বারা পশমের, পাটের ও তুলার কার্য্য সাধিত হয়। বস্ত্রবয়নকার্য্যেও এই তন্তুর ব্যবহার হইতে পারে। ইহা দ্বারা মোটা চট ইত্যাদিও প্রস্তুত হয়। আমেরিকাদিতে পূর্ব্বে তূলা, পশম ও পাট ব্যবহৃত হইত। অধুনা, বর্ত্তমান সমরোপলক্ষে, জার্ম্মানী উক্ত তিন দ্রব্যের পরিবর্ত্তে টাইফার কাণ্ড ও মূলজাত তন্তুই ব্যবহার করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে জার্ম্মানীতে ন্যূনাধিক ১॥০ দেড় কোটী টাকার টাইফা-তন্তু উৎপন্ন হইয়াছে। ২॥০ মণ টাইফা হইতে দশ হইতে সাড়ে বার সের তন্তু প্রাপ্ত হওয়া যায়। বর্ত্তমান সমর-উপলক্ষেই ইহার উপরোক্ত গুণসমূহ প্রকাশিত হইয়াছে। জার্ম্মানীই ইহার আবিষ্কর্ত্তা। কালে ইহা দ্বারা খাদ্যদ্রব্যের অভাব পূরণ করাও জার্ম্মানীর পক্ষে অসম্ভব নহে। জার্ম্মানরাজ্যে বহুলপরিমাণ জলাভূমি আছে। উহাতে প্রচুর পরিমাণ টাইফা স্বভাবতঃই উৎপন্ন হইয়া থাকে। টাইফা-তন্তু দ্বারা বস্ত্রবয়নকার্য্য এখনও আরম্ভ হয় নাই। কেহ কেহ বলেন, ইহার তন্তু মোটা কাপড় প্রস্তুতের পক্ষে উপযোগী।

এই নগণ্য তৃণের ব্যবহার এ দেশের অতি অল্প লোকেই জানে। সুতরাং, টাইফাজাত-তন্তু সংগ্রহের চেষ্টা এ পর্য্যন্তও কেহ করে নাই। এবংসর জার্ম্মানীতে যেভাবে টাইফা ব্যবহৃত হইতেছে, তাহাতে এ দেশের পাটের আদর ক্রমে কমিয়া যাইবে বলিয়াই মনে হয়।

টাইফার কাণ্ড দ্বারা কাগজ প্রস্তুতেরও চেষ্টা হইতেছে। এই চেষ্টা ফলবতী হইলে, কালে ইউরোপের কেন, এ দেশেরও মণ্ডী উপকার সাধিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এ দরিদ্র-দেশবাসী টাইফার ব্যবহার-প্রণালী শিক্ষা করিলে আংশিকরূপেও অর্থাভাব দূর করিতে পারে।

টাইফা-গাছ দেখিতে বড়ই সুন্দর। জলোদ্যান ও বিলোদ্যান সুশোভিত করার পক্ষে, ইহা বিশেষ উপযোগী। বড় বড় গামলাতে ইহার চাষ হইতে পারে। ঘরের বারিন্দা সাজাইবার জন্য সৌখিনব্যক্তি গামলাতে ইহার চাষ করিতে পারেন।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুহ।

———

গোলাপের চাষ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র গুহ এম্, আর, এইচ, এস্ লিখিত]

সকল প্রকার মৃত্তিকাতেই গোলাপের চাষ করা যায়। কিন্তু তথাপি, সাস্তর দো-আঁশ-মৃত্তিকাই গোলাপচাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। প্রস্তর-কঙ্করযুক্ত মৃত্তিকা, লাল-মৃত্তিকা, কৃষ্ণ-মৃত্তিকা এবং তদ্ভিন্ন অন্যান্য প্রকার মৃত্তিকাতেও ইহার চাষ হয়। কিন্তু বালুকাময় ভূমি গোলাপচাষের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী। অধিক আর্দ্র বায়ু ও ভূমিও ইহার চাষের ক্ষতিকারক। কারণ, ঐরূপ বায়ু ও মৃত্তিকাতে গোলাপগাছের অতিরিক্ত বৃদ্ধি সাধিত হয় বলিয়া, গাছগুলি দীর্ঘজীবী হয় না। পক্ষান্তরে, তদ্বিপরীত স্থানের গাছ সতেজে বর্দ্ধিত না হইলেও, উহার ফুল সৌন্দর্য্যে, সৌরভে ও গঠনপারিপাট্যে অধিকতর মনোহর হইয়া থাকে।

কঠিন কর্দ্দম-মৃত্তিকাতেও গোলাপের চাষ হইতে পারে। কিন্তু এরূপ মৃত্তিকা গোলাপচাষের পক্ষে তত উপযোগী নহে। কঠিন মৃত্তিকায় ইহার চাষ করিতে হইলে, মৃত্তিকার সহিত গোময়সার, পাতার সার বা তদ্রূপ অন্য কোনরূপ উদ্ভিজ্জসার এবং বালি মিশ্রিত করিয়া, উহার আঁশ ভাঙ্গিয়া লইতে হয়। উক্ত সারাদি মিশ্রণে কঠিন আঠাল মৃত্তিকাও কোমলতাপ্রাপ্ত বা দো-আঁশ-মৃত্তিকার পরিণত হইয়া থাকে। প্রথমতঃ, কঠিন আঠাল মৃত্তিকা কোদাল দ্বারা গভীররূপে কোপাইয়া লইতে এবং মৃত্তিকার ঢেলা বা চাকাগুলি শুষ্ক করিতে হইবে। তৎপর, মুগুর (মুগর) দ্বারা পিটাইয়া ঢেলাগুলি উত্তমরূপে চূর্ণ করিতে ও চূর্ণীকৃত মৃত্তিকার সহিত বালি, গোময়সার, গোশালার আবর্জ্জনা, নর্দ্দমার আবর্জ্জনা, পোড়ামাটি ও কাঠের কয়লার গুঁড়া প্রভৃতি মিশ্রিত করিতে হইবে। বর্ষাকালের বৃষ্টির জলে ঐ সকল মিশ্রিতপদার্থ পচিয়া গিয়া মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত হইয়া পড়ে; এবং উহাতেই মৃত্তিকার স্বভাবের পরিবর্ত্তন ও রূপান্তর ঘটে। এইরূপেই কঠিন আঠাল মৃত্তিকা সাস্তর দো-আঁশ-মৃত্তিকায় পরিণত হয়। কঠিন বা কর্দ্দম মৃত্তিকার ধারণা-শক্তি (Power of retention) অত্যধিক বলিয়া, উহাতে সহজে জল দাঁড়ায়; কিন্তু আবদ্ধ জল সহজে নিঃসারিত হইতে পারে না,—দীর্ঘসময় স্থায়ী হয়। গোলাপগাছের গোড়ায় জল দাঁড়াইলে বা অধিকসময় আবদ্ধ রহিলে, উহার মূলে বায়ু ও উত্তাপ প্রবিষ্ট হয় না। ফলে, অনেকসময়ই গাছের মূল পচিয়া যায়। বায়ু ও উত্তাপ—এই দুইটি পদার্থ উদ্ভিজ্জীবনের প্রধান সহায়। উদ্ভিদের সজীবতা, স্ফূর্ত্তি, বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্য প্রভৃতি ইহাদের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করে। সুতরাং, বায়ু ও উত্তাপের আংশিক অভাবও উদ্ভিদের পক্ষে কিরূপ ক্ষতিকর, তাহা সহজেই অনুমেয়। কঠিন আঠাল মৃত্তিকা সাস্তর দো-আঁশ-মৃত্তিকায় পরিণত হইলে, উহাতে একাধারে জলশোষণ, জলধারণ ও জল নিঃসারণ—এই তিনটি গুণ জন্মে। এইরূপ মৃত্তিকাই গোলাপচাষের পক্ষে প্রশস্ত।

বালিমাটিতে গোলাপের চাষ করিতে হইলে, উহাও দো-আঁশ-মৃত্তিকায় পরিবর্ত্তন করিয়া লওয়া অত্যাবশ্যক। বালিমাটির উপরিভাগের অন্যূন ২·৩ ফুট পর্য্যন্ত খনন করিয়া তুলিয়া, ঐ খনিত মৃত্তিকার সহিত পূর্ব্বোক্তরূপে সার, কর্দ্দম ও পলিমাটি মিশাইতে এবং মিশ্রিতমৃত্তিকায় গর্ত্ত পূর্ণ করিয়া ফেলিতে হয়। তাহা হইলেই উদ্দেশ্য সাধিত হইল। ঐ ভূমির উপরে গোশালা বা আস্তাবল রাখিলে, পশুর মল-মূত্র এবং মল-মূত্রমিশ্রিত আবর্জ্জনা প্রভৃতি দ্বারা বালির আঁশ পচিয়া গিয়া, উহা উত্তম দো-আঁশ মৃত্তিকায় পরিণত হয়। কিন্তু এইরূপে মৃত্তিকার স্বভাবের পরিবর্ত্তন করিতে হইলে দীর্ঘকাল প্রতীক্ষা করিতে হয়। তদ্ভিন্ন, উহার সহিতও পুরাতন জলাধারের তলদেশস্থ পলিপড়া-মৃত্তিকা এবং কিয়ৎপরিমাণ কর্দ্দম-মৃত্তিকা মিশ্রিত করিয়া লওয়া আবশ্যক। তাহা হইলেই মৃত্তিকা গোলাপচাষের উপযোগী হইয়া থাকে। আস্তাবলের আবর্জ্জনা বা অশ্বের মল পচিতে ২।৩ বৎসর লাগে। কিন্তু গোশালার আবর্জ্জনা এবং গোময় ও গোমূত্র তদপেক্ষা অল্পসময়েই পচিয়া যায়।

বালি ও কঠিন বা কর্দ্দম মৃত্তিকাকে অন্য উপায় অবলম্বনেও উৎকৃষ্ট মৃত্তিকায় পরিণত করা যায়। বর্ষারম্ভের

পূর্ব্বে, ঐরূপ মৃত্তিকার উপরে গোশালার বা নর্দ্দামার আবর্জ্জনাদি বিছাইয়া দিয়া, তদুপরি এক ফুট পুরু করিয়া পানা আবৃত করিতে পারিলে, উহা বৃষ্টির জলে পচিয়া গিয়াও মৃত্তিকার রূপান্তর সাধিত করে। আবর্জ্জনা প্রভৃতি পচিয়া গেলে, উহা বারম্বার চাষ ও মই দিয়া মৃত্তিকার সহিত মিশাইয়া দিতে হয়। ক্রমাগত কএক বৎসর পর্য্যন্ত উক্তরূপে মৃত্তিকার স্বভাব পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে পারিলে, উহা উৎকৃষ্ট দো-আঁশ-মৃত্তিকায় পরিণত হইয়া থাকে। মৃত্তিকার স্বভাব-পরিবর্ত্তনের পক্ষে, ইহাও একটি উৎকৃষ্ট উপায়।

পলিপড়া চড়-ভূমির মৃত্তিকা গোলাপচাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। কিন্তু ঐরূপ নিম্নস্থান বর্ষায় জলমগ্ন হইয়া যায় বলিয়া, উহাতে গোলাপের চাষ করা যায় না। বর্ষান্তে ঐরূপ ভূমির বা খাল, বিল-ঝিল অথবা পুষ্করিণী প্রভৃতি জলাশয়ের তলদেশস্থ পলি-মাটি সংগ্রহ করিয়া রাখিতে পারিলে, উহা গোলাপ-বাগানের বা গোলাপ-ক্ষেত্রের মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত করিয়া লওয়া যায়। ইহাতে যে কেবল মৃত্তিকার আঁশ ভাঙ্গিয়া যায় ও উহা কোমলতাপ্রাপ্ত হয়, তাহা নহে; পলিপড়া-মাটিতে সারের কার্য্যও সাধিত হইয়া থাকে।

যে ভূমি আশুধান্য, পাট, গম, যব, কপি, শণ এবং দাইলজাতীয় শস্য প্রভৃতি চাষের উপযোগী, তদ্রূপ ভূমি গোলাপচাষের পক্ষেও অনুকূল। যে ভূমিতে উপর্য্যুপরি ২।৩ বার পাট, কপি এবং শণ, ধইঞ্চা, মটর প্রভৃতি শিম্বীধারী গাছের চাষ করা হইয়াছে, উহাতে গোলাপবাগান করিলে সাফল্যলাভে বঞ্চিত হইতে হয় না। তদ্ভিন্ন, জঙ্গলাকীর্ণ ভূমি আবাদ করিয়া লইতে পারিলে, উহা গোলাপচাষের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপযোগী হয়। তবে জঙ্গল আবাদ করা ব্যয়সাধ্য ব্যাপার সন্দেহ নাই। গোলাপতত্ত্ববিদ্ রেনল্ডস্ হোল (Reynolds Hole) বলেন,—"যদি তোমার ভূমি সর্ব্বদা স্যাঁৎসেতে রহে, এবং কোনও উপায়েই ভূমির স্বভাবের পরিবর্ত্তন করা অসম্ভব হইয়া পড়ে, তাহা হইলে, ঐ ভূমির দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ৪ ফুট গভীর করিয়া আবশ্যকমত নর্দ্দামা খনন কর। নর্দ্দামাগুলির একদিক্ ঢালু করিতে হইবে। এইরূপে নর্দ্দামা খনন করিয়া লইতে পারিলেই, ভূমির অতিরিক্ত আর্দ্রতা দূর হইবে। কিন্তু বর্ষাকালে ঐ সকল নর্দ্দামা-পথে রীতিমত জল-নিঃসারণ হয় কিনা, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।" তিনি আরও বলেন যে, কঠিন বা কর্দ্দম বা আঠাল ভূমিকে স্যান্তর দো-আঁশ-মৃত্তিকায় পরিবর্ত্তিত করিতে হইলে, ভূমিতে সারি করিয়া গর্ত্ত (trench) খনম করিবে। ইহাতে মৃত্তিকাভ্যন্তরে সহজেই বায়ু প্রবেশ করিতে পারিবে। ফলে, বায়বীয় ক্রিয়া দ্বারা ভূমির উৎকর্ষ ঘটিবে। ঐরূপ ভূমির স্বভাবপরিবর্ত্তন করিয়া, উহাকে গোলাপের চাষোপযোগী উৎকৃষ্ট মৃত্তিকায় পরিণত করিতে হইলে, মৃত্তিকা খনন করিয়া, উহার সহিত বালি, পাথর-কয়লার ছাই (Cinder—পোড়া কয়লার গুঁড়া), চূণ, ঝুল বা ভূষা (Soot), পোড়ামাটি, হাল্কা উদ্ভিজ্জ-সার অথবা যে সার দীর্ঘকালের অস্ফুটিত (long infermented) উহা মিশ্রিত করিতে হয়। ইহাতেই কর্দ্দম-মৃত্তিকা উৎকৃষ্ট দো-আঁশ-মৃত্তিকায় পরিণত হইবে।

পোড়ামাটি গোলাপচাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। উহা গোলাপক্ষেত্রে সারের কার্য্য করে। কেহ কেহ বলেন, পোড়ামাটির গুণ অল্পদিন হইল আবিষ্কৃত হইয়াছে। বস্তুতঃ, ইহা সত্য নহে। কেননা, উদ্যানবিষয়ক বহুপ্রাচীন রোমান ও গ্রীক গ্রন্থেও ইহার উল্লেখ রহিয়াছে। ন্যূনাধিক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, গোলাপক্ষেত্রে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে, রোমবাসীরা মৃত্তিকা দগ্ধ করার (Incinerate) প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছিল। মৃত্তিকা দগ্ধ করিলে, উহার আঠাল-স্বভাব দূর হয়; এবং সান্তরতা (Porosity) ও ধারণাশক্তি (Power of retention) বৰ্দ্ধিত হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা কঠিন, স্যাঁৎসেতে ও স্নিগ্ধ মৃত্তিকা সহজেই শুষ্কতা ও উষ্ণতা প্রাপ্ত হয়। তদবস্থায়, উহা শুধু গোলাপ কেন নানাবিধ শস্য এবং শাক-সব্জীর চাষের পক্ষেও উপযোগী হইয়া থাকে। যে প্রণালীতে ইট পোড়ান হয়, অনেকাংশে তদ্রূপ প্রণালী অবলম্বন করিয়াই চুল্লীতে মৃত্তিকা দগ্ধ করা আবশ্যক। মৃত্তিকা অধিক দগ্ধ (Over burnt) হইলে, উহা ইষ্টক বা ঝামা হইয়া পড়ে। ঐরূপ মৃত্তিকা অকর্ম্মণ্য। দগ্ধ-মৃত্তিকা

উত্তমরূপ চূর্ণ করিয়া, উহাই গোলাপগাছের গোড়ায় ব্যবহার করিতে হয়। স্বনামখ্যাত কৃষি ও উদ্যান তত্ত্ববিদ্ ফার্ম্মিঞ্জার সাহেবের মতে, উদ্যানের আবর্জ্জনা দগ্ধ করিয়া লইতে পারিলে, উহাও মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিতভাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে। তাঁহার মতেও দগ্ধ-মৃত্তিকা গোলাপগাছের পক্ষে হিতকর। তিনি ঘাসের চাপ্‌ড়া, চুলায় বা উত্তপ্ত লোহের পাটে, দগ্ধ করিয়া লইয়া গোলাপ-ক্ষেত্রে ব্যবহার করিতে বলিয়াছেন। ফার্ম্মিঞ্জার দূর্ব্বাঘাসের চাপ্‌ড়ারই বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহার মতে, নূতন মৃত্তিকা (পলিপড়া মাটি) গোলাপচাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। গোলাপক্ষেত্রে সময় সময় নূতন মৃত্তিকা প্রদান করিতে পারিলে সুফললাভ করা যায়। মৃত্তিকার উৎকর্ষের উপরই গোলাপফুলের উৎকর্ষ অনেকাংশে নির্ভর করিয়া থাকে।

মৃত্তিকা দগ্ধ করিবার সময়, যাহাতে 'ভাটা'র ভিতরে বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কারণ, ভাটার মধ্যে বায়ু প্রবেশ করিলে, অধিকাংশসময়েই মৃত্তিকার বর্ণ লাল হইয়া উঠে। বলা বাহুল্য, অধিক পুড়িলেই এই বর্ণ হয়। ভাটার চতুর্দ্দিকে উত্তমরূপে মৃত্তিকার প্রলেপ দিলে, তন্মধ্যে সহজে বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না। ফলে, ভাটার মৃত্তিকাও সহজে লালবর্ণ ধারণ করে না। দগ্ধ-মৃত্তিকা লালবর্ণ ধারণ করিলে, উহার গুণের হানি হয়। তবে ধূমাটে-লালবর্ণের দগ্ধ-মৃত্তিকা হইলেও বিশেষ কোনরূপ ক্ষতি হয় না। পাহাড়ের মৃত্তিকা কঙ্করময় বলিয়া, তথায় গোলাপ বড় ভাল হয়। কঙ্করমৃত্তিকায় স্বভাবতঃ লোহের ভাগ কিঞ্চিৎ অধিক রহে বলিয়া, উহাও গোলাপচাষের পক্ষে অনুপযোগী নহে। কঙ্করযুক্ত মৃত্তিকা পূর্ব্বোক্ত উপায়ে দগ্ধ করিয়া লইতে পারিলেও, উহা উৎকৃষ্ট মৃত্তিকায় পরিণত হয়।

নক্‌সা-প্রস্তুত-প্রণালী—গোলাপ ক্ষেত্র বা উদ্যান যে কোন নির্দ্দিষ্ট আকারে প্রস্তুত করিতে হইবে, তাহা নহে। যাহার যে পরিমাণ ভূমি আছে, অল্পতা বা আধিক্য বুঝিয়া, তাহাতেই স্বীয় স্বীয় রুচি অনুযায়ী গোলাপ-উদ্যান প্রস্তুত করিতে হয়। গোলাকার, আয়তক্ষেত্রাকার, অর্দ্ধচন্দ্রাকার, ত্রিকোণাকার বা সমান্তরাল ক্ষেত্রাকার—ইহার যে কোনও আকারেই গোলাপ-উদ্যান প্রস্তুত করা যাইতে পারে। বাসগৃহের সম্মুখভাগে উদ্যান প্রস্তুত করিবার সুবিধা রহিলে, বড়ই ভাল হয়। সখের হিসাবে উদ্যান করিতে হইলে, তদ্রূপ স্থানেই করা উচিত। পক্ষান্তরে, ব্যবসায়ের হিসাবে গোলাপ-চাষ করিতে হইলে বিস্তৃত মাঠই বিশেষ উপযোগী। গৃহ বা বারান্দা-সজ্জার উদ্দেশ্যে পাত্রে গোলাপ-চাষ করা আবশ্যক। যে স্থানে যে আকারের উদ্যান প্রস্তুত করিলে, উহা নয়নের প্রীতিকর হইতে পারে, তত্তৎস্থানে সেইরূপ আকারের উদ্যান প্রস্তুত করাই সঙ্গত। *

মৃত্তিকা প্রস্তুত-প্রণালী—সমতল বা সমোচ্চ ভূমিতে গোলাপচাষ করিতে হয়। ভূমির সমতলতার উপরেও, গোলাপচাষের সফলতা অনেকটা নির্ভর করে। ভূমির কোনও স্থান উচ্চ এবং কোনও স্থান নিম্ন হইলে, উহা গোলাপচাষের পক্ষে উপযোগী হয় না। এইজন্য গোলাপ-বাগান প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বেই মৃত্তিকা সমতল করিয়া লওয়া আবশ্যক। উচ্চ-নিম্ন ভূমি হইলে, উচ্চস্থান কাটিয়া যে মৃত্তিকা পাওয়া যায়, তদ্দ্বারাই নিম্নস্থান পূর্ণ করিতে হয়। ইহাতেই মৃত্তিকা সমতল হইয়া থাকে। মৃত্তিকা সমতল হইলে পর, সমস্ত ক্ষেত্রকে কোদাল দ্বারা গভীররূপে কোবাইতে হইবে। ক্ষেত্রের ঢেলাগুলি শুষ্ক হইয়া উঠিলে, উহা ধূলিবৎ চূর্ণ করিতে এবং ক্ষেত্র হইতে গাছের মূল, খোলা, খাপড়া বা তদ্রূপ কঠিনপদার্থ (যাহা কিছু থাকে) ও আগাছাদি বাছিয়া ফেলিতে হয়। মুগুর দ্বারা পিটাইয়া, ক্ষেত্রের মৃত্তিকা উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া লইতে পারিলে, উহাতে আর হালচাষ করিবার প্রয়োজন হয় না। পক্ষান্তরে, কোদাল দ্বারা কোবাইয়া লইতে না পারিলে, বারম্বার হল-কর্ষণ ও মদিকা-প্রদান দ্বারা ক্ষেত্রের মৃত্তিকা উত্তমরূপে

* শ্রদ্ধেয় ঈশ্বরবাবু উদ্যানের নক্‌সা-প্রস্তুত সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, চিত্র ব্যতীত সাধারণ পাঠকের তাহা বোধগম্য হইবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এক্ষণ কাগজের অভাবে হাফটোন ব্লক ছাপান আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়াই পড়িয়াছে। এই জন্যই নক্‌সা-প্রস্তুত সম্বন্ধে আমরা বেশী কিছু প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

কর্ষিত ও চূর্ণীকৃত করিয়া লইলেও চলে। জমি-প্রস্তুতের উপরও গোলাপচাষের সাফল্যলাভ কতকটা নির্ভর করে। সুতরাং, তদ্বিষয়ে উপেক্ষা প্রদর্শন করা অনুচিত।

গোলাপ-বাগের মৃত্তিকায় লবণ বা ক্ষারপদার্থের ভাগ রহিলে, উহা পোড়াইয়া দিতে হয়। মৃত্তিকা কোবাইবার পর, তদুপরিভাগে শুষ্ক খড়, গাছের শুষ্ক পাতা বা তদ্রূপ অন্য কোন বস্তু বিস্তার করিয়া, অগ্নিসংযোগে উহা পোড়াইলেই লবণ ও ক্ষার প্রভৃতির অংশ কমিয়া যায়। তদ্ভিন্ন, জল দ্বারা সমস্ত ভূমি ধৌত করিয়া লইতে পারিলেও পোড়াইবার উদ্দেশ্য সাধিত হয়। ভূমিকে জল দ্বারা ধৌত করিতে হইলে, উহার চতুর্দ্দিকে আইল (আলি) বাঁধিয়া জল আবদ্ধ রাখিতে হইবে। মৃত্তিকা যাহাতে জলে ডুবিয়া রহে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই ক্ষেত্র জলপূর্ণ করিতে হয়। অন্ততঃ ছয় ঘণ্টাকাল ক্ষেত্রে জল আবদ্ধ রাখা আবশ্যক। তৎপর, ক্ষেত্রের একপার্শ্বে নর্দ্দমা কাটিয়া দিলেই, সমস্ত ক্ষেত্রকে ধৌত করিয়া রক্ষিতজল নর্দ্দমা-পথে বাহির হইয়া যায়। ঐ জলের সহিত লবণ এবং ক্ষারও অনেকটা বাহির হইয়া পড়ে। কিন্তু উহা বায়সাধ্যব্যাপার। সুতরাং, ক্ষেত্র পোড়াইয়া দেওয়াই সঙ্গত।

রোপণের সময়—নিম্ন-প্রদেশে প্রায় বার মাসই গোলাপগাছ রোপণ করা যাইতে পারে। কিন্তু তথাপি, বর্ষাকালে গাছ রোপণ করা সুবিধাজনক নহে। কারণ, তৎকালে একাদিক্রমে দীর্ঘকাল বৃষ্টি হইলে, রোপিত গোলাপগাছের মূল পচিয়া যাইতে পারে। ফলে, গাছ মরিয়া যাওয়ারও আশঙ্কা রহে। এই জন্যই আষাঢ় ও শ্রাবণ মাস গোলাপগাছ রোপণ করিবার পক্ষে অপকৃষ্ট সময়। এই সময়ে রোপণ করিলে অধিকাংশ গাছই মরিয়া যাইতে পারে। বর্ষাকালে মৃত্তিকা অতিশয় আর্দ্র রহে বলিয়া, গোলাপগাছ বসাইবার উপযোগী গর্ত্তের মৃত্তিকা সহজেই চাপা বাঁধিয়া উঠে; এবং বৃষ্টির অভাব হইলেই, উহা কঠিন হইয়া যায়। ইহাতে রোপিত গাছের সতেজ বর্দ্ধনে ব্যাঘাত জন্মে।

ভাদ্রমাসের শেষভাগ হইতে কার্ত্তিকমাসের শেষভাগ এবং মাঘমাস হইতে বৈশাখমাস পর্য্যন্ত গোলাপগাছ রোপণের পক্ষে প্রশস্তকাল। অগ্রহায়ণ পৌষ মাসেও গাছ রোপণ করা যাইতে পারে। কিন্তু তৎকালে শীতাধিক্যহেতু গাছের পরিবর্দ্ধন ও পুষ্টিসাধন কার্য্য অনেকাংশেই স্থগিত রহে। শীতকালের রোপিত গাছ বসন্তের শেষভাগ হইতেই সতেজ হইতে আরম্ভ করে। বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে গোলাপ-গাছ রোপণ করিলে, তৎপরবর্ত্তী শীত-ঋতুতে উহা সুন্দর পুষ্পধারণ করে। পক্ষান্তরে, শরৎকালের রোপিত গাছ পরবর্ত্তী শীতকালেই পুষ্পপ্রসূ হয় সত্য, কিন্তু উহার ফুল তত সুন্দর ও বৃহৎ হয় না। রোপণের অব্যবহিত পরে পুষ্পধারণ করে বলিয়াই, উহার ফুলের আকৃতি, সৌন্দর্য্য ও গুণের আংশিক অপকর্ষ ঘটিয়া থাকে। কারণ, অত্যল্প-সময়ের মধ্যে গাছ পূর্ণরূপে ভূমিতে লাগিয়া যাইতে এবং সুস্থ ও সতেজ হইতে পারে না। গোলাপগাছের মূল অল্পকালমধ্যে সবল ও সর্ব্বাংশে কার্য্যকর হইতে পারে না বলিয়াই, গাছও যথোপযুক্তরূপে সতেজ হয় না। সুতরাং, আংশিক নিস্তেজ গাছে কখনও আশানুরূপ পুষ্প জন্মিতে পারে না।

শীতপ্রধান-দেশে এবং পার্ব্বত্য-প্রদেশে একমাত্র বর্ষা-কাল ভিন্ন সকলসময়েই গোলাপগাছ রোপণ করা যাইতে পারে। কিন্তু তথাপি, বসন্তকালই পার্ব্বত্য-প্রদেশে গাছ রোপণ করার পক্ষে প্রশস্ত সময়। বসন্তাগমনের সঙ্গে সঙ্গেই শীতের তীব্রতা ও জড়তা অনেকাংশেই দূর হইয়া যায়, এবং মৃদু উত্তাপ অনুভূত হইতে থাকে। ঐ সময় গোলাপ-গাছ রোপণ করিলে, মৃদু উত্তাপে উহা সতেজে বর্দ্ধিত হয়। এই সময়েই গাছে পত্রমুকুল এবং শাখা ও উপশাখা সকল বহির্গত হইয়া থাকে। সুতরাং, তৎকালে গাছের গোড়ায় অধিকপরিমাণ জল ও তরলসার প্রদান করা আবশ্যক। চৈত্র বৈশাখ মাসে পুষ্পমুকুল দেখা যায়; এবং জ্যৈষ্ঠ হইতে অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত উহারা পুষ্পপ্রসূ হইয়া থাকে। নিম্ন-প্রদেশে গোলাপগাছ শীতকালেই বিশেষ স্ফূর্ত্তিলাভ করে; এবং সম্পূর্ণ শীতকালব্যাপীয়া পুষ্প প্রদান করিয়া থাকে। বৎসরের অন্তসময়ে, উহারা নিকৃষ্ট ফুলধারণ করে। পক্ষান্তরে, পার্ব্বত্য-প্রদেশে জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসেই ইহাদের ফুলের সৌন্দর্য্য ও আকৃতি বর্দ্ধিত হয়।

পার্ব্বত্য-প্রদেশে ভাদ্র আশ্বিন মাসে গোলাপগাছ সংগৃহীত হইয়া থাকে; এবং ঐ সকল গাছ প্রথমতঃ পাত্রে রোপণ করিয়া, তৎপর পাত্রসহ মৃত্তিকায় রোপণ করা হয়। স্থায়ী-ভাবে মৃত্তিকায় রোপণের কাল উপস্থিত হইবা মাত্র, পাত্রসহ রোপিত গাছগুলি মৃত্তিকা হইতে উঠাইয়া লইয়া ও পাত্রটী খুলিয়া ফেলিয়া, গাছগুলি মৃত্তিকায় রোপণ করা হয়।

দূরদেশ হইতে গোলাপগাছ আনয়ন করিয়া রোপণ করিতে হইলে, শীতকালে গাছ রোপণ করাই সঙ্গত। কারণ, দূরদেশ হইতে গ্রীষ্মকালে গাছ আনয়ন করিলে, পথে আসিতে আসিতে অনেক গাছ মরিয়া যায় বা শুকাইয়া উঠে। ইহাতে বিশেষ ক্ষতি হয়। কিন্তু শীতকালের গাছ পথক্লেশে মরিয়া যাইবার সম্ভাবনা বড় কম রহে। এইজন্য নিম্ন-প্রদেশে গোলাপগাছ আমদানী করিবার পরই, উহাদিগকে রোপণ করা হয়। টবের গাছ আনয়ন করিলে, উহা শীত-গ্রীষ্ম কোনও সময়েই পথক্লেশে মরিয়া যায় না। কিন্তু এ দেশের অধিকাংশ নার্শরীওয়ালারাই টবে করিয়া গাছ রক্ষা করেন না; সুতরাং, পাঠাইবার সময়ও, গাছের গোড়ার মৃত্তিকা পিণ্ডাকার করিয়াই, গাছ পাঠাইয়া থাকেন। ইহাতে অনেক গাছই মরিয়া যাইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা রহে। নিম্ন-প্রদেশে সাধারণতঃ 'Ball' অর্থাৎ মৃত্তিকার গোলাপ-গাছই রোপিত হইয়া থাকে। উহার অধিকাংশই জোড়-কলমের গাছ। জোড়-কলমের গাছ কিন্তু উৎকৃষ্ট নহে। সাধারণ-চাষের পক্ষে স্বমূলযুক্ত (plants on their own roots) গাছই উৎকৃষ্ট। কাটিং, ডাবাকলম এবং টবের গুটী কলম (Circumposition) দ্বারা স্বমূলযুক্ত গাছ উৎপন্ন হয়। এই সকল গাছ সহজে মরিয়া যায় না। সুতরাং, প্রায় সকলসময়েই রোপণ করা যাইতে পারে। তবে কার্ত্তিক-মাস হইতে মাঘ ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত রোপণ করাই প্রশস্ত। পৌষমাস হইতেই ক্রমশঃ দিন বড় হইতে থাকে, এবং রৌদ্রের প্রখরতাও ক্রমেই অধিক হয়। সুতরাং, তৎকালে বা তৎপরে রোপিত চারায় আবশ্যকমত ২।১ দিন পরে পরেই জলসেচন করা আবশ্যক।

সার ও উহার ব্যবহার প্রণালী—গোলাপচাষের সাফল্যলাভ অনেকাংশেই সার-ব্যবহারের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। যথাকালে ও যথোপযুক্ত পরিমাণে সার-ব্যবহার করিতে পারিলে সুফললাভ সুনিশ্চিত। সার দ্বারা গোলাপগাছের সজীবতা ও তেজস্বিতা বর্দ্ধিত এবং স্বাস্থ্য রক্ষিত হয়। তদ্ভিন্ন, তদ্দ্বারা পুষ্পের বর্ণ-চাকচিক্য, সৌন্দর্য্য, সুগন্ধ এবং আকৃতিও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, অতিরিক্ত সার ব্যবহার করিলে, উপকারের পরিবর্ত্তে, অপকারও সাধিত হয়। অতিরিক্ত সার-ব্যবহারে গোলাপগাছ রুগ্ন হইয়া পড়ে, এবং নানাবিধ কীট কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া থাকে। সেই জন্য বিশেষ সতর্কতা ও সুবিবেচনার সহিতই গোলাপগাছে সার ব্যবহার করিতে হইবে। (১) গাছ রোপণের সময়, (২) গাছ মৃত্তিকায় লাগিয়া গেলে, এবং (৩) গাছ ছাঁটিবার পর—এই তিন সময়েই সার ব্যবহার করিতে হয়। গোলাপগাছের গোড়ায় সময় সময় নূতন মাটি ব্যবহার করিলে, উহা দ্বারা একরূপ সারের কার্য্যই সাধিত হইয়া থাকে। যে স্থানে গোলাপগাছ রোপণ করিতে হইবে, সেই স্থানে গর্ত্ত করিয়া, ঐ গর্ত্ত পুরাতন গোময়সারমিশ্রিত নূতন মাটি দ্বারা পূর্ণ করিতে হয়। রোপণের অন্ততঃ একমাস পূর্ব্বেই, উক্ত সার দ্বারা গর্ত্ত পূর্ণ করা আবশ্যক। তাহা হইলেই রোপণের পূর্ব্বে সার ব্যবহার করা হইল। গর্ত্ত সারমিশ্রিত মৃত্তিকায় পূর্ণ করিয়াই, তাহাতে গোলাপ-গাছ রোপণ করা কর্ত্তব্য। পুরাতন গোময়সার অত্যুষ্ণ জলে ধৌত করিয়া লইলে ভবিষ্যতে কোনরূপ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা রহে না। পুরাতন গোময়ে অনেক সময়ই কীট-পতঙ্গাদি ডিম্বপ্রসব করে; এবং উহাতে শিশু-কীট বাস করিয়া থাকে। উষ্ণজলে ধৌত করিয়া লইলে, ঐ সকল ডিম্ব বা শিশু-কীট বিনষ্ট হয়। সুতরাং, ধৌত গোময়সার ব্যবহার করিলে, গোলাপগাছ কীট কর্ত্তৃক আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা রহে না। ভাদ্র বা আশ্বিন মাসে গোলাপগাছ রোপিত হইলে, অত্যল্পকাল মধ্যেই উহা মৃত্তিকায় 'লাগিয়া' যায়। গাছগুলি সম্পূর্ণ-রূপে লাগিয়া গেলে পর, উহার নূতন নূতন শিকড় চারিদিকে প্রসারিত হইতে আরম্ভ করে; এবং উপরিভাগে নূতন পত্রমুকুল নির্গত হয়। তৎকালে গাছের গোড়ায়

মৃত্তিকা আল্‌গা করিয়া দিয়া, ঐ স্থানে সামান্য পরিমাণে পুরাতন গোময়সার বা তরুণ গোবরের তরলসার প্রদান করা আবশ্যক। ঐ বৎসর আর সার-ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না। তবে সময় সময় গাছের গোড়ার মৃত্তিকা আল্‌গা করিয়া দিতে হইবে। তৎপরবর্ত্তী বৎসর, সময় বুঝিয়া —আশ্বিন বা কার্ত্তিক মাসে, গাছগুলি ছাঁটিয়া দিতে হয়। কোনও কোনও সময়, নিম্ন-প্রদেশে কার্ত্তিকমাস পর্য্যন্ত বর্ষাকাল স্থায়ী হয়। সুতরাং, তৎপরেই অর্থাৎ বর্ষা অন্ত হওয়ার পর মৃত্তিকা শুষ্ক হইয়া উঠিলেই, গোলাপগাছ ছাঁটিয়া দিতে হইবে। গাছ ছাঁটিবার অন্ততঃ দুই সপ্তাহ পরে, গাছের গোড়ার চারিদিকের এক ফুট পরিমাণ মৃত্তিকা খুরপী বা হাত-কোদাল (ক্ষুদ্র কোদালবিশেষ) দ্বারা খুড়িয়া উঠাইতে এবং খনিত-মৃত্তিকা গর্ত্তের চতুর্দ্দিকে সঞ্চিত রাখিতে হয়। খনন করিবার সময়, যাহাতে গাছের সবল, সতেজ ও বৃহৎ শিকড়গুলি ক্ষত-বিক্ষত না হয়, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। তদ্ভিন্ন, গাছের পাদদেশের শিকড়গুলিও আল্‌গা করিয়া দিতে হয়। তৎপর, ঐরূপ খনিত-অবস্থায় ২।৩ সপ্তাহ রহিলেই, গাছের মূলে উত্তাপ, বায়ু, আলো ও রাত্রির শিশির লাগিয়া, গাছের বিশেষ উপকার সাধিত হয়। ইহাকেই 'শীত খাওয়ান' (wintering) কহে। গাছের গোড়া কিরূপ গভীর করিয়া খনন করিতে হইবে, তাহা ঠিকরূপে নির্দ্দেশ করা সম্ভবপর নহে। কেননা, কোনও গাছের শিকড় ভাসা এবং কোনও গাছের শিকড় ডাবা অবস্থায় রহে। স্থূলতঃ, শীত খাওয়াইতে গাছের পাদদেশ-সংলগ্ন সবল ও স্থূল শিকড়গুলিই আল্‌গা করিয়া দেওয়া সঙ্গত। এই কার্য্যে, অনেকসময় মালীর অসাবধানতা ও অনভিজ্ঞতা দোষে, গাছের বিশেষ অনিষ্টসাধিত হইয়া থাকে। তাহারা আবশ্যকাতিরিক্ত গভীররূপে গোলাপগাছের গোড়া খনন করাতে, উহার স্থূলশিকড়গুলি ক্ষত-বিক্ষত হয়। ফলে, শীত খাওয়াইবার পর গাছের গোড়া মৃত্তিকা দ্বারা পূর্ণ করিয়া, উহাতে জলসেচন করিলেই গাছের জলোদরী-রোগ জন্মে; এবং তাহাতে অনেক গাছ মরিয়া যায়। গোলাপ-গাছের গোড়ার মৃত্তিকা আল্‌গা করিবার সময়, উদ্যানস্বামীর গোলাপবাগানে উপস্থিত থাকা কর্ত্তব্য।

গোলাপগাছের গোড়ার মৃত্তিকা খনন করিবার ২।৩ সপ্তাহ পরে, নূতন মৃত্তিকা বা গর্ত্তের চতুষ্পার্শ্বস্থ সঞ্চিত মৃত্তিকার সহিত প্রচুর পরিমাণে পুরাতন গোময়সার মিশ্রিত করিয়া, তদ্দ্বারা গাছের গোড়ার গর্ত্তগুলি পূর্ণ করিয়া দিতে হয়। ঐ অবস্থায় ২।৩ সপ্তাহ রহিবে। তৎপর, যখন গাছে পত্রমুকুল নির্গত হওয়ার চিহ্ন দেখা দিবে, তখন ২।১ দিনে পরে পরেই প্রচুরপরিমাণে গাছের গোড়ায় জল দেওয়া আবশ্যক। তাহা হইলেই গাছগুলি সতেজে বর্দ্ধিত হইয়া আশানুরূপ ফল প্রদান করিবে। ফার্ম্মিঞ্জারের মতে, পূর্ব্বোক্তরূপে নূতন বা খনিত মৃত্তিকা দ্বারা গাছের গোড়ার গর্ত্ত পূর্ণ করিবার কিছুদিন পরে, ঐ মৃত্তিকা তুলিয়া ফেলিয়া গর্ত্তে তাজা গোবিষ্ঠা প্রয়োগ করিতে পারিলে উপকার হয়। তিনি বলেন, "প্রত্যেক গাছের গোড়ায় এক এক টুক্‌রী (Basket) তাজা গোবর দেওয়া সঙ্গত। গোবর দিয়া, তদুপরি উচ্চ হইতে জল ঢালিয়া দিতে হইবে। তাহা হইলেই, উহা তরল গোবর-সারের কার্য্য করিবে।" ঐরূপে তাজা গোবর ব্যবহার করিলে, অনেকসময় অপকারও সাধিত হইতে দেখা গিয়াছে। আমি তরুণ গোবরের পরিবর্ত্তে গাছের গোড়ায় পুরাতন গোময়সার ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফললাভ করিয়াছি। গোলাপগাছের গোড়ার খনিত গর্ত্ত মৃত্তিকা দ্বারা পূর্ণ করিবার ২।১ মাস পরে, তথায় তরুণ গোবরের তরলসার ব্যবহার করাই সঙ্গত। ঐ সার ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে, গাছের গোড়ার মৃত্তিকা আল্‌গা করিয়া লইলেই ভাল হয়। এইরূপ প্রক্রিয়াকে উপরের মৃত্তিকা-বিন্যাস (Top-dressing) কহে। কেহ কেহ বলেন, গাছ ছাঁটিবার পূর্ব্বেই, গাছের গোড়ায় শীত খাওয়াইতে হয়। বস্তুতঃ, এ রীতি সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, একই সময়ে গাছকে উপর্য্যুপরি দুইটি যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইলে, অনেকসময় গাছের অপকার সাধিত হয়। একদিকে, গোড়ায় গর্ত্ত করায় গাছের মূলের যন্ত্রণা হয়; সেই অবস্থায় ছাঁটিয়া

দিলে, গাছের আরও অধিক যন্ত্রণা উপস্থিত হইয়া থাকে। একই সময়ে গাছকে দ্বিবিধ যন্ত্রণাভোগ করিতে হইলে, কোনও কোনও অবস্থায়, উহার জীবননাশ পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে। সেই জন্যই গাছ ছাঁটিতে ও উহাকে শীত খাওয়াইতে হইলে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক।

রেনল্ডস্ হোল বলেন,—বলবান (Robust) জাতিকে উৎকৃষ্ট স্থানে রোপণ করিবে। ইহাদের চাষের পক্ষে উৎকৃষ্ট মৃত্তিকাই অত্যাবশ্যক। তদ্ভিন্ন, একদিকে যেমন মৃত্তিকা উত্তমরূপে চূর্ণীকৃত হওয়া আবশ্যক, তদ্রূপ অন্য দিকে মৃত্তিকার খোলা, খাপড়া, ইটের টুক্‌রা, উদ্ভিদের মূল প্রভৃতি উত্তমরূপে বাছিয়াও ফেলিতে হইবে। এইরূপ-ভাবে প্রস্তুতকরা মৃত্তিকায় গাছ রোপণ করিলে, সুফল-লাভে বঞ্চিত হইতে হয় না। শীতকালেই গোলাপগাছের গোড়ায় সার ব্যবহার করিতে হয়। তৎপর, বসন্তকালে পশ্বাদির মল-সংযুক্ত খড়-কুটা গাছের গোড়ায় বিছাইয়া দিতে হইবে। ইহাকে ইংরেজী-ভাষায় 'Mulching or Mulshing' অর্থাৎ 'খড়-ঢাকন' কহে। ঐ কার্য্য দ্বারা গাছের গোড়া স্নিগ্ধ রহে; অথচ, উহাতে আংশিক সার প্রদানের কার্য্যও সাধিত হয়। গ্রীষ্মকালে গোলাপগাছের গোড়ায় জলসেচন করিতে, এবং পিচ্‌কারী দ্বারা গাছের পাতায় জল দিয়া, উহা পরিষ্কার রাখিতে হইবে। তিনি ঐ প্রক্রিয়ার সাহায্যে, প্রতিসপ্তাহে তিনবার করিয়া গাছের গোড়ায় ও পাতায় জল দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন। সার ব্যবহার করিবার পর, গোলাপগাছে নানাবিধ কীট-পতঙ্গাদির উপদ্রব ঘটে, এবং রোগ দেখা দেয়। ঐ সকল নিবারণের জন্য গন্ধক, ঝুল বা ভূষা (Soot) ও সাবানের জল ব্যবহার করিতে হয়। গাছে ছাতা-রোগ (Mildew) দেখা দিলে, তৎক্ষণাৎ ঐ সকল দ্রব্য ব্যবহার করিতে হইবে। ছাতাধরাকে উদ্ভিদের রোগবিশেষ বলা যায়। উহাতে গাছের অনিষ্ট সাধিত হয়। তাঁরার মতে, বড় বড় সহরের কলের চিমনীর ঝুল সাররূপে ব্যবহার করিলে, উহাতে গোলাপগাছের উপকারের পরিবর্ত্তে অপকারই ঘটে। কারণ, উহা দ্বারা বায়ু দূষিত হয় বলিয়া, পুষ্পের বর্ণের উজ্জ্বল্যেরও ক্ষতি হয়।

রেনল্ডস্ হোল সার-ব্যবহারসম্বন্ধে বলেন,—হাড়ের গুঁড়া, দ্রব-অস্থি এবং নানাবিধ অস্থিসার গোলাপচাষের পক্ষে বিশেষ উপকারী। গাছের গোড়ার উপরিস্থ মৃত্তিকা-বিন্যাসের (Top dressing) পর, শুষ্ক উষ্ণ ভূমির পক্ষে ঝুল বা সুট সার সুফলপ্রদ। গুয়ানো-(Guano) সার * প্রয়োগ করিলে গোলাপগাছের সজীবতা, তেজ ও আকার বর্দ্ধিত হয় সত্য, কিন্তু তাহাতে পুষ্পোৎপাদন বা উহার উৎকর্ষসাধনের পক্ষে কোনরূপ উপকার ঘটে না। গোশালাজাত সার ও গোশালার আবর্জ্জনা গোলাপের পক্ষে উৎকৃষ্ট সার নহে। কিন্তু তথাপি, উহা সহজলভ্য বলিয়া সাররূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে। গোলাপ ক্ষেত্রের নিকট স্তূপাকারে গোবর অনাবৃত অবস্থায় মজুত রাখিতে হয়। উহা উত্তমরূপে পচিয়া গেলেই ব্যবহারোপযোগী হইয়া থাকে। ঘোটক-বিষ্ঠা উত্তমরূপে পচিয়া গেলে, উহাও গোলাপ-ক্ষেত্রে সার-রূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে। শূকর-বিষ্ঠাও গোলাপের পক্ষে উৎকৃষ্ট সার। তদ্ভিন্ন, হাড়ের গুঁড়া, নাইট্রেইট্ অব্ সোডা, কোনও কোনও প্রকার গুয়ানো, কপোত-বিষ্ঠা এবং আস্তাবলজাত সার প্রভৃতি ব্যবহার করা যায়। কার্ত্তিকমাসে সার ব্যবহার করিতে এবং ফাল্গুন চৈত্র মাসে গাছের গোড়ার মৃত্তিকা আল্‌গা করিয়া দিতে হয়। মৃত্তিকায় অতিশয় পুরু করিয়া সার বিছাইতে হয় না।

ধাতবসার গোলাপচাষের পক্ষে উপকারী নহে। বরং, উহা অধিকাংশসময়ে অপকারী-ই হইয়া থাকে। অনেকে বিজ্ঞাপনের প্রলোভনে ভুলিয়া, গোলাপচাষে সুফললাভের

* প্রশান্ত মহাসাগরস্থ দ্বীপপুঞ্জে গুয়ানো নামক একপ্রকার পক্ষী আছে, উহারই বিষ্ঠাকে গুয়ানো-সার কহে। উহা নাইট্রোজেন-প্রধান সার। এক পাউণ্ড গুয়ানো-সারের সহিত প্রায় দুই মণ জল মিশ্রিত করিলে, উহার তরলসার প্রস্তুত হয়। গোলাপগাছের গোড়ায় ঐ তরলসারই ব্যবহার করা কর্ত্তব্য সুপ্রসিদ্ধ উদ্যান তত্ত্ববিদ্ ফার্ম্মিঞ্জার সাহেবের মতে, গোলাপগাছে গুয়ানো-সার ব্যবহার না করিলেও চলে। উহা সহজলভ্য এবং গোলাপের পক্ষে তত সুফলপ্রদ নহে বলিয়া, আমরাও ঐ মতেরই পক্ষপাতী।

আশায়, ধাতবসার ক্রয় করিয়া প্রতারিত হ'ন। কারণ, উহা গোলাপের সাররূপে ব্যবহার করিবার যোগ্য নহে। সুতরাং, গোলাপচাষে ধাতবসার সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য।

অস্থিসারের উপকারিতা দীর্ঘকাল পরে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অন্যূন ২।৩ বৎসর অতীত না হইলে, অস্থিসারের উপকারিতা অনুভব করা যায় না। গোলাপগাছ ২।৩ বৎসরের অধিককাল একস্থানে স্থায়ী হইলে, উহার ফুলের সৌন্দর্য্য ও আকৃতির ক্রমাবনতি ঘটে। এই জন্য ২।৩ বৎসর পর পরই নূতন নূতন ক্ষেত্রে গোলাপের চাষ করিতে হয়। বলা বাহুল্য, ব্যবসায়ের হিসাবে গোলাপচাষ করিলেই, ঐরূপ করিতে হইবে। সুতরাং, তদবস্থায় অস্থিসার ব্যবহারে যে বিশেষ কোনরূপ উপকার সাধিত হয় না, ইহা সহজেই অনুমেয়। তবে গোলাপ-ক্ষেত্রের পুরাতন গাছের কাণ্ড পরিবর্ত্তন করিলে, বা পুরাতন গাছ উঠাইয়া স্থানান্তরে রোপণ করিয়া, তৎস্থলে নূতন গাছ রোপণ করিলে অস্থিসারের কতকটা ফললাভ হইয়া থাকে।

গোবিষ্ঠা ও গোশালাজাত সারই গোলাপের পক্ষে বিশেষ উপকারী। গোশালার আবর্জ্জনা, পোয়ালী বা খড় (Straw) প্রভৃতি মিশ্রিত সার উত্তমরূপে পচাইয়া লইয়াই গোলাপ-ক্ষেত্রে ব্যবহার করিতে হয়। না পচিলে, উহা কোন কোন সময়, গোলাপগাছের অহিতই সাধন করিয়া থাকে। কারণ, গোশালার আবর্জ্জনাদি দ্বারা গোলাপগাছে উদ্ভিজ্জ-রোগের উৎপত্তি হয়। কিন্তু উত্তমরূপে পচাইয়া লইলে, উহার দোষ সারিয়া যায়। গোবিষ্ঠার তরলসারই উপকারী।

শূকর, কুক্কুট, হংস, পারাবত প্রভৃতির বিষ্ঠাও উত্তমরূপে পচাইয়া লইলে গোলাপগাছের সাররূপে ব্যবহার করিতে পারা যায়। ঘোটক-বিষ্ঠাও উত্তমরূপে পচাইয়া লইয়াই ব্যবহার করিতে হয়। এই সকল বিষ্ঠা-সারও গোলাপের পক্ষে হিতকর; কিন্তু বড় তেজাল বলিয়া, টাট্‌কা ব্যবহার করিলে বিশেষ ক্ষতি হইয়া থাকে।

গাছ রোপণের কালে অন্যান্য সারের সহিত মিশ্রিতভাবে পত্রসারও ব্যবহার করা যাইতে পারে। তদবস্থায় উহা সুফলপ্রদ হয়। কিন্তু কেবল পাতার সার প্রয়োগ করিলে, তাহাতে ইষ্ট না হইয়া অনিষ্টই ঘটে। গোলাপগাছের মূলে ভূষা বা ঝুল সার প্রয়োগ করিলেও সুফল লাভ করা যায়। কিন্তু এই সার বড় বড় সহর (যেখানে কল-কারখানা আছে) ব্যতীত, অন্যত্র সহজলভ্য নহে। নীল-শিটীও (নীলগাছ পচাইয়া, উহা হইতে নীল বাহির করিয়া লইলে যাহা অবশিষ্ট রহে।) গোলাপের পক্ষে উপকারী। কিন্তু উহা উত্তমরূপে না পচিলে ফলপ্রদ হয় না। নীল-শিটী পোটাস্ ও এমোনিয়া প্রধান সার। বঙ্গদেশে ইহা দুষ্প্রাপ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

যে কএকপ্রকার সারের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা গেল, উহার প্রত্যেকটি সারই গোলাপচাষের পক্ষে ফলপ্রদ। কিন্তু উহাদের কতকগুলি সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্র সুলভ নহে। তদ্ভিন্ন, ঐ সকল সার ব্যবহার করিতেও বিশেষ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়।

সরিষার খৈলও গোলাপগাছের সাররূপে ব্যবহার করা যায়। কিন্তু উহা পচাইয়া লইয়াই গাছের গোড়ায় দিতে হয়। গোবর পচাইবার যে প্রণালী, ঠিক সেই প্রণালীতেই খৈলও পচাইয়া লওয়া আবশ্যক। টাট্‌কা খৈল প্রয়োগ করিলে, উহা মৃত্তিকার রস শোষণ করিয়া গরম হইয়া ফুলিয়া উঠে, এবং পচিতে আরম্ভ করে। তদবস্থায়, উহা হইতে যে উত্তাপ বাহির হয়, তাহাতে গাছ মরিয়া যাইবার আশঙ্কা রহে। এই জন্যই খৈল ব্যবহার করিতে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যক।

গোলাপগাছের গোড়ায় যৎকিঞ্চিৎ (আধ ছটাক হইতে এক ছটাক) সোরাচূর্ণ বা সোরার তরল সারও ব্যবহার করা যাইতে পারে। গাছে পত্রমুকুল দেখা দিলেই সোরা প্রয়োগ করিতে হয়। কিন্তু ইহা তত ফলপ্রদ নহে; বিশেষতঃ, ইহার ফলও ক্ষণস্থায়ী।

ক্রমশঃ।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুহ।

মার্কিণ-যুক্তরাজ্যের উচ্চবিদ্যালয়ে কৃষিশিক্ষা।*

[উচ্চবিদ্যালয়ে কৃষিশিক্ষা ও তাহার উদ্দেশ্য—উচ্চবিদ্যালয়ে কৃষিশিক্ষা বিধেয় কিনা—উচ্চবিদ্যালয়ের পাঠ্য-তালিকায় কৃষির স্থান-নির্দ্দেশ—মার্কিণ-যুক্তরাজ্যের উচ্চবিদ্যালয়ে কৃষি-শিক্ষা—আমাদের দেশের উচ্চবিদ্যালয়ের পাঠ্য-তালিকায় কৃষি—কৃষিশিক্ষাপ্রদানের রীতি—কৃষি-শিক্ষার উপযোগী সরঞ্জাম।]

উচ্চবিদ্যালয়ে কৃষিশিক্ষা ও তাহার উদ্দেশ্য।

উচ্চবিদ্যালয়ে কৃষি-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার বিষয় পর্য্যালোচনা করিতে হইলে, প্রথমতঃ কৃষিশিক্ষা ও তাহার উদ্দেশ্য কি, তাহাই আমাদিগকে প্রকৃতরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। কারণ, আমরা যে পর্য্যন্ত এই মহৎ উদ্দেশ্যের প্রকৃত মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে সমর্থ না হইব, সে পর্য্যন্ত আমাদের তদ্বিষয়ে সম্যক মনোযোগ আকৃষ্ট হইতে পারে না—হইবেও না। সুতরাং, বিদ্যালয়ে কৃষি-শিক্ষা অনাবশ্যক বোধেই উপেক্ষিত হইবে। কৃষিশিক্ষার আবশ্যকতা ও উদ্দেশ্যের কথা বুঝিতে হইলে, কৃষির আবশ্যকতার বিষয়ও সম্যকরূপে বুঝিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। এই জন্য সর্ব্বাদৌ আমি তৎসম্বন্ধেই সংক্ষিপ্তভাবে কএকটি কথা বলিতেছি।

আমাদের দেশ কৃষি-প্রাণ বা কৃষি-প্রধান। এ কৃষি-প্রাণ-দেশের অধিবাসীদের শতকরা ৮০ জন কৃষি ও তদানুষঙ্গিক কার্য্য করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে। অবশিষ্ট ২০ জনও, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, অল্পাধিক পরিমাণে, কৃষির সহিত সম্পৃক্ত রহিয়াছে। সুতরাং, একমাত্র কৃষিই ভারতবাসীর জীবনধারণের প্রথম ও প্রধান উপায়। ফলে, কৃষির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিলে এ দেশবাসীর চলে না;—কৃষির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা, আর জাতীয় ধ্বংসের পথ উন্মুক্ত করা একই কথা।

সকল দেশেরই ধনাগমের প্রধান উপায়—কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য। এতন্মধ্যে, কৃষিই সকলের মূলভিত্তি। কৃষিতে অশন-বসনোপযোগী যাবতীয় সামগ্রী এবং শিল্পের অধিকাংশ উপকরণ বা "কাঁচামাল" উৎপন্ন হয়। এই সকল কৃষিজাতদ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়ে এবং শিল্পোচিত ব্যবহারে শ্রমশিল্প, তথা ব্যবসায় বা বাণিজ্যের বিস্তার ঘটে। কৃষি বাণিজ্যের মূল; বাণিজ্য অর্থের মূল। অর্থ—ইহলৌকিক সুখ-সম্পদের এবং জাতীয় উত্থানের মূল। সুতরাং, সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে, একমাত্র কৃষিই সর্ব্ববিধ উন্নতির ও সকল প্রকার সুখ-সম্পদের মূল। কৃষি সমাজের মেরুদণ্ডস্বরূপ—কৃষিই সমাজের ভিত্তি।

এই সর্ব্বমূলাধার কৃষির উন্নতি ব্যতীত কোনও দেশেরই—বিশেষতঃ ভারতবর্ষের, সার্ব্বজনীন সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সম্ভবপর নহে। সেই জন্যই ভারতবর্ষকে কৃষি-প্রাণ বা কৃষি-প্রধান দেশ নামে অভিহিত করা হয়। কৃষি-প্রাণ-দেশে কৃষির আবশ্যকতা কি, তাহা সহজেই অনুমেয়। কৃষির আবশ্যকতা সম্বন্ধে, আমি বিগত ১৩২১ সালের আশ্বিনের সংখ্যা "কৃষি-সম্পদে" প্রকাশিত 'বিদ্যালয়ে উদ্ভিদ-পরিচর্য্যা' নামক প্রবন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং, এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

বর্ত্তমান অন্ন-সমস্যাসম্বন্ধে সমগ্র দেশব্যাপী যে আন্দোলন চলিতেছে, তাহা হইতে এ দেশবাসী প্রায় সকলেই কৃষির আবশ্যকতা অল্পাধিক পরিমাণে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। সুতরাং, তৎসম্বন্ধে বেশী কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। কৃষি ভিন্ন যে আমাদের গত্যন্তর নাই, এবং কুটীরের অধিবাসী কৃষকের উন্নতি না হইলে যে

---

* এই প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত স্বর্ণকুমার মিত্র মহাশয় মার্কিণ-যুক্তরাজ্যের কালিফর্নিয়া ইউনিভার্সিটীর বার্কলি নামক কৃষি-কলেজের কৃতী ছাত্র। বিগত ১৩২১ সালের আশ্বিনের সংখ্যা "কৃষি-সম্পদে" স্বর্ণকুমারবাবুর লিখিত 'বিদ্যালয়ে উদ্ভিদ-পরিচর্য্যা' নামক প্রবন্ধে মার্কিণের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে (Grammar school) ক্রমাগত ছয়বৎসরকাল কিরূপভাবে কৃষিশিক্ষার বন্দোবস্ত রহিয়াছে, তাহারই সম্যক বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। ঐ প্রবন্ধে মার্কিণ-যুক্তরাজ্যের উচ্চ বিদ্যালয়ে কৃষিশিক্ষার বিষয় উত্থাপিতমাত্র হইয়াছিল; কিন্তু স্থানাভাববশতঃ আলোচিত হয় নাই।

দেশের ও জাতির উন্নতি কখনও সম্ভবপর হইতে পারে না—এই সকল কথাও অনেকেই বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন। এ দেশের কৃষি ও কৃষকের অবস্থা যে দিন দিনই অতিশয় হীন হইয়া পড়িতেছে, তাহাও কাহার অজ্ঞাত নহে। ইহার প্রকৃত কারণ নির্ণয় করিতে হইলে, প্রথমতঃ কৃষিশিক্ষার অভাবের কথাই আমাদের মনে পড়ে। কৃষিশিক্ষার সুব্যবস্থার ফলে, আমেরিকা এবং জাপান প্রভৃতি দেশের কৃষির বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে। কৃষিশিক্ষার সুব্যবস্থা করিতে পারিলে, এ দেশের কৃষিরও যে সর্ব্ববিধ উন্নতি ঘটিতে পারে, তাহা নিঃসন্দেহেই বলা যায়।

আমাদের দেশের কৃষকসন্তানেরা বাল্যকাল হইতেই বয়োবৃদ্ধদিগের সহিত জমি-পরীক্ষা, হালচাষ, বীজবপন ও রোপণ, নিড়ান, জলসেচন, সার প্রদান, কীটাদির উপদ্রব নিবারণ এবং শস্য-সংগ্রহ করিতে করিতেই ক্রমে ক্রমে কৃষকগুলি ধারণা ও কৃষিসম্বন্ধে নানাপ্রকার অভিজ্ঞতা লাভ করিত। এই অভিজ্ঞতা, খনার বচন, প্রবাদবাক্য এবং কুল-ক্রমাগত প্রথাসুসারেই, চাষার নেশা লইয়া, ইহারা কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইত। সুতরাং, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি শস্যের কোনরূপ ক্ষতি উপস্থিত না হইলে, তাহারা কখনও সুফললাভে বঞ্চিত হইত না। এ দেশের কৃষকসন্তানেরা হাতে-হেতেড়ে চাষ-বাস করিবার সঙ্গে সঙ্গেই, দেখিয়া শুনিয়া কৃষিশিক্ষা করিতে পারিত এবং করিত। বয়োবৃদ্ধদিগের অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়া ও তাহা ভালরূপে বুঝিয়া চাষ-বাস করিত বলিয়াই, এ দেশের কৃষকসন্তানেরা সোণা ফলাইতে পারিত। কিন্তু এক্ষণ নানা কারণে, কৃষকসন্তানদিগেরও আর পূর্ব্বের ন্যায় চাষের নেশা নাই; তাহাদেরও অনেকে এক্ষণ হালের মুঠি ধরা অপমানজনক মনে করে। ফলে, এ দেশের কৃষির ক্রমাবনতিই ঘটিতেছে। এই জন্যই বৈজ্ঞানিক চাষ-বাস-প্রণালী শিক্ষার কথা উঠিয়াছে, এবং কৃষিশিক্ষা অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

এ দেশের কৃষকদিগের মধ্যে কৃষি-শিক্ষার বিস্তার করিতে হইলে, প্রথমতঃ কৃষকসন্তানদিগকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে এবং প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গেই, কৃষকসন্তানদিগের কৃষিকার্য্যে অনুরাগের সৃষ্টি করিতে হইবে। বাল্যকাল হইতেই যে কার্য্যে অনুরাগ জন্মে না, বয়োবৃদ্ধিতে সেই কার্য্যে সাফল্যলাভ সম্ভবপর নহে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কি প্রণালীতে শিক্ষা প্রদান করিলে কৃষিশিক্ষার উদ্দেশ্য সম্যক্ সাধিত হইতে পারে, 'বিদ্যালয়ে উদ্ভিদ-পরিচর্য্যা' নামক প্রবন্ধেই তাহার বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। অনুসন্ধিৎসু পাঠক তাহা একবার পাঠ করিতে পারেন। অপ্রাসঙ্গিক বোধে, এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখ করিব না সত্য, কিন্তু প্রাথমিক কৃষিশিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে দু'একটি কথা বলিব। কারণ, প্রাথমিক কৃষি-শিক্ষার উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিলে, উচ্চবিদ্যালয়ে কৃষি-শিক্ষার উদ্দেশ্যও সহজে বুঝিতে পারা যাইবে না।

অধুনা পাশ্চাত্য-জাতির ধারণা, প্রাকৃতিক শিক্ষাই (Nature study) প্রকৃত প্রাথমিক শিক্ষা। এই প্রাথমিক শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য এই যে, এতদ্দ্বারা বালকবালিকাগণ জীবনের প্রারম্ভেই প্রকৃতির সহিত মনুষ্যের কি বিশেষ ঘনিষ্টসম্বন্ধ বর্ত্তমান রহিয়াছে, তৎসম্বন্ধে একটা মোটামোটি জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হয়। অধিকন্তু, প্রাকৃতিক শিক্ষায় বালকবালিকাদিগকে ভবিষ্যৎ-জীবন-গঠনে কর্ত্তব্যপরায়ণ ও লক্ষ্যপথবর্ত্তী করাইয়া দেয়। কৃষিশিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য, কৃষকসন্তানদিগকে কেবল চাষ-বাসে অনুরক্ত করিয়া তোলা নহে; বাহাতে বালক-বালিকাগণ স্বভাবজাত নানাবিধ চাক্ষুষ দেখিয়া-শুনিয়া প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিতে পারে, এবং তদ্দ্বারা ভাবী-জীবনে, বিজ্ঞান-চর্চ্চা, ব্যবসায়, বাণিজ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে এক মহান আদর্শের অনুসরণ করিয়া, প্রকৃত মানুষের ন্যায় সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে, ইহাই কৃষি বা প্রাকৃতিক শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য। প্রকৃতির জ্ঞানভাণ্ডারে জ্ঞান আহরণ করাই শিশু-জীবনের সহজ বা প্রকৃত শিক্ষা। ইহা হইতে তাহারা প্রাত্যহিক সাধারণ বিষয়সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারে; এবং পরবর্ত্তীকালে এই প্রাথমিক শিক্ষাই তাহাদের ভবিষ্যৎ-জীবনের কেন্দ্রীভূত-শক্তি হইয়া দাঁড়ায়। কৃষি-শিক্ষা হইতে বালকবালিকারা যে কেবল পোকা, পাখী, আগাছা, বৃক্ষলতা, মৃত্তিকা প্রভৃতি সাধারণ কৃষিসম্বন্ধে নানাবিধ শিক্ষালাভ করিবে, তাহা নহে; এই প্রাথমিক বৃক্ষ-লতার শিক্ষার বা প্রকৃতি-পাঠে তাহাদের উচ্চ প্রাণীতত্ত্ব (Biology), উদ্ভিদতত্ত্ব (Botany) প্রভৃতি শিক্ষার পথও সুগম করিয়া দিবে। ইহাতে অর্থনীতি (Economy) শিক্ষারও সুযোগ প্রদান করিবে। বিদ্যালয়ের অন্যান্য কার্য্যের (পাঠ, ক্রীড়া, ব্যায়াম প্রভৃতি) অনুরূপ, বিদ্যালয়-সংশ্লিষ্ট বাগানের কাজও দৈনিক-কার্য্যের অন্তর্ভূত করিতে পারিলে, এই কাজে বালকবালিকারা যে কেবল একটুখানি আমোদ উপভোগ করে, তাহা নহে; ইহাতে তাহাদিগকে স্বহস্তে কার্য্যনির্ব্বাহের ক্ষমতা এবং ব্যক্তিগত দায়িত্ব শিক্ষা দিয়া থাকে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বালকবালিকাদিগকে প্রাকৃতিক শিক্ষা (Nature study) দেওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য, তাহাদের অন্তর্নিহিত-শক্তির বিকাশকরণ এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ। শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীর নিকট নিত্য-ব্যবহার্য্য জিনিষের নাম ও উৎপত্তি স্থান, জন্মবৃত্তান্ত এবং উপকারিতার বিষয় গল্পের মত শুনিতে শুনিতে বালক-বালিকারা তৎসম্বন্ধে একটা সাধারণ জ্ঞানলাভ করিতে পারে। বিশেষতঃ, প্রাকৃতিক শিক্ষাই কৃষিশিক্ষার প্রথম সোপান। এমন কি, ভবিষ্যৎ-জীবনে বালকবালিকাগণ জীবিকার্জ্জনের যে কোন পথই অবলম্বন করুক না কেন, এই প্রাকৃতিক শিক্ষা তাহার পক্ষে অপরিহার্য্য। মানবীয় কর্ম্মের যতগুলি ক্ষেত্র দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে একমাত্র কৃষি-বিজ্ঞান ব্যতীত আর কোনটিতেই ছাত্রের নৈতিক-উৎকর্ষসাধনের জন্য অত্যধিক সুযোগ ও উপকরণ পাওয়া যায় না। প্রাথমিক কৃষিশিক্ষায় বালকবালিকাগণের কৃষিকার্য্যোৎপন্ন ফল-শস্যাদির প্রতি, বিশেষতঃ গ্রাম্য-জীবনের উপর, একটা আসক্তি জন্মে; এবং এই শিক্ষায় তাহাদিগকে প্রকৃতি, প্রাকৃতিক নিয়ম ও পল্লীসমাজের সহিত সুখসম্বন্ধ স্থাপনপূর্ব্বক জীবনযাপনে যোগ্যতা প্রদান করে। তদ্ভিন্ন, সাংসারিক নানাবিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়া, তাহারা ভবিষ্যৎ-জীবনের কর্ত্তব্য অনায়াসে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়। এমন কি, এই সাধারণ কৃষি-শিক্ষা বা প্রকৃতি-শিক্ষা ক্রমশঃ তাহাদের প্রাণে মৌলিক গবেষণার ভাব জাগাইয়া দেয়; এবং তাহাদিগকে সত্যানুসন্ধিৎসায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলে। প্রাথমিক কৃষিশিক্ষার সামান্য জ্ঞানই ভবিষ্যতে তাহাদের পক্ষে উচ্চবিদ্যালয়ে কৃষিশিক্ষার ভিত্তিস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়।

আমাদের দেশের অনেকেরই দৃঢ় বিশ্বাস যে, কৃষিশিক্ষা করিলে ভদ্রসন্তানেরা চাষা হইয়া যাইবে। কিন্তু তাহাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক। কারণ, কৃষিশিক্ষা প্রকৃতই বিজ্ঞান-শিক্ষা। রত্নপ্রসূ বসুন্ধরা হইতে নানারূপ বৈজ্ঞানিক-প্রণালী অবলম্বনে, যাহাতে সহজে ও স্বল্পব্যয়ে, প্রচুরপরিমাণ ফল-শস্যাদি উৎপন্ন করিতে এবং তদ্দ্বারা যথেষ্ট খাদ্য-সংস্থানের ও অর্থাগমের পথ উন্মুক্ত বা সুগম করিতে পারা যায়, তদুপায় বিধান করাই পাশ্চাত্য-জগতের কৃষিবিজ্ঞান-শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য। এতদ্ব্যতীত, কৃষি-শিক্ষা শিল্প-বিজ্ঞান-শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গস্বরূপ। বর্ত্তমানে আমাদের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধন করিতে হইলে, শিল্পবিজ্ঞানও শিক্ষা করিতে হইবে। শিল্পবিজ্ঞানের উন্নতি না ঘটিলে ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার ঘটিবে না; অধিকন্তু, কৃষিজাত-দ্রব্যেরও সদ্ব্যবহার করা অসম্ভব হইয়া পড়িবে। দেশের অন্ন-সমস্যা সমাধানের জন্য কৃষি এবং অর্থ-সমস্যা সমাধানের জন্য শিল্প-বিজ্ঞান শিক্ষা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে, কৃষি-শিক্ষা ব্যতীত শিল্প-বিজ্ঞান-শিক্ষা সম্ভবপর নহে; বিশেষতঃ, কৃষির উন্নতি না ঘটিলে শিল্পবিজ্ঞানের উন্নতিও দুরাশা মাত্র। সুতরাং, আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থার যে, কৃষিশিক্ষার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহেই বলা যায়।

প্রকৃত কৃষিশিক্ষা বা কৃষিবিজ্ঞানশিক্ষা আমাদের দেশের যুবকগণকে যে কেবল উন্নত ব্যবসায়ী বা অর্থশালী কৃষক গড়িয়া তুলিবে, এমন নহে; বস্তুতঃ, তদ্দ্বারা তাহারা পরের দাসত্ব ব্যতিরেকেও স্বাধীনভাবে জীবিকার্জ্জনের উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া লইতে এবং প্রকৃতির সেবকরূপে স্বীয় স্বীয় শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক উৎকর্ষ লাভ করিতেও সমর্থ হইবে। বৈজ্ঞানিক কৃষিশিক্ষার ফলে, তাহারা কৃষিশিক্ষার প্রকৃত মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে এবং আমাদের রত্নপ্রসূ

ভারতভূমির বিষয় স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে অবসর পাইবে। কৃষি-শিক্ষার দ্বারা সহজেই স্বদেশপ্রীতি ও আত্মদৃষ্টি জন্মে। তদ্ভিন্ন, ইহাতে মানুষকে প্রকৃত মানুষই গড়িয়া তোলে। কৃষি পুণ্য ও পবিত্রতামর কার্য্য; সুতরাং ইহাতে সংশিপ্ত রহিতে পারিলে ধর্ম্মবুদ্ধি সহজেই জাগ্রত হয়, এবং অভাবে স্বভাব নষ্ট করিতে পারে না। এইরূপ কৃষিশিক্ষা করিতে হইলে, উচ্চবিদ্যালয়েও কৃষিশিক্ষার ব্যবস্থা থাকা একান্ত কর্ত্তব্য।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উচ্চকৃষি বা কৃষি-বিজ্ঞান শিক্ষালাভ করা সম্ভবপর নহে। এই জন্যই উচ্চবিদ্যালয়েই উচ্চ-কৃষিশিক্ষা লাভ করিতে হইবে। উচ্চ কৃষিশিক্ষা করিতে পারিলে যে কেবল সাধারণ-কৃষি, ঔদ্যানিক-কৃষি অথবা পশু-পক্ষীপালন প্রভৃতি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতে হইবে, তাহা নহে; তদ্দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে এ দেশের কৃষক-সম্প্রদায়ের এবং পরোক্ষভাবে দেশবাসীর মহদুপকার সাধন করা যাইতে পারে। এ দেশে কৃষিশিক্ষাদাতার বিশেষ অভাব রহিয়াছে; সুতরাং শিক্ষিত যুবকগণকেই সেই অভাব পূরণ করিতে হইবে। ঐ অভাব পূরণ করিতে হইলে, শিক্ষিত যুবকদিগেরও কৃষিশিক্ষার প্রয়োজন; এবং উচ্চবিদ্যালয়েই কৃষিশিক্ষালাভ করিতে হইবে। কৃষক-দিগের আদর্শস্থলবর্ত্তী হইয়া, তাহাদিগকে সুপ্রণালীতে চাষ-বাস শিক্ষা দিতে এবং কৃষির প্রতি তাহাদের হৃদয়ে পূর্ব্বের ন্যায় অনুরাগ জন্মাইতে না পারিলে, এ দেশের কৃষক ও কৃষির দুরবস্থা কখনও দূর হইবে না—হইতেও পারে না। কৃষকদিগের আদর্শস্থলবর্ত্তীরূপে এ দেশের শিক্ষিত যুবক-গণকেই দণ্ডায়মান হইতে হইবে। এই কার্য্যের জন্যও তাহাদের কৃষিশিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন; এবং তাহাদিগকে বৈজ্ঞানিক কৃষিই শিক্ষালাভ করিতে হইবে। উচ্চবিদ্যালয়ে কৃষি-শিক্ষার সুব্যবস্থা না রহিলে, দুই দশ জন বিদেশ হইতে কৃষিশিক্ষা করিয়া আসিলে, বা এ দেশের কৃষি-কলেজে কৃষিবিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া বাহির হইলে, তাহাদের দ্বারা বিশাল ভারতবর্ষের কৃষিশিক্ষাদাতার অভাব আংশিকও পূরণ হইবে কিনা সন্দেহ। মার্কিণ—যুক্তরাজ্যের উচ্চবিদ্যালয়সমূহে বৈজ্ঞানিক কৃষি-শিক্ষার সুব্যবস্থা রহিয়াছে। ফলে, তথাকার শিক্ষিত ছাত্রমাত্রেই কৃষক-দিগকে চাষ-বাসসম্বন্ধে অবশ্যজ্ঞাতব্য তথ্যসমূহ বুঝাইয়া দিতে পারে। কৃষিবিষয়ে মার্কিণ যে জগতের শীর্ষস্থানাধিকার করিয়াছে, উচ্চবিদ্যালয়ের কৃষিশিক্ষাই তাহার মুখ্যকারণ। উচ্চবিদ্যালয়ে কৃষিশিক্ষার উদ্দেশ্য কেবল হাতে-হেতেড়ে চাষ-বাস করা নহে; উহার প্রকৃত উদ্দেশ্য, দেশের কৃষক-সমাজে কৃষি-বিজ্ঞান-প্রচারের সহায়তা করা।

উচ্চবিদ্যালয়ে কৃষি-শিক্ষা বিধেয় কিনা।

উচ্চবিদ্যালয়ে কৃষি বা কৃষি-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া বিধেয় কিনা, এবং আমরা আমাদের যুবকদিগকে উচ্চবিদ্যালয়ে কৃষিশিক্ষা প্রদান করিব কেন;—এইরূপ নানা প্রশ্নই অনেকের মনে উদয় হইতে পারে। কিন্তু এই প্রশ্নের সমাধান করিতে হইলে, সর্ব্বপ্রথমেই আমাদিগকে আমাদের আর্থিক অবস্থার বিষয় (Economics) ভালরূপে চিন্তা করিতে হইবে। ইহা বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন যে, শিল্প ও বাণিজ্য একমাত্র কৃষির উপরই নির্ভর করে; এবং ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শিল্পজাত-দ্রব্যই অর্থাগমের মূলভিত্তি। সুতরাং, কৃষিকে অর্থাগমের একমাত্র প্রধান উপায় বলা যায়। কৃষি-প্রাণ ভারতের পক্ষে এ কথাটি সর্ব্বথা প্রযোজ্য। কিন্তু বড়ই দুঃখের ও আশ্চর্য্যের বিষয়, নানা কারণে, এ দেশে কৃষিবৃত্তি বিড়ম্বিত এবং কৃষক-সমাজ পর্য্যুদস্ত। আমাদের দেশ 'সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা' ও কৃষি-প্রধান। অথচ, এ দেশে কৃষিশিক্ষার কোনই ব্যবস্থা নাই। সম্ভবতঃ, আমরা ইহার আবশ্যকতা বা উপকারিতাও বুঝিতে পারি না। আমরা 'নবাব' করি—লক্ষ্মীপূজায় নব-শস্যের পূজা করিয়া থাকি; কিন্তু দেশের ভাবী ভরসাস্থল ছাত্রসমাজে কৃষি-শিক্ষা-বিস্তারের ব্যবস্থা-বিধানে উদাসীন! এ বিসদৃশ ব্যবহার কারণ কি? যে কৃষি আমাদের অশন-বসন যোগায়, যে কৃষি আমাদের শ্রমশিল্প বা পণ্যসম্ভারের জন্মদাতা, যে কৃষির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভারত একদিন জ্ঞানে-গুণে, বিদ্যা-বুদ্ধিতে, অর্থে-সামর্থ্যে এবং ধর্ম্মে-কর্ম্মে জগতের শীর্ষস্থানাধিকার করিয়াছিল, যে কৃষি-কার্য্যে সংশিপ্ত রহিয়াই আমরা আর্য্যনামে গৌরবান্বিত হইতে পারিয়াছি, সেই কৃষি-বৃত্তিতে আমাদের বিজাতীয় ঘৃণা কেন? যে কারণেই ইহা ঘটিয়া থাকুক, আমাদের পক্ষে ইহা প্রশংসনীয় নহে। অধিকন্তু, বৈশ্যবৃত্তি কৃষিতে ঘৃণা করিতে গিয়া, দেশের দশেই চাকরি করিতে শিখিয়াছে—শূদ্রবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছে। আজকাল অনেক বাবু কৃষকদিগকে 'চাষা' নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। এ বাবুযুগে চাষা বলিতেই ভদ্রসমাজ-বিচ্যুত এক অতি নীচ-সম্প্রদায় বুঝায়। এই জন্যই কোনও ভদ্রলোককে চাষা বলিলে গালি দেওয়া হয়। চাষা ও চাষের প্রতি এত ঘৃণা বলিয়াই তো অনেক বাবুরই পেটে ভাত নাই—সারাজীবন অভাব ঘোচে না! বাবুরা পেটের দায়ে, আজীবন পরের চাকরি করা উপলক্ষে, প্রাণান্তকর পরিশ্রমপূর্ব্বক অনাহারে বা অর্দ্ধাহারেই জীবনপাতও শ্রেয়ঃ মনে করেন; তথাপি, স্বাধীনভাবে চাষ করিয়া মহাসুখে কালাতিপাত করিতে পারিলেও, 'চাষা' হইবার ভয়ে, কেহই চাষের পক্ষপাতী নহেন!! শূদ্রবৃত্তি অবলম্বন করিয়াও, যাঁহারা বৈশ্যবৃত্তিতে ঘৃণা প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তি কতদূর তীক্ষ্ণ, তাহাই বিচার্য্য! এ দেশের মুষ্টিমেয় বাবুর উপেক্ষায় কৃষির শোচনীয় ক্রমাবনতি ঘটে নাই সত্য, কিন্তু তাঁহারা চাষা কথা গালি বুঝাইয়া দিয়াই, এ দেশের সর্ব্বনাশসাধনের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন। এক্ষণ, এ দেশের কৃষকসন্তানেরাও বাবুদের আদর্শানুকরণে বাবু সাজিয়া, চাষানাম ঘুচাইয়া—চাষ-বাস ছাড়িয়া 'বাবু' হইয়া উঠিতেছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যৎকিঞ্চিৎ লেখাপড়া শিখিয়াই, তাহারা চাকরির জন্য লালায়িত হইয়া পড়িতেছে—হালের মুঠি ধরা অপমানজনক মনে করিতেছে। মোটকথা, বিলাসিতাই এ দেশের কৃষক-সন্তানদিগের চাষের নেশা দূর করিয়া দিয়াছে। ফলে, তাহারা ক্রমশঃই চাষ-বাসও ভুলিয়া যাইতেছে, এবং নির্ধন ও নিরন্ন হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের কুশিক্ষার ফলেই, এ দেশের কৃষক অন্নের কাঙ্গাল হইয়া পড়িয়াছে; এবং তাহাতে দেশব্যাপী অন্নসমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। কৃষির ক্রমাবনতির সঙ্গে সঙ্গে এ দেশের অর্থ-সমস্যাও ভীষণভাব ধারণ করিয়াছে।

"বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস।
তাহার অর্দ্ধেক চাষ॥"

এই মহাবাক্যটি সকল দেশের পক্ষে খাটিলেও, এ কৃষি-প্রাণ-দেশের পক্ষে একমাত্র কৃষিতেই লক্ষ্মীর বাস স্বীকার করিতে হইবে। কৃষি দ্বারা দেশ ধনধান্যে পূর্ণ করিতে না পারিলে, এ দেশবাসীর পক্ষে বাণিজ্য করিয়া উন্নতিলাভের আশা সুদূরপরাহত বলিয়াই মনে হয়। বাণিজ্য-কর্ম্মোপযোগী অর্থহীন এ দেশবাসীর কৃষি ভিন্ন গত্যন্তর নাই। সুতরাং, এ দেশের অর্থ-সমস্যা ও অন্ন-সমস্যার সমাধান করিতে হইলে, এক্ষণ আর কৃষির প্রতি উপেক্ষা করিলে চলিবে না। বর্ত্তমানসময়ে চাকরিরও যে কিরূপ ভীষণ দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নহে। শূদ্রবৃত্তি চাকরির অভাবে, আজকাল অনেক শিক্ষিত ভদ্রসন্তানেরই বৈশ্যবৃত্তি কৃষির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু কৃষিবিষয়ে অজ্ঞতানিবন্ধন, বলবতী বাসনাসত্ত্বেও তাহারা কৃষিকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে পারিতেছে না। মার্কিণের ন্যায়, আমাদের দেশের নিম্ন ও উচ্চ বিদ্যালয়সমূহে কৃষিশিক্ষার সুব্যবস্থা থাকিলে, এ দেশের শিক্ষিত যুবকদিগকে পেটের দায়ে চুরি-চামারি করিতে হইত না। দেশের বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় স্থিরচিত্তে চিন্তা করিলে, উচ্চবিদ্যালয়ে কৃষি-শিক্ষা বিধেয় কিনা, তাহা সহজেই উপলব্ধি হইবে। ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বেও, উচ্চবিদ্যালয়ে কৃষি-শিক্ষার আবশ্যকতার বিষয় বুঝাইতে হইলে, বিশেষ বাগ্মিতা এবং যুক্তিসঙ্গতির আবশ্যক হইত। কিন্তু এক্ষণ অভাবের তাড়নায়, এবং উদরপূর্ত্তির ব্যবস্থা করিতে গিয়া, বাধ্য হইয়াই কৃষিশিক্ষার কথা ভাবিতে ও বুঝিতে হইতেছে। শিক্ষার অভাবে, এবং শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের কৃষি ও কৃষকের প্রতি উপেক্ষার ফলেই, এ দেশের কৃষির ক্রমাবনতি ঘটিয়াছে। ফলে, কৃষকেরাও নির্ধন ও নিরন্ন হইয়া পড়িয়াছে। পক্ষান্তরে, পাশ্চাত্য-জগতে কৃষকগণই প্রকৃত অর্থশালী এবং তাহারাই জাতীয় উন্নতিলাভের প্রধান কারণ। মার্কিণের কৃষকেরা শিক্ষিত বলিয়াই, তাহাদের আত্মসম্মানবোধ এবং তাহাদেই ফলস্বরূপ সর্ব্বতোভাবে আত্মোন্নতির চেষ্টা বিশেষভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাহারা মনে করে,—তাহারা দেশের মেরুদণ্ডস্বরূপ; তাহাদের উন্নতি বা অবনতিতে দেশের উন্নতি বা অবনতি সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। এইরূপ দৃঢ়

বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই তাহারা যথাসাধ্য আপনাদের ও আপনাদের সন্ততিবর্গের উন্নতিসাধনের নিমিত্ত চেষ্টা করে; আবার মার্কিণের শিক্ষিত-সম্প্রদায়ও কৃষকদিগের কৃষি-শিক্ষার পথ সুগম করিয়া দিতে সততই সচেষ্ট রহিয়াছেন। তদ্ভিন্ন, শিক্ষিত কৃষিতত্ত্ববিদগণ গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া, কৃষকদিগের গ্রাম্য সভা-সমিতিতে বক্তৃতাও প্রদান করিয়া থাকেন। অধিকন্তু, তথাকার নিম্ন ও উচ্চ বিদ্যালয়সমূহেও কৃষিশিক্ষার যথোচিত সুবন্দোবস্ত রহিয়াছে। এই সকল কারণেই মার্কিণের কৃষক সভ্যজগতে কৃষিবিষয়ে শীর্ষস্থানাধিকার এবং অনন্যসাধারণ উন্নতিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। যতদিন আমরাও আমেরিকার অনুকরণে আমাদের দেশের কৃষকদিগকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে না পারিব, এবং শিক্ষিত ভদ্রসন্তানেরা হাতে-হেতেড়ে চাষ-বাসে সংলিপ্ত রহিয়া, কৃষকদিগের আদর্শ শিক্ষাদাতার স্থলবর্ত্তী হইতে না পারিবেন, ততদিন পর্য্যন্ত আমাদের দেশের কৃষির ও কৃষকের উন্নতিসাধন সম্ভবপর হইবে না,—হইতেও পারে না।

আমাদের দেশের শিক্ষার বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, অধিকাংশ যুবকই উচ্চবিদ্যালয়ে তাহাদের পাঠ সমাপন করিতে বাধ্য হয়। এমন কি, অনেকের পক্ষে প্রবেশিকা-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াও ঘটিয়া উঠে না। এই সকল যুবকেরা বিদ্যালয় ছাড়িয়া, দেশের বর্ত্তমান অবস্থায়, স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণ করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ হইয়া থাকে। কৃষি অথবা ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্বন্ধে কোনরূপ অভিজ্ঞতা না থাকায়, একমাত্র চাকরিই ইহাদের ভরসাস্থল হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু উচ্চশিক্ষার অভাববশতঃ, তাহাদের অনেকে, সামান্য চাকরিও, অনেকসময়, যোগাড় করিয়া লইতে পারে না। সুতরাং, তাহারা বাধ্য হইয়াই অশেষ দুর্গতি ভোগ করিয়া থাকে; এবং অনেকসময় অর্থের নিমিত্ত আপনার মনুষ্যত্বও তুচ্ছবোধ করে! কিন্তু তথাপি, তাহারা যথোচিতভাবে অন্নের সংস্থান করিয়া উঠিতে পারে না। মার্কিণের অনুকরণে, আমাদের এ কৃষি-প্রাণ-দেশের নিম্ন ও উচ্চ বিদ্যালয়ে যদি কৃষিশিক্ষার সুব্যবস্থা থাকিত, তাহা হইলে দেশের ভাবী ভরসাস্থল যুবকবৃন্দ পাঠত্যাগের পর, অনায়াসেই আপনার কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণ করিয়া, স্বাধীনভাবে কৃষিকার্য্যে লিপ্ত রহিতে পারিত। সুতরাং, তাহাদিগকে আর সুপারীস-পত্র হাতে করিয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতে, রক্তশোষী-চিন্তায় বৃথা আয়ুক্ষয় করিতে কিম্বা মনুষ্যত্বহীন হইয়া—চুরি-চামারি করিয়াও অশেষ দুর্গতি ভোগ করিতে হইত না। বলা বাহুল্য, সকলেই যে চাকরির মায়া ভুলিয়া কৃষি করিবেন, তাহা নহে। তবে যাহাদের সামান্য চাকরিও যোটে না, কৃষিতে তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য একটা নূতন পন্থা হইত। দেশের কতকগুলি যুবক যদি কৃষিকার্য্যে সংলিপ্ত রহে, তাহা হইলে (১) চাকরি ব্যতীতও জীবিকানির্ব্বাহের একটা পথ হয়; (২) শিক্ষিত ভদ্রসন্তানের আদর্শে এ দেশের অশিক্ষিত কৃষকেরাও সহজেই উন্নত-প্রণালীতে চাষ-বাস শিক্ষা করিতে পারে; (৩) কৃষক-সন্তানদিগের চাষা নাম ঘুচাইয়া বাবু সাজিবার বলবতী বাসনা দূর হয়, সুতরাং তাহারা আপনাদের ভুল বুঝিতে পারে বলিয়া চাষের নেশা লইয়াই চাষ-বাসে প্রবৃত্ত হইতে পারে; (৪) এ দেশের শিক্ষিত-সম্প্রদায়েরও চাষার ও চাষের প্রতি অযথা ঘৃণার ভাব দূর হয়, ফলে 'চাষা' কথায় আর গালি বুঝায় না; এবং (৫) চাকরির উমেদারের সংখ্যা কমিয়া যাওয়াতে, অনেকের ভাগ্যেই চাকরি যোটে—প্রধানতঃ, এই পঞ্চবিধ প্রকারেই দেশের মঙ্গল সাধিত হইতে পারে। তদ্ভিন্ন, যে সকল উচ্চশিক্ষিত যুবক হাতে-হেতেড়ে কৃষিকার্য্যে সংলিপ্ত না রহিবেন, তাঁহারাও দেশের কৃষির উন্নতিবিষয়ে চিন্তা করিবার প্রকৃত সুযোগ প্রাপ্ত হইবেন; এবং তাঁহারাও অবসরমত, বক্তৃতা বা উপদেশ প্রদান করিয়া, কৃষকদিগের প্রভূত হিতসাধন করিতে সমর্থ হইবেন। বিদ্যালয়ে কৃষিশিক্ষার সুব্যবস্থা রহিলে, শিক্ষিতব্যক্তিমাত্রেই যে কৃষিবিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিবেন, তাহা নিঃসন্দেহেই বলা যাইতে পারে। সুতরাং, তাহাদের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে এ দেশের কৃষকদিগের বিশেষ কোনও উপকার না হইলেও, পরোক্ষভাবে তাঁহারা কৃষকদিগের নানাপ্রকার হিতসাধন করিতে পারিবেন। বিশেষতঃ, কৃষি-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই, তাঁহারা স্বদেশ চিনিতে বা দেশের অবস্থা সম্যকরূপে বুঝিতে পারিবেন। ইহাতেও দেশের

প্রভূত মঙ্গল ঘটিবে। সুতরাং, বিদ্যালয়ে কৃষি-শিক্ষা যে কিরূপ অত্যাবশ্যক, তাহা আর বুঝাইয়া বলিতে হইবে কি?

মার্কিণ-বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ কৃষিকার্য্যের উন্নতি ও বিস্তারের উপর লক্ষ্য রাখিয়াই, তথাকার বিদ্যালয়সমূহে কৃষিশিক্ষার প্রবর্ত্তনা করিয়াছেন। এই সুব্যবস্থার ফলেই, যে মার্কিণের ভূমি বঙ্গদেশের তুলনায় অনুর্ব্বরা এবং জল-বায়ু ও অন্যান্য নৈসর্গিক অবস্থাও অনুকূল নহে, সেই মার্কিণ-দেশের কৃষকগণ কৃষিবিষয়ে সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। মার্কিণের কৃষকগণ, শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের সহায়তায় এবং অদম্য অধ্যবসায়ের ফলে ও নানারূপ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ-বাস করিয়া, প্রভূত অর্থ ও সম্মানলাভ করিতে পারিয়াছে। মার্কিণ-কৃষকের উন্নতির কথা স্থিরভাবে চিন্তা করিলে, এবং এ দেশের কৃষি ও কৃষকের বর্ত্তমান অবস্থা ও কৃষি-শিল্পাদির ক্রমাবনতি বা উহার বিস্মৃতির বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে, এ দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই বিদ্যালয়ে কৃষিশিক্ষা দেওয়া যে অবশ্যকর্ত্তব্য, তাহা সহজেই বেশ বুঝিতে পারিবেন। পেটের দায়, সকলের চেয়ে বড় দায়। এ দায়ে না পড়িলে মানুষের কর্ত্তব্যবুদ্ধি জাগ্রত হয় না; এবং 'করি কি'—এই ভাবনা উপস্থিত না হইলে, মানুষ আপনার দোষ-ক্রটীও সহজে উপলব্ধি করিতে পারে না। বস্তুতঃ, প্রকৃত অভাববোধ না জন্মিলে, অভাব দূর করিবার বলবতী বাসনাও হয় না। আমাদের অন্ন-সমস্যাই অভাববোধ জন্মাইয়া দিতেছে; সুতরাং, অভাব দূর করিবার জন্য একটা আগ্রহের ভাবও ধীরে ধীরে সমগ্র দেশব্যাপিয়া জাগিয়া উঠিতেছে। এই জন্যই মার্কিণের অনুকরণে, এ দেশের বিদ্যালয়সমূহেও যাহাতে কৃষি-শিক্ষার সুব্যবস্থা হয়, কেহ কেহ তজ্জন্যও চেষ্টিত হইয়াছেন। কিন্তু বিদ্যালয়ে কৃষি-শিক্ষার আবশ্যকতা কি, তাহা আজিও আমাদের স্বদেশবাসীরা সম্যকরূপে বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাই তাহারা কৃষি-প্রাণ-দেশের অধিবাসী হইয়াও, কৃষি-কথা একবার ভুলেও চিন্তা করেন না! যাহা হউক, বিদ্যালয়ে কৃষিশিক্ষার সুব্যবস্থা না হইলে, এবং কৃষকদিগকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে না পারিলে, এ দেশের কৃষির বা কৃষকের উন্নতিলাভ সুদূর-পরাহত বলিয়াই মনে হয়। এ দেশের কৃষির ও কৃষকের উন্নতিসাধনের নিমিত্ত যত চেষ্টাই করা হউক না কেন, বিদ্যালয়ে কৃষিশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে না পারিলে, কিছুতেই সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধন সম্ভবপর হইবে না—হইতেও পারে না।

আমাদের দেশের কৃষকদিগের অনুন্নতির প্রধান কারণ—তাহাদের শিক্ষার অভাব এবং তাহারই ফলস্বরূপ অজ্ঞতা ও কুসংস্কার। এই অজ্ঞতা শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের সাহায্য ব্যতীত বিদূরীত হইতে পারে না। কিন্তু এ দেশের শিক্ষিত-সম্প্রদায়ও কৃষিবিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ; সুতরাং, তাঁহাদের দ্বারা কৃষকেরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে বিন্দু-মাত্রও উপকৃত হইতে পারিতেছে না। কৃষকদিগের উপকার করা, আর অন্ন-সমস্যার সমাধান বা জীবনরক্ষার উপায়নির্দ্ধারণ করা একই কথা। শিক্ষিত-সম্প্রদায় যদি কৃষকদিগকে সাহায্য করিতে না পারেন, তাহা হইলে কৃষকেরাও অন্নদানে তাহাদিগকে সাহায্য করিতে অসমর্থ হইবে। কিন্তু এক অন্ধ আর এক অন্ধকে শত চেষ্টা করিয়াও পথপ্রদর্শন করিতে পারে না। এই জন্যই শিক্ষিত-সম্প্রদায়কে কৃষিবিষয়ে অজ্ঞ রহিলে চলিবে না,—তাঁহাদিগকে কৃষিবিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতেই হইবে। নিম্ন ও উচ্চ বিদ্যালয়ে কৃষি-শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইলে, কৃষিশিক্ষার জন্য সময় ও অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন হইবে না; অথচ অন্যান্য বিষয়ের সহিত অনায়াসেই প্রত্যেকে কৃষিবিষয়েও যৎকিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিবেন। সুতরাং, তদবস্থায় শিক্ষিতব্যক্তিমাত্রেই অল্পাধিকপরিমাণে কৃষকদিগের উন্নতি-সাধনের চেষ্টা করিতে সমর্থ হইবেন। আমাদের দেশের কৃষক এবং শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনরূপ সংযোগ-সূত্র নাই; শিক্ষিতব্যক্তিরা যতদিন পর্য্যন্ত কৃষিশিক্ষা লাভ করিতে বিরত রহিবেন, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহারা কৃষকদিগের সহিত সম্মিলিত হইতে পারিবেন না। আমাদের দেশের কৃষকসন্তানদিগের মধ্যে যে অত্যল্পসংখ্যক যুবক উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের একজনও কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত রহেন নাই। এ দেশে কৃষি অত্যন্ত ঘৃণনীয় কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হয় বলিয়াই, কৃষকসন্তানেরা উচ্চশিক্ষা দূরে

থাকুক, যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষালাভ করিতে পারিলেও হালের মুঠি ধরা অপমানজনক কার্য্য মনে করেন। ইহার বিষময় ফলেই, আমাদের জাতীয়-জীবনে অশেষ দুর্গতি ঘটিয়াছে। এই দুর্গতি দূর করিতে হইলে, কৃষকদিগের সহিত শিক্ষিত ব্যক্তির সম্মিলন অত্যাবশ্যক। কিন্তু কৃষিশিক্ষা ব্যতীত পরস্পরের সম্মিলন সম্ভবপর নহে। একমাত্র চাকরিকেই বর্ত্তমানসময়ে শিক্ষিতব্যক্তিরা জীবিকার্জ্জনের প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া স্থির করিয়া লইয়াছেন। এই চাকরি উপলক্ষেই উচ্চ-নীচ জাতির যে সম্মিলন ঘটিয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নহে। চাকরি লাভের আশায়, ব্রাহ্মণের ছেলে শূদ্রশিক্ষকের নিকট অধ্যয়ন করিতে এক্ষণ কুণ্ঠিত হ'ন না; ব্রাহ্মণ-সন্তান ব্রাহ্মণেতর—এমন কি, অস্পৃশ্য জাতির সন্তানের সহিত একাসনে বসিয়াও অম্লান-বদনে কার্য্য করিতেছেন। মুসলমানরাজত্বেও এ দৃশ্য বিরল ছিল। কিন্তু ইংরেজরাজত্বে সকল সম্প্রদায়ের সম্মিলন হইল কেন? বলা বাহুল্য, চাকরিই উহার মুখ্যকারণ। একপথের পথিক না হইলে প্রকৃত মিলন সংঘটিত হয় না—হইতেও পারে না। এ দেশের ভদ্রসন্তানেরাও অন্যান্য বিষয়ের সহিত কৃষিশিক্ষা করিতে পারিলে, বর্ত্তমান চাকরির দুর্দ্দিনসময়ে, তাঁহাদের অনেকেই যে কৃষিকার্য্যে আত্ম-নিয়োগ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কৃষি-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, কৃষি উপলক্ষেই, কৃষকদিগের সহিত শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের সম্মিলন ঘটিবে। তাহা না হইলে, জীবন-মরণ-সমস্যার সমাধান ত দূরের কথা, সমাধান-সান্নিধ্যলাভও একরূপ কবি-কল্পনা বলিয়াই মনে হয়।

মার্কিণের নিম্ন ও উচ্চ বিদ্যালয়ে কৃষি-শিক্ষার সুব্যবস্থা রহিয়াছে। ফলে, তথাকার শিক্ষিতব্যক্তিমাত্রেই অল্পাধিক পরিমাণে কৃষিশিক্ষালাভ করিতে পারেন। ইহাতে তাহাদের সাহিত্য, গণিতাদি অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষালাভে বিন্দুমাত্রও ক্ষতি হয় না। সুতরাং, আমেরিকার অনুকরণে, আমাদের দেশেরও নিম্ন ও উচ্চ বিদ্যালয়ে কৃষিশিক্ষা-প্রথা প্রচলিত হইলে, আমাদের দেশের যুবকগণও অন্যান্য বিষয়ের সহিত কৃষি-শিক্ষা করিতে পারিবে। ইহাতে যে কেবল তাহাদের উদরান্নের সংস্থানেরই একটা উপায় হইবে, তাহা নহে; তাহাদের সংস্রবে রহিয়া, এ দেশের কৃষকদিগেরও কৃষিশিক্ষার পথ সুগম হইবে। কৃষিজীবীর উন্নতির সহিত কেবল যে ভূম্যধিকারীর উন্নতিই সম্পৃক্ত রহিয়াছে, তাহা নহে; সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে, সকলের ভাগ্যই ইহার সঙ্গে চিরসম্বন্ধ, তাহা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারেন? ফলকথা, কৃষির উন্নতি-ই কৃষিপ্রাণ-দেশের সর্ব্বপ্রধান স্বার্থ। এই সাধারণ স্বার্থের অনুরোধে, শিক্ষিতব্যক্তিমাত্রেরই সহিত কৃষকদিগের সম্মিলন সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয়।

আমাদের দেশের কৃষকগণ মান্ধাতার আমলের রীতি অবলম্বন করিয়াই চাষ-বাস করিতেছে; তাহাদের চাষ-প্রথার কোনরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। কিন্তু (১) ভূমির উৎপাদিকা-শক্তির হ্রাস, (২) লোকসংখ্যার বৃদ্ধি, এবং (৩) অবাধ রপ্তানি —এই ত্রিবিধ কারণেই একটা বিষম অন্ন-সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং, মান্ধাতার আমলের চাষ-বাস-পদ্ধতির উৎকর্ষসাধনেই এখন আমাদের সমগ্র শক্তি নিয়োগ করা অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। কৃষি ভিন্ন যখন আমাদের গত্যন্তর নাই, তখন কৃষির উন্নতিসাধনে নিশ্চেষ্ট রহিলে বা উপেক্ষা প্রদর্শন করিলে চলিবে কেন? আমাদের দেশের শিক্ষিত-সম্প্রদায়কেও হাতে-হেতেড়ে চাষ-বাসে প্রবৃত্ত হইতে হইবে; এবং বৈজ্ঞানিক উন্নত-প্রণালীতে ফল-শস্যাদির চাষ করিয়া, তাহার ফলাফল কৃষকদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে। কৃষি-পরীক্ষা-লব্ধ জ্ঞানের চাক্ষুষ পরিচয়ে, কৃষককুলও অশিক্ষা-প্রসূত রক্ষণশীলতা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে। পাশ্চাত্য-জগতের কৃষকগণ বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বনে যে, কিরূপে কৃষির উৎকর্ষসাধন করিতে সমর্থ হইয়াছে, এবং তদ্দ্বারা প্রভূত অর্থলাভ করিয়া ধনশালী হইয়া পড়িতেছে, সেই সকল তথ্য আমাদের দেশের শিক্ষিতব্যক্তি ও কৃষকদের নিকট একরূপ অজ্ঞাত। এমন কি, আমাদের দেশের কৃষির যৎকিঞ্চিৎ উৎকর্ষসাধন করিতে পারিলে, আমাদের দেশের কৃষকেরাও যে অন্নের সংস্থান এবং প্রচুর অর্থলাভ করিতে পারে, আমাদের দেশের শিক্ষিত-ভিমানী ব্যক্তির মস্তিষ্কেও সে চিন্তার উদয় হয় নাই। আমাদের দেশে পাটের বীজ উপ্ত হইবার পূর্ব্বেই, বিলাতের

ডাণ্ডি-সহরের পাট-ব্যবসায়ীগণ পাটের দর সুস্থির করিয়া থাকেন। ইহা শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের কৃষির প্রতি ঔদাসীন্য এবং কৃষিতত্ত্বে অনভিজ্ঞতারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কৃষি-প্রাণ-দেশের অধিবাসীদের পক্ষে, ইহা গৌরবের কথা নহে। শিক্ষিতব্যক্তিরা কৃষি-কার্য্যে সংলিপ্ত রহিলে, তাঁহারাও মার্কিণের কৃষকের ন্যায়, কমলা, লেবু, কলা, আনারস, লিচু প্রভৃতি নানাবিধ ফল এবং নানাপ্রকার শস্য প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন করিয়া জগতের নানাস্থানে রপ্তানি করিতে এবং তদ্দ্বারা যথেষ্ট অর্থলাভ করিতে সমর্থ হ'ন। তদ্ভিন্ন, তাঁহারা গ্রাম্য-কৃষিসমিতি, কৃষি-ব্যাঙ্ক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়াও, দেশের ঋণজাল-জড়িত নির্ধন ও নিরক্ষর কৃষককুলের মহদুপকার সাধন করিতে পারেন। বারোয়ারী-প্রথায় দশে মিলিয়া কার্য্য করিবার শক্তি এ দেশের কৃষকদিগের এক্ষণ নাই। শিক্ষিতব্যক্তিরা সমবেতভাবে কার্য্য করিতে পারিলে, তাঁহাদের অনুকরণে, কৃষকেরাও মিলিয়া-মিশিয়া কার্য্য করিতে শিখিবে। তদ্ভিন্ন, তাহারা শিক্ষিতব্যক্তিদিগের নিকট বিভিন্নস্থানের কৃষি-যন্ত্রাদি সন্দর্শন এবং নানাপ্রকার উন্নত-প্রণালীর চাষ-পদ্ধতি শিক্ষা করিয়াও যথেষ্ট উপকৃত হইতে পারিবে। আমাদের দেশের শিক্ষিতব্যক্তিদিগের কৃষিকার্য্যের যথেষ্ট সুযোগ ও সুবিধা সত্ত্বেও যে, তাঁহারা কৃষিতে মনোনিবেশ করিতে পারিতেছেন না, তাহার একমাত্র কারণ, কৃষিবিষয়ে তাঁহাদের অজ্ঞতা। এই অজ্ঞতা দূর করিতে হইলে, বিদ্যালয়ে কৃষিশিক্ষার সুব্যবস্থা হওয়া সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয় ও অত্যাবশ্যক। আমাদের দেশের অধিকাংশ কৃষক-সন্তানই, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠ সমাপন করিয়া, উচ্চ-বিদ্যালয়ে প্রবেশলাভ করিতে পারে না। তাহারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাহা শিক্ষালাভ করে, ভবিষ্যৎ-জীবনে তদ্দ্বারা তাহাদের যৎকিঞ্চিৎ উপকারও সাধিত হয় কিনা সন্দেহ। এমতাবস্থায় আমাদের দেশের প্রাথমিক বা নিম্ন-বিদ্যালয়ে কৃষিশিক্ষার সুবন্দোবস্ত করিতে পারিলে, তাহারা যতটুকু কৃষিশিক্ষা প্রাপ্ত হয়, উহাই তাহাদের ভবিষ্যৎ-জীবনে মহোপকারসাধন করিতে পারে। অনেকে মনে করেন, চাষার ছেলেরা সামান্য লেখাপড়া শিখিলেই বাবু হইয়া উঠে। ইহা কিন্তু সর্ব্বাংশে সত্য নহে। বরোদা-রাজ্যে যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা-আইন প্রচলিত হইয়াছে, তাহা এ দেশের শিক্ষিতব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন। বরোদার কৃষক-সন্তানেরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করিয়া, প্রায় সকলেই কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছে। শিক্ষা-আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে, তথাকার কৃষকসন্তানেরা কৃষি-কার্য্যকে বড় সম্মানের কাজ মনে করিতে পারিত না। কিন্তু এক্ষণ যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষার ফলেও, তাহারা তাহাদের ভ্রান্তি বুঝিতে পারিয়াছে। সুতরাং, আজকাল তাহারা দায়ে ঠেকিয়া, যা-তা করিয়া কৃষি করে না;—চাষার নেশা লইয়াই চাষ-বাসে প্রবৃত্ত হইতেছে। প্রাথমিক বা নিম্ন-বিদ্যালয়ে কৃষিশিক্ষা অত্যাবশ্যক কিনা, বরোদার কৃষক-সন্তানেরাই তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। নিম্ন-বিদ্যালয়ে কৃষিশিক্ষার সুব্যবস্থার ফলে, প্রত্যক্ষভাবে কৃষকসন্তানদিগের বিশেষ উপকার সাধিত হয়; আর উচ্চবিদ্যালয়ে কৃষিশিক্ষার সুব্যবস্থারও পরোক্ষভাবে এ দেশের কৃষকসন্তানেরা উপকৃত হইতে পারে। সুতরাং, দ্বিবিধ প্রকারেই তাহাদের উপকার, অর্থাৎ আমাদেরও জীবনরক্ষার বা অন্ন-সমস্যা সমধানের প্রকৃষ্ট উপায় হইতে পারে।

কৃষিশিক্ষা-বিস্তার না ঘটিলে, কৃষকদিগের ও আমাদিগের দৈন্যদশা ঘুচিবে না—ঘুচিতেও পারে না। মুষ্টিমেয় শিক্ষিত বাবুর সর্ব্ববিধ কল্যাণসাধনের জন্য আমরা এতই ব্যতিব্যস্ত রহিয়াছি যে, দেশের একটা বৃহৎ অংশ—কৃষককুলের কথা আমরা একরূপ ভুলিয়াই গিয়াছি! আমরা স্বদেশী-ব্রতপালনে দীক্ষিত হই সত্য, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, স্বদেশ কি, তাহা আমাদের অধিকাংশেই চিনি না! আমরা যদি স্বদেশ চিনিতাম, স্বদেশের অবস্থা সম্যকরূপে বুঝিতে পারিতাম, তাহা হইলে যে কৃষকদিগকে লইয়াই আমাদের দেশ, সে কৃষকেরা আমাদের অন্নদাতা, যে কৃষকদিগের উন্নতি ও অবনতির উপর আমাদের জাতীয় উন্নতি বা অবনতি সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকে, সেই কৃষকদিগের কথা আমরা ভুলিয়া রহিতে পারিতাম না। আমরা স্বদেশ চিনি না বলিয়াই, আমাদের ও আমাদের কৃষকদিগের বিষম দুর্গতি

ঘটিয়াছে। যাহা হউক, উদরপূর্ত্তির ব্যবস্থা করিতে গিয়াই, আজকাল শিক্ষিতবাবুদিগকেও দেশের কথা ভাবিতে হইতেছে। এই ভাবনার ফলেই, অনেকে ক্রমশঃ স্বদেশ চিনিতে পারিয়াছেন। ফলে, কৃষি ও কৃষকের প্রতিও শিক্ষিতব্যক্তির দৃষ্টি ক্রমেই আকৃষ্ট হইতেছে। ইহা দেশের পক্ষে মঙ্গলপ্রদ সন্দেহ নাই। অধুনা, পল্লী-সমাজ গড়িয়া তুলিতে এবং দেশের স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে অনেকেই বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা ফলবতী হইতেছে না। যতদিন পর্য্যন্ত শিক্ষিত ভদ্র-কৃষকের সংখ্যা অত্যধিক-রূপে বর্দ্ধিত না হইবে, ততদিন দেশের স্বাস্থ্যরক্ষা ও পল্লী-সমাজ-গঠনের সম্বন্ধে চেষ্টাও কার্য্যকর হইবে না—হইতেও পারে না। এই হিসাবেও কৃষিশিক্ষার যথেষ্ট আবশ্যকতা রহিয়াছে। চাকরির মোহ দূর না হইলে, এ দেশের আর কিছুতেই মঙ্গল নাই। এই মোহ দূর করিবার অমোঘ উপায় কৃষি। সুতরাং, আমাদিগকে কৃষি-শিক্ষা করিতেই হইবে। পূর্ব্বে এ দেশের নিম্ন ও উচ্চ বিদ্যালয়ে চিত্র-বিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল না; কিন্তু আজকাল চিত্র-বিদ্যা বাধ্যতামূলকই হইয়াছে। এই চিত্রবিদ্যার জন্য ছাত্রদিগের যে-পড়াশুনার ব্যাঘাত জন্মিয়াছে, তাহা বলা যায় না। এমতাবস্থায়, বিদ্যালয়ে কৃষিশিক্ষার ব্যবস্থা করিলেও বিশেষ কোনরূপ ক্ষতি হইবে না—হইতেও পারে না। অথচ, তাহাতে যে দেশের দশেরই কি মহালাভ হইতে পারে, তাহা ইতঃপূর্ব্বেই বলিয়াছি।

ভারতবাসীর দৈন্যদশা দূর করিবার একমাত্র উপায়, —কৃষি-শিক্ষার বিস্তার। নিম্ন ও উচ্চ বিদ্যালয়ে কৃষি-শিক্ষার সুব্যবস্থা করিতে না পারিলে, অন্য কোনও উপায়েই কৃষি-শিক্ষার বিস্তার সম্ভবপর বলিয়া মনে লয় না। বর্ত্তমান মার্কিণ-রাজ্যের কর্ত্তৃপক্ষগণ নিম্ন ও উচ্চ বিদ্যালয়সমূহে কৃষি-শিক্ষা বাধ্যতা-মূলক করিয়া, কিরূপভাবে উহার বিস্তৃতি ঘটিতে পারে, তাহা জগতবাসীকে সম্যকরূপে বুঝাইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছেন। অধুনা, আমেরিকায় কৃষিসম্বন্ধীয় ব্যবসায়-বাণিজ্যই, অন্যান্য ব্যবসায়-বাণিজ্য অপেক্ষা, অধিকতররূপে প্রচলিত হইয়াছে। আমেরিকায় কৃষিশিক্ষা যে কিরূপভাবে বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে, ইহা তাহারই প্রকৃষ্ট নিদর্শন। বস্তুতঃ, মার্কিণ—যুক্তরাজ্যের কৃষি-বিভাগ (United States Dept. of Agriculture) কৃষির উন্নতিবিধানের নিমিত্ত কৃষিশিক্ষার যেরূপ সুব্যবস্থা করিয়াছেন, আজ পর্য্যন্ত সভ্যজগতের অন্য কোনও দেশেই তাহা পরিলক্ষিত হয় না। এ বিষয়ে মার্কিণ পৃথিবীর আদর্শস্থল। উন্নত কৃষিশিক্ষার ফলে, কৃষির সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই, ব্যবসায়-বাণিজ্যের হিসাবেও মার্কিণ জগতের শ্রেষ্ঠস্থানাধিকার করিয়াছে। কৃষির উন্নতির সহিত ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্রমোন্নতি অবশ্যম্ভাবী। এই জন্যই মার্কিণের অনুকরণে, আমাদিগকেও সর্ব্বাগ্রে কৃষির-উন্নতি-সাধনেই মনোনিবেশ করিতে হইবে; এবং তন্নিমিত্ত নিম্ন ও উচ্চ বিদ্যালয়ে যাহাতে কৃষিশিক্ষার সুবন্দোবস্ত হইতে পারে, তদুপায়বিধান করিতে হইবে।

বর্ত্তমানসময়ে ভারতবর্ষ হইতে যে সকল জিনিষ বিদেশে রপ্তানি হইতেছে, তাহার অধিকাংশই কৃষিজাত। ভারতের কাঁচামাল (raw materials) বিদেশে চলিয়া যায়, এবং তদ্দ্বারা নানাবিধ ব্যবহারোপযোগী দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া আংশিক ভারতেই ফিরিয়া আইসে। মাল রপ্তানি করিয়া আমরা যে মূল্য প্রাপ্ত হই, উহার আংশিক বিভিন্ন আকারে ফিরিয়া আসিলে, তাহা আমাদিগকে বহুগুণ অধিক মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে হয়। ইহাতে আমাদের যে কেবল আর্থিক ক্ষতিই সাধিত হয়, তাহা নহে;—বিদেশীয় শিল্পী এবং ব্যবসায়ীদিগের উপর নির্ভর করিয়া রহিয়া, আমরা আমাদের জাতীয় শিল্পেরও সর্ব্বনাশসাধন করিতেছি। উপযুক্ত শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিলে, আমরা আমাদের কাঁচামালের শিল্পোচিত ব্যবহার করিতে পারি সত্য, কিন্তু ঐরূপ করিতে হইলে কৃষিজাত-দ্রব্যের উৎপন্নের পরিমাণ বর্দ্ধিত করিতে হইবে। কারণ, তাহা না হইলে কাঁচামালের অভাবে, আমাদের শিল্পের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যাইবে। আমাদের দেশের কাঁচামাল স্বাধীন বাণিজ্যের সহস্র শাখায় পরিচালিত হইয়া, দেশ-দেশান্তরে ও দিগ্-দিগান্তরে চলিয়া যাইতেছে। এই বিশ্বজনীন স্বাধীন বাণিজ্যের গতিরোধ করিবার শক্তি কাহারও নাই। সুতরাং, এখনও যাহা রপ্তানি হইতেছে, পরেও তাহাই

রপ্তানি হইবে। তদবস্থায় আমাদের অভাব অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং, শিল্পনৈপুণ্যে শ্রেষ্ঠতর বস্তু উৎপাদন করিয়া, বিদেশীয় শিল্পসম্ভূত পণ্যদ্রব্যের আমদানীর পথ আংশিক রুদ্ধ করিতে হইলেও, প্রমাধিক্য এবং উন্নত-প্রণালী অবলম্বনে ক্ষেত্রজাত বস্তুর প্রকার, পরিমাণ ও উৎকর্ষ বৃদ্ধি করিতেই হইবে। এইরূপ করিতে হইলেই, এ দেশের নিরক্ষর কৃষক-সমাজে বৈজ্ঞানিক কৃষিতত্ত্ব প্রচার করা আবশ্যক। শিক্ষিতব্যক্তির বিশেষ সহায়তা ব্যতীত উহা সম্ভবপর নহে। এই জন্যও শিক্ষিতব্যক্তির কৃষিশিক্ষা অত্যাবশ্যক; এবং বিদ্যালয়ে কৃষিশিক্ষা করাই, কৃষি-শিক্ষার প্রকৃষ্ট উপায়।

অনেকেই হয়ত মনে করেন, কৃষকেরা ভালরূপে শস্যোৎপাদন করিতে পারিলেই আশানুরূপ লাভবান হইতে পারে। কিন্তু ইহা বাস্তবিক সত্য নহে। কারণ, আমরা অনেকসময় দেখিতে পাই, প্রচুর পরিমাণে ফল-শস্যাদি লাভ করিয়াও, কৃষিজাত দ্রব্যাদির রপ্তানি ও বিক্রয় সম্বন্ধে বিশেষ কোনও সুবন্দোবস্ত না থাকায়, আমাদের দেশের কৃষকেরা প্রায় সকলসময়েই আশানুরূপ অর্থলাভে বঞ্চিত হইয়া থাকে। এমন কি, কখনও কখনও তাহাদের লাভের পরিবর্ত্তে ক্ষতিও হয়। দশে মিলিয়া কার্য্য করিবার শক্তির অভাববশতঃই যে এরূপ হয়, এবং তাহারই ফলস্বরূপ এ দেশের নির্ধন ও নিরক্ষর কৃষকের দুঃখ-দুর্গতি দিন দিনই বাড়িয়া যাইতেছে, তাহা নিঃসন্দেহেই বলা যায়। ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বে, আমেরিকার কৃষকেরাও, আমাদের দেশের কৃষকদিগের ন্যায়, স্বীয় স্বীয় কৃষিজাত ফল-শস্যাদি বিক্রয় করিয়া আশানুরূপ অর্থলাভ করিতে পারিত না। কিন্তু অধুনা, তাহারা সমবায়-পদ্ধতিতে কৃষি-সমিতি সংস্থাপন করিয়া, আপনাদের আর্থিক অবস্থার বিশেষ উন্নতিসাধন করিতে সমর্থ হইয়াছে। কিরূপ প্রণালীতে মার্কিণের কৃষি-সমিতির কার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে, বিগত ১৩২২ সালের ৭ম সংখ্যা "কৃষি-সম্পদে" আমার লিখিত 'ক্যালিফোর্ণিয়ার সমবায় কৃষি-সমিতি' নামক প্রবন্ধে, আমি তাহা বিস্তৃতভাবেই বর্ণন করিয়াছি। অনুসন্ধিৎসু পাঠক তাহা পাঠ করিলে, সমবায়-পদ্ধতিতে কৃষি-সমিতি সংস্থাপনের আবশ্যকতা ও উপকারিতা সম্বন্ধে অনেক তথ্যই অবগত হইতে পারিবেন।

মার্কিণ-কৃষকের ন্যায়, অধুনা আমাদের দেশের কৃষক-দিগের পরস্পরের মধ্যে কোনরূপ সম্মিলনের সুব্যবস্থা (organization) নাই। প্রাচীনকালে সমবায়-পদ্ধতিতে কার্য্য করিবার প্রথা এ দেশের সর্ব্বত্রই প্রচলিত ছিল। বারজন অর্থাৎ বহুব্যক্তি সম্মিলিত হইয়া যে কার্য্য করিয়া থাকে, তাহারই নাম বারোয়ারি। এই বারোয়ারি-প্রথায় এ দেশের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য—এমন কি, ধর্ম্মকার্য্যাদিও সম্পাদিত হইত। দশে মিলিয়া কার্য্য করিবার প্রবৃত্তি এ দেশবাসীর খাঁটী নিজস্ব সম্পত্তি ছিল। কিন্তু এক্ষণ নানাকারণে, সেই চিরসম্পত্তি হারাইয়া ফেলিয়াই আমাদিগকে কাঙ্গালী সাজিতে হইয়াছে। সুতরাং, দেশের দুঃখ দূর করিতে হইলে, আবার দশে মিলিয়াই কাজ করিতে হইবে। মার্কিণ-কৃষকদিগের অনুকরণে, দেশের সর্ব্বত্র সমবায়-কৃষি-সমিতি সংস্থাপন করিতে না পারিলে, এ দেশের কৃষকদিগের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধন সম্ভবপর নহে। কিন্তু কৃষি-সমিতি সংস্থাপন করিবে কে? আমাদের দেশের প্রাচীন-প্রথায় কৃষি-বৈঠক প্রতিষ্ঠা করিবার শক্তিও যে কৃষকদিগের নাই, যাহারা মিলিয়া-মিশিয়া কার্য্য করিবার আবশ্যকতা ও উপকারিতার বিষয় একরূপ ভুলিয়াই গিয়াছে, তাহারা পাশ্চাত্য-জাতির অনুকরণে, কৃষি-সমিতি সংস্থাপন করিতে যে সম্পূর্ণ অপারক, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। আমাদের দেশের শিক্ষিত-সম্প্রদায়কেই, কৃষকদিগের রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে, কৃষি-সমিতি স্থাপনে বদ্ধপরিকর হইতে হইবে। তাঁহারা যদি কৃষি-সমিতি সংস্থাপন করিয়া, এ দেশের কৃষকদিগের কৃষিজাত দ্রব্যাদি বিক্রয়ের ও রপ্তানির সুবিধা করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলেও, আমরা আশা করি, তাহাদের দুর্দ্দশা অনেকাংশেই অপনীত হইতে পারে। তদ্ভিন্ন, দেশের শিক্ষিত-সম্প্রদায় যদি কৃষি-সমিতি সংস্থাপন করিয়া, এ দেশের কৃষকসন্তানদিগের শিক্ষা-দীক্ষার ভার গ্রহণ করেন, এবং নিজেরাও কৃষি-কার্য্যকে একটি লাভজনক ব্যবসায় মনে করিয়া, তাহাতে সংশিপ্ত রহিতে পারেন—চাষার মেশা লইয়া চাষের কাজে-প্রবৃত্ত হইতে পারেন, তাহা হইলে

সহজেই এ দেশের কৃষি ও কৃষকের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধিত হইতে পারে। এই কার্য্যের জন্য দলে দলে কৃষিশিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষিতযুবক অত্যাবশ্যক। ইহারাই দেশের নানাস্থানে আদর্শ কৃষি-ক্ষেত্র খুলিয়া, শিক্ষাদাতারূপে কৃষকের উন্নতিসাধন করিতে পারিবে। কিন্তু এ দেশের নিম্ন ও উচ্চ বিদ্যালয়ে, মার্কিণের অনুকরণে, কৃষি-শিক্ষার সুব্যবস্থা করিতে না পারিলে, আমাদের উদ্দেশ্যানুযায়ী কৃষিশিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষিতযুবকের অভাব অল্প কিছুতেই দূর হইবে না।

বাড়ীর আঙ্গিনার পার্শ্বে বা শাক-সব্জীর ক্ষুদ্র বাগানে নিজেদের দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য যাহা উৎপন্ন করা হয়, কীটাদির উপদ্রবে অথবা যথোচিত যত্নের অভাবে, তাহাও অনেকসময় নষ্ট হইয়া যায়। সুফললাভে বঞ্চিত হ'ন বলিয়াই, এ দেশের বাবুরা—বিশেষতঃ শিক্ষিত মহিলারা তরিতরকারী চাষের বড় পক্ষপাতী নহেন। পোনর টাকা বেতনের কেরাণীর বাড়ীর চতুষ্পার্শ্বে দৃষ্টিপাত করিলেও দেখা যায়, অনেকস্থানই আগাছা ও ঘাসে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। দুইবেলা পেট পুরিয়া যে খাইতে পায় না, অধুনা, সেইরূপ গরিব ভদ্রসন্তানকেও, পারিবারিক ব্যবহারে নিমিত্ত, তরিতরকারীর চাষ (Family Gardening) করিতে দেখা যায় না। মার্কিণের কথা দূরে থাকুক, পৃথিবীর অন্য কোন সভ্যদেশেও এ দৃশ্য বিরল। যৎকিঞ্চিৎ কৃষিশিক্ষার অভাবই উহার মুখ্যকারণ। পূর্ব্বে এ দেশে তরিতরকারী বিক্রয়ের প্রথা সকলস্থানে প্রচলিত ছিল না; তৎকালে গৃহস্থমাত্রেই স্বহস্তে তরিতরকারীর চাষ করিত বলিয়া, কাহারও উহা ক্রয় করিবারও বড় আবশ্যক হইত না। নানা কারণে, এক্ষণ আর পূর্ব্বের ন্যায় তরিতরকারী জন্মে না; বিশেষতঃ, উহার ক্রেতার সংখ্যাও অত্যধিকরূপে বাড়িয়া গিয়াছে। ফলে, দেশের সর্ব্বত্রই তরকারী দুর্ম্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িতেছে। এই অভাব দূর করিতে হইলেও, যৎকিঞ্চিৎ কৃষিশিক্ষার প্রয়োজন। বলা বাহুল্য, পল্লীর ভদ্রগৃহস্থদিগকেই তরিতরকারী চাষের জন্য মোটামোটিভাবে কৃষিশিক্ষা করিতে হইবে; এবং বিদ্যালয়ের কৃষিশিক্ষাই তৎপক্ষে যথেষ্ট।

উল্লিখিত বিষয়গুলি স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখিলে, এ দেশের নিম্ন ও উচ্চ বিদ্যালয়ে কৃষি-শিক্ষা যে কিরূপ অত্যাবশ্যক ও হিতকর তাহা সহজেই উপলব্ধি হইবে। উচ্চবিদ্যালয়ে কৃষিশিক্ষার সুব্যবস্থা না হইলে, এ দেশের উন্নতি সুদূরপরাহত বলিয়াই মনে হয়।

উচ্চবিদ্যালয়ের পাঠ্য-তালিকায় কৃষির স্থান-নির্দ্দেশ।

পাশ্চাত্য সভ্যজগতের উন্নতির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, স্বতঃই মনে হয়, আমাদের শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্ত্তন অত্যাবশ্যক হইয়াই পড়িয়াছে। আমাদিগকে আর সাহিত্য, গণিতাদি লইয়া থাকিলেই চলিবে না—চাকরির উপযোগী শিক্ষালাভ করিলেই হইবে না। আমাদের বিদ্যালয়সমূহে যাহাতে কৃষি-শিল্পাদির ব্যবহারিকশিক্ষার ব্যবস্থা হয়, শত-মনোযোগী হইয়া, আমাদিগকে তাহাই করিতে হইবে; এবং উহার আবশ্যকতাও রহিয়াছে যথেষ্ট। গ্রাসাচ্ছাদনের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াই শিক্ষা-পদ্ধতির পরিবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য; এবং তাহাই করিতেও হইবে।

বর্ত্তমানসময়ে আমাদের দেশের উচ্চবিদ্যালয়সমূহে যে পাঠ্য নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে, তাহা যদিও উচ্চ-আদর্শানুযায়ী সুশৃঙ্খলভাবে করা হয় সত্য, কিন্তু তথাপি, দেশের বর্ত্তমান অবস্থায়, ঐরূপ পাঠ্য-নির্ব্বাচন সময়োপযোগী বলিয়া মনে হয় না। কারণ, এ দেশের উচ্চশিক্ষা এমত রক্ষণশীলভাবে (Conservative) দেওয়া হয় যে, যুবকগণ উচ্চশিক্ষালাভ করিয়াও সার্ব্বজনীন উদারভাব (Liberal idea) হৃদয়ে পোষণ করিতে পারে না। ফলে, তাহাদের উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যও সর্ব্বাংশে সার্থক হয় না। যাহাতে দেশের ভাবীভরসাস্থল যুবকগণের মানস-চক্ষু নানাবিষয়ে উন্মুক্ত হইতে পারে, এবং তাহারা স্বদেশপ্রিয়, চিন্তাশীল, মেধাবী, প্রবর্ত্তনকারী (initiative), স্বাবলম্বী, আত্মসম্মান-জ্ঞানী ও আত্মবিশ্বাসী হয়, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াই তাহাদিগকে উদার নীতি অবলম্বনে শিক্ষা (Liberal system of education) দেওয়া কর্ত্তব্য। উচ্চবিদ্যালয়ের পাঠ্য-তালিকা প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে, আমাদিগকে

নিম্নলিখিত কএকটি বিষয়ে বিশেষভাবেই চিন্তা করা আবশ্যক। কারণ, এই শিক্ষার উপরেই আমাদের যুবক-গণের ভবিষ্যৎ মঙ্গলামঙ্গল এবং আমাদেরও জাতীয় ভবিষ্যৎ উন্নতি অনেকটা নির্ভর করে।

(১) প্রকৃতি-বিজ্ঞান (Natural Sciences)—প্রকৃতি বিজ্ঞান বা প্রকৃতি-পাঠ শিক্ষা নিম্ন-বিদ্যালয় হইতেই আরম্ভ করিতে হইবে। এই শিক্ষা দ্বারা বালকবালিকা অথবা যুবকগণ যাবতীয় আবশ্যকীয় পদার্থের উৎপত্তি ও উহাদের ব্যবহার সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিবে।

(২) সুকুমার-সাহিত্য (Humanities)—ভাষা-শিক্ষা, ইতিহাস, অঙ্কশাস্ত্র প্রভৃতি সুকুমার-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। এই শিক্ষা একান্ত প্রয়োজনীয়। এ সম্বন্ধে আমাদের বিদ্যালয়সমূহে বেশ সুব্যবস্থা রহিয়াছে।

(৩) ধন-বিজ্ঞান (Economic Science)—ধন-বিজ্ঞানশাস্ত্রালোচনা দ্বারা জাতীয় উন্নতির মূলভিত্তি নির্ণয় করিতে পারা যায়। অধুনা, পাশ্চাত্য-জাতির অভ্যুত্থান ধনবিজ্ঞানশাস্ত্রালোচনার ফলেই ঘটিয়াছে।

এই তিনটি বিষয়ই আমাদের উচ্চবিদ্যালয়সমূহে শিক্ষা দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বর্ত্তমান পাঠ্য-তালিকা (Curriculum) অনুযায়ী, আমাদের দেশের ছাত্রগণ একমাত্র সুকুমার-সাহিত্য ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ই শিক্ষালাভ করিবার প্রকৃত সুযোগ প্রাপ্ত হয় না। সুতরাং, ঐরূপ শিক্ষা দ্বারা চাকরিজীবীর সংখ্যা বর্দ্ধিত হওয়া ভিন্ন, দেশের দশের বিশেষ কোনরূপ হিতসাধিত হয় না—ইহাতেও পারেনা। এ দেশে শিক্ষিতের সংখ্যা ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছে, অথচ চাকরিরও দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে; এমতাবস্থায়, একমাত্র সুকুমার-সাহিত্য ব্যতীত প্রকৃতি-বিজ্ঞান ও ধন-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় শিক্ষনীয় বিষয়গুলি পাঠ্য-তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা কর্ত্তব্য কিনা, শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণেরও তাহা স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্রগণ যাহাতে উল্লিখিত তিনটি বিষয়েরই সাধারণ-জ্ঞান লাভ করিতে পারে, পাঠ্য-তালিকা নির্ব্বাচনকালে, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। তদ্ভিন্ন, উচ্চবিদ্যালয়ের পাঠ সমাপন করিবার পর, অর্থাৎ কলেজে গিয়া, যাহাতে যুবকগণ উহার কোনও একটি বিষয়ে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিতে পারে, তদুপায়বিধান করাও কর্ত্তব্য। ঐ নির্দ্দিষ্ট বিষয়টি যথাসম্ভব হাতে-হেতেড়ে শিক্ষা দিতে হইবে। এইরূপভাবে শিক্ষিত হইলে, যুবকগণকে কলেজ পরিত্যাগ করিবার পর একমাত্র চাকরির জন্য লালায়িত না হইলেও চলিবে। কারণ, তদবস্থায় তাঁহারা অনায়াসেই স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণ করিয়া স্বাধীনভাবেই জীবিকানির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইবেন।

আমাদের দেশের উচ্চবিদ্যালয়সমূহে যদিও প্রাচীন (Classical) ও বর্ত্তমান (modern) ভাষা এবং বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় কতিপয় বিষয় শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা রহিয়াছে সত্য, কিন্তু তথাপি, শিক্ষা-প্রণালীর দোষে, ঐ সকল বিষয়ের কার্য্যকারিতা (efficiency) বড় কম। এই জন্যই পাশ্চাত্য-জাতির আদর্শে, আমাদের উচ্চবিদ্যালয়সমূহের পাঠ্য-তালিকাও প্রস্তুত করিতে হইবে। তদ্ভিন্ন, প্রকৃতি-বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করিয়া, কৃষিশিক্ষারও সুব্যবস্থা করা অবশ্যকর্ত্তব্য। দুঃখের বিষয়, আমাদের শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ কৃষিশিক্ষার বিষয় আজিও বোধ হয় উদারভাবে চিন্তা করিতে পারেন নাই। যদিও আমাদের সদাশয় গভর্ণমেণ্ট, ভারতের প্রায় সকল প্রদেশেই এক একটি কৃষি-কলেজ প্রতিষ্ঠিত করিয়া, উচ্চশিক্ষিত (graduate students) যুবকদের নিমিত্ত কৃষিশিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়াছেন; এবং প্রত্যেক প্রদেশেরই নানাস্থানে কৃষি-পরীক্ষা-ক্ষেত্র সংস্থাপন করিয়া, দেশের একটা বিশেষ অভাব আংশিক দূর করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহাতে আপাততঃ এ দেশের সাধারণ কৃষকশ্রেণির বিশেষ কোনরূপ উপকার হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। প্রাথমিক সামান্য কৃষিশিক্ষা না হইলে, অত্যল্পকালমধ্যে, উচ্চকৃষিশিক্ষা যে কিপ্রকারে হইতে পারে, তাহা আমাদের ধারণাতীত। আমাদের শিক্ষাকর্ত্তৃপক্ষগণ নিম্ন-কৃষিশিক্ষার ব্যবস্থা না করিয়াও, কৃষি-কলেজে উচ্চকৃষিশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহাতে ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, কৃষি-কলেজ-সমূহে উপযুক্ত শিক্ষক নিযুক্ত ও শিক্ষোপযোগী যন্ত্রাদি সংগৃহীত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে অধিকসংখ্যক ছাত্র জুটিতেছে

না। কি উপায়ে কৃষিশিক্ষা দিতে হইবে, তদ্বিষয়ে বিস্তর মতভেদ রহিয়াছে সত্য, কিন্তু তথাপি, আমাদের দেশের উচ্চবিদ্যালয়সমূহে কৃষিশিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া যে একান্ত বাঞ্ছনীয়, তাহা বোধ হয় সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন।

সাধারণতঃ অন্যান্য বিজ্ঞানশিক্ষার উপরই কৃষি-বিজ্ঞানশিক্ষা অনেকটা নির্ভর করিয়া থাকে। সেই জন্য অন্যান্য বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই কৃষি-বিজ্ঞানশিক্ষারও ব্যবস্থা করা সঙ্গত। উচ্চবিদ্যালয়ে কৃষি-বিজ্ঞানের কোনও নির্দ্দিষ্টবিষয় শিক্ষা না দিয়া, কৃষি-রসায়ন (Agricultural Chemistry), কৃষি-উদ্ভিদবিদ্যা (Agricultural Botany), কৃষি-প্রাণীতত্ত্ব-বিদ্যা (Agricultural Biology) এবং ভূতত্ত্ব প্রভৃতি কৃষিবিজ্ঞানশাস্ত্রের স্থূল স্থূল বিষয়গুলি শিক্ষা দিতে পারিলেই যথেষ্ট। তবে গার্হস্থ্য-বিজ্ঞানের (Domestic Science) ন্যায়, কৃষি-বিজ্ঞানেরও কোন কথা বাদ দিলে চলিবে না। এইরূপ কৃষি-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই, যুবকগণকে যথাসম্ভব হস্তসম্পাদ্য-কার্য্য (Manual training) এবং কৃষি-শিল্প শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। মোটকথা, বর্ত্তমানসময়ের পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট বিজ্ঞান এবং ভূগোলাদি কৃষিশিক্ষার উপযোগী করিয়া লইতে পারিলে, আমরাও কৃষিশিক্ষার যথেষ্ট সুবিধা ঘটিবে। এ দেশের পাঠ্য-তালিকায়, মার্কিণের অনুরূপ, সুকুমার-সাহিত্যের পরই কৃষির স্থাননির্দ্দেশ অত্যাবশ্যক। তাহা না করিতে পারিলে, এ দেশের কৃষি ও কৃষক 'যে তিমিরে সে তিমিরেই' রহিবে;—তাহাদের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধন সহজসাধ্য বা সম্ভবপর হইবে না। স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, আমাদের এ কৃষি-প্রাণ-দেশে কৃষিশিক্ষার সুব্যবস্থা হইলেই, শিক্ষার সার্থকতা সর্ব্বাংশে সাধিত হইবে। 'অন্ন চিন্তা চমৎকারা' হইলে, প্রকৃত শিক্ষালাভ সম্ভবপর হয় না। যাঁহারা জাপানের বিস্ময়কর উন্নতির বিষয় সম্যকরূপে অবগত আছেন, তাঁহারা কৃষির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই যে জাপানের উন্নতির সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহা অস্বীকার করিতে পারিবেন না। কৃষির উন্নতি না ঘটিলে, এ দেশের উন্নতিও সুদূরপরাহত বলিয়াই মনে হয়। কৃষির উন্নতি কৃষি-শিক্ষার উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

মার্কিণের উচ্চবিদ্যালয়ে কৃষিশিক্ষা।

মার্কিণের উচ্চবিদ্যালয়সমূহে, (১) মৌখিক এবং (২) ব্যবহারিক—এই দ্বিবিধপ্রকারেই কৃষিশিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু এখানকার কোনও বিদ্যালয়েই কৃষিবিষয়ক কোনরূপ পাঠ্যপুস্তক নির্দ্দিষ্ট রহে না। শিক্ষকমহাশয়েরা বক্তৃতা দ্বারা ছাত্রদিগকে অবশ্যজ্ঞাতব্য কৃষিতত্ত্বসমূহের মর্ম্ম বুঝাইয়া দেন। পক্ষান্তরে, ছাত্রগণও কৃষিসম্বন্ধীয় নানাবিধ পুস্তক পাঠ করিয়া প্রভূত জ্ঞানলাভের প্রকৃত সুযোগ প্রাপ্ত হয়। বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকায় কৃষিবিষয়ক কোনরূপ পুস্তকের নাম নির্দ্দিষ্ট রহে না সত্য, কিন্তু উহাতে যে সকল সাহায্য-কারী (Help-book) কৃষিগ্রন্থের নাম প্রকাশিত হয়, ছাত্রগণ সেই সকল গ্রন্থই অধ্যয়ন করে। যাহাতে ছাত্রগণ কোনও পুস্তকের কোনও বিষয় অযথারূপে মুখস্থ (Cramming) না করে, তৎপ্রতি শিক্ষকমাত্রেরই বিশেষ লক্ষ্য রহে।

মার্কিণের প্রচলিত রীতি অনুসারে, তথাকার নিম্ন-বিদ্যালয়ে (Grammar School) ক্রমাগত ছয়বৎসর এবং উচ্চবিদ্যালয়ে (High School) ক্রমাগত চারি বৎসরকাল (Four years' course) অধ্যয়ন করিতে হয়। শেষোক্ত চারিবৎসর, অন্যান্য বিষয়ের সহিত, কিরূপ-ভাবে কৃষিশিক্ষা প্রদান করা হয়, তাহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের প্রধান আলোচ্য-বিষয়। এই বিষয়টি সহজবোধ্য করিবার উদ্দেশ্যে, মার্কিণের একটি উচ্চবিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকা (Curriculum) নিম্নে প্রদত্ত হইল। তৎপাঠেই, কিরূপে অন্যান্য পাঠ্যবিষয়ের কিঞ্চিন্মাত্র ক্ষতি না করিয়াও, উচ্চবিদ্যালয়ে কৃষিশিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে, তাহা সহজেই উপলব্ধি হইবে।

মার্কিণ—যুক্তরাজ্যের কৃষি-বিভাগের (United States (Department of Agriculture) অন্যতম কর্ত্তৃপক্ষ (Dr. A. C. True) মহোদয় উচ্চবিদ্যালয়ের নিমিত্ত যে পাঠ্যনির্দ্ধারণ করিয়াছেন, প্রথমতঃ তাহাই নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—

ক। প্রয়োজনীয় পাঠ্যবিষয়ের তালিকা।

পাঠ্য বিষয়।	ইউনিট্স Units	প্রতি সপ্তাহে যত ঘণ্টা পড়িতে হইবে। ১ম বৎসর	২য় বৎসর	৩য় বৎসর	৪র্থ বৎসর	মোট ঘণ্টা
ইংরেজি-সাহিত্য—	৩	৫	৫	৩	২	৫৪০
বীজগণিত—	১	৫	"	"	"	১৮০
জ্যামিতি—	১	"	৫	"	"	১৮০
ইতিহাস—	১	"	"	২	৩	১৮০
উদ্ভিদ্‌বিদ্যা—(Botany)	১	৫	"	"	"	১৮০
রসায়নবিদ্যা—	১	"	৫	"	"	১৮০
ফরাসী বা জর্ম্মণ ভাষা—.	২	"	"	৫	৫	৩৬০
কৃষিবিদ্যা (Agriculture)—	৪	৫	৫	৫	৫	৭২০
মনোনীত বিষয় (electives)—	২	"	"	৫	৫	৩৬০
					মোট=	২৮৮০ ঘণ্টা

বিশেষ দ্রষ্টব্য—১৮০ ঘণ্টায় এক ইউনিট্ (Unit) ধরা হয়; অর্থাৎ সপ্তাহে ৫ ঘণ্টা হিসাবে, প্রায় ৩৬ সপ্তাহে এক ইউনিট্ হইয়া থাকে। পাঠ আবৃত্তির নিমিত্ত ৪৫ মিনিটে এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্য (Laboratory work) ৯০ মিনিটে একঘণ্টা গণনা করা হয়। উচ্চবিদ্যালয়ে ১৫ ইউনিটের কার্য্য দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিতে পারিলে ছাত্রগণ কলেজে ভর্ত্তি হইতে পারে।

খ। মনোনীত বিষয়ের তালিকা।

মনোনীত বিষয়।	ইউনিট্।	সাপ্তাহিক ঘণ্টা।	মোট ঘণ্টা।
চিত্রবিদ্যা (Drawing)—	½	একঘণ্টা, একবৎসর	৩৬
হিসাব-বিদ্যা (Book-keeping)—	"	" "	৩৬
পৌরবিদ্যা (Civics)—	½	২ঘণ্টা, "	৭২
ঘন-জ্যামিতি (Solid Geometry)—	½	৫ " "	৯০
সরল ত্রিকোণমিতি ও জরিপ (Plane Trigonometry and Surveying)—	১	২ " দুইবৎসর	১৪৪
ফরাসী বা জর্ম্মণ ভাষা—	১	৫ " একবৎসর	১৮০
উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, রসায়নবিদ্যা বা পদার্থবিদ্যা—	১	৫ " "	১৮০
কৃষিবিদ্যা ও উদ্যান-রচনা (Agriculture & Horticulture)—	১	এক হইতে পাঁচ ঘণ্টা; ২য় ও ১ম শ্রেণী।	১৮০
প্রাথমিক বনরক্ষণ-বিদ্যা (Elementary Forestry)—			

গ। কৃষিবিদ্যাশিক্ষার্থী ছাত্রদিগের প্রয়োজনীয় বিষয়।
(Required subjects for all students in Agriculture).

কৃষিবিষয়।	ইউনিট্	সাপ্তাহিক ঘণ্টা। ১ম বৎসর	২য় বৎসর	৩য় বৎসর	৪র্থ বৎসর	মোট ঘণ্টা।
বৃক্ষ ও তৎপারিপার্শ্বিক বিষয়াবলী—(Tree and their environment)	½	২	০	০	০	৭২
কৃষিবাটিকার শস্য—(Farm crops)	½	১	০	০	০	৩৬
কৃষি-পূর্ত্ত-বিদ্যা—(Agricultural Engineering)	½	১	০	১	০	৭২
উদ্যান-রচনা ও বনরক্ষণ—(Horticulture & Forestry)	½	১	০	০	০	৩৬
অর্থকরী কীটবিদ্যা—(Economic Entomology)	½	০	২	০	০	৭২
পশুপালন—(Animal husbandry)	½	০	২	০	০	৭২
ব্যবসায়ের হিসাবে গোপালন—(Dairying)	½	০	১	০	০	৩৬
বৃক্ষ ও পশুর রোগ-নিদানতত্ব—(Pathology)	½	০	০	২	০	৭২
কৃষিক্ষেত্র পরিচালন—(Farm management)	½	০	০	০	২	৭২
পরিশিষ্ট "ক" হইতে অন্যান্য বিষয় যোগ করিতে হইবে—(Subjects to be added from the subjoined list "A")	১	০	০	২	৩	১৮০
					মোট—	৭২০ ঘণ্টা।

পরিশিষ্ট—"ক"।

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি হইতে ৪ ইউনিট্ পূরণ করিতে হইবে (Subjects from wich selection must be made to make up the required 720 hours in Agriculture)।

বিষয়।	সাপ্তাহিক ঘণ্টা। ৩য় বৎসর	৪র্থ বৎসর	মোট ঘণ্টা।
কৃষিবাটিকার শস্য (Farm crops)—	২	২	৭২ বা ১৪৪
পশুপালন (Animal husbandry)—	২	২	„ „
ব্যবসায়ের হিসাবে গোপালন (Dairying)—	২	০	„
উদ্যান-রচনা (Horticulture)—	২	০	„
বনরক্ষণ (Forestry)—	২	০	„
কৃষি-পূর্ত্ত-বিদ্যা (Agricultural Engineering)—	০	২	„
গ্রাম্য অর্থনীতিশাস্ত্র (Rural Economics)—	১	২	৩৬ বা ৭২
বৃক্ষোৎপাদন ও বৃক্ষপালন (Plant Breeding)—	১	২	„ „

মেইনে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত উচ্চবিদ্যালয়ের পাঠ্য-তালিকায় কৃষি।

(Course in Agriculture by W. D. Hurd, College of Agri : Univ. of Maine.)

১ম বৎসর—

ইংরেজী ... ... ৩ ঘণ্টা।
বীজগণিত ... ... ৫ „
রসায়ন ... ... ৫ „
মৃত্তিকা, উদ্ভিদ এবং সার সম্বন্ধে ... ... ৩ „
হস্তসম্পাদ্য-কার্য্য ... ... ৪ „
(Practicums)

২য় বৎসর—

ইংরেজী ... ... ৩ ঘণ্টা।
জ্যামিতি ... ... ৫ „
ইতিহাস ও পৌরবিদ্যা (History and Civic) ... ৫ „
পশুপালন, গোরক্ষণ প্রভৃতি ... ৩ „
(Animal husbandry & Dairy)
হস্তসম্পাদ্য-কার্য্য ... ... ৪ „

৩য় বৎসর—

ইংরেজী .. .. ৩ ঘণ্টা।
পুনরালোচনা (Review) ... ... ৫ „
ব্যবসায় ও হিসাব-নিকাশ ... ... ৩ „
কৃষি-যন্ত্র ও কৃষিক্ষেত্র-সংরক্ষণ-বিদ্যা এবং বৃক্ষের রোগ-নিদানতত্ব প্রভৃতি ... ৫ „
(Agri. Engineering, Farm management, Plant Pathology etc.)
হস্তসম্পাদ্য-কার্য্য ... ... ৪ „

৪র্থ বৎসর—

ইংরেজী ... ... ৩ ঘণ্টা।
পদার্থবিদ্যা (Physics) ... ... ৫ „
ইতিহাস ... ... ৫ „
মাঠজশস্য ও ফল উৎপাদন এবং সব্জীচাষ ৩ „
(Yield crop, Fruit growing and Vegetable gardening)
হস্তসম্পাদ্য-কার্য্য ... ... ৪ „

কালিফর্ণিয়া—গার্ডেনা-উচ্চবিদ্যালয়ের পাঠ্য-তালিকায় কৃষি।

১ম বৎসর—

সাধারণ বিজ্ঞান এবং উদ্যান-রচনা-প্রণালী ৫ ইউনিট্স
ইংরেজী ... ... ৫ „
ব্যবহারিক বীজগণিত ... ৫ „
(Applied Mathematics)
তক্ষণ-বিদ্যা এবং চিত্র-বিদ্যা ৫ „
(Carpentry and Drawing)
সঙ্গীত-বিদ্যা বা মৌখিক ইংরেজী ২ „
(Music or Oral English)

২২ ইউনিট্স

২য় বৎসর—

কৃষি-সংক্রান্ত উদ্ভিদ্-বিদ্যা ... ৫ ইউনিট্স
(Agri. Botany)
ইংরেজী বা বিদেশীয় ভাষা ... ৫ „
অর্থকরী জীব-বিদ্যা, পশুপালন এবং কীট বিদ্যা ... ... ৫ „
(Economic Zoology, Animal Industry and Economic Entomology)
হাপর এবং যন্ত্র-চিত্র-বিদ্যা ... ৫ „
(Forge and Mechanical Drawing)
সঙ্গীত-বিদ্যা বা মৌখিক ইংরেজী ২ „

২২ ইউনিট্স

৩য় বৎসর—

কৃষি-রসায়ন ...	...	৫ ইউনিট্‌স
উদ্যান-বিদ্যা ও বনরক্ষণ-বিদ্যা (Horticulture and Forestry)	...	৫ ,,
গোপালন এবং কুক্কুটপালন (Dairying and Poultry)	...	৫ ,,
মনোনীত বিষয় (Electives)		৫ ,,
		২০ ইউনিট্‌স

ইংরেজী, বৈদেশিক ভাষা, গণিতশাস্ত্র এবং কাষ্ঠ-মিলন (cabinet works) প্রভৃতি মনোনীত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত।

৪র্থ বৎসর—

কৃষি-পদার্থবিদ্যা (Agri : Physics)	...	৫ ইউনিট্‌স
মৃত্তিকা, সার ও কৃষিক্ষেত্রজাত শস্যরক্ষণ এবং কৃষিক্ষেত্র-পরিচালনা (Soils and Fertilisers, Farm crops and Farm management)	...	৫ ,,
পল্লীবিষয়ক আইন এবং ধন-শাস্ত্র (Rural laws and Economics)		২ ,,
হিসাবরক্ষণ-বিদ্যা এবং কৃষিক্ষেত্রের হিসাব (Book keeping and Farm accounts)		৩ ,,
প্রাকৃতিক-উদ্যানরচনা এবং হরিৎমন্দির-পরিচালনা (Landscape gardening and Green-house management)	...	৩ ,,
ইতিহাস ও পৌর-বিদ্যা (Civics and History)	...	৫ ,,
বিশিষ্ট-প্রসঙ্গ বা সমস্যাসমূহ (Special topics or problems)	...	২ ,,
		২৫ ইউনিট্‌স

আমাদের দেশের উচ্চ-বিদ্যালয়ের পাঠ্য-তালিকায় কৃষি।

বর্ত্তমানসময়ে আমাদের দেশের উচ্চ বিদ্যালয়সমূহে যে সকল বিষয় পাঠ্য করা হয়, তৎপাঠে ছাত্রগণ সাংসারিক বিষয়সম্বন্ধে বিশেষ কোনরূপ জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হয় না। তদ্ভিন্ন, পাঠ্য-তালিকায় কৃষি-শিক্ষার উপযোগী কিছুই নাই। এমতাবস্থায়, বর্ত্তমান পাঠ্য-তালিকার পরিবর্ত্তন, দেশের বর্ত্তমান অবস্থায়, অত্যাবশ্যক বলিয়াই মনে লয়। আমাদের দেশের উচ্চ বিদ্যালয়সমূহেও, মার্কিণের অনুকরণে, অন্যান্য বিষয়ের সহিত কৃষিবিষয়ক—বিশেষতঃ, গৃহস্থালী-সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদি পাঠ্য নির্ব্বাচন করা একান্ত আবশ্যক। মার্কিণের উচ্চবিদ্যালয়সমূহের পাঠ্য-তালিকার অন্যান্য বিষয়ের সহিতই যে কৃষিশিক্ষার উপযোগী গ্রন্থাদি পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, যাহারা কৃষি-শিক্ষা করিতে ইচ্ছুক, তাহাদের কৃষি-শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থাও রহিয়াছে। এই ব্যবস্থার ফলেই, মার্কিণের শিক্ষিত যুবকেরা স্বাধীনভাবে কৃষি, কৃষি-শিল্প এবং ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতি করিয়া সুখ-স্বচ্ছন্দে জীবিকানির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হয়। উচ্চ বিদ্যালয়ের পাঠ্য-তালিকা হইতে কোনও কোনও বিষয় উঠাইয়া দিয়া, তৎপরিবর্ত্তে কৃষিবিষয়ক পুস্তক পাঠ্য-নির্দ্দেশ করিতে পারিলেই, এ কৃষি-প্রাণ-দেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হইতে পারে। আমার মতে, উচ্চবিদ্যালয়ের (High English School) ৭ম শ্রেণী বা মান হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত—এই চারিবৎসরব্যাপী কৃষিশিক্ষার ব্যবস্থা করাই সঙ্গত। এই চারি শ্রেণীর কোন শ্রেণীতে কিরূপভাবে কৃষিশিক্ষা দিলে শিক্ষার উদ্দেশ্য সার্থক হইতে পারে, তাহারও একটু নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

সপ্তমশ্রেণী—প্রথমবর্ষ।

শিক্ষাস্থল—স্কুল এবং স্কুলের বাগান।

শিক্ষার উপকরণ—নানাপ্রকার ফলের, ফুলের, ঘাসের ও আগাছার বীজ এবং মাঠজ ও শিখীজাতীয় শস্য-বীজ ও নানাপ্রকার কৃষি-যন্ত্র।

শিক্ষা—বস্তু-উপলক্ষে মৌখিক; কিন্তু বৎসরের শেষভাগে যৎকিঞ্চিৎ ব্যবহারিক শিক্ষাও প্রদত্ত হইবে।

শিক্ষার সময়—মৌখিক সপ্তাহে তিন ঘণ্টা এবং ব্যবহারিক চারি ঘণ্টা মাত্র।

শিক্ষণীয় বিষয়—মৌখিক—

(১) কৃষিবিষয়ক উদ্ভিদ্-বিদ্যা—

(ক) সাধারণ উদ্ভিদ্-বিদ্যা (Plant life in general).

(খ) ধান্য, গম, যব প্রভৃতি মাঠজ-শস্যের বৃত্তান্ত ও সংক্ষিপ্ত চাষ-বাস-প্রণালী।

(গ) শিখীধারী শস্যের বৃত্তান্ত এবং সংক্ষিপ্ত চাষ-প্রণালী।

(ঘ) নানাজাতীয় ঘাসের বৃত্তান্ত।

(ঙ) আগাছার কথা—আগাছা-পরিচয়, আগাছা জন্মিবার কারণ ও বিনাশের উপায় এবং আগাছার অনিষ্টকারিতা।

(চ) বীজের পরিচয় ও পরীক্ষা-প্রণালী।

(২) মৃত্তিকাতত্ত্ব—

(ক) মৃত্তিকার উৎপত্তি ও গঠন-প্রণালী।

(খ) মৃত্তিকা-পরীক্ষা এবং মৃত্তিকার শ্রেণী-বিভাগ।

(গ) মৃত্তিকার সহিত জল ও উত্তাপের সম্বন্ধ।

(ঘ) মৃত্তিকার রাসায়নিক ও পদার্থগত উপাদান।

(ঙ) মৃত্তিকার সহিত বৃক্ষের সম্বন্ধ।

(৩) ব্যবহারিক—

(ক) বীজ-পরীক্ষা, বীজ-রোপণ ও চারা উৎপাদন।

(খ) বিভিন্ন প্রকার মৃত্তিকার জলধারণ-শক্তি।

(গ) মৃত্তিকার জলের কৈশিকাকর্ষণ।

(ঘ) বিভিন্নরূপ জলসিঞ্চন-প্রণালী।

(ঙ) সাধারণ উদ্যান-রচনা-পদ্ধতি।

শিক্ষার উদ্দেশ্য—সাধারণ উদ্ভিদ্-বিদ্যা, মৃত্তিকাতত্ত্ব, উদ্ভিদ্-পরিচর্য্যা ও পশুখাদ্য সম্বন্ধে, এবং মাঠজ ও শিখীধারী শস্যের চাষ-বাসবিষয়ে, মোটামোটিভাবে জ্ঞানলাভ। তদ্ভিন্ন, পর্য্যবেক্ষণ-শক্তির ক্রমবিকাশ এবং কৃষি-কর্ম্মে অনুরাগ-সৃষ্টিও শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য রহিবে।

হস্তসম্পাদ্য-কার্য্য—জমি-প্রস্তুত, বীজবপন বা বীজরোপণ এবং নিড়ণ-করণ ও অন্যান্য পাইট। নানাপ্রকার ফল, ফুল, ঘাস, আগাছা এবং মাঠজ ও শিখীধারী শস্যের সংগৃহীত বীজ-সংরক্ষণ-পদ্ধতি।

অষ্টমশ্রেণী—দ্বিতীয়বর্ষ।

শিক্ষাস্থল—স্কুল ও স্কুলের বাগান।

শিক্ষার উপকরণ—ঔদ্যানিক কৃষির এবং বিভিন্নপ্রকার ফলন-প্রস্তুতের উপযোগী নানাপ্রকার আবশ্যকীয়দ্রব্য এবং নানাপ্রকার সার ও প্রক্ষনাশক-কীটধ্বংসকারী পদার্থ।

শিক্ষার সময়—প্রতিসপ্তাহে মৌখিক তিন ঘণ্টা এবং ব্যবহারিক সাত ঘণ্টা মাত্র।

শিক্ষণীয় বিষয়—(১) মৌখিক—

(ক) উদ্যান-রচনা—বৃক্ষোৎপত্তির প্রণালী অর্থাৎ ফলন বাধিবার বিভিন্ন পদ্ধতি।

(খ) স্থানীয় যাবতীয় বৃক্ষলতাদির পরিচয়।

(গ) বৃক্ষ-রোপণ-প্রণালী এবং রোপিত বৃক্ষের পরিচর্য্যা।

(ঘ) গাছ-ছাঁটন

(ঙ) মৃত্তিকার উর্ব্বরতা-বৃদ্ধির উপায়।

(চ) বৃক্ষে নানারূপ কীটের উপদ্রব এবং তন্নিবারণের উপায়।

(ছ) শাক-সব্জীর চাষ-প্রণালী।

(ঙ) বিভিন্ন শস্যক্ষেত্রে বিভিন্নরূপ জল-সিঞ্চন-প্রণালী এবং স্থাৎসেতে মৃত্তিকার জলনির্গমনের উপায়।

(ঝ) সারের কথা—গোময়সার, কাঁচা-সার, ধাতবসার, প্রাণীজসার, কৃত্রিমসার প্রভৃতি।

(ঞ) পর্য্যায়ক্রমে শস্যোৎপাদন ও তাহার উপকারিতা।

(২) ব্যবহারিক—

(ক) সার-ব্যবহারের উপকারিতা।

(খ) সাধারণ উদ্যান-রচনা।

(গ) পাত্রে উদ্ভিদ-চাষ।

(ঘ) সার-প্রস্তুত ও সার-সংরক্ষণ।

(ঙ) শস্যধ্বংসকারী কীটনাশক ঔষধ-প্রস্তুত-প্রণালী।

(চ) সাধারণ উদ্যান-রচনা।

শিক্ষার উদ্দেশ্য—উদ্যান-রচনা, কলম-প্রস্তুত-প্রণালী, উদ্ভিদ-পরিচর্য্যা এবং শস্যরক্ষার উপায় শিক্ষা।

হস্তসম্পাদ্য-কার্য্য—নানাবিধ কলম-প্রস্তুত, পাত্রে উদ্ভিদ-চাষ, উদ্ভিদের পরিচর্য্যা এবং সার ও কীটনাশক ঔষধ প্রস্তুত করা।

নবমশ্রেণী—তৃতীয় বর্ষ।

শিক্ষাস্থল—স্কুল ও স্কুলের কৃষি-যন্ত্রাগার।

শিক্ষার উপকরণ—দুধাদি পরীক্ষা করিবার এবং ডিম ফুটাইবার নানাপ্রকার যন্ত্র।

শিক্ষার সময়—প্রতিসপ্তাহে মৌখিক ছয় ঘণ্টা এবং ব্যবহারিক চারি ঘণ্টা মাত্র।

শিক্ষণীয় বিষয়—(১) মৌখিক—

(ক) গো, মেষ, মহিষ, ছাগ প্রভৃতি গৃহপালিত পশুপালন এবং উহাদের সম্বন্ধে জ্ঞাতব্যতথ্যসমূহ।

(খ) মাখন, ছানা, ঘৃত প্রভৃতি গব্য-সামগ্রী প্রস্তুত-প্রণালী।

(গ) গো-পরীক্ষা।

(ঘ) পশুখাদ্য এবং গোশালাদি প্রস্তুত-প্রণালী।

(ঙ) মাংস ও উহার রাসায়নিক উপাদান।

(চ) কুক্কুট, পারাবত, রাজহাঁস প্রভৃতি গৃহপালিত পক্ষীসম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ।

(ছ) গৃহপালিত পক্ষীপালন।

(জ) ডিম ফুটাইবার উপযোগী অণ্ডতাপ-যন্ত্র (Incubator) ও তাহার ব্যবহার-প্রণালী।

(ঝ) গৃহপালিত পক্ষীর বাসোপযোগী গৃহনির্ম্মাণ-প্রণালী।

(ঞ) পাখীর খাদ্য ও যত্ন।

(ট) পাখীর মাংস ও তাহার রাসায়নিক উপাদান।

(২) ব্যবহারিক——

(ক) যন্ত্রের সাহায্যে গব্যসামগ্রী প্রস্তুত-প্রণালী।

(খ) অণ্ডতাপ-যন্ত্রের ব্যবহার-প্রণালী।

শিক্ষার উদ্দেশ্য—গৃহপালিত পশু-পক্ষীপালনসম্বন্ধে মোটামুটি-ভাবে জ্ঞানলাভ।

হস্তসম্পাদ্য কার্য্য—যন্ত্রের সাহায্যে ডিম ফুটান এবং মাখনাদি প্রস্তুত করা।

১০ম শ্রেণী—চতুর্থ বর্ষ।

শিক্ষাস্থল—স্কুল ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার।

শিক্ষার উপকরণ—লাঙ্গল, মদিকা, বিদা প্রভৃতি সাধারণ কৃষির ও ঔদ্ভানিক-কৃষির উপযোগী নানাবিধ যন্ত্র এবং শস্যাদি নাশক নানাবিধ কীটের ও কীটাক্রান্তস্থানের যথাসম্ভব নমুনা।

শিক্ষার সময়—প্রতি সপ্তাহে মৌখিক ছয় ঘণ্টা এবং ব্যবহারিক চারি ঘণ্টা মাত্র।

শিক্ষণীয় বিষয়—(১) মৌখিক——

(ক) কৃষি-যন্ত্র-বিদ্যা—কৃষির উপযোগী যন্ত্র-সম্বন্ধে অবশ্যজ্ঞাতব্য নানা তথ্য।

(খ) কৃষি-যন্ত্রের ব্যবহার-প্রণালী।

(গ) বিজ্ঞানসম্মত গোলাবাড়ী প্রস্তুত।

(ঘ) কৃষিক্ষেত্র-পরিচালনা (Farm management)।

(ঙ) কৃষিকার্য্যের আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখা।

(চ) গোলাবাড়ীর তত্ত্বাবধান।

(ছ) সাময়িক ফল-শস্যের পরিচর্য্যা।

(জ) ফল-শস্যাদি বাছাই ও রপ্তানি করা এবং ফলাদি সংরক্ষণ।

(ঝ) উদ্ভিদ্ এবং গৃহপালিত পশুপক্ষীর-নানাবিধ রোগ ও তরিবারণের উপায়।

(ঞ) নানাপ্রকার রাসায়নিক পদার্থ প্রস্তুত করা এবং তাহার ব্যবহার।

(২) ব্যবহারিক—

(ক) ধূম-প্রয়োগ বা রাসায়নিক জল-সেচন দ্বারা কীটহনন (Spraying & Fumigation)।

(খ) বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে (Laboratory) নানাবিধ কৃষি-যন্ত্রাদির পরীক্ষা।

(গ) নানাপ্রকার জলসেচন-যন্ত্রের ব্যবহার।

শিক্ষার উদ্দেশ্য—কৃষিক্ষেত্র-পরিচালনা ও কৃষি-যন্ত্রের ব্যবহার-সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞানলাভ, কৃষি-জাত-দ্রব্য সংরক্ষণ বা রপ্তানি এবং উদ্ভিদ্ ও গৃহপালিত পশুপক্ষীর রোগ-নিবারণ করা।

হস্তসম্পাদ্য-কার্য্য—ধূম-প্রয়োগ বা রাসায়নিক জলসেচনে কীটহনন, ফলশস্যাদি বা বীজ বাছাই করণ এবং কৃষিজাত ফল-শস্যাদি রপ্তানির উপযোগী করিয়া বাঁধাই (Packing) করা।

কৃষি-শিক্ষা প্রদানের রীতি।

আমাদের দেশের উচ্চবিদ্যালয়সমূহে কৃষিশিক্ষা প্রদান করিতে হইলে কিরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করা বিধেয় এবং কি প্রকার শিক্ষক নিযুক্ত করা আবশ্যক, তাহাও বিশেষভাবে চিন্তনীয়। যাঁহারা আমাদের দেশের কৃষিসম্বন্ধীয় যাবতীয় বিষয় সম্যকরূপে অবগত আছেন, এবং পাশ্চাত্য-কৃষিতত্ত্বও যাঁহাদের অজ্ঞাত নহে; বিশেষতঃ, যাঁহারা বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বনে হাতে-হেতেড়ে চাষ-বাস করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তদ্রূপ উপযুক্ত শিক্ষক নিযুক্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু এরূপ শিক্ষাদাতার সংখ্যা আমাদের দেশে একরূপ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এমতাবস্থায় কৃষিশিক্ষা দিবে কে? ইহা বিশেষ চিন্তার বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, যদি কৃষিশিক্ষার উপযুক্ত চাকরি মিলে, তাহা হইলে কৃষিশিক্ষাদাতার অভাব পূরণ হইতে বেশী সময় লাগিবে না। কারণ, আমাদের দেশের পাশকরা বাবুরা চাকরির গন্ধ পাইলে, দলে দলেই কৃষি-কলেজে (ভারতের প্রায় সকল প্রদেশেই এক একটি কৃষি-কলেজ আছে) প্রবেশ করিবে; এবং তাহারা শিক্ষা লাভ করিয়া আসিয়াই শিক্ষকের অভাব পূরণ করিতে পারিবে। আমাদের সদাশয় গভর্ণমেণ্টের সাহায্য ব্যতীত শিক্ষাদাতার অভাব পূরণ হওয়া সম্ভবপর নহে। আমাদের শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ উচ্চবিদ্যালয়ে কৃষিশিক্ষার ব্যবস্থা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিলে, এবং উচ্চ বিদ্যালয়ে কৃষিশিক্ষার প্রথা প্রবর্ত্তন করিলে, অত্যল্পকালমধ্যেই বহুসংখ্যক শিক্ষক পাওয়া যাইবে। সুতরাং, শিক্ষাদাতার অভাবে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য কখনও ব্যর্থ হইতে পারে বলিয়া মনে হয় না।

একমাত্র মৌখিক শিক্ষা দিলে, কৃষিশিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যাইবে। সুতরাং, মৌখিক ও ব্যবহারিক—এই উভয়প্রকারেই কৃষিশিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। তদ্ভিন্ন, ছাত্রগণ যাহাতে হাতে-হেতেড়ে কার্য্য (মোটামোটভাবে) করিয়া যৎকিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারে, তদ্দিকে শিক্ষাদাতাদিগকে, স্বহস্তে কার্য্য করিয়া, সকল বিষয় চাক্ষুষ

দেখাইয়া দিতে হইবে। যে বিষয়ে শিক্ষা দিতে হইবে, সেই বিষয়ে শিক্ষাদাতার অভিজ্ঞতা রহিলেই চলিবে না, কিরূপে ছাত্রদিগকে অত্যল্পসময়ের মধ্যে শিক্ষণীয় বিষয় সম্যক-রূপে বুঝাইয়া দেওয়া যাইতে পারে, তদ্বিষয়েও তাঁহার অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক। ছাত্রদিগের হৃদয়ে কৃষি-কর্ম্মানুরাগের সৃষ্টি এবং উহাদের হৃদয়ে গ্রাম্যজীবনের আদর্শভাব জাগ্রত করাই শিক্ষকের প্রধান উদ্দেশ্য রহিবে। এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য প্রাকৃতিকবিষয়ে ছাত্রদিগের মনোযোগ বিশেষভাবেই আকর্ষণ করিতে হইবে। শিক্ষক মহাশয় এমনভাবে বক্তৃতা দিবেন, যাহা শুনিয়া ছাত্রগণ কৃষি ও তদানুষঙ্গিক যাবতীয় বিষয়েই মোটামোটিভাবে জ্ঞানলাভ করিতে পারে। তদ্ভিন্ন, ছাত্রগণ যাহাতে দেশের, পল্লীসমাজের ও কৃষকদিগের অবস্থা সম্যকরূপে বুঝিতে পারে, এবং কৃষির সহিত দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শিল্প প্রভৃতির কিরূপ ঘনিষ্টসম্বন্ধ বর্ত্তমান, তাহাও বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয়, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াই শিক্ষাদাতাদিগকে কৃষিশিক্ষা প্রদান করিতে হইবে। এইরূপভাবে শিক্ষা দিতে পারিলেই ছাত্রগণ স্বাধীনভাবে জীবিকার্জ্জনের পন্থা নির্দ্ধারণ করিয়া লইতে সমর্থ হইবে; এবং সর্ব্বান্তঃকরণে কৃষি অথবা ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত রহিবে।

উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্রগণ পর্য্যবেক্ষণ (Observation) দ্বারা, বক্তৃতা শুনিয়া, হাতে-হেতেড়ে কার্য্য করিয়া এবং নির্দ্দিষ্ট কৃষিগ্রন্থাদি পাঠ করিয়াই কৃষিশিক্ষালাভ করিবে। শিক্ষা-প্রণালী উৎকৃষ্ট হইলে, ছাত্রগণের পর্য্যবেক্ষণ, পরীক্ষা (Experiment) এবং উদ্ভাবন শক্তির ক্রমবিকাশ ঘটিবে। কার্য্যক্ষেত্রে এই সকল শক্তির সম্যক্ বিকাশ হইলেই, তাহারা সাফল্যলাভ করিতে পারিবে।

কৃষিশিক্ষার উপযোগী সরঞ্জাম।

উচ্চবিদ্যালয়ে কৃষিশিক্ষার উপযোগী কি কি সরঞ্জাম (equipment) আবশ্যক, তাহা বিদ্যালয়-সংলগ্ন ভূমির পরিমাণ এবং শিক্ষা-প্রণালীর অনুযায়ীই স্থির করিয়া লইতে হইবে। এতদুদ্দেশ্যে অল্পব্যয়েও নানাপ্রকার আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া লওয়া যাইতে পারে। রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদ্-বিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়ার উপযোগী সকল প্রকার যন্ত্রই কৃষিশিক্ষার নিমিত্ত আবশ্যক। তদ্ভিন্ন, অন্যান্য প্রকার যন্ত্রাদিরও প্রয়োজন হইবে। কৃষিশিক্ষার উপযোগী সরঞ্জাম না হইলে, কৃষিশিক্ষা দেওয়া সম্ভবপর নহে। সুতরাং, তজ্জন্য আবশ্যকানুযায়ী অর্থব্যয় করিতেই হইবে। বিশেষতঃ, কৃষিশিক্ষা দিতে হইলে, সামগ্রিক ব্যয়নির্ব্বাহের জন্যও অর্থের আবশ্যক হয়।

কৃষিশিক্ষার নিমিত্ত (১) বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার (Laboratory) নির্ম্মাণ, (২) বিদ্যালয়-সংলগ্ন কৃষিক্ষেত্র (School Farm) স্থাপন এবং (৩) কৃষি-পুস্তকাগার (Agri. School library) প্রতিষ্ঠা—এই ত্রিবিধপ্রকার কার্য্যের জন্যই অর্থব্যয়ের আবশ্যক। এই অর্থ স্কুলের তহবিল হইতেই ব্যয় করিতে হইবে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার না থাকিলে, ছাত্রগণ কোনও বিষয়েই পরীক্ষালব্ধ জ্ঞানলাভ করিতে পারিবে না। ফলে, তাহাদের শিক্ষাও অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে। পরীক্ষাগারে অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্রাদি থাকা চাই। বলা বাহুল্য, শিক্ষাপদ্ধতির অনুযায়ীই যন্ত্রাদি আবশ্যক হইয়া থাকে।

বিদ্যালয়-সংলগ্ন বাগান বা কৃষিক্ষেত্রে শিক্ষার্থী ছাত্রগণ হাতে-হেতেড়ে কার্য্য করিয়া, চাষ-প্রণালী, সঞ্চোৎপাদন এবং উদ্ভিদ-পরিচর্য্যা প্রভৃতি নানাবিষয়েই শিক্ষালাভ করিতে পারিবে। ঐ স্থানে নানাপ্রকার ফল-শস্যাদির চাষ-পরীক্ষা করা হইবে। যথোচিতভাবে কৃষিপরীক্ষা-ক্ষেত্র স্থাপন করিতে পারিলে, তন্নিকটস্থ গ্রামবাসীরাও পরীক্ষার সুফল সন্দর্শন করিয়া নানাবিষয়ে শিক্ষালাভ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইবে। বিভিন্ন শ্রেণীর নিমিত্ত কৃষিক্ষেত্রে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জমি নির্দ্দিষ্ট থাকা আবশ্যক। সাধারণ কৃষি ও ঔদ্যানিক কৃষির উপযোগী আবশ্যকীয় যন্ত্রাদি কৃষিক্ষেত্রে রাখিতেই হইবে। তদ্ভিন্ন, উহাতে একটি বাথারীর ঘর (Lath-house) এবং কৃষিজাত-দ্রব্যের ভাণ্ডারগৃহ (Agricultural store-house) নির্ম্মাণ করাও অত্যাবশ্যক। কৃষিক্ষেত্রের জন্য একজন মালীরও প্রয়োজন হইবে।

কৃষি-পাঠাগার স্বতন্ত্রভাবে না করিলেও চলিবে। স্কুল লাইব্রেরীর একাংশেই কৃষিগ্রন্থাদি রাখিবে। এই পাঠাগার

হইতে প্রয়োজনীয় গ্রন্থাদি নিয়াই ছাত্রগণ পাঠ করিতে পারিবে ও করিবে। কৃষি-পাঠাগারে বিভিন্ন দেশের কৃষিসম্বন্ধীয় সংবাদপত্র এবং সরকারী কৃষি-বিভাগসমূহের প্রচারিত কৃষি-পুস্তিকা এবং কৃষিক্ষেত্রের কার্য্য-বিবরণী (report) প্রভৃতি রাখিতেই হইবে। এই সকল সংবাদপত্র এবং কৃষি-পুস্তিকাদি পাঠেও ছাত্রগণ বিশেষ উপকৃত হইতে পারিবে।

প্রত্যেক বিদ্যালয়েই যান্ত্রাসিক কৃষি-প্রদর্শনী হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই প্রদর্শনীর জন্য নির্দ্দিষ্ট সময় রহিবে। নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই, শিক্ষকগণ স্থানীয় কৃষকদিগের নিকট হইতে নানাপ্রকার ফল-শস্যাদি সংগ্রহ করিয়া, তাহা রীতিমত কাচের পাত্রে রক্ষা করিবেন। ছাত্রগণও এ বিষয়ে যথাসম্ভব সাহায্য করিবে। স্থানীয় কৃষিজাত যাবতীয় পদার্থ ব্যতীত বিভিন্ন স্থানের উৎপন্ন উৎকৃষ্ট ফল-শস্যাদি সংগ্রহ করাও আবশ্যক। নানাপ্রকার মৃত্তিকা, শস্যনাশক নানা প্রকার কীট, নানাপ্রকার বীজ এবং আগাছা প্রভৃতিও কোনরূপ পাত্রে স্থায়ীভাবে রাখিতে (mount) হইবে। তদ্ভিন্ন, নানাপ্রকার চিত্রের সাহায্যেও কৃষিবিষয়গুলি প্রদর্শিত হইবে। প্রদর্শনীর প্রত্যেক বস্তুতেই উহার নাম, উৎপত্তিস্থান এবং পরিচয়জ্ঞাপক বিষয় সংক্ষিপ্তভাবে লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক। এইরূপ প্রদর্শনী দ্বারা কৃষিশিক্ষার্থী ছাত্রগণ বিশেষ উপকৃত হইতে এবং নানাবিষয়েই যৎকিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা লাভ করিতে সমর্থ হইবে। স্থানীয় কৃষকগণও প্রদর্শনী সন্দর্শন করিয়া, অনেক বিষয়েই শিখিতে ও বুঝিতে পারিবে। সুতরাং, প্রদর্শনী-ব্যাপারে তাহারাও যথেষ্ট সাহায্য ও সহানুভূতি প্রদর্শন করিবে।

শ্রীস্বর্ণকুমার মিত্র।

বঙ্গের গো-ধন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

বৈদেশিক গাভীর সাহায্যে যাঁহারা বঙ্গদেশীয় গো-জাতির উন্নতিসাধন করিতে চাহেন, তাঁহাদের অভিমত যে ভ্রমসঙ্কুল, মিঃ ব্ল্যাকউড্ তাহা স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন। ভারত-গবর্ণমেণ্টের ভেটেরিনারি-বিভাগের ভূতপূর্ব্ব ইনস্পেক্টর জেনারেল কার্ণল সাহেবও ভারতের এক প্রদেশের বৃষ দ্বারা অন্য প্রদেশের গোবংশের উন্নতিসাধনের বিরোধী। তিনি বলেন—ভূয়োদর্শনের ফলে, আমাদের এই ধারণা হইয়াছে যে, ভারতের এক প্রদেশের গো অন্য প্রদেশে গিয়া স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে না। ভিন্ন প্রদেশ ত দূরের কথা, একই প্রদেশের অন্তর্গত এক জেলার গো অন্য জেলাতে গিয়া স্বচ্ছন্দতা বোধ করে না। এমতাবস্থায় এক প্রদেশের বৃষ দ্বারা অন্য প্রদেশের গোজাতির উন্নতিসাধনের চেষ্টা করা সর্ব্বথা অনুচিত। সুতরাং, যাহাতে স্থানীয় বৃষের দ্বারাই গো-জাতির উন্নতি সাধিত হয়, তজ্জন্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। সঙ্করজাতীয় গো উৎপাদনের চেষ্টা অনেক স্থলেই নিষ্ফল হইয়াছে। এ দেশীয় কৃষকেরাও সঙ্কর-গাভী উৎপাদনের পক্ষপাতী নহে। কারণ, তাহারা জানে যে, সঙ্করত্ব দ্বারা গোজাতির উন্নতির পরিবর্ত্তে অধিকাংশস্থলে অবনতিই ঘটিয়া থাকে।

মিঃ ব্ল্যাকউডের মতে, বৈদেশিক বৃষের দ্বারা উৎপাদিত গো অনেকস্থলেই দেশীয় সাধারণ গাভী অপেক্ষা ভাল হয় সত্য, কিন্তু এই প্রথা অবলম্বনে সমগ্র বঙ্গের গো-জাতির উন্নতিসাধন সম্ভবপর নহে। যাঁহারা অধিক পরিমাণে দুগ্ধের লোভে অন্য প্রদেশের গাভী ক্রয় করেন, অধিকাংশ-স্থলেই তাঁহাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। এ সম্বন্ধে তিনি বিভিন্ন স্থান হইতে যে সকল উদাহরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহার প্রকাশিত বিবরণী হইতে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

(১) পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার অধীন গোটাইজা গ্রামে গোরলাল ঘোষ নামক একজন গোপ বাস করে। ইহার গোশালায় অন্যূন দেড়শত গাভী ও কএকটি জননকার্য্যোপযোগী বৃষ (Stud bulls) আছে। ঐ গোপ একটিও বিদেশী গাভী পালন করে না। তাহার মতে, বিদেশীয় গাভী পালন করিলে যেরূপ অত্যধিক ব্যয় হয়, তাহার দুগ্ধ হইতে, দেশীয় গাভীর তুলনায়, সেরূপ লাভ হয় না। তাহার গোশালায় যে গাভীটী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুগ্ধ দেয়, উহারও দুগ্ধের পরিমাণ প্রত্যহ /৩ সেরের

অধিক হয় না। এই গাভী হিসার-অঞ্চলের বৃষ ও দেশীয় গাভীর সংযোগে উৎপন্ন হইয়াছে।

(২) ঐ মহকুমাতেই সাহাজাদপুর গ্রামে আর একজন গোয়ালার অন্যূন ৬০টি গাভী আছে। ঐ গোপ একবার শোনপুরের মেলাতে ৩০০৲ টাকা মূল্যে একযোড়া গাভী ক্রয় করিয়াছিল। সে গাভী ক্রয়কালে স্বহস্তে দোহন করিয়া দেখিয়াছিল যে, প্রত্যেকটি গাভীই সাত সের হইতে আট সের পর্য্যন্ত দুগ্ধ দেয়। কিন্তু গাভী দুইটি তাহার সাহাজাদপুরের বাড়ীতে আনয়ন করিবার পর হইতেই ক্রমশঃ দুগ্ধের পরিমাণ কমিয়া যাইতে লাগিল; এবং অবশেষে প্রত্যেকটি গাভীই প্রতিবারে আড়াই সের হইতে তিন সের করিয়া দুগ্ধ দিতে আরম্ভ করিল। গোপ প্রথমে মনে করিয়াছিল যে, বহুদূর হইতে আসাতে (পথক্লেশে) এবং স্থানপরিবর্ত্তনের নিমিত্ত দুগ্ধ কমিয়া গিয়া থাকিবে; সুতরাং, পরবর্ত্তী সন্তান-প্রসবের পর আবার দুগ্ধের পরিমাণ বাড়িতে পারে। এইরূপ মনে করিয়াই, উক্ত গোপ দুগ্ধবৃদ্ধির জন্য প্রথমাবধিই গাভী দুইটিকে নানা প্রকার সারবান খাদ্য প্রদান করিতেও যথোচিত যত্ন করিতে লাগিল। কিন্তু ফলে,—দ্বিতীয়বার সন্তানপ্রসবের পর, সন্তোষজনক পরিমিত দুগ্ধ প্রদানের পরিবর্ত্তে, উহাদের দুগ্ধের পরিমাণ প্রতিবারে দেড়সের হইতে দুইসের পর্য্যন্ত হইল। দুগ্ধের পরিমাণ বৃদ্ধি হইল না সত্য, কিন্তু সারবান খাদ্য ভক্ষণ ও যথোচিত যত্নের ফলে, গাভী দুইটি হৃষ্ট-পুষ্ট এবং স্থূলকায় হইয়া উঠিল।

(৩) দিনাজপুরের 'ভেটেরিনারি এসিষ্টাণ্ট' বিদেশীয় গাভী সম্বন্ধে বলেন,—"বিদেশীয় গাভীর দুগ্ধ-প্রদানের শক্তি প্রতিবার সন্তানপ্রসবের পরই হ্রাস পাইতে থাকে। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, যে গাভী বিদেশে ক্রয়কালে দশসের দুগ্ধ দিয়াছে, সেই গাভীই এ দেশে আসিয়া দ্বিতীয়বার সন্তান প্রসবের পর ছয়সের এবং তৃতীয়বার সন্তানপ্রসবের পর তিন চারি সের মাত্র দুগ্ধ দিয়া থাকে।

(৪) মালদহ জেলায় চকলের রাজা একটি হান্‌সী, একটি হান্‌সী ও নেলোর সংযোগে উৎপন্ন সঙ্কর, একটি ওঙ্গরাটী, একটি ওঙ্গরাটী ও হান্‌সী সংযোগে উৎপন্ন সঙ্কর এবং চারিটি মূলতানী—এই আটটি গাভী ক্রয় করিয়াছিলেন। এই সকল গাভী ক্রয় করিবার পূর্ব্বে, উহাদের প্রত্যেকটি গাভীই প্রতিবারে গড়ে বারসের করিয়া দুগ্ধ প্রদান করিত। কিন্তু এক্ষণ প্রত্যহ গড়ে ছয়সেরের অধিক দুগ্ধ দেয় না।

(৫) ঐ জেলারই ভালুকা নামক স্থানের জমিদার একটি হান্‌সী বৃষ এবং তিনটি ওঙ্গরাটী গাভী ক্রয় করেন। ঐ সকল গাভী ক্রয় করিবার পূর্ব্বে, উহারা প্রত্যেকে প্রতিবারে ১০।১২ সের দুগ্ধ দিত; কিন্তু এক্ষণ পাঁচ সের হইতে ছয় সের মাত্র দুগ্ধ দিতেছে।

(৬) ঐ জেলারই সিংহবাদ গ্রামের জনৈক ভদ্রলোক দশসের দুগ্ধবতী একটি গাভী ক্রয় করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই গাভী এক্ষণ প্রতিবারে মাত্র চারিসের দুগ্ধ দিতেছে।

(৭) ময়মনসিংহ জেলার সেনবাড়ী গ্রামের শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন শোনপুরের মেলাতে ২৩০৲ টাকাতে একটি এবং ৭২৲ টাকাতে আর একটি—এই দুইটি গাভী ক্রয় করিয়াছিলেন। প্রথম গাভীটি শোনপুরের মেলাতে ৩০ সের এবং দ্বিতীয় গাভীটি ৬ সের দুগ্ধ দিত। প্রথম গাভীটির বৎস মরিয়া যায়; এবং রেলপথে ৮ দিন ও স্থলপথে ৮ দিন অতিবাহন করিয়া গাভী দুইটি শোনপুর হইতে সেনবাড়ীতে উপস্থিত হয়। বলা বাহুল্য, উহারা পথে যৎকিঞ্চিৎ খাদ্যই প্রাপ্ত হইয়াছিল। ভাল গাভীটী ওলান ফুলা (Mamnitis) এবং আওতা (Foot and mouth disease) রোগাক্রান্ত হইয়া একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছে। পক্ষান্তরে, দ্বিতীয় গাভীটি প্রত্যহ তিনসের করিয়া দুগ্ধ দিতেছে।

(৮) ঐ গ্রামেরই শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র সেন নামক অন্য একজন ভদ্রলোক পাটনাতে ১৫০৲ টাকা দিয়া একটি গাভী ক্রয় করিয়াছিলেন। ঐ গাভী পাটনাতে ১০ সের করিয়া দুগ্ধ দিত; কিন্তু সেনবাড়ীতে উপস্থিত হইবার পরই, উহার দুগ্ধের পরিমাণ ৮ সের হইয়াছিল। দ্বিতীয়বার সন্তানপ্রসবের পর, উহার দুগ্ধের পরিমাণ সাত সের এবং তৃতীয়বার সন্তানপ্রসবের পর আবার ১০ সের দুগ্ধ হইয়াছিল। যাহা হউক, এরূপ ঘটনা সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় না।

(৯) বীরভূম জেলার বোলপুরে ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষা-আয়তনের সংলগ্ন ভূমিতে মিঃ সন্তোষকুমার মজুমদার একটী বৃহদায়তনের গোশালা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি ঐ গোশালাতে অনেকগুলি মন্টগোমারী গাভী এবং দিল্লীর মুর্হি আনাইয়াছিলেন; এবং উক্ত কলেজের ছাত্রদিগের নিকটই টাকায় /৪ সের হিসাবে সমুদয় দুগ্ধ বিক্রয় করিতেন। কিন্তু তথাপি, তাঁহার ব্যবসায় লাভজনক হয় নাই। ফলে, অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যেই বিদেশীয় গাভী ও মহিষগুলি বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়েন।

অধিক পরিমাণে দুগ্ধ প্রাপ্তির আশায়, ফলাফল বিচার না করিয়াই, যাঁহারা বিদেশীয় গাভী ক্রয় করেন, অধিকাংশস্থলেই যে তাহাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়, উল্লিখিত উদাহরণগুলি তাহারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তবে কোনও কোনও স্থলে যে বিদেশীয় গাভী হইতেও লাভ না হয়, তাহা নহে। কিন্তু ঐ প্রকার গাভী পালন করা কষ্টকর ও ব্যয়সাধ্য। স্থানীয় গাভী এবং রপ্তানিকৃত বৃষের সংযোগে যে সঙ্কর গাভী জন্মে, উহার উন্নেষযোগ্য উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে সত্য, কিন্তু উহাতেও নানারূপ বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। চট্টগ্রামের, সাহেবেরা হান্‌সী ও হিসার জাতীয় গো দ্বারা সঙ্কর উৎপাদনের অনেক চেষ্টা করিয়া, অত্যল্পসংখ্যক স্থলেই কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। প্রায় দশবৎসর পূর্ব্বে, ক্যাটেল (Mr. Cattell) নামক জনৈক চা-কর সাহেব একপাল হান্‌সী-গো (cattle) আনয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ সকল বসন্তরোগে (Rinderpest) মরিয়া যায়। বিগত ১৯০৩ খৃঃ অব্দে, বীরভূম জেলার যে সরকারী 'ডেয়ারি ফার্ম' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, উহার গোগুলিও মরিয়া যায়। ফলে, উহা ১৯০৪ খৃঃ অব্দের মধ্যেই উঠিয়া যায়। ফিন্নি (Mr. Finney) নামক চট্টগ্রামের অন্য আর একজন কৃষক (Planter) হিসার এবং বিহারী গাভী রাখিয়াছিলেন। তাঁহার মতে, বিদেশী গাভী ক্রয়কালে যে পরিমাণ দুগ্ধ দেয়, স্থানান্তরে নীত হইলেই উহার দুগ্ধের পরিমাণ অর্দ্ধেক হইয়া যায়। যে সকল গাভী ক্রয়কালে ৮।১০ সের দুগ্ধ দেয়, উহারা চট্টগ্রামের জলবায়ুসহ হইয়া উঠিলেই ৪ হইতে ৫ সের মাত্র দুগ্ধ প্রদান করে। ঐ পরিমাণ দুগ্ধ দেয়, এরূপ স্থানীয় গাভীও পাওয়া যায়। অথচ, উহাদের পালনের ব্যয়ও, আমদানীকৃত গাভী অপেক্ষা অনেক কম। সুতরাং, বিদেশী গাভী আনয়ন করিলে, কার্য্যতঃ কিছুই লাভ হয় না।

সঙ্কর-গাভী উৎপাদনের ফলাফলসম্বন্ধে মিঃ ব্ল্যাকউড্ যাহা লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহাই উদ্ধৃত করা গেল :—

১। বর্দ্ধমানের নিকটবর্ত্তী অনেক গ্রামেই, স্থানীয় গাভী এবং হিসার-বৃষ হইতে উৎপন্ন সঙ্কর-গাভী, সাধারণতঃ স্থানীয় গাভী অপেক্ষা, অধিক দুগ্ধ দিয়া থাকে।

(২) যশোহর জেলার কোটচাঁদপুর নামক গ্রামে ম্যাক্‌লিওড্ সাহেব (Mr. Mac-Leod) হিসার-বৃষের সাহায্যে, ঐ স্থানের গোজাতির উৎকর্ষসাধনে সমর্থ হইয়াছেন। কিন্তু চকলের রাজা আয়ার-শায়ার-বৃষ ও হান্‌সী গাভীর মিলনে সঙ্কর-গাভী উৎপাদনের চেষ্টা করিয়া সম্পূর্ণরূপে অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। কারণ, ঐ সঙ্কর-জাতীয় একটি বৎসও দীর্ঘজীবী হয় নাই।

(৩) নদীয়া—রাণাঘাটের মিঃ বি, পাল চৌধুরী স্থানীয় গোজাতির উন্নতিসাধনের জন্য একটি আয়ার-শায়ার-বৃষ ক্রয় করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, স্থানীয় গাভী ও ঐ বৃষ সংযোগে উৎপন্ন গাভীগুলি প্রত্যহ পাঁচসের করিয়া দুগ্ধ দিতেছে। উক্তরূপে উৎপন্ন একযোড়া সঙ্কর-বৃষ ৫০ মণ মালবোঝাই একখানা গাড়ী অনায়াসে ১০ মাইল টানিয়া লইয়া যাইতে পারে। পক্ষান্তরে, দেশীয় বৃষ ২০ মণের অধিক মালবোঝাই গাড়ী সহজে টানিতে পারে না। তবে সঙ্করজাতীয় বৃষ ও গাভী সকলের সর্ব্বদা নানাপ্রকার পীড়া হইয়া থাকে। সুতরাং, এক্ষেত্রেও গোজাতির উন্নতির চেষ্টার ফল যে আশানুরূপ হইয়াছে, তাহা বলা যায় না।

মিঃ ব্ল্যাকউডের মতে, যদি সঙ্কর-জাতীয়-গাভী উৎপাদন করিতেই হয়, তাহা হইলে যাহাতে বৃষ ও গাভীর মধ্যে অনেক বিষয়ে সমতা থাকে, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। সম্পূর্ণ বিভিন্ন জাতীয় বৃষ ও গাভীর সংযোগে শুভফলের আশা করিতে পারা যায় না।

বঙ্গের—বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গের জলবায়ু বলিষ্ঠ ও বড় জাতীয় গাভী অথবা বৃষ পালনের পক্ষে উপযোগী নহে। বর্ষাকালই উক্তরূপ গবাদি পালনের পক্ষে বিশেষ অনুপযোগী সময়। কারণ, তৎকালে অনেকস্থানেই বর্ষার জলপ্লাবনে ডুবিয়া যায় বলিয়া, গবাদি দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে, এরূপ শুষ্কস্থানেরও অভাব হয়। যাহা হউক, এই জলবায়ু ব্যতীতও, এ দেশের গোজাতির ক্রমাবনতি ঘটিবার, আরও কতকগুলি আনুষঙ্গিক বা প্রধান কারণ আছে। তন্মধ্যে, গোচর-ভূমির অভাবই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সাধারণ কৃষকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারাও বলে যে, ঘাসের অভাবেই গোজাতির ক্রমাবনতি ঘটিয়াছে।

ঘাসের অভাব বা পশুখাদ্যের পরই, জননকার্য্যোপযোগী বৃষের অভাবের কথা উল্লেখ করা যায়। মিঃ ব্ল্যাকউডের মতে, গোচারণ মাঠের অভাবই গো-জাতির অবনতির প্রত্যক্ষ কারণ; সুস্থকায় বৃষের অভাব পরোক্ষ কারণ মাত্র। সাধারণতঃ, কর্ষণকার্য্যোপযোগী (পূর্ণবয়স্ক) না হইলে, বৃষের মুষ্কচ্ছেদন করা হয় না। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই, অর্থাৎ বৃষের যৌবনপ্রাপ্তির পূর্ব্বেই, অনেকস্থলে বৃষের দ্বারা জননকার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, ঐ সকল অপ্রাপ্ত-যৌবন বৃষের ঔরসজাত বৎস সুস্থ, সবল ও উন্নত হইতে পারে না। তাঁহার মতে, এ দেশীয় গোজাতির অবনতির তৃতীয় কারণ—শৈশবকালে গো-বৎসের পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব। সমগ্র বঙ্গদেশের সাধারণ গাভী প্রত্যহ গড়ে একসেরের অধিক দুগ্ধ দেয় না। কোনও গাভী যদি একবারে দুইসের দুধ দেয়, তাহা হইলে বঙ্গদেশে উহা ভাল গাভী বলিয়া বিবেচিত হয়। বঙ্গের তিনসের দুগ্ধবতী গাভী খুব ভাল; এবং চারি সের দুগ্ধ প্রদান করিলে, উহা অত্যুৎকৃষ্ট গাভী বলিয়া কথিত হয়। চারি সেরের অধিক দুগ্ধ দেয়, এরূপ এ দেশীয় গাভী বিরল। দুগ্ধবতী গাভীর কি পরিমাণ দুগ্ধের অংশ উহার বৎসকে পান করিতে দেওয়া হয়, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য, ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে, কর্তৃপক্ষ একবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। অনুসন্ধানের ফলে জানা যায় যে, বাঙ্গালার কোনও স্থলেই বৎসকে গাভীর অর্দ্ধেকের অধিক দুগ্ধ পান করিতে দেওয়া হয় না। সাধারণতঃ সিকি পরিমাণের অধিক দুগ্ধ গো-বৎস পান করিতে পায় না। অনেকস্থলে একদশমাংস ভাগ মাত্র বৎসকে পান করিতে দেওয়া হয়। বৎসের এই যে দুগ্ধ-খাদ্যাভাব হয়, তাহা অন্য কোনপ্রকার খাদ্য দ্বারা সর্ব্বাংশে পূরণ করা যায় না। দুগ্ধের মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই, গো-বৎসেরও পানীয় দুগ্ধে টান পড়ে। পুষ্টিকর খাদ্য দ্বারা দুগ্ধের অভাব অনেকটা পূরণ করিতে পারা যায় সত্য, কিন্তু পুষ্টিকর খাদ্য দূরে থাকুক, অনেকস্থলে উহারা যথোচিত পরিমাণে খাইতেও পায় না! দুগ্ধবতী গাভী দুগ্ধদানে বিরত হইলেই, তাহার খাদ্যের পরিমাণ কমাইয়া দেওয়া হয়। সুতরাং, তৎকালে বৎসেরও খাদ্যাভাব ঘটে। যথোচিত পরিমাণে মাতৃস্তন্য পান করিতে না পারাতেই, এ দেশের গাভী ক্রমেই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। শৈশবকালে দুগ্ধাভাব এবং উত্তরকালে সারবান খাদ্যের অভাব; এমতাবস্থায়, এ দেশের গাভীর তুষ্টি-পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও শক্তি অক্ষুণ্ণ রহিতে পারে না।

মিঃ ব্ল্যাকউড্ বঙ্গের বিভিন্ন জেলার, লোকসংখ্যার তুলনায়, গো-মহিষের যে সংখ্যা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা হইল। গো-মহিষের সংখ্যা বলিতে,—গাভী, বলদ (Bullock) বৃষ (Bull) এবং মহিষ ও মহিষীর মোট সংখ্যাই বুঝিতে হইবে।

প্রেসিডেন্সি-বিভাগ।

জেলার নাম।		গো-মহিষের সংখ্যা।	লোকসংখ্যা।
নদীয়া	...	১০৩৩০৬৮	১৬১৭৮৪৬
খুলনা	..	৮৮৫৫৫৫	১৩৬৬৭৬৬
২৪-পরগণা	...	১০৩২৮৫৭	২৪৩৪১০৪
যশোহর	..	১০৮৪০৪৭	১৭৫৮২৬৪
মুর্শিদাবাদ	...	৭৮০০৭০	১৩৭২২৭৪
		মোট—৪০১৫৫৯৭	৮৫৪৯২৫৪

বর্দ্ধমান-বিভাগ।

বাঁকুড়া	...	৭৮৩১৯৩	১১৩৮৬৭০
মেদিনীপুর	...	১৯০৭৪৫৩	২৮২১২০১
বর্দ্ধমান	...	১০৫৪৭৫৯	১৫৩৮৩৭১
হুগলী	...	৫১৫৩৪৮	১০৯০০৯৭
হাওড়া	...	২৬৬০৯৬	৯৪৩৫০২
বীরভূম	...	৭০৬৬৯৮	৯৩৫৪৭৩
		মোট—৫২৩৩৫৪৭	৮৪৬৭২৯৪

রাজসাহী-বিভাগ।

রাজসাহী	...	১০৪৮৫৬৯	১৪৮০৫৮৭
দিনাজপুর	...	১৮২৬৫৩০	১০৮৭৮৬৩
রঙ্গপুর	...	১৬৫২১৪৭	২৩৮৫৩৩০
জলপাইগুড়ী	...	৯১২৯৭৭	৯০২৬০০
দার্জ্জিলিং	...	১৫৪৪৬৭	২৬৫৫৫০
পাবনা	...	৭২৯৭৭২	১৪২৮৫৮৬
বগুরা	...	৫৯৫৮৯৫	৯৮৩৫৬৭
মালদহ	...	৭৪৩৩৮৮	১০০৪১৫৯
		মোট—৭৭০৩৭৪৫	১০১৩৮২৪২

ঢাকা-বিভাগ।

ঢাঁকা	...	১৩৩৫৮৯১	২৯৬০৪০২
ময়মনসিংহ	...	১৭০৩২৮৭	৪৫২৬৪২২
ফরিদপুর	...	৮৯৫৯৩৫	২১২১৯১৪
বাকরগঞ্জ	...	১৩৮৩৫৯৪	২৪২৮৯১১
		মোট—৫৩১৮৭০৭	১২০৩৭৬৪৯

চট্টগ্রাম-বিভাগ।

চট্টগ্রাম	...	৬৪৪৬৭০	১৫০৮৪৩৩
নোয়াখালী	...	৫৪০৩৪৮	১৩০২০৯০
ত্রিপুরা	...	৯৮৮৮৫৮	২৪৩০১৩৩
পার্ব্বত্য-চট্টগ্রাম	...	৭৮৪৫২	১৫৩৮৩০
		মোট—২২৫২৩২৮	৫৩৯৪৪৮৬

মহুয়া।

(Bassia Latifolia).

মহুয়ার সংস্কৃত নাম মধুক বা মধুদ্রুম। এই মধুক শব্দই অপভ্রংশে মহুয়া বা মহুলে রূপান্তরিত হইয়াছে। জন্মস্থান ভারতবর্ষ বলিয়া, ভারতের অধিকাংশস্থানেই প্রচুর পরিমাণে মহুয়াগাছ জন্মে এবং অযত্নেই সতেজে বর্দ্ধিত ও ফলপ্রসূ হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের মধ্যে ছোটনাগপুর, বিহার, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও হায়দরাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলে অগণিত মহুয়াগাছ রহিয়াছে। কিন্তু ভারতের কুত্রাপি মহুয়ার চাষ-প্রথা প্রচলিত নাই।

মধুকবৃক্ষ পূর্ণরূপে বর্দ্ধিত হইলে আম্রবৃক্ষের ন্যায় প্রকাণ্ড হয়। এই গাছের কাণ্ড সাধারণতঃ ৬।৭ হস্তের অধিক দীর্ঘ না হইলেও যথোচিত স্থূল হইয়া থাকে। মধুকবৃক্ষের পত্রের আকার অনেকটা অশ্বত্থের অনুরূপ হইলেও, উহা তীক্ষ্ণাগ্রযুক্ত হয়। মহুয়াগাছের পাতা কাঁঠালপাতা অপেক্ষা অধিক লম্বা, গাঢ় সবুজবর্ণের এবং বেশ পুরু হইয়া থাকে। কঠিন নীরস মৃত্তিকায় জন্মে বলিয়া, মহুয়াগাছের শিকড়গুলি মৃত্তিকাভ্যন্তরে অধিক নিম্নে প্রবিষ্ট হয় না;—সরলভাবে চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এই বৃক্ষের বল্কল স্থূল, শক্ত ও লালাভ বর্ণের হয়; এবং উহাতে আঘাত লাগিলেই একপ্রকার নির্ম্মল নির্য্যাস নির্গত হইয়া থাকে। মাঘ ফাল্গুন মাসেই মহুয়াগাছের পাতা পড়িয়া যায়। তৎপর, একমাসের মধ্যেই প্রত্যেকটি প্রশাখায় ৪০।৫০টি নূতন পত্র জন্মে; এবং তৎকালেই উহা পুষ্পধারণ করে। প্রত্যেকটি ডালায় ৭।৮ ইঞ্চি এক একটি বোঁটায় গুচ্ছাকারে ফুল বাহির হয়। মহুয়াফুলগুলি নিম্নাভিমুখে রহে বলিয়া, উহাতে ফল জন্মিবার পর, সহজেই উহা ভূপতিত হয়। এই ফুলের আকার কিঞ্চিদধিক এক ইঞ্চি; এবং উহা হরিদ্রাভ শ্বেতবর্ণের ও দেখিতে সুন্দর। চৈত্র বৈশাখ মাসেই মহুয়াগাছের সকল ফুল ঝড়িয়া পড়ে; এবং তৎপরই ফল পাকিতে আরম্ভ করে। মহুয়া-ফল দুই প্রকারের হয়;—এক প্রকার ছোট সুপারীর মত দেখায় এবং অন্যপ্রকার তদপেক্ষা বড় হইয়া থাকে। এই ফল পরিপক্ক হইয়া উঠিলেই মাটিতে পড়িয়া যায়। বৈশাখমাসের শেষভাগ হইতেই ফল পড়িতে আরম্ভ করে এবং জ্যৈষ্ঠমাসের শেষভাগ পর্য্যন্ত পতিত হইয়া থাকে। মহুয়াফল সুকোমল বলিয়া, মাটিতে পড়িবামাত্রই ফাটিয়া যায়; ফলে, তন্মধ্যস্থ বীজ বাহির হইয়া পড়ে। ফলের খাদ্যাংশ মাখনের মত কোমল। মহুয়াফলের বীজ প্রায় এক ইঞ্চি দীর্ঘ হয়।

মহুয়াফুল শুষ্ক করিয়া, অথবা সংগ্রহ করিবার পর কাঁচা অবস্থায়, উহা খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। এই ফুল বিহারবাসীরা তরকারীরূপে রন্ধন করিয়াও খায়। অন্নকষ্ট উপস্থিত হইলে, সিদ্ধ মহুয়াফুল ভক্ষণ করিয়াই, সাঁওতালেরা

দুই তিন মাসকাল যাপন করে। পূর্ণরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত একটি মহুয়াগাছের তলায় প্রতিবৎসর ৫।৬ মণ ফুল কুড়াইয়া পাওয়া যায়। ঐ পতিত ফুল সংগ্রহ করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিলে, উহা স্বাদে ও গন্ধে কতকটা মনক্কার মত হয়। কোনও কোনও স্থলে শুষ্ক মহুলপুষ্প অন্নের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এক একটি গাছ হইতে যে পরিমাণে শুষ্ক ফুল প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই পরিমাণ চাউল বা গোধূমের পরিবর্ত্তে উহা ব্যবহৃত হইতে পারে। বিহারের গরিব লোকেরা অন্নের সহিত সিদ্ধ মহুলফুল মিশাইয়া খায়। উহা খাইতেও নিতান্ত মন্দ লাগে না। দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে দরিদ্রব্যক্তিরা এই খাদ্য ভক্ষণ করিয়াও কিছুদিন প্রাণধারণ করিতে পারে। মহুয়াফুল পুষ্টিকর খাদ্য। এই ফুলের পাঁপড়ি অন্যান্য দ্রব্যের সহিত পচাইয়া ও চুয়াইয়া লইয়া একপ্রকার অতি সুলভ মূল্যের তীব্র মদিরা প্রস্তুত করা হয়। ফুল পচাইয়া মদ্য প্রস্তুত করা হয় বলিয়া, উহা পচাই-মদ নামে খ্যাত। বিহারের অধিকাংশ স্থানেই খোলাভাঁটি আছে; ঐ সকল খোলা-ভাঁটিতে যে পচাই-মদ প্রস্তুত হয়, উহার মূল্য এত সুলভ যে, কাঁচি একসের মদ একপয়সা মূল্যেই বিক্রীত হইয়া থাকে। সুতরাং, দুই এক পয়সার মহুয়াফুলের মদই একজন মদ্যপায়ীর নেশার পক্ষে যথেষ্ট। পচাই-মদ হইতে, ব্রাণ্ডি প্রভৃতি বিলাতি মদ অপেক্ষা কম অনিষ্টকর। মহুয়াফুল জলে সিদ্ধ করিয়া একপ্রকার খোলাগুড় প্রস্তুত করা হয়। এই গুড় খেঁজুরেগুড় অপেক্ষা কোনও অংশে হীন হয় না সত্য, কিন্তু উহা তত পরিষ্কার বা দানাদার নহে বলিয়া সুলভ মূল্যেই বিক্রীত হইয়া থাকে। শুষ্ক মহুয়া-ফুল দুগ্ধবতী গাভীর পক্ষে উপাদেয় ও পুষ্টিকর খাদ্য। ইহা খাইলে গাভীর দুগ্ধের পরিমাণ অধিক ও শক্তি বৃদ্ধি হয়।

মহুয়ার বীজ হইতে একপ্রকার শুভ্র তৈল পাওয়া যায়; উহা দেখিতে অনেকটা ঘৃতের মত। মূল্য সুলভ বলিয়া, ইহা ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করা হয়। তদ্ভিন্ন, মহুয়াবীজের তৈল পাককার্য্যে, ঔষধরূপে এবং প্রদীপে আলাইবার জন্যও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নানাপ্রকার চর্ম্মরোগ এবং ক্ষতরোগের পক্ষে, ইহা বিশেষ উপকারক। দেশীয় ঘানিতে মহুয়াবীজ পেষণ করিয়াই তৈল বাহির করা হয়। তৈল বাহির করিয়া লইলে যে খৈল অবশিষ্ট রহে, উহা গবাদি গৃহ-পালিত জন্তুর আহার্য্য। নারিকেলতৈলের ন্যায়, সাবান ও মোমবাতি প্রস্তুত করিতেও মহুয়াবীজের তৈল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই তৈল জ্বালাইবার সময় কোনরূপ দুর্গন্ধ বা ধূম নির্গত হয় না; সুতরাং, উহা জ্বালাইবার পক্ষে উত্তম। উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশে মহুয়া-তৈলের সহিত আতরাদি মিশ্রিত করিয়া, 'ফালুদা' (Phuloa) নামক একপ্রকার সুগন্ধি তৈল প্রস্তুত করা হয়। প্রথমাবস্থায় মহুয়া-তৈল, সাধারণ তৈলের ন্যায়, তরলাবস্থায় রহে; কিন্তু তৎপর, উহা ঘন হইয়া যায়। তদবস্থায়, উহা হইতে দুর্গন্ধ বাহির হয়। ঘানিতে তৈল বাহির হইবার পরই, উহা পরিষ্কার করিয়া লইতে পারিলে কখনও দুর্গন্ধ বাহির হয় না। বিলাতে প্রত্যেক টন (২৭।০ মণ) মহুয়াতৈল প্রায় ৬০০৲ মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। বিহার হইতে মহুয়াবীজের তৈল নানাস্থানে রপ্তানি হইয়া যায়। পূর্ণরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত একটী মহুয়াগাছের ফল হইতে দুই মণ বা ততোধিক বীজ সংগ্রহ করিতে পারা যায়। এই বীজে ।৬ সেরের অধিক তৈল নির্গত হয় না। ছাপরা-অঞ্চলের গাছেই, অন্যান্য স্থান অপেক্ষা, অধিক পরিমাণে ফল-ফল জন্মে। সুতরাং, তথাকার গাছ হইতেই অধিক পরিমাণে বীজ ও তৈল পাওয়া যায়।

মহুয়াফুলে অন্যান্য ফুলের তুলনায়, অধিক পরিমাণে মধু রহে। এই মধুপান করিয়া, মধুকরেরা বড় বড় মৌচাক প্রস্তুত করে। সাঁওতালেরা বৃক্ষকোটর এবং পাহাড়ের গর্ত্ত অনুসন্ধান করিয়া, ঐ সকল চাক্ হইতে প্রচুর পরিমাণে মধু সংগ্রহ করিয়া থাকে। এক একখানি চাক্ হইতে ৩।৪ সের বা ততোধিক পরিমাণে মধু পাওয়া যায়। মহুয়াফুলের মধু অতিশয় সুমিষ্ট; কিন্তু উহাতে কিঞ্চিৎ মাদকতা রহিয়াছে।

মহুয়াগাছের পাতা খাইয়া তসর-পোকা সুন্দর কোয়া প্রস্তুত করে। তদ্ভিন্ন, গবাদি পশুরাও উহা আগ্রহের সহিত ভক্ষণ করিয়া থাকে। মহুয়াগাছের আঁঠা ঔষধ প্রস্তুত-কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। কাঠের হিসাবেও, মহুয়া-কাষ্ঠ

উত্তম। এই কাষ্ঠের দ্বারা নৌকাদি জলযান প্রস্তুত করিলে, উহা বহুকাল স্থায়ী হয়। মহুয়া-কাষ্ঠ দ্বারা গৃহকার্য্যের উপযোগী নানাবিধ দ্রব্যও প্রস্তুত হইয়া থাকে।

অনুর্ব্বর পার্ব্বত্য-প্রদেশে—যেখানে কোনরূপ উদ্ভিদই জন্মে না, সেখানেও মহুয়াগাছ জন্মে। শালগাছের ন্যায়, মহুয়াগাছের, পার্শ্বেও কোনরূপ আগাছা বা ক্ষুদ্র গাছ জন্মিতে পারে না। এমন কি, মহুয়াগাছের নিকটে কোনও বড়গাছ রহিলে, তাহাও অধিককাল জীবিত রহে না। মহুয়াগাছের বৃদ্ধি ও পুষ্টি সাধনের নিমিত্ত জলের বড় প্রয়োজন হয় না বলিয়াই, উহা নীরস ও কঠিন মৃত্তিকায়ও স্ফূর্ত্তিলাভ করিতে এবং ফলপ্রসূ হইতে পারে। সর্ব্বপ্রকার উচ্চভূমিতেই মহুয়াগাছ জন্মে। সুতরাং, সর্ব্বত্রই ইহার চাষ করা যাইতে পারে। বর্ষাকালের মধ্যভাগে হাপোর বা বীজতলায় বীজ বপন করিলে যে চারা জন্মে, এই সকল চারাই নির্দ্দিষ্ট স্থানে শ্রেণীবদ্ধভাবে রোপণ করা প্রশস্ত। প্রত্যেকটি চারা ২০।২৫ হাত দূরে দূরে রোপণ করিতে হয়। সুতরাং, প্রতিবিঘায় আটটির অধিক গাছ রোপণ করা যায় না। রোপণের পর গাছগুলি মাটিতে লাগিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত, অর্থাৎ প্রথম দুই এক বৎসর গাছের একটু যত্ন করিতে হয় সত্য, কিন্তু তৎপর আর উহার কোনরূপ যত্নেরই আবশ্যক হয় না। মহুয়াগাছ ৭।৮ বৎসরের হইলেই, উহাতে ফুল ধরে; এবং ১০।১২ বৎসরের গাছে প্রায় অর্দ্ধেক পরিমাণে ফুল জন্মে। গাছগুলি ২০।২৫ বৎসরের পূর্ব্বে পূর্ণরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না; সুতরাং, তৎপূর্ব্বে উহাতে পূর্ণপরিমাণে ফুল-ফল জন্মে না। পূর্ণরূপে বর্দ্ধিত গাছ প্রায় একশত বৎসর পর্য্যন্ত ফলপ্রসূ হইয়া থাকে।

বরোদার গেইকোঁয়ার মহুয়া-ব্যবসায়ের বিস্তৃতির উদ্দেশ্যে, তাঁহার রাজ্যের মহুয়া-ফুল, মহুয়াবীজের তৈল প্রভৃতি পরীক্ষার্থ ইংলণ্ডে পাঠাইয়াছিলেন। তথাকার রসায়নতত্ত্ববিদেরা ঐ সকল পরীক্ষা করিয়া, মহুয়াফুল গৃহপালিত পশুর পক্ষে বিশেষ পুষ্টিকর খাদ্য এবং উহা মদ্য প্রস্তুতের পক্ষেও বিশেষ উপযোগী—এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। গৃহপালিত পশুরা মহুয়াফুল খাইতে ভালবাসে। ইহা গবাদি পশুর স্ফূর্ত্তি ও পুষ্টি কর খাদ্য। বিশেষতঃ, ইহা ভক্ষণ করিলে, উহাদের সহজে কোনরূপ পীড়া জন্মিতেও পারে না।

লকহার্ট সাহেব (Mr. Lockhard—an Indian Civilian) প্রায় ২৪ বৎসর পূর্ব্বে, একখানি ইংরেজী সংবাদপত্রে লিখিয়াছিলেন—"বিলাতে মহুয়াফুলের আদর হইলে, ভারতবাসী বিশেষ উপকৃত হইতে পারে। ভারতের নানাস্থানেই মহুয়াগাছের যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বন রহিয়াছে, সেই সকল বনের মালিকেরা বৎসামান্য অর্থই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বিলাতে মহুয়াফুলের আদর হইলে, এই সকল মহুয়া-বনের মালিকেরা প্রচুর অর্থই প্রাপ্ত হইবে। অধিকন্তু, মহুয়াফুল সংগ্রহ করিয়া সহস্র সহস্র লোক জীবিকার্জ্জন করিতে সমর্থ হইবে।" বিলাতে এতদিন মহুয়াফুলের যথোচিত আদর হয় নাই; বিশেষতঃ, এ দেশবাসীরাও ব্যবসায়ের হিসাবে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে মহুয়াফুল সংগ্রহ করিয়া বিলাতে পাঠাইতে পারে নাই। সুতরাং, লকহার্ট সাহেবের উক্তিও সার্থক হইয়াছে বলা যায় না।

সম্প্রতি হায়দরাবাদ-রাজ্যে শিল্পাদির উন্নতিকল্পে যে চেষ্টা হইতেছে, তাহাতে মহুয়াফুলের অনেক গুণ প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। হায়দরাবাদ-রাজ্যের শিল্পবিভাগের কর্ত্তা (Revenue Director General) মিঃ জি, ই, সি, ওয়েকফিল্ড মহুয়াফুলের শিল্পোচিত ব্যবহারসম্বন্ধে নানারূপ পরীক্ষা করিয়াছেন। তিনি বলেন,—হায়দরাবাদে প্রতি-বৎসর ত্রিশলক্ষ বা ততোধিক টাকার চিনি বিদেশ হইতে আমদানী করা হয়। আমি প্রথমতঃ, চিনির আমদানী বন্ধ করিবার অভিপ্রায়ে, মহুয়াফুল হইতে চিনি প্রস্তুতের চেষ্টা করিয়াছিলাম। পরীক্ষার ফলে জানা যায় যে, মহুয়াফুলে যথেষ্ট শর্করা আছে। সুতরাং, উহা হইতে চিনি ও গুড় প্রস্তুত করিবার বন্দোবস্ত করিলে, বিদেশ হইতে এই সকল জিনিষ আমদানী করিবার প্রয়োজনীয়তা অনেক হ্রাস হইতে পারে। মহুয়াফুলে শর্করা ব্যতীত এসিটিক এসিড্, এসিটোন্, সুরাসার ও মটোরস্পিরিট প্রভৃতিরও ভাগ আছে। ইউরোপীয় যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে এসিটোনের কথা বড় একটা চিন্তা করি নাই। গত বৎসর নীলগিরির

কার্ডাইট্ ফ্যাক্টরির কর্ণেল বেবিংটন বলেন যে, ঐ কারখানায় ধূমহীন বারুদ ইত্যাদি প্রস্তুতের জন্য কানাডা হইতে 'এসিটোন' নামক রাসায়নিক উপাদান আনয়ন করা হয়। কার্ডাইট্ প্রস্তুত করিতে এসিটোনের বিশেষ আবশ্যক। কানাডায় কাঠ হইতে যে এসিটোন বাহির করা হয়, তাহার এক টন বাহির করিতে একশত টন কাঠ লাগে। ঐ কাঠের গুঁড়া জলে সিদ্ধ করিয়াই এসিটোন বাহির করা হয়। কিন্তু মহুয়াফুল হইতে অতি সহজেই এসিটোন প্রস্তুত করা যায়। উক্ত কর্ণেল বেবিংটন সাহেবের পরমর্শমত, আমি ভারত-গবর্ণমেণ্টকে এই বিষয় জ্ঞাপন করি। তৎপর, লণ্ডনের সামরিক বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণকে ঐ বিষয় জানাইলে, তাঁহারা হায়দরাবাদ হইতে মহুয়াফুল লইয়া গিয়া পরীক্ষা করেন। পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক হওয়াতে, ষ্টেট্ সেক্রেটারী বাহাদুর প্রসিদ্ধ রসায়নতত্ত্ববিদ্ ডাক্তার কাউলারকে ভারতে প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি আসিয়া নাসিক-নগরে মহুয়াফুল হইতে এসিটোন প্রস্তুতোপযোগী কল-কারখানা স্থাপন করিতেছেন। এ জন্য গভর্ণমেণ্টের ৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। তদ্ভিন্ন, হায়দরাবাদ হইতে ইতিমধ্যে ৭০,০০০৲ টাকার মহুয়াফুলও ক্রয় করা হইয়াছে। কার্ডাইট্ ব্যতীত আলো ও অন্যান্য প্রয়োজনেও এসিটোন ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

এসিটোন ব্যতীত, মহুয়াফুল হইতে মটোর-স্পিরিটও বাহির করা হইতেছে। এই স্পিরিট দ্বারা মটর গাড়ী এবং অন্যান্য এঞ্জিন আদি সহজেই চালিত হইতে পারে। অথচ, মহুয়া-স্পিরিটের ব্যয় পেট্রোলের অর্দ্ধেক মাত্র। মহুয়াবীজ হইতে যে তৈল পাওয়া যায়, তদ্দ্বারা ইউরোপে বহুবিধ তৈলাক্ত দ্রব্য প্রস্তুত হয়। এই তৈলের সহিত তুলার বীজের তৈল মিশাইয়া 'মারগারাইন' নামক এক প্রকার পদার্থ প্রস্তুত হইতেছে; তদ্দ্বারা যে মাখন প্রস্তুত হয়, তাহাতে ও খাঁটী মাখনে নাকি কোন পার্থক্য দেখা যায় না। মহুয়াফুল হইতে এসিটিন্ ও গ্ল্যাসিয়েল এসিটেট্ নামক রাসায়নিক পদার্থ প্রস্তুত হয়; এবং তদ্দ্বারা কৃত্রিম রেসম ও অন্যান্য জিনিষ প্রস্তুত হইয়া থাকে। সুতরাং, উক্ত লকহার্ড সাহেবের উক্তি এতদিন পরে সার্থকতালাভ করিয়াছে, বলা যায়। বস্তুতঃ, এক্ষণ মহুয়ার চাষ ও ব্যবসায়ের দ্বারা এ দেশের শিল্প-বাণিজ্যে যুগান্তর ঘটিবারই সূত্রপাত হইয়াছে।

বঙ্গের চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরা প্রভৃতি জেলায় এবং ঢাকা জেলার ভাওয়াল-পরগণায় অনায়াসেই মহুয়ার চাষ হইতে পারে; এবং তাহাতে একটা অর্থাগমেরও নূতন দ্বার উদ্ঘাটিত হইবে। এ বিষয়ে কৃষিকার্য্যে সংলিপ্ত শিক্ষিত-ব্যক্তিদিগের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। ভাওয়াল-পরগণায় বহুস্থান অনাবাদি অবস্থায় পতিত রহিয়াছে। এই সকল স্থান বন্দোবস্ত লইয়া, উহা কৃষি-কার্য্যোপযোগী করিতে বহু অর্থব্যয়ের প্রয়োজন। এই জন্য কেহই উহার বন্দোবস্ত লইতেছেন না। ফলে, এই সকল স্থান বহুকাল হইতেই পতিত রহিয়াছে। পতিত স্থান বন্দোবস্ত লইয়া, তাহাতে মহুয়ার চাষ করিতে পারিলে, অল্পব্যয়েই একটা স্থায়ী আয়ের উপায় করা যাইতে পারে। আমি ভাওয়ালের লাল মাটিতে মহুয়া-গাছ লাগাইয়া দেখিয়াছি, উহা মহুয়াচাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। অনাবাদী পতিত স্থানে মহুয়ার চাষ করিতে পারিলে, লাভের পরিমাণ অধিক হইবে না সত্য, কিন্তু যাহা হইতে কিছুই উৎপন্ন হয় না, তাহাতে যৎসামান্য লাভও মন্দ নহে। বিশেষতঃ, উহাতে জমিদার ও কৃষক—উভয়েরই যৎকিঞ্চিৎ আয় বাড়িতে পারে।

শ্রীহলধর বাবু।

করি কি?

(উদ্ধৃত)

অন্ন-সমস্যাই বর্ত্তমান বাঙ্গালী গৃহস্থের সর্ব্বপ্রধান সমস্যা। অভাবের শত বৃশ্চিক-দংশনে সে এক্ষণে কাতর। এ সমস্যার মীমাংসা না হইলে—এ অভাব দূর করিবার পক্ষে কোনও উদ্যোগ-আয়োজন না করিলে, আমরা আমাদের জাতীয় জীবনকে ঠিকমত উন্নতির পথে চালিত করিতে পারিব না।

যিনি যাহাই বলুন, পেটের দায় সকলের চেয়ে বড় দায়! এ দায়ের নিকট সকল রকম উপদেশ ভাসিয়া যায়—সকল রকম উত্তেজনা-উদ্দীপনাই নিভিয়া আসে। পেটে অহরহঃ ক্ষুধার তাড়না বিদ্যমান থাকিলে,—প্রাণে উৎসাহ-উদ্দীপনা আসিতে পারে না।

ইংরেজ-রাজত্বে বাঙ্গালী নিজেদের উদরান্নের সংস্থান জন্য যে কয়টি পথ বাছিয়া লইয়াছিল, সে সমস্ত পথই ক্রমে কণ্টকাকীর্ণ হইয়া উঠিতেছে। ডাক্তারী, ওকালতী ও চাকরী—এ তিনটা কাজ করিয়া বাঙ্গালী এখন আর পেট ভরিয়া খাইতে পাইতেছে না। রোগীর চেয়ে ডাক্তারের সংখ্যা এখন বেশী। উকিলের সংখ্যাও মক্কেলের সংখ্যাকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। আর চাকরী খালির কথাও এখন এক রকম শুনিতে পাওয়াই যায় না। কাজেই অর্থাগমের পথ বাঙ্গালীর পক্ষে প্রায় বন্ধ হইয়া আসিয়াছে। তাই চারিদিক হইতে একটা রব উঠিয়াছে—"করি কি?"

বলা বাহুল্য, বাঙ্গালী নিজের হাতে যে বিষবৃক্ষ রোপণ করিয়াছিল, ইহা তাহারই ফল। পাশ্চাত্যভাবের প্রবল বন্যা সর্ব্বপ্রথম যখন সহরগুলিকে আলোড়িত করিয়া তুলে, তখন বাঙ্গালী জ্ঞানহারা হইয়াছিল। সহরের আদালত-আফিস, ঘোড়ারগাড়ী-ট্রাম, থিয়েটার-সার্কাস প্রভৃতি দেখিয়া বাঙ্গালীর তখন পল্লীবাসে অরুচি জন্মিয়াছিল। চাকরীর নূতন আস্বাদন পাইয়া কৃষি-কার্য্য ভুলিয়াছিল। চাকুরে বাবু হইয়া সহরে বাস করাই তখন সে স্বর্গসুখ বলিয়া মনে করিয়াছিল। মানুষমাত্রেই সুখের প্রয়াসী। আমরা যাহা কিছু করিয়া থাকি, সমস্তই সুখের জন্য। ইংরেজের আমলে আমরা যে পল্লীবাস ত্যাগ করিয়া সহরে বাবু হইতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, তাহাও ঐ সুখের আশায়। ভাবিয়াছিলাম—এই ভাবেই দিন চিরকাল চলিবে। কিন্তু তাহা হইল না। 'ইতো নষ্টঃ ততোভ্রষ্টঃ' হইলাম। সহরে বাস করাটা সামর্থ্যে এখন কুলায় না—এদিকে 'আমার' বলিবার যাহা কিছু ছিল, তাহা হইতেও ভ্রষ্ট হইয়াছি। কাজেই দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে মুখ হইতে কেবলই বাহির হইতেছে—"করি কি?"

ইহার প্রত্যুত্তরে আশ্বাসবাণী যে আসিতেছে না, তাহা নহে। চারিদিক হইতেই শুনিতেছি,—"আবার পল্লীবাস আরম্ভ কর—কৃষি-কার্য্যে মনোযোগ দাও। আবার তোমার সব হইবে,—সব পাইবে।"—কথা শুনিতেছি, কিন্তু কথা কার্য্যে পরিণত হইতে আজ পর্য্যন্ত দেখিলাম না। সকলেই উপদেশ দিতেছেন, কিন্তু কার্য্যে কাহাকেও অগ্রসর হইতে দেখিতেছি না। কেন এমন হইল?

যাঁহারা উপদেশ দিতেছেন, তাঁহারা একটু তলাইয়া দেখিতেছেন না যে, 'পল্লীতে যাইয়া কৃষিকার্য্য কর' কথাটা বলা যত সুলভ,—করাটা তত সহজ নহে। বাঙ্গালীকে নূতন করিয়া কৃষিকার্য্যে হাত দিতে হইলে, ইহার বিপক্ষে যে সকল প্রধান প্রধান অন্তরায় আছে, তাহা দূর করিতে না পারিলে 'কথায় চিঁড়ে ভিজিবে না।'

প্রথম কথা—বাঙ্গালার ভদ্রসন্তানেরা কৃষি-কার্য্যে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। কলম ছাড়িয়া কোদালের মর্ম্ম—ইচ্ছা করিলেই বুঝা যায় না। বাস্তবিকই যদি আমাদিগকে কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিতে হয়, তবে কৃষিশিক্ষা প্রদানের ভার দেশবাসীর নিজের হাতেই লইতে হইবে। ভদ্র-সন্তানের পক্ষে কৃষিবিদ্যা শিখিবার কোনও ব্যবস্থাই আজ পর্য্যন্ত এ দেশে হয় নাই। পুষা ও সাবুর গবর্ণমেণ্ট কৃষি-বিদ্যালয়ে দুই চারিটি ছাত্র লওয়া হয় বটে, কিন্তু সমগ্র বাঙ্গালী-জাতির পক্ষে সেটা কিছুই নহে। তাহা ছাড়া, এ বিদ্যালয়ে যে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা দেশের উপযোগী বলিয়াও মনে হয় না। সে শিক্ষা রিপোর্ট লিখিবার উপযুক্ত কর্ম্মচারী গড়িতে পারে, কিন্তু প্রকৃত কৃষি-বিদ্যা পারদর্শী করিয়া তুলে না। কাজেই কৃষিবিষয়ক শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করাই আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য।

কৃষিকার্য্যের দ্বিতীয় অন্তরায়—জমি। বাঙ্গালার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারেরা যে প্রকারের জীব, তাহাতে তাহাদের নিকট হইতে জমি পত্তন লওয়াও এক বিষম ব্যাপার! এই জমিদারেরা অনেকসময় জমি পতিত রাখে, তথাপি ভদ্রলোককে জমি পত্তন দিতে চাহে না। নিরক্ষর প্রজার উপর নানারূপ অত্যাচার অবিচার করা চলে বলিয়া, জমিদারের সদাই ঝোঁক তাহাদের উপর। তাহারা অল্প খাজনা ও অল্প নজর দিলেও জমিদারেরা তাহাদিগকে জমি ছাড়িয়া দেয়। কিন্তু ভদ্রলোককে শিক্ষিত লোককে

ইচ্ছামত জব্দ করা কঠিন কাজ বলিয়া, অনেক জমিদারই বেশী নজর বা বেশী খাজানার লোভ সম্বরণ করিয়া তাঁহাদের জমি পত্তন দেন না। কাজেই ভদ্রসন্তানের পক্ষে জমি সংগ্রহ করাও একটা কঠিন কাজ!

তার পর, কৃষাণ-চাকর ও পাইট-মজুরের উৎপাত আছে। ইহাদিগকে অগ্রিম একবৎসরের মজুরি চুকাইয়া দিতে হয়; অথচ কাজের সময় ইহারা সমান ফাঁকি দিবারই চেষ্টা করিয়া থাকে। অগ্রিম মজুরি দিয়া কাজ করান যে দরিদ্র ভদ্রলোকের পক্ষে সুবিধাজনক নহে, তাহা বলাই বাহুল্য।

তাই বলিতেছি, বাঙ্গালার নেতৃ-বৃন্দ ও ধনী-সম্প্রদায়েরা যদি দেশের ব্যথায় ব্যথিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারা মুখের শুধু শুষ্ক উপদেশ ছাড়িয়া দিয়া, উপরি উক্ত অভিযোগগুলি সংশোধন করিতে যত্নবান হউন। ব্যাধির কথা বলিয়া দিলাম,—ঔষধ তাঁহাদের হস্তে। তাঁহারা ব্যাধি-প্রতিকারের ব্যবস্থা করুন। দরিদ্র গৃহস্থকে রক্ষা করিতে না পারিলে, এ জাতির ধ্বংস সুনিশ্চয়। এ রক্ষা শুধু গৃহস্থরক্ষা নহে—আত্মরক্ষা। তাহাদের বুক ভাঙ্গা দীর্ঘ নিঃশ্বাস—'করি কি', যদি সত্যই ইহার জবাব দিতে হয়, তবে শুধু কথার জবাব না দিয়া কাজে জবাব দাও!—হাতে-কলমে তাহাদিগকে কৃষিকার্য্য শিখাইয়া, তাহাদিগকে পল্লীবাসের উপযুক্ত করিয়া তোল। হে বাঙ্গালীর নেতৃবৃন্দ! হে ধনি-সম্প্রদায়! এ ভার তোমাদেরই উপর! ইচ্ছা করিলে তোমরাই এ মর্ম্মভেদী রোদনের উপশম করিতে পার! "বাঙ্গালী"

RABINDRA BHARATI UNIVERSITY LIBRARY

Printed by Jatindra Mohan Das at the Wari Printing Works, Dacca and published by Nishi Kanta Ghosh at the Krishi-Sampada office, 66, Narindia, Dacca.

কৃষি-সম্পদ

কৃষি, কৃষি-শিল্প এবং যৌথ ঋণ-দান-সমিতি-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নূতন ধরণের সচিত্র মাসিক পত্র। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩৲ মাত্র।

প্রবন্ধ-সম্পদে অতুলনীয়, চিত্র-সৌন্দর্য্যে অপূর্ব্ব ও সর্ব্বত্র উচ্চ-প্রশংসিত বাঙ্গালার কৃষি-বিষয়ক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও বৃহত্তম পত্র।

লেখক—"কৃষি-সম্পদে" রহিয়াছেন—

আমেরিকা-প্রত্যাগত শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী বি, এ, এম, এস, এ।
" " শ্রীযুক্ত হিমদাস দত্ত এম, আর, ই, সি,
" " " অনাথবন্ধু সরকার এম, এ, সি, এল,
জাপান-প্রত্যাগত শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম, এ, এস।
" " " রসিকরঞ্জন ঘোষ এম, এস, এ।
" " " মন্মথনাথ দে " " "
" " " যোগেশচন্দ্র চৌধুরী " " "
" " মিঃ এ, সি, ঘোষ এম, এ, এস্।
" " " এন্, এল, দত্ত " " "
" " ডাঃ পি, কে, বিশ্বাস পি এইচ, ডি।
ব্রাহ্ম-প্রত্যাগত শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস এস, ই
" ঈশ্বরচন্দ্র গুহ এফ, আর, এইচ, এস
" প্রবোধচন্দ্র দে " " " "
" রাজেশ্বর দাসগুপ্ত এম, আর, এ, এস
" প্রফুল্লচন্দ্র সরকার " " " "
" রঘুনাথ দাস বি, বি, ডি, সি
" কামিনীকুমার লাহিড়ী B. A. G.
" হৈমচন্দ্র দেব (মেডিকো বোটানিষ্ট)

রংপুর গবর্ণমেণ্ট কৃষি-পরীক্ষাক্ষেত্রের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত যামিনীকুমার বিশ্বাস বি, এ, কটক গবর্ণমেণ্ট কৃষি-পরীক্ষাক্ষেত্রের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত রাজনাথ রায় বি, এ, ঢাকা-বিভাগের স্কুল-ইন্‌স্পেক্টার রায় সাহেব শ্রীযুক্ত প্রমোদ কুমার বসু এম, এ, আমেরিকার বার্কলী কৃষি-কলেজের শ্রীযুক্ত স্বর্ণকুমার মিত্র, শ্রীযুক্ত নিরুপমচন্দ্র গুহ প্রভৃতি।

বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী।

১। "কৃষি-সম্পদে" তিনমাসের কম মেয়াদ বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় না।

২। অশ্লীল বিজ্ঞাপন গ্রহণ করা হয় না।

৩। একাদিক্রমে তিনমাস বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইলে পর, বিজ্ঞাপনদাতা ইচ্ছা করিলে তাহার পরিবর্ত্তন করিতে পারেন।

৪। চুক্তির সময় পূর্ণ হইবার ১৫ দিবস পূর্ব্বে বিজ্ঞাপন বন্ধ করিবার নিষেধ-পত্র না পাইলে, পূর্ব্বোক্ত হারেই বিজ্ঞাপন চলিবে এবং এ বিষয়ে বিজ্ঞাপনদাতার দায় থাকে বুঝিয়া লওয়া হইবে।

৫। অন্য কোনরূপ চুক্তির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের সহিত বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

৬। "কৃষি-সম্পদ" সম্বন্ধীয় সমস্ত চিঠি-পত্র, প্রবন্ধ, বিনিময়ের সংবাদ-পত্র, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি "কৃষি-সম্পদ" পত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত ঘোষের নিকট কৃষি-সম্পদ আফিস, ৬৬নং নারিন্দা, ঢাকা—এই ঠিকানায় এবং টাকাকড়ি আমার নামে পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয়— ৬৬নং নারিন্দা, ঢাকা। } শ্রীরমণীকান্ত ঘোষ কার্য্যাধ্যক্ষ।

বিজ্ঞাপনের হার।

১। "কৃষি-সম্পদে" বিজ্ঞাপনের হার সুলভ। মাসিক প্রতিপৃষ্ঠা ৬৲ টাকা; প্রতিকলম ৪৲ টাকা। সিকি কলম ২৷৹ টাকা; ½ কলম ১৷৹ টাকা।

২। কাভারিংএর দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ পৃষ্ঠাও বিজ্ঞাপন গৃহীত হইবে। দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় মাসিক ১০৲, ৩য় পৃষ্ঠায় ৮৲ টাকা এবং চতুর্থ পৃষ্ঠায় ১২৲ টাকা দেয়।

ফ্রোকপত্র ৮ পৃষ্ঠা মাসিক ৩০৲ টাকা; ৪ পৃষ্ঠা ২০৲, ২ পৃষ্ঠা ১২৲ টাকা এবং ১ পৃষ্ঠা—১০৲ টাকা মাত্র।

বাৎসরিক চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

আমাদের বিজ্ঞাপনের কড়-দস্তুর নাই—ইহাই নিশ্চিন্ত নিয়ম।

বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

"It is my wish that there may be spread over the land a net-work of schools and colleges, from which will go forth loyal and manly and useful citizens able to hold their own in industries and "AGRICULTURE" and all the vocations in life"

His Majesty the King-Emperor George V.
6th January, 1912.

Selected by the Director of Public Instruction, Bengal, for use in Schools, Colleges and Attached Hostels (Cal. Gazette 2nd Oct. 12).

Krishi-Sampad,
Vol. VII. No. XII.

চৈত্র, ১৩২৩,
৭ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা।

কৃষি-সম্পদ

একমাত্র কৃষিবিষয়ক মাসিক পত্র।

শ্রীনিশিকান্ত ঘোষ কর্ত্তৃক
সম্পাদিত।

"I am glad to know that in other directions the agricultural practice of India has improved. The cultivator has always been patient, laborious and skilful, though his methods have been based upon tradition. Latterly the resources of science have been brought to bear upon agriculture and have demonstrated in a very short time the great results that can be secured by its application."

H. M. The KING EMPEROR.

কৃষি-সম্পদ

কৃষি, কৃষি-শিল্প এবং যৌথ ঋণ-দান-সমিতি-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নূতন ধরণের সচিত্র মাসিক পত্র।
অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩৲ মাত্র।
প্রবন্ধ-সম্পদে অতুলনীয়, চিত্র-সৌন্দর্য্যে
অপূর্ব্ব ও সর্ব্বত্র উচ্চ-প্রশংসিত
বাঙ্গালার কৃষি-বিষয়ক
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও বৃহত্তম পত্র।
লেখক—"কৃষি-সম্পদে" রহিয়াছেন—

আমেরিকা-প্রত্যাগত শ্রীযুক্ত মতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী বি, এ, এম, এস, এ।
" " শ্রীযুক্ত দ্বিজদাস দত্ত এম্, আর, ই, সি,
" " অনাথবন্ধু সরকার এম্, এ, সি, এস,
জাপান-প্রত্যাগত শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম্, এ, এস।
" " " রসিকরঞ্জন ঘোষ এম্, এস, এ।
" " " মন্মথনাথ দে " " "
" " " যোগেশচন্দ্র চৌধুরী " " "
" " মিঃ এ, সি, ঘোষ এম্, এ, এস্।
" " " এন্, এল, দত্ত " " "
" " ডাঃ পি, কে, বিশ্বাস পি এইচ, ডি।
ফ্রান্স-প্রত্যাগত শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস এস, ই
" ঈশ্বরচন্দ্র গুহ এফ, আর, এইচ, এস
" প্রবোধচন্দ্র দে " " " "
" রাজেশ্বর দাসগুপ্ত এম, আর, এ, এস
" প্রকাশচন্দ্র সরকার " " " "
" রঘুনাথ দাস জি, বি, ভি, সি
" কামিনীকুমার লাহিড়ী বি. A. C.
" হেমচন্দ্র দের (মেডিকো বোটানিষ্ট)

রংপুর গবর্ণমেণ্ট কৃষি-পরীক্ষাক্ষেত্রের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত যামিনীকুমার বিশ্বাস বি, এ, কটক গবর্ণমেণ্ট কৃষি-পরীক্ষাক্ষেত্রের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত রাজনাথ রায় বি, এ, ঢাকা-বিভাগের স্কুল-ইন্‌স্পেক্টার রায় সাহেব শ্রীযুক্ত প্রমোদ কুমার বসু এম, এ, আমেরিকার বার্কলী কৃষি-কলেজের শ্রীযুক্ত স্বর্ণকুমার মিত্র, শ্রীযুক্ত নিরুপমচন্দ্র গুহ প্রভৃতি।

বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী।

১। "কৃষি-সম্পদে" তিনমাসের কম কোনও বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় না।

২। অশ্লীল বিজ্ঞাপন গ্রহণ করা হয় না।

৩। একাদিক্রমে তিনমাস বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইলে পর, বিজ্ঞাপনদাতা ইচ্ছা করিলে তাহার পরিবর্ত্তন করিতে পারেন।

৪। চুক্তির সময় পূর্ণ হইবার ১৫ দিবস পূর্ব্বে বিজ্ঞাপন বন্ধ করিবার নিষেধ-পত্র না পাইলে, পূর্ব্বোক্ত হারেই বিজ্ঞাপন চলিবে এবং এ বিষয়ে বিজ্ঞাপনদাতার মত আছে বুঝিয়া লওয়া হইবে।

৫। অন্য কোনরূপ চুক্তির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের সহিত বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

৬। "কৃষি-সম্পদ" সম্বন্ধীয় সমস্ত চিঠি-পত্র, প্রবন্ধ, বিনিময়ের সংবাদ-পত্র, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি "কৃষি-সম্পদ" পত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত ঘোষের নিকট কৃষি-সম্পদ আফিস, ৬৮নং নারিন্দা, ঢাকা—এই ঠিকানায় এবং টাকাকড়ি আমার নামে পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয়—
৬৮নং নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীরমণীকান্ত ঘোষ
কার্য্যাধ্যক্ষ।

বিজ্ঞাপনের হার।

১। "কৃষি-সম্পদে" বিজ্ঞাপনের হার সুলভ। মাসিক প্রতিপৃষ্ঠা ৲ টাকা; প্রতিকলম ৪৲ টাকা। সিকি কলম ২৷৷০ টাকা; ½ কলম ১৷৷০ টাকা।

১। কাভারিংএর দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ পৃষ্ঠায়ও বিজ্ঞাপন গৃহীত হইবে। দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় মাসিক ১০৲, ৩য় পৃষ্ঠার ৮৲ টাকা এবং চতুর্থ পৃষ্ঠায় ১২৲ টাকা দেয়।

ক্রোড়পত্র ৮ পৃষ্ঠা মাসিক ৩০৲ টাকা; ৪ পৃষ্ঠা ২০৲; ২ পৃষ্ঠা ১২৲ টাকা এবং ১ পৃষ্ঠা—১০৲ টাকা মাত্র।

বাৎসরিক চুক্তির হার স্বতন্ত্র।
আমাদের বিজ্ঞাপনের দর-দস্তুর নাই—টহাই নির্দ্দিষ্ট নিয়ম।

বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

RABINDRA BHARATI UNIVERSITY
LIBRARY

অন্নং বহু কুর্ব্বীত ॥ তদ্‌ব্রতম্ ॥
তৈত্তিরীয়োপনিষদি ভৃগুবল্লী।

সূচী।

[লেখকদিগের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।]

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
কৃষিপ্রসঙ্গ	৩০৫
আত্ম-নিবেদন	৩০৬
তামাকচাষে মুক্তিকা ও সার ... ... —শ্রীযুক্ত যামিনীকুমার বিশ্বাস বি, এ (রংপুর-বুড়িহাট ফার্ম্মের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট)	৩০৭
বিষ ভক্ষণ ... ... —শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র সরকার এম, আর, এ, এস্	৩১১
পোলাপের চাষ ... ... —শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র গুহ এস্, আর্, এইচ্, এস্	৩১৩
মানদহের লেখম-শিল্পের উত্থান-পতন ... ("পল্লীয়া" হইতে উদ্ধৃত)	৩২১

কৃষিপ্রসঙ্গ।

হাড়ের গুঁড়া—আমাদের দেশের মৃত্তিকার উর্ব্বরতা-শক্তি দিন দিনই যে হ্রাস হইয়া পড়িতেছে, তাহা কাহারও অবিদিত নহে। এমতাবস্থায় একমাত্র গোময় ব্যবহারেই সার-প্রয়োগের কার্য্য চলিতে পারে না। কারণ, স্থলবিশেষে বিঘাপ্রতি ৪০/০ মণ হইতে ১০০/০ মণ পর্য্যন্ত গোময়সার ব্যবহার করা আবশ্যক; কিন্তু কৃষকদিগের সকলেই এত অধিক পরিমাণে গোবর সংগ্রহ করিতে পারে না। ফলে, অত্যাবশ্যকপ্রকার সার-ব্যবহার করাও নিতান্ত আবশ্যক। হাড়ের গুঁড়া একটি উৎকৃষ্ট সার। ইহা ব্যবহার করিলে, শস্যের ফুল, ফল, বীজ ও মূলের বৃদ্ধি হয়, ফল-মূলের মিষ্টতা বাড়ে এবং শস্যাদি সত্বরই পরিপক্ক হইয়া উঠে। অস্থিসার মাত্রই ক্ষারদ্রাবসযুক্ত

সার। ইহাতে ফস্‌ফোরাসের ভাগই অধিক। অকৃত্রিম গুঁড়া অস্থিতে (Bone meal) শতকরা ৪০ হইতে ৫০ ভাগ ফস্ফেট্ ও ৪ ভাগ নাইট্রোজেন বা সাড়ে চারি হইতে ৫ ভাগ এমোনিয়া থাকে। সুতরাং, যে ভূমিতে ফস্ফেটের ভাগ কম, উহার উর্ব্বরতা-শক্তি বৃদ্ধি করিতে হইলে, হাড়ের গুঁড়া ব্যবহার করিতেই হইবে। ধান্য, গম, যব, আলু, ইক্ষু, মূলা এবং কপি প্রভৃতি শস্যের পক্ষে হাড়ের গুঁড়া বিশেষ হিতকারী। সরকারী কৃষি-পরীক্ষা-ক্ষেত্রে বারম্বার পরীক্ষার ফলে জানা গিয়াছে যে, রোয়া-ধানের জমিতে হাড়ের গুঁড়া ব্যবহার করিলে সুফললাভ করা যায়। যেখানে বিনা সারে ৬।৭ মণ ফসল জন্মে, সেস্থলে এই সার ব্যবহার করিয়া ৯।১০ মণ ফসল পাওয়া যায়। হাড়ের গুঁড়া বিঘাপ্রতি ১/০ মণ হিসাবে ব্যবহার করিতে হয়। ইহার মূল্য প্রতি মণ ৩৲ টাকা বা তদপেক্ষা কিঞ্চিদধিক। হাড়ের গুঁড়ার গুণ তিনবৎসর পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়া থাকে। প্রথমবার জমি চাষ করিবার সময়েই, তদুপরি ভালরূপে হাড়ের গুঁড়া ছিটাইয়া দিয়া, ক্রমে চাষের সঙ্গে উহা মিশাইয়া দিতে হয়। চাষের যত পূর্ব্বে হাড়ের গুঁড়া জমিতে দেওয়া যায়, ততই ভাল ফল পাওয়া যায়। কারণ, উহা মাটির সহিত মিশিয়া গিয়া, শস্যের ব্যবহারোপযোগী হইতে একটু বেশী সময় লাগে।

সকল প্রকার মৃত্তিকার পক্ষেই হাড়ের গুঁড়া সমান উপকারী নহে। খিয়ার-জমি, লালমাটি এবং ভিটাজমির পক্ষেই হাড়ের গুঁড়া সুফলপ্রদ। যে সকল জমি বর্ষার জলে প্লাবিত হইয়া থাকে, সে সকল স্থানে ইহার উপকারিতা বুঝা যায় না। সুতরাং, ঐরূপস্থলে হাড়ের গুঁড়া ব্যবহার না করাই সঙ্গত। যে সকল দো-ফসলী জমিতে হৈমন্তিক ধান্যের পর যব, গম প্রভৃতি রবিশস্য উৎপন্ন করা হয়, সেই সকল জমিতে হাড়ের গুঁড়া ব্যবহার করাই শ্রেয়ঃ।

আত্মনিবেদন।

বর্ত্তমান চৈত্রের সংখ্যার সহিত "কৃষি-সম্পদের" ৭ম বর্ষ শেষ হইল। ১৩২৩ সাল আমাদের পক্ষে বিশেষ দুর্ব্বৎসর বলিয়াই মনে হয়। এ বৎসর—বিগত শ্রাবণ মাসে (২১শে তারিখ), কৃষি-সম্পদ-সম্পাদক মহাশয়ের যে পিতৃবিয়োগ ঘটিয়াছে, তাহা আমাদের পত্রিকার গ্রাহকমাত্রেই অবগত আছেন। এই মহাবিপদের পর, ক্রমাগত আরও বহু আকস্মিক বিপদের সহিতই আমাদিগকে সংগ্রাম করিয়া আত্মরক্ষা করিতে হইয়াছে। নানারূপ বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া পড়াতেই, এ বৎসর আমরা যথারীতি প্রতি মাসে পত্রিকা প্রকাশ করিতে পারি নাই। আমাদের অনিচ্ছাকৃত ত্রুটীর জন্য "কৃষি-সম্পদ"-সম্পৃক্ত ব্যক্তিমাত্রেরই নিকট বিনীতভাবে ক্ষমাপ্রার্থনা করিতেছি।

আগামী বর্ষের অর্থাৎ ১৩২৪ সালের বৈশাখের সংখ্যা যন্ত্রস্থ রহিয়াছে। যদি "কৃষি-সম্পদ"-সম্পাদক মহাশয়ের একমাত্র কন্যার বিবাহ বৈশাখ মাসে হয়, তাহা হইলে মাসের শেষভাগে পত্রিকা প্রকাশিত হইবে; নতুবা বৈশাখের সংখ্যা সত্বরই প্রকাশিত হইবে। আমরা প্রথমাবধিই অনন্যকর্ম্মা হইয়া, "কৃষি-সম্পদের" উন্নতিবিধানকল্পে এবং প্রবন্ধ-সম্পদে—বিষয়-বৈচিত্র্যে — চিত্র-সৌন্দর্য্যে— সর্ব্বতোভাবে পত্রিকাখানাকে নূতন—মোহন—শোভন— শিক্ষাপ্রদ — সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে প্রাণান্তকর পরিশ্রম ও বহু অর্থব্যয় করিতেছি। "কৃষি-সম্পদের" জন্য বিশেষ আয়োজন করা হইয়াছে; সুতরাং আগামী বর্ষের পত্রিকা সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন হইবে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। ১৩২৪ সালে নিয়মিতভাবেই "কৃষি-সম্পদ" প্রকাশিত হইবে। পত্রিকার সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখিতে কখনও আমাদের চেষ্টা ও পরিশ্রমের ত্রুটী হয় নাই, ভবিষ্যতেও হইবে না।

আগামী বর্ষের অর্থাৎ ১৩২৪ সালের বৈশাখের সংখ্যা "কৃষি-সম্পদ" গ্রাহকদিগের নিকট ভিঃ পিঃ করিয়া পাঠান হইবে। আশা করি, বর্ত্তমান গ্রাহকগণ সকলেই আগামী বৎসরের পত্রিকা গ্রহণ করিবেন। যাঁহারা ৮ম বর্ষের পত্রিকা গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক, তাঁহারা অনুগ্রহপূরসর সত্বর তাহা আমাদিগকে জানিতে দিবেন। ভিঃ পিঃ ফেরত দিয়া, কেহ যেন আমাদিগকে অনর্থক ক্ষতিগ্রস্ত না করেন, ইহাই আমাদের বিনীত প্রার্থনা।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র গুহ এফ্, আর্, এইচ্, এস্ মহাশয়ের 'গোলাপের চাষ' নামক প্রবন্ধের প্রায় দুই তৃতীয়াংশই অপ্রকাশিত রহিল। উহা আগামী বর্ষের "কৃষি-সম্পদে" ধারাবাহিক প্রবন্ধাকারে সমগ্র বৎসরই চলিবে। বঙ্গের গোধনসম্বন্ধেও অনেক কথাই বলিবার রহিল। 'আর্য্য-শাস্ত্রে কৃষি-তত্ত্বের'ও অপ্রকাশিত অংশ আগামী বৎসরে প্রকাশিত হইবে।

বিনয়াবনত—

ম্যানেজার।

তামাকচাষে মৃত্তিকা ও সার।

[রংপুর--বুড়িরহাট--কৃষি--ক্ষেত্রের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট,
শ্রীযুক্ত যামিনীকুমার বিশ্বাস বি, এ লিখিত]।

বিভিন্নজাতীয় তামাক বিভিন্নপ্রকার মৃত্তিকায় জন্মে ও বিভিন্ন গুণযুক্ত হয়। এইজন্যই কোনও নির্দ্দিষ্ট জাতীয় ও গুণসম্পন্ন তামাকের চাষ করিতে হইলে, তদুপযোগী মৃত্তিকা নির্দ্ধারণ করিয়া লওয়া আবশ্যক। মৃত্তিকায় বালির ভাগ যত অধিক হইবে, তদুৎপন্ন তামাক ততই পাতলা ও সুগন্ধি হয়; সচ্ছিদ্র বালি-মৃত্তিকায় উৎকৃষ্ট চুরট ও সিগারেটের তামাক জন্মিয়া থাকে। ঐরূপ মৃত্তিকায় ৮।১০ ভাগ মাত্র আঁঠাল মাটি রহিলেই ভাল হয়। বালির স্তর অন্ততঃ এক ফুট গভীর হওয়া আবশ্যক। তদপেক্ষা অধিক অর্থাৎ ৪।৫ ফুট গভীর হইলে আরও ভাল হয়। এইরূপ জমি রঙ্গপুর জেলার অনেক স্থানেই পাওয়া যায়। ইহাতে তামাকের ফলন কম হয় সত্য, কিন্তু সর্ব্বোৎকৃষ্ট গুণযুক্ত তামাক জন্মে। উক্তরূপ বেলেমাটি অন্যান্য শস্যচাষের পক্ষে একরূপ অনুপযোগী। অনুর্ব্বর মৃত্তিকা বলিয়াই উহাতে অধিকতর সার দিয়া ও জলসেচন করিয়াই তামাকের চাষ করিত হয়। কিন্তু আবশ্যকমত জলসেচন করিতে না পারিলে, জলের অভাবে, তামাক ভালরূপ জন্মে না; তদ্ভিন্ন, তামাকের পত্রভাগও পুরু হয়।

বালি-মৃত্তিকাস্তরের একহাত নিম্নে আঁঠাল মৃত্তিকার একটি স্তর রহিলেও, উহাতে তামাকচাষ চলিতে পারে। আঁঠাল মৃত্তিকার জলধারণশক্তি অধিক বলিয়া, একবার প্রচুর পরিমাণে জলসেচন করিলেও, উহা অধিককাল সরস রহে। সুতরাং, অপেক্ষাকৃত অল্পব্যয়েই (জলসেচনের ব্যয় অনেকটা কম হয় বলিয়া) ঐরূপ জমিতে তামাকের চাষ করা যায়। আমেরিকায় এবম্বিধ জমিতে চুরটের প্রথম নম্বর বহিরাবরণের তামাক উৎপাদন করা হয়।

এ দেশীয় উৎকৃষ্ট তামাক দো-আঁশ কিম্বা বেলে মাটিতে জন্মে। এইরূপ মৃত্তিকায় চুরটের অন্তরস্থ তামাক, মধ্যম প্রকারের বহিরাবরণের তামাক ও সিগারেটের তামাক বেশ উৎপাদন করা যাইতে পারে। সিগারেটের উপযোগী আমেরিকার 'বার্লি' তামাক উর্ব্বরা চূর্ণ-পাথরযুক্ত মৃত্তিকায় উত্তমরূপে জন্মে। আমাদের দেশে সময় সময় আঁঠাল-মৃত্তিকায়ও তামাকের চাষ করা হয়; কিন্তু মৃত্তিকায় কর্দ্দমের ভাগ অধিক ও বালির ভাগ কম রহিলে, তদুৎপন্ন তামাক বিবর্ণ ও বিস্বাদযুক্ত হইয়া থাকে। অত্যধিক রসযুক্ত আঁঠাল মৃত্তিকায় তামাক জন্মে না।

তামাকচাষের ভূমি কিঞ্চিৎ উচ্চ হওয়া আবশ্যক। তাহা না হইলে, উহা হইতে জল সহজে নির্গত হইয়া যাইতে পারে না। তদ্ভিন্ন, উহাতে গলিত উদ্ভিজ্জপদার্থ মধ্যমরূপ থাকিলে ভাল হয়। কিন্তু ইহার ভাগ মৃত্তিকায় অধিক রহিলে, তামাকপাতা পুরু ও বিবর্ণ হয়, এবং উহার সুঘ্রাণ কমিয়া যায়। তবে অধিক পরিমাণ উদ্ভিজ্জসারযুক্ত মৃত্তিকায় তামাকের ফলন অধিক হইতে পারে। সুমাত্রাদ্বীপের জঙ্গল আবাদী নূতন জমিতে উদ্ভিজ্জপদার্থ অধিক থাকা সত্বেও, উহাতে চুরটের উৎকৃষ্ট বহিরাবণের তামাক জন্মে। মৃত্তিকা সর্ব্বদা সিক্ত রহিলে, তদুৎপন্ন তামাক উপযুক্ত সময়ে পক্ক না হইয়া অধিককাল কাঁচা রহে; এবং একবার বৃষ্টিপাত হইলে পুনর্ব্বার কাঁচা-অবস্থা প্রাপ্ত হয়। সুতরাং, উহা উপযুক্তসময়ে কাটিয়া আনিতে পারা যায় না বলিয়া, তামাকও ভাল হয় না।

চুরটের জন্ত প্রথম নম্বর বহিরাবণের তামাকের চাষ করিতে অধিক খরচ পড়ে; অথচ, উহার ফলনও কম হয়। কিন্তু তথাপি, ঐরূপ উৎকৃষ্ট তামাকের মূল্য অধিক বলিয়া, ব্যয় বাদেও বেশ লাভ হইয়া থাকে। সুমাত্রা কিম্বা হেভানা তামাকের প্রতি মণ (উৎকৃষ্ট ও প্রকৃত হইলে) ১০০০৲।১২০০৲ টাকা কি ততোহধিক দরে বিক্রীত হইয়া থাকে। বহু অর্থব্যয় করিয়া এরূপ তামাকের চাষ করা সাধারণ কৃষকের পক্ষে সম্ভবপর নহে। কিন্তু চুরটের অন্তরস্থ তামাক, সিগারেটের তামাক অথবা দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর বহিরাবণের তামাক অপেক্ষাকৃত অনেক অল্পব্যয়ে উৎপন্ন হইতে পারে; অধিকন্তু, ঐরূপ তামাকের ফলনও অধিক হইয়া থাকে। সুতরাং, মূল্য কম হইলেও তামাক-চাষ লাভজনক হয়। এতদ্দেশীয় কৃষকের অর্থাভাববশতঃ, তাহাদের পক্ষে মূল্যবান সার অধিক পরিমাণে ব্যবহার করা কষ্টকর বা সম্ভবপর নহে। সুতরাং, শেষোক্ত জাতীয় তামাকের চাষের চেষ্টা করাই তাহাদের পক্ষে সঙ্গত। এইরূপ তামাকের পক্ষে কিরূপ জমি প্রশস্ত, সে সম্বন্ধেই কএকটি কথা বলিতেছি।

মাল্রাজ-প্রদেশের অন্তর্গত দিন্দিগালে চুরটের উপযোগী তামাকের চাষ হইয়া থাকে। ঐ স্থানের মৃত্তিকা পুরাতন পলিসংযুক্ত, সচ্ছিদ্র এবং বালি কিম্বা বালি-দো-আঁশ। তন্মধ্যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ডও মিশ্রিত রহে, এবং উহার কএক ফুট নিম্নে প্রস্তরের স্তর দেখিতে পাওয়া যায়। দিন্দিগালে বাৎসরিক বৃষ্টিপাত কম হওয়াতে, তথাকার তামাকক্ষেত্রে সর্ব্বদাই জলসেচন করিতে হয়। একই গ্রামে বিভিন্ন জমির তামাকের মধ্যেও বিশিষ্টরূপ প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। থট্টনম্পট্টি নামক গ্রামের একটি কৃষকের জমিতে প্রতিবৎসরই সর্ব্বোৎকৃষ্ট তামাক জন্মিতে দেখা গিয়াছে। ঐ গ্রামের অন্ত কোনও কৃষকের জমিতেই তেমন উৎকৃষ্ট তামাক জন্মে না। ইহার কারণ আজিও নির্ণীত হয় নাই। আমেরিকায়ও একই কৃষিক্ষেত্রের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন গুণযুক্ত তামাক উৎপন্ন হয় বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং, তামাকের উৎকর্ষের উপর যে মৃত্তিকার বিশেষ সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহা সহজেই অনুমেয়।

বিস্তৃতভাবে তামাকের চাষ করিতে হইলে, তৎপূর্ব্বে অত্যল্প পরিমাণ জমিতে তামাকের চাষ-পরীক্ষা অবশ্যকর্ত্তব্য। নতুবা, তামাকচাষে বহু অর্থের ক্ষতিও হইতে পারে।

গোদাবরী-নদীর চড়সমূহের মৃত্তিকা নূতন পলিময়। ঐ সকল চড় প্রতিবৎসরই জলে প্লাবিত হইয়া থাকে; কিন্তু কোনও কোনও স্থান এত উচ্চ যে, উহা প্রায়ই জলমগ্ন হয় না। ঐ সকল স্থানের মৃত্তিকা সচ্ছিদ্র বালি, কিম্বা বালি-দো-আঁশ; এবং প্রায় প্রতিবৎসরই উহাতে নূতন পলির স্তর পড়ে। নিম্নভূমিতে এই পলির স্তর প্রায় নয় ইঞ্চি হইতে বার ইঞ্চি গভীর। এই প্রকার জমিতে উৎকৃষ্ট তামাক জন্মিতে পারে। উক্ত চড়সমূহের মৃত্তিকায় যবক্ষারজানের ভাগ অধিক বলিয়া, তদুৎপন্ন তামাকের ক্ষার বেশ পরিষ্কৃত হয়। সমগ্র বৎসরের মধ্যে প্রায় ছয়মাসকাল জমি পতিত রাখা হয় বলিয়া, উহাতে সারাংশও বৃদ্ধি পায়।

স্থানে স্থানে মৃত্তিকা এত অনুর্ব্বর যে, তাহাতে তামাকের চারাগাছ রোপণ করিবার সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত্ত করিয়া, স্থানান্তর হইতে আনীত উর্ব্বরা মৃত্তিকা দ্বারা গর্ত্তগুলি পূর্ণ করিতে হয়। পক্ষান্তরে, নিম্নভূমি উর্ব্বর হইলে, তদুপরিস্থ বালি অপসারণ করিয়াই চারা রোপণ করিতে হয়। এই প্রকার জমিতে সুবর্ণবর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল বহিরাবণের তামাক জন্মিতে পারে।

কৃষ্ণা-জেলার কালবর্ণের আঁঠাল-দো-আঁশ মৃত্তিকা অতিশয় উর্ব্বরা ও সরস। ঐরূপ মৃত্তিকা কার্পাসচাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী বলিয়া, উহা 'কালা-কার্পাস-মৃত্তিকা' নামে খ্যাত। ইহাতেও তামাক বেশ জন্মে। উড়িষ্যার অন্তর্গত কটক জেলায় পলিসংযুক্ত আঁঠাল-মাটিতে জলসেচনের সাহায্যে তামাক চাষ করা হয়। কিন্তু ঐরূপ মৃত্তিকায় নিকৃষ্ট তামাক জন্মে। উৎকলদেশীয় লোকেরা ইহা দ্বারা নিকৃষ্ট চুরট প্রস্তুত করে। যশোহর ও নদীয়ায় সামান্য পরিমাণ গুরুক-তামাকের চাষ হইয়া থাকে। নদীয়ার 'হিঙ্গলীতামাক' প্রসিদ্ধ। এই স্থানের মৃত্তিকা দো-আঁশ কিম্বা বালি-দো-আঁশ। বেহারের 'ত্রিহুত্তা' তামাকের জমিও বালি-দো-আঁশ বা দো-আঁশ; কিন্তু তাহাতে চূণের ভাগ অধিক। বেহারের যে সকল

তামাকের জমিতে নীলের পচা-সার (নীল সিটী) দেওয়া হয়, সেই সকল জমির তামাকের পাতা অধিক পুরু হয় বলিয়া মোট ফলনও বেশী হয়। বেহারে তামাকের জমিতে সাধারণতঃ জলসেচন করা হয় না; তবে বৃষ্টিপাত কম হইলে জলসেচনের আবশ্যক হইয়া থাকে। পশ্চিমদেশীয় লোকেরা বিহারের তামাক দ্বারা খৈনী প্রস্তুত করিয়া খায়। ঐ স্থানের মৃত্তিকা সিগারেটের উপযোগী আমেরিকার 'বার্লি' তামাকচাষের পক্ষে উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়। রংপুর, জলপাইগুড়ী ও কোচবেহারের তামাকের জমি বালি-দো-আঁশ। তবে ঐ সকল স্থানে, সময় সময় আঁঠাল-দো-আঁশ মৃত্তিকায়ও তামাকের চাষ করা হয়। কিন্তু শেষোক্ত স্থানের তামাক মগেরা খরিদ করে না। জলপাইগুড়ী ও কোচবেহারে আঁঠাল-দো-আঁশ তামাকের জমিই অধিক। বালি-মাটিতে অধিক পরিমাণ গোবর ও গোশালার আবর্জ্জনা সার প্রয়োগ এবং বারম্বার জলসেচন করিয়া তামাক চাষ করিতে পারিলে, তাহাতে যে তামাক জন্মে, উহাই উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়। এই তামাকে অধিকতর তাম্রবর্ণের ফোস্কা পড়ে ও ইহা বেশ কড়া হয়। মৃত্তিকায় কর্দ্দমের ভাগ যত অধিক হইবে, তদুৎপন্ন তামাকে ততই কম ফোস্কা পড়িবে। এই মৃত্তিকামধ্যে চূণের ভাগ অতি কম। সুতরাং 'ত্রিহুত'-তামাকের মৃত্তিকার সহিত ইহার বিশেষ অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়।

রঙ্গপুরের মধ্যে কোনও কোনও স্থানে বালি-মাটির বিস্তীর্ণ পতিত মাঠ দেখা যায়। এই জাতীয় মৃত্তিকায় অধিকপরিমাণে সার দিলে এবং আবশ্যকমত জলসেচন করিতে পারিলে, উহাতেও চুরট ও সিগারেটের উপযোগী উৎকৃষ্ট তামাক জন্মিতে পারে বলিয়া বিবেচিত হয়। মৃত্তিকামধ্যে বালির ভাগ যত অধিক হয়, তদুৎপন্ন তামাকের স্বাদ ততই উৎকৃষ্ট হয়। তদ্ভিন্ন, উহার বর্ণও অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া থাকে।

সচ্ছিদ্র বালি মৃত্তিকা তামাকচাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী সত্য, কিন্তু তদ্রূপ মৃত্তিকায় অধিক পরিমাণে সার ব্যবহার করিতে হয়। পক্ষান্তরে, উর্ব্বর জমিতে সারপ্রয়োগ না করিলেও চলিতে পারে। আমেরিকার যুক্ত-রাজ্যের অন্তর্গত কনেকটিকট উপত্যকার বার্লি-তামাকচাষের জমির প্রতি একরে সাধারণতঃ ৩০।৪০ হইতে ৫০।৫৫ মণ পর্য্যন্ত বিশেষ-সার দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে, সুমাত্রা-দ্বীপের জঙ্গলা আবাদী নূতন মৃত্তিকায় সার ব্যতীতও উৎকৃষ্ট তামাক জন্মে। রঙ্গপুরের পুরাতন সরকারী কৃষি-পরীক্ষা-ক্ষেত্রে কোনরূপ সার না দিয়াও তামাকের চাষ করা হইত। মৃত্তিকার উর্ব্বরতার উপর লক্ষ্য রাখিয়াই, তামাকের জমিতে অল্প বা অধিক পরিমাণে সার ব্যবহার করিতে হয়। ৩।৪ মাসের মধ্যেই তামাক পরিপক হইয়া থাকে; সুতরাং, এই অল্পকালমধ্যে প্রদত্ত সারের সকল অংশ তামাকগাছ গ্রহণ করিতে পারে না। এই জন্তই উহাদের যতটা সারের আবশ্যক, তদপেক্ষা অধিক সারই ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা আবশ্যক। যে সারে ৪—৬ ভাগ নাইট্রোজেন, ৮—১৫ ভাগ পটাস এবং ১—৩ ভাগ ফস্‌ফরিক এসিড্‌ বর্ত্তমান থাকে, তামাকের জমিতে তদ্রূপ সার ব্যবহার উচিত।

আমাদের দেশের—বিশেষতঃ রঙ্গপুরের, কৃষকেরা তামাকের জমিতে একমাত্র গোবর ও গোশালার আবর্জ্জনা সারই ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু গো-মূত্র স্বতন্ত্রভাবে প্রায়ই রক্ষিত বা ব্যবহৃত হয় না। রঙ্গপুরের কৃষকগণ শীতকালে গরুর ঘরে খড় বিছাইয়া দেয়; এবং গোবর ও মূত্রসহ উহা প্রতিদিন জমিতে একস্থানে অনাবৃত অবস্থায় স্তূপ করিয়া রাখে। এই সকল স্তূপ বৃষ্টির জলে পচিয়া সাররূপে পরিণত হয়। কৃষকেরা সমস্ত বৎসর যত গোবর সংগ্রহ করিতে পারে, তাহার অধিকাংশই তামাকক্ষেত্রে দিয়া থাকে। তামাকগাছে ফুলের কুঁড়ি দেখা না দেওয়া পর্য্যন্ত গোময়সার ব্যবহার করা হয়। ইহাতে তামাক-গাছ খুব তেজাল হইয়া উঠে। গোবর বিশেষরূপে পচাইয়া লইয়া, উহাই তামাকের জমিতে ব্যবহার করা সঙ্গত। জমিতে একবার গোবর দিলে, তাহার ফল অনেক দিন পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। গোবরের আর একটি গুণ এই যে, ইহার মধ্যে গলিত উদ্ভিজ্জপদার্থ অধিকপরিমাণে বর্ত্তমান থাকায়, ইহা বালিমাটি সরস রাখে ও শক্ত করে। তদ্ভিন্ন, সোরা উৎপাদনেরও সুবিধা করিয়া থাকে। কোনও

সারে অধিক পরিমাণে নাইট্রোজেন বর্ত্তমান রহিলেও, উহা সোরায় পরিণত না হইলে উদ্ভিদের গ্রহণোপযোগী হয় না। ৫।৬ মাসের পুরাতন গোবর ব্যবহার করা ভাল। বর্ষা অন্তে, তামাক রোপণ করিবার এক কি দেড়মাসে পূর্ব্বে, পচা গোময়সার তামাকের জমির সর্ব্বত্র সমভাবে দিতে হয়। তৎপর, চাষ ও মই দিয়, উহা মৃত্তিকার সহিত মিশাইয়া দিলেই হইল। চাষের দ্বারা গোবর মৃত্তিকার সহিত মিশাইয়া দিতে না পারিলে, উহা শুষ্ক হইয়া যায়—সহজে পচে না। সুতরাং তদবস্থায়, উহা সহজে গৃহীত হইতেও পারে না।

তামাকগাছ এবং উহার পত্রশিরা বা গুঁড়া প্রভৃতি যাহা কিছু পাওয়া যায়, তৎসমুদায়ই সাররূপে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। এই সকলের মধ্যে পটাসের ভাগই অধিক। আমেরিকার কনেক্‌টিকট উপত্যকায় তামাকের জমির প্রতি বিঘায় ১০০—১৫২৴০ মণ তামাকগাছের সার দেওয়া হয়। সময় সময় অর্দ্ধেক তামাকগাছের সার ও অর্দ্ধেক গোবর মিশ্রিতভাবেও প্রয়োগ করার রীতি আছে। তথায় অন্ত কোনরূপ সার দেওয়া হয় না।

পরিষ্কৃত সোরার মধ্যে ১১.৬ ভাগ নাইট্রোজেন এবং ৪৫.৩ ভাগ পটাস থাকিতে পারে। এই উভয়ের মধ্যে, নাইট্রোজেন তামাকের প্রধান এবং পটাস প্রধানতম খাদ্য। সুতরাং, তামাকের পক্ষে সোরা একটি প্রধান সার। কিন্তু অপরিষ্কার সোরার মধ্যে ক্লোরাইড্ থাকিতে পারে। সুতরাং, উহা ব্যবহার করা সঙ্গত নহে। বিঘা-প্রতি ২০।৩০ সের সোরা গোবরের সারের সঙ্গে ব্যবহার করিলে বেশ ফল পাওয়া যায়। এই মিশ্রসার, তামাকের চারাগাছ ৮।৯ ইঞ্চি বড় হইলে, উহার গোড়ায় ছিটাইয়া দেওয়া ভাল। সালফেট্ অব এমোনিয়া, অস্থিচূর্ণ, সুপার ফস্‌ফেট, মৎস্যের গুঁড়া, প্রভৃতি সার তামাকের চারা রোপণ করিবার কিয়ৎদিন পূর্ব্বে মৃত্তিকামধ্যে ছিটাইয়া দিতে ও উহা চাষ করিয়া মৃত্তিকার সহিত মিশাইয়া দিতে হইবে। রোপণের অন্ততঃ দেড়মাস পূর্ব্বে, ক্ষেত্রে খৈলসার প্রয়োগ করিতে হয়। উহাও পূর্ব্বোক্তরূপে মৃত্তিকার সহিত মিশাইয়া দিতে ইহবে। রঙ্গপুরের কৃষকেরা তামাকের জমিতে মৎস্যের গুঁড়া ও খৈল সার অত্যল্পপরিমাণই ব্যবহার করিয়া থাকে।

গাছের ছাই তামাকের একটি প্রধান সার। কিন্তু বৃষ্টির জলে ধৌত ছাই অথবা পাথর কয়লার ছাই ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে। জলে ধৌত হইলে ছাইয়ের সারভাগ অনেকাংশে অপসারিত হয়; এবং পাথর কয়লার ছাই পটাস-শূন্য। সুতরাং, ঐরূপ ছাই ব্যবহার করিলে যে কোনও ফললাভ করা যায় না, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। পরিপক্ব অপেক্ষা কাঁচা শাখা-প্রশাখা কিম্বা পত্র মধ্যে পটাস্ অধিক রহে। কার্পাসবীজের ছাইএর মধ্যে পটাস্ ও নাইট্রোজেনের ভাগ অধিক বলিয়া, উহা তামাকের পক্ষে বিশেষ হিতকর। আমেরিকায় এই সারগুলি বিশেষরূপে ব্যবহৃত হয়। এতদ্ব্যতীত, সীম, ভূট্টা ও টেকিয়া প্রভৃতি গাছের ছাইও প্রয়োগ করা বিধেয়। পল্লীগ্রামের প্রায় সকল গৃহস্থই পাককার্য্যে জ্বালানী-কাষ্ঠ ব্যবহার করিয়া থাকে; সুতরাং, সমগ্র বৎসরে কাষ্ঠের ছাই সহজেই একত্র স্তূপ করিয়া রাখা যাইতে পারে। জমি তৈয়ার হইলে পর, স্তূপের ছাই সংগ্রহ করিয়া ক্ষেত্রে ছিটাইয়া দিতে ও মৈ দিয়া উহা মৃত্তিকার সহিত মিশাইয়া দিতে হয়।

কাঁচাসারও তামাকের পক্ষে উৎকৃষ্ট সার। আমেরিকায় ইহার বিশেষরূপ প্রচলন আছে। রঙ্গপুরের সরকারী কৃষি-পরীক্ষা-ক্ষেত্রে তামাকের জমিতে কাঁচাসার প্রয়োগে বেশ ফল পাওয়া গিয়াছে। তামাক কাটিবার পর, তামাকের জমিতে ২।১ বার চাষ দিয়া বিঘাপ্রতি ৫।৬ সের বরবটী (বোরা কালাই) ছিটাইয়া বুনিয়া দিতে হয়। ইহাতে যে গাছ জন্মে, তদ্দ্বারা মৃত্তিকার বেশ উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে।

শ্রীযামিনীকুমার বিশ্বাস

বিষভক্ষণ।

[শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র সরকার এম্, আর্, এ, এস্ লিখিত।]

গবাদি গৃহপালিত পশুরা কখনও কখনও খাদ্যদ্রব্যের সহিত বিষভক্ষণ করিয়া থাকে। বিষের পরিমাণ অধিক

হইলে বা যথাসময়ে সুচিকিৎসা করিতে না পারিলে, বিষভক্ষণকারী পশু মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তদ্ভিন্ন, দুষ্টলোকে কু-অভিসন্ধিতে অথবা চামারেরা চামড়া পাইবার লোভেও কখন কখন গবাদি পশুকে তীব্র বিষ খাওয়াইয়া মারিয়া ফেলে। আমাদের দেশে বিষভক্ষণে গো-মৃত্যুর সংখ্যাও বড় কম নহে। এই জন্যই আজ বিষ-চিকিৎসা-সম্বন্ধে দুএকটি কথা বিবৃত হইল।

প্রাণীজ, খনিজ এবং উদ্ভিজ্জ—এই ত্রিবিধ প্রকার বিষই পশু-শরীরে প্রবিষ্ট হইতে পারে। তন্মধ্যে, শেষোক্ত প্রকার বিষের চিকিৎসায়ই অধিকাংশস্থলে সুফললাভ করা যায়। খাদ্যের অভাব ঘটিলে, গবাদি পশুরা জঙ্গলা তীব্র লতা-পাতা প্রভৃতি যাহা পায়, তাহা খাইয়াই উদরপূর্ত্তি করিয়া থাকে। বিষাক্ত লতা-পাতা ভক্ষণ করিলেই, পশু-দেহে বিষ-ক্রিয়া উপস্থিত হয়। দীর্ঘকাল অনাহার বা অর্দ্ধাহারে রহিয়া, হঠাৎ একদিন অত্যধিক পরিমাণে জঙ্গলা লতা-পাতা (যাহা বিষাক্ত নহে) ভক্ষণ করিলেও, কখন কখন গবাদি পশুর শরীরে বিষলক্ষণসমূহ প্রকাশিত হইতে দেখা যায়। ভেরাণ্ডাগাছ বা উহার বীচি খাইলেও গোগণের দেহে বিষ-লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

মরা গরু ভাগাড়ে ফেলিয়া দেওয়ার প্রথা ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই প্রচলিত রহিয়াছে। উহার চামড়া স্থানীয় চামারেরাই সংগ্রহ করিয়া বিক্রয় করে। কোন কোন জেলায়, চামড়া-সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত, চামারেরা জমিদারকে গো-ভাগাড়ের খাজানা দিয়া থাকে। কিন্তু অধিকাংশস্থলেই ভাগাড় হইতে চামড়া সংগ্রহ করিতে চামারদিগের এক কপর্দ্দকও ব্যয় করিতে হয় না। উহারা বিনামূল্যে যে সকল চামড়া প্রাপ্ত হয়, সেই সকল চামড়া চর্ম্মব্যবসায়ী-দিগের দালালের নিকট বিক্রয় করিয়া ফেলে। যাহারা অধিক পরিমাণে চামড়া সংগ্রহ করিতে পারে, তাহারা দালালদিগকে সংগৃহীত চামড়া না দিয়া, অনেকসময় চর্ম্মব্যবসায়ীদিগের নিকটই সেই সকল বিক্রয় করিয়া যায়। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দ্দিষ্টসংখ্যক চর্ম্ম সংগ্রহ করিয়া দেওয়ার চুক্তিতে আবদ্ধ হইলে, চর্ম্মব্যবসায়ীরা চামারদিগকে চর্ম্মের আনুমানিক মূল্যের টাকা দাদন দিয়া থাকে। দাদনের টাকা গ্রহণ করিবার পর হইতেই চামারেরা চর্ম্মসংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দ্দিষ্টসংখ্যক চর্ম্ম সংগ্রহ করিতে না পারিলে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে মনে করিয়া, অনেকসময় চামারেরা চর্ম্মের লোভে বিষ খাওয়াইয়া গো-হত্যা করিয়া থাকে। এই উপায়ে বিষ খাওয়াইতে গিয়া, অনেকস্থলে তাহারা ধরা পড়িয়াও যায়। কিন্তু উহারা এমন সুকৌশলে কার্য্য সম্পাদন করে যে, অধিকাংশসময়েই উহাদের ধরা পড়িয়া শাস্তিভোগ করিবার কোনই সম্ভাবনা রহে না।

কোনও স্থানে গোবসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক ও মারাত্মক ব্যাধিতে গো-মড়ক উপস্থিত হইলে, চামারেরা সেই উপলক্ষে অধিক চামড়া পাইবার প্রত্যাশায় অনেক সুস্থ গরুকেও বিষ খাওয়াইয়া মারিয়া ফেলে। তৎকালে অত্যধিক পরিমাণে গো-মৃত্যু ঘটিলেও, কাহারও মনে কোনরূপ সন্দেহ উপস্থিত হয় না—হইতেও পারে না। ফলে, চামারেরা নিঃশঙ্ক-চিত্তে ও অবাধেই বিষ-প্রয়োগে ইচ্ছানুযায়ী গো হত্যা করিবার মহা সুযোগ প্রাপ্ত হয়; এবং বহুসংখ্যক গো-হত্যা করিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন, অন্য উপায় অবলম্বনেও অর্থাৎ সংক্রামক-রোগ-বিস্তারের উপায়বিধান করিয়াও, চামারেরা গো-মৃত্যুর সংখ্যা বর্দ্ধিত করিয়া থাকে। বসন্তরোগ যে অতি সংক্রামক, তাহা চামারদিগের অজ্ঞাত নহে। উহারা বসন্তরোগে মৃত গরুর পাকস্থলী ও অন্ত্র-মধ্যস্থ পদার্থ সকল লইয়া গিয়া, যে স্থানে গো-মড়ক উপস্থিত হয় নাই, সেইরূপ দূরস্থ কোনও পল্লীর গোচারণ-মাঠে ছড়াইয়া দিয়া আইসে। উহাতে মাঠের অনেক স্থানের দুর্ব্বাঘাসাদি বিষাক্ত হইয়া পড়ে। ফলে, উহা ভক্ষণ করিবামাত্রই সুস্থ গাভীগুলিও রোগগ্রস্ত হইয়া পড়ে। গ্রামে একবার সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব ঘটিলেই ভীষণ গো-মড়ক উপস্থিত হয়। সুতরাং, তদুপলক্ষে চামারেরা নিশ্চিন্তভাবেই বহুসংখ্যক চামড়া সংগ্রহ করিতে পারে।

চামারেরা সাধারণতঃ শাদা কিম্বা হলদে সেঁকো-বিষ-প্রয়োগেই গো-হত্যা করে। অধিকাংশস্থলেই শাদা বিষ ব্যবহৃত হয়। তদ্ভিন্ন, উহারা কখন কখন কুচুয়া, কাঠবিষ

ও অন্যান্য প্রকার বিষাক্ত গাছগাছড়া-ঘটিত বিষও ব্যবহার করিয়া থাকে। যে পরিমাণ বিষ খাওয়াইতে হইবে, সেই পরিমাণ বিষ লইয়া, প্রথমতঃ উহা অল্প ঘৃত বা ময়দার সহিত মিশ্রিত করে; এবং তৎপর, বিষাক্ত ঘৃতাদি কলাপাতা বা অন্য কোনও পাতায় বাঁধিয়া গরুর মুখে পূরিয়া দেয়। গরুর মুখে দিতে না পারিলে, যখন মাঠে গোগণ চরিতে থাকে, তখন তাহাদের মুখের সম্মুখে বিষাক্ত পদার্থপূর্ণ কলাপাতা প্রভৃতি ফেলিয়া দিয়া যায়। গাভীরা উহা দেখিবামাত্রই আগ্রহের সহিত ভক্ষণ করে; এবং অত্যল্পকালমধ্যেই অসুস্থ হইয়া পড়ে। অনেকস্থলে, চামারেরা গোচারণ-মাঠের ঘাসের উপরে নানা প্রকার বিষ ছড়াইয়া দিয়াও গো-হত্যা করিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন, উহারা সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রের সাহায্যেও গো-শরীরে বিষ প্রবেশ করাইয়া দেয়। সুবিধা হইলে, গাভীর মলদ্বার প্রভৃতিতেও চামারেরা বিষ ভরিয়া দিয়া যায়। গবাদি পশু অধিক পরিমাণে বিষ খাইলে, অথবা কোনরূপে উহাদিগকে বিষ খাওয়াইলে, নিম্নলিখিত লক্ষণ সকল প্রকাশিত হইয়া থাকে:—

গরুটা হঠাৎ পীড়িত হয় ও কাঁপিতে থাকে; এবং উহাদের পেটে অত্যন্ত বেদনা হয়। এই বেদনা অসহ হওয়াতে, গাভী শিং অথবা পশ্চাতের পা দিয়া পেটে আঘাত করিতে থাকে এবং বারম্বার পাঁজরের দিকে তাকায়। গাভীর মুখ দিয়া ফেণা বাহির হয়; এবং সে জলের জন্য ছটফট্ করিতে থাকে। ধনুষ্টঙ্কারের লক্ষণ উপস্থিত হয়; এবং তদবস্থায় পীড়িত গাভী বারম্বার মলত্যাগ করে। এই মলের সহিত অল্পাধিক পরিমাণে রক্তও নির্গত হয়। বিষভক্ষণ করিলে গোগণের সাধারণতঃ দুই হইতে চারি ঘণ্টার মধ্যেই মৃত্যু ঘটে। বিষের পরিমাণ ও প্রকার-ভেদের উপরই, প্রধানতঃ উহাদের মৃত্যুকাল নির্ভর করিয়া থাকে।

বিরেচক বা বমনকারক ঔষধ সেবন করাইয়া, ভক্ষিত বিষ মলের বা বমনের সহিত বাহির করিয়া ফেলিতে পারিলেই পশুটীকে রক্ষা করিতে পারা যায়। নিম্নলিখিত বিরেচক ঔষধ কএকটির মধ্যে যে কোনও ঔষধই ব্যবহার করা যাইতে পারে।

(১) গন্ধকচূর্ণ ... ... /০ ছটাক
মসিনার তৈল ... ... ৵০ "
ভাতের মাড় ... ... /॥০ সের

উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে।

(২) লবণ ... ... ৬ ছটাক
মুসব্বর ... ... ½ "
শুঁঠ ... ... ½ "
চিটাগুড় ... ... ৪ "

সোওয়াসের পরিমিত অত্যুষ্ণজলের সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া, গরম গরম অবস্থায় পান করাইতে হইবে।

(৩) শুঁঠচূর্ণ ... ... ১ তোলা
মসিনার তৈল ... ... /।০ পোওয়া
গন্ধকচূর্ণ ... ... /৶০ "
ভাতের মাড় ... ... /॥০ সের

একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইয়া দিবে।

(৪) তিসির তৈল ... ৫ ছটাক
মিঠাতৈল ... .. ৫ "
চিটাগুড় ... ... ১ তোলা

একত্র মিশ্রিত করিয়া খওয়াইতে হইবে।

(৫) সর্পজয়ার শিকড় একছটাক থেতো করিয়া ভাতের মাড়ের সহিত সিদ্ধ করিয়া লইবে; এবং তৎপর, উহা উষ্ণ থাকিতে থাকিতেই পীড়িত গাভীকে সেবন করাইবে।

পীড়িত গাভীকে প্রচুর পরিমাণে তিসির মাড় খাইতে দেওয়া যায়; কিন্তু যে পর্য্যন্ত পেটের বেদনা ও পেট নামা বন্ধ না হয়, ততক্ষণ উহাকে জল খাইতে দেওয়া অনুচিত। অত্যন্ত পিপাসা থাকিলে, তিসির মাড় বা সিদ্ধ কলাইয়ের সহিত ভূষির মাড় খাইতে দেওয়া কর্ত্তব্য। তদবস্থায় ঘাস অথবা অন্য কিছু খাইতে দেওয়া সঙ্গত নহে। গবাদি পশু বিষভক্ষণ করিয়াছে জানিতে বা লক্ষণ দেখিয়া বুঝিতে পারিলে, একসের তিসির তৈল বা জলপাইর তৈল ঘণ্টায় ঘণ্টায় পশুকে খাওয়াইতে পারিলেও উপকার হয়।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার।

গোলাপের চাষ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র গুহ এফ্. আর, এইচ, এস্ লিখিত।]

কেয়ারি-রচনা — সমতল, ক্রমোচ্চ এবং ক্রমনিম্ন—সকল স্থানেই গোলাপ-ক্ষেত্র বা গোলাপ-বাগ প্রস্তুত করা যায়। বিভিন্ন জাতি অনুসারে, ঐরূপ সকল ক্ষেত্রেই গোলাপের চাষ হইতে পারে। তবে ক্ষেত্রের অবস্থা বুঝিয়া, যাহাতে রোপণ-কার্য্য চলিতে পারে, তাহারই ব্যবস্থা করিতে হয়। তদ্ভিন্ন, গোলাপ-বাগের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে, তাহাতে গোলাপগাছ বসাইবার উপযোগী কতকগুলি কেয়ারি (Bed) প্রস্তুত করিয়া লওয়া আবশ্যক। নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রের আয়তন অনুসারেই, উহা বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত করিতে এবং খণ্ডীকৃত প্রত্যেক অংশেই কেয়ারি প্রস্তুত করিতে হয়। প্রথমতঃ, প্রত্যেক খণ্ডের মৃত্তিকা অন্ততঃ দুই হাত গভীর করিয়া খনন করিতে বা কোবাইয়া লইতে হইবে। তৎপর, খনিত মৃত্তিকার চাকাগুলি উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া ও চূর্ণীকৃত মৃত্তিকা হইতে আগাছাদি বাছিয়া ফেলিয়া জমি প্রস্তুত করিতে হইবে। জমি প্রস্তুত হইলে, উহাতে আবশ্যক-মত কেয়ারি রচনা করিয়া লইতে পারা যায়।

যে স্থানে গোলাপের চাষ করিতে হইবে, সেই স্থান যদি সমতল না হয়, অর্থাৎ উহা ক্রমোচ্চ, ক্রমনিম্ন অথবা টিলার মত বন্ধুর হয়, তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে উহা যথাসম্ভব সমতল করিয়া লইতে হইবে। টিলার অত্যুচ্চ স্থান কাটিয়া এবং নিম্নস্থান বা গর্ত্ত প্রভৃতি 'ভরাট' করিয়া—নির্দ্দিষ্ট স্থানটুকু সমতল করিয়া লইলেই হইল। সমতল-ক্ষেত্রই কেয়ারি-রচনা করিবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

সৌখীনব্যক্তিরা স্বীয় স্বীয় পছন্দমতই গোলাপগাছ বসাইবার উপযোগী কেয়ারি প্রস্তুত করিয়া লইবেন। ঐ সকল কেয়ারি (১) সরল (simple) এবং জটিল (compound)—এই দ্বিবিধ প্রকারেই প্রস্তুত করা যাইতে পারে। মঞ্চোপরিও কেয়ারি প্রস্তুত করিয়া, উহাতে গোলাপের চাষ হইতে পারে। কিন্তু ইষ্টকগ্রথিত মঞ্চ (mound) প্রস্তুত করা বহুব্যয়সাধ্য ব্যাপার। মৃত্তিকা-রচিত উচ্চ মঞ্চেই গোলাপচাষ সহজ ও অল্পব্যয়সাধ্য। মঞ্চের আকারও নানারূপ হইতে পারে; এবং উহাও সরল ও জটিল—এই দুই প্রকারেই প্রস্তুত করিতে পারা যায়। গোলাপ-বাগের বা মঞ্চের কেয়ারিতে নানারূপ কারুকার্য্য করিতে পারিলে, উহা বস্তুতঃই নয়নের প্রীতিকর হইয়া থাকে। সৌখীনব্যক্তিরা স্বীয় স্বীয় অভিরুচিমতই মঞ্চ বা মালঞ্চ প্রস্তুত করিবেন। স্থান-বিশেষের—বিশেষতঃ, নিম্নস্থানের পক্ষে, মঞ্চোপরি গোলাপের চাষ বিশেষ উপযোগী। সাধারণ ভূমি হইতে উচ্চ স্থানের (বেদির আকারে রচিত) নাম মঞ্চ।

সাধারণতঃ, আয়তক্ষেত্রের, বৃত্তের ও ত্রিভুজের আকারেই সরল কেয়ারি প্রস্তুত করা হয়। পক্ষান্তরে, কারুকার্য্যসমন্বিত বিবিধ আকারেই জটিল কেয়ারি প্রস্তুত হইয়া থাকে। ক্ষেত্রের আয়তনানুসারে, উহা কতকগুলি চিত্র-বিচিত্র কেয়ারিতে পরিণত করিয়া লইতে পারিলে, এবং উহার স্থানে স্থানে খোদিত প্রতিমূর্ত্তি (statue) স্থাপন করিলে, গোলাপ-বাগের সৌন্দর্য্য পরিবর্দ্ধিত হয়। তদ্ভিন্ন, ঐ সকল কেয়ারি সুশোভিত করিবার উদ্দেশ্যে, উহাদের মাঝে মাঝে কৃত্রিম ফোয়ারা (Fountain), চৌবাচ্চা (tank or reservoir), কুঞ্জ বা লতামণ্ডপ (লতা-গোলাপের) এবং পটমণ্ডপ (Pavillion) প্রভৃতি প্রস্তুত করা আবশ্যক।

ত্রিভুজাকার-ক্ষেত্রে কেয়ারি প্রস্তুত করিতে হইলে, উহা সূক্ষ্মকোণী আকারে প্রস্তুত করা সঙ্গত নহে। কারণ, ঐরূপ আকারের কেয়ারিতে গাছ রোপণের অসুবিধা ঘটিয়া থাকে। সাধারণতঃ সমকোণী সমান্তরাল চতুর্ভুজ-ক্ষেত্রই কেয়ারি-রচনার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। গোলাপ-ক্ষেত্রে অবাধে সূর্য্যোত্তাপ, আলো ও বায়ু প্রবেশের সুবিধা থাকা চাই। তবে ক্ষেত্রের পশ্চিমদিক্ আংশিক ছায়াযুক্ত হওয়া আবশ্যক। যাহাতে ঐ ছায়া অপরাহ্ণ-কালে অর্থাৎ একপ্রহর বেলা থাকিতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদুপায়বিধান করিতে হইবে। চিক, পর্দ্দা বা তদ্রূপ

অন্য কোন আবরণ দ্বারা ছায়ার সুবিধা করাই সঙ্গত। যাহাতে নানাজাতীয় গোলাপের একক্ষেত্রেই সমাবেশ হয়, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াই গোলাপ-বাগ ও কেয়ারি প্রস্তুত করিতে হইবে। কেয়ারি অতিশয় উচ্চ হওয়া সঙ্গত নহে। তবে বর্ষাকালে যে সকল স্থানে সাময়িক জল দাঁড়াইবার সম্ভাবনা রহে, সেই সকল স্থানের কেয়ারি উচ্চ হওয়াই আবশ্যক। গোলাপগাছে অধিক পরিমাণে জলসেচন করিতে হয় বলিয়া, ক্ষেত্রের বা কেয়ারির মৃত্তিকা সরস, অথচ অতিশয় আর্দ্র নহে, থাকা আবশ্যক। গোলাপ-বাগের পথ অপেক্ষা কেয়ারিগুলি কিছু নীচু করিতে হয়। বিহার, উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশ এবং নিম্নবঙ্গের গোলাপ-বাগের কেয়ারিগুলিই ঐরূপ করিতে হইবে। পক্ষান্তরে, পার্ব্বত্য-প্রদেশের কেয়ারি পথ অপেক্ষা নীচু করা অনাবশ্যক।

গোলাপ-বাগের কেয়ারিতে যে সকল গোলাপগাছ রোপিত হয়, উহাদের গোড়ার চতুর্দ্দিকে দেড় হইতে দুই হাত স্থান খালি রাখিয়া, ক্ষেত্রের অবশিষ্ট স্থানে দুর্ব্বাঘাস লাগাইয়া দিতে পারিলে, কেয়ারির সৌন্দর্য্য অত্যধিকরূপে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। কেয়ারি-রচনা এবং গোলাপগাছ-রোপণ-কার্য্য বিশেষ বিবেচনা ও সতর্কতার সহিত করিতে হয়। যাহাতে কেয়ারিগুলি অতিশয় বিস্তৃত না হয়, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কেয়ারিতে রোপিত গাছগুলি অতিশয় ঘন হইলে, উহাদের পুষ্পধারণের ব্যাঘাত জন্মে; অধিকন্তু, ঘনসন্নিবিষ্ট গাছের দ্বারা কেয়ারিও ছত্রপ্রেক্ষ হইয়া থাকে। দীর্ঘাকার আয়তক্ষেত্রের অনুরূপ কেয়ারিতেই গোলাপগাছ রোপণ করা সুবিধা-জনক। কিন্তু যাহাতে কেয়ারির দৈর্ঘ্য ৮।১০ হাত ও প্রস্থ ৩।৪ হাতের অধিক না হয়, তৎপ্রতিও বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

প্রত্যেক কেয়ারির কেন্দ্রস্থানে এক একটি স্তম্ভাকার গোলাপগাছ ও উহার চতুর্দ্দিকে প্রমাণ আকারের উচ্চ গোলাপগাছ রোপণ করাই সঙ্গত। কেয়ারির স্থানে স্থানে ঝাড়াল (bush) গাছ সুন্দর দেখায়। কেয়ারির স্থানে স্থানে শাখিত লতাজাতীয় গোলাপগাছও রোপণ করা যাইতে পারে। প্রমাণ-আকারের গোলাপগাছ অপেক্ষা স্তম্ভাকার-জাতীয় গোলাপগাছই দেখিতে সুন্দর। ত্রিভুজ, পিরামিড্ (Pyramid) আকারের গোলাপঝাড়ের সৌন্দর্য্যও বড় কম নহে। গাছের সৌন্দর্য্যের উপরে কেয়ারির সৌন্দর্য্য নির্ভর করে। সুতরাং, গাছের সৌন্দর্য্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই, তদনুযায়ী কেয়ারি রচনা করা আবশ্যক। গোলাপ-বাগের রাস্তাগুলি দুর্ব্বাঘাস অথবা কঙ্কর, খোয়া কি ইষ্টক নির্ম্মিত হইলে বাগানের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হয়। প্রত্যেকটি কেয়ারির পার্শ্বদেশে দুর্ব্বাঘাসের চান্‌কাও নয়নের প্রীতিকর হইয়া থাকে। রাস্তাগুলি দুর্ব্বাঘাসে পূর্ণ রহিলে এবং কেয়ারির পার্শ্বে নানাজাতীয় অল্টার-নেছিয়া (Alternanthera) রক্তবীজ, রিবণ-ঘাস (Ribbon grass) অথবা তদ্রূপ অন্য কোনরূপ ঘাসের চান্‌কা প্রস্তুত করিতে পারিলে, কেয়ারির সৌন্দর্য্য অত্যধিকরূপে বর্দ্ধিত হয়। প্রত্যেক কেয়ারির পার্শ্বে এন্থুরিয়াম (Anthurium) প্রভৃতি ক্ষুদ্রাকার রঙ্গিত-পত্র (Foliaged) উদ্ভিদ রোপণ করিলে, তদ্দ্বারা কেয়ারির সৌন্দর্য্য পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। কেয়ারি-রচনা ও তাহাতে গোলাপগাছ রোপণ করিবার পূর্ব্বে, কিরূপে কেয়ারির শোভা নয়নের প্রীতিকর হইতে পারে, তাহাও ভাবিয়া দেখা উচিত।

গোলাপতত্ত্ববিদ্ লেণ্ডোলিকাস্ বলেন,—যে সকল স্থানে কেয়ারি প্রস্তুত করিতে হইবে, সেই সকল স্থানের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যাহা হইবে, ঐপরিমাণ স্থানের মৃত্তিকা ৪ ফুট গভীর করিয়া খনন করিতে এবং খনিত মৃত্তিকা উঠাইয়া ফেলিতে হইবে। তৎপর, খনিতস্থানের তলদেশে দুইপাত পাথরের টালি বিছাইয়া দিতে হয়। পাথরের টালির পরিবর্ত্তে ইট বিছাইলেও চলে। যাহাতে কেয়ারির জলনির্গমনের পথ রুদ্ধ হইয়া না যায়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই টালি বিছাইতে হইবে। টালি বিছান হইলে পর, ঘাসযুক্ত দো-আঁশ-মৃত্তিকার সহিত অস্থিচূর্ণ, পুরাতন গো-বিষ্ঠা, অতি পুরাতন ঘোটক-বিষ্ঠা অথবা নীলের সিটী মিশ্রিত করিয়া, তদ্দ্বারা গর্ত্তগুলি পূর্ণ করা আবশ্যক, এবং তদুপরি কেয়ারি-রচনা করিতে হইবে। তরুণ অথবা শুষ্ক ঘোটক-বিষ্ঠা বড়ই তেজস্কর সার; সুতরাং উহা ব্যবহার

করিলে কেয়ারির গাছের বড়ই অনিষ্ট সাধিত হয়। ঘোটক-বিষ্ঠা উত্তমরূপে পচাইয়া লইয়াই, উহা মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিতভাবে ব্যবহার করিতে হইবে। ৪।৫ বৎসরের পূর্ব্বে ঘোটক-বিষ্ঠা সম্পূর্ণরূপে পচে না; সুতরাং, উহা তৎপূর্ব্বে ব্যবহার করাও সঙ্গত নহে। নিম্ন-প্রদেশে ঘোটক-বিষ্ঠা ব্যবহার করা অনাবশ্যক। কেয়ারি প্রস্তুত হইলে, তাহাতে গোলাপগাছ রোপণ করিতে হইবে।

ইউরোপ ও অন্যান্য শীত-প্রধান-দেশে কাচনির্ম্মিত গৃহে বা সবুজ-গৃহে (green-house) গোলাপের চাষ হইয়া থাকে। ঐরূপ গৃহেও কেয়ারি রচনা করিয়া, তদুপরি গোলাপগাছ রোপণ করা হয়। ভারতবর্ষে গোলাপ-গৃহ প্রস্তুত করিবার বিশেষ কোনরূপ প্রয়োজন হয় না। বিশেষতঃ, কাচ-গৃহে বা সবুজ-গৃহে গোলাপের চাষ করাও বহু ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। অথচ, এরূপ সৌখীনও এ দেশে অতি বিরল। তবে সৌখীনব্যক্তি ইচ্ছা করিলে সবুজ-গৃহ বা কাচ-গৃহেও গোলাপের চাষ করিতে পারেন। ইউরোপে—বিশেষতঃ ইংলণ্ডে, ৫।৬ গিনি মূল্যে ক্ষুদ্রাকার কাচ-গৃহ বিক্রীত হয়। কিন্তু এদেশে উহা সুলভ নহে। শীত-প্রধান-দেশে তুষারের উপদ্রব হইতে গোলাপগাছ রক্ষা করিবার নিমিত্তই কাচ-গৃহাদিতে গোলাপচাষ করা অত্যাবশ্যক। আমাদের দেশে আবশ্যকতা না রহিলেও, সখের হিসাবে, কাচ-গৃহ বা সবুজ-গৃহে গোলাপের চাষ করা যাইতে পারে। গোলাপ-বাগের ন্যায়, গোলাপ-গৃহেও কেয়ারি রচনা করিয়া লওয়া অত্যাবশ্যক।

গোলাপ-ক্ষেত্রের বেড়া—নানাবিধ উপায় অবলম্বনেই গোলাপ-ক্ষেত্রের বা গোলাপ-বাগের প্রাচীর বা বেড়া দেওয়া যাইতে পারে। সৌখীন ও অর্থশালী ব্যক্তির পক্ষে লোহার রেইলিং দ্বারা গোলাপ-ক্ষেত্রের প্রাচীর দেওয়াই সঙ্গত। কারণ, উহা অতি সুন্দর দেখায় ও দীর্ঘস্থায়ী হয়। কিন্তু রেল দেওয়া বেড়া (railing) দেওয়া অতিশয় ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। ঢেউ-তোলা টীনের (corrogated iron) রেল দেওয়া বেড়াও মন্দ নহে। কিন্তু এই উভয়বিধ বেড়ার নিম্নভাগ ইষ্টকগ্রথিত হওয়া আবশ্যক। ইষ্টক-প্রাচীর সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘস্থায়ী হয় সত্য, কিন্তু উহাও অতিশয় ব্যয়সাধ্য। কাষ্ঠের রেইলিং দ্বারাও বেড়া দেওয়া যাইতে পারে। এই বেড়া অপেক্ষাকৃত অল্পব্যয়েই দেওয়া যায়।

ইক্ষা ও অসেজ অরেঞ্জ (Osage orange) প্রভৃতি গাছের বেড়া দিলে খুব অল্প ব্যয় হয়। উহাও দীর্ঘস্থায়ী। সময় সময় ছাঁটিয়া দিতে পারিলে, ইহাদিগের বেড়াও সুন্দর দেখায়। এইরূপ বেড়ার পার্শ্বে লতাজাতীয় গোলাপগাছ রোপণ করিলে, উহারা বেড়ার সহিত জড়াইয়া বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ঐ সকল গোলাপগাছে ফুল ফুটিলে, ফুলের বর্ণ ও বেড়ার সবুজবর্ণের একত্র সমাবেশহেতু, অতিশয় রমণীয় শোভা ধারণ করে। ইষ্টক-প্রাচীরে অথবা লৌহ, চেউতোলা টীন ও কাষ্ঠ নির্ম্মিত রেল দেওয়া বেড়াতেও লতাজাতীয় গোলাপগাছ উঠাইয়া দিতে পারিলে, এই সকলও বিচিত্র শোভাধারণ করিয়া থাকে। লতাজাতীয় গোলাপের মধ্যে উইলিএম্ এলেন্ রিচার্ডসন্ (W. Allen Richardson), চার্লস্ লসন্ (Charles Lawson), ডিউক অব্ এডিনবর্গ (Duke of Edinburgh), ব্যাঙ্কসিয়ান (Banksian), ফরচুনস্ ইয়লো (Fortunes Yellow) সেম্পর ভাইরেন্স্ (Semper Virens), গ্লোরি ডি ডিজন (Glorie de Dijon), মেডাম্ বেরার্ড (Madame Berard), এল্ আইডিয়াল (L', Ideal), হনর ব্লেয়ারী Blaire No. 2), আয়ার-শায়ার (Ayrshire), ক্লথ অব্ গোল্ড (Cloth of gold), মার্শেল নীল (Murechal Neil), রিনি-মেরি-হেন্‌রিএট্ (Reine Marie Henriett), ও উল্‌রিচ্ ব্রুনার (Ulrich Brunner) প্রভৃতি গোলাপই বেড়া সাজাইবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

ইউরোপ এবং আমেরিকার চিরহরিৎ ক্ষুদ্রাকার বৃক্ষ ও ওষধাদি দ্বারাও বেড়া দেওয়ার কার্য্য সাধিত হয়। ইউ (Yew), হলি (Holly), আমেরিকান আরবরভাইটি (American Arborvitæ), বার্ব্বেরিস্ (Berberis), প্রাইভেট্ (Privet), হরণবিম্ (Hornbeam) প্রভৃতি উদ্ভিদই বেড়া দেওয়ার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এই সকল গাছের বেড়া দিয়া, উহাদের সহিত লতা-গোলাপ-

গাছ উঠাইয়া দিলে, একদিকে বেড়ার এবং অপরদিকে প্রস্ফুটিত গোলাপের সৌন্দর্য্যের একত্র সমাবেশ হওয়াতে এক অনির্ব্বচনীয় শোভাধারণ করিয়া থাকে। অষ্ট্রীয়ান্ ব্রায়ার (Austrian Briar) এবং রোসা জাইগেন্টিয়া (Rosa gigantia) প্রভৃতি আরণ্য-গোলাপের বেড়াও দেওয়া যায়। কিন্তু উহাদের ফুল সুন্দর নহে। তবে গাছ কণ্টকময় বলিয়া, ঐ সকল আরণ্য-গোলাপের বেড়া দ্বারা গোলাপ-বাগ পশ্বাদির উপদ্রব হইতে রক্ষিত হয়। রোসা ভিলোসা (Rosa Villosa), বৌর সলট্ (Bour Sault), জাপানী গোলাপ (Japanese rose) এবং সুইট্ ব্রায়ার (Sweet briar) প্রভৃতি গোলাপের বেড়াও মন্দ নহে। তদ্ভিন্ন, পল্‌স্ কারমিন পিলার (Pauls' Carmine pillar) নামক গোলাপও বেড়ার পক্ষে উপযোগী। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, উপরে যে সকল গোলাপের নামোল্লেখ করা গেল, উহাদের অধিকাংশই নিম্ন-প্রদেশে পুষ্পপ্রসূ হয় না। সুতরাং, উহারা পার্ব্বত্য ও শীত-প্রধান দেশের পক্ষেই বিশেষ উপযোগী। পক্ষান্তরে, উইলিয়ম এলেন রিচার্ডসন্, ডিউক অব্ এডিনবার্গ, ব্যাক্সিয়ান, গ্লোরি ডি ডি জন্, বোরসন্ট মেডাম বেরার্ড, ক্লথ অব গোল্ড, মার্শেল নীল প্রভৃতি কএকটি জাতিই নিম্ন-প্রদেশের উপযোগী।

উদ্ভিদের বেড়াতে অনেকসময় গোলাপবাগের অপকারও সাধিত হইয়া থাকে। ঐরূপ বেড়াতে নানাবিধ কীট-পতঙ্গাদি বাস করিবার সুবিধা পায়। উহারা গোলাপ-গাছের ফুলের ও পাতার বিশেষ অনিষ্টসাধন করে। কিন্তু বেড়া দ্বারা গোলাপগাছগুলি প্রবল ঝঞ্ঝাবাত হইতে সুরক্ষিত হয় বলিয়া, কোনও কোনও সময় কোন কোন স্থানে গাছের বেড়া দেওয়ারও প্রয়োজন হয়। নিম্ন-প্রদেশে গোলাপবাগের পশ্চিম ও উত্তর দিক্ বেড়া দ্বারা আবরণ করিয়া, অপর দুইদিক্ উন্মুক্ত রাখাই সঙ্গত। আমাদের দেশে মেন্দিগাছের যে বেড়া দেওয়া হয়, উহাও দেখিতে সুন্দর। তদ্ভিন্ন, গন্ধরাজের বেড়াও সুন্দর দেখায়। গন্ধরাজের বেড়া দিলে, ঐ সকল গাছের ফুলগুলি ফাও লাভ হইয়া থাকে। প্রস্ফুটিত গন্ধরাজ-পুষ্পের সুগন্ধে যখন সমস্ত বাগান আমোদিত হইয়া উঠে, তখন বস্তুতঃই উহা বড় আরামের স্থল হয়। ঘনসন্নিবিষ্ট গন্ধরাজগাছগুলি ছাঁটিয়া দিয়া মন্দির, স্তম্ভ, মনুষ্য বা মনুষ্যেতর প্রাণী প্রভৃতি নানাবিধ মূর্ত্তি তৈয়ার করিয়া রাখিলে, তদ্দ্বারাও বাগানের শোভা পরিবর্দ্ধিত হয়। স্থূলতঃ, বেড়ার সৌন্দর্য্যের উপর গোলাপবাগের সৌন্দর্য্য আংশিক-নির্ভর করিয়া থাকে। কারুকার্য্যসমন্বিত বেড়াই গোলাপবাগের সৌন্দর্য্যবর্দ্ধক।

গাছরোপণ-প্রণালী—জমি প্রস্তুত হইলে পরই, তাহাতে গাছ বসাইতে হইবে। কিরূপভাবে জমি প্রস্তুত করিতে হইবে, এবং কোনসময়ে গাছ রোপণ করা প্রশস্ত, তাহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। যে যে স্থানে গোলাপগাছ রোপণ করিতে হইবে, সেই সকল স্থানে ২।৩ ফুট ব্যাস এবং ২ ফুট গভীর এক একটি গর্ত্ত খনন করিতে হইবে। তৎপর, উৎকৃষ্ট ঘাসযুক্ত দো-আঁশ-মৃত্তিকার সহিত সার মিশ্রিত করিয়া, ঐ সারমিশ্রিত মৃত্তিকা দ্বারাই গর্ত্তগুলি পূর্ণ করিতে হয়। দুইভাগ মৃত্তিকার সহিত একভাগ সার মিশ্রিত করিলেই চলে। কোন কোন সার গোলাপচাষের উপযোগী, তাহাও পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। গোলাপগাছের পক্ষে অস্থিসার উপযোগী হইলেও, উহা ২।৩ বৎসরের পূর্ব্বে কার্য্যকর হয় না। গোশালাজাত-সার সর্ব্বত্রই সুলভ ও সহজলভ্য; এবং এই সারই গোলাপ-চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী ও আশুফলদায়ক। সুতরাং, সাধারণ চাষের পক্ষে, উহাই ব্যবহার করা সঙ্গত। আমি গোলাপের চাষে পুরাতন গোময়সার, পোড়ামাটি এবং খৈল ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফললাভ করিয়াছি। পুরাতন গোময় গোলাপের পক্ষে উৎকৃষ্ট সার। ঘাসসংযুক্ত পচা মৃত্তিকাও মন্দ নহে। পোড়ামাটি গোলাপচাষের পক্ষে বিশেষ হিতকর। সারসম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে যাহা লিখিত হইয়াছে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই গোলাপের চাষ করিতে হইবে।

গোলাপগাছ রোপণ করিবার জন্য যে সকল গর্ত্ত প্রস্তুত করা হইবে, ঐ সকল গর্ত্ত সারমিশ্রিত মৃত্তিকা দ্বারা পূর্ণ করিবার পর, উহাতে ক্রমাগত ১০।১২ দিন

পর্য্যন্ত দুইবেলা জলসেচন করিবে। তাহা হইলেই সার ও মৃত্তিকা উত্তমরূপে মিশিয়া যাইবে। গর্ত্ত পূর্ণ করিবার পর দুই একবার বৃষ্টি হইলে, গর্ত্তের মৃত্তিকা উত্তমরূপে পচিয়া যায়; সুতরাং, তদবস্থায় আর জলসেচন করিতে হয় না। সার পচিয়া গিয়া মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত হইলে পরই, গর্ত্তের মৃত্তিকায় গোলাপগাছ রোপণ করিতে, এবং রোপিত গাছের চতুর্দ্দিকের মৃত্তিকা হাতের চাপে আস্তে আস্তে টিপিয়া ভালরূপে বসাইয়া দিতে হয়। বলা বাহুল্য, মাটি যেন কঠিন হইয়া না যায়। কারণ, তাহা হইলে গাছের রসশোষণ করিবার পক্ষে ব্যাঘাত ঘটিবে। রোপিত গাছগুলি মৃত্তিকায় লাগিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত, প্রত্যেক গাছের উপরিভাগেই আবশ্যকমত প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে জলসেচন করিতে হইবে। এরূপভাবে সতর্কতার সহিত জল দিতে হইবে, যাহাতে গাছের গোড়ার মৃত্তিকা সরস রহে, অথচ মৃত্তিকা অধিক আর্দ্র হইয়া না পড়ে। অধিক জল দেওয়া অনাবশ্যক। কারণ, অধিক জল দিলে গাছের শিকড় পচিয়া যাইতে পারে। তাহাতে রোপিত গোলাপ-গাছ মরিয়া যাইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা রহে।

সাধারণতঃ, পাঁচ হইতে সাত ফুট ব্যবধানেই গোলাপ-গাছ রোপণ করা সঙ্গত। গাছের জাতিভেদে রোপণের দূরতা নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। কোনও কোনও জাতীয় গোলাপগাছ অতিশয় ঝাড়াল বা ঝোপবিশিষ্ট হয়। উহাদের রোপণের ব্যবধান সাত ফুটেরও অধিক হওয়া আবশ্যক। পক্ষান্তরে, কোনও কোনও ছোটজাতীয় গোলাপগাছ দেড় কি দুই ফুট ব্যবধানে রোপণ করিলেও চলে। গাছ রোপণ করিবার সময়, আরও একটি বিষয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। জোড়-কলম বা চোখ-কলমের গোলাপগাছ রোপণ করিতে হইলে, উহার জোড়ার সম্পূর্ণভাগ বা অন্ততঃ অর্দ্ধভাগ মৃত্তিকার নীচে প্রোথিত করিতে হইবে। নচেৎ, সামান্য আঘাতেই জোড়া খসিয়া যাইবার সম্ভাবনা রহে। সাধারণতঃ, জঙ্গলা-গোলাপের কাটিং (Cutting) এর সহিতই ভাল জাতীয় গোলাপ-শাখার জোড় বা চোখ কলম বাঁধা হয়। উহাদের কাটিং ভূমির উপরে রহিলে, উহা হইতে বহুসংখ্যক ফেঁকড়ি বাহির হইয়া পড়ে; এবং তাহাতে আসল গাছকে মারিয়া ফেলিবার সম্ভাবনা রহে। সুতরাং, জোড়ের নিম্নাংশের জঙ্গলাগাছে ফেঁকড়ি বাহির হওয়া মাত্রই, উহা কাটিয়া ফেলিতে হয়। শাখা বা ডাল কলমের (Cutting) এবং ডাবা-কলমের গাছে উক্তরূপ দোষ ঘটে না। সুতরাং, তদ্রূপ গাছ সাধারণ রীতি অনুসারেই রোপণ করা যায়। গাছ-রোপণের উপরেই গোলাপ-চাষে সফলতা বা নিষ্ফলতা অনেকাংশে নির্ভর করিয়া থাকে। সুতরাং, যা-তা করিয়া চারা রোপণ করিলেই চলিবে না।

সকল জাতীয় গোলাপগাছই দীর্ঘজীবী হয় না। সাধারণতঃ, দীর্ঘজীবী গাছগুলিও কদাচিৎ ৮.১০ বৎসরের অধিককাল বাঁচিয়া থাকে। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহার পুষ্পধারণ-শক্তি ক্রমেই হ্রাস পায়। বিশেষতঃ, অধিক বয়সের গাছে কদাচিৎ উৎকৃষ্ট ফুল হয়। এই সকল কারণে, ২।৩ বৎসর পর পরই, গোলাপ-ক্ষেত্রে নূতন গাছ রোপণ করিতে হয়। সাধারণতঃ গোলাপগাছ ৪।৫ বৎসর বয়সেই বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। গোলাপগাছের কাণ্ড ক্রমে স্থূল হইয়া উঠিলে, উহার ডালপালাও স্থূলতা-লাভ করিয়া কঠিন হইয়া পড়ে। তদবস্থায় গাছগুলি একরূপ অকর্ম্মণ্য হইয়াই যায়। গোলাপগাছের কাণ্ড এবং উহার শাখা-প্রশাখা যতকাল কোমল রহিবে, ততকালই উহারা যথোচিত পরিমাণে ফুল প্রদান করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে, পুরাতন ডালপালায় কদাচিৎ আশানুরূপ ফুল উৎপন্ন হয়। সেইজন্য প্রতিবৎসর গোলাপগাছ ছাঁটিয়া দিয়া, নূতন ডালপালা বাহির হইবার সুবিধা করিয়া দিতে হয়। প্রতিবৎসর গোলাপগাছ ছাঁটিয়া দিতে হইবে; ইহা স্মরণ রাখিয়াই গাছ বসাইবার দূরত্ব-নির্দ্ধারণ করিতে হয়।

বিভিন্নজাতীয় গোলাপগাছ বিভিন্ন চৌকা বা কেয়ারিতে রোপণ করাই সুবিধাজনক। প্রত্যেক জাতিরই সাময়িক পরিচর্য্যার জন্য সময় নির্দ্দিষ্ট আছে। সুতরাং, বিভিন্ন জাতীয় গোলাপ বিভিন্ন চৌকায় রোপিত হইলে, উহাদের পরিচর্য্যা করিবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয়। এক চৌকায় বিভিন্নজাতীয় গাছ রোপণ করিতে হইলে, উহাদের জাতি অনুসারে দূরত্ব স্থির করিয়া লইয়া, তদনুযায়ী ব্যবধানেই

গাছ রোপণ করিতে হয়। যাহাতে অতি বৃদ্ধিশীল, দীর্ঘ-শাখী ও লতিকাস্বভাবাপন্ন গাছের দ্বারা ক্ষুদ্রজাতীয় বা কোমলস্বভাববিশিষ্ট গাছের কোনরূপ অনিষ্ট ঘটিতে না পারে, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াই এক কেয়ারি বা চৌকায় নানা জাতীয় গোলাপগাছ রোপণ করা সঙ্গত। গোলাপ-চাষে যৎকিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা না থাকিলে, এক এক চৌকায় এক এক জাতীয় গোলাপগাছ রোপণ করাই কর্ত্তব্য। চারাগাছ রোপণ করিবার পূর্ব্বে, উহার ডালের সংখ্যা অধিক রহিলে কিম্বা ডালগুলি দীর্ঘ হইলে, ডাল কাটিয়া সংখ্যা কম ও ছোট করিয়া দিতে হয়। নার্শারী-ওয়ালারা কলমের গাছের গোড়ায় যে আঁঠাল মৃত্তিকার চাপ বাঁধিয়া দেয়, রোপণ করিবার সময়, ঐ চাপের অন্নাধিক অংশ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াই গাছ রোপণ করা কর্ত্তব্য। কারণ, তাহা না হইলে, শিকড়গুলি আঁঠাল মৃত্তিকা ভেদ করিয়া সহজে বাহির হইতে পারে না। ইহাতে গাছও সতেজ হইতে পারে না। চারাগাছে শাখা না রহিলে, উহা ঈষৎ হেলাইয়া রোপণ করাই সঙ্গত। কারণ, তদবস্থায় কাণ্ডের গাত্র হইতে সহজেই নূতন শাখা নির্গত হইয়া থাকে।

গাছ রোপণের শৃঙ্খলা—সহস্র সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া গোলাপ-বাগ প্রস্তুত করিলেও, শৃঙ্খলার সহিত গাছ রোপণ করিতে না পারিলে, উহা সুন্দর বা চিত্তাকর্ষক হয় না। কারণ, রোপিত গাছের শৃঙ্খলার উপরই বাগানের সৌন্দর্য্য অনেকাংশে নির্ভর করিয়া থাকে। গোলাপ নানাজাতি এবং বিভিন্ন স্বভাবাপন্ন। সুতরাং, নানা-জাতির একত্রে সমাবেশ করিতে হইলে, উহাদের রোপণের শৃঙ্খলার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। একই উদ্যানে প্রমাণ (Standard) জাতীয়, লতাজাতীয়, উর্দ্ধ-লতা জাতীয় এবং ঝোপাকৃতিবিশিষ্ট জাতির সমাবেশ করিতে হইলে, অতিশয় দক্ষতার সহিত শৃঙ্খলাবদ্ধভাবেই উহাদিগকে বাগানে রোপণ করিতে হইবে। নচেৎ উদ্যানের সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়া যায়। ফলে, অর্থ ও শ্রম ব্যয়ের যথোচিত সাফল্য ঘটে না। উদ্যানস্বামীর নিজের এই বিষয়ে দক্ষতা না থাকিলে, প্রবীণ-লোক দ্বারা উদ্যান-রচনা করাইতে হইবে। গোলাপ-বাগের কোন স্থানে, কিভাবে ও কত দূরে দূরে গাছ রোপণ করিতে হইবে, তাহা পূর্ব্বেই সুস্থির করিয়া লওয়া আবশ্যক। কোন জাতীয় গোলাপ কিরূপ স্বভাবাপন্ন, উদ্যান রচকের তৎসম্বন্ধে অভিজ্ঞতা থাকা চাই। গোলাপ-বাগে গাছ রোপণ করিবার পূর্ব্বে, কত দূরে দূরে গাছ রোপণ করিতে হইবে, তাহার একটা নক্সা প্রস্তুত করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। বিভিন্ন জাতীয় গোলাপসম্বন্ধে উদ্যানস্বামীর বা উদ্যান-রচকের অভিজ্ঞতা না রহিলে, নক্সা প্রস্তুত করা সহজসাধ্য হয় না। নক্সা প্রস্তুত করিয়া লইয়া, তদনুযায়ী গাছ রোপণ করিতে পারিলে, কেবল যে উদ্যানের সৌন্দর্য্যই বর্দ্ধিত হয়, তাহা নহে। উহাতে কার্য্যেরও সুবিধা হয়; বিশেষতঃ, গোলাপচাষে সাফল্যলাভেরও ব্যাঘাত ঘটে না।

রোপণের শৃঙ্খলার দোষেও অনেকসময় গোলাপগাছের অকালমৃত্যু ঘটিয়া থাকে। গাছের অথবা মৃত্তিকা ও জলবায়ুর দোষেই যে কেবল গোলাপগাছের অনিষ্ট সাধিত হয়, তাহা নহে; রোপণের দোষেও উহার বিশেষ অনিষ্ট ঘটে। যথোচিত পরিচর্য্যার ত্রুটী বা ভ্রমজনক পরিচর্য্যা, রোপণের বিশৃঙ্খলা, সাময়িক কার্য্যে অবহেলা ও অনভিজ্ঞতা প্রভৃতি গোলাপচাষে সাফল্যলাভের প্রধান অন্তরায়। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা ও বসন্ত ইত্যাদি ঋতুভেদে কোন জাতি কোন স্থানে চাষের পক্ষে উপযোগী হইবে, তাহাও পূর্ব্বেই স্থির করিয়া লইতে হইবে। কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা না রহিলে, ইহা সুস্থির করিয়া লইতে পারা যায় না। গোলাপ-বাগের কোনদিকের পথের কোন পার্শ্বে কোন জাতীয় গোলাপের আবাগোপযোগী হইবে এবং কোন কোন স্থানে গোলাপগাছের কুঞ্জ, মঞ্চ, লতা-মণ্ডপ ও স্তম্ভ প্রভৃতি রচনা করা আবশ্যক, ঐ সকল সুস্থির করিয়া লইয়া, নক্সাতে চিহ্ন দিয়া রাখিতে হইবে। প্রত্যেক জাতীয় গোলাপের স্বভাব এবং কোন জাতীয় গোলাপ উদ্যানের কোন স্থানে রোপণের উপযোগী তাহা বিস্তৃতভাবেই লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। ঐ সকল বিষয় পাঠ না করিলে, পাঠকগণ নক্সা প্রস্তুতসম্বন্ধে কোনও কথাই ভালরূপে বুঝিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ। সুতরাং, ঐ স্থলে তৎসম্বন্ধে বেশী কিছুই লিখিত হইল না।

নানাবর্ণে বিভূষিত চিত্রে যেমন বর্ণের সামঞ্জস্য রক্ষিত না হইলে, উহা প্রীতিকর হয় না, তদ্রূপ জাতিগত বর্ণের পার্থক্যের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া গোলাপগাছ রোপণ করিলে, উহাও সুদৃশ্য বা মনমোহকর হইতে পারে না। যেখানে সেখানে যদৃচ্ছাক্রমে বিভিন্ন জাতীয় গোলাপগাছ রোপণ করিলে, উহাদের প্রস্ফুটিত পুষ্পের বর্ণগত কোনরূপ সামঞ্জস্য রহে না; সুতরাং, তাহাতে বাগানের সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়া যায়। ঐরূপ বিশৃঙ্খলভাবে উদ্যান রচিত হইলে, উহা সন্দর্শন করিয়া দর্শকের হৃদয়ে আনন্দের উদ্রেক হইতে পারে না। গোলাপ-বাগে যে প্রণালী অবলম্বনে সুশৃঙ্খলাসম্মত (systematic) চৌকা বা কেয়ারি প্রস্তুত করা হয়, তদনুযায়ী বর্ণের পার্থক্যানুসারে গোলাপের জাতি নির্ব্বাচন করিয়া, সেই সকল বিভিন্ন জাতি সুশৃঙ্খলার সহিত রোপণ করিতে হইবে।

রেনল্ড্স্ হোল্ (Reynolds Hole) বলেন,—গোলাপ-বাগে নানাবিধ গোলাপের একত্র সমাবেশ বড়ই রমণীয়। গোলাপগাছের চৌকা, গোলাপগাছের কুঞ্জ, গোলাপগাছের বেড়া, গোলাপগাছের ঝাঁসিরা (border) অর্থাৎ পথের পার্শ্বদেশে রোপিত গোলাপগাছের সারি এবং গোলাপ-বাগের ফোয়ারা প্রভৃতি বড়ই সুন্দর ও চিত্তা-কর্ষক হইয়া থাকে। পদসংলগ্ন ভূমিতে এবং মস্তকোপরি গোলাপগাছ জন্মিলে উদ্যানের সৌন্দর্য্য অত্যধিকরূপে বর্দ্ধিত হয়। গোলাপ-বাগের দক্ষিণভাগে ঢালু পাড় (Bank) থাকা আবশ্যক। উহাতে সুন্দর সুন্দর পুষ্পধারী নানাবিধ গুল্মজাতীয় গাছ রোপণ করা সঙ্গত। ঢালুর নিম্নভাগে বা পাদদেশে কেয়ারি রচিত হইলে, উহা অনির্ব্বচনীয় শোভাধারণ করিয়া থাকে। গোলাপ-বাগের মধ্যভাগে স্থানে স্থানে ঝিল্পি ও বিশৃঙ্খলভাবে রচিত গোলাপমঞ্চ থাকা আবশ্যক। উদ্যানের কোণে কোণে কুঞ্জ রচিত হইলে, উহার সৌন্দর্য্য আরও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। গোলাপ-বাগের দুই কেয়ারির মধ্যবর্ত্তী স্থান তৃণাচ্ছাদিত রহিলে, তদ্দ্বারা যে কেবল স্থানীয় শোভাই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, তাহা নহে। গোলাপ-বাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তৃণমণ্ডল রহিলে দর্শকমাত্রেরই নয়ন স্নিগ্ধ হয় এবং হৃদয়ে বিমলানন্দের সঞ্চার হইয়া থাকে। কতকগুলি গোলাপগাছ বিশৃঙ্খলার সহিত যেখানে সেখানে রোপণ করিয়া, গোলাপবাগকে অরণ্যে পরিণত করা সঙ্গত নহে। সুতরাং, সুশৃঙ্খলানুসারেই গোলাপবাগ প্রস্তুত করিতে হইবে।

গোলাপবাগের স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলের চৌবাচ্চা থাকা প্রয়োজন। বাগান বৃহদাকারের হইলে, তন্মধ্যে খাল খনন করা উচিত। খাল বা চৌবাচ্চার পার্শ্বেও শৃঙ্খলার সহিত গোলাপগাছ রোপণ করা যাইতে পারে। গোলাপবাগের আয়তনানুসারেই, উহাতে চৌবাচ্চা কি খাল খনন করা আবশ্যক, তাহা সুস্থির করিয়া লইতে হয়। খালাদির পার্শ্বে সুমূলোৎপন্ন গাছই রোপণ করা সঙ্গত। তবে রোপিত গাছগুলি ছাঁটিয়া ক্ষুদ্রাকারেই রক্ষা করিতে হইবে। বেরোনেস্ রথ্চাইল্ড (Baroness) Roth Child), লা ফ্রেন্স (La France), মেরি ফিঙ্গার (Marie Finger), মেরি বৌমান (Marie Bauman), মারাভিলি ডি লাইঅন্ (Merveill-de-Lyon), লুইস্ ভ্যান্ হাউটী (Louis van Hautte) মিসেস্ মারগোরেরাইট্ ডিকসন্ (Mrs. Marguerite Dickson), জেভিয়ার ওলিবা (Xavier olib), ডিউক অব ওয়েলিংটন (Duke of Wellington) এবং মেডাম্ গেব্রিল লুইজেট (Madame Grabriel Luizet) প্রভৃতি গোলাপগাছই খালাদি জলাশয়ের পার্শ্বে রোপণ করিবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ঝর্ব্বাকৃতি ও বৃদ্ধিশীল গোলাপগাছ বাগানের মধ্যভাগে রোপণ করিতে হয়। কিন্তু শেষোক্ত জাতীয় গাছ ছাটিয়া দিয়া, উহাদিগকেও ঝর্ব্বাকৃতি-জাতির ন্যায় রক্ষা করিতে হইবে।

জলসেচন-প্রণালী—গোলাপক্ষেত্রে বা গোলাপবাগে অতি সতর্কতার সহিতই জলসেচন করিতে হয়। রোপিত গোলাপগাছ ক্ষেত্রের মৃত্তিকায় লাগিয়া গেলে পর, অনেকেই সময় সময় উহাতে অত্যল্পপরিমাণ জল দিয়া থাকে। ফলে, আবশ্যকানুরূপ রসের অভাবে, গাছগুলিও আশানুরূপ পুষ্প প্রদান করিতে পারে না। এমন কি, অনেকসময় উপযুক্ত খাদ্য ও রসের

অভাবে রোপিত গাছগুলি নিতান্ত ক্ষীণ ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে; এবং কখনও কখনও, ঐ কারণে মৃত্যুমুখেও পতিত হয়। সুতরাং, গাছগুলি মৃত্তিকায় লাগিয়া গেলে পর, উহাতে প্রতিদিন জল না দিয়া, আবশ্যকমত সময় সময় প্রত্যেক গাছেই প্রচুর পরিমাণে জলসেচন করিতে হইবে। তদবস্থায় প্রতিদিন অল্প অল্প করিয়া জলসেচন করা অনাবশ্যক। মৃত্তিকা রসহীন হইবার উপক্রম হইলেই, উহাতে পূর্ব্বোক্তরূপে অধিক পরিমাণ জলসেচন করিতে হয়। সুবিধা রহিলে, ঐ সময় গোলাপ-ক্ষেত্রকে জলমগ্ন করিয়া দিলেও ক্ষতি নাই। কখন কখন বৃহদাকারের গাছেও অল্পপরিমাণে জল দেওয়া হয়। সুতরাং, উহা ঐ গাছের পক্ষে যথেষ্ট হয় না। ইহাতেও গোলাপগাছের বিশেষ অনিষ্ট সাধিত হইয়া থাকে। গোলাপ-ক্ষেত্রে আবশ্যকমত যথোচিত পরিমাণে জলসেচন না করিলে, তথায় রোপিত গাছগুলি ক্রমে এত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে যে, বর্ষার প্রারম্ভে উহাদের গোড়ায় সঞ্চিত রস, উহারা গ্রহণ করিতে পারে না। সুতরাং, তদবস্থায় গোড়ায় রস জমিয়া গিয়া গাছের বিশেষ অনিষ্টসাধন করে। এমন কি, তখন মূলের রস-গ্রহণ-শক্তির অভাবে, উহা পচিয়া উঠে; এবং ফলে, গাছ মরিয়া যায়। প্রাণীর পক্ষেও, ঐ নিয়ম সর্ব্বথা প্রযোজ্য। কারণ, উহারাও দীর্ঘসময় অনাহারে রহিয়া, তৎপর অধিকপরিমাণে আহার করিলে, উহাদেরে উদররোগে আক্রান্ত হইতে হয়। তদবস্থায়, উহারা কোনরূপ আহার্য্য বস্তুই ভক্ষণ করিতে বা ভক্ষিত-বস্তু জীর্ণ করিতে সমর্থ হয় না। অত্যধিক আহার বা অনাহার জনিত রোগাদি যেমন মনুষ্য বা মনুষ্যেতর প্রাণীদিগকে আক্রমণ করিয়া ধ্বংসের পথে আনয়ন করে, তদ্রূপ উদ্ভিদের—বিশেষতঃ, গোলাপ-গাছেরও রসাভাব বা অত্যধিক রসসঞ্চারে মৃত্যু ঘটিতে পারে। গোলাপগাছ সুস্থ ও সবল হইতে না পারিলে, অর্থাৎ যে কোনও কারণেই হউক রুগ্ন হইয়া পড়িলে, উহারা উৎকৃষ্ট পুষ্প প্রদান করিতে সমর্থ হয় না। পার্ব্বত্য-প্রদেশের জলবায়ুতে নবেম্বর মাস হইতে জুন মাসের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত অত্যল্পপরিমাণে বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। কিন্তু তৎকালে নিয়মিতরূপে বৃষ্টি হয় না;—সময় সময় বর্ষণ হয়। ঐ সময়ই, ছাঁটিয়া দেওয়ার পর, গোলাপগাছের বৃদ্ধি ঘটে; এবং তৎকালেই উহারা পুষ্পপ্রসূ হইতে আরম্ভ করে। এই সময় গোলাপগাছের অধিকপরিমাণে রস গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক হইয়া থাকে। সুতরাং, 'যো' বুঝিয়া জলসেচন না করিলে, উহারা যথোচিত পরিমাণে উৎকৃষ্ট পুষ্পধারণ করিতে পারে না। ফলে, গোলাপচাষে শ্রম ও অর্থব্যয় ব্যর্থ হইয়া যায়। সময় বুঝিয়া গাছে জল না দিলে, যদি মৃত্তিকায় রসের অভাব ঘটে, তাহা হইলে পরিবর্দ্ধন ও পুষ্টিসাধন উপযোগী রসের অনুসন্ধানে গাছের শিকড়গুলি নিম্নদিকে চলিয়া যায়। তাহা হইলে, উহারা আর ভূমির উপরিভাগের রস গ্রহণ করিতে সক্ষম হয় না। ফলে, শিকড়গুলি এবং উহাদের সঙ্গে সঙ্গে গাছটিও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। তদবস্থায়, চিকিৎসা বা শুশ্রূষা দ্বারা গাছের বিশেষ কোনরূপ উপকার সাধিত হইতে পারে না। আবশ্যকমত জলসেচনের অভাবে বা অতিরিক্ত জলসেচনের ফলে, শতকরা প্রায় ৯০টি গাছই আশানুরূপ পুষ্প প্রদান করিতে পারে না। আবশ্যকাতিরিক্ত জলসেচন করিলে গাছের মূল পচিয়া যায়। সেই জন্যই গাছে অতিরিক্ত জল দেওয়াও সঙ্গত নহে। বৃষ্টিপাতের অভাব ঘটিলেই, গাছে জল দেওয়ার আবশ্যক হয়। বর্ষাকালে কদাচিৎ জলসেচনের প্রয়োজন ঘটে। যে সময়ে বৃষ্টির অভাব হয়, সেই সময়ে প্রত্যেক তিন বা চারি দিন হইতে একসপ্তাহ অন্তর অন্তর গোলাপগাছে জলসেচন করিতে হয়। প্রতিদিন অল্পপরিমাণে জল না দিয়া, একদিনে প্রচুর পরিমাণে জলসেচন করাই সঙ্গত। ঐরূপ করিলে, ব্যয়ের পরিমাণও কম হয়, অথচ উহাতে গাছেরও উপকার হইয়া থাকে। জলসেচন করিবার পর, যদি ঐ জল মৃত্তিকায় শোষিত না হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, মৃত্তিকায় রসাধিক্য ঘটিয়াছে। তদবস্থায়, গাছের গোড়ার মৃত্তিকা আল্‌গা করিয়া দিয়া ২।৩ দিন রৌদ্র খাওয়াইলেই, উহা শুষ্ক হইয়া যাইবে। মৃত্তিকা খোঁচাইয়া আল্‌গা করিয়া দেওয়ার ৪।৫ দিন পরে, পুনরায় আবশ্যকমত জল দিতে হইবে। গাছে ফুলের কুঁড়ি দেখা দিলে, গাছের স্বাস্থ্যের অবস্থা বিবেচনায়, উহার গোড়ায় তরলসার ব্যবহার করা সঙ্গত।

মালদহের রেশম-শিল্পের উত্থান-পতন

("গম্ভীরা" হইতে উদ্ধৃত।)

মালদহের নাম কেবল রেশম ও আমের জন্য। কিন্তু আমের জন্য নামটী আধুনিক। রেশমের জন্য যে খ্যাতি আছে, তাহা অতি প্রাচীন। বহু পুরাতন কালে এ দেশে রেশম-কৃষি ও শিল্পের কীদৃশ অবস্থা ছিল, তাহা বলিবার উপায় নাই! তত্রাচ বলিতে পারা যায়, এ দেশের রেশম-কৃষি এবং রেশম-শিল্প নূতন নহে। এই বিষয়ের বিস্তীর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া প্রবন্ধটি গুরু করা অভিপ্রেত নহে। দেড়শত বৎসরের মধ্যে মালদহের রেশম-কৃষি-শিল্প কি প্রকার ধারা অবলম্বনে উন্নত হইয়াছিল এবং শেষে পতনের কারণ কি কি উপস্থিত হইয়াছে, তাহারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইলাম।

বর্ত্তমানসময়ে তুঁত-কৃষি-ক্ষেত্র যে প্রকার, শতবৎসর পূর্ব্বে এ প্রকার ছিল না; সে সময়ে তুঁতের জন্য ক্ষেত্রে সার দিবার কথা কেহই অবগত ছিল না। দু'বৎসরের মধ্যে কয়েকবার জমি কোদাল দিয়া কোবাইয়া দিত, বর্ষার সময় বেশী ঘাস হইলে একবার নিড়াইয়া দিবার প্রয়োজন হইত। এক্ষণে বর্ষার পর যেমন তুঁতগাছগুলি একেবারে কাটিয়া ফেলা হয়, তখন তাহা করিবার নিয়ম প্রচলিত ছিল না। এখন যেমন শাখা-সমেত তুঁতপাতা সংগ্রহ করা হয়, তখন তাহা হইত না। চা' পাতা সংগ্রহের মত, ফুল তোলার মত—কেবল তুঁত-ডাল হইতে পাতাগুলি তুলিয়া লওয়া হইত। কৃষক একটা বড় খুঙ্গী স্কন্ধে ঝুলাইয়া তুঁতক্ষেত্রে গমন করিত; সে খুঙ্গীটা ক্ষুদ্র নহে—প্রকাণ্ড চারি বৎসরের একটা ছেলে সে খুঙ্গীর মধ্যে অক্লেশে বসিয়া থাকিতে পারিত। তুঁতগাছগুলি বর্ত্তমানকালের মত ঘন-সন্নিবিষ্ট, সতেজ ও সুদর্শন ছিল না। তৎকালে এক হাত, খুব জোর দেড়হাত পর্য্যন্ত তুঁতগাছ দীর্ঘ হইত। কৃষক আবশ্যকমত তুঁতপাতা লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিত।

এখন দেখা যায়, কোন কোন রেশম-কীটপালক (বস্‌নী) ত্রিশ চল্লিশ থোপ পর্য্যন্ত রেশম-কীট পালন করিয়া থাকে। সে কালে ইহা অসম্ভব বলিয়া গণ্য হইত। সাধারণ বস্‌নীগণ দুই ডালা, চার ডালা, আট ডালা, খুব জোর এক থোপ পলু পুষিত। দুই থোপ পলু (রেশম-কীট). পালন করার কথা কমই অবগত হওয়া যাইত। অন্যান্য কৃষি-কার্য্যের মধ্যে তুঁতের চাষ এবং রেশমকীট পালন হইত। কেবল পলু-পোষার উপর নির্ভর করিয়া কেহ সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিত না। তুঁতের জমির খাজানা সাধারণ কৃষি-ক্ষেত্রের মত ছিল। সে সময়ে জমির খাজানা দুই পয়সা হইতে দুই আনা, জোর চারি আনা ছিল। ধান, গম, যব, ভুট্টা, কলাই, মটর, সকল কৃষকের গৃহেই থাকিত; তৎকালে সংসারযাত্রার মধ্যে রেশম-কৃষিটা 'ফাও' স্বরূপ ছিল। পল্লীতে পল্লীতে দু-পাঁচটা 'ঘাই' ছিল; তাহাতেই পালা করিয়া ও ঘাইএর ভাড়া দিয়া বস্‌নীগণ কোয়া কাটাই করিয়া লইত। যে বড় বড় বস্‌নীরা আধ থোপ, এক থোপ পলু পালন করিত, তাহাদেরই 'ঘাই' থাকিত। কোয়া কাটাই করিলে রেশম উৎপন্ন হয়; আর খানিকটা 'জটাম্' থাকিয়া যায়। ছোট ফাঁদের ঘাই ছিল, সুতরাং রেশমের 'ছড়ি'টা ছোট ফাঁদের হইত। স্ত্রীলোকেরা 'ফুকি-লাট' (Pear's cocoon) টাকু সাহায্যে কাটিয়া যে সরু ও মোটা সূতা কাটিত, তাহাকে 'লাটের সূতা' বলিত এবং তুলেতে করিয়া 'ঢেপুয়া' হিসাবে ওজন-নির্ণয় ও মূল্য-নির্দ্ধারণ হইত। দুই এক বন্দের বা সমুদায় 'বন্দে'র রেশম একত্র করিয়া হাটে বিক্রয় করিতে গমন করিত। সে সময়ে তাঁতের কাজ অতি সুন্দর ছিল—পল্লীবাসীমাত্রেরই তাঁত ছিল; বাটীর পুরুষ হিসাবে তাঁতের পরিমাণ অর্দ্ধেক ছিল। তাহারা কেবল মসরু ও কাট্‌য়ার থান বয়ন করিত; ধুতী, শাড়ী খুব কম লোকে বয়ন করিত। হিন্দু মুসলমান সকলেই তাঁতের কার্য্য করিত। পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়েরাই রেশম-কীট পালন করিত। আজকাল রেশম-সূত্র পুরাতন হইলে অর্থাৎ এক বৎসর বা দুই বৎসরের হইলে বিক্রয় করা যায় না; কিন্তু সে সময়ে পুরাতন বিবর্ণরেশম-সূত্র আদরের সহিত বিক্রয় হইত।

যেশে রেশমসূত্র যে পরিমাণে উৎপন্ন হইত, তদপেক্ষা সূত্রের আবশ্যক অধিক ছিল ; সুতরাং রেশমের দর বেশ ছিল।

ক্রমে ক্রমে মসরু ও কাটরার থানের কাটতি বাড়িয়া উঠিল, রেশমের মূল্য বৃদ্ধি পাইল, তাঁতী ও তাঁতের সংখ্যা দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইল ;—পীর গোসাঞগণ প্রত্যেক তাঁতীকে তাহাদের তাঁতের সরঞ্জাম প্রস্তুত করিবার টাকা প্রদান করিতেন, রেশম দিতেন, কার্পাস-সূত্র দিতেন এবং গোটা একখান মসরু বয়ন করিতে যে সময় আবশ্যক, ততদিনের সংসার-খরচের টাকা দিতেন। খানটার বয়নকার্য্য শেষ হইলেই, তাঁতী সেই খানটী মহাজনের নিকট পৌঁছাইয়া দিত ; মহাজন বাজারদর হিসাবে বা কিছিৎ কমে থানের মূল্য মিটাইয়া দিতেন। তাঁতী মহাজনের নিকট হইতে রেশম ও সূতা ক্রয় করিয়া লইয়া যাইত এবং মহাজনের পূর্ব্ব ঋণ কিছু কিছু করিয়া শোধ দিত। আবশ্যক হইলে ঋণ প্রাপ্ত হইত। নূতন তাঁতের প্রয়োজন হইলে বা কাহারও বাড়ীতে তাঁত বুনিবার উপযুক্ত লোক হইলে, মহাজন নূতন তাঁতের সরঞ্জামের জন্য সমুদায় টাকা দিতেন। এই প্রকারের সাহায্য পাইয়া দেশের তাঁত হু হু করিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। তাঁতের বৃদ্ধির সহিত তুঁতের কৃষি-ক্ষেত্র বৃদ্ধি পাইল, জমির উর্ব্বরতার প্রতি লক্ষ্য হইল, রেশম-কীট পালনের জন্য বসুনীগণ সবিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল। বসুনীরা পূর্ব্বে যে পরিমাণ পলু পালন করিত, তাহার দ্বিগুণ চতুর্গুণ পলু পালন আরম্ভ করিল। যথেষ্ট কোয়া উৎপন্ন হইতে আরম্ভ হইল ; এবং রেশমের যথেষ্ট মূল্য ছিল বলিয়া, লোকে রাশীকৃত টাকার মুখ দেখিতে আরম্ভ করিল। সুতরাং বসুনীদের মধ্যে রেশমকীট পালনের আগ্রহ চরম হইয়া উঠিল। তাহাদের সংসার-নির্ব্বাহের উপযুক্ত কৃষিকার্য্যের মধ্যে রেশম-কীটপালন আর গোবাকী রহিল না। তুঁতের কৃষি ও রেশম-কীট পালনই সংসার-নির্ব্বাহের মধ্যে মুখ্যস্থান অধিকার করিয়া লইল। সে সময়ে সরল জীবন-ধারণের উপযুক্ত দ্রব্যাদির মূল্য যথেষ্ট সুলভ ছিল ; সুতরাং অতি অল্প টাকাতেই সংসার বেশ সুন্দররূপেই নির্ব্বাহ হইয়া যাইত। ধান, গম, ভুট্টা, কলাই, মটরের কৃষি বসুনীরা ত্যাগ করিল ; কেবল তুঁত আর তুঁত, পলু আর পলু মাথার মধ্যে ঘুরিতে আরম্ভ করিল, বাড়ী বাড়ী ঘাই বসিল, কাটনী ও পাকদার দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিল। যাহারা পলুপালন করিত না,—কেবল কৃষিকার্য্য করিয়া সংসার নির্ব্বাহ করিত, তাহারা টাকার লোভে তাহাদের ছেলেদিগকে গো-পালন ত্যাগ করাইয়া পাকদার করিয়া দিল। বসুনীরা পাকদারের জন্য অগ্রিম টাকা দিত।

মসরু ও কাটরার থানের দর বৃদ্ধি-নিবন্ধন তাঁতী ও তাঁতের সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। ছায়ায় বসিয়া বেশ দশ টাকা লাভ হইত, সুতরাং তাহারা কৃষিকার্য্য ত্যাগ করিয়া তাঁতী হইয়া উঠিল! মহাজনের টাকা পরিশোধ হইয়া গেল। সপ্তাহে সপ্তাহে হাটে থান বিক্রয় করিয়া বা মহাজনকে দিয়া, নগদ ঝক্-ঝকে তক্‌তকে টাকায় পুটুলি বাঁধিয়া ও ধান, গম, তেল ইত্যাদি দ্রব্য সপ্তাহের মত ক্রয় করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিত ; এবং পূর্ব্ব হাটবার পর্য্যন্ত তাঁত বুনিত, গল্প করিত, রাজা-বাদশার মত সুখে থাকিত। কৃষিকার্য্য তাহাদের নিকট ক্রমশঃ হীন কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইতে লাগিল।

কুঠিয়াল সাহেবগণ এই সময়ে কুঠীর উন্নতি-কল্পে সবিশেষ মনোযোগী হইয়াছিলেন। রংরেজা বাজারে (ইংলিশ বাজার) তৎকালে রেশমকুঠি ছিল। যে স্থানে সার্কিট হাউস ও পূর্ব্বে জেলাস্কুল ছিল, সেই মাঠটা 'ঘাইবাড়ী' ছিল; লক্‌ড়ীখানা নামক স্থানে ঘাই আলাই করিবার জন্য 'লক্‌ড়ী' (কাঠ) থাকিত। সাহেবান্ ঘাই কাটিবার জন্য কাটনী, পাকদার, কর্ম্মচারী, ভৃত্য প্রভৃতির যথেষ্ট আবশ্যক হইয়াছিল। কুঠিয়ালগণ রেশমী-কীট পালন করিত না। তাহারা এ দেশের বসুনীগণের নিকট হইতে কোয়া ক্রয় করিত। সুতরাং কোয়ার দর ক্রমশঃই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। কুঠিয়াল-গণ জোর করিয়া দাদন দিয়া বসুনীর বাড়ী হইতে কোয়া লইতে আরম্ভ করিল। বর্ত্তমানকালে আরাপুরের যে স্থানে ছাত্রবৃত্তি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেই স্থানে রংরেজা বাজারের কুঠিয়ালের একটা শাখা ছিল। একজন দাওয়ানজী থাকিতেন, কতিপয় পাইক থাকিত; তন্মধ্যে কালু পাইকের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ছিল। জোর করিয়া কোয়া

ক্রয় করিবার প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল। কুঠিয়ালের জুলুমে বসুনীদের ঘাই-কাটা বন্ধ হইয়া গেল। দাদন লইতেই হইবে, কোয়া দিতেই হইবে, সুতরাং কাটিবার মত কোয়া বসুনী কোথায় পাইবে? তত্রাচ বসুনীগণ রেশমের প্রচুর মূল্য দেখিয়া লোভ সম্বরণ করিতে পারিত না। লুকাইয়া বনের মধ্যে ঘাই কাটিত। পাক দিবার হাতর্দে একটী বাঁশের চুঙ্গা পরান থাকে ; কাটিবার সময় ঐ হাতল ও চুঙ্গীতে শব্দ হয় ; ঘাই দ্রুত ঘূর্ণিত হয়, কিন্তু শব্দ হইলেই কুঠিয়ালের পাইকে ধরিয়া লইয়া যাইবে ও ভীষণ উৎপীড়নের ভয়! সুতরাং চুঙ্গী না দিয়াই ঘাই কাটিত। তাঁতীদের কষ্ট উপস্থিত হইল ; তাহারা দূর হইতে রেশম ক্রয় করিতে আরম্ভ করিল, তাহাতেও সুবিধা হইল না। কেবল কোয়া বিক্রয় করিয়া লাভ করিবার উপায় রহিল। কয়েক বৎসর ঘাইকাটা-রেশম প্রস্তুত করা উঠিয়া গেল। কিন্তু কোয়ার দর ধীরে ধীরে বৃদ্ধি করিয়া, কুঠিয়ালগণ কোয়া সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিল। দেশে বসুনীর বাড়ী আর ঘাই নাই, তাহারা কেবল দায়ে পড়িয়া কুঠিয়ালদিগকে কোয়া বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিল। তাঁতীর সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল, তাঁতী মাথায় হাত দিয়া বসিল, রেশম কৈ যে থান বুনিবে! অতি কষ্টে রেশম সংগ্রহপূর্ব্বক খুব কম পরিমাণ তাঁতের কাজ চলিতে লাগিল। সংসার নির্ব্বাহের জন্য যে কৃষি, তাহা তাঁহারা তাঁতের খাতিরে পূর্ব্বেই ত্যাগ করিয়াছে ; তাহারা রেশমকে ভুলিতে চায় না, সুতরাং তুঁতের চাষ ও রেশম-কীটপালন ধীরে ধীরে গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল। তাঁতীর গৃহ ক্রমশঃ তাঁতশূন্য হইয়া আসিল। ঘরে ঘরে পলু-পালন আরম্ভ হইল—যে কোয়ার জন্য কুঠিয়ালগণ চিহ্নিত ছিল, কোয়ার অভাবে সাহেবান বাণক বন্ধ হইবার উপক্রম হইতেছিল—তাহাদের আর কোয়ার অভাব রহিল না। প্রচুর কোয়া, বিশেষ লাভ ; এই সময়ে মালদহে ক্রমশঃ অনেকগুলি রেশম-কুঠি প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁতীরা তাঁত ছাড়িয়া পলু পালন করিতেছে। অনেক জাতি, অনেক সম্প্রদায় কোয়ার লাভ দেখিয়া বসুনী হইল, তুঁতের জমি ও পলু-পালন আরম্ভ হইল। তাঁত উঠিয়া গেল, কিন্তু রেশমকৃষি—তুঁতের ক্ষেত্র বৃদ্ধি পাইল। সাহেবান বাণকে প্রচুর কোয়া গৃহীত হইয়াও অতিরিক্ত হইবার উপক্রম হইল। কুঠিয়ালগণ কোয়ার বাজার নরম করিবার উপক্রম করিলে, বসুনীরা ঘাই কাটিতে আরম্ভ করিল। রংরেজার কুঠী পুনর্ব্বেই উঠিয়া গিয়াছিল ; ঘাই কাটিতে পাইব না, এ প্রকার জুলুম আর রহিল না। বসুনীরা ঘাই কাটিতে আরম্ভ করিল, কুঠিয়ালেরা কোয়া লইতে আরম্ভ করিল, কোয়ার প্রয়োজন প্রচুর বৃদ্ধি পাইল। এদেশে মসরু, ওকাট্, রার থানের ব্যবসায় উঠিয়া গেল, তাঁতীমাত্রেরই তাঁত উঠিয়া গেল ; সকলেই বসুনী, এখন আর কেহই তাঁতী নাই। কুঠিয়ালগণ (পৃথক্ কোম্পানী) পৃথক্ পৃথক্ ভাবে কোয়া ক্রয় আরম্ভ করিল, ক্রমশঃই প্রতিযোগিতা দেখা দিল, কোয়ার বাজার ৪০—৬০৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠিল। যাহারা চাষ করিত তাহারাও চাষ ছাড়িয়া, তুঁত ও পলু পালন লইয়া ব্যস্ত হইল। মাড়োয়ারীগণ রেশম ক্রয় আরম্ভ করিল। ঘুংকুর বাজার তেজ হইয়া উঠিল, কাজেই কোয়ার বাজার তেজ হইল ; কুঠিয়ালগণ তেজ কোয়া ক্রয় করিতে আরম্ভ করিলেন, ব্যবসায়ে লোকসান পড়িবার উপক্রম হইল। মালদহ জেলার কাগজচিরা, জোত আরাপুর, ধানতলা, গনিপুর, ভোলাহাট, রাইহো, মুচিয়া, মহদীপুর প্রভৃতি বহুসংখ্যক পল্লীগ্রামের লোকে বসুনী হইয়া উঠিল। যাহারা ইদানীং বসুনী হইল তাহারা চাষ ত্যাগ করে নাই, কৃষিক্ষেত্রও ছিল। মালদহের উৎকৃষ্ট ভূখণ্ড তুঁত-ক্ষেত্রে পরিণত হইল, অনেক পুরাতন আম-বাগান তুঁতক্ষেত্রে পর্য্যবসিত হইয়া গেল। যাহারা পলু পালন করে না (জাতীয় শাসনে), তাহারা তুঁতের জমি করিয়া তুঁতপাতা বসুনীগণকে বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিল। তুঁত ও বসুনীতে দেশ পূর্ণ হইয়া উঠিল।

সাহেব কুঠিয়ালগণ উত্তরোত্তর কোয়ার মূল্য বৃদ্ধি দর্শনে শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন ; তাঁহারা ঘুংকুর রেশম জন্য প্রতি বন্দে কত কোয়া ক্রয় করে, তাহার সন্ধান লইতে আরম্ভ করিলেন, দেশে বন্দে বন্দে কত কোয়া হইতেছে তাহার একটা তালিকা করিয়া বুঝিলেন—ঘুংকুর বাজার যত কোয়া ক্রয় করিবে অবশিষ্ট তাঁহারাই ক্রয় করিবেন ;

তাঁহারা সকল কুঠিয়াল একত্র হইয়া কোয়া ক্রয়ের চেষ্টা করিলেন। যে বন্দে তুঁত-পাতের দর বেশী হয়, সেই বন্দে কোয়া অধিক উৎপন্ন হয়। কোয়ার দর ফেলিবার জন্য অনেক চেষ্টা হইল, কুঠিয়াল ও ঘুংরুর প্রতিযোগিতায় কোয়ার বাজার গরম রহিল। অপরাপর স্থানে দেশ-বিদেশে রেশমকৃষি আরম্ভ হইল এবং অনিবার্য্য কারণে অনেকগুলি কুঠি উঠিয়া গেল—বস্‌নী ও তুঁতক্ষেত্র যাহা ছিল, তাহাই রহিল; সুতরাং কোয়ার দর পড়িতে পড়িতে একেবারে ১৬৲।১৭৲ টাকায় নামিল। এই প্রকার কোয়ার দর হঠাৎ পড়ে নাই; ধীরে ধীরে কয়েক বৎসরের মধ্যে চরমদশায় উপস্থিত হইয়াছে।

তুঁতের জমিতে বিবিধপ্রকার সার, যথা—ভোদ্ (জলজ পচা দাম), নীলের সিটী, গোবর, পাঁক, নাদি ও কাশাড় প্রভৃতি দিয়া, উহা আলুর জমির মত আলগা ও তৃণশূন্য করিয়া রাখিতে প্রতি বিঘা তুঁতজমিতে অনেক টাকা খরচ হইত। কোয়ার দর নরম হইলে, তুঁতের পাতের দরও কমিয়া গেল; সুতরাং তুঁতের জমির কৃষি বাবদে, সার বাবদে, খাজনা বাবদে, যাহা ব্যয় হইত তাহা উঠিত না। কাজেই তুঁতের জমিতে আমের কলম রোপণ করিল, তুঁতক্ষেত্র আমবাগানে পরিণত হইতে আরম্ভ হইল। ঢাকাই খরিদদারগণের কৃপায় মালদহের আম্রের দর দ্বিগুণ চতুর্গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুতরাং, তুঁতের আয় অপেক্ষা, আমের বাগান লাভজনক হইয়া উঠিল। মালদহে যেমন তুঁত ও কোয়ার মূল্যের হ্রাসের সূচনাতেই আমের মূল্য বৃদ্ধি হইয়া দেশবাসীর মঙ্গলবিধান করিল, তেমনই বহুসংখ্যক তুঁতক্ষেত্র আমবাগানে পরিণত হইল। সাধারণ বস্‌নীগণ কৃষিভূমির অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইল; কৃষি-ক্ষেত্রের দর—নজর, খাজনা অত্যধিক হইল। রাজসাহীর অন্তর্গত গুয়েপাড়া প্রভৃতি স্থানের রেশমকৃষির দুরবস্থা হইলে, তথাকার অধিবাসিগণ তুঁতের জমিতে হরিদ্রার চাষ আরম্ভ করিয়া বেশ দু' পয়সা লাভ করিতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, হরিদ্রা-ক্রয়ের গোলার মালিক সকলেই মাড়োয়ারী, বাঙ্গালী নাই! তবে বাঙ্গালী কর্ম্মচারী আছে।

বস্‌নীরা নিঃস্ব হইল কেন ?

যখন তাঁত বুনিত, যৎকিঞ্চিৎ পলু পালন করিত এবং কৃষির উপর অধিকাংশ নির্ভর ছিল, তখন তাহারা টাকার মুখ বড় দেখিতে পাইত না; অর্থ না থাকায় বড় লোকের সৌখীনভাবের অনুকরণ করিতে চেষ্টাও করিত না। ক্রমশঃ রেশম ও কোয়া বিক্রয়ে যখন প্রচুর টাকা গৃহে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিল, তখনি লোভ বৃদ্ধি হইল। সামান্য লোকেও মহাজনের নিকট হইতে ঋণ করিয়া দুই থোপ চারি থোপ পলু পুষিতে আরম্ভ করিল। যখন দেশের লোকে যৎসামান্য পলু পুষিত, তখন পলুর মধ্যে সংক্রামক-রোগ বড় দেখা দেয় নাই। কিন্তু বস্‌নীরা যখন প্রচুরপরিমাণে পলু পালনে মনোযোগী হইল, তখন কয়েকপ্রকার কঠিন রোগে এক এক বস্‌নীর এক এক বন্দের সিকি, অর্দ্ধেক বা পূর্ণভাবে মারা যাইতে আরম্ভ করিল। পলুর পোষার খরচ বড় কম নহে! এমন কোন বস্‌নী নাই, যাহার পলু জীবনে বহুবার নষ্ট না হইয়াছে। কাহার পাঁচ থোপ, কাহার সাত থোপ পলু কোন বন্দে পূর্ণ বা আংশিকভাবে নষ্ট হইলে, পাতের টাকা, মজুরের টাকা দিবার জন্য হয় মহাজনের নিকট ঋণ করিয়া শোধ করিতে হয়, নয় অন্য বন্দের জন্য অপেক্ষা করিতে হয়। অধিকাংশ বস্‌নী ঋণজালে জড়িত হইয়া দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে; যে সকল লোকে রেশম-শিল্পকে মুখ্য শিল্পভাবে গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারাই মূর্খের ন্যায় পতিত হইয়াছে। যাহারা অন্য ব্যবসায় বা কৃষির উপর নির্ভর করিয়া গৌণ বা ব্যবসায়ের 'ফাউ' স্বরূপ রেশম-শিল্প করিত, তাহারাই জীবনসংগ্রামে টিকিয়া গিয়াছে। কথায় বলে—

"মালোর পরণে ত্যানা,
পাঙ্খ্যার কাণে সোণা।"

যাহারা মাছ মারিয়া জীবনধারণ করে, তাহাদের দরিদ্রতা ঘুচে না; কিন্তু যাহারা জেলেদের নিকট হইতে মাছ লইয়া স্বতন্ত্রভাবে হাটে-বাজারে বিক্রয় করে, তাহারা ধনী হইয়া থাকে। মালোরা কৃষিকর্ম্ম করে না; তাহাদের সংসারযাত্রার সমুদায় বিষয় মাছের উপর নির্ভর করে। তদ্রূপ যে

বস্‌নীরা কেবল তুঁত ও পলুর উপর নির্ভর করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে, বর্ত্তমানে তাহাদের চরম পতন উপস্থিত হইয়াছে। সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের প্রত্যেক দ্রব্যের অসম্ভব মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে; কিন্তু কোয়ার বাজার ১৪৲—১৮৲ টাকাতে নামিয়াছে। সুতরাং বস্‌নী বাধ্য হইয়া পলু-পোষা ত্যাগ করিতেছে। বস্‌নীর মত হতভাগ্য জীব বর্ত্তমানে মালদহে কেহ নাই।

ভারত হইতে যখন প্রায় ১,৫৫, ৩২,২৯০৲ টাকার রেশম বৎসরে বৎসরে বিদেশে রপ্তানি হইত, তখন এ-দেশের রেশমশিল্পিগণ সুস্থ থাকিত। এখন ভারতের ৫০, ৫৫,২৪৪৲ টাকা মূল্যের রেশম বিদেশে রপ্তানি হয়, আর ভারতের বহির্ভাগ হইতে বৎসরে বৎসরে প্রায় ৫৮,৫০,০০০৲ টাকা হইতে ৩,০০,০০,০০০৲ টাকা মূল্যের রেশমী জিনিষ ভারতের বাজারে বিক্রয় হইতে আসে। ইহার উপর বিদেশ হইতে কৃত্রিম (নক্‌লি) ও ভেজাল রেশমের আমদানি ও কাট্‌তি হু হু করিয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে। নক্‌লি নীলে এ দেশের আসল নীলের সর্ব্বনাশ করিয়াছে, নীলের কুঠী উঠিয়া গিয়াছে; হয়ত কয়েক বৎসর পরে রেশমকুঠী উঠিবে, রেশম-কীট পালনের মাত্রা একেবারে কমিয়া যাইবে। নীলে ব্যক্তিগত লাভ ছিল, উৎপীড়ন প্রচুর হইত, উঠিয়া মঙ্গল হইয়াছে, কৃষি বাড়িবে। রেশম সাধারণের লাভের কৃষি ও শিল্প, কুঠি অনিবার্য্য কারণে—অনেকটা তাহাদের 'অতি লোভে তাঁতী নষ্টে'র মত হইয়া উঠিয়া গিয়াছে ও যাইতেছে; তাহাতে বড় ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। কিন্তু এক্ষণে কুটীর-শিল্পরূপে প্রতি গৃহে গৃহে ঘাই, তাঁত, পলুপোষা এবং মুখ্যরূপে কৃষি-কার্য্যের অনুষ্ঠান হইলেই মঙ্গল হইবে; নচেৎ নহে। দিন দিন তুঁতের জমির খাজনা বৃদ্ধিতে সকলেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। পলুর ব্যাধি দিন দিন সংক্রামক হইয়া উঠিয়াছিল, কটা-রোগগ্রস্ত বীজশূন্য রেশম-বীজ (সঞ্চ) দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছিল। তুঁতের ক্ষেত্রে কর্ম্ম করিবার ও পলুর সময় কাজকর্ম্ম করিবার মজুরের অভাব যত হউক না হউক, মজুরীর মূল্য দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিদেশিনী "পাড় দেওয়ানী" জাতীয় সমাজ-শাসনের ভয়ে আর আসে না; সুতরাং পূর্ব্বের মত অধিক পলু পোষা মালদহের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে।

রেশম-শিল্পের উন্নতির চেষ্টাকল্পে এ জেলায় বিশেষ চেষ্টা যে না হইয়াছিল, তাহা নহে। যখন রেশমের বাজার উঠিয়াছিল, যখন কোয়ার মূল্য ৪০৲ হইতে ৬০৲ টাকা মণ বিক্রয় হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, তখন এ দেশের কুঠিয়ালগণ আবশ্যক মত কোয়া ক্রয় করিতে বেগ পাইতেছিল, প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে কোয়ার মূল্য বৃদ্ধি করিতেছিল, সেই সময়ে এ দেশে তুঁত ও পলুর কৃষি হু হু করিয়া বাড়িয়া উঠিয়াছিল—বস্‌নীদিগকে বলিতে হয় নাই যে, তোমরা বেশী বেশী পলু পালন কর। আমবাগান, বাঁশবাগান কাটিয়া তাহারা তুঁতের আবাদ করিতে আরম্ভ করিল; দো-ফসলী উৎকৃষ্ট ক্ষেত্রগুলিতে তুঁতের আবাদ হইল, জীবনযাপনের মূল কৃষি ত্যাগ করিয়া, তাহারা পলু ও তুঁতকে সংসারের একমাত্র সম্পদরূপে গ্রহণ করিয়া ভবিষ্যতের দরিদ্রতাকে আহ্বান করিয়াছিল। যাহাতে তুঁতের কৃষি অধিক হয়, বস্‌নীরা যথেষ্ট পলুপালন আরম্ভ করে, বেশী কোয়া উৎপন্ন হয়, তাহার চেষ্টা মুখ্যভাবে কুঠিয়ালগণই করিয়াছিলেন, গৌণভাবে গবর্ণমেণ্টের আন্তরিকতা দেখা দিয়াছিল। বেশ মনে পড়ে—সেই সময়ে স্বর্গীয় নৃত্যগোপাল মুখার্জ্জী সাহেব (এন, জি, মুখার্জ্জী) এ দেশে বহুবার আসিয়াছিলেন। কাগজচিরা, জোত, ধানতলা, আরাপুর, ভোলাহাট, মেহেদীপুর প্রভৃতি অঞ্চলে তিনি ভ্রমণ ও অবস্থান করিয়া বস্‌নীগণকে হাতে-কলমে রেশম-শিল্পের সমুদায় ব্যাপার বুঝাইয়া দিয়াছিলেন—নির্দ্দোষ বীজ (সঞ্চ)-নির্ব্বাচন-প্রথা, রেশমকীটের ব্যাধিনিবারণের উপায়, তিনি প্রতিবস্‌নীর ঘরে ঘরে গিয়া শিক্ষা দিয়াছিলেন। অণুবীক্ষণের ব্যবহার তিনিই প্রথমে বস্‌নীকে শিক্ষা দেন। তাঁহার একটী প্রিয় শিষ্যের কথা বলিতেছি—জোতনিবাসী ভোলানাথ দাস রেশম-শিল্পে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছেন। তিনি বিশেষ-রূপে অবগত আছেন যে, সেই সময়ে মালদহ জেলায় রেশম-শিল্পের উন্নতিকল্পে মিঃ মুখার্জ্জী কীদৃশ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তাঁহার কৃত সুবৃহৎ "রেশম-বিজ্ঞান" তিনি স্বয়ং অনেক বস্‌নীকেই পাঠার্থে দিয়াছিলেন। তাহা মালদহের

রেশম-শিল্পের উপযোগী বহু জ্ঞাতব্যবিষয়ে পূর্ণ ছিল; তাঁহার কৃপাতেই বসনীগণ পলুর "রসা" (গ্র্যাসিরি), ছোঁয়াচে কালশিরা (ফ্ল্যাসিরি) এবং চুণাকেটে বা ছিট্ (মস্কার্ডিন) ও কটা (পেব্রিণ) প্রভৃতি ব্যাধির বিষয় অবগত হইয়াছিল, এবং 'ছিট' ব্যাধি নিবারণের জন্য তুঁতে (তুতিয়া) ও 'গন্ধক' প্রভৃতি রেশমকীটপালন ব্যপদেশে ব্যবহার করিতে শিক্ষালাভ করিয়াছিল। ভীষণ কটা (পেব্রিণ) রোগের বীজাণু অণুবীক্ষণ সাহায্যে অবগত হইয়াছিল, তাহারা সঙ্ক (সীড্ ককন) ও চকরী পরীক্ষা করিয়া কটা-রোগের বীজাণু ধরিতে পারিত এবং যথাসম্ভব নির্দ্দোষ সঙ্ক সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। চকরী (motle) পরীক্ষা করিয়া, উহা কটা-রোগশূন্য কিনা অবগত হইয়া, 'ডিম' রাখিত। কালশিরা পলুর একরকম উদরাময়-রোগ; তাহার নিদান অবগত হইয়া, তাহারা ব্যাধিপ্রতিকারে সমর্থ হইয়াছিল। রসা একরকম সর্দ্দি ও শোথ রোগবিশেষ; ইহারও যথাসাধ্য প্রতিকারে সমর্থ হইয়াছিল। মোটের উপর, এই সময়ে এদেশে রেশম-কৃষির বৈজ্ঞানিক কতিপয় উপায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

মালদহের রেশম-কৃষি-শিল্পবিষয়ে উল্লিখিত সময়টাকে "মুখার্জ্জীর যুগ" বলিতে পারা যায়। মুখার্জ্জী সাহেবের মত সদাশয়, বিদ্বান্, লোকপ্রিয়, হিতৈষী ব্যক্তি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া এদেশের রেশম-শিল্পের উন্নতি যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহা অসম্ভব। এই সময়ে তুতিয়া, গন্ধক, জাল প্রভৃতি পলুপালনের ও ব্যাধিনিবারণের দ্রব্যাদি সুলভে পাইবার উপায়বিধান করিতেও তিনি ভুলিয়া যান নাই। তাঁহার সময়ে বড় তুঁতের চাষ আরম্ভ হইয়াছিল। তিনি ফ্রান্স-দেশ হইতে রেশমকীটের ডিম্ব আনয়ন করিয়া এদেশের অনেক বসনীকে পালন করিতে দিয়াছিলেন। কোয়ার বাজার গরম ছিল বলিয়া বসনীরও সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কোয়া প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতে আরম্ভ হইল; কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রথায় কাজ করা অধিকাংশ বসনীর অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার পর "ঘোষ সাহেবের" যুগ মালদহে দেখা দিল। কৃষি-বিভাগের অফিস হইতে তুঁতিয়া, গন্ধক, জাল প্রভৃতি সুলভ মূল্যে বসনীগণকে প্রদত্ত হইতে আরম্ভ হইল—ঘোষ সাহেব একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা (রেশম-কীটসম্বন্ধে) প্রকাশ করিয়া বসনীগণকে দিয়াছিলেন। "কোয়ার জোয়ার" মূলস্থান অনুসারে পলুর "ওভারসিয়ার" নিযুক্ত হইল। তাহারা বসনীকে উপদেশ দিবে। কুঠিয়ালগণ পল্লীতে পল্লীতে বেতনভুক্ত দালাল নিযুক্ত করিয়া কত কোয়া কোন্ বন্দে উৎপন্ন হইতেছে, তাহার সন্ধান লইয়া (ঘুংরু কত কোয়া কোন্ বন্দে হইবে) এবং কত কোয়া দেশের লোকে কাটিতে পারে হিসাব করিয়া, কোয়ার দাম ধার্য্য করিতে আরম্ভ করিল। "জামালপুর কনসার্ণ" প্রতিষ্ঠিত হইয়া একত্রে সমুদায় কুঠির কোয়া ক্রয় আরম্ভ হইল, কত কৌশলে কোয়ার বাজার নরম করিয়া ফেলা হইল। সেই যে নরম হইল, সেই নরমেই বসনীর জ্ঞানোদয় হইল। বিদেশের তাঁতের জন্য, ভারতের বাহিরের তাঁতের জন্য কোয়া ও রেশম প্রস্তুত হইতেছিল; মালদহে তাঁত নাই যে, তাহার জন্য বসনীরা ঘাই কাটিবে। সুতরাং মাড়োয়ারী ও কুঠিয়ালগণের ফাঁদে পা দিয়া বসনী মারা পড়িল। তাহার পর তুঁতের কৃষি ও পলুপালন হ্রাস পাইল।

এ দেশের সূতার দোষ অনেক—একে ত মোটা, তাহাও সমান নহে; সমস্ত রেশম-সূত্রের কোথাও মোটা কোথাও সরু (খোলাচক্ষে বড় ধরা পড়ে না)। ডেনিয়ারের হিসাবে, এ দেশের ঘাইএ যে সূতা হয়, তাহা ৪০।৬০ ডেনিয়ার। ইউরোপে ১০ ডেনিয়ারের সূতা বেশী বিক্রয় হয়। আমেরিকায় ১৩ ডেনিয়ারের সূতার কাটতি বেশী; কিন্তু সাহেবান বাণকে ১৬ হইতে ২৫ ডেনিয়ারের সূতা প্রস্তুত হয়। সাহেবান বাণকের কাটনী ও পাকদার এ দেশী। ইহারা ইচ্ছা করিলে নিজেদের ঘাইএ ঐ প্রকারের সূতা কাটিতে পারে। তদুপরি বড় ফাঁদের তহবিল বাণকে চলে, বড় ফাঁদের সূতা বিদেশে বিক্রয় হইবে; কিন্তু দেশী কাটনী ও মহাজনগণ ছোট তহবিলে ছোট ফাঁদের সূতা কাটাই করে। সকল দোষের শ্রেষ্ঠ দোষ হইতেছে, ছুট ও ঘাই সম্বন্ধে দেশী কাটনীগণ উদাসীন। ছুট হইতে ছিন্ন সূতার সহিত পরবর্ত্তী সূতার গ্রন্থি দেওয়া হয় না, শেষে এক এক ফেটি সূতার মাই খুঁজিয়া বাহির করা দুষ্কর।

যাহা হউক, বড় ফাঁদের তহবিলে সূক্ষ্ম করিয়া সূতা কাটাই করিয়া অনেকে সবিশেষ লাভবান হইয়াছেন; লক্ষ্মীপুর নিবাসী দিলজান মণ্ডলের ও লক্ষ্মীপুরের অবস্থা পরিবর্ত্তনের ইহাই কারণ। এই প্রকারে অনেক মুসলমান ও হিন্দু যথেষ্ট লাভ করিয়াছিল। বর্ত্তমান কালে কোয়ার বাজার "বাবুণের" দরে নামিয়া পড়িয়াছে। এ দরে কোয়া বিক্রয় করিয়া বসনী কখন পলুপালনে সমর্থ হইবে না। তবে ঝিউড়ীর মেয়েরা করিবে বলিয়া নিজ নিজ জমির পাতে সামান্য পলু পালন করিতেছে; চাষ-বাসের চেষ্টায় বা অন্য কোন প্রকারে জীবিকা উপার্জ্জনের চেষ্টা করিতেছে। এখন বসনীরা বুঝিয়াছে, মুখ্যভাবে রেশম-কৃষিশিল্পে যোগ দিলে প্রাণে বাঁচিবে না। কিন্তু তবু তাহারা পলুপালন ভালবাসে; এখনও কিছু কিছু আশা আছে—একবার হয়ত কোয়ার দর চড়িবে। কিন্তু যদি তাহারা জানিতে পারিত যে কোয়ার বাজার আর চড়িবে না, পূর্ব্বের মত আর হইবে না, তাহা হইলে তাহারা এ আশাও হৃদয়ে পোষণ করিত না।

রেশম-শিল্পের উন্নতির আশা কোথায়?

তুঁতের জমি অপেক্ষা আমবাগানের আয় বেশী হইতেছে। ধান, গম প্রভৃতির মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে বলিয়া, উহার কৃষি লাভজনক। এখন আর দুই টাকা মণ ধান, গম নাই, এক টাকা মণ কলাই নাই, সুতরাং সাধারণ কৃষি লাভজনক। তদুপরি, এদেশ হইতে যত টাকা মূল্যের রেশম বিদেশে রপ্তানি হয়, তাহার তুলনায় বিদেশ হইতে রেশম আমদানী বৎসরে তিন কোটী অধিক টাকায় উঠিয়াছে। বৈদেশিক রেশমের চাপে এ দেশের রেশম-শিল্প আর কি করিয়া মাথা তুলিবে? কেবল বাক্য দ্বারা, কেবল কথায় সাহস দিলে, এ দেশে রেশমকীটপালন বৃদ্ধি পাইবে না। ভারতবর্ষে বৎসর বৎসর ১২,০০,০০০ সের রেশম উৎপন্ন হয় এবং এ দেশে মোট ৭,৬০,০০০ সের রেশমের জিনিষের (সমগ্র ভারত ব্যাপিয়া) কাটতি আছে। বিদেশে অধিক যায় না। অধিকন্তু, বিদেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে আসিতেছে। শুধু রেশম নয়, নকলী (কৃত্রিম) রেশম ও ভেজাল রেশম হু হু করিয়া আসিতেছে। বাজারে সুন্দর রেশমী কাপড় সকল বিদেশ হইতে আসিতেছে—উহার মধ্যে নকলী ও ভেজাল রেশমের বস্ত্রই অধিক; সম্ভবতঃ এই প্রকার রেশম ও আদত রেশমে ভারতের বাজার পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। কয়েক বৎসরের মধ্যে, এদেশী ৬,৬০,০০০ সের রেশম যে সমগ্র ভারতের কার্য্যে ব্যবহৃত হইতেছে, তাহাও থাকিবে না। সুতরাং রেশম কৃষি ও শিল্প অচিরাৎ এ দেশ হইতে বিদায় গ্রহণ করিবেই করিবে, এ কথা নিশ্চয়। কৃষিবিভাগ হইতে "রেশমকীটপালনের" আদর্শ নর্সরী খোলাটা বিড়ম্বনা মাত্র; ইহার পরীক্ষা বহু স্থানে বহুবার হইয়াছে, কেবল ব্যয় ভিন্ন লাভ কখনই হইবে না। ব্যাধির নিদান বুঝিতে বাকি নাই, রোগ নিশ্চয়ই হইয়াছে, ঔষধ ঠিক আছে, তখন গাছগাছড়া সেবনে এ রোগ আরোগ্য করিবার প্রয়াস বৃথা।

লোকে যে বেশী পলু পুষিবে বা বেশী লোকে রেশম-কৃষিতে মন দিবে কেন? ইহার কি উত্তর মিলিবে? কোয়া ধান-চাল নহে যে খাইবে; দর উঠিবে, এ যে সকলি পরের উপর নির্ভর করিয়া পলু-পালন করিতে হইবে। কোয়া বা রেশম পরের জন্য—বিদেশের জন্য করিতে হইবে—ঘরে ইহার আদর নাই! দেশের লোকে নকলী বেনারসী সিল্ক, জাপানী সিল্ক ক্রয় করিবে। একবার দৃষ্টিপাত করিয়া দেখুন—ছেলে-মেয়ে, যুবক-যুবতী, প্রৌঢ় সকলে নকলী ও ভেজাল বিদেশী সৌখীন রেশমী কাপড় ব্যবহার করিতেছে। দেশের মধ্যে যাহারা রেশমী-বস্ত্রব্যবসায়ী তাহারাও নকলী ও ভেজাল যুক্ত রেশমীবস্ত্র কাশীর, জাপানীর, ফরাসীর বা ইতালীর বলিয়া বিক্রয় করিতেছে! দেশের রেশম বৈদেশিক আসল, ভেজাল ও নকলী রেশমের চাপে চূর্ণ হইতেছে। এ মৃতপ্রায় শিল্পকে বাঁচান কেবল কথায় হইবে না। দেহের রক্ত না দিলে, বলিষ্ঠের রক্ত ট্রান্সফার করিয়া ঐ শিল্পের দেহে প্রবেশ করাইতে না পারিলে, রক্তশূন্য রেশম-শিল্প নিশ্চয় মরিবে। কেবল বাজে কথায় ফাঁকা আওয়াজে কিছুই হইবে না।

রেশম-শিল্পের নব-জাগরণের কল্পনা।

পীর গোসাঞগণের রেশম-ব্যবসায় কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহারা এ দেশের রেশম-শিল্পের উন্নতিকল্পে যে প্রকার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তদপেক্ষা উন্নত-প্রণালীর

Kshitindranath Tagore Collection

ব্যবস্থা করিতে হইবে। যে কোন উপায়ে হউক, একটা কোম্পানী গঠন করিতে হইবে। এদেশের যে যে পল্লীতে এখন পলুর চাষ আছে, ঘাই আছে, সেই সকল পল্লীর তালিকা করিয়া, সেই সেই পল্লীতে কেহ তাঁত বয়ন করিতে জানে কিনা—রেশম-চাদর, মটকার চাদর, রেশমী ধুতি-শাড়ী বুনিতে পারে কিনা, তাহার সন্ধান লইতে হইবে। এখনও বৃদ্ধ তাঁতীর সন্ধান মিলিবে, কিন্তু আর কিছু দিন পরে আর মিলিবে না! যাহারা ভাল রেশমী কাপড়, মটকার কাপড় বা বাফতা বুনিতে পারে, তাহাদিগকে দেশী-প্রথার তাঁত ও তাঁতের আনুষঙ্গিক যন্ত্রাদি প্রস্তুত করাইয়া দিতে হইবে, রেশম-সূত্র দিতে হইবে, রঞ্জিত রেশম-সূত্র দিতে হইবে; যাহারা বাফতা বুনিবে, তাহাদিগকে রেশম ও কার্পাস সূত্র দিতে হইবে। তদ্ভিন্ন অগ্রিম দাদনও কিছু দিতে হইবে; এবং কাপড় প্রস্তুত হইলে, তাহাদের নিকট হইতে আনিয়া, উপযুক্ত মূল্যনির্দ্ধারণপূর্ব্বক, রেশম, ও সূতার মূল্য বাদ দিয়া অথবা বস্ত্রের "বাণী" হিসাব করিয়া, তাঁতীকে টাকা দিতে হইবে। পুনশ্চ রেশম ও সূত্র দিতে হইবে, নূতন ধরণের কাপড় বুনিতে ফরমাইস করিতে হইবে, নমুনা দিতে হইবে; এবং বড় বড় গ্রামে এক বা দুই জন বর্ত্তমানকালের উন্নত বয়ন-যন্ত্রে উন্নত-প্রণালীতে শিক্ষিত যুবককে এক বা দুইটী নূতন বৈজ্ঞানিক প্রণালীবদ্ধ তাঁত ও উহার সরঞ্জামসহ বসাইতে হইবে। তাহারা যে নূতন তাঁতে—নূতন যন্ত্রে কেমন বুনিতেছে, কত শীঘ্র বুনিতেছে, দেশের লোকে তাহা দেখিবে; পল্লীমধ্যগত কোন কোন যুবককে সাকরেদ্-স্বরূপ গ্রহণ করিতে হইবে, পুরাতন প্রণালীর পার্শ্বেই নূতন প্রণালীর তাঁত রাখিতে হইবে, দেশের লোকে তুলনা করিয়া ভাল-মন্দ নিজেরাই বিচার করিবে। যাহাতে সাবেক তাঁত বেশী প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মাঝে মাঝে তুলনাসিদ্ধ জ্ঞানলাভের জন্য নূতন বৈজ্ঞানিক তাঁত কম মাত্রায় প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহারও চেষ্টা করিতে হইবে। সর্ব্বত্র নূতন ধরণের তাঁতের প্রচলন করিতে চেষ্টা করিলে, বীজ পুতিয়াই ফলের জন্য দাঁড়াইবার মত হইবে। বস্ত্রাগণের নিকট হইতে রেশম ক্রয় করিতে হইবে, কোনও রেশমের বড় বা ছোট দোকান হইতে রেশম ক্রয় করিলে চলিবে না। প্রতি পল্লী হইতে—যাহাদের ঘাই আছে, এমন বস্ত্রের বাড়ী হইতে রেশম ক্রয় করিয়া, সেই রেশম তাঁতীর বাড়ী পৌঁছাইতে হইবে। প্রথমতঃ, খাড়ী করা, রঞ্জন করার কথা দেশী তাঁতের মালিকদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা না করিয়া, ঐ সকল বৈজ্ঞানিক-তাঁতের মালিকদিগকে শিখাইতে হইবে এবং দেশী তাঁতের মালিকদিগের নিকট ঐ সকল উপায়ের গল্প করিতে হইবে; এবং শিখাইবার জন্য বৈজ্ঞানিক শিক্ষিত তাঁতীর বাড়ী তাঁত ও অপরাপর কল-কব্জার কার্য্য-প্রণালী দেখাইতে হইবে। কেবল পাঠশালার ছাত্রদিগকে "রেশম-বিজ্ঞান" পড়াইলে চলিবে না। তাহার পর, দেশী ও বৈজ্ঞানিক তাঁতের সাজসরঞ্জাম ও উপকরণ যাহাতে জেলার প্রকাশ্য স্থানে ও বৃহৎ গণ্ডগ্রামে প্রাপ্তির সুবিধা হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রতিষ্ঠিত কোম্পানী বা সমিতি এই উপায় করিবেন। উপকরণের মূল্য অতিরিক্ত হইলে চলিবে না; যন্ত্রগুলিও নিতান্ত জটিল যেন না হয়। তৎপরে আর একটা উপায় করিতে হইবে—কাপড় শেলাই-কলের সিঙ্গার কোম্পানী যেমন তাঁহাদের শেলাইকল ও উপকরণ ইত্যাদি ভাড়া দেন এবং মাসিক কিছু কিছু মূল্য লইয়া, শেষে কলের মূল্য শোধ হইলে, ক্রেতাকে কলটা বিক্রয় করেন, সেই প্রণালী অবলম্বনে, দেশী ও বৈজ্ঞানিক তাঁত ও তাঁতের সরঞ্জাম ভাড়া দেওয়া হিসাবে দিয়া, ধীরে ধীরে দাম উসুল করিয়া লইতে হইবে।

* * * তুঁতক্ষেত্রের খাজনা যাহাতে অতিরিক্ত গৃহীত না হয়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। কোম্পানী বা সমিতি তাঁতে বোনা বিবিধ বস্ত্রাদি উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করিবেন। নতুবা রেশম-শিল্পের উন্নতি কেবল কথার দ্বারায় হইবে না—হইতে পারে না।

RABINDRA BHARATI UNIVERSITY LIBRARY

Printed by Jatindra Mohan Das at the Ward Printing Works, Dacca and published by Nishi Kanta Ghosh at the Krishi-Samjada office, 66, Narinda, Dacca.

অর্দ্ধমূল্য !   অর্দ্ধমূল্য !!   অর্দ্ধমূল্য !!!

পাঠশালার শিক্ষকমাত্রেরই নিত্যপ্রয়োজনীয়—

বিদ্যালয়ে উদ্ভিদ-পরিচর্য্যা।

কালিফর্ণিয়া—বার্কলী-কৃষি-কলেজের শ্রীযুক্ত স্বর্ণকুমার মিত্র প্রণীত।

মার্কিণের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে (Grammar school) ক্রমাগত ছয় বৎসরকাল কিরূপভাবে প্রাথমিক কৃষিশিক্ষার বন্দোবস্ত রহিয়াছে, এ পুস্তকে তাহাই সরলভাষায় বিশদভাবে ব[illegible]লিখিত বিষয়গুলির বিস্তৃত আলোচনা রহিয়াছে :—

Kshitindranath Tagore
Collection

ভারতবর্ষ ও কৃষি-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা—বিদ্যালয়ে কৃষিশিক্ষা—আমাদের দেশ—পাশ্চাত্য-দেশে কৃষিশিক্ষা—প্রকৃতি-পাঠ—আমেরিকায় নিম্নশিক্ষা—বর্ষভেদে শিক্ষা-পর্য্যায়—নিম্নশিক্ষায় কৃষিচর্চ্চা—প্রাথমিক কৃষিশিক্ষার ভাবীফল—বাগানের উৎপন্ন শাক্-সব্জী—কার্য্যের নির্দ্দিষ্ট কাল—শিক্ষা-প্রণালী—আমাদের দেশে প্রাইমারী স্কুলে কৃষি-শিক্ষা—এ দেশের কৃষকসন্তানের শিক্ষার অন্তরায়—আমাদের কর্ত্তব্য—প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারের উপায়—গভর্ণমেণ্টের সাহায্য-প্রার্থনা।

সুন্দর মোটা আইভরি ফিনিস কাগজে অপূর্ব্ব মুদ্রণ। গ্রন্থকারের একখানি প্রতিকৃতি এবং পাঁচখানি একপৃষ্ঠাব্যাপী হাফটোন ছবি সংযুক্ত। মূল্য ।০ আনা মাত্র।

অভাবনীয় সুযোগ!   অভাবনীয় সুযোগ !!

কৃষি-সম্পদের গ্রাহকগণকে ‘বিদ্যালয়ে উদ্ভিদ-পরিচর্য্যা’ অর্দ্ধমূল্যে প্রদত্ত হইবে। পাঁচখানি ৵১০ মূল্যের ডাকটিকিট বা দশ পয়সার টিকিট পাঠাইয়া দিলেই এক একখানি পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন। স্মরণ রাখিবেন, এ আশাতীত সুযোগ অধিক দিন স্থায়ী হইবে না।

প্রাপ্তিস্থান—কৃষি-সম্পদ-পুস্তকবিভাগ, কৃষি-সম্পদ আফিস, ঢাকা। অথবা ম্যানেজার সিটী লাইব্রেরী, বাঙ্গালাবাজার—ঢাকা।